উৎসর্গ

অশেষ-শাস্ত্রবেত্তা মহামহোপাধ্যায়

ডক্টর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ

পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু

পরিচায়িকা

নাথ-সম্প্রদায় বলিয়া যে একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায় মধ্যযুগ হইতে আমাদের দেশে প্রচলিত রহিয়াছে, তাহা শিক্ষিত বাঙালী পাঠকের অজ্ঞাত নয়। নাথ-গুরুদের অলৌকিক কাহিনী সংস্কৃত, হিন্দী, মারাঠী প্রভৃতি নানা ভাষায় বিবিধ ভাবে গ্রথিত হইয়াছে ; কিন্তু বাংলা দেশ ও বাংলা ভাষার সঙ্গেই ইহাদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। এই সম্প্রদায়ের আদি-পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল নাকি বাংলা দেশে, এবং অন্যান্য নাথ-যোগীদের কথাও, এ দেশে, মঙ্গলকাব্যের মত রচিত নাথ-গীতিকায় ও কাহিনীতে প্রচারিত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে গোরক্ষনাথের শিষ্য জালন্ধর ও শিষ্যা ময়নামতী বাংলা গোপীচন্দ্রের গীতে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু একেবারে অজ্ঞাত না হইলেও এই সম্প্রদায়ের পূর্ব্ববৃত্তান্ত ও ধর্ম্মমত সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুব সুস্পষ্ট নয়। বিক্ষিপ্ত ভাবে এই সম্প্রদায়ের ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হইয়াছে, কিন্তু ইহার দর্শন ও সাধনা-পদ্ধতির বিবরণ যাহা এ পর্য্যন্ত লিখিত হইয়াছে, তাহা পর্য্যাপ্ত বা প্রচুর বলিয়া মনে হয় না। তাহার কারণ জিজ্ঞাসু পাঠকের অভাব বলিয়া নয়, বিবরণ দুষ্প্রাপ্য বলিয়াই এ সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতার শেষ নাই। এই অজ্ঞতা দূর করিবার জন্য প্রকৃত অনুসন্ধানীর শ্রমসাধ্য ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করিবার উৎসাহ ও একাগ্রতা আজকাল প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান বিদুষী লেখিকার সেই উৎসাহ ও একাগ্রতা আছে বলিয়াই আমি তাঁহার বিস্তৃত ও সারগর্ভ প্রথম রচনাটিকে বিদ্বৎসমাজে পরিচিত করিয়া দিতে সাহসী হইয়াছি।

কিন্তু রচনার বিষয়টি চিত্তাকর্ষক হইলেও সহজসাধ্য নয়। অন্তর্গত দুরূহতার কথা ছাড়িয়া দিলেও বহির্গত উপকরণের অভাব রহিয়াছে যথেষ্ট। নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রদেশে যে বিভিন্ন কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে এত অসঙ্গতি ও সংশয়ের কারণ রহিয়াছে যে তাহা হইতে একটি ধারাবাহিক বৃত্তান্ত রচনা করা নিরাপদ নয়। ইহার তত্ত্ব ও সাধনা সম্বন্ধে প্রামাণিক গ্রন্থের অভাবও যথেষ্ট। ইহা খুবই আশ্চর্য্যের কথা যে, এই ভারত-বিস্তৃত প্রাচীন সম্প্রদায়ের

কোনও আদি মূলগ্রন্থ পাওয়া যায় না। পরবর্ত্তী সময়ের গ্রন্থাদি, যাহা হইতে ইহার বৃত্তান্ত উদ্ধার করা যাইতে পারে, তাহাও নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত ও দুষ্প্রাপ্য, জলহাওয়ার প্রভাবে বা যত্নের অভাবে লুপ্তপ্রায়। ইহার অধিকাংশই অজ্ঞাত; যেগুলির সন্ধান পাওয়া যায়, তাহাদের সংগ্রহ করা যে কত কষ্টসাধ্য ব্যাপার তাহা যাঁহারা এ ক্ষেত্রে কাজ করিয়াছেন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন। বাস্তবিক, মধ্যযুগের অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায়, নাথ-সম্প্রদায়ের পুঁথি অতি অল্পই পাওয়া গিয়াছে; অধিকাংশই এখনও অমুদ্রিত অথবা অপ্রখ্যাত স্থান হইতে মুদ্রিত। ইহার মধ্যে সবগুলিই যে প্রাচীন ও প্রামাণিক তাহাও নিঃসন্দেহে বলা যায় না। ইহার একটি কারণ এই হইতে পারে যে, নাথ-গুরুদের শিক্ষা ছিল পরম্পরাগত। গুহ্য তত্ত্ব বলিয়া অনধিকারী বা সম্প্রদায়ের বহির্ভূত লোকের নিকট প্রকাশ্য ছিল না; তাই কোন বিশিষ্ট পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা হয় নাই। কারণ যাহাই হউক না কেন, এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, এই সাধক-সম্প্রদায়ের একটি সুসংযত ও পূর্ণাঙ্গ ইতিবৃত্ত লিখিতে হইলে যে তথ্যের উপাদান ও তত্ত্বের আলোচনা একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা এখনও সম্পূর্ণ-ভাবে সংগৃহীত হয় নাই।

কিন্তু প্রাচীন বাংলা দেশ বুঝিতে হইলে ইহার প্রাচীন ধর্ম্মসাধনা না বুঝিলে চলিবে না। অতীতের যে লুপ্ত চেতনা ও অনুভূতির উপর বর্ত্তমানের ভাব ও চিন্তা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা বুঝিবার সময় আসিয়াছে; কারণ, তাহা অগ্রাহ্য করিয়া জাতির ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণরূপে গড়িয়া উঠিতে পারিবে না। বাঙালীর যুগবাহী অধ্যাত্মচিন্তার যে সনাতন স্বরূপ, যাহার মগ্ন ভিত্তিমূলের উপর বাঙ্গালীর আত্মচেতনার বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠিত, নাথ-সম্প্রদায়ের সাধনা তাহারই একটি দিক। সুতরাং বাঙ্গালীর পক্ষে ইহার তথ্যানুসন্ধান ও তত্ত্বানুশীলনের প্রয়োজন রহিয়াছে। নিখুঁত ও নিরপেক্ষ বৃত্তান্ত লিখিবার সময় হয়ত এখনও আসে নাই; কিন্তু সমস্ত অসুবিধা সত্ত্বেও বর্ত্তমান গ্রন্থে যতদূর সম্ভব দুষ্প্রাপ্য আকরের অনুসন্ধান ও বিভিন্ন মোহন্তদের সহিত আলোচনা করিয়া যে বহু-আয়াস-সাধ্য বিবরণ রচিত হইয়াছে, তাহা এই প্রয়োজনের একটি উপযোগী দিক-নির্ণয়ের সহায়তা করিবে বলিয়াই মনে হয়।

মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির পর যে সকল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল, সেগুলি পরবর্ত্তী বৌদ্ধ মতের দ্বারা অল্পবিস্তর প্রভাবান্বিত।

ইহার সহিত যোগ রহিয়াছে হিন্দু ও বৌদ্ধ তন্ত্রের। তাহা ছাড়া, বাংলা দেশে বৈষ্ণব মতের বহু পূর্ব্বে শৈব মতের প্রাদুর্ভাব ও প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। নাথ-ধর্ম্ম বিশিষ্ট হইলেও এই সব প্রচলিত মতবাদকে এড়াইয়া যাইতে পারে নাই, যদিও আমাদের লেখিকা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ইহা মূলতঃ ছিল শৈব। কিন্তু মধ্যযুগের চিন্তায় ছিল একটি সমন্বয়ের প্রবণতা (Syncretism), যাহার দ্বারা ঘটিয়াছিল উপরোক্ত বিভিন্ন সাধনা-পদ্ধতির পরস্পর সংযোগ ও সমীকরণ। তাই পরিভাষা ও বিবৃতির প্রণালী বিভিন্ন হইলেও সকলের মধ্যে একটি মূলগত সাদৃশ্য বা ঐক্য রহিয়াছে। লেখিকা দেখাইয়াছেন, এই সকল অধ্যাত্ম সাধনার একটি মূলসূত্র হইতেছে অন্তরঙ্গ 'যোগ'-সাধন, অপরটি হইতেছে দেহতত্ত্ব। দুইটি প্রস্থানের অঙ্কুর বহুপ্রাচীন, কিন্তু মধ্যযুগের বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভিন্ন ভাবে পল্লবিত হইয়াছে। এই মূলকথা বোঝা কঠিন নয়র ; কিন্তু মধ্যযুগে এই গূঢ় তত্ত্ববাদের ভাষা হইয়াছে রূপকে ভাষা, তাই দুরূহ ও দুর্ব্বোধ্য। আত্মগত সাধনা ভিন্ন ইহার বিশ্লেষণে ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে ; কিন্তু বুদ্ধিমতী লেখিকা যথেষ্ট সতর্কতার সহিত নাথ-সম্প্রদায়ের বর্ত্তমান গ্রন্থগুলি অবলম্বন ও আলোচনা করিয়া ইহার বিশিষ্ট তত্ত্বগুলির একটি বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও বিবরণ দিয়াছেন। তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টা যে নিষ্ফল হয় নাই তাহার পরিচয় গ্রন্থের মধ্যেই পাওয়া যাইবে।

এই প্রসঙ্গে লেখিকা যে সকল সমস্যার উত্থাপন করিয়াছেন তাহার সমাধান সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ থাকিতে পারে, তথাপি তাঁহার একাগ্র প্রয়াস ও যত্ন যদি ভবিষ্যৎ চর্চ্চার ও সমালোচনার সহায়তা করে, এবং তাঁহার সংগৃহীত উপাদান যদি ভবিষ্যৎ পূর্ণতর বিবরণের ভিত্তিস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, তাঁহার অনুশীলন একেবারে ব্যর্থ হয় নাই। এ দাবী গ্রন্থকর্ত্রী নিজেও করেন নাই যে এই দুরূহ বিষয়ের সকল সমস্যার তিনি চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়াছেন। আরও অনুসন্ধান ও আলোচনার প্রয়োজন রহিয়াছে; কিন্তু তিনি সমগ্র বিষয়টির যে সুচিন্তিত ও সুনির্দ্দিষ্ট খসড়া প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, তাহা এই ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ কর্ম্মীর পথপ্রদর্শক হইবে বলিয়াই আশা করা যায়।

গ্রন্থের ভালমন্দের বিচার এই সামান্য ভূমিকার উদ্দেশ্য নয়।

সে ভার বিশেষজ্ঞের উপর দিয়া এইটুকু নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় যে, যাঁহারা মধ্যযুগের একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায় ও সাধনা-পদ্ধতির রহস্য-লোকে প্রবেশ করিতে উৎসুক, তাঁহারা ইহা হইতে, আমারই মত, যথেষ্ট উপকার ও আনন্দ লাভ করিবেন।

কলিকাতা
১লা জানুয়ারী, ১৯৫০

শ্রীসুশীলকুমার দে

অবতারণা

নাথ-সম্প্রদায় একদা সমগ্র ভারতবর্ষে একটী প্রধান ধর্ম্মসম্প্রদায় রূপে গণ্য হইত, নাথ সম্প্রদায়ের যোগীদের ভারতের সর্ব্বত্র গতিবিধি ছিল এবং তাঁহাদের অলৌকিক কীর্ত্তি ও কাহিনীসকল আসমুদ্রহিমাচল লোককে স্তম্ভিত করিত। নাথসিদ্ধদের মধ্যে দার্শনিক, কবি, বৈজ্ঞানিক, রাজনীতিজ্ঞ ও রাজাদেরও অভাব ছিল না, দেশের সর্ব্ববিধ উন্নতিকল্পে ইঁহারা জীবন উৎসর্গ করেন। নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস বিষয়ে ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে কৃতবিদ্য তেসিতরি, গ্রীয়ারসন, পুঁসা, উইন্টারনিট্জ, গ্রুনবিডেল, লেভি, তুচী, ব্রীগ্‌স প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এবং প্রাচ্যের মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজ, পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী, অধ্যক্ষ রাধাগোবিন্দ নাথ, ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী, ডাঃ মহাম্মদ শহীদুল্লাহ, ডাঃ মোহন সিং, ডাঃ রমন শাস্ত্রী, ডাঃ সুশীলকুমার দে, ডাঃ সুকুমার সেন প্রভৃতি আলোচনা করিলেও নাথ-দর্শন একপ্রকার অজ্ঞাতই রহিয়া গিয়াছে।[1] অতএব এবিষয়ে অনুসন্ধান ও আলোচনা করিবার যথেষ্ট অবসর অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। এযাবৎকাল মাত্র দুইটী নাথদর্শনের সংস্কৃত পুথি কাশী হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় নেপাল হইতে প্রাপ্ত কয়েকটি পুথি প্রকাশিত করিয়াছেন, তদ্ব্যতীত দোহাকোষ, গোরক্ষশতক, গোরক্ষসংহিতাদির নামও সংস্কৃতজ্ঞ পাঠকদের অজ্ঞাত নহে। কিন্তু কাশ্মীর হইতে প্রকাশিত গোরক্ষকৃত 'অমরৌঘ শাসন' বা হরিদ্বার হইতে প্রকাশিত 'সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতির' নাম অনেকের অজ্ঞাত থাকা বিচিত্র নহে। এখনও বিভিন্ন দেশে পুথি সকল অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে বা আবিষ্কৃত হইয়াও মুদ্রিত হয় নাই। ক্ষেত্রবিশেষে মুদ্রিত পুথিও অসম্প্রদায়িক লোকের নিকট গুপ্ত রহিয়া গিয়াছে। এইরূপ একটি পুথির নকল অতি কষ্টে আমাকে সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। হিন্দী, রাজস্থানী প্রভৃতি ভাষাতেও এই সম্প্রদায়ের বৃত্তান্ত আছে, বিভিন্ন দেশ হইতে সে সকল পুথিও কয়েকখানি সংগ্রহ করিয়াছি। অনতিবিলম্বে সেগুলি প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা রহিয়াছে। গোরক্ষনাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতি নাথগুরুদের অলৌকিক কাহিনী বঙ্গীয় কবিদের উপজীব্য হইয়া বঙ্গভাষায় বিভিন্ন গীতিকায় পরিণত হইয়াছে। মহারাষ্ট্র দেশে এসম্বন্ধে চিত্র ও নাটকাদি রচিত হইয়াছে, হিন্দী ভাষাতে ও উড়িয়া ভাষাতে কাব্য রচিত হইয়াছে, নেপালেও নেওয়ারী ভাষায় রচিত নাটক ও পুরাতন কাহিনীর অভাব নাই। নাথযোগীদের মধ্যে মৎস্যেন্দ্র ও গোরক্ষনাথ প্রধান, ইঁহারা যে ঐতিহাসিক ব্যক্তি তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। নেপালে মৎস্যেন্দ্রনাথের পূজা হয়, তাঁহার রথযাত্রা এখনও সে স্থলে প্রচলিত।

নাথযোগীদের কর্ম্মক্ষেত্র বঙ্গদেশেই অধিক। মৎস্যেন্দ্র এই ধর্ম্মের আদি প্রবর্ত্তক ছিলেন, তাঁহার আদি নিবাস পূর্ব্ববঙ্গে ছিল, বঙ্গভাষায় তাঁহার রচিত পদ পাওয়া গিয়াছে। নাথগুরু ও গোরক্ষ শিষ্য মধ্যে জালন্ধর নাথ বঙ্গীয় রাজা গোপীচন্দ্রের গুরু ছিলেন, সম্ভবতঃ জালন্ধরনাথই বঙ্গীয় গীতিকার হাড়িপা। গোপীচন্দ্রের মাতা ময়নামতী গোরক্ষনাথের শিষ্যা, একথা গীতিকার মধ্যে পাই, ময়নামতী, গোপীচন্দ্র, গোরক্ষনাথাদি সম্বন্ধে মর্ম্মস্পর্শী নাথগীতিকা বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অদ্যাপি গীত হয়। গোপীচন্দ্রের গানের একসময়ে ভারতব্যাপী প্রচলন হইয়াছিল। মীননাথ প্রভৃতির রচিত পদও একসময়ে কীর্ত্তনের সুরে গীত হইত। এই সকল কারণে বঙ্গদেশের সহিত নাথসম্প্রদায়ের ঘনিষ্ঠ সংশ্রব বহু শতাব্দী ধরিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে।

নাথসিদ্ধদের গৌরবময় যুগের কথা কেবল তাঁহাদের ইতিহাস নয়, তাঁহাদের ধর্ম্ম ও দর্শনকে স্মরণ করাইয়া দেয়, তাই নিবন্ধ রচনায় তাঁহাদের ইতিহাসের সহিত বিশেষভাবে তাঁহাদের দর্শনও আলোচনা করিয়াছি। এই নিবন্ধকে তিনটি বিভাগে বিভক্ত করিয়াছি,—'ঐতিহাসিক' অংশ, দর্শন বা 'সিদ্ধান্ত' অংশ এবং 'সাধনা' অংশ। তন্মধ্যে ঐতিহাসিক অংশে বিশেষ কোন নূতন তত্ত্ব সন্নিবেশিত হয় নাই, বিভিন্ন ভাষায় রচিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া, অমুদ্রিত পুথি হইতে সারসঙ্কলন করিয়া এবং মঠমন্দিরাদি দর্শনে লব্ধ আমার স্বকীয় অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়াছি। নিবন্ধ রচনার আরম্ভের সময় হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত যে সকল গ্রন্থ বা প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে বা যে সকল নূতন শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, সাধ্যমত সে সকল হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া যোজনা করিয়াছি। এ সম্পর্কে ফ্রেঞ্চ ও জার্ম্মাণ ভাষায় রচিত কয়েকখানি মূলগ্রন্থাদি দেখিয়াছি, হিন্দীতে রচিত বিভিন্ন গ্রন্থাদি পড়িয়াছি, মহারাষ্ট্র ভাষায় রচিত জ্ঞানেশ্বরীর হিন্দী অনুবাদ দেখিয়াছি। এই সকল পাঠ ও আলোচনার দ্বারা আমি মৎস্যেন্দ্র ও গোরক্ষনাথের সময় নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিয়া ঐতিহাসিক অংশে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছি। তারানাথ, লেভি, শহীদুল্লাহ প্রভৃতি মৎস্যেন্দ্রকে সপ্তম শতাব্দীর বলিয়া ধার্য্য করিয়াছেন, শাস্ত্রী মহাশয় লুইপাকে নবম শতাব্দীর বলিয়াছেন, ভাণ্ডারকার ও চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অনুমান করেন, গোরক্ষ দ্বাদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন, বাগচী মহাশয় লিপিতত্ত্ব হইতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন মৎস্যেন্দ্রনাথের 'কৌল-জ্ঞাননির্ণয়' পুথি একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের এবং পুথির রচয়িতা দশম শতাব্দীর শেষ ভাগের। ডাঃ মোহন সিং তাঁহার গোরক্ষনাথ গ্রন্থের ভূমিকায় প্রতিহার বংশের প্রাধান্যের যুগে গোরক্ষনাথ বর্ত্তমান ছিলেন এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার মতে গোরক্ষের জন্ম খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে ও মৃত্যু দশম শতাব্দীতে হয়।[১] প্রচলিত এবং

১। গোরক্ষনাথ গ্রন্থের ভূমিকা।—ডাঃ মোহন সিং।
বৌদ্ধগান ও দোঁহার ভূমিকা—পৃঃ ১৬, ২৩; শাস্ত্রী সম্পাদিত।
বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস পৃঃ ৩৪; সুকুমার সেন।
কৌলজ্ঞাননির্ণয়, ভূমিকা পৃঃ ৫, ৬, বাগচী সম্পাদিত।

নির্ভরযোগ্য যে কয়টি প্রমাণ আছে, তাহার দ্বারাও কোন একটী সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিন। জ্ঞানেশ্বরী তন্ত্রালোক ও কৌলজ্ঞান নির্ণয় এই তিনটী গ্রন্থের সমন্বয় সাধন করিয়া আমি মৎস্যেন্দ্রকে দশম শতাব্দীর ও গোরক্ষকে একাদশ শতাব্দীর বলিয়া স্থির করিয়াছি। নিবন্ধমধ্যে এই কালনির্ণয়ের কারণ নির্ণীত হইয়াছে। ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে আরও তথ্য আবিষ্কৃত হইবে আশা করিতেছি। লুইপাদ ও মৎস্যেন্দ্র এক কি ভিন্ন, উভয়ের ধর্ম্মমত কি, নবগোরক্ষনাথ ও নবমৎস্যেন্দ্রনাথের বিষয়ও আলোচিত হইয়াছে। তাঁহাদের সম্পর্কিত কয়েকটী স্থানের নির্দ্দেশের প্রয়াসও করিয়াছি, যদিও বহু শতাব্দীর পর এ সমস্যার মীমাংসা কঠিনতম হইয়া পড়িয়াছে।

এই নিবন্ধের সিদ্ধান্ত ও সাধনা অংশদ্বয়ে এ পর্য্যন্ত আলোচিত নাথদর্শনের অপূর্ণতা কিয়ৎ পরিমাণে পূর্ণ করিবার প্রযত্ন করিয়াছি, গ্রন্থাদির সাহায্যেই নাথদর্শন আলোচনায় বাধ্য হইলেও, এই অংশদ্বয়কে আমার মৌলিক আলোচনা স্বরূপ মনে করি। দ্বৈত বা অদ্বৈত মতামতের সহিত নাথমতের তুলনা নিষ্প্রয়োজন, কারণ প্রত্যেকের নির্দ্দিষ্ট পথ প্রত্যেকের বিশেষত্ব, তাই শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতির মতামতের বিশেষভাবে উল্লেখ না করিয়া কেবল নাথমতের বৈশিষ্ট্য দেখাইতে যেটুকু প্রয়োজন তাহাই নিবন্ধে আলোচিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে নাথদর্শনের বিক্ষিপ্তভাবে আলোচনা হইয়াছে সত্য, কিন্তু এতাবৎকাল ধারাবাহিকরূপে বা পূর্ব্বাপরসম্বন্ধরূপে ইহার আলোচনা হয় নাই। নাথদের যে সকল মুদ্রিত গ্রন্থ বা অমুদ্রিত পুথি আশ্রয় করিয়া আমি নাথদর্শন ব্যাখ্যা করিয়াছি, সে সকল মৎস্যেন্দ্রনাথ বা গোরক্ষনাথ বিরচিত কি না তদ্বিষয়ে সুধীমণ্ডলী সন্দেহপ্রকাশ করিবার অবকাশ পাইতে পারেন মনে করিয়া প্রথমেই স্বীকার করিতেছি যে প্রায় এক সহস্র বৎসর পরে কোন পুথি কাহার রচিত তাহা সঠিকভাবে নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। লিপিতত্ত্ব হইতে গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হইবার কালনির্ণয় সম্ভব হইলেও রচয়িতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিবার যথেষ্ট কারণ পাওয়া যায়, তথাপি এইটুকু স্বীকার্য্য যে গ্রন্থগুলি যে ঐ বিশেষ সম্প্রদায়ের, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই, মঠাদিতে ঘুরিয়া ও নাথযোগীদের সহিত আলাপ করিয়া এবিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়াছি।

বিংশাধিক বৎসর অতীত হইল কাশীর সরস্বতী ভবন হইতে 'গোরক্ষসিদ্ধান্ত-সংগ্রহ', 'সিদ্ধসিদ্ধান্তসংগ্রহ' মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইলেও তাহা লইয়া কেহ সবিশেষ আলোচনা করেন নাই। হরিদ্বার নাথব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতে 'সিদ্ধসিদ্ধান্ত-পদ্ধতি' মুদ্রিত হইলেও, সাধারণের পক্ষে উহা দুষ্প্রাপ্য রহিয়াছে, বহু বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে উহার অনুলিপি মাত্র আমার হস্তগত হইয়াছে, কারণ পুথিটি যোগসম্বন্ধীয় এবং গোরক্ষকৃত, উহা অসম্প্রদায়ী ব্যক্তির নিকট গোপন রাখা কর্ত্তব্য বিবেচিত হইয়াছে। গোরক্ষপুরের মোহন্ত মহারাজের সহিত এই পুথি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া এবং স্বয়ং তৎপূর্ব্ব হইতেই উহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া এই নিবন্ধের পরিশিষ্টে উহার অংশবিশেষ যোজিত করিতেছি। যোধপুর

মিউজিয়মে সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতি সম্বন্ধীয় ২৫টি চিত্রও রহিয়াছে। তাহাদের বিশেষ বিবরণ আমি প্রাপ্ত হইয়াছি ; মহারাজ মানসিংহের রাজত্বকালে এই সকল চিত্র অঙ্কিত হয়, ইহাদের প্রত্যেকটির আকার ৪ × ১২ ফুট। রাজপুত চিত্রকরের তুলিকার ইহারা উত্তম নিদর্শন। নাথসম্প্রদায়ের বহু পুথি লুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। নিবন্ধ রচনাকালে ও তৎপরেও দক্ষিণভারত, যোধপুর, কাশী প্রভৃতি স্থান হইতে কয়েকটী পুথি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। আলোওয়ার মহারাজা যোগীদের বিষয়ে সন্ধান করিতে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, তাঁহার পুথিশালায় নাথসম্প্রদায়ের পুথি থাকা বিচিত্র নহে। শান্তিনিকেতনের চীনাভবনে বা পাটনার সুবিখ্যাত গ্রন্থাগারে এ বিষয়ে কোন পুথি নাই।

যে কয়েকটী মঠ দর্শন করিয়াছি সংক্ষেপে তাহাদের উল্লেখ করিতেছি। কাশীর নাগরী প্রচারিণী সভার অনতিদূরে নবাবপুরায় 'গোরক্ষ-টিলা' নামক স্থান আছে, মঠটি বহু প্রাচীন, ভগ্নপ্রায় মন্দিরচূড়ায় একটী অশ্বত্থ বৃক্ষ আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পুষ্ট হইতেছে, মঠে মনুষ্যবসতির চিহ্ন নাই, মন্দির মধ্যে কোন মূর্ত্তিও নাই। প্রাঙ্গণে একটী মৌনী নেপালী সাধুর দর্শন মিলিল, তাঁহার কণ্ঠে নাথদের সাম্প্রদায়িক চিহ্ন সিংনাদ ও পবিত্রী থাকিলেও কর্ণে কুণ্ডল ছিল না। তিনি শ্লেট আনিয়া হিন্দীতে লিখিয়া জানাইলেন শেষ মোহন্ত লালনাথ মৃত হইলে তৎশিষ্য অর্জ্জুননাথ শাস্ত্রাদিসহ হরিদ্বারে গমন করেন এবং তথায় তাঁহার অপঘাত মৃত্যু হয়। এক্ষণে মন্দির-সম্মুখে গোরক্ষ ও জালন্ধরের চরণ মাত্র সার হইয়াছে, মন্দির-মধ্যে যে সকল মূর্ত্তি ছিল তাহা অপহৃত হইয়াছে। মন্দিরটী বর্ত্তমানে যোধপুর মহারাজের তত্ত্বাবধানে আছে, কিন্তু কোন সাধুর সেখানে রাত্রিবাস করিবার অনুমতি নাই। দালানে সাধুদের থাকিবার উপযোগী বহু কুঠরী শূন্য পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া এককালে তাহার সমৃদ্ধ অবস্থা অনুমান করিয়া দুঃখ হইল।

কাশীর কালভৈরবের মন্দির সন্নিকটে নাথদের একটী ক্ষুদ্র মঠ আছে, বাবা বটুকনাথ ইহার মোহন্ত, তিনি স্বল্প বয়সী এবং দর্শনী অর্থাৎ দর্শন বা কুণ্ডলধারী। নামের শেষে 'নাথ' পদবী ও পূর্ণ দীক্ষা হইলে 'কুণ্ডল' ধারণ নাথ সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য। মোহন্ত নেপালী ও গৃহী, মাত্র তিন বৎসর বয়ঃক্রমকালে পিতামাতাকর্ত্তৃক কালভৈরবের চরণে উৎসর্গীকৃত হইলে, পূর্ব্ব মোহন্ত তাঁহাকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। মোহন্ত পরিবার সেদিন জামাতার মৃত্যুতে শোকাচ্ছন্ন ছিলেন, জামাতা পূর্ব্বে নেপালের দেবী পাটানের মন্দিরের ভাণ্ডারী ছিলেন, মাত্র এক সপ্তাহ পূর্ব্বে ঐ মঠে তাঁহার বসন্ত রোগে মৃত্যু হইয়াছে শুনিলাম। ইহা শুনিয়া আমরাও আর কালবিলম্ব না করিয়া মোহন্তর পরামর্শানুযায়ী বাবা মঙ্গলনাথের মঠে চলিলাম। আমার সঙ্গীর মধ্যে একটি বৃদ্ধ বাঙ্গালী সন্ন্যাসী ছিলেন, মোহন্ত একটী গৃহী নাথসাধুকে সঙ্গে দিলেন, ইহার কর্ণে কুণ্ডল ছিল না।

অনতিদূরে বাবা মঙ্গলনাথের আশ্রম, বাবাজীর বয়স অশীতি বৎসরের ঊর্দ্ধে

হইলেও বেশ বলিষ্ঠ সুপুরুষ, দীর্ঘ শ্বেতশ্মশ্রু ও জটাধারী। তাঁহার সম্মুখেই গোরক্ষ প্রজ্বলিত ধুনি জ্বলিতেছে এবং একটী মন্দিরের মধ্যে গোরক্ষনাথের বৃহৎ মূর্ত্তি রহিয়াছে। বাবাজী অশ্বত্থবৃক্ষতলে কুশাসনে আমাদের বসিবার স্থান নির্দ্দেশ করিলেন। কথাবার্ত্তায় জানিলাম তাঁহার আদি নিবাস জয়পুরে, বহু বৎসর কাশীবাসী হইয়াছেন। বাবাজী বলিলেন, "গোরক্ষনাথের পিতামাতা ছিল না, তাঁহার দেশ বা জাতিও ছিল না, তিনি মহাদেবের ত্যাগের মূর্ত্তি বিশেষ, পার্ব্বতীকে এই মূর্ত্তিতে দেখা দিবার নিমিত্ত স্বয়ং শঙ্কর গোরক্ষরূপে আবির্ভূত হন।" রাজা গোপীচন্দ্রের বিষয়ে বলিলেন, "অজরত্ব ও অমরত্ব প্রাপ্তির নিমিত্ত মাতা ময়নামতী পুত্রকে সিদ্ধযোগী জালন্ধরের নিকট প্রেরণ করেন, গোপীচন্দ্র তাঁহাকে কূপ মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া হত্যার চেষ্টা করিলেও সফলকাম হন নাই।"

অনেক অনুনয়ের পর বাবাজী অনুগ্রহ করিয়া আমাদের সহিত গোরক্ষ-গায়ত্রী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলেও কোন শাস্ত্রগ্রন্থের সন্ধান পাইলাম না, আমাদের সমস্ত যুক্তি-তর্ক ও বুদ্ধির কৌশল তাঁহার নিকট হার মানিল, কেবল স্বীকার করিলেন, পূর্ব্বে তাঁহার নিকট দুইটী পুথি ছিল বটে, কিন্তু জনৈক সাধু তাহা পাঠের নিমিত্ত লইয়া গিয়া প্রত্যর্পণ করেন নাই। তিনি হরিদ্বার আশ্রম ও কয়েকটী মুদ্রিত পুথির নাম উল্লেখ করিলেন। বাবাজী বিশেষ অনুরোধ করায় সেদিন ঐ স্থানে প্রসাদ গ্রহণ করিতে হইল। বৃদ্ধের অমায়িক স্নেহপূর্ণ ব্যবহারে আমরা সত্যই মুগ্ধ হইয়াছিলাম; কিন্তু পুথির কথা আমি ভুলিতে পারি নাই। তাহার পুনরুল্লেখ করিলে তিনি বলিলেন, "শাস্ত্রপাঠে কি হইবে? আমাদের সাধন অনুভূতি-সাপেক্ষ।" আমি বলিলাম "তাহা সত্য, কিন্তু এই প্রকারে সম্প্রদায়ের তত্ত্বসকল লুপ্ত হইতে বসিয়াছে।" তদুত্তরে তিনি সম্মুখের অশ্বত্থবৃক্ষ দেখাইয়া সহাস্যে বলিলেন, "ঐ যে বৃক্ষ দেখিতেছ তাহা মৃতপ্রায়, কিন্তু তাহার শাখাপ্রশাখা কিরূপ সতেজ দেখিয়াছ? বালকের সহিত বৃদ্ধ কি দৌড়াইয়া পারে? আমাদের সম্প্রদায় এখন ঐ বৃদ্ধ অশ্বত্থের ন্যায়।" আবার সাক্ষাৎ করিতে বারম্বার অনুরোধ করিয়া বাবাজী আমাদের বিদায় দিলেন।

কাশীর চেৎগঞ্জে বাবা গুলাবচন্দ্রের মঠে কালভৈরবের নাথপন্থী যোগীদের মঠের সন্ধান পাইয়াছিলাম। বাবা গুলাবচাঁদ কেনারামী সম্প্রদায়ের অঘোরী, ইংরাজি-শিক্ষিত, বৃদ্ধ, সরল ও অতিশয় বিনয়ী। তাঁহার রচিত গ্রন্থাদি আছে, একটী পাক্ষিক পত্রিকারও তিনি সম্পাদক। তিনি কালীমঠে যন্ত্রাদির ও শিবালার নিকটবর্ত্তী অঘোরীমঠে ষট্‌চক্রের চিত্রের সন্ধান দিলেও, কার্য্যতঃ তাহাদের সন্ধানে গিয়া তাহাদের অস্তিত্বের কোন চিহ্ন পাই নাই। যন্ত্রাদি দর্শনে অসম্প্রদায়িকের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের একেবারেই অনধিকার, চক্রের চিত্রের পরিবর্ত্তে কয়েকটী সমাধি ধুনি ও তৎপার্শ্বে সুপ্ত কুণ্ডলীকৃত দুইটী কুক্কুর, দত্তাত্রেয়, কেনারাম প্রভৃতির মূর্ত্তি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতে হইয়াছিল। মোহন্ত বাবাজী চক্রাদির চিত্রের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেন না।

কেনারামী অঘোরীরা নিজেদের অবধূত বলেন, আমাদের আলোচ্য নাথমার্গের আদর্শও 'অবধূত'। বাবা গুলাবচন্দ্রের সহিত ষট্‌চক্রসাধনার বিষয় আলাপ হইয়াছিল, বাবাজী বলেন, "অঘোরী ষট্‌চক্রের সাধক, অন্যান্য তান্ত্রিকেরা পঞ্চমকারের সাধক, অর্থাৎ নাভিমূল হইতে তাঁহারা পঞ্চচক্রের মধ্য দিয়া বায়ুকে উর্দ্ধে নীত করেন। অবধূতের সাধনা মূলাধার চক্র হইতে, অতএব ইহাই ষট্‌চক্রের সাধন। মূলাধার হইতে বায়ু উত্থিত করেন বলিয়া অঘোরীদের মূত্রবিষ্ঠাহারী বলা হয়, ইহা ভ্রান্তিমাত্র। অঘোরী পক্ষে 'মৈথুন' অর্থে খেচরী মুদ্রা সাধন দ্বারা মৃত্যুঞ্জয়ী হওয়া।" তৎপরে অতি সঙ্কোচের সহিত যুক্ত করে বৃদ্ধ বলিলেন, "মাফ্ কী জিয়েগা, বাঙ্গালামে পঞ্চমকারকা দুসরা অর্থ কিয়া গয়া হ্যায়।" ইঁহার রচিত 'বিবেকসার' গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন, অবধূত হইতে শ্রেষ্ঠ মার্গ আর নাই, পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্তি অবধূতের বেশ, অবধূত শিবোপাসক। বর্ত্তমান কালে অবধূতের সিদ্ধান্ত কেহ মান্য না করিয়া ভ্রান্তির পথে চলিয়াছেন, ইত্যাদি।

কলিকাতার নিকট দমদমে গোরখ বাঁস্‌লীতে বৃহৎ মঠ ও মন্দির আছে। মন্দির মধ্যে ভর্ত্তৃহরি, গোরক্ষনাথ ও গোপীচাঁদের তিনটী বৃহৎ মূর্ত্তি আছে, অন্যান্য দেবতার ক্ষুদ্র মূর্ত্তিরও অভাব নাই, গোরক্ষ প্রজ্জ্বলিত ধুনিও আছে। মোহন্তর নাম 'বুধনাথ'। ইঁহাদের বিশ্বাস গোরক্ষনাথ ভারতের দক্ষিণ হইতে আসিয়া গঙ্গাতীরে বাস করিবার নিমিত্ত ঐস্থানে আগমন করেন। পূর্ব্বে গঙ্গা ঐ মঠের নিকট ছিল। ভাণ্ডারগৃহে ধূলিধূসরিত কয়েকখানি মুদ্রিত গ্রন্থের ছিন্ন পত্র ব্যতীত কোন পুথির সন্ধান মিলিল না। যথেষ্ট প্রসাদ ও সরল ব্যবহার পাইয়া বিদায় গ্রহণ করিতে হইল। নিকটবর্ত্তী ষাট্‌গাছি গ্রামে সাধক চিকিৎসক নগেন্দ্রনাথ নাথ মহাশয়ের নাম শুনিয়া তথায় গমন করিলাম। তাঁহার আশ্চর্য্য ফলপ্রদ ঔষধের জন্য দূরদূরান্তর হইতে সর্ব্ব জাতি ও সর্ব্ব শ্রেণীর স্ত্রী-পুরুষের সমাবেশ দেখিলাম, কিন্তু কোন শাস্ত্র-গ্রন্থের সন্ধান মিলিল না। নাথসম্প্রদায়ের কোন শাস্ত্রগ্রন্থের সন্ধান তিনি রাখেন না দেখিলাম।

সম্প্রতি গোরক্ষপুরের মঠ দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। মোহন্ত মহারাজ শ্রীমদ্ দিগ্বিজয় নাথ, বি, এ, দীর্ঘাবয়বসম্পন্ন ও স্বর্ণকুণ্ডলধারী। তিনি স্বদেশপ্রেমী নামে খ্যাত। তিনি মন্দির-মধ্যে লইয়া গেলেন, দেখিলাম গোরক্ষের কোন মূর্ত্তি নাই, তাঁহার চরণদ্বয় পুষ্প ও নৈবেদ্যে আবৃত হইয়া রহিয়াছে, মন্দিরের গৃহতল শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত, চতুর্দ্দিক ধূপ, ধূনা ও পুষ্পের গন্ধে আমোদিত। একপার্শ্বে গোরক্ষের কল্পিত মূর্ত্তির একটি চিত্র রহিয়াছে, তৎপার্শ্ববর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ মধ্যে গোরক্ষ-প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ শত শত বৎসর ধরিয়া জ্বলিতেছে। মন্দিরের বহির্গাত্রে নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি রহিয়াছে। আমরা মন্দির-পরিক্রমা করিয়া কালীমূর্ত্ত্যাদি দর্শন করিলাম। মন্দিরটি বৃহৎ না হইলেও তাহার চূড়া স্বর্ণমণ্ডিত। অতিথিশালা প্রভৃতির অভাব নাই। সেইদিন মন্দিরদর্শনপ্রার্থী পাটনা হইতে আগত মুসলমান ফকীরদের

দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম। গোরক্ষমন্দিরের বাহিরে ভূতপূর্ব্ব মঠাধ্যক্ষ মহাত্মা গম্ভীরনাথের সুন্দ. মন্দির দেখিলাম। মন্দির মধ্যে বাবাজীর শ্বেত প্রস্তরের সুন্দর মূর্ত্তি রহিয়াছে। নৈতিক চরিত্রবলে তিনি সকলের নমস্য হন, সাধুদের মধ্যে তিনি 'সিদ্ধ-যোগী'রূপে খ্যাত ছিলেন। তিনি বাঙ্গালী না হইলেও তাঁহার বহু শিক্ষিত বাঙ্গালী শিষ্য আছেন, তাঁহাদের অর্থেই এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গোরক্ষপুরের মঠ নাথপন্থীদের প্রধান তীর্থ বিশেষ। ইহার ভাণ্ডারগৃহেও কোন পুথির সন্ধান না পাইয়া যথার্থই মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছিলাম। গোরক্ষপুরের সুবিখ্যাত গীতা প্রেসের সত্বাধিকারী মহাশয়ের পুথি-সংগ্রহাগার আছে সন্ধান পাইয়া, সেখানে গিয়া যে দুইটি পুথির সন্ধান পাইলাম তাহা পূর্ব্বেই মুদ্রিত হইয়াছে। নাথযোগীরা অলৌকিক সিদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। যোগীদের অদ্ভুত ক্ষমতা সম্বন্ধে মিসেস্ ডেভিড্ ওনিল নামে একজন ইংরাজ মহিলা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। রহস্যাবৃত তিব্বত নিষিদ্ধ রাজ্যের ন্যায়, তথায় বৌদ্ধলামার বেশে কোন মহিলার প্রবেশ করিয়া মঠাদির বিবরণ দেওয়া অতি বিস্ময়ের ব্যাপার। সম্প্রতি ভাগ্যক্রমে এই মহিলার সহিত আমার আলাপ ও আলোচনা হয়। ইনি এক্ষণে অশীতিপরা বৃদ্ধা হইলেও যথেষ্ট সক্ষম। সাধনার বলে একদা ইনিও সিদ্ধিলাভ করেন।

বহু বৎসর যাবৎ নানাস্থানে নিজে গিয়া বা পত্র লিখিয়া অনুসন্ধানের ফলে যে সকল পুথি আমার হস্তগত হইয়াছে, তাহার নিমিত্ত কাশী নাগরী প্রচারিণী সভার পুস্তকাগারাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত শম্ভুনারায়ণ চৌবে বি,এল, এবং সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নারায়ণ মিশ্র, কাশী বিদ্যাপীঠ প্রভৃতি গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষেরা, কাশীর শ্রীযুক্ত গিরিধারীলাল ব্যাসজী, যোধপুরের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পান্নালাল নাগ, মান্দ্রাজ গভর্ণমেণ্ট ওরিএণ্ট্যাল পুথির পুস্তকাগারের অধ্যক্ষ ডাঃ এ, সঙ্করণ, এম, এ, পি, এইচ, ডি এবং তাঞ্জোর মহারাজের গ্রন্থাগারাধ্যক্ষ শ্রীগোপালন, বি-এ, বি-এল আমার বিশেষ ধন্যবাদার্হ। তাঁহাদের ঐকান্তিক চেষ্টার জন্য আমি তাঁহাদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। কুমিল্লা কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ এম, এ, নানা তীর্থ পর্য্যটক শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়, বেলগাঁওয়ের ডাঃ এন, আর, সাকারে এম, এ, টি, ডি, রায়বাহাদুর সুরেশচন্দ্র সিংহরায় বিদ্যার্ণব, এম, এ, প্রভৃতি যাঁহারা আমার পত্রের উত্তরদান বা গ্রন্থদান করিয়া আমার কার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকেই আমি কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিতেছি। শ্রীযুক্ত ব্যাসজীর নিকট আমি একটি পুথির জন্য বিশেষভাবে ঋণী। পরম শ্রদ্ধাভাজন শ্রীমদ্ হরিহরানন্দ আরণ্য ও পণ্ডিত তারকেশ্বর পাঠকশাস্ত্রী প্রাচীন সংস্কৃত, হিন্দী ও রাজস্থানী ভাষায় রচিত পুথির দুরূহ অর্থ উদ্ধার করিতে আমায় যে সাহায্য করিয়াছেন তজ্জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম। ভবিষ্যতে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি দ্বারা নাথযোগীদের অন্যান্য পুথি সংগৃহীত হইলে আরও আলোচনা সম্ভব হইতে পারে।

মধ্যযুগের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধনগত ঐক্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা আমি নিবন্ধের ঐতিহাসিক অংশের শেষাংশে করিয়াছি, ইহা অনুসন্ধিৎসু পাঠক দ্বারা পৃথকভাবে আলোচিত হইবার যোগ্য বিষয় বলিয়া মনে করি। বর্ত্তমান নিবন্ধের অনাবশ্যক কলেবর বৃদ্ধি আশঙ্কায় এবং আমার গবেষণার বিষয়ের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না থাকায় এ বিষয়ে আমার আলোচনার ফল আমার নিবন্ধে সম্পূর্ণরূপে সন্নিবেশিত করিতেছি না।

মধ্যযুগের ভারতীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের আলোচনা করিলে জানা যায় যে মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুত্থান কাল হইতে যে সকল বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়, তাহাদের প্রত্যেকের সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও উহাদের মধ্যে একটী মূলগত ঐক্য আছে। নাথ সম্প্রদায়ের দর্শন ও সাধনের সহিত উক্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধনের তুলনা করিলে চিত্তবৃত্তির একটী সাধারণ ধারা প্রবাহিত হইতে দেখা যায়। নাথদর্শন সম্বন্ধে মতভেদ আছে, আমার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ যে সকল গ্রন্থ অবলম্বনে যে ভাবে রচিত হইয়াছে, তাহার সহিত অন্যের মতভেদ থাকা বিচিত্র নহে। নাথসম্প্রদায়ের গ্রন্থাদি মূলতঃ আশ্রয় করিয়া, সমজাতীয় প্রচলিত তন্ত্র ও উপনিষদের সাহায্যে নাথসিদ্ধদের দর্শনের মূল তত্ত্বগুলি বিশ্লেষণের প্রয়াস পাইয়াছি, কারণ মধ্যযুগের দর্শন আলোচনায় ইহা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। তন্ত্রের সহিত নাথদর্শনের যোগ সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা ইতিপূর্ব্বে কেহ করেন নাই। ডাঃ মোহন সিং সংক্ষেপে উপনিষদের সহিত ও ডাঃ পীতাম্বর দত্ত বড়থ্বাল নির্গুণ সম্প্রদায়ের সহিত তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন। এই নিবন্ধে তন্ত্র ও উপনিষদ উভয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বিষয়টী পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিয়াছি, প্রসঙ্গতঃ সন্ত, সুফী, রসেশ্বর প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সহিত নাথদের যোগসূত্র আলোচিত হইয়াছে। প্রাচীন বৌদ্ধ সহজিয়া মন্ত্রযান, কালচক্রযান, জৈন সম্প্রদায় এবং কাপালিক, কালামুখ, পাশুপত, অঘোরীদের সহিত নাথদের অনেক বিষয়ে ঐক্য আছে। ইহাদের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান সকল স্থলে সাক্ষাৎ ভাবে না ঘটিলেও, চিন্তাধারার সাধারণ ক্ষেত্র হইতে ঐক্যের উদ্ভব হয়। কালের নির্ম্মম হস্তে কয়েকটী সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য লুপ্ত হইলেও, ভারতের চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য ফল্গুধারার ন্যায় বিভিন্ন ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়ের মধ্য দিয়া বহুযুগ হইতে প্রবাহিত হইয়া একটি ক্ষীণ যোগসূত্রের স্থাপনা করিয়াছে। সেই যোগসূত্রটী অন্তরঙ্গ সাধন বা 'যোগ' সাধন। দেহমধ্যে বিশ্বকল্পনা এই যুগের সাধনের বৈশিষ্ট্য। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী হইতে ক্রিয়াকাণ্ড ও বহিরঙ্গ সাধন ক্রমশঃ শিথিল হইয়া অন্তরঙ্গ সাধন প্রচলিত হয়। নাথপন্থের "লবণং তোয়সম্পর্কাদ্ যথা তোয়সমং ভবেৎ। মনোঽপি ব্রহ্মসম্পর্কাত্তথা ব্রহ্মময়ং ভবেৎ॥" (অমনস্ক ১।২৫) প্রভৃতির অনুরূপ কথা বৌদ্ধসহজিয়া ও জৈনদের সাধন মধ্যে পাওয়া যায়। নাথপন্থের যাহা শিব ও শক্তি, বৌদ্ধসহজিয়ার তাহাই শূন্যতা ও করুণা; নাথদের যাহা নাদ ও বিন্দু, বৌদ্ধসহজিয়ার তাহাই প্রজ্ঞা ও উপায়; নাথদের যাহা সামরস্য, বৌদ্ধদের তাহাই

এবমকার ; নাথদের যাহা সিদ্ধদেহ, বৌদ্ধদের তাহাই বজ্রদেহ, রসেশ্বরের তাহাই হরগৌরীতমু, পাতঞ্জল মতে ইহাই কায়সম্পৎ। নাথদের কুণ্ডলিনী শক্তি, বৌদ্ধদের নৈরাত্ম্য দেবী ! বারুণী, সহজ, শূন্য, মন্ত্রযোগ, উন্মনী, মুদ্রা প্রভৃতির সাধন মধ্যযুগের বৌদ্ধ, জৈন, নাথ, সন্ত, সুফী সম্প্রদায় মধ্যে বিভিন্ন রূপে দেখা যায়। গুরুবাদও ধর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ বিবেচিত হইত। তথাপি নাথদর্শন আলোচনাকালে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিয়া তুলনামূলক আলোচনায় অগ্রসর হইতে হইয়াছে, সর্ব্বত্র অন্যমতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তুলনামূলক আলোচনা করা নিরাপদও মনে হয় নাই।

এদেশে নাথসিদ্ধদের 'বৌদ্ধ' সন্ন্যাসী রূপে অভিহিত করার প্রথা প্রচলিত আছে, তিব্বতীয় ৮৪ সিদ্ধার তালিকায় বিশিষ্ট নাথসিদ্ধদের উল্লেখ পাওয়া যায়। শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন, বৌদ্ধতন্ত্রের সহিত নাথপন্থীদের যোগাযোগ অধিক। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য রচয়িতা স্বর্গীয় দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় বলিয়াছেন, "নাথ-মহান্তদের ধর্ম্ম বৌদ্ধভাবাপন্ন এবং নাথগীতিকাগুলিতে ও হাড়িপার উপদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব আছে। গোরক্ষের চরিত্রে বৌদ্ধযুগের চরিত্রবল, উচ্চ নীতি ও গুরুভক্তি আছে। এইরূপে নাথধর্ম্মে বৌদ্ধ ও শৈব ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ উপকরণে মিশিয়া গিয়াছিল।" তাঁহার রচিত বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে ইংরাজী গ্রন্থে মীননাথ ও গোরক্ষনাথকে তিনি বৌদ্ধযোগীরূপে অভিহিত করিয়াছেন। নেপালে মৎস্যেন্দ্রনাথ অবলোকিতেশ্বরের অবতার ও চতুর্থ বোধিসত্ত্বরূপে গণ্য হওয়ায় পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও মৎস্যেন্দ্রকে বৌদ্ধসন্ন্যাসী বলিয়াছেন। ডাঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ নাথপন্থকে বৌদ্ধমতের রূপান্তর ও সহজসিদ্ধির উত্তরাধিকারী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

নাথসম্প্রদায়ের গ্রন্থাদি আলোচনা করিয়া ও বিভিন্ন মোহন্তদের সহিত আলোচনা করিয়া আমি তাঁহাদের মূলতঃ 'শৈব' বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছি। নাথদের মন্ত্র "শিব-গোরক্ষ", তাঁহাদের তীর্থ শৈব তীর্থ, তাঁহারা শিবের ন্যায় কুণ্ডলধারী, তাঁহাদের কণ্ঠে যোনিলিঙ্গের প্রতীক ধারণ বিধি, কোটেশ্বর তীর্থ হইতেও তাঁহারা এই চিহ্ন ধারণ করিয়া আসেন এবং নিজেদের 'শৈব' বলিয়া পরিচয় দেন। "গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহে" (পৃঃ ৪৭) উল্লিখিত হইয়াছে যে বিষ্ণুর উপাসকের মোক্ষের আশাও বৃথা। অতএব নাথেরা বৈষ্ণব ছিলেন না। মৎস্যেন্দ্র শৈব ধর্ম্ম প্রচার করিতেই নেপালে গমন করেন, তিনি পাশুপত শৈবের বেশ ধারণ করিয়া গিয়াছিলেন। অতএব তাঁহাকে বৌদ্ধসন্ন্যাসী বলা অসঙ্গত। কাশীতেও কাল-ভৈরবের মন্দিরের পুজারীরা নাথযোগী। নাথযোগীদের দর্শন, গ্রন্থপাঠ ও আলোচনা ফলে নাথ-সিদ্ধযোগীর যে চিত্র আমার মনে উদিত হইয়াছে, তাহার নিদর্শন গ্রন্থে সংযোজিত চিত্রে প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছি।

নাথমার্গে তন্ত্র ও রহস্যবাদের অপূর্ব্ব মিশ্রণ আছে। প্রাচীন পারসিক পুরোহিতদের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া এদেশে তন্ত্রের প্রচার হয়।[১] তন্ত্রের

১। Modern Buddhism in Orissa, N. N. Vasu, Intro. p 10.

দীক্ষাপ্রণালীও অবৈদিক, অতএব হিন্দু বা বৌদ্ধধর্ম্ম একই মূল হইতে তন্ত্র শিক্ষা করেন ; এবিষয়ে কেহ কাহারও নিকট ঋণী নহেন। বৌদ্ধতন্ত্রের সহিত নাথগ্রন্থের অধিক যোগাযোগ আছে একথা বলা সঙ্গত নহে। নাথগ্রন্থে শিব ও শক্তির উল্লেখ বারংবার দেখা যায়। সহস্রার, ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, নাদ, বিন্দু প্রভৃতি শব্দের ব্যবহারও পাওয়া যায়। নাথমতে শিবশক্তির সামরস্য দ্বারা ও বৌদ্ধ সহজসিদ্ধিমতে শূন্যতা করুণার মিলন দ্বারা চিত্তের সমতা লাভই উদ্দেশ্য। তন্ত্র হিন্দুর পঞ্চম বেদ, তন্ত্রের আগম শ্রবণ করিয়া মৎস্যরূপী মৎস্যেন্দ্র যোগধর্ম্ম শিক্ষা ও প্রচার করেন, মৎস্যেন্দ্র নিজেকে 'কৌল' বলিয়াছেন। কৌলেরা বৌদ্ধ ছিলেন না, তাঁহারা শিবোপাসক। মৎস্যেন্দ্র রচিত কৌল গ্রন্থে বৌদ্ধদের উল্লেখ মাত্র নাই। মৎস্যেন্দ্র মৎস্য ধরিতেন, সম্ভবতঃ গোরক্ষ পশুহত্যা করিতেন, অতএব বৌদ্ধশাস্ত্রের নির্দ্দেশ অনুযায়ী তাঁহারা প্রাণী-হত্যাকারী হইয়া বৌদ্ধ হইতে পারেন না। গোরক্ষ পূর্ব্বে বৌদ্ধ ছিলেন এইরূপ ধারণা প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু ডাঃ মোহন সিংহ তাঁহার গ্রন্থে বলিয়াছেন এই মত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

সাধনগত ঐক্য দেখিয়াও তাঁহাদের বৌদ্ধ বলা চলে না। বৌদ্ধ সহজিয়া দ্বৈত হইতে অদ্বৈতে উপনীত হইবার সাধনা করেন। নাথযোগী বলেন, "দ্বৈতবা-দ্বৈতরূপং দ্বয়ং উত পরং যোগিনাং শঙ্করং বা"। এই তত্ত্বাতীত অবস্থা দ্বৈত বা অদ্বৈত নহে, ইহা দ্বৈতাদ্বৈতবিলক্ষণ অবস্থা, এককথায় 'যাদৃশ এব তাদৃশ এব' অবস্থা, ইহাই নাথমার্গের 'পরমপদ'। নাথগুরুকে 'নাদবিন্দুকলাত্মনে' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, বৌদ্ধ সহজিয়া গুরুর 'যুগনদ্ধ' রূপ। অতএব নাথেরা বৌদ্ধ ছিলেন বলা যায় না। তবে মৎস্যেন্দ্রনাথ পাশুপত শৈব গুরু হইয়াও নেপালী বৌদ্ধদের উপাস্য দেবতারূপে এখনও পূজা পাইতেছেন, ইহা স্বীকার্য্য।

বঙ্গদেশের সহিত নাথযোগীদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় আমি এই নিবন্ধ বঙ্গভাষায় রচনা করিতে কৃতসঙ্কল্প হই, কিন্তু উপযুক্ত বাংলা লিপিযন্ত্র ও শিক্ষিত যন্ত্রচালক অভাবে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে। এতৎসহ সংযোজিত গ্রন্থসূচীতে আমি মাত্র এই নিবন্ধের জন্য ব্যবহৃত গ্রন্থাদির উল্লেখ করিয়াছি। পাদটীকায় ব্যবহৃত সংক্ষিপ্ত নামের বিবরণ ও ইংরাজিগ্রন্থের তালিকাও যোজিত হইল। শব্দসূচীতে কেবল নাথমতের বৈশিষ্ট্যমূলক শব্দের তালিকা দেওয়া হইয়াছে। যুদ্ধকালীন গোলযোগে ইচ্ছামত সকল গ্রন্থ সংগ্রহ সম্ভবপর না হইলেও, ভারতের বিভিন্নস্থানের গ্রন্থাগারাধ্যক্ষদের আমি যথেষ্ট সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করিয়াছি, ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার হইতেও সবিশেষ সাহায্য পাইয়াছি, তাঁহারা সকলেই আমার বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

এই নিবন্ধ রচনায় আমি অন্যনিরপেক্ষভাবে কার্য্য করিয়াছি, তবে আমার শুভাকাঙ্ক্ষী মাননীয় পরীক্ষকগণ স্থলবিশেষে সামান্য পরিবর্দ্ধন ও ভৌগোলিক সংস্থান সম্বন্ধে যে নির্দ্দেশ দিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থ মুদ্রণের সময়ে পালন করিয়াছি।

প্রাচীন পুথি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় ও অন্যান্য উৎসাহদাতা বন্ধু ও আত্মীয়গণকে আমি শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিতেছি। আমার পুত্রকন্যারাও প্রতিলিপি কার্য্যে তাহাদের সাধ্যমত আমার সাহায্য করিয়াছে, স্নেহভাজন সোদরোপম অন্যেরাও নানাভাবে আমায় উপকৃত করিয়াছেন। পৃথকভাবে সকলের নাম করা সম্ভব নহে, আমার অনিচ্ছাকৃত এই ত্রুটি মার্জ্জনীয়। তবে বিশেষভাবে দুইজনের নাম না করিলে অপরাধের মাত্রা বৃদ্ধি পাইবে; পরম শ্রদ্ধাভাজন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজ এম, এ, ডি, লিট্ মহাশয়, এই নিবন্ধে ব্যবহৃত তাঁহার গ্রন্থাগারের মূল জার্ম্মান, সংস্কৃত, হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় রচিত গ্রন্থের সাহায্যদান ও অর্থ নির্ণয় করিয়া, ও অগ্রজপ্রতিম, আমার প্রতি স্নেহাসক্ত স্বর্গীয় রামশশী মিত্র মহাশয় মূল সংস্কৃত দার্শনিক গ্রন্থাদি সংগ্রহ ও আলোচনা করিয়া যে অকৃত্রিম সাহায্য করিয়াছেন সে ঋণ অপরিশোধনীয়। এই উভয়ের সাহায্য ব্যতীত এ কঠিন কার্য্যে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব হইত, ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি। কৈশোরে গল্প প্রভৃতি রচনায় প্রবৃত্ত হই, তাহাতে বিমুখ হইয়া চিন্তাশীল প্রবন্ধ রচনার জন্য যিনি সর্ব্বদা উপদেশ দিতেন, সেই পূজনীয় স্বর্গত পিতৃদেবকে আজ কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিতেছি, তাঁহার সদিচ্ছাপূরণ করিতে পারিয়াছি কি না, তাহা সুধীগণ বিচার করিবেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই নিবন্ধ প্রকাশের ভার লইয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীসরস্বতী প্রেসের পরিচালকসঙ্ঘের শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায় এবং তাঁহার সহকর্ম্মিবর্গ মুদ্রণ ব্যাপারে আমাকে অক্লান্তভাবে সাহায্য করিয়া চিরঋণী করিয়াছেন। তথাপি আমার অনভিজ্ঞতা ও সম্পূর্ণরূপে একাকী কার্য্য করার ফলে পুস্তকে যে সকল ত্রুটি রহিয়া গেল তাহার জন্য সহৃদয় পাঠকবর্গের মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছি। বিগত দ্বাদশ বৎসর বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া যে করুণাময়ের কৃপায় এই নিবন্ধরচনা শেষ করিয়া প্রকাশ করা সম্ভব হইয়াছে, সেই স্বয়ংপূর্ণ দ্বৈতাদ্বৈতবিলক্ষণ, সগুণ-নির্গুণের অতীত 'নাথ'স্বরূপকে বারবার প্রণিপাত করি।

রাখী-পূর্ণিমা
১৩৫৫

শ্রীকল্যাণী দেবী

নিবন্ধে ব্যবহৃত গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদির

সূচী-নির্দ্দেশ

অমনস্কবিবরণম্—'শাস্ত্রশতক' সংগ্রহ গ্রন্থে দ্রষ্টব্য—উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত, ১ম সংস্করণ, ২নং হরিমোহন বসু লেন, নূতন কলিকাতা যন্ত্রে মুদ্রিত, ১২৯৯ সাল।

অমরৌঘশাসনম্—সিদ্ধ গোরক্ষনাথ কৃত, ভট্ট বামদেব কৃত 'জন্মমরণ বিচার' নামক Kashmir Series No XIX মধ্যে প্রকাশিত, ১৯১৯।

অবধূত গীতা (হিন্দী) - দত্তাত্রেয় কৃত, হরিপ্রসাদ ভাগীরথজী কর্ত্তৃক প্রকাশিত, নেটিব ওপিনিয়ন মুদ্রণ যন্ত্রালয়ে, ১৯২৫।

অনুভূত যোগসাধন—স্বামী সত্যানন্দ, ২য় সং, হৃষীকেশ।

অভিধর্মকোশঃ (বসুবন্ধু)—রাহুল সংকৃত্যায়ণ সম্পাদিত, বিদ্যাপীঠ সংস্কৃত গ্রন্থমালা—১, কাশী।

অমৃত বচন—দয়ালবাগ, আগ্রা, রাধাস্বামী সৎসঙ্গ সভা হইতে প্রকাশিত, ১২৭ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। খগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত দ্বারা অনূদিত।

আশাবতীর উপাখ্যান—শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী কৃত, বিধুভূষণ লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৩৩৩।

আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ—রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, ২য় সং, ১৮৪৮ শকাব্দ।

আত্মবোধ—শ্রীশঙ্করাচার্য্য প্রণীত, দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় অনূদিত মগনীরাম রত্নপিটক গ্রন্থাবলী সংখ্যা ৬, ইয়ুরেকা প্রিন্টিং প্রেস, গোধূলিয়া, বেণারস।

ঈশ্বর প্রত্যাভিজ্ঞাবিমর্শিনী—অভিনব গুপ্ত।

ঈশাদ্যষ্টোত্তরশতোপনিষদঃ—পাণ্ডুরং জওয়াজী প্রকাশিত, নির্ণয়সাগর প্রেস, ২৬।২৮ কোল্লাট লেন, বোম্বাই, ৪র্থ সং, ১৯৩২।

উপনিষৎ গ্রন্থাবলী—১ম ও ২য় খণ্ড উদ্বোধন কার্য্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা। ১৩৪৮, ১৩৫০।

ওঙ্কার ও গায়ত্রীতত্ত্ব—শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহরায় বিদ্যার্ণব, রায় বাহাদুর, এম, এ। ২য় সংস্করণ, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি, কলিকাতা।

কদলীরাজ্য—রাজমোহন নাথ, বি, ই; ১ম সং, ১৯৪১। Trio Stores, Gauhati.

কৌলমার্গ রহস্য—সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাবলী সং, ৭৬।

কমলাকান্তের সাধকরঞ্জন—বসন্তরঞ্জন রায় ও অটলবিহারী ঘোষ, সাহিত্য পরিষদ মন্দির হইতে প্রকাশিত।

কুলার্ণবতন্ত্র

গঙ্গা (হিন্দী) পুরাতত্ত্বাঙ্ক—জানুয়ারী, ১৯৩৩। এই বিশেষাঙ্কর সম্পাদক রাহুল সাংকৃত্যায়ন, রামগোবিন্দ ত্রিবেদী—গঙ্গা কার্য্যালয়, কৃষ্ণগড়, সুলতানগঞ্জ, ভাগলপুর হইতে প্রকাশিত।

গণকারিক—আচার্য্য ভাসর্ব্বজ্ঞ বিরতি, G. O. S. XV. Edited by C. D. Dalal.

গম্ভীরনাথ প্রসঙ্গ—অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৩২।

গীতা—উদ্বোধন কার্য্যালয়, কলিকাতা। ১ম সং।

গোপীচন্দ্রের গান (দুই খণ্ড)—(গোপীচন্দ্রের পাঁচালী, গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস) দীনেশচন্দ্র সেন ও বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত ১৯২৪।

গোরক্ষ-বিকাশ (হিন্দী)—সদানাথ যোগী, কৈলাস আশ্রম, জালান্ধর।

গোরক্ষ-বোধ (হিন্দী)—'গোরক্ষ-বিকাশে' সন্নিবেশিত।

গোরক্ষ-বোধ (ইংরাজি)—ডাঃ মোহন সিংএর 'Gorakhnath' গ্রন্থে অনুবাদ সন্নিবেশিত, গোরক্ষনাথকী গোষ্ঠীর' ইহা অনুবাদ।

গোরক্ষ-পদ্ধতি (হিন্দী)—হিমালয়ের টেহরী রাজধানীতে হিন্দীতে রচিত। বোম্বাইএ মুদ্রিত। ইহাতে গোরক্ষ-শতক ও হঠযোগ প্রদীপিকার অনুরূপ দুইশত শ্লোক আছে, হিন্দী টীকা সহ। ইহা গোরক্ষ সংহিতা নামেও প্রচলিত।

গোরক্ষ-শতক—ব্রীগ্‌স্‌ সাহেব রচিত ইংরাজি 'গোরক্ষনাথ' গ্রন্থে ইহার শ্লোক ও অনুবাদ আছে।

গোরক্ষ-সংহিতা—প্রসন্নকুমার কবিরত্ন সম্পাদিত সংস্করণ, ১৮১৩।

গোরক্ষ-বাণী (হিন্দী)—ডাঃ পীতাম্বর দত্ত বড়থ্বাল, ১ম সংস্করণ, সাহিত্য সম্মেলন, প্রয়াগ।

গোরক্ষ-গোষ্ঠী (হিন্দী)—বাবা লক্ষণদাসজী, কবীর চৌরা, বেণারস, ১৯৩৭।

গোরক্ষ-বিজয়—ফয়জুল্লা মরহুম প্রণীত, মুন্সী আব্দুল করিম সম্পাদিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাবলী সং ৬৪।১৩২৪।

গোরক্ষ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ—পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজ সম্পাদিত, সরস্বতী ভবন টেক্সট নং ১৮, বেণারস, ১৯২৫।

জ্ঞানেশ্বরী (হিন্দী)—ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ, ২য় সংস্করণ।

জ্ঞানেশ্বরী (বাংলা)—জীবনকৃষ্ণ গোস্বামী, ২৪৬ নবাবপুরা, ঢাকা ১৩৪১।

জ্ঞান-ভারতী—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শান্তি নিকেতন, ১ম সং।

জন্মমরণ বিচার—ভট্টবাম দেব কৃত। Kashmir Series No XIX

জীবনীকোষ—শশী বিদ্যালঙ্কার, রেঙ্গুন, ১৩৩৬।

জৈবধর্ম্ম—ঠাকুর বিদ্যাবিনোদ (কেদার দত্ত)

তন্ত্রবটধানিকা—অভিনব গুপ্ত বিরচিত Kashmir Series No. XXIV.

তন্ত্রাভিলাসীর সাধুসঙ্গ—প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৩৪৮

তন্ত্রালোক—অভিনব গুপ্ত বিরচিত, কাশ্মীর।

তন্ত্রসার—কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ

ত্রিপুরা রহস্য (জ্ঞান খণ্ড) ১ম ভাগ, সরস্বতী ভবন টেক্সট নং ১৫, কাশী। ১৯২৫।

দর্শন পরিচয়—গোপালচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ।

দাদূ—আচার্য্য ক্ষিতিমোহন সেন।

দেবী যুদ্ধে চিন্তনীয়—স্বামী দুর্গাচৈতন্য ভারতী, ৪২ মানমন্দির, কাশী।

দ্বাত্রিংশৎ উপনিষৎ—রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ ১৮৩১ শকাব্দ।

ন্যায়দর্শন—

প্রজ্ঞাপারমিতা—(১ম ভাগ) গোবিন্দকুমার সংস্কৃত সিরিজ নং ১ 'বোধচর্য্যাবতার' দ্রষ্টব্য, কাপিলমঠ, মধুপুর।

প্রজ্ঞাপায়বিনিশ্চয়সিদ্ধি—বৌদ্ধ গান ও দোহা দ্রষ্টব্য।

প্রেমধর্ম্ম—হীরেন দত্ত, ১৩৪৫।

পাতঞ্জল সূত্রম—কালীবর বেদান্তবাগীশ।

পাতঞ্জল-যোগদর্শন—শ্রীমদ্ হরিহরানন্দ আরণ্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত ১৯৩৮।

পাদুকাপঞ্চক স্তোত্র—(শ্রীশিবোক্ত) মন্ত্রযোগ—অবধূত জ্ঞানানন্দ পৃ ৮৮-৯০ কালীচরণের 'অমলা' নামে ইহার টীকা আছে।

বর্ণরত্নাকর—ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 4th Ort. Con. Proceedings.

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—দীনেশচন্দ্র সেন (৫ম সং), গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ১৩৩৪।

বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়—দীনেশচন্দ্র সেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত।

বাঙ্গলা-সাহিত্যের ইতিহাস—সুকুমার সেন; মডার্ণ বুক এজেন্সী ১৩৪৭।

বিবেকসার (হিন্দী)—কিনারামজী মহারাজ, আনন্দ ভবন, চেৎগঞ্জ।

বীজক—রীবা সংস্করণ, বেঙ্কটেশ্বর যন্ত্রালয়, বোম্বাই, ১৯৬১ সম্বৎ।

বেণের মেয়ে—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বসুমতী সাহিত্য মন্দির।

বেদান্তে শক্তিতত্ত্ব—স্বামী দুর্গাচৈতন্য ভারতী, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা।

বেদান্তসার—সদানাথ যোগী বিরচিত, কালীবর বেদান্তবাগীশ সঙ্কলিত।

বেদান্ত সংজ্ঞাপ্রকরণম্—আদিত্যপুরী বিরচিত।

বেদান্তসূত্রম্—মহেশচন্দ্র পাল সঙ্কলিত (শারীরিক সূত্রম্) ১৩১৭।

বেদসংহিতা—মধুসূদন সরকার কর্ত্তৃক অনূদিত, হিন্দুমিশন যন্ত্র, কলিকাতা, ১৩০৯ সাল।

বেদানাং বাস্তবিকং স্বরূপম্—ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ, লক্ষ্মীনারায়ণ প্রেস, কাশী।

বৌদ্ধগান ও দোহা—(চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়, দোহাকোষ প্রভৃতি)—ম. ম. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত, সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাবলী' সংখ্যা ৫৫।

ব্রহ্মসূত্র—শ্রীকণ্ঠাচার্য্য প্রণীত।

ভারতীয় দর্শন (হিন্দী)—বলদেব উপাধ্যায়, এম, এ, লক্ষ্মীনারায়ণ প্রেস, কাশী ১৯৪২।

ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (দুই খণ্ড)—অক্ষয় দত্ত, ২য় সংস্করণ।

ময়নামতীর গান—নলিনীকান্ত ভট্টশালী ও বৈকুণ্ঠ দত্ত সম্পাদিত, ঢাকা সাহিত্য-পরিষদ। ইহা গ্রীয়ারসন সংগৃহীত মাণিকচন্দ্র রাজার গানের অনুরূপ।

মীনচেতন—ভণিতায় শ্যামদাস সেনের নাম, ভট্টশালী সম্পাদিত, ঢাকা সাহিত্য-পরিষদ। ইহা গোরক্ষ-বিজয়ের অনুরূপ গ্রন্থ।

মধ্যযুগে বাঙ্গলা—কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স ১৩৩০।

মন্ত্রযোগ—অবধূত জ্ঞানানন্দ, আদরচন্দ্র মিত্র দ্বারা প্রকাশিত, পাঠ-ডাঙ্গা, বীড়া-বল্লভপাড়া, ২৪ পরগণা, ১৩৩৬।

যোগশাস্ত্রাবলী—যোগরহস্য, যোগী যাজ্ঞবল্ক্য, যোগতারাবলী, শিবসংহিতা, ঘেরণ্ডসংহিতা প্রভৃতি সংগ্রহ, শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রকাশিত, ১৩২৫ সাল। কালিকা প্রেস, ২১নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরী ২য় লেন।

যোগাম্বুধি—শিবসংহিতা, যোগতারাবলী ইত্যাদি সংগ্রহ, প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী কর্ত্তৃক অনুবাদিত ও সঙ্কলিত, ১৩২১।

যোগবীজম্—ভুবনচন্দ্র বসাক প্রকাশিত, সংবাদরত্নাকর যন্ত্রে মুদ্রিত, ৮, নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট, ১৮৮৬।

যোগিসম্প্রদায়াবিষ্কৃতি (হিন্দী)—চন্দ্রনাথ যোগী, যোগাশ্রম, অহমদাবাদ, ১৯২৪।

রহস্য পূজাপদ্ধতি—জগমোহন তর্কালঙ্কার বিরচিত, জ্ঞানেন্দ্রনাথ তন্ত্ররত্ন সঙ্কলিত।

রসহৃদয়তন্ত্রম্—গোবিন্দভাগবৎ পাদাচার্য্য, মোতিলাল বেণারসীদাস প্রকাশিত, সংস্কৃত বুক ডিপো, লাহোর।

রাজযোগ—স্বামী বিবেকানন্দ, উদ্বোধন গ্রন্থাবলী, ১৩২৭।

শারদাতিলক—

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন—বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত, সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাবলী সংখ্যা ৫৮, ১৩২৩।

শূন্যপুরাণ—বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৩৩৬।

শক্তি উপাসনা ও বেদান্ত—স্বামী দুর্গাচৈতন্য ভারতী, ৪২ মানমন্দির, কাশী।

সন্তবাণী সংগ্রহ—(১ম খণ্ড) Belvedere Press.

সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ—মহেশচন্দ্র পাল কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত, সম্বৎ ১৯৫০।

সাংখ্য-সূত্রম্—অনিরুদ্ধ-টীকাযুক্ত, কালীবর বেদান্তবাগীশ সঙ্কলিত।

সাংখ্য-কারিকা—ঈশ্বরকৃষ্ণ কৃত, বঙ্গানুবাদ থিওসফিক্যাল সোসাইটী, ১২৯৯।

সরল সাংখ্য-যোগ—(১ম সং) কাপিলাশ্রম, ত্রিবেণী হইতে প্রকাশিত।

স্বাধ্যায়রত্নম্—যোগভাষ্যস্থগাথা, কাপিলমঠ, মধুপুর।

সদ্গুরুবাণী—(হিন্দী) রামমূর্ত্তি শর্মা সম্পাদিত। সীতারাম ব্রহ্মচারী ডি ৩২/৬১ পাতালেশ্বর, বেণারস।

সর্ব্বোল্লাসতন্ত্রম্—সর্ব্বানন্দ কৃত, রাসমোহন চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত, রামমালা গ্রন্থাগার, কুমিল্লা, ১৯৪১।

সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ—সরস্বতী ভবন টেক্স্ট নং ১৩, বেণারস, ১৯২৫। ম.ম. গোপীনাথ কবিরাজ সম্পাদিত ; বলভদ্র কৃত।

সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি—গোরক্ষনাথ কৃত, নাথ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, হরিদ্বার।

সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতির চিত্রের বিবরণ—সরদার ম্যুজিয়াম, যোধপুর, সন ১৯৩৫

হঠযোগ প্রদীপিকা—স্বতারাম যোগী, মহেশচন্দ্র পাল সঙ্কলিত ২য় সং, ১৮১০ শকাব্দ।

গ্রন্থের সংক্ষেপ নির্দ্দেশ

গো. সি. স—গোরক্ষ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ, সরস্বতী ভবন, কাশী।

গো. সং—গোরক্ষ-সংহিতা (প্রসন্ন কবিরত্ন সম্পাদিত)

গো. বিজয়—গোরক্ষ-বিজয়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ গ্রন্থাবলী সং ৬৪।

সি. সি. স.—সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ, কাশী।

সি. সি. প—সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি, হরিদ্বার।

হ. যো. প্র.—হঠযোগ প্রদীপিকা, স্বতারাম যোগী।

ভা. উ. স—ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, অক্ষয় দত্ত।

বা. সা. ই.—বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস, সুকুমার সেন।

বঙ্গ. সা. প.—বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়, দীনেশ সেন।

বঙ্গদেশের ইতিহাস—History of Bengal. Vol 1. Dacca University.

১০৮ উপনিষদের নাম সংক্ষেপে লেখা হইয়াছে যথা :—

যোগ. শি. উঃ—যোগ শিখো উপনিষদ।

না. প. উ.—নারদ পরিব্রাজক উপনিষদ, ইত্যাদি।

'গোরক্ষনাথ' গ্রন্থ ব্রীগ্স ও মোহন সিং উভয়ের দ্বারা রচিত হওয়ায় কেবল ব্রীগ্স বা সিং দ্বারা নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

বাগ্‌চী—ডাঃ বাগ্‌চীর ভূমিকা Kaulajnana-nirnaya দ্রষ্টব্য।

ফারকার—Farquharএর Outline of the Religious Literature of India.

অণ্ডারহিল রহস্যবাদ—Underhillএর Mysticism.

বড়থ্বাল নির্গুণ সম্প্রদায়—Barthwal's Nirguna School of Hindi Poetry.

ইঃ—ইত্যাদি, ইহা ইংরাজি শব্দের following বা ff এর পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিয়াছি।

C. H. I—Cultural Heritage of India in 3 Vols. Ram krishna Mission Publication.

G. O. S.—Gaekwad's Oriental Series.

E. R. E.—Hasting's Encyclopaedia of Religion & Ethics.

I. H. Q.—Indian Historical Quarterly.

S. B. S.—Saraswati Bhavan Series, Benares.

খ

Alberuni's India. (2 Vols) Trans, by Dr. E. C. Sachan, 1910.

Abhisamayaalankara (Maitreya) E. Obermiller, Calcutta, Oriental Series No. 27.

Abhinava Gupta—An Historical-Philosophical study. K. C. Panday, Chowkhamba Skt. Series. Vol. 1. 1935, Benares City.

Aspects of Mahayana Buddhism & its relation to Hinayana —N. Dutta.

Buddhist Art in India.—Prof. Albert Grünwedel's Handbuck Trans. by Jones. Burgess. London 1901.

Childer's Pali Dictionary—Mahapurusio.

Charyas—Ed. by Dr. P C. Bagchi. Journal of the Dept. of Letters—Cal. Univ. Vol. XXX.

Dravya Samgraha—N. Siddhanta. Trans. by S. C. Ghosal. Sacred Books of the Jainas Series Vol. I. 1917.

Dabistan Moshan Fani. (2 Vols). Trans. by David Shea. Paris 1843.

Doctrine of Maitreya Nath & Asanga—Tucci.

Doctrinal Culture & Tradition of the Siddhas—Dr. Raman Shastri C. H. I. Vol. II. p. 303 ff.

E. R. E. Vol. VI. etc. for articles on Gorakhnath, Dharmanath, Kanphatas etc.

First Principles of Theosophy—C. Jinarajadasa. Adyar, Madras. Theosophical Publishing House. 5th Ed. 1938.

Gorakhnath & Medieval Hindu Mysticism—Dr. Mohan Singh. Oriental College. Lahore, 1937.

Gorakhnath & the Kanphata Yogis—G. W. Briggs. Y. M. C. A. Publishing House, Calcutta, 1938.

Geschichte der indischen Litteratur—Dr. M. Winternitz. Leipzig, 1922.

Hatha-Yoga—Yogi Ramcharaka. 1904. Chicago, Ill. Masonic Temple, Yogi Publication Society.

History of Bengal—Ed. by R. C. Mazumder. Vol I. Hindu Period, Dacca University, Dr. S. K. De's Article, Sanskrit Literature pp. 290—373.

History of Bengali Language & Literature—D. C. Sen. Cal. Univ. Pub. 1911.

Indian Philosophy (2 Vols.)—S. Radhakrishnan, George Allen & Unwin Ltd., London 1941.

Initiation (The Perfecting of Man)—Annie Beasant.

Is the Cult of Dharma a Living Relic of Buddhism in Bengal ?—Dr. Sukumar. Sen. Reprint from Dr. B. C. Law's Vol. Pt. I.

The Idea of Personality in Sufism.—Nicholson, 1923.

'Jnaneswar' in Kalyan-Kalpataru—Magazine from Gita Press, Gorakhpore, Vol. VIII. Jan. 1941.

Kashmir Saivaism—J. C. Chatterji. State Publication, 1914.

Kaulajnana-nirnaya—Edited by Dr. P. C. Bagchi, Calcutta University Pub. This includes Akulaviratantra 'A' & 'B', Akulagamtantra, Nityanhika-tilakam, etc.

Lamaism—(The Buddhism of Tibet)—L. A. Waddell, 2nd. Ed. 1934.

Les Chantes Mystiques.—M. Sahidullah. 1928.

Legend of Raja Gopichand—by Gopal Haldar. 6th All-India Oriental Conference Proceedings. Patna. 1930.

Legend of Matsyendranath—C. Chakravarti. I. H. Q. 1930. pp. 178-87.

Lingadharanachandrika—M. R. Sakhare, M. A. T. D. Belgaon, 1942.

Magic & Miracle in Jain Literature—K. Mitra, Principal D. J. College, Mongyhr.

Modern Buddhism and its Followers in Orissa—N. N. Vasu. Visvakosa Office, Bagbazar, 1911.

Monograph of the Religious Sects in India—D. A. Pai. Published by the Bombay Corporation 1928.

Mysticism—Evelynn Underhill. 12th Edition—Revised.

Mysticism in Maharastra—by Ranade. History of Indian Philosophy Vol. VII 1933.

Mystic Significance of Evam.—Pt. Gopinath Kaviraj, Journal of the Ganganath Jha Research Institute, Nov. 1944.

New Background of Science – Sir James Jeans. Camb. 1933.

Niramana Kaya—Pt. Gopinath Kaviraj. S. B. S. Vol. I. pp. 47 – 58.

Nirguna School of Hindi Poetry—Dr. P. D. Barthwal, Indian Book Shop, Benares, 1937.

Nyaya-Kusumanjali – (Eng. Trans. 1st Ch.) by Pt. Gopinath Kaviraj, S. B. S. Vol. II.

Outlines of Jainism – Jagmanderlal Jaini, M. A., Jain Lit. Society 1916.

Outline of the Religious Literature of India—J. N. Farquhar. 1920.

Oriental Mysticism – E. H. Palmer. Intro. by Arbery.

Origin & Development of the Bengali Language (2 Vols.) --Dr. S. Chatterji.

(An) Outline of the History & Teaching of the Nath-panthiya Siddhas—by Pt. Pandurang Sarma. 3rd Ort. Con. Proceedings 1924. pp. 495—501.

Oxford History of India—V. Smith. 1923.

Pratima Lakshana. (Text from Nepal)—J. Banerji. (Cal. Univ. Pub.)

Post-Chaitanya Sahajiya Cult of Bengal—M. M. Bose 1930.

Pahuda Doha—Hiralal Jain.

Positive Sciences of the Ancient Hindus.—B. N. Seal.

Ramai Pandit—Dr. B. C. Sen. Cal. Review, August, 1924.

Report on the Search of Hindi M. S. S. 1902. Benares University.

Risala-I-Haqnama—Prince Muhammad Dara Shikoh, Translated by S. C. Vasu, as 'The Compassion of Truth.'

Shakti & Shakta (1st Ed.)—Sir J. Woodroffe, Luzac & Co. London 1918.

Serpent Power—Sir J. Woodroffe. 2nd Ed. in 1920.

Soma of Sauma Sect of the Saiva—C. Chakravarti I. H. Q. Vol VI 1932.

Sekoddesatika (Naropa)—G. O. S. Vol. XC M. Carelli 1941, Baroda.

Shadhanmala (2 Vols)—Dr. B. Bhattacharji. Baroda.

Studies in the Tantras—Dr. P. Bagchi Cal. Univ. Publication 1939.

Some Aspects of the History & Doctrine of the Naths.—Pt. Gopinath Kaviraj, S. B. S. Vol. VI p. 19 ff.

Some Historical Aspects of the Inscriptions of Bengal—Dr. B. C. Sen.

System of Chakras according to Gorakhnath—Pt. Gopinath Kaviraj, S. B. S. Vol. II, pp. 83-92.

Seven Books in Tibetan—Dr. Evans Wentz.

Tibetan Yoga and Secret Doctrines—Dr. W. Y. Evans Wentz, Oxford University Press, London, 1935.

Tibet's Great Yogi Milarepa—W. Y. Evans Wentz, Ox. Univ. Press, 1928.

The Apocalypse Unsealed (Revelation of St. John)—Trans. James M. Pryse. New York, 1910.

Vaisnavism, Saivism & Minor Religious Systems—Dr. R. G. Bhandarkar.

Wave of Bliss (Trans. of Anandalahari)—Arthur Avalon.

What are the Tantras and their Significance—Arthur Avalon (Reprint from Prabuddha Bharat, Vol XXII, pp. 37-72).

With Mystics & Magicians in Tibet—A. David Neel, Penguin Series, 1938.

Yoga Philosophy, an Introduction to—Major B. D. Basu, Allahabad 1912.

Yoga Upanishads—Adyar, Madras 1938.

নিবন্ধে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সংগৃহীত পুঁথির নাম

১। সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি—গোরক্ষনাথ কৃত

২। গোরক্ষ-উপনিষদ—গোরক্ষ কৃত

৩। মৎস্যেন্দ্র জী কা পদ

৪। ভরথর জী কা সব্‌দী

৫। চিরপট জী কা সব্‌দী

৬। গোপীচাঁদ জী কা সব্‌দী

৭। জালন্ধরী কী সব্‌দী

৮। যোগবিষয়—মৎস্যেন্দ্র বিরচিত

৯। অমরৌঘ-প্রবোধ—গোরক্ষ বিরচিত

১০। যোগমার্তণ্ড—গোরক্ষনাথ বিরচিত

চিত্র-পরিচয়

নিবন্ধের প্রথম পৃষ্ঠায় একটি চিত্র দেওয়া হইয়াছে। তিব্বতে ৮৪ সিদ্ধার চিত্র আছে, কিন্তু সাধারণতঃ মৎস্যেন্দ্র, গোরক্ষ প্রভৃতি মহাসিদ্ধের কোন চিত্র প্রদর্শিত হয় না, মন্দির মধ্যের মূর্ত্তি বা চিত্র কাল্পনিক। এই নিবন্ধে আমার অভিজ্ঞতা ও কল্পনার সাহায্যে নাথযোগীর যে আলেখ্য রচিত হইয়াছে, তাহাতে সাম্প্রদায়িক চিহ্ন সকলের পরিচয় পাওয়া যাইবে, যথা—ললাটে ত্রিপুণ্ড্র ধারণ কর্ণের উপাস্থি ভেদ করিয়া কুণ্ডল বা 'মুদ্রা' ধারণ, কণ্ঠে ঠুম্‌রা ও আশাপুরীর মালা, তদ্ব্যতীত 'সেলী' নামক ঊর্ণ উপবীত সহ শিব-পার্ব্বতীর প্রতীক স্বরূপ 'শিংনাদ' ধারণ, দক্ষিণ বাহুতে কোটেশ্বরের তীর্থ প্রত্যাগত 'যোনিলিঙ্গে'র চিহ্ন ও রুদ্রাক্ষের মালা, হস্তে কেদার-বদরীর লৌহাদি ধাতু নির্ম্মিত বলয়, অঙ্গে ধুনিভস্ম লেপন, ও গেরুয়া বসন ধারণ। জটাধারণ সম্বন্ধে কোন বাধ্যবাধকতা নাই, কাশীতে প্রাচীনপন্থী জয়পুরের বাবা মঙ্গলনাথকে জটাধারণ করিতে দেখিয়াছি, তাহাও পাগড়ী দ্বারা সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত ছিল, তাঁহার দীর্ঘ শ্বেত-শ্মশ্রুও ছিল, নবীন নাথযোগীদের জটা দেখি নাই। চিত্রের আসন 'পদ্মাসন' হইলেও বুদ্ধের পদ্মাসন হইতে ইহার ভিন্নতা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

(গ)

প্রবন্ধ-সূচী

অ-ক-থ চক্র, যুক্তত্রিবেণী, মুদ্রাদির রহস্য, শিবনারায়ণজী শর্মা সেঙ্গই, কল্যাণ, যোগাঙ্ক পৃঃ ৬৪৯।

অনাহত নাদ—স্বামী শ্রীনয়নানন্দজী সরস্বতী, সাধনাঙ্ক (১ম) পৃঃ ৩৪৭

কুণ্ডলিনী-তত্ত্ব—অধ্যক্ষ শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ এম-এ, বঙ্গসাহিত্য, ১ম বর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, বারাণসী হইতে প্রাশিত।

গুজরাটে গোপীচাঁদের গান—ননীলাল রায় চৌধুরী, প্রবাসী ১৩৩৬ পৃঃ ৬৩৬।

গুরুতত্ত্ব ও সদ্‌গুরুরহস্য—ম.ম. গোপীনাথ কবিরাজ, উত্তরা, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০, কাশী হইতে প্রকাশিত।

গম্ভীরনাথজী (সিদ্ধ যোগীরাজ মাহাত্ম্য)—কল্যাণ, সন্তঅঙ্ক পৃঃ ৭০০।

চৌরঙ্গীনাথ—ডাঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, উদ্বোধন, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৭৮।

জালন্ধর নাথ—কল্যাণ যোগাঙ্ক পরিশিষ্ট ২নং সূচীতে দ্রষ্টব্য, পৃঃ ৭৮৩।

তন্ত্র ও বাঙ্গালী—চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৪১, অগ্রহায়ণ ১৩৪৩।

তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্ম—ম.ম. গোপীনাথ কবিরাজ,উত্তরা,কার্ত্তিক ১৩৩৪,জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫।

তন্ত্রে গুরু সাধনা—ভবানী দাসজী মেহরা, সাধনাঙ্ক ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩৭ ইঃ।

তান্ত্রিক সাধনা বা মুদ্রা—উপেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, কল্যাণ সাধনাঙ্ক ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৯৪।

তান্ত্রিক সাধন—দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ, কল্যাণ সাধনাঙ্ক ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪২১ ইঃ।

তান্ত্রিক বৌদ্ধ সাহিত্যে বাঙ্গালীর অবদান—রাসমোহন চক্রবর্ত্তী, উদ্বোধন বৈশাখ ১৩৪৯।

দীক্ষারহস্য—ম.ম. গোপীনাথ কবিরাজ, কল্যাণ সাধনাঙ্ক, ২য় খণ্ড পৃঃ ১২০৩ গুরুপরম্পরা দ্রষ্টব্য।

দীক্ষা ও অনুশাসন—সাধনাঙ্ক ১ম খণ্ড, পৃঃ ২১০ ইঃ, লেখকের নাম নাই।

দেলপূজার ছড়া—তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ৪৭ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা।

নাথপন্থ—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অভিভাষণ, অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন, প্রবাসী—বৈশাখ, ১৩২২।

নাথযোগী সম্প্রদায় ও যোগিরাজ গম্ভীরনাথ—অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবর্ত্তক—শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, ১৩৫০।

নাথসম্প্রদায়ের মহাসিদ্ধ—স্বামীজি মৌক্তিকনাথজী, কল্যাণ সন্তঅঙ্ক।

নিবৃত্তিনাথ (শ্রীগুরু)—কল্যাণ সন্তঅঙ্ক দ্রষ্টব্য।

নাদবিন্দুকলা—শ্রীগৌরীশঙ্কর দ্বিবেদী সাহিত্যরত্ন, কল্যাণ শক্তিঅঙ্ক দ্রষ্টব্য,—Based on Arthur Avalon's Garland of Letters.

নাথপন্থে যোগ—পীতাম্বর দত্ত বড়থ্বাল, কল্যাণ, যোগাঙ্ক পৃ ৭০২ ইঃ।

পাশুপত সিদ্ধান্ত ও বেদান্ত—কল্যাণ, বেদান্তঅঙ্ক দ্রষ্টব্য।

পঞ্চমকারের আধ্যাত্মিক রহস্য—দয়াশঙ্কর রবিশঙ্কর, কল্যাণ, শক্তিঅঙ্ক।

পঞ্চদশকলাত্মক পঞ্চদশতিথিরূপী নিত্যা তথা ষোড়শী অথবা অমৃতকলার বিচার—শ্রীকৃষ্ণজী কাশীনাথ শাস্ত্রী, কল্যাণ, সাধনাঙ্ক ২য় খণ্ড পৃ ৮৫৭—৫৮।

প্রণবোপাসনা—হরিদত্তজী শর্ম্মা বেদান্তাচার্য্য, কল্যাণ, সাধনাঙ্ক ২য় খণ্ড।

প্রাণশক্তিযোগ ও পরকায় প্রবেশবিদ্যার পূর্ব্বরূপ—শ্রীত্র্যম্বক ভাস্কর শাস্ত্রী খরে, কল্যাণ, সাধনাঙ্ক ১ম খণ্ড, পৃ ৪০৪ ইঃ।

বঙ্গীয় যোগিজাতি—শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ, সমাজ—অগ্রহায়ণ, পৌষ, ১৩১৬ সাল।

বগুড়ায় বৌদ্ধ-যোগী—হরগোপাল দাস কুণ্ডু, প্রবাসী—আষাঢ় ১৩১৭ সাল।

বামাচার—হারাণচন্দ্র শাস্ত্রী, উদ্বোধন, আশ্বিন ১৩৪৮।

বাপ্পারাওর দৈবীশক্তি লাভ—শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ, সমাজ—ফাল্গুন ১৩৩৬।

ভাব ও আচার—অটলবিহারী ঘোষ, কল্যাণ, শক্তিঅঙ্ক।

মন্ত্রযান, সহজযান ও চৌরাশী সিদ্ধ—রাহুল সাংকৃত্যায়ন, গঙ্গা, পুরাতত্ত্বাঙ্ক, জানুয়ারী ১৯৩৩।

মহানির্ব্বাণতন্ত্র—সতীশচন্দ্র দেব, শ্রীভারতী, ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা।

মধ্যযুগের সন্ত ও নাথসাধনা – কল্যাণী দেবী, পরিচয়, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫২।

মন্ত্রযোগের অঙ্গ—রামেশ্বরপ্রসাদ বকীল, কল্যাণ, যোগাঙ্ক পৃঃ ৩৪৪ ইঃ।

মধ্যযুগের জৈন ও বৌদ্ধসাধনার ধারা—ডাঃ প্রবোধ বাগ্‌চী, পরিচয়—আষাঢ় ১৩৪৭।

মীননাথ—ডাঃ শশীভূষণ দাস গুপ্ত, শ্রীভারতী, আশ্বিন ১৩৪৯।

মৃত্যুবিজ্ঞান ও পরমপদ—ম.ম. গোপীনাথ কবিরাজ, ভারতবর্ষ—মাঘ, ফাল্গুন ১৩৪৭।

মৎস্যেন্দ্রনাথ—কল্যাণ-যোগাঙ্ক, পৃঃ ৭৮৩।

যোগিজাতি—অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, প্রবাসী—চৈত্র ১৩২৮। যোগিসখা—চৈত্র ১৩২৮, বৈশাখ ১৩২৯।

যোগিরাজ শ্রীগোরক্ষনাথ—কল্যাণ—যোগাঙ্ক পৃঃ ৭৮৩।

যোগবিদ্যা—হনুমানজী শর্মা, কল্যাণ—যোগাঙ্ক পৃঃ ৬৬৫।

যোগের বিষয় পরিচয়—মম. গোপীনাথ কবিরাজ, কল্যাণ—যোগাঙ্ক পৃঃ ৫১।

যোগচতুষ্টয়—কল্যাণ—সাধনাঙ্ক (১ম খণ্ড) লেখকের নাম নাই।

রসসিদ্ধি—শ্রীনারায়ণ দামোদর শাস্ত্রী, কল্যাণ—সাধনাঙ্ক ২য় খণ্ড পৃঃ ৫১।

শক্তিসাধনা—ম.ম. গোপীনাথ কবিরাজ, কল্যাণ—শক্তি অঙ্ক ১৯৩৫ সাল।

শক্তি ও শক্তিমানের অভেদত্ব—সূর্য্যনারায়ণ শাস্ত্রী, কল্যাণ—শক্তি অঙ্ক।

শব্দযোগ ও বাগ্‌যোগ—ম.ম. গোপীনাথ কবিরাজ, কল্যাণ—যোগাঙ্ক।

শক্তির স্বরূপ—ডাঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য, কল্যাণ—শক্তি অঙ্ক।

শক্তিপাত রহস্য—ম.ম. গোপীনাথ কবিরাজ, উত্তরা—পৌষ ১৩৪৯।

শাক্তধর্ম্ম—চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, কল্যাণ—শক্তি অঙ্ক, পৃঃ ৫১২ ইঃ।

সন্তোকী সহজশূন্য সাধনা—আচার্য্য ক্ষিতিমোহন সেন, কল্যাণ—সাধনাঙ্ক (১ম খণ্ড)।

সাধনমার্গে শক্তিতত্ত্ব—ম.ম. প্রমথনাথ তর্কভূষণ, কল্যাণ—শক্তি অঙ্ক।

সমাধিসাধন ও বিভূতিলাভ—দ্বিজদাস দত্ত, প্রবাসী—শ্রাবণ, ২২।

হিন্দুজাতির যোগবল ও হরিদাস যোগী—'প্রবন্ধপাঠ নামে বহু প্রাচীন স্কুল-পাঠ্য পুস্তকের খণ্ডিতাংশে প্রাপ্ত, গ্রন্থের প্রথম বা শেষাংশ না পাওয়ায় লেখকের নাম দিতে পারিলাম না।

গোরক্ষপুরের সুপ্রসিদ্ধ মুদ্রাযন্ত্র গীতাপ্রেস হইতে 'কল্যাণ' নামক হিন্দী পত্রিকার বিশেষাঙ্কগুলি দ্রষ্টব্য—যথা যোগাঙ্ক, সাধনাঙ্ক, ইত্যাদি।

বিষয়-সূচী

ঐতিহাসিক অংশ

প্রথম পরিচ্ছেদ (পৃ ১—১০)

নাথসম্প্রদায়ের উদ্ভব, নামকরণ ও প্রচার ইতিহাস

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ (পৃ ১১—২৪)

নাথসম্প্রদায়ের উদ্ভব সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশের উপাখ্যান

তৃতীয় পরিচ্ছেদ (পৃ ২৫—৩৯)

মৎস্যেন্দ্র ও গোরক্ষনাথ কে? তাঁহাদের প্রাদুর্ভাব কাহিনী এবং ঐতিহাসিকতা

নেপালে দেবতারূপে পুজা—মৎস্যেন্দ্রের জন্মস্থান বরণা বঙ্গদেশে—চন্দ্রদ্বীপ, কামরূপ প্রভৃতির সহিত মৎস্যেন্দ্রের নাম জড়িত—চন্দ্রদ্বীপ কোথায়? মৎস্যেন্দ্রের পতন-কাহিনীর সহিত যুক্ত কদলীনগর—মায়ামচ্ছন্দর চিত্রে মৎস্যেন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব।

গোরক্ষ-কাহিনী—গোরক্ষনাথের গোময়ে জন্ম—নেপালে গুরুদর্শনে যাত্রা, অনাবৃষ্টি ও তাহার প্রতিকার—মৎস্যেন্দ্র সম্বন্ধীয় বৌদ্ধ-কাহিনী এই কাহিনীরই সহিত যুক্ত—নেপালে গোরক্ষের পুজা—'গোরক্ষ' শব্দের ব্যাখ্যা—ঈশ্বরসন্তান—চরিত্র-মাহাত্ম্য—সম্ভবতঃ পাঞ্জাবের অধিবাসী—অপূর্ব্ব জন্মবৃত্তান্ত—বঙ্গীয় মৎস্যেন্দ্র ও গোপীচন্দ্রের সহিত গোরক্ষের নাম যুক্ত হইলেও তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত রহস্যাবৃত।

মৎস্যেন্দ্র-গোরক্ষের ঐতিহাসিকতা—দাবিস্তান, গোরক্ষনাথকী গোষ্ঠী, বীজক ইত্যাদি গ্রন্থে উল্লেখ—নেপালের শিলালিপি—মৎস্যেন্দ্র অবলোকিতেশ্বরের অবতার—বিভিন্ন শৈব মন্দিরের মূর্ত্তি—'নবনাথ' 'চতুরশীতি সিদ্ধ' মধ্যে স্থান—গোরক্ষনাথের নামের সহিত যুক্ত স্থানাদি ও গ্রন্থাদি—ঐতিহাসিক ঘটনা—ষোড়শ হইতে অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত শতাব্দীভেদে এই ঘটনাগুলির বিচার—মুদ্রা ও মন্দিরাদিতে উৎকীর্ণ-লিপি হইতে গোরক্ষের কাল নির্ণয় চেষ্টা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ (পৃ ৪০—৫৮)

গোরক্ষনাথের কাল সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত

মতামতের চারিটী বিভাগ—প্রথমতঃ কবীর, নানক প্রভৃতির সহিত গোরক্ষের সাক্ষাৎবৃত্তান্ত—উড়িষ্যায় প্রাপ্ত শূন্য-সংহিতার বিবরণ—লামা তারানাথের মতামত—দ্বিতীয়তঃ ভারতের যুদ্ধাদি ও গুগা, ভর্ত্তৃহরি, পিঙ্গলা, গোপীচাঁদ প্রভৃতির বৃত্তান্ত—জ্ঞানেশ্বরীর রচনাকাল—তৃতীয়তঃ নেপালে গোরক্ষের গমন—বাপ্পারাওকে তরবারি দান—রসালু ও পুরাণ ভাগবতের সহিত সম্বন্ধ—নানাস্থানে মন্দির প্রতিষ্ঠা—চতুর্থতঃ দাক্ষিণাত্যের শিবলিঙ্গ প্রভৃতির সহিত গোরক্ষের নামের যোগ—কিন্তু গোরক্ষকাল এত প্রাচীন হওয়া সম্ভব নহে—গোরক্ষের জন্মস্থান ও জাতি বিচার—গোরক্ষের যোগ কথা—হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ে গোরক্ষের শিষ্যাদি—গোরক্ষ পুর্ব্বে বৌদ্ধ ছিলেন, ইহা ভ্রান্তি—গৈনীনাথ ও চর্পটী গোরক্ষের শিষ্য।

মৎস্যেন্দ্র ও গোরক্ষনাথের কালনিরূপণ প্রচেষ্টা

মহাযোগীরা কালজয়ী, তথাপি কালনিরূপণ প্রচেষ্টা—মৎস্যেন্দ্র, মীননাথ ও লুইপা কথা—জন্মস্থান—কামরূপে কৌলশাস্ত্রের প্রচার—ময়নামতী গোরক্ষের শিষ্য—গোরক্ষের বাংলা পদ নাই, লুইপার আছে—গোরক্ষ হিন্দী গদ্যের আদি রচয়িতা—গুরুপরম্পরায়—নেপালের সহিত মৎস্যেন্দ্রের নাম ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত—রথযাত্রা—মৎস্যেন্দ্র-শিষ্য গোরক্ষের গোপীচন্দ্রের সহিত সম্বন্ধ—গোপীচন্দ্র বৃত্তান্ত—ধর্ম্মকীর্ত্তির সমসাময়িক—বাগ্‌চী মহাশয়ের প্রতিবাদ—শহীদুল্লাহের ৭ম শতাব্দীতে মৎস্যেন্দ্রকে

স্থাপনা—তাহার বিচার—কৌলজ্ঞান পুঁথির রচনাকাল লইয়া মতভেদ—উক্ত পুঁথিতে গোরক্ষের নামোল্লেখ মাত্র নাই—বাগ্‌চী মহাশয়ের মতে মৎস্যেন্দ্র দশম শতাব্দীর—অভিনবের তন্ত্রালোক—(তন্ত্রালোক ১১ শতাব্দীর রচনা ইহাতে মচ্ছেন্দ্রবিভুকে নমস্কার জ্ঞাপন)—ইহাতেও গোরক্ষের উল্লেখ নাই—কামরূপে 'অর্দ্ধত্র্যম্বক' শাখার প্রতিষ্ঠাতা মচ্ছেন্দ্রবিভু—মৎস্যেন্দ্রের নামান্তর 'তুর্য্যনাথ' অর্থাৎ চতুর্থ শাখার প্রতিষ্ঠাতা—পাণ্ডে রচিত 'অভিনবগুপ্ত' গ্রন্থে ত্র্যম্বকের কালবিচার—মঙ্গলশতকে মৎস্যেন্দ্রের উল্লেখ—তুকারাম শিষ্যা বহীনাবাঈ প্রাপ্ত গুরুপরম্পরার তালিকা—কবীরের ৮৪ সিদ্ধের ও গোরক্ষের উল্লেখ—জ্ঞানেশ্বরীর রচনাকাল হইতে গোরক্ষের কালনিরূপণ—জনাবাঈয়ের অভঙ্গী বা পদ—জ্ঞানদেব ও জ্ঞানেশ্বরীর কথা কিন্তু জ্ঞানেশ্বরীর গুরুপরম্পরায় প্রচলিত ব্যবধান ধরিলে গোরক্ষকে দ্বাদশ শতাব্দীর ধরিলে অন্যান্য প্রমাণের সহিত বিরোধ ঘটে—রসরত্নসমুচ্চয়, শব্দপ্রদীপ হইতে কালনিরূপণ—ময়নামতীর গানে উল্লেখ—বিভিন্ন তন্ত্রে উল্লেখ—লুইপাদের বংশে অন্যান্য সিদ্ধ—লুইপা, চর্পটী ও নাগার্জ্জুনের কালবিচার—লুইপার দীপঙ্করকে পুঁথি ব্যাখ্যা, ভণিতায় যুগ্মনাম—হঠযোগপ্রদীপিকায় উল্লেখ—'নবনাথ' তালিকা—বেণের মেয়ে গ্রন্থে বর্ণনা—লুইপা ওড্ডিয়ানের রাজকর্ম্মচারী—মতান্তরে ধর্ম্মপালের কায়স্থ বা লেখক—মীননাথ কথা—কুমিল্লায় ময়নামতীর পাহাড়, ইত্যাদি—পালবংশের ইতিহাস—তান্ত্রিক আচার—কৌল-প্রথা—বৌদ্ধতন্ত্র গ্রন্থাদি—আকাশমার্গে গমনাদি বিভূতি—কাপালিক, পাশুপত আদি সম্প্রদায়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ (পৃ ৫৯—৭২)

লুইপাদ, মৎস্যেন্দ্র, মীননাথ ভিন্ন না অভিন্ন

মীননাথ, মৎস্যেন্দ্র—বঙ্গদেশে প্রবাদ মৎস্যেন্দ্র পিতা মীননাথ পুত্র, তিব্বতী মতে মীননাথ মৎস্যেন্দ্রের পিতা—ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চীর মতে উভয়ে এক ও অভিন্ন ব্যক্তি—তন্ত্রালোক ভাষ্য দ্বারাও মীন ও মৎস্যেন্দ্রের অভিন্নত্ব প্রমাণ—**লুইপাদ, মৎস্যেন্দ্র**—তিব্বতে লুইপাদ আদিসিদ্ধরূপে পরিচিত—শাবরীপা ইঁহার গুরু—লুইপাদ লোহিত্য দেশের অধিবাসী—লুই অর্থে লোহিত—বঙ্গদেশে মৎস্যেন্দ্র আদিসিদ্ধরূপে পরিচিত—লোহিত বা রোহিত শব্দে মৎস্যেন্দ্র বা মৎস্যের রাজা—লুইএর নামান্তর মৎস্যান্ত্রাদ—মৎস্যেন্দ্রের তিব্বতী চিত্র—লুইপার চিত্র—মৎস্যের সহিত উভয়ের যোগ—উভয়েই কৌলমার্গের সহিত যুক্ত—অতএব উভয়ে অভিন্ন ব্যক্তি এবং বাঙ্গালী—মীননাথের বাংলাপদ—সহজসিদ্ধির প্রথম আচার্য্য—নাথপন্থের সূত্রপাত—হঠযোগের সহিত সম্বন্ধ—মীননাথ ও মৎস্যেন্দ্র তারার পূজারী—অতএব লুই, মীননাথ ও মৎস্যেন্দ্র এক ও অভিন্ন।

লুইপাদ ও মৎস্যেন্দ্রের ধর্ম্মমত বিচার

লুইপাদ রচিত পদ—বাংলার প্রাচীনতম নিদর্শন—মীননাথের ভণিতাযুক্ত বাংলা দোহা—কাহ্নুপাদ প্রভৃতির বাংলাপদ—এই পদগুলির রচনাকাল সম্বন্ধে মতভেদ—ধর্ম্মঠাকুরের পুজা—মৎস্যেন্দ্রাসন দ্বারা হঠযোগের সহিত নাথপন্থের যোগ—আদিনাথ হঠযোগের উপদেষ্টা—গোরক্ষনাথ কায়াসাধনের নেতা—লুইপাদ কষ্টসাধ্য সাধনের বিরোধী—অতএব মনে হয় লুইপাদ ও মৎস্যেন্দ্র ভিন্ন ব্যক্তি—কিন্তু বাগ্‌চী দ্বারা অভিন্নত্ব প্রমাণ—যোগশাস্ত্রে ও নাথসাহিত্যে ইঁহাদের অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ—লুইপাদের সহজ ধর্ম্মের ক্রমশঃ রূপান্তর—বঙ্গদেশে প্রচারিত নবীন তান্ত্রিক সাধনা—নব মৎস্যেন্দ্রনাথ ও নব গোরক্ষনাথ বৃত্তান্ত—শ্রীরাজমোহন নাথ মহাশয়ের বর্ণনা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ (পৃ ৭৩—৮৮)

অন্যান্য নাথযোগীদের কালনির্ণয় চেষ্টা
গোপীচন্দ্রের কালনির্ণয়

গোপীচন্দ্র কাহিনী সুপ্রচলিত—বিভিন্ন গাথা—গোপীচন্দ্রের রাজধানী—তিরুমলয় শিলালিপি—চন্দ্ররাজাদের ইতিবৃত্ত—পাইকাপাড়া ও সন্দীপ শিলালিপি—গোপীচন্দ্র পালরাজাদের সমসাময়িক—সুরেশ্বর, শ্রীহর্ষ প্রভৃতির সময় দ্বারা কালনির্ণয় চেষ্টা।

চৌরঙ্গীনাথের কালনির্ণয়

চৌরঙ্গী মৎস্যেন্দ্রনাথের শিষ্য—পূর্ব্ব কাহিনী—চৌরঙ্গীর পিতা দেবপাল—ময়নামতী দেবপালের ভগিনী—ধর্ম্মপুজার উৎসাহদাত্রী—শূন্যপুরাণে ধর্ম্মপুজা বৃত্তান্ত—গোরক্ষবিজয় গ্রন্থে গাভুর সিদ্ধার উল্লেখ—তিনিই চৌরঙ্গীনাথ—গাভুর বজ্রযনের ভাষ্যকার—গাভুর পূর্ব্বদেশীয়—পালরাজাদের সময়ে রূপান্তরিত বৌদ্ধধর্ম্ম বা ধর্ম্মপুজার প্রচারক।

হাড়িসিদ্ধা বা জালন্ধরিনাথের উৎপত্তি কথা

হাড়িসিদ্ধার জন্মস্থান সিন্ধুদেশে—ওড্ডিয়ানে যোগশিক্ষা—অদ্ভুত ক্ষমতার্জ্জন—ময়নামতীর গুরুভাই -গোরক্ষনাথ গুরু—গোপীচন্দ্র হাড়িপার শিষ্য—জালন্ধরিনাথের বন্দনা—নিরঞ্জনপুরাণে জলন্ধরের কথা—জলন্ধর রাজা ও ময়নামতীর ভ্রাতা—গোপীচাঁদ সিদ্ধরূপে 'শৃঙ্গারী পাব' নামে পরিচিত—সিদ্ধান্তবাক্যে জালন্ধর—গোপীচাঁদের প্রশ্নোত্তর—জালেন্দ্রনাথের অনুরূপ জন্মবৃত্তান্ত।

ভর্ত্তৃহরিনাথ

গোরক্ষনাথ ভর্ত্তৃহরির গুরু—প্রবাদ আছে যে ভর্ত্তৃহরি উজ্জয়িনীর রাজা ছিলেন—পত্নীর ব্যবহারে সন্ন্যাস গ্রহণ—ও বনবাসে গ্রন্থরচনা—কিন্তু এই ভর্ত্তৃ

গোরক্ষশিষ্য ভর্তৃ হইতে ভিন্ন—কারণ গোরক্ষশিষ্য ভর্তৃর স্ত্রী পিঙ্গলা পতিব্রতা—ইহাই ভর্তৃর সন্ন্যাস লইবার বিলম্বের কারণ— ভর্তৃ কাহিনীর সঠিক অনুসন্ধান নিষ্ফল—ভর্তৃর ভ্রাতা বিক্রমকে শালিবাহন পরাজিত করিয়া নিজ সম্বৎ প্রতিষ্ঠা করেন—দেবতা মিত্রাবরুণের পুত্র ভর্তৃর ভাণ্ড মধ্যে জন্ম—তাই 'ভর্থী' নাম—উজ্জয়িনীর সহিত সম্বন্ধ —গোরক্ষের শিষ্য ও ময়নামতীর ধর্ম্মভ্রাতা।

শ্রীজ্ঞানেশ্বর মহারাজ

মহারাষ্ট্র প্রদেশে জ্ঞানদেবের জন্ম—গোরক্ষনাথের শিষ্য—মহারাষ্ট্র ভাষায় 'জ্ঞানেশ্বরী' নামক গীতা-ভাষ্য ও অন্যান্য গ্রন্থ রচনা—জ্ঞানেশ্বরীর রচনা কাল—সমাজচ্যুত পরিবারে জন্ম—নিজ সিদ্ধি বলে 'জ্ঞানেশ্বর' নাম অর্জ্জন—মাত্র ২১ বৎসর বয়সে জীবন্তে সমাধি গ্রহণ।

গহনীনাথ, চর্পটনাথ প্রভৃতির উৎপত্তি কথা।

শ্রীগম্ভীরনাথজী

গোরক্ষপুরের মোহন্ত গোপালনাথজীর নিকট গম্ভীরনাথের দীক্ষা গ্রহণ—অসাধারণ চরিত্রবল—বহু বাঙ্গালী শিষ্য—গোরক্ষপুরের মঠাধ্যক্ষ—অতিথি সেবা ও দানশীলতার জন্য প্রসিদ্ধ—বর্ত্তমান যুগে মহাসিদ্ধ পুরুষরূপে খ্যাত।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বিভিন্ন নাথসিদ্ধ যোগীদের নাম ও শ্রেণীবিভাগ—(পৃঃ ৮৯—১০০)

'নবনাথ' নামে প্রসিদ্ধি—নবনাথের বিভিন্ন তালিকা—নবদ্বারের নাম—নবনাথ—গোরক্ষসিদ্ধান্ত সংগ্রহে ঈশ্বর সন্তান শ্রীগোরক্ষনাথের উল্লেখ—বিভিন্ন তন্ত্রে উল্লেখ—৮৪ সিদ্ধা—দ্বাদশ পন্থ—'নাথ' শব্দের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—নাথমার্গের নামান্তর যোগমার্গ প্রভৃতি—শ্রেণীবিভাগ—দ্বাদশ পন্থ হইতে কানফাটা সম্প্রদায়ের উৎপত্তি—সৎনাথী, ধর্ম্মনাথী প্রভৃতি সম্প্রদায়—গোপীচন্দ্রের সম্প্রদায়।

নাথ যোগীদের বিভিন্ন সম্প্রদায়

গার্হস্থ্য ও মঠধারী যোগী—উপার্জ্জনের বিভিন্ন পন্থা—বঙ্গীয় যোগিজাতির মধ্যে বহু বিভাগ—তাহাদের বিবরণ—বোম্বাই প্রদেশের যোগী—পুণা, বেরার প্রভৃতিতে নাথযোগীদের আবাস—দাক্ষিণাত্যে যোগীদের বৃত্তি—মহারাষ্ট্রে **'যোগীপুরুষ'** সম্প্রদায়—যুক্তপ্রদেশে, নেপালে বিভিন্ন যোগী সম্প্রদায়—বগুড়ায় বৌদ্ধ যোগীসম্প্রদায়।

নাথপন্থের সহিত যুক্ত অন্যান্য যোগী সম্প্রদায়

পুণার এক মুসলমান সিদ্ধ গোরক্ষনাথের শিষ্যরূপে পরিচিত—পেশোয়ার প্রভৃতি নানাস্থানে গোরক্ষের শিষ্য—অঘোরী দত্তাত্রেয়ের শিষ্যদের সহিত গোরক্ষ-

যোগীদের সংস্পর্শ—বিভিন্ন যোগীসম্প্রদায়ের নাম—সন্তদের মধ্যে 'সাধ'শ্রেণী গোরক্ষের উপাসক—

ভেক বারহ পন্থ বা কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি দ্বারা দ্বাদশ বৎসরান্তে মোহন্ত নির্ব্বাচন আদি কার্য্য সাধন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ (পৃঃ ১০১—১১০)

মঠ ও তীর্থস্থানাদি

বঙ্গদেশে দমদমের নিকট গোরখ-বাসলী, মন্দির মধ্যে ত্রিমূর্ত্তি—গোরক্ষধুনি প্রভৃতি—হুগলীর ত্রিবেণীতে মহানাদ গ্রামও গোরক্ষ-ক্ষেত্র—কালীঘাটের কালীমূর্ত্তি।

সিকিম, নেপাল, তুলসীপুর, কাশ্মীর, নৈনিতাল, হরিদ্বার, গোরক্ষপুর, বারাণসী, পেশোওয়ার প্রভৃতি বহুস্থানে গোরক্ষ-পূজা, তন্মধ্যে গোরক্ষপুরের মঠ, পাঞ্জাবের টিলা মঠ বিশেষ প্রসিদ্ধ—করাচীর অনতিদূরে কোটেশ্বর তীর্থে নাথ-যোগীদের 'যোনিলিঙ্গ' চিহ্ন ধারণ—কচ্ছপ্রদেশের ধীনোধরের প্রসিদ্ধ দ্বিতল মঠ—ইহাতে ধর্ম্মনাথের মূর্ত্তি—ভারতের বহুস্থানে গোরক্ষনাথের নামে যোগাশ্রম বিদ্যমান।

নাথসম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতা

যোগীরা শৈব, শিবের ভৈরবাদি মূর্ত্তি-পূজা—অষ্টমূর্ত্তি—সাধারণতঃ কাপালিক দ্বারা ভৈরবের পূজা—অম্বা ও জগদম্বা-পূজা—কুণ্ডলিনীর জাগরণ—শক্তিপূজা—যোনি ও লিঙ্গপূজা —শ্রীচক্রের পূজা, তবে স্ত্রী লইয়া সাধনার স্পষ্ট উল্লেখ নাই।

নবম পরিচ্ছেদ (পৃঃ ১১১—১১৫)

মৎস্যেন্দ্র ও গোরক্ষনাথাদি সম্পর্কিত কয়েকটি স্থানের নির্দ্দেশ

পূর্ব্বদেশ—মীননাথ পূর্ব্বদেশের অর্থাৎ কামরূপের অধিবাসী।

কদলীদেশ—প্রবাদ আছে মৎস্যেন্দ্র কদলীদেশের অধিপত্নীর মোহে আবদ্ধ হন, এই দেশের অবস্থান সম্বন্ধে মতভেদ আছে, সম্ভবতঃ উহা কামরূপের বর্ত্তমান নগাঁও জেলার 'কদলী'।

বিজয়নগর—ইহা বর্ত্তমান বিজনী রাজ্যের অন্তর্গত।

ওড্ডিয়ান—বৌদ্ধতান্ত্রিকদের পীঠস্থান, যাদুবিদ্যার জন্য প্রসিদ্ধ—লুইপা ওড্ডিয়ান রাজ্যের কর্ম্মচারী ছিলেন, ওড্ডিয়ানের সংস্থান সম্বন্ধে মতভেদ ও তাহার আলোচনা।

লঙ্কাপুরী, জাহোর—কাশ্মীর ও নেপালের সীমান্তে জাহোর ও তথায় লঙ্কাপুরী নামে সমাধি—মৎস্যেন্দ্রের জন্মস্থান ও দেশভ্রমণাদি সম্বন্ধে আলোচনা।

কামলাক গৌড়ের সহর—গোপীচন্দ্রের নামের সহিত যুক্ত পুরাতন শ্রীহট্ট, কুমিল্লা প্রভৃতি স্থান।

ভাড়ার সহর –সম্ভবতঃ বাঙ্গালাদেশের পশ্চিমাংশের কোন সহর।

দশম পরিচ্ছেদ (পৃঃ ১১৬—১২০)

নাথসম্প্রদায়ের আচার, সংস্কার, দীক্ষা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াদি ও ব্যবহার্য্য দ্রব্যসকল

যোগীদের খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে বিচার—অন্ন বিতরণ—ঔষধ কবচাদি দান—শিবরাত্রিতে গোরক্ষাদির চরণপূজা—গোরক্ষগীত—কালভৈরবের পূজা—নেপালে মৎস্যেন্দ্রের রথযাত্রা—'আদেশ' শব্দের অর্থ ও অভিবাদন প্রথা—গোরক্ষনাথীদের মধ্যে বিভিন্ন জাতি—কর্ণবেধ প্রথা—কুণ্ডলধারণ—শিখাচ্ছেদ—'শিব-গোরক্ষ' মন্ত্র গ্রহণ—শিংনাদসহ সূত্র ধারণ—মৃতদেহ সমাধিস্থ করার রীতি।

নাথযোগীদের ব্যবহার্য্য দ্রব্যসকল—কুণ্ডল, সেলী নামক ঔর্ণ উপবীত সহ কৃষ্ণবর্ণের বংশীর ন্যায় 'নাদ' ধারণ—গৈরিক ধারণ—ভস্ম লেপন—ত্রিপুণ্ড্র ধারণ—সাবিত্রী, রুদ্রাক্ষ ঠুম্‌রা ও আশাপূরীর মালা—দক্ষিণ বাহুতে যোনিলিঙ্গ চিহ্ন—নানাবিধ বলয়, ধুনি ও 'আচল' যষ্টির ব্যবহার—সূত্র, শিখাদির যৌগিক অর্থ—বিভূতিস্নান—কুণ্ডল দ্বারা আদিনাথ শিবকে স্মরণ—কুণ্ডলের নামান্তর 'দর্শন বা মুদ্রা'।

একাদশ পরিচ্ছেদ (পৃঃ ১২১—১৫০)

গোরক্ষ-সাহিত্য ও বঙ্গসাহিত্যে গোরক্ষের যোগ-পরিচয়

শৈবযোগীদের সহজবোধ্য ভাষায় পদরচনা—লুইপাদ রচিত পদ—মৎস্যেন্দ্র গোরক্ষাদি রচিত সংস্কৃত পুথি—তাহারা প্রামাণ্য কি না বিচার—গোরক্ষ বিজয়, ময়নামতীর গান প্রভৃতি প্রাচীন কাহিনী—নেপালে প্রাপ্ত কৌলজ্ঞাননির্ণয় পুথি—ইহার লিপিকাল—পুথিতে মীননাথ ও মৎস্যেন্দ্র উভয় নাম থাকায় অভিন্ন ব্যক্তি—মৎস্যেন্দ্র রচিত অকুলাগম তন্ত্র প্রভৃতি—বৌদ্ধ গান ও দোহায় লুইপাদ রচিত গ্রন্থের নাম—মৎস্যেন্দ্র সংহিতা—গোরক্ষ সংহিতা—গোরক্ষ রচিত সিদ্ধসিদ্ধান্ত পদ্ধতি, বিবেকমার্ত্তণ্ড প্রভৃতি গ্রন্থ—কাশ্মীর গ্রন্থাগারের অমরৌঘ-শাসনম্—প্রাচীন হিন্দীতে রচিত গোরক্ষবোধ—শিবসংহিতা ও ঘেরণ্ড সংহিতায় গোরক্ষ সম্প্রদায়ের রীতিনীতি—মৎস্যেন্দ্র হঠযোগের আদি প্রচারকর্ত্তা—স্বতারাম যোগীন্দ্র রচিত হঠযোগ প্রদীপিকার মূল গোরক্ষ পদ্ধতি ও গোরক্ষ শতক—এই গ্রন্থদ্বয় হইতে নাথমার্গীদের সাধন-পদ্ধতি উপলব্ধি—গোরক্ষ সিদ্ধান্ত সংগ্রহে নাথ সম্প্রদায়ের প্রচলিত বহু পুথির উল্লেখ—বলভদ্রকৃত সিদ্ধসিদ্ধান্ত সংগ্রহ—অমনস্ক—যোগবীজম্ গ্রন্থ—বিভিন্ন গ্রন্থকর্ত্তার নামে সিদ্ধসিদ্ধান্ত পদ্ধতি—গোরক্ষবোধ গ্রন্থ—পরবর্ত্তী গোরক্ষবোধে কবীর পন্থীদের মতামত—গোরক্ষবোধ একাদশ বা চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে মিশ্রিত ভাষায় রচিত—ডাঃ মোহন সিংএর গ্রন্থ-তালিকা—শ্রুত-শব্দ-যোগ ও উল্টা-সাধন

বর্ণন—গোরক্ষের রচনার নমুনা—নাথদিগের ভাষা অপভ্রংশ, মহারাষ্ট্রী ও রাজপুত ভাষা মিশ্রিত—বিভিন্ন স্থানে গোপীচাঁদ ও ভর্তৃহরি সম্বন্ধে নাটক—গোরক্ষের সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক রচনা 'সব্‌দী'--হিন্দী গোরক্ষবিকাশ গ্রন্থে গোরক্ষনাথের নামে প্রচলিত অর্দ্ধ শতাধিক গ্রন্থের উল্লেখ—মৎস্যেন্দ্রনাথের রচিত গ্রন্থের উল্লেখ—যোধপুররাজ মানসিংহ কর্ত্তৃক গোরক্ষ প্রশংসা—জয়পুরে কবীরের সংগ্রহ গ্রন্থে গোরক্ষনাথের কয়েকটি গ্রন্থের পরিচয়—যোধপুর গ্রন্থাগারে গোরক্ষের নামে প্রচলিত পুথি—গোরক্ষগোষ্ঠী নামক হিন্দী পুস্তিকা—বিভিন্ন দেশ হইতে সংগৃহীত পদ ও পুথি—গোরক্ষবিজয়, মীনচেতন, গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস, মাণিকচন্দ্রের গান প্রভৃতি বঙ্গীয় গ্রন্থ।

বঙ্গসাহিত্যে গোরক্ষের যোগ-পরিচয়

গোরক্ষবিজয় প্রভৃতিতে গোরক্ষের যোগকথা—'মহাজ্ঞান' লাভ—ইহা দ্বারা মরণশীল দেহের পরিবর্ত্তন—শিবতনু লাভ—গোরক্ষের ব্রহ্মচর্য্য সাধন—মীননাথের পতন—গোরক্ষের গুরু উদ্ধার—মৃদঙ্গে 'কায়াসাধনে'র বোল—গায়ত্রী-ক্রিয়া—উল্টাসাধন—বঙ্কনালে সাধন—মহারসকে উর্দ্ধমুখী করার সাধন—মহারসই চন্দ্রামৃত—শঙ্খিনী নাড়ীর পরিচয়—ইহাই বঙ্কনাল—গোরক্ষবিজয়ে ইহাকে 'দুই মুখ সাপ' বলা হইয়াছে—দশমীদ্বার কথা—চর্য্যাপদ প্রভৃতিতে দশমীদ্বার, গঙ্গাযমুনা অবধূতি মার্গ প্রভৃতির উল্লেখ—গোরক্ষবিজয়ে গঙ্গাযমুনা, ব্রহ্মনাল প্রভৃতির উল্লেখ—ব্রহ্মনালই সুষুম্নাপথ—গোরক্ষবিজয়ে খেচরীমুদ্রা সাধনের ইঙ্গিত—কায়া পরিচয়, অজপাজপ, বিন্দুরক্ষা প্রভৃতির উল্লেখ—হিন্দীতে অনুরূপ প্রশ্নোত্তর—বঙ্গভাষা ও হিন্দীভাষায় রচিত পদের তুলনা—'বৈষ্ণব মিনাই' অর্থে সাধু মীননাথ—কারণ বৈষ্ণব ও নাথের সাধনা-পদ্ধতি ভিন্ন—বুদ্ধের 'দশবল' ও গোরক্ষের 'বিভুতি'—শূন্যপুরাণের সৃষ্টিবিবরণ—শব্দব্রহ্মের ইঙ্গিত—ইহাতে নাথপন্থের পীঠস্থান হিংলাজের উল্লেখ—গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসে নামজপের মাহাত্ম্য—অজপাজপ বা 'হংস' মন্ত্র—মহাজ্ঞান অর্থে যোগযুক্ত জ্ঞান—ময়নামতীর মহাজ্ঞান সত্ত্বেও পুত্রের সন্দেহ ও মাতাকে পরীক্ষা—মাতাপুত্রের প্রশ্নোত্তরের মধ্যে বিবিধ তত্ত্ব-কথা—সাধকরঞ্জনে ত্রিবেণী কথা—ষট্‌চক্রভেদ, কুণ্ডলিনী জাগরণ, ইড়াপিঙ্গলার বশীকরণ ও ব্রহ্মচর্য্য সাধন নাথযোগীদের বৈশিষ্ট্য।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ (পৃঃ ১৫১—১৯৭)

নাথপন্থের সহিত তন্ত্র, কৌলমার্গ, রহস্যবাদী, বৌদ্ধ ও শৈবসম্প্রদায়ের সম্বন্ধ বিচার

নাথপন্থের মূল অনুসন্ধানার্থ সমসাময়িক পন্থাদির সহিত তুলনা

(ক) নাথপন্থের সহিত তন্ত্রের যোগাযোগ

নাথপন্থীরা শৈবতান্ত্রিক—বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সহজিয়াদের মধ্যে ভেদ—বৌদ্ধ সহজিয়াদের মধ্যে তন্ত্রের সাধনা—ভারতের বিভিন্ন দেশে তন্ত্রের আলোচনা—

বঙ্গদেশে তান্ত্রিক বৌদ্ধদের বিরাট সাহিত্যের তিব্বতী অনুবাদ—আসঙ্গের অষ্টসিদ্ধি—মন্ত্রযান সম্প্রদায়—কালচক্রযান—বজ্রযান হইতে লামাধর্ম্মের উৎপত্তি—তিব্বতে বিচিত্র অনুষ্ঠান—ভারত হইতে গুরু পদ্মসম্ভবের তিব্বতে গমন—যাদুবিদ্যা শিক্ষাদান—বৌদ্ধধর্ম্মের বিকৃতি—বৌদ্ধদের বিহার বঙ্গদেশে ও বিহারে—বৌদ্ধ বিহারে গ্রন্থরচনা—সান্ধ্য ভাষার ব্যবহার—বঙ্গদেশের দীপঙ্কর, শীলভদ্র প্রভৃতি—মৎস্যেন্দ্রনাথের গ্রন্থে বৌদ্ধধর্ম্মের উল্লেখ নাই, তথাপি তিনি বৌদ্ধদের দেবতা—আর্য্য ও জৈন ধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের ভেদ—নাথধর্ম্মে হিন্দুতন্ত্র ও বৌদ্ধ যোগতন্ত্রের সংমিশ্রণ—তন্ত্রের উৎপত্তি—বৈদিক যুগ হইতে ইন্দ্রজালের ব্যবহার—দ্বাদশ শতাব্দীর লোকগীতির মধ্যে তন্ত্রের প্রভাব—ভোজবিদ্যার গ্রন্থ—বৈদিক ও তৎপরে বৌদ্ধযুগেও ভোজবিদ্যার প্রভাব—শাক্ত ধর্ম্মেও ইন্দ্রজালের ব্যবস্থা—দেবী-পূজায় মন্ত্রসাধন—কুণ্ডলিনীর জাগরণ—বৌদ্ধধর্ম্মের ভারতের বাহিরে প্রচার—শঙ্করাচার্য্যকে মহাযানী বৌদ্ধ প্রতিপন্নের চেষ্টা—শাক্তদের মধ্যে শঙ্কর কর্ত্তৃক দক্ষিণাচার প্রচলিত—বলিদান প্রভৃতি ইহাতে নাই—দাক্ষিণাত্যে 'পাঞ্চরাত্র' ও 'বৈখানস' সংহিতার ব্যবহার রীতি—শৈবাগমের সহিত পাঞ্চরাত্রের সাদৃশ্য—ইহারা গোরক্ষ-পূর্ব্বযুগের —সংহিতা ও আগম—আভাসবাদ—ত্রিক বা পতি-পাশ-পশু সম্বন্ধে বিচার—আগমে দ্বৈতবাদ—৬৪ তন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়—সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর গ্রন্থে তন্ত্রের প্রভাব—শাক্তের দেবীপূজা—ওঁ মহামন্ত্রের সহিত শক্তি জড়িত—শক্তিই পরাবাক্—শাক্তদের ষট্চক্রসাধন—চক্রপূজা—সর্ব্বশ্রেণীর প্রবেশাধিকার থাকায় বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্ম হীনবল—ক্রমশঃ বৌদ্ধদের তন্ত্রে বিশ্বাস—কাপালিক, পাশুপত, লকুলীশ, কানফাটা, নাথ প্রভৃতি সম্প্রদায়—ইহারা সকলেই মূলতঃ শৈব—ব্রাত্যযোগীরা শৈব—অথর্ব্ববেদে বর্ণনা—ইহাদের মধ্যেও তন্ত্রের সাধনা—কালামুখ সম্প্রদায়—ইহারাও শৈব—সুবিখ্যাত হর্ষ পাশুপত সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন—বাণের—হর্ষচরিত সপ্তম শতাব্দীতে রচিত, —কালামুখদের ললাটে কৃষ্ণচিহ্ন—ইহারা ভৈরবের উপাসক ও অঘোরীদের সহিত যুক্ত—মালতীমাধব প্রভৃতিতে কাপালিকের চিত্র—দশকুমার চরিতে বর্ণিত ভয়াবহ চিত্র—অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে গ্রন্থগুলি রচিত—বৌদ্ধতন্ত্র গ্রন্থ তথাগত-গুহ্যকও সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে রচিত—অতএব বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয় ধর্ম্মেই তন্ত্রের প্রবেশ—পাশুপত শৈবদের সহিত নাথপন্থের সাধনায় সাদৃশ্য—পশুপতিই শিব—নাথধর্ম্মে যোগ ও তন্ত্রের মিশ্রণ—জৈনগ্রন্থে যোগসাধনার প্রয়োজনীয়তার ইঙ্গিত মাত্র—তন্ত্রসাধনার দ্বারা সিদ্ধিলাভ নাথদের অন্যতম লক্ষ্য—বৌদ্ধধর্ম্মে তন্ত্রসাধনার দ্বারা ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি—তন্ত্র হিন্দুর পঞ্চম বেদ—আগম ও নিয়ম—'গণকারিকা' গ্রন্থে পাশুপত-দর্শন—সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ ও মহাভারতেও পাশুপত সিদ্ধান্ত—দত্তাত্রেয় রচিত ৬৪ তন্ত্র—মন্ত্রসাধনই তন্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য—তন্ত্রের সাধক পশু, বীর ও দিব্য—তন্মধ্যে দিব্যসাধকই 'কৌল'—নাথ-সিদ্ধেরাও কৌল নামে পরিচিত—ইহা দ্বারা তন্ত্রের সহিত নাথপন্থের যোগাযোগ সূচিত হয়।

(খ) নাথমার্গের সহিত কৌলমার্গের সম্বন্ধ বিচার

কৌলজ্ঞাননির্ণয়ে বিভিন্ন কৌল সম্প্রদায় ও তাহাদের গুরুদের নাম—কৌলশাস্ত্রে যোগপ্রণালীর ব্যাখ্যা—মৎস্যেন্দ্র সিদ্ধামৃত কৌলান্তর্গত যোগিনীকৌল ছিলেন—এই কুলশাস্ত্র কামরূপে প্রচার—কৌলদের দুইটি শ্রেণী—'কৃতক' ও 'সহজ'—'সহজের' উচ্চস্থান—বৌদ্ধসিদ্ধেরাও সহজসাধক—সহজাবস্থা লাভ হইলে সাধক স্বয়ং দেবতা হন—শাস্ত্রাদি সহজসাধনের অন্তরায়স্বরূপ—কৌলজ্ঞানেও লৌকিকমার্গ বর্জ্জনের কথা আছে—কৌলদের মধ্যে পঞ্চকুলের উল্লেখ—পীঠ, উপপীঠ, ক্ষেত্র ও ছন্দ এই চারি শ্রেণীর তীর্থ—কামাখ্যা, পুর্ণগিরি, ওড়িয়ান ও অর্ব্বুদ পীঠ—বৌদ্ধতন্ত্রে ও কৌলজ্ঞাননির্ণয়ে 'শান্তিকা', 'পোষ্টিকা' আদি শব্দ—অতএব উভয় মতই কোন সাধারণ মূল ভিত্তির আশ্রয়ে বর্দ্ধিত—কুলার্ণব তন্ত্রে সপ্তবিধ আচার বর্ণনা—পঞ্চমকারের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—"কৌলমার্গ রহস্যে" ইহাদের ব্যাখ্যা—পূর্ণাভিষিক্ত জীবন্মুক্ত যোগীর পক্ষে পঞ্চমকারের বাহ্য অনুষ্ঠানে আপত্তি নাই—ইহার নিমিত্ত শিবসদৃশ ব্যক্তির প্রয়োজন—বৈদিক ও তান্ত্রিক যোগসাধনের চরম লক্ষ্য এক হইলেও পদ্ধতি অন্য —কৌলাচারের মুখ্য কেন্দ্র কামাখ্যা—কৌল দ্বিবিধ—"উত্তরকৌল" ও "পূর্ব্বকৌল"—"কৌল" ও "সময়মার্গী" "কুল" শব্দের অর্থ—পূর্ণ অদ্বৈতজ্ঞানীই কৌল—তান্ত্রিকপূজার অধিকারী স্বল্প—তন্ত্রের শক্তি কল্পনা বৈদিক—ঋগ্বেদের "বাগম্ভৃনী সূক্ত"—সপ্তবিধ আচার মধ্যে 'বামাচার' মাত্র অবৈদিক—কঠিনতম ভাব ও আচার 'দিব্য' ও 'কৌল' ইহা নাথসম্প্রদায়ের অনুমোদিত—'কৌল', 'কুল' ও 'অকুলের' সম্বন্ধ—কৌলের ভেদাভেদ নাই—পঙ্ক ও চন্দন, পুত্র ও শত্রু উভয়েই তুল্য—নাথসিদ্ধদের ইহাই লক্ষ্য — বিভিন্ন গ্রন্থে কৌলদের বিবরণ—ভাব মানসধর্ম্ম, আচার তাহারই বহিঃপ্রকাশ—সকল ভাববর্জ্জিত সাধকই কৌল—তাঁহার কোন নিয়ম বা বন্ধন নাই—'রহস্য পুজা পদ্ধতি'তে কৌল ও চক্রানুষ্ঠানের বর্ণনা—গঙ্গাযমুনার ব্যাখ্যা—ভাস বর্ণিত বীরাচারের প্রতি বিদ্রূপ—সোমদেবের 'নীতিবাক্যামৃত'র টীকায় কৌলাচারের নিন্দা—হিন্দুতন্ত্র বা কৌলাচার বৌদ্ধতন্ত্রের নিকট ঋণী নহে—বৌদ্ধধর্ম্মে পরবর্ত্তীকালে বীরাচারের প্রবেশ—নিত্যা প্রকৃতির নারীতে স্থূলরূপে আবির্ভাব, তাই তন্ত্রে শক্তির সাধনা—'সেকোদ্দেশ' গ্রন্থে মহামুদ্রা সাধন কথা—স্বীয় পিণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডের অনুভূতি—'কেবলী' সাধক—তান্ত্রিক সাধনে 'যন্ত্রের' ব্যবহার—শক্তি সাধনায় সর্ব্বজাতির মিলন।

(গ) ভারতের মধ্যযুগের রহস্যবাদীদের সাধনার সহিত নাথ সাধনার সম্বন্ধ বিচার

ভারতের বিভিন্ন ধর্ম্মের মধ্যে যোগসূত্র—সন্ত ও সুফীদের সহিত নাথ সাধনার ঐক্য—সাধনার মধ্যে 'যোগ'—সন্তদের 'সাধ' শ্রেণী গোরক্ষনাথের পুজারী—কবীর, দাদূ প্রভৃতির গোরক্ষের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন—দিনাজপুরে সুফী ও নাথযোগীদের সাধনার মিশ্রণ—নাথপন্থীদের ন্যায়-কবীরের হিন্দু ও মুসলমানে অভেদ দেখা—সুফী সাধক মনসুর

হালাজ ও সন্তসাধক শিবদয়ালের জীবাত্মা ও পরমাত্মা সম্বন্ধে মতামত—নাথযোগীদের 'জীব' ও 'শিব' ভেদ—সন্ত সাধনায় 'সুরত' শব্দ যোগ—সাজাহান পুত্র দারা সেখের পুস্তকে অনাহতনাদ কথা—নাথমার্গে ইহাই অজপাজপ—ইহারই নামান্তর 'মন্ত্রচৈতন্য' —উপনিষদে ও নাথমার্গে প্রণব-প্রশস্তি, সন্ত মধ্যে 'সন্তনাম' বা 'সত্যনামে'র প্রশস্তি —সন্তদের 'বিগমদেশ' নাথদের 'উন্মনী' বা মনোহীন অবস্থা—সুফীদের 'সমা' সাধন—মীরার ভজন অতুলনীয়—নামরূপ বা 'সুমীরণ' দ্বারা অসম্ভব সম্ভব হয়—কবীরের রামনাম জপ—এই রাম নিগুর্ণ, তাই মূর্ত্তি বা মন্দিরহীন—সন্ত, নাথ ও সুফীদের মধ্যে সদ্‌গুরুর প্রাধান্য—শরীর মধ্যে চক্রাদির সাধন—ইহাই সন্তদের 'কবল' বা 'কমল'—নাথ মধ্যে কুণ্ডলিনী জাগরণের বৈশিষ্ট্য—জীবন্মুক্ত যোগী—সন্ত, নাথ, বৌদ্ধ প্রভৃতি সম্প্রদায় মধ্যে শূন্যের সাধনা—সুফীসাধক চিশ্‌তীর হঠযোগ সাধন—দাদ্‌ নাথযোগীদের মধ্যে 'কুম্ভারীপাব্" নামে প্রসিদ্ধ—বাউল সহজিয়া ও সুফীদের মধ্যে সহজসাধন—সন্তদের বিন-মন-সা বা মনঃশূন্য অবস্থা নাথদের 'অমনস্ক' অবস্থার ন্যায়।

(ঘ) নাথপন্থের সহিত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সম্বন্ধ বিচার

নাথদের কেহ বৌদ্ধ কেহ শৈব বলেন—নাথমার্গে হিন্দুতন্ত্রের নাথদের ও বৌদ্ধ সহজিয়া রহস্যের অপূর্ব্ব মিশ্রণ—নাথ হঠযোগ ও বৌদ্ধ সহজিয়া সাধন—নাথমত মূলতঃ ব্রাহ্মণ্যমার্গের সহিত যুক্ত—শিবশক্তি ও প্রজ্ঞা উপায়—মহামুদ্রা সাক্ষাৎকার—মহাসুখ বা এবম্‌কার—তন্ত্রের ষট্‌কোণ—সামরস্য—জীবের কালচক্রে আবর্ত্তন—তৎপরে নির্ব্বাণলাভ—নাথমতে অদ্বৈতভাবের উৎপত্তি—অমনস্ক অবস্থার বর্ণনা—নাদবিন্দু বা প্রজ্ঞাউপায়ের মিলন—চন্দ্রসূর্য্য কথা—চন্দ্রের নিত্যকলা—সহস্রারে আনন্দানুভূতি—বৌদ্ধদের শূন্যসমাধি ও নাথদের সমরস সাধন—পরমপদ লাভ—নাথ, বৌদ্ধ ও জৈন মতে শূন্য সাধনা—সহজ ও পরমপদ—বজ্রদেহ, যোগদেহ, সিদ্ধদেহ ও রসময়ী তনু—নাথমতে দ্বাদশমুদ্রা—বঙ্গদেশে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ—নাথেরা বৌদ্ধ নহেন—শৈববেশে মৎস্যেন্দ্রের নেপালে গমন ও শৈবধর্ম্ম প্রচার—গোরক্ষ পুর্ব্বে বৌদ্ধ ছিলেন এইরূপ প্রবাদ—স্পষ্ট প্রমাণের অভাব—বৌদ্ধ ৮৪ সিদ্ধার তালিকায় নাথসিদ্ধদের নাম—নাথদের মন্ত্র 'শিব-গোরক্ষ' পরিচ্ছদ শৈব যোগীর অনুরূপ, তীর্থ শৈবতীর্থ, গোত্র শিবগোত্র, অতএব বৌদ্ধ হওয়া অসম্ভব—গোরক্ষ পশুহত্যাকারী ও মৎস্যেন্দ্র কৈবর্ত্ত, অতএব বৌদ্ধ নহেন—দাক্ষিণাত্যের শ্রীপর্ব্বতে বৌদ্ধদের যাদুবিদ্যা শিক্ষা—এইরূপে দাক্ষিণাত্যের তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি—৮৪ সিদ্ধার দ্বারা উহা উত্তর ভারতে প্রচার—তন্মধ্যে নাথসিদ্ধারাও অন্যতম—চৌরাশী সিদ্ধের বংশবৃক্ষ—বৌদ্ধসহজিয়া ও পাশ্চাত্য সাধনের মধ্যে তুলনা—গোরক্ষের সাধন ভিন্ন—ইহা উপনিষদের ধর্ম্মসাধন—তৎসহ হঠযোগ প্রভৃতির মিশ্রণ—ডাঃ মোহন সিং মতে গোরক্ষের নাদানুসন্ধান উপনিষদেও পাওয়া যায়—গোরক্ষের সহজানন্দ লাভের উপদেশ।

(ঙ) নাথসম্প্রদায়ের সহিত শৈব সম্প্রদায়ের সম্বন্ধ বিচার

বৈদিক কাল হইতে শিবের পূজা—শৈবদের চারিটি সম্প্রদায়, শৈব পাশুপত কালদমন ও কাপালিক—ত্রিকদর্শন ও বীরশৈব প্রভৃতি দর্শনের সহিত নাথদর্শনের মিল—দক্ষিণে তামিলদেশে শৈবসিদ্ধান্ত দর্শন—দ্বাদশ শতকে বীরশৈব মত—ইহাদের কণ্ঠে লিঙ্গ মূর্ত্তি ধারণ—নাথদের শিংনাদ ধারণ—কাশ্মীর শৈবাদ্বৈতবাদই ত্রিকবাদ—ত্রিকদর্শন একাধারে সাহিত্য ও দর্শন, মালিনীবিজয়বার্ত্তিক, তন্ত্রসার প্রভৃতি—কামাখ্যায় শাক্ততন্ত্র রচনা—কৌলমতের মুখ্যস্থান কামাখ্যা—বীরশৈব সিদ্ধান্ত মত—জীব ও শিব বস্তুতঃ অভেদ—শৈবসিদ্ধান্ত মত—শিব, শক্তি ও বিন্দু রত্নত্রয়—শিবের সংজ্ঞা 'পতি'—তিনি পঞ্চকৃত্যকারী (সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, অনুগ্রহ ও নিগ্রহ শিবের পঞ্চকৃত্য)—ত্রিকবাদে শিবেরই পশুভাব গ্রহণ—মোক্ষকথা—প্রত্যভিজ্ঞাই মোক্ষ—অর্থাৎ স্ব স্ব রূপের উপলব্ধি—পরমেশ্বরের নিরপেক্ষ শক্তিপাত—ত্রিকমতে শিবের ইচ্ছায় জগতের সৃষ্টি—নাথ মতে শক্তির ক্রিয়াশীল অবস্থায় জগতের উদ্ভব—শক্তিযুক্ত শিবই 'সকল' পরমেশ্বর—শক্তির তিনটি রূপ—শৈবসিদ্ধান্ত মতের শিব, শক্তি ও বিন্দুর সহিত নাথদর্শনের অনেকাংশে মিল—বিন্দু হইতে নাদ তথা জগৎ সৃষ্টি—শিবশক্তির জগৎ সৃষ্টির ইচ্ছাই বিন্দু—শিবশক্তির সঙ্গমে পরমপদ প্রাপ্তি—ইহাই নাথসিদ্ধদের লক্ষ্য।

সিদ্ধান্ত অংশ

প্রথম পরিচ্ছেদ (পৃঃ ১৯৯-২১২)

পরমপদ বা পূর্ণসত্যের স্বরূপ, সামরস্য

নাথগণের চরমলক্ষ্য পরমপদ প্রাপ্তি সর্ব্বতত্ত্বের ঊর্দ্ধস্থ পরমতত্ত্ব—কার্য্যকারণ কর্ত্তৃত্বহীন ও সর্ব্বকারণের কারণ—পরমপদ গতাগতিহীন, সামরস্যাত্মক, সর্ব্বানন্দময়, স্বরূপস্থিতি তুরীয়াতীত শান্তিনিলয়, সাত্মজাগর অবস্থা—মনবুদ্ধির অতীত পরমপদ স্বসংবেদ্য, একাধারে বিশ্বরূপ ও বিশ্বোত্তীর্ণ আনন্দঘন অভয়পদ—নাথস্বরূপে অবস্থানই মুক্তি, উহাই পরমপদ—নাথস্বরূপ দ্বৈতাদ্বৈত উপরোবর্ত্তী—সামরস্যই মোক্ষ, যথায় বিশুদ্ধ আত্মার উপলব্ধি ও অনাত্ম ভাবের প্রশান্তি স্বপিণ্ডলীন ও চরাচরের অঙ্গীকার—পাপপুণ্যহীন বিগতক্লেশ সাম্যাবস্থা, তাদাত্ম্যে ভেদবিরহ অখণ্ড একবোধ, শিবভাবই সামরস্যের ভূমি, যুগপৎ বিশ্বাতীত ও বিশ্বরূপই পূর্ণ সত্যের স্বরূপ—জ্ঞানে বহু ভেদময় সংকীর্ণ ভাবের সমাবেশ বশতঃ পূর্ণত্বের অভাব—অভিন্নত্বই পূর্ণত্ব, ভেদবিরহই সামরস্য—পরমপদই সহজাবস্থা সামরস্যের ভূমি কুলাকুলের প্রতিষ্ঠা—পূর্ণসত্যের লক্ষণ, সর্ব্ব-বিলক্ষণ—পূর্ণসত্য 'নাথ' নির্গুণ সগুণের ঐক্যভূমি—ক্রিয়া ও অক্রিয়া উভয়ই যাহাতে স্থিত তাহাই পূর্ণসত্য—সকল নিষ্কল মিলিয়াই পূর্ণ—অপরোক্ষ পরমপদলাভে গুরুকৃপা ও পুরুষকারের প্রয়োজন—পরমপদ লাভের সাধন 'জ্ঞান' ও 'যোগ' উভয় উপায়ে—সংকল্প ত্যাগ ও পরমাত্মার স্বরূপদর্শনে মুক্তি, ইহা যোগসাধ্য—যোগাগ্নি দ্বারা অপক্বদেহের

দহন ও পক্কদেহ লাভ—পবনজয়ে চিত্তজয় ও দোষহীন চিত্তে সাত্মপ্রকাশ—চতুর্বিধ জ্ঞানাবস্থা—তল্লাভে পরমপদে স্থিতি, চাঞ্চল্যের মূল সংকল্পের নিরোধে নৈরুত্থ্য—নিরুত্থান ও সামরস্যের মধ্যে সূক্ষ্ম ভেদ—নৈরুত্থ্য মাত্র পরমপদ নহে, নিজাশক্তির আশ্রয়ে যুগপৎ বিশ্বময় ও বিশ্বোত্তীর্ণ ভাবই পরমপদ—কেবলীপুরুষের পরমপদে স্থিতি—কুণ্ডলিনীর প্রবোধে ও সর্ব্ব কর্ম্মত্যাগে সহজাবস্থা—ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণের সংযমনসহ প্রণব উচ্চারণ ও ভগবানকে স্মরণপূর্ব্বক পরমগতিলাভ অন্তরঙ্গ সাধন—পরমবৈরাগ্য দ্বারা বুদ্ধি উপরস্ত হইলে স্বরূপে অবস্থান তাহাই সহজাবস্থা—নৈরুত্থ্যের স্বরূপ—আশয়ের প্রলয় হইতে নিষ্কম্পতা, তাহা হইতে নিজাবেশ, তৎ প্রতিষ্ঠাই নৈরুত্থ্য, পরমপদে নিজপিণ্ডবিত্তি ও স্বরূপানন্দের উন্মেষ, উন্মেষ প্রত্যাহরণই সামরস্যের রহস্য—বিশ্বোত্তীর্ণ বিশ্বের অস্বীকার সামরস্যের চরমস্তর—সামরস্যে বা পরমপদে বিশ্ব ও বিশ্বাতীতের এক অখণ্ডবোধ, সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি কল্পনা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছে (পৃঃ ১১৫-২২১)

পিণ্ডতত্ত্ব

সত্যবিচারে উৎপত্তি নাই—ব্যবহার দৃষ্টিতে উৎপত্তি আলোচ্য—ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তির পরেও পরব্রহ্ম পূর্ণস্বরূপ—অনামা পরব্রহ্ম স্বরূপতঃ কার্য্যকারণ কর্তৃত্বহীন—অব্যক্তের নিজাপরাদি পঞ্চশক্তি ও তাহাদের প্রত্যেকের পঞ্চগুণ, নিজাদির পঞ্চবিংশতি গুণাশ্রয়ে পরপিণ্ড, অনাদিপিণ্ড পঞ্চতত্ত্বযুক্ত, আদ্যপিণ্ড ও তাহার পঞ্চতত্ত্ব, সাকার ও মহাসাকার পিণ্ড, মহাসাকারই শিব, শিবের অষ্টমূর্ত্তি জীবের পঞ্চ অন্তঃকরণ, অকুল ও কুল, কুলপঞ্চক—সত্ত্বরজতমকাল ও জীব—জীবের পঞ্চগুণ, ব্যক্তিপঞ্চক, প্রত্যক্ষকরণ পঞ্চক, কলা চন্দ্রের ১৬, সূর্য্যের ১২, অগ্নির ১০, তদতিরিক্ত অমৃত, প্রকাশিকা ও পরাজ্যোতি কলা—গর্ভপিণ্ড, অনুলোম ও বিলোম ক্রমে পরমেশ্বর ও মনুষ্য ভ্রূণের সম্বন্ধ, সন্তমতে ষট্‌পিণ্ডের উদ্ভব—জীবের মুক্তি প্রয়োজন, মুক্তির নিমিত্ত সাধন—জীবের স্বরূপ নিরূপণে ষট্‌পিণ্ডের আবির্ভাবের চিত্র।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ (পৃঃ ২২২—২২৭)

পিণ্ডাধার

পিণ্ডশব্দের অর্থ—পিণ্ড সকল উৎপন্ন, শক্তির প্রসার ও সংকোচই সৃষ্টি ও সংহার, শক্তিমান শিব জগদাকারে স্ফুরিত, শিব ও শক্তি চন্দ্র চন্দ্রিকার ন্যায়—শক্তি নিখিলপিণ্ডের আশ্রয়, তন্তু যেমন সূত্ররূপে বস্ত্রের আশ্রয়, অতএব শক্তির নাম পিণ্ডাধার, শক্তির ত্রিবিধ অবস্থা—১। শিবস্বরূপ, ২। আধারশক্তি, ৩। চিদ্রূপা। শিবভাব সামরস্যের ভূমি কুলাকুল স্বরূপ, কুল ও অকুল শক্তি—বিমর্শ পরাসত্তাদি পঞ্চকুলশক্তি—শক্তির প্রসরে শিবের স্বরূপচ্যুতি ঘটে না, কারণ বিসর্গ ব্যবহারিক পারমার্থিক নহে, আধারশক্তি কুণ্ডলিনী, প্রবুদ্ধ ও অপ্রবুদ্ধরূপা কুণ্ডলিনীর

উর্দ্ধগমনই জাগরণ, তখন প্রপঞ্চনিরস্ত—আধারশক্তি মূলশক্তি, নবচক্রশক্তি তদধীনা—উর্দ্ধ, মধ্য ও অধঃ শক্তি, মধ্যশক্তির স্থূল ও সূক্ষ্মভেদ—ক্রিয়াভেদে ত্রিশক্তির ত্রিবিধ আখ্যা—উর্দ্ধশক্তির নিপাতনে পরমপদ প্রাপ্তি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ (পৃঃ ২২৮—২৩২)

শিবশক্তির পরস্পর সম্বন্ধ বিচার

জগৎ প্রপঞ্চের পরমকারণরূপ শিব—তিনি স্বয়ংসিদ্ধ—শিবের কারণতাই তাঁহার শক্তি—শিবশক্তি নিত্যযুক্ত ও অভিন্ন, তথাপি এই পরমতত্ত্ব দৃষ্টিভেদে শিব বা শক্তি, শক্তির প্রসর ও সঙ্কোচ, বহিঃপ্রকাশই শক্তির কার্য্য—বিকাশ ও উন্মেষ—শিবের নিগ্রহ ও অনুগ্রহ, শক্তি প্রসর সঙ্কোচাত্মক, শিব উহার উপরমাত্মক—শিব নিরাভাস ও শক্তি আভাসস্বরূপা—একরস সদ্‌বস্তু, পরমশিবের দ্বৈরূপ্য—সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয়—শিবস্বরূপ ও শক্তির পঞ্চভাব, বিমর্শই শিবের শক্তি—অনামা পরমব্রহ্ম ও পরাইচ্ছাদি পঞ্চশক্তি—কুণ্ডলিনীশক্তি। শক্তির নিগ্রহ ও অনুগ্রহ, বহির্ম্মুখ ও অন্তর্ম্মুখ ক্রিয়া নিষেধব্যাপাররূপা শক্তি ও অলুপ্তশক্তিমান শিব, শক্তি দ্বারা বাচ্য-বাচকত্বের উপরম—শিব ও শক্তি ভাবের তুলনা—শিবাভিন্ন শক্তি, সৃষ্টির অপেক্ষায় শক্তির প্রসার ও সঙ্কোচ, শক্তি শিবের আগন্তুক ধর্ম্ম নহে, স্বনিষ্ঠস্বরূপ যোগ্যতা। নিরুত্থান দশা শিব, উত্থিত দশা শক্তি—শক্তির স্থূলসূক্ষ্ম কারণভাব, প্রমাতা, প্রমেয়, প্রমাণরূপা শক্তি, পরা, পরাপরা ও অপরাভাব চিতিশক্তির ত্রিবিধরূপ, চিৎ, মায়া ও জীবশক্তি ; ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া শক্তি অন্তরঙ্গ, বহিরঙ্গ ও তটস্থ শক্তি এবং শক্তি ও শক্তিমানের তাদাত্ম্যসম্বন্ধ—শক্তির তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন নাম—রাধাস্বামীতত্ত্ব। পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব বা ষটত্রিংশতিতত্ত্ব—শিবতত্ত্ব—স্বতন্ত্র তত্ত্বরূপে খ্যাত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ (পৃঃ ২৩৩—২৪৯)

সৃষ্টি ও সংহার—পিণ্ড উৎপত্তি বিচার

সৃষ্টি ও সংহার—ব্যক্ত ও অব্যক্তভাব—বুদ্ধ ও অবুদ্ধ ভাব—শক্তির প্রসর ও সঙ্কোচ—সৃষ্টি ও সংহার—সৃষ্ট জগতের সাকার নিরাকার ভেদ—ষট্‌পিণ্ড—গোরক্ষমতে সৃষ্টির পূর্ব্বাপর ক্রম—ব্রহ্মার দৃষ্টি হইতে প্রাকৃতপিণ্ড—পরমতত্ত্ব বিশ্বময় হইয়া বিশ্বোত্তীর্ণ—শক্তির প্রসরের ক্রম ও ভেদ—সৃষ্টিহেতু পরতত্ত্বের পূর্ণতা খণ্ডিত হয় না। পরাপিণ্ডের অপরম্পরাদি পঞ্চভাবের আবির্ভাব—স্বপ্রকাশ ও বিমর্শভাব। শক্তির ক্রমোন্মেষেই সৃষ্টির আরম্ভ—আদ্যপিণ্ড হইতে সাকার সৃষ্টি—কুলপঞ্চক—সৃষ্টি ও সংহারের স্বরূপ—বিসর্গশক্তি—ইহা বিশ্বসৃষ্টির কারণ—নাদ ও বিন্দুরূপ সৃষ্টি, শব্দসৃষ্টি—এক হইতে বহু সৃষ্টি—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিরূপ বিগ্রহ—নাথ সম্প্রদায়ে প্রচলিত বঙ্গ-সাহিত্যে সৃষ্টিপত্তন বর্ণনা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ (পৃঃ ২৫০—২৬৬)

জীব, ঈশ্বর ও জগৎ

শক্তি ও শক্তিমান অহম্ মমেতিবৎ—শিবই জীব—নাম ও রূপদ্বারা ব্যক্ত জগৎ—ব্যক্ত জগতের উপাদান কারণ শ্রুতিতে মায়াশক্তি—প্রকৃষ্টরূপে বা মুখ্যস্বরূপে জগতের কর্ত্রীই প্রকৃতি—'জীব' শব্দ মনুষ্যজীব অর্থে ব্যবহৃত—জীবের 'পাশ' ও তাহা হইতে মুক্তি—জীবের জন্ম—জীবের ত্রিবিধ দেহ ধারণ—একজীববাদ ও অনন্তজীববাদ—ঈশ্বরের সংজ্ঞা নিরূপণ চেষ্টা—বেদান্তে ও তন্ত্রে—শক্তির অন্তর্লীন অবস্থায় শিব শববৎ—ঈশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা—কৈবল্যের উর্দ্ধে শিবকে লাভ করিবার অবস্থা—বিম্ব ও প্রতিবিম্ব, সাধনবলে 'মায়া'কে দূর করা যায়—কিন্তু 'শক্তি'কে দূর করা যায় না—শিবের অষ্টমূর্ত্তি—শঙ্করপরবর্ত্তী যুগে ঈশ্বরতত্ত্ব—জীব, ব্রহ্ম ও ঈশ্বরে ভেদ—নাথস্বরূপ—শিব, শক্তি, কাল ও নাথ—দ্বৈত ও অদ্বৈত মতে ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ব্বাচন, 'ব্রহ্ম' ও 'নাথে' ভেদ—শিব-শক্তি অভেদ—উপনিষদে ঈশ্বরলক্ষণ এবং সিদ্ধাসিদ্ধান্তসংগ্রহে পরমেশ্বরের লক্ষণভেদ—'ব্রহ্মযোনি' বা ঈশ্বর জগৎসৃষ্টির কারণস্বরূপ—জগৎ ও আত্মা ভোগ্য ও ভোক্তা স্বরূপ—মায়া কামধেনু, জীব ও ঈশ্বর তাহার বৎস স্বরূপ—জীবে ঈশ্বরে ভেদাভেদ—বেদান্তমতে মায়ার উচ্ছেদে মোক্ষ—শক্তি দর্শনে উহা হইতে পৃথক্ কল্পনা—জীব চৈতন্য স্বরূপ—জীবের স্থূল সূক্ষ্ম কারণ শরীর—ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভেদে জীব ও ঈশ্বর—শঙ্কর মতে জগৎ মিথ্যা—শশশৃঙ্গের ন্যায় অলীক নহে—উহার ব্যবহারিক সত্তা আছে—সপ্তদশ অবয়ব বিশিষ্ট জীব—স্থূল ভূতের পঞ্চীকরণ—শিব জীব হন ও জীব পুনরায় শিব হন—শরীরাভিমানে জীবত্ব—সমনস্ক ও অমনস্ক জীব—ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার—সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মে ভেদ—'গোরক্ষমতে' বিশ্বের উৎপত্তি—মৎস্যেন্দ্রনাথের 'নিরঞ্জন'—সৃষ্টি সংহার ও জীব কল্পনা—তন্ত্রের বিন্দু ও বিসর্গ রহস্য—বৈষ্ণবতন্ত্রে নারায়ণ ও তাঁহার শক্তি—তত্ত্বমসি ব্যাখ্যা—অহম্ রূপে বাচ্যবাচক সম্বন্ধ—চন্দ্র চন্দ্রিকার ন্যায়—নিরাকার হইতে ইচ্ছাশক্তির জন্ম—যোগমায়ার জন্ম—মহামায়া ও মায়ায় সম্বন্ধ—দ্বৈত অদ্বৈতবাদ ও সিদ্ধমতে পুরুষ প্রকৃতি ভেদ বর্ণনা—বিবর্ত্ত ও আভাসবাদ—বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ—নাথমতে বিশ্বের উদ্ভব ও শিবশক্তির সম্বন্ধ—বৌদ্ধমতে শূন্য হইতে জগতের উৎপত্তি কল্পনা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ (পৃঃ ২৬৭—২৯১)

দ্বৈত ও অদ্বৈত মত হইতে সিদ্ধমতের বৈশিষ্ট্য (পৃ ২৬৭—২৮০)

বেদান্ত ও আগমে সাধনার আদর্শ বা লক্ষ্য এক—বেদান্তে অদ্বৈতবাদ, আগমে দ্বৈত, অদ্বৈত ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদ—শক্তি উপাসনা—ভারতে ষষ্ঠ শতাব্দীতে শক্তিপূজা উত্তমরূপে প্রতিষ্ঠিত—বাণের চণ্ডীশতক—শ্রুতিতে শক্তিপূজা—শক্তি ও কারণব্রহ্ম বস্তুতঃ অভেদ—অদ্বৈতাগমে শিব ও শক্তি অভিন্ন—মহাশক্তি তত্ত্বাতীত হইয়াও সর্ব্ব-

তত্ত্বাত্মক—সিদ্ধমতে পরমতত্ত্ব দ্বৈত ও অদ্বৈত বিবর্জ্জিত—দ্বৈত ও অদ্বৈত উভয়ই পরমসত্যের একাংশ—নাথমতের বৈশিষ্ট্য—সিদ্ধমতে যোগ ও ভোগের বৈশিষ্ট্য—অবধূত প্রারব্ধ কর্ম্ম নির্ম্মূল করিতে সক্ষম—গীতায় নিষ্কাম কর্ম্মের উপদেশ—বেদান্তীর জ্ঞান ও কর্ম্ম পরস্পরসাপেক্ষ—দ্বৈতাদ্বৈত বিলক্ষণ পদে অবস্থানে মুক্তি—ব্রহ্ম সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয়—নির্গুণ 'ব্রহ্ম' ও 'নাথ' স্বরূপে ভেদ—নাথস্বরূপ যাদৃশ এব তাদৃশ এব—সিদ্ধমতে ত্যাগ ও ভোগের সামরস্য কর্ত্তব্য—ওঁকার সাধনে কুণ্ডলিনীর জাগরণ—কায়সাধন - মহাসিদ্ধদের দণ্ড, উপবীত, শিখাদির বৈশিষ্ট্য—নাথ বিশ্বোত্তীর্ণ ও যোগদ্বারা লভ্য—যোগমার্গ শ্রেষ্ঠমার্গ—হঠযোগের বর্ণনা—মৎস্যেন্দ্র গোরক্ষ জালন্ধর আদির নামে আসন, বন্ধ ইত্যাদি—বায়ুজয় দ্বারা রাজযোগে উপনীত হওয়া সিদ্ধমতের বৈশিষ্ট্য—নাথমতে আসন, নাদ প্রভৃতি সাধনের ফল—কুণ্ডলিনীর প্রবোধন ও সহস্রারে স্থিতি—আত্মার আচ্ছাদনস্বরূপ মন ও ভূত—শিবের দিব্যচক্ষু লাভের সাধন বা দিব্যদর্শন—নাথমতে নদীর সাগরে নীত হইবার ন্যায় মানবের পরমসত্তাকে উপলব্ধি—জড়পদার্থ শিব ও শক্তিতে ভেদ উৎপন্ন করে—বৌদ্ধ ও হিন্দুতন্ত্রে শিব-শক্তির মিলন আদর্শ—সাধকের প্রকৃতিলীন অবস্থা—'সন্ধিক্ষণে' স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্তি—সিদ্ধমতে এই নিমিত্ত ইড়াপিঙ্গলার বশীকরণ—কুণ্ডলিনীর জাগরণ, মধ্যনাড়ীর পথ উন্মুক্ত ইত্যাদি একই কথা—শ্রুতিতে মধ্যনাড়ী বা সুষুম্নার কথা—সিদ্ধমতে যোগ ও জ্ঞানের সম্বন্ধ—নাথমতে পক্ক ও অপক্কদেহ—অন্যান্য মার্গে মুক্তি চরমলক্ষ্য কিন্তু সিদ্ধমার্গে মুক্তিসহ সিদ্ধি লক্ষ্য—কৌলজ্ঞাননির্ণয়ে সিদ্ধিলাভের কথা দূরদর্শন পরকায় প্রবেশ আদি সিদ্ধি - যোগীদের খেচরীমুদ্রা সাধন—দশদ্বার কথা—গোরক্ষমতে 'শব্দব্রহ্ম' সাধন—নিরঞ্জনের জ্ঞানে 'মুক্তি—বৃত্তি, প্রাণ ও বীর্য্যজয়ে গোরক্ষমতে বৈশিষ্ট্য—অর্দ্ধনারীশ্বর পুরুষবাক্—দ্বৈত হইতে অদ্বৈত, তৎপরে দ্বৈতাদ্বৈত-বিবর্জ্জিত সত্তার উপলব্ধি সিদ্ধমতের বৈশিষ্ট্য।

ত্যাগ ও ভোগের সামরস্য (পৃ ২৮০—২৮৩)

ত্যাগ ও ভোগের রহস্যভেদ—অবধূত পক্ষে ভোগ বাধকস্বরূপ নহে—গৃহস্থের ত্যাগ ও ভোগ, ভোগের পরে ত্যাগের পন্থাগ্রহণ—যোগিপক্ষে প্রারব্ধের জয়—ভারতীয় আদর্শানুযায়ী ত্যাগে মুক্তি, ভোগে বন্ধন—কিন্তু উপনিষদে সামরস্য আদর্শ—ভোগাসক্ত না হইলে ভোগ বর্জ্জনীয় নহে—বৌদ্ধ ও আর্হতদর্শনে ত্যাগমার্গ—ত্রিকদর্শনে ভোগ ও মোক্ষের সামরস্যে জীবমুক্তি—বৌদ্ধ সহজিয়ার 'মহাসুখ' উপলব্ধিতে ভব ও নির্ব্বাণ উভয় সিদ্ধি।

পরমহংস ও অবধূত (পৃ ২৮৩—২৮৫)

অবধূতই নাথমার্গের আদর্শ—নাথমতে পরমহংস ও অবধূত বিচার—সিদ্ধমতে পরমহংস কেবল ত্যাগী, অবধূতের ত্যাগ ও ভোগ উভয়ই করায়ত্ত—বেদান্তমতে

পরমহংস শ্রেষ্ঠ—অতএব বিভিন্ন মার্গে বিভিন্ন আদর্শ, ইহা দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব বিচার অকর্ত্তব্য ।

বন্ধন ও মোক্ষ (পৃ ২৮৫—২৯১)

নাথমতে ব্রহ্ম পক্ষপাতবিনির্মুক্ত—বর্ণাশ্রমত্যাগে মুক্তি—নাথস্বরূপে অবস্থানে মুক্তি—সবিষয় ও নির্বিষয় মন বন্ধন ও মোক্ষের কারণ—চিত্ত ও অচিত্তে সমতাপন্ন ব্যক্তি মুক্ত—সদ্যোমুক্তি ক্রমমুক্তি বিহঙ্গমমার্গ ও পিপীলিকামার্গ-যোগবীজে মর্কটক্রম ও কাকমত—সিদ্ধযোগী বন্ধমোক্ষহীন—সিদ্ধযোগী ভাবাভাবমুক্ত অর্থাৎ প্রাণ ও অপানের যোগ জানেন—মোক্ষলাভার্থে 'জ্ঞানযুক্ত যোগ' আবশ্যক—কুলের বা শক্তির উর্দ্ধগমনে মোক্ষ—বেদান্তমতে অধ্যাস দূর হইলে মুক্তি—সাংখ্যমতে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিতে মোক্ষ—শক্তিতত্ত্বে মোক্ষের আদর্শ এবং বন্ধ ও মোক্ষের বৈলক্ষণ্য—কুণ্ডলিনীর জাগরণ ভিন্ন পরমাত্মায় স্থিতিলাভ অসম্ভব—পূর্ণজাগরণে অদ্বৈত জ্ঞান বা 'পূর্ণহন্তা'—'স্রোতাপন্ন' বা কুণ্ডলিনীর প্রবোধন একই কথা—কুণ্ডলিনীর পূর্ণ চৈতন্যে মেরুপথে সহস্রারে গমন—সাধনদ্বারা তত্ত্বাতীত অবস্থা লাভ—কৈবল্যসিদ্ধি অথবা জীবোদ্ধার নিমিত্ত নির্ম্মাণকায় গ্রহণ—নাথাবস্থায় অবস্থিতি হইলে মগ্নোত্থানবৎ পুনরুত্থান হয় না—সাংখ্যের কার্য্যেশ্বরত্ব ও তটস্থ অবস্থা—তন্ত্রমতে সাম্যভাবে স্থিতি বা ব্রাহ্মী স্থিতি।

অষ্টম পরিচ্ছেদ (পৃ ২৯২—৩০৭)

জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি, অপরা ও পরা মুক্তি

মুক্তি দ্বিপ্রকার—জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি—উহাদের ভেদবর্ণন—বেদান্তীর জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি—নাথমতে জীবন্মুক্তি আদর্শ—সিদ্ধদেহলাভে মুক্তি রক্ষা—সন্তমতেও স্থূলদেহে মুক্তিলাভ আদর্শ—জীবন্মুক্ত যোগীর পিণ্ডপাত হয় না যোগীর ইচ্ছামৃত্যু-জীবের অজ্ঞানের স্বরূপ মনোনাশ, বাসনাক্ষয় ও তত্ত্বজ্ঞান—পক্কদেহ প্রারব্ধের অধীন নহে যোগদ্বারা প্রারব্ধের ক্ষয়—বেদান্তী জ্ঞানমার্গী অর্থাৎ জ্ঞানদ্বারা জীবন্মুক্তি লক্ষ্য-সাংখ্য ও গীতাতে জীবন্মুক্তির আদর্শ—শ্রুতিতে জীবন্মুক্তি—শ্রুতিতে বিদেহমুক্তির আদর্শ—নবদ্বার রুদ্ধকরণে বিদেহমুক্তি—সাংখ্য প্রভৃতির আদর্শ ইহা হইতে ভিন্ন—নাথমতে যোগীর আদর্শ—দেহনাশে বিদেহ বা অদেশ মুক্তি-শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপের জ্ঞান ও তাহাতে স্থিতি যথাক্রমে জীবন্মুক্তি ও বিদেহ-মুক্তিরূপে পরিচিত-জীবন্মুক্তের বিভিন্ন ভূমি—নির্ব্বিকার যোগী জীবন্মুক্ত—কায়িক ও মানসিক কর্ম্মত্যাগই জীবন্মুক্তি—সিদ্ধমতে বিদেহমুক্তি নাই, কায়ব্যূহ রচনা দ্বারা প্রারব্ধ ক্ষয়—বেদান্তীর প্রারব্ধ ক্ষয়ে বিদেহমুক্তি—শুদ্ধমার্গের দিব্যদেহ, যোগদেহ ও ভাবদেহ—রামানুজমতে ভগবানের কৈঙ্কর্য্যই পরমমুক্তি—রামানুজ নিম্বার্ক জীবন্মুক্তি স্বীকার করেন না, বিদেহমুক্তি স্বীকার করেন—সাংখ্যমতে বিবেকজ্ঞানে জীবন্মুক্তি—

শরীরনাশে দুঃখ হইতে মুক্তিই বিদেহমুক্তি—বিদেহমুক্তদের প্রকারভেদ—প্রকৃতিলীন ও বিদেহলীনদের মোক্ষ—বৌদ্ধ ও জৈনদর্শনে জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তির ভেদবর্ণন—ত্রিকদর্শনে জীবন্মুক্তির স্বরূপ বিচার—বায়ুনিরোধে জগৎ মিথ্যারূপে প্রতিভাত হয়—জ্ঞানের উন্মেষে ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহার—চিত্তলয় ও বিবেকখ্যাতির দ্বারা যোগীর জীবন্মুক্তি—যোগীর চারি অবস্থা—নাথমতে 'উন্মনী' অবস্থা প্রাপ্তি আদর্শ—জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তিভেদে অপরা ও পরা মুক্তি—আগমসম্মত পরামুক্তিতে পুর্ণত্ব—মৎস্যেন্দ্রমতে দেহমুক্ত জীবই শিব—সালোক্যাদি প্রাপ্তি অপরামুক্তি এবং শিবত্বপ্রাপ্তি পরামুক্তি—পরামুক্তি পুনরাবর্ত্তনশূন্য—কালচক্রের আবর্ত্তন হইতে রক্ষা পাইবার উপায় – জন্ম ও দেহসিদ্ধি—মৃত্যুতে মুক্তি এ ধারণা ভ্রান্তিমাত্র—মানবের ত্রিবিধদেহ—প্রণবতনুলাভ ও জীবন্মুক্তি, জ্ঞানতনুলাভ ও পরামুক্তি—প্রণবতনু হইতে ক্রমশঃ জ্ঞানতনুলাভ—দেহশুদ্ধির বিভিন্ন প্রক্রিয়া—অজপাজাপ—রসের ব্যবহার ইত্যাদি—সিদ্ধদেহ বা মন্ত্রতনুই রূপান্তরিত দেহ—মতান্তরে মহাকারণ দেহ, বৈন্দব দেহ, শুদ্ধ দেহ ইত্যাদি সিদ্ধমার্গে মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে দেহসাধন প্রক্রিয়া প্রচলিত—চীনদেশের ভোগের দেহসিদ্ধি দাক্ষিণাত্যে প্রসিদ্ধ—সিদ্ধমতে মৃত্যু হইতে অব্যাহতি লাভই মুক্তি পদবাচ্য—কুণ্ডলিনীর প্রবোধনে মৃত্যুহীন সিদ্ধদেহলাভ।

নবম পরিচ্ছেদ (পৃ ৩০৮—৩০৯)

গুরু-পরম্পরায় নাদ ও বিন্দুসন্তান

নবনাথ কথা—বিভিন্ন গুরুবর্ণনা—শ্রীগোরক্ষনাথ ঈশ্বরসন্তান—বিন্দুসন্তান—পুত্র, নাদসন্তান—শিষ্য—সিদ্ধমতে শিষ্য বা নাদসন্তান পুত্রাপেক্ষা প্রিয়—নাদ হইতে নবনাথের জন্ম—বিন্দু হইতে সদাশিব ভৈরবের জন্ম—তন্ত্রমতে পরশিব আদিগুরু—শিষ্যরূপে তিনিই ঈশ্বর পদবাচ্য বা অপরশিব—ঈশ্বরের অনুগ্রহে মন্ত্র, মন্ত্রেশ্বরাদির জন্ম।

দশম পরিচ্ছেদ (পৃঃ ৩১০—৩১৯)

জরামৃত্যুর রহস্য এবং উহা হইতে অব্যাহতি লাভ

পাঞ্চভৌতিক দেহ জরামরণশীল—তথাপি এই দেহে অজরত্ব অমরত্ব সাধন—খেচরীমুদ্রা সাধন—রস বা পারদের ব্যবহার—বিভিন্ন মুদ্রাসাধনে কায়সিদ্ধি—কালজয় বন্ধত্রয়ের সাধন—অমৃতকলার স্রাব—অমৃতকলায় ষোড়শী শক্তি—জীবনের পুর্ণিমা ও অমাবস্যা—পঞ্চমহাভূতের পঞ্চদশগুণ—ষোড়শী নিত্যা বা মহাত্রিপুরাসুন্দরীর পুজা—এই ষোড়শীকলার সহিত নাথসিদ্ধদের সম্বন্ধ—কুণ্ডলিনীর জাগরণ—দেহমধ্যে সূর্য্য ও চন্দ্র বা পুরুষ ও প্রকৃতির প্রতীক—বিন্দুজয়, উন্মনী বা তুরীয় অবস্থা—উল্টামার্গে সাধন—মৃত্যুকালে দশমীদ্বার হইতে বহির্গমনের সাধন—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে দশমীদ্বারের উল্লেখ—ইন্দ্রিয় ও প্রাণের প্রত্যাহার—উর্দ্ধত্রিবেণী বা বারাণসী সঙ্গম—ব্রহ্মবিদ্যালাভে

জরামরণ জয়—ভোগবাসনাই মানবের জন্মের কারণ—লিঙ্গশরীরে ভোগ নিষ্পন্ন হয় না—তিব্বতে মুমূর্ষুর গতি নিয়ন্ত্রণে কৃত্রিম উপায় অবলম্বন—গীতায় মৃত্যুবিজ্ঞান—গীতায় মন ও প্রাণ নিরোধের উপায় বর্ণন—গীতায় অক্ষরব্রহ্মযোগ—নাথযোগীর সাধন—অজপা জাপ—বিন্দুজয়ে কায়সিদ্ধি—বৌদ্ধদের বজ্রকায়—রসেশ্বরের হরগৌরী তনু—সিদ্ধমার্গের দিব্যদেহ ও সিদ্ধদেহ—অশুদ্ধ সৃষ্টিতে অবস্থান্তরই জরা—শুদ্ধ অধ্বার মরণ বা তিরোভাব জাগতিক মরণের সদৃশ নহে—সিদ্ধমার্গে কল্পান্ত বা যুগান্তরূপ দীর্ঘস্থিতিতে অমরত্ব লাভ—কালের গতির উর্দ্ধে অজরত্ব লাভ ও জন্ম-মৃত্যু হইতে অব্যাহতি।

একাদশ পরিচ্ছেদ (পৃঃ ৩২০—৩৩৯)

দেহতত্ত্ব ও পিণ্ডসংবেদন

দেহতত্ত্ব কি? পিণ্ডসংবেদনের অর্থ—পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের সম্বন্ধ—বিশ্ব উৎপত্তি—জীবের আবির্ভাব—ভূতাকাশ হইতে পঞ্চমণ্ডল ও পঞ্চচক্রের উৎপত্তি নিম্নতম চক্রে স্থূল জগতের জীব—ষট্‌পিণ্ডের উৎপত্তি ও গর্ভপিণ্ডে জীবের আবির্ভাব—জীবের তিনটী আবরণ: বাসনা, কামনা ও অভিমান—জীবের ঈশ্বরতত্ত্বলাভের সাধনা—শ্রুতিতে জীবদেহের উৎপত্তি এবং 'হংস' মন্ত্র বর্ণন—ব্রাহ্মী স্থিতি ও কুণ্ডলিনীতত্ত্ব—ত্রিবিধ দেহ: স্থূল সূক্ষ্ম কারণ—নাথদের সিদ্ধদেহ আত্মা উপাধি ত্রয় হইতে ভিন্ন—লিঙ্গশরীরের উপাদান—সূক্ষ্ম শরীরের উপাদান—স্থূল শরীর বা ভোগায়তন দেহ—নাথমতে স্থূলশরীর মোক্ষের উপায়স্বরূপ—জীবের চৈতন্য ও ত্রিবিধ অবস্থায় উহার অবস্থিতি—নাথগণের উৎপত্তি বর্ণন—ব্রহ্মাণ্ড কি? ব্রহ্মাণ্ডে চতুর্দ্দশ ভুবন, পিণ্ডে চতুর্দ্দশ ভুবন কল্পনা—দেহমধ্যে নদনদী, দেবতাদির অবস্থান—ব্রহ্মাণ্ডে ও পিণ্ডে সমষ্টি ও ব্যষ্টি সম্বন্ধ—শিব ও শক্তির জীবদেহে অবস্থান বর্ণন—ব্যষ্টি ও সমষ্টির জ্ঞান আবশ্যক—কুণ্ডলিনীর উদ্বোধনে পিণ্ডসিদ্ধি—পাশ্চাত্যদেশে পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের কল্পনা—পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডে ষট্‌চক্রের অবস্থান—সন্তমতে মনুষ্যপিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডীমনের দেশ—মনুষ্যদেহে 'শ্রীচক্র'র রূপ কল্পনা—অস্মিতার তিনটী রূপ: মানস, প্রাণময় ও ভৌতিক শরীব—আত্মা ও অস্মিতার ভেদ-নাথগণের আত্মোপলব্ধি কাম্য সেই নিমিত্ত পিণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞান।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ (পৃঃ ৩৪০—৩৬১)

শূন্যতত্ত্ব

ভারতবর্ষে প্রাচীন যুগ হইতে শূন্যতত্ত্বের ধারণা প্রচলিত—শূন্যবাদ বৌদ্ধ ধর্ম্মের নিজস্ব কোন বাদ নহে—বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মে শূন্য কথা—নাথধর্ম্মে শূন্যতত্ত্ব—সহজাবস্থালাভে শূন্যসমাধি—বৌদ্ধ সহজিয়ামতে চারিশূন্য—হঠযোগ গ্রন্থে শূন্যলক্ষণ ও প্রকারভেদ বর্ণন—অমনস্কে শূন্য পর যোগী কথা—গীতায় তত্ত্বে লীন যোগী কথা—নাথমার্গে জলমধ্যে লবণের ন্যায় ব্রহ্মে লীন যোগীর কথা—বৌদ্ধ ও জৈনমার্গে ইহার

অনুরূপ কথা—শূন্যপদবী বা ব্রহ্মনাড়ী—বিশুদ্ধ শূন্য বা নির্ব্বাণ পদ—চতুর্থ শূন্য অদ্বৈতভূমি স্বরূপ—উপায় ও প্রজ্ঞা বা নাদ ও বিন্দুর মিলনে নির্ব্বাণপদলাভ বা চিত্তের শূন্যময় অবস্থা—নাথমার্গে পঞ্চব্যোমের সাধনই শূন্য সাধন—শূন্যমূর্ত্তি নিরঞ্জনের পূজা—নাথসম্প্রদায় হইতে নিরঞ্জনীদের উদ্ভব – বিভিন্ন সম্প্রদায় মধ্যে অন্তরঙ্গ সাধনে ঐক্য—শূন্যতত্ত্বের বিভিন্ন ধর্ম্মে প্রবেশ—শূন্য অর্থে বৃত্তাকার বা কুণ্ডলী—শূন্য বা ব্যাপিনী ওঁকারের মাত্রাংশ, ব্যাপিনী ও নিরাকার নাথে ভেদ বর্ণন—প্রণবের স্বরূপ—গোরক্ষ-বোধে শূন্যকথা—গোরক্ষ-বিকাশে মনের শূন্যরূপ কল্পনা—শূন্যতত্ত্ব উপলব্ধি গুরু-সাপেক্ষ—যোগীর লয় সাধনে শূন্যসাধন—যোগীর চিত্ত শূন্যময়—উন্মনী অবস্থাপ্রাপ্ত যোগী—দেহমধ্যে যেঁ শূন্য বা আকাশ আছে তাহাই উন্মনী অবস্থায় মনের আবাস—গোপীচন্দ্রের গীতে শূন্য কথা—হাড়িপার শূন্য হইতে বিশ্বের উদ্ভব কল্পনা—ধর্ম্মঠাকুর শূন্যমূর্ত্তি—বৌদ্ধ 'শূন্য' স্বয়ংজ্যোতি—বঙ্গদেশে ধর্ম্মপূজা শূন্যপূজার নামান্তর—ঋগ্বেদে শূন্যতত্ত্ব উপনিষদের নিরাকার 'ব্রহ্ম'—বৌদ্ধমতে পরমতত্ত্ব দৃশ্য ধর্ম্মের নিষেধবাচক শূন্য দ্বারা অভিহিত—নির্ব্বাণ লাভে চিত্তের যে অবস্থা হয় তাহাই শূন্য—শূন্যের স্বরূপ ব্যাখ্যা—শূন্যই 'বজ্র'—চিত্তের নির্ব্বাণ ও অব্যক্তে লীন হওয়া এক কথা—নির্ব্বাণ শূন্যোপম—মহাযান মতে শূন্যের বহু ভেদ ও শূন্যতত্ত্বের মূলকথা সাপেক্ষত্ব—বৌদ্ধ সহজিয়া দোহায় শূন্য কথা—অবিদ্যা দূর হইলে মহাশূন্যে স্থিতি হয় ত্রিরত্নের ধর্ম্ম শূন্য—অতএব একবার পুরুষ একবার প্রকৃতিরূপে বর্ণিত—মাধ্যমিক ও শূন্যবাদীর দুইদল—পরমার্থ সত্যই শূন্য—শূন্যতা ভাবনার উপদেশ—গোরক্ষনাথের যোগতত্ত্ব ও নিগুর্ণীদেরশূন্য বা সংএর সাধনা – রাধাস্বামী মতে শূন্য সত্যলোকের নিম্নে, শূন্য ও ভ্রমরগুহায় যথাক্রমে ব্রহ্ম ও পরব্রহ্মের অধিষ্ঠান—ব্রহ্ম জ্ঞানলাভে শূন্য উপলব্ধি—বঙ্গীয় গীতিকায় তাহার উল্লেখ—বৈদিক যুগ হইতে শূন্যতত্ত্বের বিভিন্ন রূপ—বৌদ্ধদের 'শূন্য', নাথদের 'নাথ', যোগের 'ঈশ্বর' ও পরমেশ্বরতত্ত্বে ভেদাভেদবর্ণন, নাথ-স্বরূপের বৈশিষ্ট্য।

সকল সাধনার মূলতত্ত্ব চিত্তকে বৃত্তিহীন করা;—নির্ব্বাণ, অমনস্ক প্রভৃতি বর্ণন—বৌদ্ধদের চারিটী শূন্য - পাতঞ্জল যোগমতে যোগীর চারিটী অবস্থা—হঠযোগের তিনটী শূন্য, নাথসিদ্ধদের পঞ্চব্যোম, ত্রিলক্ষ্যসাধন—মহাযান বৌদ্ধদের বিংশতি শূন্য—বৌদ্ধদের বীজমন্ত্র 'ওঁ শূন্যব্রহ্মণে নমঃ' – সকল সাধনতত্ত্বের মূলকথা এক, ইহাই নির্ব্বাণলাভ বা পরমপদে স্থিতি।

সাধনা অংশ

প্রথম পরিচ্ছেদ (পৃ ৩৬৫—৩৮৭)

গুরুতত্ত্ব ও সদ্গুরুর মহিমা

একমাত্র গুরুবাক্যে সিদ্ধিলাভ—সহজাবস্থালাভে গুরুর প্রয়োজনীয়তা—গুরুর স্বরূপ বর্ণনা—নাদবিন্দুকলাত্মনে—'নাথ', শিব ও গুরু অভেদ—বিভিন্ন গুরু

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ (৩৮৮—৩৯২)

যোগসাধনের উদ্দেশ্য

তৃতীয় পরিচ্ছেদ (পৃ ৩৯৩—৪০৩)

সহজাবস্থালাভ, যোগসাধন-প্রণালী

চতুর্থ পরিচ্ছেদ (পৃ ৪০৪—৪৫২)

যোগ ও জ্ঞানের পরস্পর সম্বন্ধ বিচার (৪০৪—৪১২)

ত্রিবিধ জ্ঞান—যোগী জ্ঞানকে আশ্রয় করেন–জ্ঞান ও অজ্ঞানে ভেদ—বিবেকী সদামুক্ত সংসারভ্রমবর্জ্জিত যোগ বিনা জ্ঞানে মুক্তি নাই, নাথমার্গে 'জ্ঞান' ও 'যোগে'র অবস্থা—'মহাজ্ঞান' লাভ—জ্ঞানী ও যোগীর মৃত্যুর সহিত সম্বন্ধ বিচার—যোগীর চারিপ্রকার ভেদ—মহাজ্ঞানের স্বরূপ বিচার—ময়নামতীর 'মহাজ্ঞান'—মহাজ্ঞানলাভের দুইটী প্রকারভেদ পক্কদেহে মহাজ্ঞানধারণ সম্ভব–যোগযুক্ত জ্ঞানই মহাজ্ঞান বা তারকজ্ঞান—জ্ঞানখড়্গ, যোগ যুদ্ধস্বরূপ–যোগের দ্বারাই জীবের মুক্তি—যোগাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মার্গ নাই।

যোগ ও যোগাঙ্গ (পৃ ৪১৩—৪৫২)

যোগের অর্থ—যোগের অষ্ট অঙ্গ বা গোরক্ষমতে ষট্ অঙ্গ—যম ও নিয়ম—আসন (সিদ্ধাসন ও পদ্মাসনে ভেদ)—গোরক্ষাসন, মৎস্যেন্দ্রাসন প্রভৃতি, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি বর্ণন, যোগীর সপ্তসাধন—যোগের চারিটী পথ :—'মন্ত্র' 'হঠ' 'লয়' ও 'রাজযোগ—এই বিভিন্ন পথের বর্ণন মন্ত্রযোগে মন্ত্রচৈতন্য -ষোড়শীকলা—জপাৎ সিদ্ধিঃ–হঠযোগের ষট্‌কর্ম্ম, মুদ্রা, বন্ধ, বেধ, সপ্তসাধন—মহামুদ্রা, মহাবন্ধ, মহাবেধ–মুদ্রাসাধনের ফল–খেচরী প্রভৃতি মুদ্রার রহস্য–সমাধি–হঠযোগ সাধনের ফলাফল—বজ্রোলী, সহজোলী ও অমরোলী মুদ্রার রহস্য—কুণ্ডলিনীতত্ত্ব—হঠযোগে সিদ্ধিলক্ষণ—লয়যোগে চিত্তলয় দ্বারা মোক্ষ—ষট্‌চক্র গোরক্ষমতে নবচক্র, ষোড়শাধার ত্রিলক্ষ্য, পঞ্চব্যোমসাধন—দশদ্বার কথা—দশমীদুয়ার বা শঙ্খিনীদ্বার–পীঠতত্ত্ব—কামরূপ, পূর্ণগিরি, জালন্ধর ও ওড্ডিয়ানপীঠ—রাজযোগ সর্ব্বযোগের রাজা—ইহাই পাতঞ্জল যোগের অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি—রাজযোগ সাধনের ষোড়শঅঙ্গ—রাজযোগে সিদ্ধিপ্রাপ্ত জীবন্মুক্ত যোগী—ইহাই যোগের চরমসীমা ও নাথগণের আদর্শ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হঠ ও রাজযোগের পরস্পর সম্বন্ধ বিচার—নাড়ীচক্র ও নাড়ীশুদ্ধি অজপাসাধন (পৃ ৪৫৩–৪৬২)

হঠযোগের অর্থ—রাজযোগ আরোহণের সোপানস্বরূপ—হঠ ও রাজযোগের সমন্বয় কর্ত্তব্য–যোগারম্ভের ফল–নাড়ীচক্র ও নাড়ীশুদ্ধি—বায়ুর সহিত দেহের সম্বন্ধ—অজপাগায়ত্রী–ইহা কুণ্ডলিনী হইতে সমুদ্ভূত নাড়ীশুদ্ধির লক্ষণ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নাদ ও নাদানুসন্ধান, নাদের অবস্থাচতুষ্টয় (পৃ ৪৬৩ ৪৬৯)

আকাশ সাম্যভাবে বর্ত্তমান, আকাশের গুণ শব্দ—উহাতে শক্তির আঘাতে কম্পনের ফলে নাদের উৎপত্তি—উহার বহির্ম্মুখী ও অন্তর্ম্মুখী ধারা—ছয়টী ধারা—ষট্‌চক্রভেদ—গুরুকৃপায় অনাহতধ্বনি শ্রবণ–নাদ মূলতঃ এক, কিন্তু বিভিন্ন সুর

বর্ণন—'স্ফোট'—বিভিন্ন প্রকার নাদ শ্রবণ—আরম্ভ, ঘট, পরিচয় ও নিষ্পত্তি অবস্থার বর্ণন—যোগীর নাদানুসন্ধান ও চিত্তলয়—রাজযোগ বা উন্মনী অবস্থা প্রাপ্তি—নাদানুসন্ধানের ফল জীবন্মুক্তি—মন্ত্রচৈতন্য—ষট্‌ত্রিংশ মণ্ডল—নাদরূপী আমিত্বের উপলব্ধি—হংসমন্ত্র জপ—সোঽহং দ্বারা আত্মদর্শন—নাদানুসন্ধান লয়সাধনের মুখ্যতম উপায়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ (পৃঃ ৪৭০—৪৮৬)

ওঁকারের স্বরূপ ও সাধন

সকম সম্প্রদায়ের মূলসাধন ওঁকার—সদ্‌গুরু ইহার পথপ্রদর্শক—ওঁকার সাধনে শিবত্বের বিকাশ বা শিবসাম্য, শ্রুতিতে প্রণব কথা—অ-উ-ম—ওঁকার সাধনে 'ত্রিরত্ন' উপলব্ধি—চিৎ, শক্তি ও বিন্দু দীক্ষাদ্বারা মল অপসারণ—জীবের অণুভাব—দ্বিবিধ অজ্ঞান—'হংস'পক্ষী—ওঁকারের দ্বাদশমাত্রা—ব্রহ্ম মাত্রারহিত—সিদ্ধমতে ওঁকারের মাত্রা—ওঁকার জপে মনোলয়—ইহাই 'হংসমন্ত্র' বা অজপাজাপ'—আদিনাথ স্বয়ং মীননাথকে অজপা গায়ত্রীর বর্ণনা করেন—শ্রুতিতে ও গীতাতে প্রণব প্রশংসা—এই একাক্ষর মন্ত্রেই মুক্তি—শব্দযোগ বা বাক্‌যোগ—শব্দযোগের পরিচয়—অন্তিম সীমানায় ওঁকাররূপ বথও পরিত্যাগ কর্ত্তব্য—প্রণবের অষ্ট অঙ্গ, চতুষ্পাদ—নাদ, বিন্দু, কলা প্রভৃতি মাত্রা—নাদবিন্দু যোগে বিশ্বসৃষ্টি।

অষ্টম পরিচ্ছেদ (পৃঃ ৪৮৭—৫১০)

নাদবিন্দু কলা

গুরু-নমস্কার, 'নাদবিন্দুকলাত্মনে'—পরমেশ্বর ও চিৎশক্তি—'সকল' ও 'নিষ্কল' শিব—চিৎশক্তির আসন, চিদাকাশ, মহামায়া, পরবিন্দু—পরবিন্দু হইতে জ্যোতি বা নাদ, ওঁকার—জ্যোতির বহিরঙ্গ মাযা বা শিবের আত্মাবরণ—প্রলয়কালে পক্কমলজীব—মন্ত্রেশ্বর ও মন্ত্র—উহাদের বৈন্দবদেহ কারণ বিন্দু জ্যোতির্ম্ময়—বিন্দুর প্রথম কম্পনে নাদের উৎপত্তি বা ওঁকার—স্ফোটবাদের ব্যাখ্যা—মানবমধ্যে অনাহত নাদ—নাদ হইতে কলা বা বর্ণের উৎপত্তি—বর্ণের ব্যাখ্যা, বর্ণসমষ্টি ময়ূর অণ্ডরসের ন্যায়—ষট্‌চক্র সাধন—পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা, বৈখরী অবস্থার বর্ণন—বিন্দুতে আঘাত ফলে পঞ্চস্তরের উৎপত্তি, নিবৃত্তি, প্রতিষ্ঠা, বিদ্যা, শান্তি ও শান্ত্যতীত কলা—কলার সহিত বর্ণ যুক্ত, যেরূপ বাক্যের সহিত অর্থ—'ষড়ধ্বা' ব্যাখ্যা—শব্দব্রহ্ম—চিৎ ও অচিৎ কলা—পরবিন্দু হইতে নাদবিন্দু ও বর্ণ—ব্যাপ্তি অবস্থায় যাহা নাদ, ঘনীভূত অবস্থায় তাহাই বিন্দু—শক্তির উদয় অথচ নাদের আবির্ভাব হয় নাই—তাহাই নির্ব্বাণ বা অমাকলা—ঈশ্বরতত্ত্ব বা শিবের তিন অবসর ও জগৎসৃষ্টি—জগতের লয় বা পরঃ শিবঃ অবস্থা—কামকলার বিচার—জীবদেহে কুণ্ডলিনীরূপ বিন্দু কামকলার দর্শন—শিবের পঞ্চবক্ত্র—এবম্‌কার—ঈশ্বরতত্ত্ব—'অহম্ ইদম্'-এর রহস্য—পরমেশ্বর হইতে শক্তি,

নবম পরিচ্ছেদ (পৃ ৫১১—৫৫২)

কায়সিদ্ধি

দশম পরিচ্ছেদ (পৃঃ ৫৫৩—৫৫৮)

অধিকার লাভ বা অবধূত বা সিদ্ধযোগীর লক্ষণ

মহাবিন্দু বা অমৃতকলা—বিন্দুশোধন—ঊর্দ্ধমুখী বিন্দু বা কুণ্ডলিনীর জাগরণে আত্ম-জ্ঞানের বিকাশ বা অধিকার লাভ—ব্রহ্মচর্য্যই প্রথম উপায় স্বরূপ—হঠ, মন্ত্র, রাজযোগ প্রভৃতি দ্বারা সত্যলাভ—কুণ্ডলিনীর জাগরণে সত্যে স্থিতিলাভ—নাথমার্গে ইহাকেই 'সহজাবস্থা' বলা হইয়াছে—ইহাই নিষ্কল বা দগ্ধবীজের ন্যায় অবস্থা—এইরূপ যোগী পক্ষে সকল লোকাচার নিষিদ্ধ—ঈশ্বর অকুল, তাঁহাকে লাভ করিতে হইলে বাহ্যাচরণ নিষিদ্ধ—পঞ্চমকারের আধ্যাত্মিক সাধনই লক্ষ্য—অন্যথায় নরকবাস—আচারত্যাগীই 'অবধূত'—তিনি ত্যাগ বা ভোগ দ্বারা অলিপ্ত—মুদ্রা, নাদ প্রভৃতি ধারণের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—অ-ব-ধূ-ত লক্ষণ—প্রারব্ধহীন, নূতনকর্ম্মফলহীন—অবধূত গুরুর কর্ত্তব্য, তিনি সর্ব্বাবস্থা-বিনির্মুক্ত, পঞ্চমাশ্রমী ও পূর্ণ অধিকারী।

একাদশ পরিচ্ছেদ (পৃঃ ৫৫৯—৫৬৭)

সিদ্ধি ও যোগপথে সিদ্ধির স্থান

সিদ্ধি এক প্রকার বিশেষ শক্তি ও মহাজ্ঞান দ্বারা লভ্য—ঈশ্বর সদামুক্ত হইয়াও ঐশ্বর্য্যযুক্ত—কেবলী যোগীর পক্ষে সিদ্ধি অন্তরায় স্বরূপ—অষ্টসিদ্ধি—ষট্‌অভিজ্ঞা—দশ-সিদ্ধি—২৪ ও ৩৬ সিদ্ধি বর্ণন—সিদ্ধিলাভ যোগীর পক্ষে অবশ্যম্ভাবী—যোগজ সাধন-ফলে মধুমতী ভূমিতে পদার্পণ—সাংখ্য ও তন্ত্রে ভেদ - তন্ত্রে শক্তিলাভের উপদেশ—যোগীর দৈহিক তেজ বৃদ্ধি—বিভিন্ন হঠযোগীর উল্লেখ—নানাবিধ সিদ্ধি প্রদর্শন—তাহা প্রকৃত সিদ্ধি নহে—শিবনেত্রের উন্মেষ—সুলতাদির আখ্যায়িকা—তিব্বতের সিদ্ধি বৃত্তান্ত—যোগ দ্বারা দূরদর্শন ইত্যাদি অসম্ভব নহে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ বা উপসংহার (পৃঃ ৫৬৮—৫৭৭)

পরমপদে পিণ্ডলয়—সমরসীকরণ

নাথপন্থে সামরস্য সাধন বৈশিষ্ট্য—সিদ্ধসম্প্রদায়ে দেহসিদ্ধি—পরমতত্ত্ব তত্ত্বাতীত—তিনি কালের দ্বারা অস্পৃষ্ট, নাম ও রূপহীন—শব্দ বা 'নাদ' দ্বারা তাঁহার সাক্ষাৎ-কার হয়—অগম লোকে পৌছাইবার উপায়—যোগী তাঁহার তত্ত্ব অবগত—বাসনা-ত্যাগে নির্গুণ সগুণের ঐক্যভূমিতে অবস্থান—নাথস্বরূপ বর্ণন—নিরুত্থান দশা ও পূর্ণ ব্রহ্মে স্থিতিতে ভেদ—যোগ ও জ্ঞানের সমন্বয় সাধনে পরমপদ লাভ—পক্ক ও অপক্ক দেহ—যোগদেহ লাভে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার—জীবের আবির্ভাব—জীবের মুক্তি—কুণ্ডলিনীর জাগরণ দ্বারা মুক্তি লভ্য—শিবাভিন্না শক্তি, তাই শিব-সামরস্য চাহিলে শক্তিসাধনা—বেদান্তে মায়াকে ত্যাগের উপদেশ, তন্ত্রে শক্তিকে লাভের সাধনা—দ্বৈতমধ্য দিয়া অদ্বৈতে উপনীত হইতে হয়—নাথসিদ্ধমতে পরমতত্ত্ব দ্বৈতাদ্বৈত বিবর্জ্জিত—ওঁকার সাধনে মুক্তি—হঠযোগ সাধন নাথ মধ্যে প্রচলিত—মুক্তি সহ সিদ্ধি লক্ষ্য—জীবদেহ মুক্তিলাভের অন্তরায় নহে—রসায়নী মহাবিদ্যা—ষট্‌কর্ম্মাদি সাধন—মীনমার্গে গমনের উপদেশ—বিন্দুজয়ের সাধন—বিন্দুক্ষয়ে কল্প বিনাশ—নাথযোগীর

আদর্শ ও সাধন—অমৃতাস্বাদন ও আত্মজ্যোতি দর্শন—অজপা সাধন—যোগীর চতুর্ব্বিধ অবস্থা—দেহসম্বন্ধে নাথসিদ্ধেরা মধ্যমমার্গী—ত্যাগ ও ভোগের সমন্বয়—বালযোগীর ধর্ম্ম সাধন কর্ত্তব্য—কুণ্ডলিনী জীবের উদ্ধারকর্ত্রী—দর্শন বা কুণ্ডলের মাহাত্ম্য—যোগীর সমরসীকরণ সিদ্ধি—নবদ্বার রুদ্ধ করণ—'গোরক্ষগোষ্ঠী'র বিচার—পরমপদের ব্যাখ্যা—নিজপিণ্ডের জ্ঞান—মুক্তি দ্বিপ্রকার, নাথগণের জীবন্মুক্তি আদর্শ—অবধূত আদর্শ যোগী ও গুরু—হঠযোগের অন্তে রাজযোগ—মুক্তির দুইটি মার্গ: বিহঙ্গম ও পিপীলিকা—একজন্মে পরমপদে পিণ্ডলয় বা সমরসীকরণ—কায়সিদ্ধির আবশ্যকতা—দেহতত্ত্ব ও পিণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞান—প্রাচীন সম্প্রদায় মধ্যে শূন্যতত্ত্বের ধারণা সাধারণ হইয়াও ভিন্নার্থক—যোগের প্রাধান্য এবং নাথসিদ্ধ মধ্যে জ্ঞান-যুক্ত যোগ বা 'মহাজ্ঞানের' প্রাধান্য—নাথযোগী ওঁকার সাধনের যথার্থ অধিকারী ছিলেন এবং পরমপদের সন্ধান পাইয়া তাহাতে স্থিতিলাভ করেন—নাথসিদ্ধদের ভারতব্যাপী খ্যাতি।

প্রথম ভাগ

ঐতিহাসিক অংশ
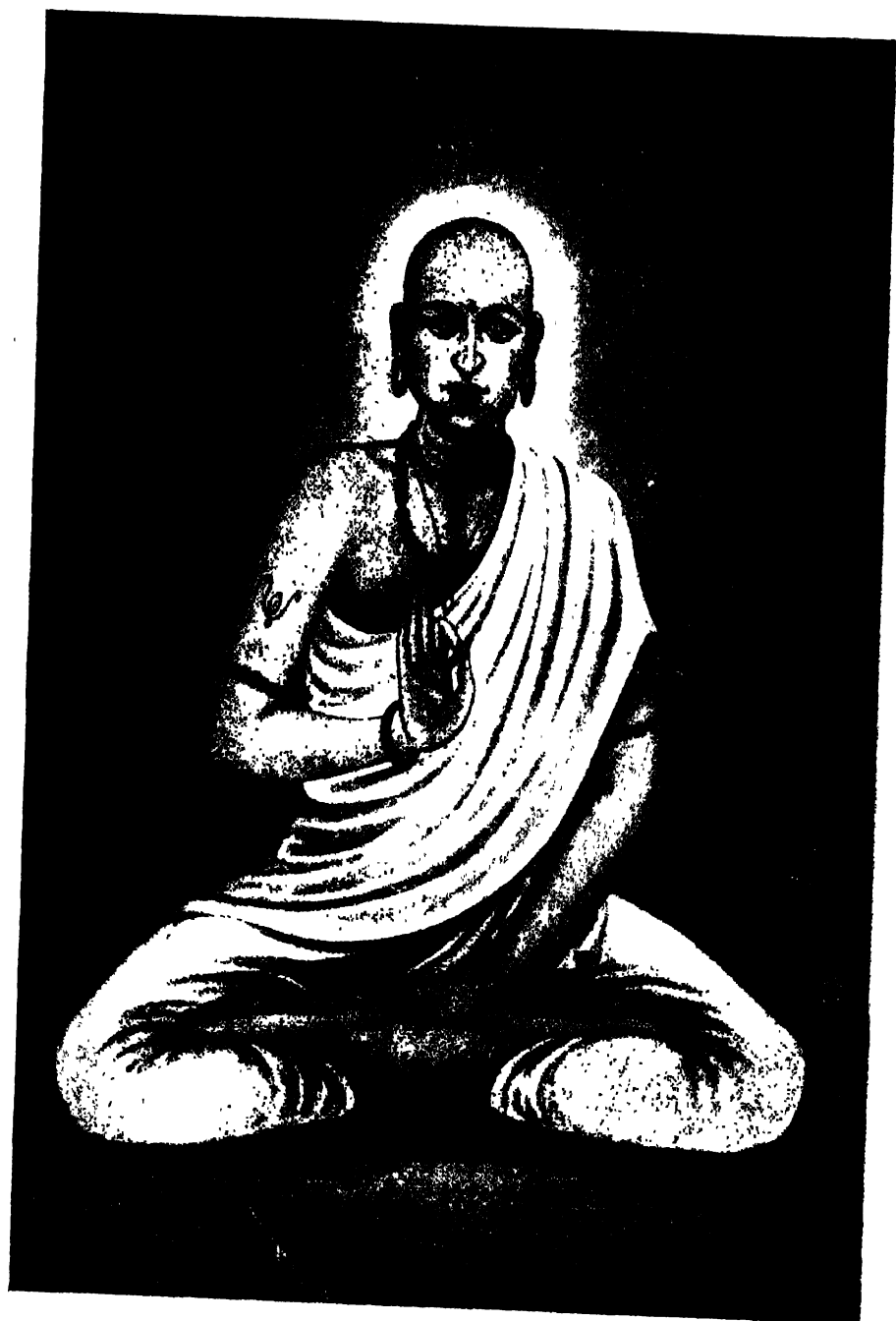
নাথযোগী

নাথ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন
ও
সাধন-প্রণালী

প্রথম পরিচ্ছেদ

নাথ-সম্প্রদায়ের উদ্ভব, নামকরণ ও প্রচার-ইতিহাস

আদিনাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ প্রভৃতির নাম ভারতীয় যোগি-সম্প্রদায়ে সুবিদিত। এই সম্প্রদায়ভুক্ত যোগীদের নামের শেষে দীক্ষান্তে 'নাথ' পদবী যুক্ত করা হয়, তাই উহারা বর্ত্তমানে 'নাথযোগী সম্প্রদায়' বা 'নাথপন্থী' রূপে সমাজে পরিচিত। কিন্তু 'নাথপন্থ' শব্দটী অতি আধুনিক; মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কর্ত্তৃক এই নামকরণ হইয়াছে। অধুনা আমরা নাথপন্থীদের শৈব বা বৌদ্ধ বলিলেও, তাঁহারা 'কৌল' নামেই পরিচিত ছিলেন; নাথ, যোগী প্রভৃতি শব্দ পরবর্ত্তী কালের যোজনা। এই কৌলরা পরম তপস্বী ও সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, তাই ইঁহাদের 'সিদ্ধ'ও বলিত। হঠযোগমার্গে ইঁহাদের দক্ষতা অবিসংবাদী ছিল। বর্ত্তমানে ইঁহারা হীনাবস্থ হইলেও এবং যোগমার্গের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ না রাখিলেও, এক সময়ে সমগ্র ভারতে তথা বাঙ্গলার সমাজে ও সাহিত্যে ইঁহারা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। সংখ্যায়ও তখন তাঁহারা নগণ্য ছিলেন না।

বঙ্গদেশে নাথ-সম্প্রদায় ও নাথ-ধর্ম্মের আলোচনার প্রসঙ্গ উঠিলে প্রথমেই 'নাথ' পদবীধারী বঙ্গীয় যোগি-জাতির কথা মনে হয়। আদিনাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ প্রভৃতির বংশেই ইঁহাদের উদ্ভব, এইরূপ বিশ্বাস অনেকেই করেন। শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয় 'বঙ্গীয় যোগিজাতি' সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, যোগীরা নিজেরাই তাঁহাদের জাতি সম্বন্ধে অজ্ঞ।। কোপাবিষ্ট ঈশ্বরের ললাটাগ্নি হইতে একাদশ রুদ্র ও তদীয় পত্নীর উদ্ভব হয়, তাঁহাদের মহান্ আদি বহুসংখ্যক পুত্র

হয়, তাঁহারা সকলেই শিবপার্ষদ ও যোগধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন (ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তপুরাণ, ১ম স্কন্ধ, ৮ম ও ৯ম অধ্যায়)।

আবার আগমসংহিতা মতে ঈশ্বর হইতে যোগী একাদশ রুদ্রের উৎপত্তি, এই একাদশ রুদ্রের মধ্যে মহাযোগীই প্রধান। মহাযোগীর পুত্র বিন্দুনাথ, বিন্দুনাথের পুত্র আদিনাথ (আইনাথ), এই আদিনাথই রুদ্রকুলের প্রকাশক। বিন্দুনাথের বংশে গোরক্ষনাথ, মীননাথ, ছায়ানাথ, সত্যনাথ প্রভৃতি মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন। যোগিগণ ত্রিদণ্ডী ও যোগপট্টধারী; তাঁহারা গাত্রে ভস্ম লেপন, ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র ধারণ ও রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া থাকেন। তাঁহারা নাথগুরুর উপদেশে পরমগুরুর চিন্তা করিয়া থাকেন। এই রুদ্রকুলসম্ভূত যোগীদের অনাদি (শিব) গোত্র।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের যোগধর্ম্মপরায়ণ 'মহান্' ও আগমসংহিতানুযায়ী 'মহাযোগী' এক ও অভিন্ন। উভয়েই ঈশ্বর হইতে আবির্ভূত রুদ্র; কেবল যোগী শব্দ পরে থাকাতে তাহা মহান্ শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া আগম-সংহিতার 'মহাযোগী' হইয়াছে। মহান্ ও মহাযোগীর বংশধরেরা শিবগোত্রীয়, অতএব উভয় মতে অনৈক্য নাই।

চন্দ্রাদিত্য পরমাগমের দ্বাবিংশ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে সূর্য্যবংশীয় সুধন্বা রাজার কন্যা সূর্য্যবতী তপস্যা দ্বারা মহাদেবের বরে যে পুত্রলাভ করেন তাঁহার নাম যোগনাথ, স্বয়ং মহাদেব তাঁহাকে গায়ত্রী মন্ত্র, আগমাদি শিক্ষা দেন। যোগনাথ মহাদেবের আদেশে বিবাহ করিলে তদীয় পত্নী সুব্রতীর গর্ভে আদিনাথ, মীননাথ, সত্যনাথ প্রভৃতি ষোড়শ পুত্রের জন্ম হয়। যোগনাথ হইতে উৎপন্ন বলিয়া ইহারা সকলেই যোগী আখ্যা লাভ করেন। আদিনাথ, মীননাথ, সত্যনাথ, সচেতনাথ, কপিলনাথ, নানকনাথ গৃহবাসী হইলেন, অন্যেরা দিগ্‌দিগন্তর ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।[১]

ইহারা শিব বা নাথ হইতে উৎপন্ন বলিয়া সকলেই নামের শেষে 'নাথ' ব্যবহার করেন ও ব্রাহ্মণকন্যার গর্ভজাত বলিয়া ইঁহাদের জননে ও মরণে দশরাত্রি অশৌচ পালনীয় (বৃদ্ধশাতাতপ সংহিতা, ৯ম অধ্যায়)। মহাবিরাটতন্ত্রে শিব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন, "আমা হইতে যোগিবংশের

১। সমাজ—অগ্রহায়ণ, ১৩১৬ সাল, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, 'বঙ্গীয় যোগিজাতি' সম্পাদকীয় প্রবন্ধ হইতে পুরাণ ও সংহিতার বিষয়গুলি গৃহীত হইয়াছে। প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয়।

উৎপত্তি, এই জাতি সকলের শ্রেষ্ঠ।" পরাশরপদ্ধতি মতে ব্রাহ্মণকন্যার গর্ভে অবধূতের ঔরসে নাথজাতির উদ্ভব হইয়াছে।

গোরক্ষসংহিতায় উক্ত হইয়াছে—

"वर्णयोगी शिवपत्न्याः पद्धति तस्यवत् ।
दासदासीति मा वाच्यं नाथदेव्याति मा वदेत् ।
पद्धति सम्बोधनश्चैव शिवगोत्री उच्यते ।
उक्त गोत्रेण गोत्रं स्यात् तस्य (योगिनः) कुलोद्भवो द्विजः ।
त्रिगुणं धारयेत् ... ... "

"ग्रहन्ते प्रवरस्य शिवशम्भु हरन्तु ।
आदिशाखा भवोदेव सामवेद तः सम्मतः ।
दशरात्राशौचानि च भूम्यास्य वदनोत्तरे ।
अन्नपिण्डं पितुः स्वर्गं त्रिषु कर्म्मसु पावगा ॥"

অর্থাৎ শিবপত্নী হইতে যোগীবর্ণের উৎপত্তি, ইহারা সিদ্ধ, শিবগোত্র, শিব-শম্ভু-হরপ্রবর; ইহাদের পুরুষদের 'দাস' না বলিয়া 'নাথ' বলিবে, স্ত্রীদের 'দাসী' না বলিয়া 'দেবী' বলিবে। সামবেদানুসারে ইহাদের ক্রিয়াকর্ম্ম হইবে, মৃত্যুর পর উত্তরাস্য করিয়া মৃত্তিকাতে সমাধি দিবে। ইহাদের অশৌচ দশদিন। পিতৃলোকের উদ্ধার-কামনায় অন্নপিণ্ড প্রদান করিতে হইবে, এই সকল বৈদিক ক্রিয়ায় ইহাদের অধিকার আছে।[১] ভট্টশালী মহাশয়ও যোগীদের 'শিবগোত্র' বলিয়াছেন।[২]

যে গোরক্ষনাথের নামে অধুনা নাথসম্প্রদায় ও নাথধর্ম্ম সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, সেই গোরক্ষনাথকে অনেকে বাঙ্গালী মনে করেন। ডাক্তার মোহন সিং গোরক্ষনাথ-সম্বন্ধে যে পুস্তক লিখিয়াছেন তাহাতে গোরক্ষনাথকে পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ও বঙ্গ-আসাম অঞ্চলের কোন কোন যোগিজাতির গোত্রনাম যে 'গোরক্ষ' তাহাও প্রতিপন্ন করিয়াছেন।[৩]

১। এই গোরক্ষসংহিতা প্রচলিত সংহিতা হইতে ভিন্ন। প্রসন্নকুমার কবিরত্নের সঙ্কলনে এই শ্লোক নাই। সমাজ, পৌষ ১৩১৬, 'বঙ্গীয় যোগিজাতি' প্রবন্ধে এই শ্লোকের উল্লেখ আছে।

২। ময়নামতীর গান, ভূমিকা, ভট্টশালী।

৩। হিন্দী বিশ্বকোষ, ১৭ খণ্ড, পৃ ৭৪৫, ডাঃ সিংএর 'গোরক্ষনাথ' দ্রষ্টব্য।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের অষ্টম অধিবেশনে শাস্ত্রী মহাশয় বলেন : আমাদের দেশের সব যোগীদের উপাধি 'নাথ'। তাঁহারা বলেন, "আমরা এদেশের রাজাদের গুরু ছিলাম, ব্রাহ্মণেরা আমাদের গুরুগিরি কাড়িয়া লইয়াছে"; তাই তাঁহারা এখন পৈতা লইয়া ব্রাহ্মণ হইবার চেষ্টায় আছেন। 'নাথপন্থ' নামক এক প্রবল ধর্ম্মসম্প্রদায় বহুশত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গলায় ও পূর্ব্বভারতে প্রভুত্ব করিয়া গিয়াছে।

গোরক্ষনাথ খৃষ্টের আটশত বৎসর পরে আবির্ভূত হন। নেপালে সংস্কার আছে যে নাথেরা বৌদ্ধ, কিন্তু গোরক্ষনাথ বৌদ্ধমত ত্যাগ করিয়া শৈবমত গ্রহণ করেন। তাঁহার বৌদ্ধনাম 'রমণবজ্র' বা 'অনঙ্গবজ্র'। নাথেরা যে বাঙ্গলা বা পূর্ব্বভারতের লোক, তাহার প্রমাণ মীননাথের খাঁটি বাঙ্গলা পদ ও গোরক্ষনাথের লীলাক্ষেত্র বাঙ্গলায় অধিক। তাঁহারই চেলা হাড়িপা ময়নামতীর গানের নায়ক। রাজা মাণিকচন্দ্র ময়নামতীর স্বামী। অদ্যাপি রংপুর অঞ্চলে যোগিসম্প্রদায় মাণিকচাঁদের গীত গাহিয়া থাকেন, তাঁহারা মাণিকচন্দ্রকে রংপুরবাসী ও রাজা ধর্ম্মপালের ভ্রাতা রূপে বর্ণনা করেন। রংপুরের যোগীরা পাশুপত শৈব, তাঁহারা গোরক্ষকে আদিগুরুরূপে মান্য করেন ও নিজেদেব 'কানফাটা' সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া প্রচার করেন। রংপুর আর্য্যজাতির গণ্ডীর বাহিরে ছিল, দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মতে গীতিকায় বৌদ্ধভাব সুস্পষ্ট।[১]

বাঙ্গলাদেশের গীতি-সাহিত্যের এক বিস্তীর্ণ অংশ গোরক্ষনাথ ও তাঁহার শিষ্যসম্প্রদায়কে আশ্রয় করিয়া পুষ্টিলাভ করে। 'চর্য্যাপদ ও দোহাকোষ'গুলিতেও গোরক্ষ-প্রচারিত যোগধর্ম্মের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। পরবর্ত্তী 'লুইপাদ ও মৎস্যেন্দ্রনাথের ধর্ম্মমত' অধ্যায়ে ইহার বিশেষ আলোচনা করা যাইবে।

সুজন রায় কৃত দিল্লীর ইতিহাসে ৩৪৩ বৎসর ধরিয়া যোগিবংশ ও ১৫৫ বৎসর ধরিয়া চাঁদবংশ রাজত্ব করিবার যে ইতিহাস আছে তাহা উদ্ধৃত করিয়া ডাক্তার মোহন সিং বলিয়াছেন, তিলকচন্দ্রের বংশের গোবিন্দচন্দ্র, গোরক্ষ বা জালন্ধরের শিষ্য ছিলেন; এই গোবিন্দচন্দ্র বঙ্গীয় গীতিকাব্যের গোপীচাঁদ কি না তাহা চিন্তনীয়।[২] কিন্তু ডাক্তার মোহন সিং যোগিবংশ বা চাঁদবংশের রাজত্বকালের উল্লেখ না করায়

১। প্রবাসী, বৈশাখ ১৩২২, 'নাথপন্থ'—শাস্ত্রী মহাশয়ের অভিভাষণ।

২। গোরক্ষনাথ—মোহন সিং, পৃ ১৬।

ইহার কোন ঐতিহাসিক মূল্য নাই। অবশ্য কেহ কেহ গোপীচাঁদের মাতা ময়নামতীকে মালবরাজ ভর্ত্তৃহরির ভগিনী ও বঙ্গীয় রাজা মাণিক-চাঁদের পত্নী রূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

গোরক্ষনাথকে কেন্দ্র করিয়া বাঙ্গলা দেশে তথা সমগ্র ভারতে একসময়ে যে প্রবল ধর্ম্মান্দোলন প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার ফলে ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র গোরক্ষপন্থী মঠ ও মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠিত হয় ও গোরক্ষনাথ কর্ত্তৃক পুনঃপ্রচারিত নামধর্ম্ম 'নাথপন্থ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। নাথপন্থী প্রতিষ্ঠানসমূহের পূর্ব্বগৌরব অধুনা ক্ষুণ্ণ হইলেও, তাহাদের প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা অদ্যাপি বহু পরিমাণে বিদ্যমান আছে। গ্রীয়ারসন সাহেব গোরক্ষনাথকেই কানফাটা যোগিসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া নির্দ্দেশ কবিয়াছেন। আদিনাথ এই পন্থের আদিম বক্তা হইলেও মৎস্যেন্দ্র ও গোরক্ষ কর্ত্তৃক উত্তরকালে এই সম্প্রদায়ের সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়।[১] 'গোরক্ষপন্থী' ও 'কানফাটা' উভয় যোগীরাই শৈব, গোরক্ষপন্থী মতে গোরক্ষই নাথ-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ; কানফাটাদের মতে গোরক্ষ ঐ সম্প্রদায়েব পুনর্গঠন করেন কিন্তু তিনি প্রতিষ্ঠাতা নহেন। গোবক্ষপন্থী ও কানফাটাদের মধ্যে ইহাই প্রভেদ।[২]

নাথপন্থীরা 'কানফাটা যোগী' নামে কিম্বা কেবল 'যোগী' নামেও পরিচিত। বর্ত্তমানে ইহাদের সংখ্যা একমাত্র বঙ্গদেশেই সাড়ে চারি লক্ষের কম নহে। ইহার দুইভাগ পূর্ব্ববঙ্গের, একভাগ পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী। শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, নোয়াখালি, বাখরগঞ্জ ও ঢাকায় অনেক যোগীর বাস। সকল যোগীরই সাধারণ উপাধি 'নাথ'। বঙ্গদেশের যোগীদের মধ্যে তিনটী শ্রেণী আছে—যোগী, জাতযোগী ও সন্ন্যাসীযোগী। ইহারা উপস্থিত অস্পৃশ্য ও সমাজচ্যুত হইলেও, শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য শ্রেণীর হিন্দুর অন্নগ্রহণ করে না ও নিজেদের হিন্দু বলে। দারিদ্র্যবশতঃ উচ্চশিক্ষায় বঞ্চিত হইলেও যোগীদের মধ্যে ৩,০০০এর অধিক গ্রাজুয়েট আছে। বঙ্গীয় যোগীরা অনেকেই তন্তুবায়ের কার্য্য করিত, তাহারা বস্ত্র ও সূত্রে ভাতের মণ্ড ব্যবহার করায় জাতিচ্যুত হয় ; অন্য তাঁতিরা খইয়ের মণ্ড ব্যবহার করিত। জাতযোগীরা

১। E. R. E. Kanphatas—Grierson.

২। প্রবাসী, চৈত্র ১৩২৯, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, যোগিজাতি, পৃ ৭৫০।

ভবঘুরে ও সাপুড়ে। সন্ন্যাসী যোগীরা 'গোরক্ষপন্থী' ও শৈব।[১] গোরক্ষপন্থী ও কানফাটাদের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারী হইতে জানা যায় যে আগ্রা ও অযোধ্যায় অওঘর ও নাথযোগীরা শতকরা ৪৫ জন, তন্মধ্যে যোগীর ও যোগিনীর সংখ্যা প্রায় তুল্য। যোগীরা ব্রহ্মচারী এবং যোগিনীদের মধ্যে অনেকে বিধবা ছিলেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে সমগ্র ভারতে ৪৫,৪৬৩ নাথযোগী ছিলেন, ১৯১১ খৃঃ পর্য্যন্ত যুক্তপ্রদেশে মোট ১৫,০০০ কানফাটা যোগিসংখ্যা নির্ণয় করা হয়, তৎপরে পৃথকভাবে ইঁহাদের সংখ্যা গণনা করা হয় নাই। অদ্যাপি ভারতের সর্ব্বত্র ইঁহাদের গতিবিধি আছে ও ভারতের লক্ষাধিক যোগীর মধ্যে সংখ্যায় ইঁহারা অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত যোগী হইতে ন্যূন হইবেন না।[২]

গোরক্ষপুরে নাথপন্থীদের প্রসিদ্ধ মঠ প্রতিষ্ঠিত আছে, কিছুদিন পূর্ব্বেও মহাত্মা গম্ভীরনাথ এই মন্দিরের ভার গ্রহণ করিয়া অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ব্যবহারিক জীবনের অবসান হয়। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ ইঁহার মাহাত্ম্য প্রচার করেন। কাঠিয়া বাবাজী ইঁহাকে 'নিত্যযুক্ত যোগী' বলিতেন (প্রবর্ত্তক, ভাদ্র সংখ্যা ১৩৫০)।[৩] ইঁহার জন্মস্থান কাশ্মীরে, গোরক্ষপুরের মোহন্ত গোপালনাথের নিকটে ইনি দীক্ষা লাভ করেন।[৪] তাঁহার সাধন, জ্ঞাননিষ্ঠা ও নৈতিক বল ভারতের তদানীন্তন সর্ব্ব সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা ও ভক্তি-আকর্ষণ করিয়াছিল। গোরক্ষপুর ব্যতীত ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র নাথপন্থীদের মঠ আছে, তন্মধ্যে কচ্ছপ্রদেশের ধীনোধর মঠ ও পাঞ্জাবের টিলামঠ সমধিক প্রসিদ্ধ।

বঙ্গদেশে দমদমের নিকটে 'গোরখবাসলী' ও হুগলীজেলায় 'ত্রিবেণী'র নিকটে 'মহানন্দ' নামক স্থানে নাথসম্প্রদায়ের মন্দিরাদি আছে। গোরক্ষ-মৎস্যেন্দ্র কর্তৃক প্রচারিত যোগপন্থা নাথপন্থীদের সকল মঠে মান্য হয়, এবং মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথ মনুষ্যদেহধারী গুরুরূপে পূজিত হন।

নাথপন্থীদের বিশ্বাস, অনাদিকাল হইতে নাথধর্ম্ম জগতে প্রচারিত

১। প্রবাসী, চৈত্র ১৩২৯, অমূল্য বিদ্যাভূষণ, যোগিজাতি, পৃ ৭৫৮-৬০।

২। গোরক্ষনাথ—ব্রীগ্‌স্, পৃ ৪, ৫।

৩। প্রবর্ত্তক, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, ১৩৫০, অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, "নাথযোগী সম্প্রদায় ও যোগিরাজ গম্ভীরনাথ"।

৪। কল্যাণ সন্তঅঙ্ক, পৃ ৭০০, সিদ্ধযোগিরাজ মহাত্মা বাবা শ্রীগম্ভীরনাথজী।

হইয়াছে। ইহার আদি উদ্ভব স্বয়ং আদিনাথ বা শিব হইতে; কালবশে সাধারণ্যে ইহার প্রচার বিরল হইলে মৎস্যেন্দ্র ও গোরক্ষ ইহার পুনঃপ্রচার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। অতএব মৎস্যেন্দ্র ও গোরক্ষনাথের ইতিহাসই নাথধর্ম্মের পুনরুদ্ভব ও প্রচারের ইতিহাসরূপে গণ্য করা যাইতে পারে। ইঁহাদের সম্বন্ধে কোন সঠিক ইতিহাস ও জীবনী পাওয়া যায় না, জনমুখে প্রচারিত কিংবদন্তী ও নানাদেশের নানা ভাষায় লিপিবদ্ধ কাহিনী ও উপাখ্যান ইঁহাদের জীবনীর ও ধর্ম্মপ্রচার-ইতিহাসের প্রধান উপজীব্য। অন্যান্য সমসাময়িক ধর্ম্মমতে ইঁহাদের উল্লেখ বা আলোচনা হইতেও ইঁহাদের ইতিহাস কিঞ্চিৎ উদ্ধার করা যাইতে পারে।

গোরক্ষনাথের পরবর্ত্তী কালে ভারতের ধর্ম্মজগতে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও বিভিন্ন পন্থের উদ্ভব ও প্রচলন হইলেও, নাথপন্থ বিলুপ্ত না হওয়ায় ইহা অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে, এক সময়ে নাথসম্প্রদায় ভারতের ধর্ম্ম-জগতের ইতিহাসে একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল এবং উহা প্রবল ও বহুবিস্তীর্ণ ছিল। নাথপন্থীরা এক বিশিষ্ট যোগপন্থী, অন্যান্য সাধক-সম্প্রদায়ের সহিত ইঁহাদের সাধনায় ঐক্য দেখা যায়। এই সকল সম্প্রদায় মধ্যে আপেক্ষিক প্রাচীনতা বা অর্ব্বাচীনতা সহজে নির্ণেয় না হইলেও, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্ভব ও পরিণতির ইতিহাস যে অনুসন্ধান-যোগ্য তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এইরূপ দৃষ্টি লইয়াই নাথমার্গের উদ্ভব, ইতিহাস ও তাহাদের দর্শন ও সাধন বিষয়ে নিবন্ধ রচনায় ব্রতী হইয়াছি। নাথপন্থীদের বর্ত্তমান অবস্থা আলোচনা করিয়া, তাঁহাদের পূর্ব্ব ইতিহাস যতদূর সম্ভব সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছি। যে সকল নাথদর্শন আলোচিত হইবে, তাহা প্রাক্তন নাথ, সিদ্ধ বা সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের দর্শন, তাঁহাদের গ্রন্থাদি হইতেই ইহার আলোচনা করিব। 'গোরক্ষ-সংহিতা' 'গোরক্ষ-সিদ্ধান্ত' আদি পুস্তক গোরক্ষের নামেই প্রচলিত, কিন্তু গোরক্ষনাথের রচনারূপে প্রামাণ্য কি না তদ্বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে; তবে উহারা তাঁহাদের দর্শন ও সাধন বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। নাথ-সম্প্রদায়ে প্রচলিত পুস্তকগুলি সংস্কৃতে রচিত। এই প্রচলিত পুথি ও পুস্তকাদির উপর নির্ভর করিয়াই নিবন্ধ রচনা করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই বলিয়া উহাদের সাহায্য লইতে বাধ্য হইয়াছি।

বঙ্গীয় রাজা গোপীচাঁদের গীত বা গোরক্ষবিজয়, ময়নামতীর গান ইত্যাদি পুস্তক মুসলমান আমলের পূর্ব্বে রচিত হয় নাই। কাহিনীগুলি

প্রাচীন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা পুস্তকাকারে রচিত হইবার কাল অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে নহে।[১] মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িপা ও কানুপার অলৌকিক কাহিনী সকল এই গীতিকায় বর্ণিত হইয়াছে। এই চারি সিদ্ধার 'মাহাত্ম্য-পাঁচালী' মীননাথ ও অপরপক্ষে গোবিন্দ-চন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া বিবৃত হইয়াছে। ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় এই মীননাথকেই শৈবযোগী ও সিদ্ধাচার্য্য লুইপাদ বলিয়া মনে করেন। হঠযোগপ্রদীপিকা (১।৫-৯) মতে মৎস্যেন্দ্রনাথ ও মীননাথ ভিন্ন।

মধ্যযুগের চিন্তাধারার অনুশীলনার্থে নাথ ও সিদ্ধমার্গের অনুশীলন কর্ত্তব্য। শাস্ত্রী মহাশয় যে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যদের উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে বহু নাথ-সিদ্ধের নাম পাওয়া যায়। হঠযোগী, বজ্রযান ও সহজযান, ত্রিপুরা তান্ত্রিক, বীরাচারী, দত্তাত্রেয়, শৈব, সহজিয়া ও নববৈষ্ণবদের তুলনামূলক আলোচনা করিলে তাঁহাদের সাধনের মধ্যে কিছু কিছু ঐক্য লক্ষিত হইবে। সহজযান বৌদ্ধমতের 'শূন্যবাদ' হইতেই হঠ ও তন্ত্রের শূন্যবাদের উৎপত্তি। ইহাদের সকলের সহিত রসেশ্বর সম্প্রদায়ের সাধন জড়িত। নববৈষ্ণবদের রসবাদও সিদ্ধদের নামের সহিত জড়িত রহস্যময় বিজ্ঞানেরই উৎকর্ষ।[২]

নাথ-সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য—গোরক্ষনাথের শিষ্যসম্প্রদায় নাথ, যোগী, গোরক্ষনাথী, দর্শনী, কানফাটা, সিদ্ধ ইত্যাদি নানা নামে পরিচিত, সাধারণতঃ ইঁহারা 'যোগী' নামেই অভিহিত হন। হিমালয়, পাঞ্জাব, বোম্বাই ইত্যাদি প্রদেশে এই সম্প্রদায়ের যোগীদের নাম 'নাথ' অর্থাৎ প্রভু ও যোগিনীদের নাম 'নাথী'। পশ্চিমভারতে গোরক্ষের এক বিশিষ্ট শিষ্য ধর্ম্মনাথের নাম অনুযায়ী তত্রত্য যোগীরা 'ধর্ম্মনাথী' নামে অভিহিত হয়। দশনামী সন্ন্যাসীরা যেরূপ গিরি, পুরী ইত্যাদি উপাধি ব্যবহার করেন, গোরক্ষনাথীরাও সেরূপ 'নাথ' উপাধি ব্যবহার করেন। কিন্তু রাজপুতানা অঞ্চলে 'কণ্ঠদ' উপাধি প্রচলিত।[৩]

অপরাপর যোগিসম্প্রদায় হইতে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বুঝাইবার

১। গোরক্ষবিজয়ের প্রাচীনতম পুথির লিপিকাল ১১৮৪ সাল; মীনচেতন পুথির লিপিকাল ১২২৪ সাল।—বা. সা. ইতিহাস—সুকুমার সেন, পৃ ৯৬৯।

২। S. B. S., Vol. VI, p. 19. Some Aspects of the History and Doctrine of the Naths by Gopinath Kaviraj.

৩। গোরক্ষনাথ—ব্রীগস্, পৃ ২৬, ৩৩।

জন্য নাথেরা কর্ণে ছিদ্র করিয়া একপ্রকার কুণ্ডল ধারণ করেন, তাহার নাম 'দর্শন'। এই নিমিত্ত নাথদের অপর নাম 'দর্শনী'।

দর্শন বা কুণ্ডল বৃহদাকার, কর্ণের উপাস্থি ভেদ করিয়া উহা ধারণ করা বিধি; অতএব এই সম্প্রদায়ের আর এক নাম কানফাটা যোগী— সম্ভবতঃ মুসলমানেরা অবজ্ঞাভরে তাঁহাদের এই নাম দেন।[১] কুণ্ডল অপহৃত হইলে যোগীর পক্ষে সমাজে মুখপ্রদর্শন নিষিদ্ধ; এমন কি তাহাকে জীবন্ত সমাধি দিবার রীতিও প্রচলিত আছে।

নাথযোগীরা দীক্ষার সময়ে এই কুণ্ডল ধারণ করেন। মৎস্যেন্দ্র কর্তৃক নাথ-সম্প্রদায় মধ্যে কুণ্ডল-ধারণ রীতি প্রবর্ত্তিত হয় এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। কুণ্ডলের 'দর্শন' নামটী শ্রদ্ধামূলক। উহার অর্থ সাধকের পরমাত্মা দর্শন হইয়াছে, অতএব তিনি দর্শন ধারণের অধিকারী বা 'দর্শনী'। কুণ্ডলকে অতি পবিত্র জ্ঞানে 'পবিত্রী' আখ্যাও দেওয়া হয়। নাথ-পন্থীরা শৈব, শিবও কুণ্ডলধারী, তাই উক্ত কুণ্ডলকে ইঁহারা শৈব-কুণ্ডল বলিয়া বিশ্বাস করেন। কর্ণবেধ দ্বারা যে নাড়ী ভেদ হয় তাহার দ্বারা যোগজ সিদ্ধি লাভ হয় ও যোগী অমরত্ব লাভ করেন এই মতও প্রসিদ্ধ।

গুরু গোবিন্দ সিং-এর শিষ্য-সম্প্রদায় ও দশনামী সম্প্রদায়ের ব্রহ্ম-গিরির গুদড় সম্প্রদায়ও কুণ্ডল ধারণ করেন। প্রবাদ আছে, গোরক্ষনাথ ব্রহ্মগিরিকে তাঁহার কুণ্ডল বা দর্শন দান করেন।[২] সেই অবধি ইঁহারা এক কর্ণে কুণ্ডল, অন্য কর্ণে গোরক্ষ-পদচিহ্নযুক্ত তাম্র-তক্তি ধারণ করেন।

পাঞ্জাবে যোগী নাম মুসলমানদিগের মধ্যেও প্রচলিত, তাঁহাদের উপাধি 'রাওল', উহার অর্থ 'নাথ' শব্দের অনুরূপ।

হিন্দু যোগীদের মধ্যে বঙ্গের যশোহর ও উৎকল প্রভৃতি দেশে বৈষ্ণবযোগী দেখা যায়। বগুড়ার বৌদ্ধযোগীরা কানফাটা যোগী সম্প্রদায়ভুক্ত।[৩]

অওঘর যোগীরাও কানফাটাদের ন্যায় শৈব, কিন্তু ইহারা কর্ণে মুদ্রা ধারণ করে না।

১। I. A., Vol VII, p. 299—Ref. in Briggs, Gorakhnath, p. 1.

২। ভা. উ. স.—শৈব সম্প্রদায়, পৃ ৯৫; ব্রীগ স, পৃ ১১।

৩। প্রবাসী, আষাঢ় ১৩১৭—বগুড়ার বৌদ্ধ যোগী, হরগোপাল দাস কুণ্ডু।

কানফাটা ও অওঘর যোগী ভিন্ন অন্য বহুপ্রকার শৈবযোগী আছে, তাহারাও নাথযোগীদের সহিত সংশ্লিষ্ট। মচ্ছেন্দ্রীযোগীরা গোরক্ষের গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথকে গুরু বলিয়া থাকে। ভর্তৃহরির শিষ্যদলও শৈব, ও ভর্তৃহরিযোগী নামে পরিচিত। শারঙ্গ লইয়া যে যোগীরা শিব ও শক্তি বিষয়ক গান গাহিয়া ভিক্ষা করে, তাহাদের নাম 'শারঙ্গীহার', কার্পাস ও পট্টসূত্রের বস্ত্র বিক্রেতা যোগীদের নাম 'ডুরীহার'। তুবড়ী বাজাইয়া অহিতুণ্ডকবৃত্তি অবলম্বনে যাহারা জীবিকার্জ্জন করে, তাহাদের নাম 'কাণিপা যোগী', ইহারাও গোরক্ষনাথকে আদিগুরু রূপে স্বীকার করে ও কর্ণযুগলে পিতল বা রৌপ্যাদি নির্ম্মিত কুণ্ডল বা দর্শন ধারণ করে; কিন্তু ইহাদের কর্ণের ছিদ্র কানফাটাদের ন্যায় বৃহৎ নহে। কানফাটাদের ন্যায় ইহারাও গেরুয়া বস্ত্র পরিধান ও গলদেশে ঔর্ণসূত্র ধারণ করে, কিন্তু শিংনাদ (ইহার বিবরণ 'ব্যবহার্য্য দ্রব্যসকল' পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য) ধারণ রীতি ইহাদের মধ্যে নাই। ইহারা পশ্চিমোত্তর দেশীয় যাযাবর জাতি বিশেষ এবং সাধারণতঃ গোরক্ষপুর হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া নানাদেশে জীবিকার্জ্জনের জন্য ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়।

অঘোরপন্থী যোগীরাও কুণ্ডলধারী, তাহারা অস্থিমালা ও রুদ্রাক্ষ-মালাসহ কানফাটাদের ন্যায় হিংলাজ তীর্থের 'ঠুমরা'র মালাও ধারণ করে, ইহারা নিজেদের 'স্বর্ভঙ্গী' বলিয়াও পরিচয় দেয়।

কাণিপা যোগীদের ন্যায় উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে 'ভোপা', 'চন্দ্রভাট' প্রভৃতি শৈবপন্থী যাযাবর শ্রেণীর যোগীদেরও দেখা যায়।[১]

১। ভা· উ· স—শৈব সম্প্রদায়, পৃ ৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নাথ-সম্প্রদায়ের উদ্ভব সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশের উপাখ্যান

নেপাল হইতে রাজপুতানা, পাঞ্জাব হইতে বাঙ্গলা, সিন্ধু হইতে দাক্ষিণাত্য—ভারতের সর্ব্বত্রই গোরক্ষনাথের অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। একদা সমগ্র ভারতে নাথসম্প্রদায়ের যে প্রাধান্য ছিল, অদ্যাপি প্রচারিত গীতিকায়, নাটকে, গ্রন্থে, তিব্বতীয় চিত্রে তাহার বহু সাক্ষ্য বিদ্যমান। নাথগুরুরাও সিদ্ধরূপে পূজিত হইয়াছেন ও ৮৪ সিদ্ধের বর্ণনা ও তালিকামধ্যে স্থান পাইয়াছেন। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন স্থানে গোরক্ষনাথের আবির্ভাবের কথা, কবীরাদির সহিত তর্কের কথা ও শেষনাগরূপে কলিযুগে অবতীর্ণ হইবার প্রবাদও আছে। এক্ষণে কোন্ দেশে কোন্ সাহিত্য, কাহিনী বা কিংবদন্তীর উদ্ভব হইয়াছে, তাহা হইতে গোরক্ষনাথ ও তাঁহার প্রচারিত যোগধর্ম্ম বিষয়ে কি তথ্য সংগ্রহ করা যায় তাহা আলোচিত হইতেছে।

বঙ্গদেশে প্রচলিত কাহিনীতে গোরক্ষনাথকে পূর্ব্ব অঞ্চলের অধিবাসী বলা হইয়াছে। মৎস্যেন্দ্রনাথের পতনকাহিনী বঙ্গদেশেও প্রচলিত ছিল। শিষ্য গোরক্ষই গুরুর উদ্ধার সাধন করেন। মৎস্যেন্দ্র নাথমার্গের গুরু ছিলেন ও তিনি গোরক্ষকে বজ্রযান বৌদ্ধমত হইতে শৈবধর্ম্মে দীক্ষাদান করেন এইরূপ বৃত্তান্ত আছে।[১]

বঙ্গদেশের প্রচলিত কাহিনী—বঙ্গভাষায় রচিত গোরক্ষবিজয়, মীনচেতন, ময়নামতীর পুথি, গোপীচন্দ্রের গান, ময়নামতীর গান, গোবিন্দচন্দ্রের গীত, ময়নামতীর গাথা, শূন্যপুরাণ ইত্যাদিতে শিব হইতে মীননাথ, হাড়িপা, গোরক্ষ, কানুপা প্রভৃতি সিদ্ধগণের উৎপত্তি কাহিনী বর্ণিত আছে। শিবকে গৌরীদান কালে গোরক্ষ মীনের ভৃত্য ও কানুপা হাড়িপার ভৃত্য হন।

"তবে যদি পৃথিবীতে য়াইল হরগৌরী
মীননাথ হাড়িফাএ করন্ত চাকরি।

১। Mod. Bud. in Orissa, Introduction—N. N. Vasu.

মীননাথের চাকরি করে জতি গোরখাই।
হাড়িফার সেবা করে কানফা জোগাই ॥"[১]

একদা শিব গৌরীকে সমুদ্রতীরে গুহ্যতত্ত্ব ব্যাখ্যাকালে মীননাথ মৎস্যরূপে তাহা শ্রবণ করিলে শিব কর্ত্তৃক অভিসম্পাত প্রাপ্ত হন যে তিনি শ্রুত-বিদ্যা ভুলিয়া যাইবেন। তৎপরে শিব গৌরীর সাহায্যে মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িপা ও কানুপার চরিত্র পরীক্ষা করিলে একমাত্র গোরক্ষই তাহাতে উত্তীর্ণ হন। মীননাথ দেবীর আদেশে কদলীরাজ্যে গমন করিয়া ষোড়শ শত রমণীসহ মায়ামুগ্ধভাবে দিন অতিবাহিত করিতে থাকিলেন। দেবীর অভিসম্পাত-ফলে ইনি তপস্বী হইয়াও পাশবদ্ধ হন ও পরে তৎশিষ্য গোরক্ষনাথ কর্ত্তৃক উদ্ধার প্রাপ্ত হন। গোরক্ষনাথ নর্ত্তকী-রূপ ধারণ করিয়া (মতান্তরে কৃষ্ণ ভ্রমরের রূপ ধারণ করিয়া) অন্যের অগোচরে মৎস্যেন্দ্রের আত্মস্মৃতি পুনরুজ্জীবিত করেন। এই উদ্ধার-কাহিনী 'মীনচেতন' ও 'গোরক্ষবিজয়ে' বর্ণিত হইয়াছে। দেবীর আদেশে হাড়িপা ময়নামতী রাণীর দেশে যান ও পরে তাঁহার পুত্র রাজা গোবিন্দচন্দ্রের গুরু হন। এই সকল গীতিকাব্যে মীননাথকে অনেকস্থলে কথ্য ভাষার রূপে 'মোচন্দর' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। মৎস্যেন্দ্র বোয়াল মৎস্যরূপে যোগতত্ত্ব শ্রবণ করেন ৷—

"মৎস্যরূপ ধরি তথা মীন মোচন্দর
টাঙ্গির লামাতে রহে বোগাল সুন্দর।"

—গোরক্ষবিজয়, পৃ ১৩ ॥

এইরূপ কাহিনীও প্রচলিত আছে যে বিষ্ণুই মৎস্যোদরে প্রবেশ করিয়া হর-পার্ব্বতীর যোগতত্ত্ব শ্রবণ করেন ও পরে বালকরূপে দেখা দেন। (কল্যাণ যোগাঙ্ক, পৃ ৭৮৩)। স্কন্দপুরাণ ও বৃহন্নারদপুরাণে বর্ণিত আছে যে এক দম্পতী অশুভলগ্নে জাত পুত্রকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলে কোন মৎস্য তাহাকে উদরসাৎ করে। শিবপার্ব্বতী-সংবাদ শুনিয়া সেই বালক 'আদেশ' 'আদেশ' বলিয়া চীৎকার করে, তৎকালে শিব তাহাকে উদ্ধার করিয়া 'মৎস্যেন্দ্রনাথ' নাম রাখেন। শঙ্কর ভগবান ইহাকে যোগশিক্ষা দিয়া তাহা সংসারে প্রচারের আদেশ দেন (কল্যাণ যোগাঙ্ক, পৃ ৭৮৩, শ্রীমৎস্যেন্দ্রনাথ)।

১। গোরক্ষবিজয়, পৃ ১০।

হাড়িফা চলিয়া গেল মনামতি পুরী।
তথা গিয়া রহিল হাড়িরূপ ধরি ॥
... ...
মীননাথ চলি গেল কদলির দেশ।
কদলিত দেখে জুবতি সব প্রজা।
স্ত্রীরাজ্য হএ সে জে স্ত্রী হএ রাজা ॥[১]

ময়নামতীর পুত্র গোপীচাঁদের সন্ন্যাসগ্রহণের সময়ে ১,৬০০ যোগী ময়নামতী কর্ত্তৃক আহূত হন, তন্মধ্যে বিদ্যাধর গোরক্ষনাথ পুষ্পরথে আগমন করেন।

সুকুর মহম্মদ রচিত 'গোপীচাঁদের সন্ন্যাস' রাজসাহী হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল; উহা অধুনা লুপ্ত হইয়াছে। ভবানীদাস রচিত 'ময়নামতীর গান' নলিনীকান্ত ভট্টশালী ও বৈকুণ্ঠ দত্ত প্রকাশ করিয়াছেন।

গ্রীয়ারসন রংপুরের জনৈক যোগীর নিকট প্রাপ্ত ময়নামতীর গীত প্রকাশ করেন। বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য সংগৃহীত ময়নামতীর গানে মাণিক্য-চন্দ্রের রাজ্যের সমৃদ্ধির কথা বর্ণিত আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক বীরেশ্বর ভট্টাচার্য্যের সংগ্রহ 'গোপীচাঁদের গান' নামে মুদ্রিত হইয়াছে।

ভবানীদাসকৃত রংপুর গীতিতে ময়না মাণিকচাঁদের প্রধানা স্ত্রী। স্বামীকে তিনি যোগদীক্ষা দেন ও তাঁহার পুত্র হাড়িপার নিকট ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে। ময়নার বাল্যজীবনের কথাও ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে; অন্যান্য লেখকেরা গোপীচন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া কাহিনী রচনা করিয়াছেন।

ভট্টশালী মহাশয় প্রকাশিত 'মীনচেতন' (ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ) ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'গোরক্ষবিজয়' একই গ্রন্থ বলিলে ভুল হয় না। একটী পুথিতে 'ইতি মীননাথ চেতন গোরক্ষবিজয় সমাপ্ত' থাকায় উভয় নামই তুল্যরূপে উপযোগী।

গোরক্ষবিজয়ের ভণিতায় কবীন্দ্রদাস, ফয়জুল্লা, ভীমদাস ও শ্যামদাস সেনের ভণিত পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ফয়জুল্লার ভণিতাই সমধিক এবং প্রাচীনতম হস্তলিখিত পুথিতে ইনিই একমাত্র লেখকরূপে পরিদৃষ্ট হন। দ্বাদশ শতাব্দীতে যাহা বঙ্গীয় গ্রাম্য সাহিত্যের এককোণে

১। গোরক্ষবিজয়, পৃ ২৩, ২৪।

পড়িয়াছিল, ফয়জুল্লা প্রভৃতি লেখকগণ হয়ত তাহা পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দীতে কুড়াইয়া লইয়া কাব্যে পরিণত করেন।[১]

গোপীচন্দ্রের প্রচলিত কাহিনীর মূল বঙ্গদেশে; বঙ্গদেশ হইতেই সমগ্র ভারতে এই করুণ কাহিনী ছড়াইয়া পড়ে। রাজপুত্র হইয়াও মাতা কর্ত্তৃক গৃহত্যাগে বাধ্য হওয়ায় তাঁহার কাহিনী বুদ্ধদেব ও শ্রীচৈতন্যের গৃহত্যাগ কাহিনীর ন্যায়ই জনপ্রিয় হইয়া উঠে। কাহিনীটির মূল চট্টগ্রামে বা ত্রিপুরায়, এইরূপ মতবাদও প্রচলিত আছে।

কাহিনীগুলির মধ্যে গোরক্ষ-প্রচারিত যোগধর্ম্মের বর্ণনা পাওয়া যায়। ষট্‌চক্রাদি ও শূন্যসাধন, বিন্দু ও নাদের কথা, অজপাসাধন, প্রভৃতি দুরূহ যোগমার্গ ও সাধনের কথা আছে। গোরক্ষ যখন গুরুর আত্মচেতন করাইতেছেন তখন সঙ্কেতে বলিতেছেন—

ইঙ্গলা পিঙ্গলা দুই উজানি বাহিয়া।
আনন্দে সুনহ ধ্বনি চৈতন্য রহিয়া। (গোরক্ষবিজয়, পৃ ১৩৮)

প্রচলিত কাহিনী হইতে ময়নামতীকে শৈবতান্ত্রিক যোগিনী ও হাড়িপার সাধন-সঙ্গিনী বলিয়া শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন (বা. সা. ই., পৃ ৯৬৭)।

ময়নামতী যে গোরক্ষের শিষ্যা ছিলেন তাহা গোপীচাঁদের গান হইতে বুঝা যায়।

হেনকালে পূর্ব্বেত গোর্খ পশ্চিমেতে জাএ।
বার বছর ধরি গোর্খ শূন্যেতে ভ্রমএ॥
দেশে দেশে ভ্রমে তবে জতিশা গোর্ক্ষা এ।
সতীকন্যার লাগ গোর্খে কবু নহি পাএ॥ (২য় খণ্ড, পৃ ৩৪২)

বালনাথ, হালিকপাব এবং মালীপাবও গোরক্ষের শিষ্য নামে পরিচিত। বালনাথ সম্ভবতঃ জালন্ধর নাথ। ইনি প্রথমে শূদ্র, পরে বৌদ্ধ ও শেষে নাথ হন। তিব্বতী সাহিত্যে ইঁহার বৃত্তান্ত আছে। বঙ্গীয় গীতিকায় ইনিই 'হাড়িপা'। 'পা' শব্দটা তিব্বতী, ইহার অর্থ সিদ্ধ। ইনি অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন, সেই নিমিত্ত কেহ কেহ ইঁহাকে গোরক্ষের উর্দ্ধে স্থান দেন। বঙ্গীয় গোপীচাঁদ, ভর্তৃহরি, চর্পট প্রভৃতির সহিত জালন্ধরের নাম সংশ্লিষ্ট। চৌরঙ্গী, ঘোড়াচলি প্রভৃতি মৎস্যেন্দ্র-শিষ্যদের

১। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—দীনেশ সেন, পৃ ৬০।

অন্যতম। ইঁহাদের পদাবলী অদ্যাপি একতারা সহযোগে গীত হয়। ইঁহাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে কিংবদন্তীও প্রচলিত আছে।[১]

হিন্দী সাহিত্যে মৎস্যেন্দ্রের জন্মবৃত্তান্ত এইরূপ উল্লেখ আছে—

অহং মৎস্যোদরে স্থিতঃ সমুদ্রে ক্ষীরসম্ভবে
মাতা তু পিতৃবাক্যেন নায়ং মম কুলান্বিতঃ ॥
কুলক্ষয়ভয়ত্বেন জাতং স্বকুলনাশনম্ ।
গণ্ডান্তযোগজনিতো বালো ন গৃহকর্মকৃৎ ॥[২]

সংস্কৃত যোগগ্রন্থ 'গোরক্ষ শতকে'র হিন্দী অনুবাদ 'গোরক্ষসার' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি কাশীর রামনগরের রাজবাড়ীতে রক্ষিত আছে। তাহাতে আছেঃ যিনি সকল চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়াছেন ও ষট্‌চক্রের রহস্য জানিতে পারিয়াছেন এবং যিনি আত্মার অবিচল জ্যোতিতে অবস্থান করেন তিনিই 'মছন্দর'।[৩]

ফলতঃ মীননাথ কাহিনীকে উপকথা জাতীয় বলা যায়, কিন্তু গোবিন্দচন্দ্রের উপাখ্যানের মূলে বাস্তবতা আছে। গ্রীয়ারসন প্রমুখ পণ্ডিতগণ তাহার ঐতিহাসিক তত্ত্ব বিচার করিবার জন্য প্রচুর শ্রম করিয়াছেন, কিন্তু পরস্পরবিরোধী ঘটনা ও নামের অন্তরালে মূল যে ঐতিহাসিক বীজ ছিল তাহা আত্মগোপন করিয়াছে।

কৃষ্ণপাদ (গোপীচন্দ্র গীতের 'কানুপা') ও 'মীননাথ' রচিত বাংলা চর্য্যাপদ পাওয়া গিয়াছে। অতএব ইঁহাদিগকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলা যায়। গোরক্ষনাথ ও জালন্ধারিপাদ (হাড়িপা) মীননাথের শিষ্যদ্বয় বলিয়া সুপরিচিত। গোরক্ষনাথের কোন বাঙ্গলা পদ পাওয়া যায় নাই। মীননাথের রচনার ভাষা বাঙ্গলার প্রাচীনতম নিদর্শন। হিন্দী পুস্তক 'যোগিসম্প্রদায়াবিষ্কৃতি'তে যোগিসমাজের উৎপত্তি বিবরণ ও তাহা কি কারণে সংঘটিত হয় তাহার নিম্নরূপ বিবরণ আছে :—

দ্বাপরের অন্তে ঋষভরাজার নবপুত্র নবনারায়ণের জন্ম হয়। নারদের পরামর্শে ইঁহারা যোগমার্গের উদ্ধার ও ত্রিতাপ-সন্তাপিত লোকোদ্ধার নিমিত্ত কৈলাসে মহাদেবের সকাশে গমন করেন। মহাদেবের

১। S. B. S., Vol. VI, p. 19 ff..

২। গোরক্ষ বিকাশ—পৃ ৩৬, স্কন্দপুরাণ হইতে উদ্ধৃত।

৩। মীননাথ—শশীভূষণ দাসগুপ্ত—শ্রীভারতী, আশ্বিন ১৩৪১, পৃ ৬১।

কৃপায় 'গোরক্ষনাথ' নামে এক ব্যক্তি প্রকটিত হন; তিনি মুমুক্ষুজনের রক্ষাকর্ত্তা ও জীবকে সন্মার্গে নীত করিবার উদ্দেশ্যে ধরায় প্রেরিত হন। নবনারায়ণের অন্যতম কবিনারায়ণ 'মৎস্যেন্দ্রনাথ' নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। অন্যেরা (যথা করভাজন নারায়ণ, অন্তরিক্ষ নারায়ণ) যথাক্রমে গহনিনাথ, জ্বালেন্দ্রনাথ, কাণিপানাথ, চর্পটনাথ, রেবননাথ, নাগনাথ, ভর্তৃনাথ, গোপীচন্দ্রনাথ নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। মৎস্যেন্দ্র ও গোরক্ষনাথ ব্যতীত এই অষ্ট-নাথ লইয়া দশজন নাথ। মৎস্যেন্দ্র ও জ্বালেন্দ্র মহাদেবের নিকট দীক্ষালাভ করেন। গোরক্ষ ও রেবননাথ মৎস্যেন্দ্রের নিকট; গহনী, নাগনাথ ও ভর্তৃনাথ গোরক্ষর নিকট; চর্পট মৎস্যেন্দ্রের নিকট; গোপীচন্দ্র ও কাণিপা জ্বালেন্দ্রনাথের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবেন, এইরূপ ব্যবস্থাও মহাদেব করিলেন।[১]

গুরু মৎস্যেন্দ্রের সহিত গোরক্ষনাথের বঙ্গদেশে মিলিত হইবার বৃত্তান্তও উক্ত পুস্তকের পৃ ৭৫-৭৮এ বর্ণিত হইয়াছে। উভয়েই ভ্রমণ করিতে করিতে বঙ্গদেশের কনকগিরি নামক গ্রামে মিলিত হন।

সিদ্ধদিগের জন্মবৃত্তান্তের নিম্নরূপ বর্ণনাও বঙ্গসাহিত্যে আছে: অনাদ্যের শরীর হইতে শিব যোগিরূপ ধরিয়া জন্মিলেন, নাভিতে জন্মিলেন মীনগুরু ধন্বন্তরী, হাড়িফার জন্ম হইল হাড় হইতে, কর্ণ হইতে কানকা যোগী, গাভুর সিদ্ধাই অতি খরতর হইলেন, জটা ভেদ করিয়া গোর্খনাথ বাহির হইলেন ও অবশেষে জগৎমাতা গৌরী জন্ম গ্রহণ করিলেন। গাভুর সিদ্ধাই নামান্তরে 'চৌরঙ্গীনাথ', মৎস্যেন্দ্রের শিষ্যদ্বয় চৌরঙ্গীনাথ ও গোরক্ষনাথ।[২] পূর্ব্বে হাড়িফা, দক্ষিণে কানফা, পশ্চিমে গোর্খ ও উত্তরে মিনাই গমন করিলেন (গোরক্ষ বিজয়, পৃ ১৫)। [তুলনীয় গোপীচন্দ্রের পাঁচালী, পৃ ৩১৪, "পশ্চিম কুলের যুগী গোরক্ষনাথের চেলা"।]

উত্তর-ভারতে বর্ণিত কাহিনী

নেপালে আবিষ্কৃত 'কৌলজ্ঞাননির্ণয়' পুথি বহু প্রাচীন গ্রন্থ, অতএব উহাতে বর্ণিত মৎস্যেন্দ্র কাহিনীর প্রাচীনতা অবিসংবাদী। কৌলজ্ঞান-

---

১। যোগিসম্প্রদায়াবিষ্কৃতি—চন্দ্রনাথ যোগী, পৃ ১২-১৪।

২। ডাঃ শহীদুল্লাহ ধৃত পাঠ গোরক্ষবিজয়, পৃ ৬, ৭—উদ্বোধন, আশ্বিন ১৩৪৮, পৃ ৪৯৭ দ্রষ্টব্য।

নির্ণয়ের ষোড়শ পটলে শিব সিদ্ধরূপে ভূতলে অবতীর্ণ হইবার কাহিনী পার্ব্বতীকে বলিতেছেন, "অহং সো ধীবরো দেবী, অহং বীরেশ্বরঃ প্রিয়ে।"—(১২ শ্লোক)। ষোড়শ পটলে পুনর্ব্বার—

> अहं सो धीवरो देवि कैवर्त्तत्वं मया कृतः ।
> आक्रम्य तु यदा मत्स्यं ग्रन्थिजालसमीकृतः ॥२५॥
> मत्स्योदरन्तु ततस्फोट्य गृहीतञ्च कुलागमं ।
> वदन्ति विदिता लोके पशवो ज्ञानवर्जिताः ॥२६॥
> ब्राह्मणोऽपि महापुण्ये कैवर्त्तत्वं मया कृतः ।
> मत्स्याभिघातिनैर्विप्रा मत्स्यघ्नमिति विश्रुताः ॥
> कैवर्त्तत्वं कृतं यस्मात् कैवर्त्ती विप्रनायकः ॥२७॥

শিব চন্দ্রদ্বীপে গূঢ়তত্ত্ব জ্ঞানলাভ করিয়া স্বয়ং তাহা কামরূপে 'কৌলাগম' নামে প্রচার করেন। চন্দ্রদ্বীপে বাসকালে কার্ত্তিকেয় তাঁহার শিষ্যরূপে (মতান্তরে মূষিকরূপে) আগমন করিয়া অজ্ঞানবশতঃ শাস্ত্রটী অপহরণ করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলে এক মৎস্য তাহা উদরসাৎ করে, শিব মৎস্যেন্দ্র রূপে তাহাকে ধৃত করিয়া শাস্ত্র উদ্ধার করেন। কার্ত্তিকেয় তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার শাস্ত্র হরণ করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলে শিব বৃহৎ মৎস্যকে ধরিতে অপারগ হইলেন, তখন শিব জাতিত্যাগ করিয়া কৈবর্ত্ত হইলেন ও মৎস্যকে ধরিয়া কুলাগম উদ্ধার করিলেন। সেই হইতে জাতিভ্রষ্ট ভৈরবের নাম 'মচ্ছঘ্ন' বা মৎস্য-হত্যাকারী হইল। কামরূপে মৎস্যেন্দ্র এই কৌলশাস্ত্র প্রচার করেন।

মৎস্যেন্দ্র অর্থে যে মৎস্য ধরে বা যে পাশমোচন করিতে সমর্থ। কাশ্মীরী শৈবমতে মৎস্য অর্থে 'পাশ' বা ইন্দ্রিয়। অভিনব গুপ্ত 'রাগারুণম্ জালম্' বলিতে সম্ভবতঃ মাৎসর্য্য বলিতে চাহিয়াছেন। তন্ত্রালোক, ১ম খণ্ড, পৃ ২৫—১।৭ :—

> रागारुणं ग्रन्थिबिलावकीर्णम् यो जालमातान वितानवृत्तिम् ।
> कलोज्झितम् बाह्यपथे चकार स्तान्मे स मच्छन्दविभुः प्रसन्नः ॥

টীকাকার জয়দ্রথ বলিয়াছেন—"মচ্ছাঃ পাশাঃ সমাখ্যাতাশ্চপলাশ্চিত্ত-বৃত্তয়ঃ। ছেদিতাস্তু যদা তেন মচ্ছন্দস্তেন কীর্ত্তিতঃ"—(বাগচী, পৃ ৬)। প্রোফেসর টুচী দুর্জ্জয়চন্দ্রের চতুষ্পীঠ তন্ত্রের তৃতীয় পটলের টীকা

হইতে মাত্র একটী স্থান হইতে মৎস্য অর্থাৎ আধ্যাত্মজ্ঞানের প্রতিবন্ধক এই অর্থ দেখাইয়াছেন, নহিলে মাৎসর্য্য শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ করা কঠিন। কিন্তু মৎস্য শব্দ যে কেবল রূপক হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। কৌলজ্ঞানে মৎস্য অর্থে মাছ ও মৎস্যেন্দ্র অর্থে মৎস্যধারী গণ্য করা হইয়াছে। অবশ্য পরবর্ত্তী কালে ১১শ শতাব্দীতে অভিনব গুপ্তের তন্ত্রালোকে ইহার রূপক ব্যাখ্যা আছে; সম্ভবতঃ তখন মৎস্যেন্দ্র প্রচারিত গূঢ়তত্ত্ব সাধারণ্যে প্রচারিত হওয়ায়, তাঁহাকে কৈবর্ত্ত বলিতে দ্বিধা জন্মাইয়াছিল। কৌলজ্ঞাননির্ণয়ে মৎস্যেন্দ্রের বিষয়ে যে সকল অলৌকিক কাহিনী আছে তাহাও মৎস্যেন্দ্রকে শিবা[illegible]র রূপে গণ্য করার যুগে প্রচারিত বলিয়া মনে হয়।[১]

/ অভিনব গুপ্ত একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের লোক, অতএব মৎস্যেন্দ্র তাহার অন্ততঃ ১০০ বৎসব পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন অনুমান করা অন্যায্য নহে, অভিনব তাঁহাকে শিবতুল্য বলিয়াছেন।[২]

/ সত্যযুগে ধার্ম্মিক রাজা উধোধরের মৃত্যু হইলে নদীবক্ষে নিক্ষিপ্ত তাঁহার নাভিকুণ্ড আহার করিয়া এক মৎস্যের যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় তাহার নাম 'মৎস্যেন্দ্র নাথ', পূর্ব্বজন্মে উক্ত রাজা ধার্ম্মিক হওয়ায় এ জন্মে সাধুরূপে জন্মগ্রহণ কবেন এইরূপ কাহিনীও প্রচলিত আছে।[৩]

নেপালে প্রাপ্ত নেওয়ারী ভাষায় রচিত গোবিন্দচন্দ্রের সন্ন্যাস বিষয়ে একটী নাটক পাওয়া গিয়াছে। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উহার কিয়দংশের নকল আনিয়াছেন। পুথিটী ১৬২০-৫৭ খৃঃ লিপিবদ্ধ ও উহা বাঙলা ভাষায় রচিত। উহাতে জালন্ধরি গোবিন্দচন্দ্রকে বলিতেছেন, "তুমি দুইটী রাণী ত্যাগ করিতে পারিতেছ না, আর আমি দিল্লী নগরের রাজা ছিলাম, সাতশত রাণী ত্যাগ করিয়াছি"—

জালন্ধরি নৃপতি জালন্ধর দেশ
শ্রীআদিনাথ কহিয় উপদেশ।

১। G. R. E. Grierson's article on Gorakhnath; বাগচী কৌলজ্ঞাননির্ণয় ভূমিকা,—পৃ ৭।

২। বাগচী, পৃ ২৬।

৩। Briggs, p. 233, Ref. Rose, Tribes and Castes of the Punjab Vol II. p. 393.

কোন বঙ্গ-কুমার কর্ত্তৃক বঙ্গেশ্বর গোপীচাঁদের রাজধানী আক্রমণ ও গোপীচাঁদের পরাজয় এবং তৎপরে গোপীচাঁদের যোগীর সন্ধানে বহির্গমন ও জালন্ধর কর্ত্তৃক জন্ম-মৃত্যু রহস্য বিবৃতি, চক্রাদিতে দীক্ষাদান, গোপীচাঁদের রাণীদের সেই শোকে আত্মহত্যা প্রভৃতি বৃত্তান্ত এই পুথিতে আছে।[১]

নেপালে রচিত নাটকের শেষাংশের সহিত দুর্লভ মল্লিকের গোবিন্দ-চন্দ্রের গীতের শেষাংশের মিল আছে। শিবচন্দ্র শীল দুর্ল্লভ মল্লিকের গীত প্রকাশ করিয়াছেন।

নেপালে প্রচলিত এক কাহিনীর মধ্যে মৎস্যেন্দ্রনাথের নিজ স্থূল-দেহরক্ষার ভার গোরক্ষের উপর ন্যস্ত করিয়া সদ্যোমৃত এক রাজার দেহ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার রাণীর মায়াপাশে আবদ্ধ হইবার কথা আছে। গোরক্ষনাথই গুরুর স্থূল অচেতন দেহে চেতনা সঞ্চার করিয়া রাণীর মায়াপাশ হইতে তাঁহাকে রক্ষা কবেন।[২] মতান্তরে গিবনার পর্ব্বতে সমাধিস্থ থাকাকালে মৎস্যেন্দ্র সিংহলেব রাণীর মায়াপাশে আবদ্ধ হন। তাঁহার পরশুরাম ও মীনরাম নামে দুই পুত্রের জন্ম হয়। গোরক্ষ তবলার ধ্বনিব সাহায্যে গুরুর উদ্ধার সাধন করেন ও 'আদেশ' শব্দ দ্বারা গুরু নমস্কার করেন। এই সময়ে মৎস্যেন্দ্রের স্থূল দেহরক্ষার ভার দত্তাত্রয়ের উপর ন্যস্ত হয়।[৩]

এতদ্দ্বারা মীনরাম মৎস্যেন্দ্রের পুত্ররূপে প্রতিপন্ন হইতেছেন। মীনরাম ও মীননাথ কি অভিন্ন ?

গোরক্ষনাথ সম্বন্ধে নেপালীদেব ধারণা, তিনি পাঞ্জাব হইতে কাঠমুণ্ডে আসেন ও পশুপতিনাথের মন্দিরেব নিকট বাস করিয়া শৈবধর্ম্ম প্রচার করিতে থাকেন। গোরক্ষনাথকে গো-রক্ষক বা গোরক্ষপুরের রক্ষক বলা হয়, নেপালীদের রক্ষক ছিলেন মৎস্যেন্দ্রনাথ। গোরক্ষ শব্দ হইতেই কালক্রমে 'গুর্খা' শব্দেব উৎপত্তি হয়। তারানাথ বলেন, তিব্বতী মতে গোরক্ষ বৌদ্ধ ঐন্দ্রজালিক ছিলেন। তাঁহার শিষ্যেরাও বৌদ্ধ ছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে তাঁহারা ঈশ্বরের শিষ্য অর্থাৎ 'শৈব' হইলেন। বিজয়ী

১। বা. সা. ই., পৃ ২৫৫।

২। Briggs, p. 233.

৩। যোগিসম্প্রদায়াবিষ্কৃতি, পৃ ১৬৩, ১৬৭ই।

মুসলমানদিগকে অসন্তুষ্ট করিতে অনিচ্ছুক হইয়া তাঁহারা স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া শৈব হইলেন।[১]

ডাঃ মোহন সিং-এর মতে বরোদার 'গায়কোয়াড়' উপাধি যে 'গোরক্ষ'র সহিত অভিন্ন এ কথা অধুনা স্বীকৃত হইতেছে।

গোরক্ষপুরে প্রবাদ যে গোরক্ষ পাঞ্জাব হইতে যুক্তপ্রদেশে আসেন ও তাঁহার প্রধান মঠ ঝিলাম প্রদেশের টিলায়।

গোরক্ষপুরে যে গোরক্ষ মন্দির আছে তাহার বিশেষ বিবরণ বুকানন হ্যামিলটন দিয়াছেন।

নেপালে বৌদ্ধ ও শৈব উভয় ধর্ম্মই আচরিত হয়। মহাযান বৌদ্ধ-মত প্রবল হইলেও গোরক্ষ কর্ত্তৃক শৈব ধর্ম্ম পরিপুষ্টি লাভ করে। এখনও পশ্চিম হিমালয় প্রদেশে কানফাটা যোগীরা বলিদান প্রভৃতি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। উত্তর ভারতে গোরক্ষকে ভক্তিমার্গের প্রতিদ্বন্দ্বী ও শৈবধর্ম্মের প্রতিনিধিরূপে চিত্রিত করিলেও ভক্তমালে মীননাথ ও গোরক্ষনাথ পরম বৈষ্ণবরূপে বর্ণিত হইয়াছেন।

পাঞ্জাবেও গোরক্ষনাথ ও তাঁহার শিষ্যদের সম্বন্ধে বহু উপাখ্যান আছে। স্যার রিচার্ড কার্ণাক টেম্পল সংগৃহীত উপাখ্যান মধ্যে গোপীচাঁদকে উজ্জয়িনীর রাজা বলা হইয়াছে। ময়নামতীর বিবাহ গৌড়বঙ্গে হয়, তিনি ভর্ত্তৃহরির ভগিনী ছিলেন। ময়নামতী তাঁহার পুত্র গোপীচাঁদকে জালন্ধরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে বলিলে, গোপীচাঁদ জালন্ধরকে কূপমধ্যে নিক্ষেপ করেন, তৎপরে গোরক্ষনাথ তাঁহাকে কূপ হইতে উদ্ধার করিলে গোপীচাঁদ ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া জালন্ধরের শিষ্য হইলেন। রাণীদ্বয় ও ভগিনী চম্পার নিকট গোপীচাঁদ বিদায় গ্রহণ করিলে চম্পা তাঁহার শোকে দেহত্যাগ করেন ও জালন্ধর কর্ত্তৃক পুনর্জ্জীবিত হন।

গোরক্ষের বিভূতি বর্ণনা পিঙ্গলা কাহিনীতে আছে। একদা ভর্ত্তৃহরি স্বীয় মৃত্যু বিষয়ে মিথ্যা সংবাদ রাণী পিঙ্গলাকে প্রেরণের ফলে রাণী অগ্নিতে দেহত্যাগ করেন। তখন শোকাচ্ছন্ন ভর্ত্তৃহরিকে সান্ত্বনা দিবার জন্য গোরক্ষ রাণীর জীবনদান করিলে ভর্ত্তৃহরি গোরক্ষনাথের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। গোরক্ষ কর্ত্তৃক গোপীচাঁদের ভগিনীকে জীবনদান ও মাণিকচন্দ্রের মৃত্যুর ১৮ মাস পরে তাঁহার বরে ময়নামতীর পুত্রলাভ কাহিনীও আছে।

১। E. R. E., Vol VI. Grierson's article; Levi, Le Nepal, Vol. I, p. 355 ff.

হিন্দী-সাহিত্যে বর্ণিত উপাখ্যান

মালিক মুহম্মদ জায়সী কর্ত্তৃক হিন্দীভাষায় রচিত পদ্মাবৎ কাব্যে গোপীচাঁদের যে উপাখ্যান পাওয়া যায় তাহা বঙ্গদেশে প্রচলিত কাহিনীর অনুরূপ। তবে গোপীচাঁদ কর্ত্তৃক জালন্ধরির পরীক্ষার কথা ইহাতে নাই। লক্ষ্মণদাস রচিত হিন্দী গাথাতে তিলকচন্দ্র, ময়নামতী ও চম্পার বৃত্তান্তও আছে। পুরুষোত্তম দাসের গোপীচাঁদের লীলাতে গোরক্ষনাথকে গোপীচাঁদের গুরু বলা হইয়াছে। অন্য এক কাহিনী অনুসারে ভর্ত্তৃহরিই স্বীয় ভাগিনেয়কে গোরক্ষনাথ সমীপে দীক্ষার্থ লইয়া যান।[১]

সৃষ্টির প্রারম্ভে বিষ্ণু পদ্ম হইতে উত্থিত হইয়া সমুদ্রের জলরাশি দেখিয়া ভীত হইলে, পাতালপ্রদেশে গোরক্ষের শরণাপন্ন হইলেন। গোরক্ষ ধূনাচি হইতে ভস্ম দান করিলে ও অভয় প্রদান করিলে, বিষ্ণু সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইলেন। তদবধি ব্রহ্মাবিষ্ণুশিব গোরক্ষের শিষ্য হইলেন এইরূপ কিংবদন্তী আছে।[২]

ভীম যখন হিমালয়ের মহাপ্রস্থানের পথে মৃত্যুমুখে পতিত হন, তখন গোরক্ষ তাঁহার জীবনদান করিয়া তাঁহাকে ভোটানের (মতান্তরে নেপালের) রাজা করিয়া দেন। নেপালী প্রবাদ অনুযায়ী যুধিষ্ঠিরের স্বর্গগমন কালে মাত্র ভীম জীবিত থাকেন ও গোরক্ষের কৃপায় নেপালের রাজা হন।[৩]

পশ্চিম-ভারতের উপাখ্যান

গুজরাটী উপাখ্যানমতে রাণী মেনাবতীর হার এক চোর অপহরণ করিয়া ধৃত হইবার ভয়ে ধ্যানস্থ জালন্ধরির কণ্ঠে উহা পরাইয়া দিলে, রাজভৃত্যেরা তাঁহার উপর নির্য্যাতন আরম্ভ করে। ধ্যানভঙ্গে যোগী শাপ দিলে গোবিন্দচন্দ্রের পিতা গৌড়বঙ্গের তিলকচন্দ্র মৃত্যুমুখে পতিত হন। মতান্তরে ধ্যানভঙ্গে যোগীর কোপদৃষ্টিতে তিনটী দাইলপূর্ণ পাত্র ভস্ম হইবার কথাও আছে। মিঃ ঝবেরীচাঁদ মেঘানে গোপীচাঁদ বিষয়ে গুজরাটী উপাখ্যান সংগ্রহ করিয়াছেন ও ননীলাল রায়চৌধুরী গোপীচাঁদের জন্ম 'দেব রত্নাকরে'র কৃপায় হয়, জালন্ধরির অভিশাপে রাজা তিলকের মৃত্যু

১। 6th Ort. Con. Pro.—G. Haldar's article, pp. 267-69.

২। Briggs, p. 229.

৩। E. R. E.—Gorakhnath.

ঘটে এইরূপ বর্ণনা দিয়াছেন। কাহিনীর শেষাংশকে বঙ্গীয় কাহিনীর অনুরূপ দেখাইয়াছেন।[১]

মহারাষ্ট্র প্রদেশেও চিত্রে ও নাটকে এই করুণ কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ চিত্রকর রবিবর্ম্মা দেশভ্রমণের পর সন্ন্যাসীবেশে রাণীদের সহিত গোপীচাঁদের সাক্ষাৎ চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন।

মারাঠী উপাখ্যান মতে মৈনাবতী জালন্ধারিনাথকে কাষ্ঠভার বহন করিতে দেখিয়া তাঁহার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া তাঁহার শিষ্যা হন। কাহিনীটির কিয়দংশ গুজরাটি কাহিনীর অনুরূপ। যোগীর ধ্যানভঙ্গে তাঁহার কোপদৃষ্টিতে রাজার তিনটী স্বর্ণ-প্রতিকৃতি ভস্মীভূত হইবার কথা আছে। জালন্ধরনাথের জন্মবৃত্তান্ত এইরূপ—

একদা শিবপার্ব্বতী একটী শিশুকে সমুদ্রের তরঙ্গে ভাসিয়া যাইতে দেখেন। শিব দয়া করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়া দীক্ষা দেন—ইনিই 'জালন্ধর' নামে খ্যাত। গোপীচন্দ্র ইঁহাকেই দ্বাদশবর্ষ কূপে আবদ্ধ করিয়া রাখেন, তৎপরেও ইঁহার দেহনাশ না হওয়ায় মুগ্ধ হইয়া ইঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ভর্তৃহরি, মৈনাবতী, লীলাবতী প্রভৃতি এই সম্প্রদায়ের।[২]

উড়িষ্যা-প্রদেশের কাহিনী

উড়িয়া ভাষায় রচিত গোবিন্দচন্দ্র গীত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব মহাশয় ময়ূরভঞ্জ হইতে লিপিবদ্ধ করিয়া আনেন। তাহার কিয়দংশ বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ের প্রথম খণ্ডে উদ্ধৃত হইয়াছে। কাহিনীটি বাঙ্গালা কাহিনীর অনুরূপ।

দাক্ষিণাত্যে গোরক্ষনাথের যোগবর্ণনা

দাক্ষিণাত্যে দ্বাদশ শতাব্দীতে সিদ্ধ আলমপ্রভুর সহিত সিদ্ধ গোরক্ষনাথের যে তর্ক হয় তাহার বিররণ লিঙ্গধারণচন্দ্রিকায় পাওয়া যায়। উহাতে গোপীচাঁদের বৃত্তান্ত নাই বটে, কিন্তু গোরক্ষনাথের অলৌকিক শক্তির যে পরিচয় আছে তাহার পরিচয় অন্যত্র (কায়সিদ্ধি অধ্যায়ে) দেওয়া যাইতেছে।[৩]

১। 6th Ort. Con. Pro. (Patna, 1930)—G. Haldar's article, Raja Gopichand.

২। কল্যাণ যোগাঙ্ক শ্রীজালন্ধরনাথ।

৩। লিঙ্গধারণচন্দ্রিকা—সাকারে, পৃ ৩৪৭।

কবীরাদির গ্রন্থে গোরক্ষর যোগবর্ণনা

কবীরের বীজকে গোরক্ষনাথের স্পর্শমণি বা অলৌকিক সিদ্ধির কথা আছে। দত্তাত্রেয়ের সহিত তর্ক ও গোরক্ষের অদৃশ্য হইবার কথা দাবিস্তানে উল্লিখিত হইয়াছে।

ভারতের সর্ব্বজনপ্রিয় কাহিনী

বঙ্গদেশ হইতে প্রথমে পশ্চিমে বিহারে, তৎপরে পাঞ্জাব, রাজপুতানা, মধ্যভারত, গুজরাট, মহারাষ্ট্রপ্রদেশে গোপীচাঁদ কাহিনী প্রচারিত হইতে থাকে ও রামায়ণ মহাভারতের ন্যায়ই জনপ্রিয় হইয়া উঠে। অদ্যাপি রংপুরে এই গীত 'পালা-গান' রূপে গীত হয়। তাহার মূল গায়ক অধিকাংশ স্থলেই মুসলমান। ধুয়া গাহিবার জন্য তাহাদের দল থাকে। যোগী গায়কেরা বৈরাগী শ্রেণীর। চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা অঞ্চলে গোপীচাঁদের পুথি পাঠ হয়। উত্তর ভারতে সারঙ্গী সাহায্যে গীত গাওয়া হয়। গুজরাটের বাউলেরা একতারা সাহায্যে গোপীচাঁদের গীত গাহিয়া থাকেন; নারীরাও দেবীর নবরাত্র পূজায় গর্ব্বা নৃত্যসহ এই গীত গাহিয়া থাকেন।[১]

বিভিন্ন কাহিনী হইতে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায় যে শ্রীআদিনাথ এই মার্গের উপদেষ্টা এবং মৎস্যেন্দ্র ও গোরক্ষ তাঁহার কৃপাতেই নাথধর্ম্ম প্রচার করিতে সমর্থ হন। গোরক্ষের অলৌকিক ক্ষমতায় ভর্ত্তৃহরি, গোপীচাঁদ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশের রাজগণও তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া নাথধর্ম্ম প্রচারের সহায়তা করেন। গোরক্ষের শিষ্যা ময়নামতীর নামই সমধিক প্রসিদ্ধ। নাথগুরুদিগের সহিত যোগ থাকাতেই গোপীচাঁদের গীত এরূপ প্রচার লাভ করে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ঐতিহাসিক তারানাথের মতে নাথেরা শৈব ছিলেন ও ইন্দ্রজাল প্রদর্শনের ক্ষমতার জন্য সর্ব্বত্র প্রিয় হন। মীননাথের কাহিনী উপকথা জাতীয় হইলেও, গোবিন্দচন্দ্রের উপাখ্যানের মূলে কিছু বাস্তবতা আছে, কিন্তু পরস্পর-বিরোধী ঘটনার অন্তরালে ঐতিহাসিকতার বীজ আত্মগোপন করিয়াছে। গোপীচাঁদের রাজত্বকাল, তাঁহার ধর্ম্ম, তাঁহার

১। প্রবাসী, ১৩৩৬, পৃ ৬৩৬—গুজরাটে গোপীচাঁদের গান, ননীলাল রায়চৌধুরী।

রাজত্ব বিষয়ে ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চলিয়াছে তাহার সামান্য আলোচনা ঐতিহাসিক তথ্য অধ্যায়ে করা যাইবে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ও বঙ্গদেশে প্রচলিত কাহিনীর মধ্যেও অবান্তর কাহিনী ও অপ্রধান পাত্রপাত্রী লইয়া ভেদ দৃষ্ট হইলেও মূল কাহিনীটিতে ভেদ নাই।

এই সর্ব্বজনপ্রিয় কাহিনী আলোচনায় নিম্নের কয়েকটি প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হয়ঃ—

১। মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথ কে? তাঁহাদের কাল ও ধর্ম্মমত কি?

২। গোরক্ষ প্রভৃতি নাথসিদ্ধদিগের সহিত গোপীচাঁদের সম্বন্ধ কি এবং গোপীচাঁদের ঐতিহাসিকতাই বা কতটুকু?

৩। নাথপন্থের মূল কোথায়?

আমরা একে একে উক্ত প্রশ্নগুলি সমাধানের চেষ্টা করিব। মীননাথ, গোরক্ষনাথ, জালন্ধরিপাদ, কানুপা প্রভৃতি ঐতিহাসিক ব্যক্তি, ইঁহাদের বিষয়ে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে, তাহার উল্লেখও করিতেছি। লুইপা ও মীননাথ অভিন্ন হইলে তাঁহার, জালন্ধরিপাদের ও কানুপার বাংলা পদও আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু গোরক্ষনাথের হিন্দী ব্যতীত কোন বাংলা পদ এযাবৎকাল পাওয়া যায় নাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মৎস্যেন্দ্র ও গোরক্ষনাথ কে? তাঁহাদের প্রাদুর্ভাব কাহিনী ও ঐতিহাসিকতা

মৎস্যেন্দ্র কাহিনী ঃ

নেপালে মৎস্যেন্দ্র বিষয়ে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য এই দ্বিবিধ কাহিনী প্রচলিত আছে। বৌদ্ধমতে মৎস্যেন্দ্র অবলোকিতেশ্বরের অবতার। একদা গোরক্ষ গুরু দর্শনে আসিয়া নেপালের দুরারোহ পর্ব্বতশ্রেণী দেখিয়া গুরু সাক্ষাৎকারে ক্ষান্ত হইয়া নবনাগকে আবদ্ধ করিয়া তদুপরি ধ্যানাসনে বসিলেন, তৎফলে দ্বাদশ বর্ষ অনাবৃষ্টি হইয়া নেপালে দুর্ভিক্ষ হইল। ইহার প্রতিকারার্থে নেপালের রাজা স্বীয় গুরুসহ অবলোকিতেশ্বরের পূজা দিয়া গুপ্ত মন্ত্র লাভ করেন এবং কৃষ্ণভ্রমরের রূপে অবলোকিতেশ্বরকে কমণ্ডলু মধ্যে আবদ্ধ করিয়া বুগাম সহরে আনয়ন করিয়া তাঁহাকে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করেন। নেপালে তৎপরে বৃষ্টিপাত হইয়া দুর্ভিক্ষ নিবারিত হয়। প্রবাদ যে এই অবলোকিতেশ্বরই মৎস্যেন্দ্রনাথ। কাহিনীর শেষাংশে গোরক্ষের উল্লেখ নাই। অদ্যাপি প্রতিবৎসর বুগাম সহরে মৎস্যেন্দ্রের রথযাত্রা হইয়া থাকে। ইহা পুরীর জগন্নাথের রথযাত্রার ন্যায় মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়।[১] একদা নেপালরাজ শ্রীবসন্তদেবজী রাজ্যচ্যুত হন এবং মৎস্যেন্দ্রের আশীর্ব্বাদে উহা পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া প্রতি বৈশাখ মাসে ভোগমতী নদী তীরে তাঁহার উৎসবের ব্যবস্থা করেন।[২]

কৌলজ্ঞাননির্ণয় পুথিতে মৎস্যেন্দ্রের নামান্তর ভৃঙ্গীপাদ (১৬ পটল, ১৭ শ্লোক)। ইহা দ্বারা নেপাল-রাজ কর্তৃক কৃষ্ণভ্রমরের রূপে আবদ্ধ হইয়া তাঁহার বুগামে নীত হওয়ার কাহিনী সূচিত হইতেছে। লেভি বলিয়াছেন, বুগাম লোকেশ্বর নেপালে পূর্ব্ব হইতেই পূজিত হইতেন, পরে ইঁহাকে মৎস্যেন্দ্রাভিন্ন স্থির করা হয়। মৎস্যেন্দ্রকে 'লোহিত অবলোকিতেশ্বর' ও তদীয় ভ্রাতা মীননাথকে 'সান্থু মৎস্যেন্দ্র' রূপে পূজা করা হয়। কেহ কেহ

১। Briggs, pp. 144-145, 231, etc.
লেভি নেপাল, ১ম খণ্ড, পৃ ৩৪৭ ইত্যাদি—বাগচীর কৌলজ্ঞাননির্ণয়ের ভূমিকায় উল্লেখ।

২। কল্যাণ, যোগাঙ্ক, পৃ ৭৮৩—শ্রীমৎস্যেন্দ্রনাথ।

মীননাথকে মৎস্যেন্দ্রের পুত্র বলিয়া মনে করেন, আবার কাহারও মতে মৎস্যেন্দ্র ও মীননাথ অভিন্ন।[১] এ বিষয় এই নিবন্ধের অন্যত্র আলোচিত হইতেছে, অতএব পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। যোগীন্দ্র সাত্মারামের গুরু-পরম্পরায় মৎস্যেন্দ্র ও গোরক্ষনাথের মধ্যে যথাক্রমে নাথ, সরহ, আনন্দ, ভৈরব, গৌরাঙ্গ ও মীননাথ এই ছয়টী গুরুর উল্লেখ পাওয়া যায়।

অধ্যাপক ফাউচার নেপাল সম্বন্ধে যে পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে বুগাম লোকেশ্বরের উল্লেখ থাকিলেও, তাঁহাকে মৎস্যেন্দ্রাভিন্ন বলার প্রশ্ন উঠে নাই ; নেপালের রাজবংশের প্রাচীনতম বৌদ্ধ তালিকাতে (আনুমানিক ১৩শ শতাব্দীর) রাজগুরু বন্ধুদত্ত কর্তৃক বুগাম লোকেশ্বরের রথযাত্রার উদ্বোধন কথা আছে মাত্র, অতএব মৎস্যেন্দ্রনাথের সহিত বুগাম লোকেশ্বরের অভিন্নত্ব প্রতিষ্ঠা পরবর্ত্তী কালের ঘটনা বলিয়া অনুমান হয়। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পরবর্ত্তী কাল হইতেই নাথগুরুদিগের শ্রেষ্ঠত্ব দেশদেশান্তরে প্রচারিত হইতে থাকে, অতএব সেই যুগেই মৎস্যেন্দ্রকে অবলোকিতেশ্বর রূপ দেবতার স্থানে প্রতিষ্ঠিত করা বিচিত্র নহে।[২]

নাথগুরুরা হিন্দু ছিলেন, গোরক্ষনাথ পূর্ব্বে বৌদ্ধ ছিলেন ও স্বধর্ম্ম ত্যাগ করায় নেপালী বৌদ্ধরা তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট, কিন্তু মৎস্যেন্দ্র কৈবর্ত্ত হইয়াও তাহাদের পূজা পাইয়াছেন। মৎস্যেন্দ্রের রচিত 'কৌলজ্ঞাননির্ণয়' পুথি নেপালে সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে, ইহাতে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের উল্লেখ মাত্র নাই, ইহা হরপার্ব্বতী সংবাদ আকারে রচিত। অথচ মীননাথের বাংলা পদ একটী বৌদ্ধগ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে এবং তাহাকে 'পরদর্শনের মত' বলা হইয়াছে।[৩]

মৎস্যেন্দ্রের জন্মস্থান :

কৌলজ্ঞান পুথি মতে মৎস্যেন্দ্রের জন্মস্থান চন্দ্রদ্বীপে, ইহা সম্ভবতঃ কামরূপের নিকটবর্ত্তী স্থান। ইহাতে মৎস্যেন্দ্রের পতন কাহিনী নাই। মৎস্যেন্দ্র সিদ্ধকৌলান্তর্গত যোগিনী কৌল ছিলেন, পুথির ভণিতায় ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। উপরন্তু 'কামরূপ ইদং শাস্ত্রং যোগীনাং গৃহে গৃহে' (২২।১০) পুথির এই বর্ণনার সহিত কামরূপে মৎস্যেন্দ্রের যোগধর্ম্ম প্রচার কাহিনীর যে প্রবাদ আছে তাহার সাদৃশ্য দেখা যায়।

১। বাগচী, কৌলজ্ঞাননির্ণয় ভূমিকা, পৃ ৭, ১২, ২৩, ২৪ দ্রষ্টব্য ; হঠযোগপ্রদীপিকা, ১।৫৯ দ্রষ্টব্য।
২। বাগচী ভূমিকা, পৃ ১৩।
৩। প্রবাসী, বৈশাখ ১৩২২—'নাথপন্থ' হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

নিত্যাহ্নিকতিলকম্ মতেও মৎস্যেন্দ্রের জন্ম বঙ্গদেশে, যথা—

বরণা বঙ্গদেশে জন্ম জাতি ব্রাহ্মণঃ বিষ্ণুশর্ম্মা নাম। মর্কটনস্থাং যদা কর্ষিতা তদা শ্রীমৎস্যেন্দ্রনাথ। অস্তৈব শক্তিঃ শ্রীললিতাভৈরবীঅম্বাপপূ।[১]

ইহাতে ষোড়শ গুরুর উল্লেখ আছে, প্রত্যেকের নামের সহিত শক্তির নাম যুক্ত আছে দেখা যায়। উত্তর ভারতই এই গুরুদের জন্মস্থান।

শাস্ত্রীমহাশয়ের মতে পূর্ব্ববঙ্গে চন্দ্রগোমীন বৈয়াকরণিক বরেন্দ্র উত্তর বঙ্গ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া 'চন্দ্রদ্বীপে' বাস করেন। এই 'চন্দ্রদ্বীপ' বঙ্গদেশের সমুদ্রতীরের কোন্ অংশটুকু তাহা এখন নির্ণয় করা কঠিন। বাখরগঞ্জ, সুন্দরবন প্রভৃতি ঐ নামে পরিচিত ছিল। বঙ্গোপকূলদেশ অর্দ্ধচন্দ্রাকার বলিয়া চন্দ্রদ্বীপ নাম হওয়াও বিচিত্র নহে। চন্দ্রদ্বীপ কি ক্রমশঃ সন্দ্বীপে পরিণত হইয়াছে? বোগদাদ হইতে দ্বাদশজন আওলিয়া অর্থাৎ ফকির মৎস্যে আরোহণ করিয়া সন্দ্বীপে আগমন করেন, এইরূপ একটি বিচিত্র কাহিনী আছে। নোয়াখালীর সন্দ্বীপে অধিকাংশ যোগী-জাতির বাস, ইহারা নিজেদের মৎস্যেন্দ্র সম্প্রদায়ভুক্ত বলে। সম্ভবতঃ মৎস্যেন্দ্র সমুদ্রতীরের সন্দ্বীপে শিষ্যাদি গ্রহণ করিয়া তৎপরে কামরূপে যোগধর্ম্ম প্রচারার্থ গমন করেন।[২]

নারদপুরাণে মৎস্যেন্দ্রের প্রাদুর্ভাব কাহিনী আছে। শক্তিস গম তন্ত্রে নেপাল রাজ্যের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা, সাক্ষাৎ ঈশ্বরস্বরূপ, শ্রীমৎস্যেন্দ্রনাথজীর উল্লেখ আছে। স্কন্দপুরাণে মৎস্যেন্দ্রের অশুভলগ্নে জন্ম ফলে পিতামাতা কর্ত্তৃক সমুদ্রে নিক্ষেপ কাহিনী, মৎস্যোদর হইতে শিবের যোগব্যাখ্যা শ্রবণ ও শিব কর্ত্তৃক উদ্ধার প্রাপ্তির কাহিনী আছে।[৩]

বঙ্গদেশে মৎস্যেন্দ্রের পতনকাহিনী কদলীনগর বা কামরূপের সহিত জড়িত। ভট্টশালী মহাশয় "স্ত্রী-স্বাধীনতার দেশ"রূপে এই কামরূপকে মণিপুর, ব্রহ্মদেশ বলিয়া অনুমান করেন।[৪] ডাক্তার শহীদুল্লাহর মতে 'কদলীনগর' সম্ভবতঃ আসামস্থ 'কচলী' বা 'কাছার'।[৫] তিব্বতী ভাষায় রচিত গ্রন্থ প্যাগস্বামগোমবজানে কদলী ক্ষেত্রের উল্লেখ আছে।

১। বাগচী ভূমিকা, পৃ ৬৮।

২। বাগচী, ভূমিকা, পৃ ২৯-৩২।

৩। কল্যাণ, সন্ত অঙ্ক, পৃ ৪৭৯—নাথসম্প্রদায়ের মহাসিদ্ধ। যোগিসম্প্রদায়াবিষ্কৃতি, পৃ ১৫।

৪। ময়নামতীর গান (ঢাকা সাহিত্য পরিষদ), পৃ ১২২, টীকা।

৫। Les Chantes Mystiques, p. 27 fn, Ch. II.

তথায় যাইতে হইলে পথে গোপীচন্দ্রের রাজ্য পড়িত। রাজমোহন নাথ মহাশয় 'কদলীরাজ্য' নামক পুস্তিকায় ইহার বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। মতান্তরে মৎস্যেন্দ্র সিংহলের রাণীর মায়ায় আবদ্ধ হন, পরবর্ত্তী কালে এই রাণীর গর্ভজাত মৎস্যেন্দ্রের দুই পুত্র পরেশনাথ ও নিমনাথ জৈনধর্ম্ম প্রচার করেন।[১]

বোম্বাই অঞ্চলে 'মায়ামচ্ছীন্দর' নামক ছায়াচিত্রের খুব প্রচলন। এই চিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে যে শিষ্য গোরক্ষের আত্মাভিমান বিনষ্ট করিতেই মহাসিদ্ধ মৎস্যেন্দ্রনাথ স্বেচ্ছায় ভোগীরূপ ধারণ করেন। গোরক্ষ গুরুকে উদ্ধার করিয়া তাঁহাকে যোগাশ্রমে ফিরিয়া আসিতে স্বীকৃত করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন যে গুরু অন্তর্হিত হইয়াছেন ও গোদাবরী তীরে সমাধিস্থ আছেন। ইহাতে শিষ্যের চৈতন্য হইল। ভক্তের মনোবথ পূর্ণ করিতে মৎস্যেন্দ্র যে আপন শক্তি দ্বাবা বিভিন্ন রূপ ধারণ করিতে সমর্থ, তাহা গোরক্ষনাথ উপলব্ধি করিলেন।[২]

গোরক্ষ কাহিনী ঃ

নেপালে প্রচলিত ব্রাহ্মণ্যকাহিনী অনুসারে মহাদেব একটী পুত্রকামা নারীকে ভক্ষ্য (মতান্তরে ভস্ম) প্রদান করিলে, সে তাহাতে অবিশ্বাস করিয়া তাহা গোময়ে নিক্ষেপ করে। ইহার দ্বাদশ বৎসর পরে মহাদেবের অনুসন্ধান ফলে সেস্থানে 'গোরক্ষনাথ' আবিষ্কৃত হন। এই গোরক্ষ মৎস্যেন্দ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।[৩] ভবিষ্যৎকালে গোরক্ষ গুরুদর্শনে নেপালে গমন করিলে, সেখানে অনাদৃত হইয়া মেঘপুঞ্জকে আবদ্ধ করিয়া অনাবৃষ্টির সঞ্চার করেন। হঠাৎ সেই পথে গুরু মৎস্যেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইলে বাধ্য হইয়া গোরক্ষনাথকে দণ্ডায়মান হইতে হয়, মেঘেরাও মুক্ত হইয়া বারিবর্ষণ আরম্ভ করে। এই কাহিনী হইতে মৎস্যেন্দ্র যে গোরক্ষের গুরু ছিলেন, তাহা জানা যায়। মৎস্যেন্দ্রের পূর্ব্ববৃত্তান্ত ইহাতে নাই। পূর্ব্বোক্ত মৎস্যেন্দ্র সম্বন্ধীয় বৌদ্ধ কাহিনীটী ইহারই পল্লবিত ও পরবর্ত্তী সংস্করণ বলিয়া অনুমান হয়।[৪]

১। Briggs, pp. 72-73, 233.

২। কল্যাণ, সন্ত অঙ্ক, পৃ ৪৮০-৮১—নাথসম্প্রদায়ের মহাসিদ্ধ।

৩। কল্যাণ, যোগাঙ্ক—যোগিরাজ শ্রীগোরক্ষনাথ, পৃ ৭৮৩।

৪। বাগচী, ভূমিকা, পৃ ১২, কৌলজ্ঞাননির্ণয়।

নেপালের মুদ্রায় শ্রীগোরক্ষের নাম অঙ্কিত থাকে। সেখানে তাঁহার পশুপতিনাথের তুল্য সম্মান। গোরক্ষনাথ স্তোত্রে "'গ'কার গুণসংযুক্ত, 'র'কার রূপলক্ষণ, 'ক্ষ'কারেণ অক্ষয় ব্রহ্ম শ্রীগোরক্ষ নমোঽস্তু মে" দ্বারা গোরক্ষ শব্দের মাহাত্ম্য বর্ণন করা হইয়াছে।[১]

গোরক্ষের জন্মবৃত্তান্ত ঃ

গোরক্ষের জন্মকথা রহস্যাবৃত। গোরক্ষ সিদ্ধান্ত সংগ্রহে ইঁহাকে 'ঈশ্বর-সন্তান' বলা হইয়াছে (পৃ ৪০ দ্রষ্টব্য)। সম্ভবতঃ কবীরাদির ন্যায় কোন অখ্যাতনামা বংশে গোরক্ষের জন্ম হওয়ায় তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে। তথাপি গোরক্ষ-চরিত্র শরৎ-শেফালিকা বা যূথিকার ন্যায় শুভ্র, তাঁহার চরিত্র মাহাত্ম্য বঙ্গ-সাহিত্যের আদিযুগের একটি প্রধান দিক্‌নির্দ্দেশক স্তম্ভ।[২] স্বয়ং দেবী ভগবতী ইঁহার চরিত্রের নিকট পরাজিত হইয়াছেন। গোরক্ষের বিষয়ে বঙ্গভাষায় কাব্য রচিত হইলেও, তাঁহার জন্মবৃত্তান্তের উল্লেখ উত্তর-পশ্চিম ভারতের যোগিসম্প্রদায় মধ্যে মাত্র পাওয়া যায়। নেপাল, গোরক্ষপুর, পাঞ্জাব প্রভৃতি গোরক্ষের জন্মস্থানরূপে নির্দ্দেশিত হইয়াছে। ডাঃ মোহন সিং গোরক্ষনাথকে পেশোয়ারের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানের অধিবাসী বলিয়া স্থির করিয়াছেন।[৩] বঙ্গীয় কাব্য 'গোরক্ষ বিজয়' হইতে গোরক্ষের জন্ম মহাদেবের জটা হইতে এইরূপ বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। গোরক্ষের অন্যান্য জন্মবৃত্তান্ত সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ

ক। পুত্রকামা জনৈক নারীর শিব কর্ত্তৃক ভস্ম প্রাপ্তি, উহা গোময়ে নিক্ষেপ ফলে গোরক্ষের জন্ম। সমুদ্র হইতে মৎস্য কর্ত্তৃক গোরক্ষের গুরু প্রাপ্তি, তাই গুরুর নাম 'মৎস্যেন্দ্রনাথ'। গোরক্ষের ধর্ম্ম প্রচার ও দ্বাদশ শিষ্য লাভ।

খ। নিরাকার নিরঞ্জনের ঘর্ম্ম হইতে গোরক্ষের উৎপত্তি। ইনি মৎস্যজাত মৎস্যেন্দ্রের পিতা, নিজ পাপস্খালনের জন্য গুরু অন্বেষণ এবং অবশেষে স্বীয় পুত্রকেই গুরুপদে বরণ।

গ। শিব বিষ্ণুর মোহিনীরূপে মুগ্ধ হইলে মৎস্যেন্দ্রের জন্ম হয়। একটী গরু ইঁহাকে লালন পালন করে।

১। গো. সি. স., পৃ ৪২।
২। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, দীনেশ সেন, পৃ ৬০ (৫ম সং)।
৩। সিং, গোরক্ষনাথ দ্রষ্টব্য।

ঘ। শিব জালন্ধর নামে জনৈক দুষ্টকে স্বীয় বশে আনেন। এই জালন্ধরের দুইটী শিষ্য—মচ্ছেন্দ্র ও জালন্ধরিপা। মচ্ছেন্দ্রর শিষ্য গোরক্ষ ও জালন্ধরিপা (পা—পন্থের প্রবর্ত্তক)। মৎস্যেন্দ্রের পতন, গোরক্ষের মক্ষিকারূপে গুরু উদ্ধার, সপ্তশিষ্য দ্বারা সপ্ত সম্প্রদায়ের প্রচলন ইত্যাদিরও বর্ণনা আছে।[১]

গোদাবরী তটে ব্রাহ্মণীগর্ভে গোরক্ষের জন্ম ও দ্বাদশবৎসরান্তে মৎস্যেন্দ্র কর্ত্তৃক আন্তর্ধানিক রীতিতে সম্প্রদান, গোরক্ষের গোসেবা, যোগধর্ম্ম শিক্ষা ইত্যাদি কথাও পাওয়া যায়।[২] স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত ভক্তিবিলাসের ৫১, ৫২ অধ্যায়ে গোরক্ষ অবতারের কথা আছে।[৩]

এই সকল কাহিনী হইতে মৎস্যেন্দ্রনাথই যে গোরক্ষের গুরু এই তথ্য সংগ্রহ করা কঠিন নহে। বঙ্গদেশে গোরক্ষের জন্মকথা অজ্ঞাত থাকিলেও, মৎস্যেন্দ্রের জন্ম বঙ্গদেশের সমুদ্রতীরে ও তিনি 'শিবপুত্র' ও শিবসম্ভূত তাহা সর্ব্বত্র স্বীকৃত। মৎস্যেন্দ্র ও গোপীচন্দ্র রাজার কাহিনী মূলতঃ বঙ্গদেশের। তবে গোরক্ষনাথ গোপীচন্দ্রের মাতা ময়নামতীর গুরুরূপে স্বীকৃত হইয়াছেন। পাঞ্জাব কাহিনী অনুসারে গোপীচাঁদ উজ্জয়িনীর রাজা হইলেও, তাঁহাব জন্মস্থান গৌড় বঙ্গদেশে। গোপীচন্দ্রের দেশ ত্রিপুরা জিলায়, সেখান হইতে গৌড়, কামলাক যাওয়া যাইত। শ্রীহট্টের প্রাচীন নাম গৌড়, কুমিল্লার প্রাচীন নাম কামলাক। পদ্মপুরাণে শ্রীহট্ট গৌড়ের উল্লেখ আছে।[৪] বঙ্গীয় মৎস্যেন্দ্র বা গোপীচন্দ্রের কাহিনী হইতে গোরক্ষের জন্মস্থান নির্দ্ধারণ সম্ভবপর নহে। অতএব উহা অদ্যাপি অজ্ঞাতই রহিয়া গিয়াছে।

মৎস্যেন্দ্র-গোরক্ষনাথের ঐতিহাসিকতা

গ্রন্থাদিতে উল্লেখ ঃ

মৎস্যেন্দ্র গোরক্ষনাথের প্রাদুর্ভাব সম্বন্ধীয় কয়েকটি কাহিনী বর্ণিত হইল। এক্ষণে গ্রন্থাদি বা শিলালিপিতে তাঁহাদের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় কি না তাহাই বিচার্য্য, কারণ ইহা দ্বারা তাঁহাদের ঐতিহাসিকতা নির্ণয় করা সাধ্য হইবে। মৎস্যেন্দ্র ও গোরক্ষনাথের

১। Briggs, pp 182, 183 ff.

২। যোগিসম্প্রদায়াবিষ্কৃতি, পৃ ৩১।

৩। কল্যাণ, সন্ত অঙ্ক, পৃ ৪৭৯—নাথসম্প্রদায়ের মহাসিদ্ধ।

৪। গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস, পৃ ১০১ টীকা।

মধ্যে গোরক্ষের নামই সমধিক প্রসিদ্ধ হওয়ায় দাবিস্তান, বীজক, গোরক্ষনাথকী গোষ্ঠীতে গোরক্ষের উল্লেখ পাওয়া যায়। মৎস্যেন্দ্র স্বীয় উপযুক্ত শিষ্যকে ভারার্পণ করিয়া যুধিষ্ঠির সম্বৎ ১৯৩৯তে অন্তর্হিত হন বা গিরনার পর্ব্বত মধ্যে সমাধিস্থ হন, এইরূপ প্রবাদ আছে।[১]

দাবিস্তানে গোরক্ষের যোগবৃত্তান্ত আছে (১ম খণ্ড, পৃ ১২৭)। দাবিস্তান লেখক গোরক্ষের রচনাও উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে (পৃ ১২২) গোরক্ষকে মহম্মদের পালক পিতা ও শিক্ষাগুরু বলা হইয়াছে। গোরক্ষের মুসলমানী নাম 'রীন হাজি'। সিন্ধুদেশে তিনি দাতার জামিল শাহ নামে পরিচিত ছিলেন ও গুগাকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষা দেন, ইহার উল্লেখ আছে।[২]

দত্তাত্রেয়ের সহিত তর্ক উপস্থিত হইলে গোরক্ষ মণ্ডুকরূপে জলে অদৃশ্য হন, আবার দত্তাত্রেয় জলের রূপ ধারণ করিয়া জল মধ্যে অদৃশ্য হইলে গোরক্ষ তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে অসমর্থ হন, ইহার উল্লেখও দাবিস্তানে পাই।[৩]

অন্যত্র দাবিস্তানে মৎস্যেন্দ্রকে খৃষ্টানদের Jonahও বলা হইয়াছে।[৪] বাস্তবিকপক্ষে মৎস্যেন্দ্র না ব্রাহ্মণ্য, না বৌদ্ধ, না মুসলমান, কোন দেবমণ্ডলীর মধ্যে স্থান না পাইয়াও যোগিশ্রেষ্ঠরূপে গণ্য হইয়াছেন। মৎস্যেন্দ্রকে বিষ্ণুস্বামীরূপে প্রমাণেরও চেষ্টা করা হইয়াছে। 'গোরক্ষকী মায়াসার' নামক কাহিনীতে তাঁহাকে মহাবিষ্ণুসঙ্গ বলা হইয়াছে। পণ্ডিতেরা তাঁহাকেই প্রাচীন বিষ্ণুস্বামী বলিয়া অনুমান করেন। গোরক্ষ বিজয় (পৃ ৪৩) গ্রন্থেও মৎস্যেন্দ্রকে বৈষ্ণব বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু মৎস্যেন্দ্র 'কৌল' বা 'শৈব' ছিলেন।

গোরক্ষনাথকী গোষ্ঠীতে কবীর ও গোরক্ষের বার্ত্তালাপের মধ্যে গোরক্ষ নিজেকে মৎস্যেন্দ্রের পুত্র ও আদিনাথের পৌত্ররূপে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এই আদিনাথ অর্থে শিব বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কবীরের কাল ষোড়শ শতাব্দী। কবীর তাঁহার 'বীজকে'র বিভিন্ন স্থানে গোরক্ষনাথের উল্লেখ করিয়াছেন। উইলসনের মতে গোরক্ষ কবীরের

১। যোগিসম্প্রদায়াবিষ্কৃতি, পৃ ১৬২, ১৬৩, ২২৮।

২। Briggs, p. 181.

৩। দাবিস্তান, ২য় খণ্ড, পৃ ১৪০।

৪। দাবিস্তান, ২য় খণ্ড, পৃ ১৩৭।

সমসাময়িক প্রতিদ্বন্দ্বী।[১] কবীরের ন্যায় নানকের সহিতও গোরক্ষ ও মৎস্যেন্দ্র উভয়ের কথোপকথন বৃত্তান্ত 'জনমশাখী'তে বর্ণিত আছে। নানকের কাল ১৪৬৯-১৫৩৮ খৃষ্টাব্দ। একদা সিংহলে নানককে গোরক্ষ বলিয়া ভ্রম করার কথায় এইটুকু অনুমান করা যাইতে পারে যে ১৫শ শতাব্দীতেও গোরক্ষের মত প্রবল ছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীর লিপিতে নেপালে এক শিলায় এই বাক্যগুলি উৎকীর্ণ হইয়াছে দেখা যায়ঃ "যোগিশ্রেষ্ঠবা তাঁহাকে 'মৎস্যেন্দ্রনাথ' বলেন, শক্তি উপাসকেরা তাঁহাকে 'শক্তি' আখ্যা দেন, বৌদ্ধরা তাঁহাকে 'লোকেশ্বর' নামে অভিহিত করেন, যিনি স্বরূপতঃ ব্রহ্ম সেই পুরুষের জয় হউক।" এই লিপির কাল নির্ণয় হইয়াছে ১৬৭২ খৃষ্টাব্দ।[২]

মৎস্যেন্দ্রনাথ নেপালীদের রক্ষকস্বরূপ দেবতা ও রাজ্যের ভাগ্যবিধাতা। তিনি বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও অবলোকিতেশ্বরের অবতার। অবলোকিতেশ্বর চতুর্থ বোধিসত্ত্ব, এ যুগের ভারবহন কার্য্য তাঁহারই উপর ন্যস্ত, কারণ বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন বোধিসত্ত্বের উপর রক্ষা ও সংহার ভার আছে। পঞ্চধ্যানীবুদ্ধের আত্মজ পঞ্চবোধিসত্ত্বরূপে গণ্য।[৩] শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে মৎস্যেন্দ্রের কৌলগ্রন্থ হইতে তাঁহাকে বৌদ্ধ বলা যায় না, তিনি নাথদের গুরু হইয়াও নেপালী বৌদ্ধদের উপাস্য দেবতা হন (বৌদ্ধ গান ও দোঁহা পৃ ১৬)।

অবলোকিতেশ্বর শিবকে যোগধর্ম্ম শিক্ষা দেন। শিব সমুদ্র উপকূলে তাহা পার্ব্বতীকে ব্যাখ্যা করিবার কালে মৎস্যরূপী মৎস্যেন্দ্র উহা শ্রবণ করিয়া যোগধর্ম্ম প্রচার করেন। গোরক্ষপদ্ধতির ভূমিকায় ও জ্ঞানেশ্বরীতে (১৮, ১৭৫২) এইরূপ বৃত্তান্ত আছে। 'জ্ঞানেশ্বরী' ও 'গোরক্ষপদ্ধতি' উভয় গ্রন্থই বিখ্যাত, তথাপি মৎস্যরূপী মৎস্যেন্দ্রনাথের কাহিনীর মধ্যে সত্য ঘটনা কতটুকু তাহাই বিচার্য্য।

অবলোকিতেশ্বরের অপর নাম লোকনাথ বা লোকেশ্বর। ইনি পরম তপস্বী ও ঐন্দ্রজালিক। খৃষ্টীয় ধর্ম্মের আদিযুগে ইঁহার মত প্রচলিত ছিল। ইঁহার বীজমন্ত্র 'ওঁ মণিপদ্মে হুম্' অদ্যাপি বৌদ্ধগণ কর্তৃক উচ্চারিত হইতেছে। স্বর্গে প্রবেশলাভ ও নরক হইতে অব্যাহতি পাইবার

১। E. R. E., Vol. VI—Gorakhnath.

২। E. R. E., Vol., VI, pp. 256-61—Vallee Poussin.

৩। Briggs, p. 231—Refs. to Wright's History of Nepal, etc., etc.

একমাত্র সহায় এই বীজমন্ত্র। নেপালে দ্বাদশ বর্ষ অনাবৃষ্টি হওয়ার ফলে মৎস্যেন্দ্রকে কপোতল বা পোতল পর্ব্বত হইতে নেপালে আনয়ন করিয়া দেশকে রক্ষা করা হয়, তাই তাঁহার বিগ্রহ আজও সাদরে পূজিত হয়। এই পর্ব্বতের অবস্থিতি-সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ বলেন উহা আসামে, কেহ দাক্ষিণাত্যে, কেহ বা বলেন উহা সিংহলে।[১] ডাঃ মোহন সিং-এর মতে সংগলদ্বীপ বা সকলদ্বীপ বর্ত্তমান সিয়ালকোটের নিকট, সেইস্থান হইতেই মৎস্যেন্দ্র নেপালে গমন করেন। শৈব পাশুপতের বেশেই মৎস্যেন্দ্র নেপালে গমন করেন।[২] তিনি গোরক্ষের গুরু ও কানফাটা সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক, নেপালে তিনিই শৈব ধর্ম্ম প্রচার করেন। তিনি পাশুপত শৈব সন্ন্যাসিরূপে নেপালে গমন করেন বলিয়া তাঁহার শৈব বিগ্রহও নেপালে আছে। রংপুরে, উত্তর-পূর্ব্ব বঙ্গদেশে প্রবাদ যে কানফাটারা শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য ছিলেন, কিন্তু মদ্যপানাসক্ত হওয়ায় শঙ্কর কর্ত্তৃক ত্যাজ্য হন। কানফাটাদিগের দুইটী প্রধান বিভাগ আছে; একটী ভারতের উত্তরে, অপরটী পশ্চিম ভারতে। ইতালীয় পণ্ডিত তেসিতরির মতে কানফাটা যোগীরা সম্ভবতঃ ভারতের উত্তরাঞ্চল হইতে আগমন করেন ও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিপত্তির যুগেও ইঁহারা বিদ্যমান ছিলেন, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের পতনের যুগেই ইঁহাদের ক্ষমতার বিকাশ হয়।

আসামের দা পার্ব্বতীয়া নামক স্থানে ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীর একটী শৈব মন্দির আছে। তাহার একটী ইষ্টকে চতুর্ভুজ নরমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। উহার এক হস্তে শিব-ডম্বরু আছে, মূর্ত্তিটী লকুলীশ শিবের। মূর্ত্তির নিম্নে সমুদ্রতরঙ্গ অঙ্কিত আছে।[৩] সমুদ্রমধ্যে থাকিয়া মৎস্যেন্দ্র-কর্ত্তৃক যোগধর্ম্ম শ্রবণ কি ইহা দ্বারা সূচিত হইতেছে? গোরক্ষনাথ বৌদ্ধধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া শৈব হন, সেই নিমিত্ত নেপালী বৌদ্ধেরা তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট, সিকিমের বিভিন্ন মন্দিরে তাঁহার মূর্ত্তি আছে এ কথা যাঁহারা বলেন তাঁহারা ভ্রান্ত, কারণ উহা গুরু রিম্বোচের মূর্ত্তি।[৪] সাধারণতঃ নাথগুরুদিগকে 'নবনাথ' আখ্যা দেওয়া হয়। যোগসিদ্ধ চতুর-

---

১। বাগচী, ভূমিকা, পৃ ১৭; ব্রীগস্, গোরক্ষনাথ, পৃ ২৩২, ফুটনোট ২। ডাঃ সিং, গোরক্ষনাথ, পৃ ১৩।

২। ব্রীগস্, গোরক্ষনাথ, পৃ ২৩২, ফুটনোট ২।

৩। ব্রীগস্, পৃ ২৩২, কামাখ্যার মন্দির কথা।

৪। Lamaism—Wadell, p. 292, *re* Gorakhnath.

শীতি জনের মধ্যেও ইঁহারা স্থান পাইয়াছেন। জ্যোতিরীশ্বরের 'বর্ণ-রত্নাকরে' ইঁহাদের তালিকা আছে। রাহুল সাংকৃত্যায়ন ৮৪ সিদ্ধার চিত্র ও বংশবৃক্ষ ভোটিয়া হইতে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।[১] ব্রীগস তাঁহার গোরক্ষনাথ গ্রন্থে (পৃ ৭৫-৭৭) কয়েকটি গুরুপরম্পরার চিত্র দিয়াছেন। কল্যাণ সন্তঅঙ্কে (হিন্দী গ্রন্থ, পৃ ৪৮৪) ব্রীগসের Chart B-র প্রায় অনুরূপ চিত্র আছে। ভোটিয়া গ্রন্থ মতে মৎস্যেন্দ্রনাথ জালন্ধর-পার শিষ্য। 'মহারাষ্ট্রমে নাথপন্থ' প্রবন্ধে (কল্যাণ সন্তঅঙ্ক, পৃ ৪৮৪ দ্রষ্টব্য) নাথসিদ্ধদের নামের সহিত যুক্ত বহু স্থানের উল্লেখ আছে। নাসিক জিলায় গোরক্ষ-গুহা, গৈনীনাথের মঠ, চৌরঙ্গীর আবাসস্থল প্রভৃতি নির্দ্দেশিত হয়। মহারাষ্ট্র-ভাষায় 'ভর্ত্তৃহরি-নির্ব্বেদ' নামক গোরক্ষসম্বন্ধীয় নাটক আছে। প্রবাদ যে গোরক্ষ স্বয়ং মহারাষ্ট্র-ভাষায় 'গোরক্ষ-অমর-সংবাদ' ও 'গোরক্ষ গীতা' রচনা করেন। সংস্কৃতে রচিত 'গোরক্ষ-সংহিতা' ও 'গোরক্ষ-সিদ্ধান্ত' গোরক্ষনাথের নামে প্রচলিত। বৌদ্ধতন্ত্রগ্রন্থ 'বায়ুতত্ত্ব-ভাবনোপদেশ' জনৈক গোরক্ষ-রচিত। (শাস্ত্রী, বৌদ্ধগান ও দোহা দ্রষ্টব্য)।

ঐতিহাসিক ঘটনা—এক্ষণে গোরক্ষের নামের সহিত যে সকল ঐতিহাসিক ঘটনা যুক্ত আছে, তাহাদের শতাব্দী অনুসারে বিভাগ করিয়া গোরক্ষ-সম্বন্ধে কোন তথ্য নির্দ্দেশ করা সম্ভব হয় কিনা দেখা যাউক।

ষোড়শ শতাব্দী—কবীর, নানক প্রভৃতির সহিত গোরক্ষের সাক্ষাৎ কথা ও তত্ত্বালোচনা সুবিদিত, কিন্তু কবীর বীজকের ৪০ শ্লোকে নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে গোরক্ষ বহু পূর্ব্বে মৃত হইয়াছেন, অতএব স্থূলদেহে তাঁহাদের সাক্ষাৎকার সম্ভবপর নহে। কবীরের কাল ১৪৪০-১৫১৮ খৃঃ, নানক কবীরের প্রায় ৩০ বৎসর পরের সাধক (১৪৬৯-১৫৩৮ খৃঃ)। উইলসন প্রমুখ পণ্ডিতগণ কবীরের সহিত সাক্ষাতের উপর নির্ভর করিয়া গোরক্ষ-কাল পঞ্চদশ শতাব্দী স্থির করিয়াছেন, কিন্তু ইহা সম্ভবপর নহে, কারণ কবীর নিজেই বলিয়াছেন, "গোরক্ষ কৌরবদিগের ন্যায় মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহার দেহ প্রোথিত হইয়াছে।" তথাপি কবীরের যুগেও গোরক্ষ-প্রসিদ্ধি ছিল, এই পর্য্যন্ত বলা যায়।

১। বৌদ্ধগান ও দোহা—শাস্ত্রী, ভূমিকা, 4th Ort. Con. Proceedings. Dr. S. Chatterjee, p. 563, ৮৩ 'বর্ণরত্নাকর' নাম। গঙ্গা-পুরাতত্ত্বাঙ্ক, জানুয়ারী ১৯৩৩, বজ্রযান, সহজযান ও চৌরাসী সিদ্ধ, রাহুল সাংকৃত্যায়ন।

চতুর্দ্দশ শতাব্দী—গোরক্ষ-শিষ্য গুগা সর্পদিগের দেবতা, তিনি অদ্যাপি পূজা পাইতেছেন। টডের ইতিহাসে ইনি রাজপুতানার জনৈক বীর ও গজনীর সহিত যুদ্ধে নিহত হন বলা হইয়াছে। মতান্তরে গুগা চৌহান-রাজবংশীয় এবং পরে 'জহর-পীর' নামে পরিচিত হন। অপর একটি কাহিনীর মতে তিনি ফিরোজ সাহ কর্ত্তৃক নিহত হন। ফিরোজ সাহের কাল চতুর্দ্দশ শতাব্দী, কিন্তু এই কাহিনীর দ্বারা কোন ঐতিহাসিক তথ্যে উপনীত হওয়া সম্ভবপর নহে। সর্প-দেবতা ও রাজপুত-বীর এক ও অভিন্ন কিনা তাহা নিরূপণ করাও অসম্ভব।[১]

ধর্ম্মনাথ গোরক্ষ-শিষ্য ছিলেন। তিনি ১৩৮২ খৃষ্টাব্দে কচ্ছপ্রদেশের বিখ্যাত ধীনোধরের মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা হইতেই গ্রীয়ারসন গোরক্ষের কাল আনুমানিক চতুর্দ্দশ শতাব্দী স্থির করিয়াছেন।[২] কিন্তু পরম্পরা-ক্রমে গোরক্ষনাথ ও ধর্ম্মনাথের মধ্যে সৎনাথের নাম পাওয়া যায়।[৩] অতএব তাঁহারা সমসাময়িক হওয়া সম্ভবপর নহে।

ত্রয়োদশ শতাব্দী—বাবা ফরিদের নামের সহিত গোরক্ষনাথের নাম যুক্ত করা হয়। বাবা ফরিদ ১২৪৪ খৃষ্টাব্দে গিরণারে গমন করেন, সেখানে গোরক্ষনাথেরও মন্দির আছে।[৪] সম্ভবতঃ বাবা ফরিদ গোরক্ষের সাধন-পদ্ধতি পরবর্ত্তী কালে গ্রহণ করেন, এই কারণেই গোরক্ষের সহিত তাঁহার নাম যুক্ত হয়। নানা কারণে ইঁহাদের মধ্যে পার্থিব সম্বন্ধ স্বীকার করা যায় না।

একাদশ শতাব্দী—এই শতাব্দীতে কয়েকটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও প্রামাণ্য ঘটনার সহিত গোরক্ষনাথের যোগাযোগ দেখা যায়। প্রথমতঃ জ্ঞানদেব-রচিত 'জ্ঞানেশ্বরী'-নামক গীতা-ভাষ্যে নাথযোগীদের উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত ভাবের মতে জ্ঞানেশ্বরের সহিত নাথযোগীদের যোগাযোগ থাকা বিচিত্র নহে, কারণ দ্বাদশ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্রে নাথযোগীদের বিশেষ আধিপত্য ছিল। ভাবের মতে জ্ঞানেশ্বরীর রচনা-কাল দশম বা একাদশ শতাব্দী। জ্ঞানদেবের কাল লইয়া অনেকেই আলোচনা করিয়াছেন। জ্ঞানদেব ১২১২ শকে উহা রচনা করেন (১২৯০ খৃঃ) তাহা তিনি নিজেই

১। Briggs, pp. 99, 132, etc.
২। E. R. E., VI, p. 329, Gorakhnath, p. 116, Dharmanath.
৩। Briggs, p. 77, Chart D.
৪। Briggs, p. 119.

উল্লেখ করিয়াছেন। জ্ঞানেশ্বরের পিতামহ গোবিন্দপন্থের ধর্ম্মে প্রবৃত্তি গোরক্ষনাথ দ্বারা সিদ্ধ হয়, এইরূপ প্রবাদ আছে।[১] গোবিন্দপন্থ একাদশ শতাব্দীর হইলে, গোরক্ষের সহিত সম্বন্ধ থাকা বিচিত্র নহে।

ময়নামতী গোরক্ষের শিষ্যা ছিলেন, ইহা বিশ্বাসযোগ্য হইলে গোরক্ষের কাল একাদশ শতাব্দী বলা যায়, কারণ ময়নামতীর স্বামী মাণিকচন্দ্র ধর্ম্মপালের ভ্রাতারূপে খ্যাত এবং পালবংশের লোপ হয় একাদশ শতাব্দীতে (১০৯৫ খৃঃ)।

১০২৫ খৃষ্টাব্দের রাজেন্দ্র চোলের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে ঐ সময়ে বঙ্গদেশে গোবিন্দচন্দ্র নামে রাজা ছিলেন। তিনি তান্ত্রিক বৌদ্ধ ছিলেন। এই রাজারা বাখরগঞ্জের এক দ্বীপে বাস করিতেন বলিয়া ইঁহাদের উপাধি 'চন্দ্র' হইতে দ্বীপের নামও 'চন্দ্রদ্বীপ' হয়। রাঢ় বঙ্গদেশে ও বরেন্দ্রভূমিতে এই সময়ে পাল-রাজারা রাজত্ব করিতেন। বৌদ্ধধর্ম্মের পতনের যুগে চট্টগ্রাম, আরাকান, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতিতে বৌদ্ধমঠ ও বিহার স্থাপিত হয়। ক্রমশঃ রাজারাও বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন।[২] আরাকানের চন্দ্রবংশীয় রাজা গোবিন্দচন্দ্র ও ময়নামতীর পুত্র গোপীচাঁদ অভিন্ন হইলে গোরক্ষ-কাল একাদশ শতাব্দী স্থির করা যাইতে পারে।

পাল-রাজাদিগের মধ্যে তৃতীয় রাজা দেবপাল জনৈক নিম্ন শ্রেণীর ব্যক্তির প্রেরণায় 'ধর্ম্ম'পূজার প্রচলন করেন। বঙ্গদেশে এই ধর্ম্মপূজার আদি প্রবর্ত্তকের নাম রামাই পণ্ডিত। ইঁহার জন্ম হয় দশম শতাব্দীর শেষাংশে। এই ব্যক্তি নিম্ন শ্রেণীর হইলেও কেবল রাজা দেবপাল নহে, তাঁহার ভগিনী ময়নারও সাহায্য ও সহানুভূতি পান। শাস্ত্রীর মতে পরবর্ত্তী পাল-রাজারা পাশুপত শৈবদের ভূমি প্রদান করেন ও সহস্রাধিক মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।[৩] খৃষ্টীয় ৮ম হইতে ১১শ শতাব্দী পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে পাল-রাজারা আধিপত্য করেন। পাল-রাজাদিগের গীতিকাতেও বৌদ্ধপ্রভাব সুস্পষ্ট এবং মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িসিদ্ধা প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়।[৪] ১১শ শতাব্দীর আরম্ভে মহীপালের সময়ে ভাষার অর্থাৎ অসংস্কৃত বা কথিত ভাষার প্রচার হয়। ধর্ম্মপূজার পুথি 'শূন্য পুরাণ'

১। Briggs, p. 242, refs. to Pangarkar, Bhave, etc.

২। কদলীরাজ্য, রাজমোহননাথ, পৃ ৭, ৮ চন্দ্রদ্বীপ-সম্বন্ধে আলোচনা।

৩। Briggs, p. 245, refs. to Sastri.

৪। Hist. of Beng. Lang. & Litt.—D. C. Sen, p. 29. (1911 Ed.).

এই ভাষাতেই রচিত। বৌদ্ধধর্ম্মেও এই সময় হইতে তান্ত্রিক ভৈরব-ভৈরবীর প্রবেশ ঘটে। নাথযোগীদিগের প্রতি সমাজে শ্রদ্ধা-প্রদর্শনই রীতি ছিল। বঙ্গীয় রাজা গোবিন্দচন্দ্রের রাজত্বকালে নাথগুরুরা যথেষ্ট সম্মান পাইয়াছেন।

দশম শতাব্দী—ডাঃ বিনয় সেন দেখাইয়াছেন গোপীচন্দ্রের গানের হরিচন্দ্র (গোপীচন্দ্রের শ্বশুর), শূন্যপুরাণের হরিচন্দ্র রাজা ও তারানাথ উল্লিখিত পূর্ব্ববঙ্গের চন্দ্রবংশীয় বৌদ্ধরাজা হরিচন্দ্র এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। চন্দ্রবংশীয় বৌদ্ধ রাজা হরিচন্দ্র পালবংশের পতনের যুগে বঙ্গে রাজত্ব করেন। তিরুমলয় লিপি ১০২৫ খৃষ্টাব্দের হইলে এবং গোবিন্দচন্দ্র রাজেন্দ্র চোল কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে তখন গোপীচন্দ্রের বয়স আনুমানিক ত্রিশ বৎসর হইবে এবং ময়নামতী বৃদ্ধা হইবেন।[১] কিন্তু এই প্রমাণ সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে গোরক্ষনাথের কাল দশম শতাব্দী ধার্য্য করিতে হয়।

মালবরাজ ভর্ত্তৃহরি ময়নামতীর ভ্রাতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। কথিত আছে তিনি স্বীয় পত্নী পিঙ্গলার মৃত্যুতে শোকার্ত্ত হইয়া গোরক্ষনাথী হন। এক সম্প্রদায়ের কানফাটা যোগীরা ভর্ত্তৃহরির নামে পরিচিত। ভর্ত্তৃহরির পরে বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীর রাজা হন (১০৭৬—১১২৬ খৃঃ)। অতএব পিঙ্গলা রাণীর মৃত্যু ১১শ শতাব্দীর পূর্ব্বের ঘটনা এবং গোরক্ষও তৎপরবর্ত্তী কালের নহেন। সিন্ধুদেশ, পাঞ্জাব ও বঙ্গদেশে গোপীচাঁদ, রাণী পিঙ্গলা ও ভর্ত্তৃহরির কাহিনী প্রচলিত আছে। সিন্ধুদেশে পটাও নামে এক পীর দ্বীপগুহা-মধ্যে বাস করিতেন। ১২০৯ খৃঃ তাঁহার মৃত্যু ঘটে। হিন্দুরা তাহাকে গোপীচাঁদ বলিত। অদ্যাপি এই দ্বীপগুহা তীর্থ-বিশেষ। ময়নামতী ও হাড়িপা উভয়েই গোরক্ষনাথের শিষ্য ছিলেন। গোপীচাঁদ হাড়িপার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই সকল তথ্য হইতে গোরক্ষনাথ ১১শ শতাব্দীর পূর্ব্বে বলিতে হয়।[২]

দশম শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী কাল—মালব-রাজকন্যা ময়নামতীর স্বামী মাণিকচন্দ্রের গীত রংপুরের পাশুপত শৈবরা গাহিয়া থাকে। তাহারা গোরক্ষনাথকে গুরুরূপে পূজা করে। প্যাগ্‌শ্যাম্‌জোন্‌বজ্ঝান্‌ মতে শঙ্কর-দিগ্বিজয়ের পরবর্ত্তী কালে মগধে শ্রীহর্ষের জ্যেষ্ঠপুত্রের রাজত্ব-

১। Cal. Review, Aug. 1924, Ramai Pandit by B.. C Sen.

২। Briggs, p. 244.

কালে বঙ্গদেশে মাণিকচন্দ্রের পিতা রাজত্ব করিতেন।[১] শঙ্করের জন্ম হয় ৭৮৮ খৃষ্টাব্দে। গোরক্ষনাথ নাথ-সম্প্রদায়ের দর্শনের সহিত উপনিষদের দর্শনের সামঞ্জস্য সাধন করেন, অতএব তিনি শঙ্করের বহু পরবর্ত্তী যুগের নহেন—গ্রীয়ারসন এইরূপ অনুমান করেন।[২]

রাজপুতদিগের সহিত মুসলমানদিগের সংঘর্ষের ঘটনাবলী হইতে গোরক্ষনাথ গুগার গুরুরূপে যেরূপ দ্বাদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন বলা হয়, সেইরূপ অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে হিন্দু-মুসলমানের যে সংঘর্ষ হয় তাহাতে গোরক্ষ-শিষ্য রাজা রসালু বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করেন, এইরূপ মতবাদ প্রচলিত থাকায় গোরক্ষনাথকে টেম্পল্ অষ্টম শতাব্দীর বলিয়া ধার্য্য করিয়াছেন। রসালু ও তদীয় ভ্রাতা পুরাণ ভাগত উভয়েই গোরক্ষের শিষ্য ছিলেন। কালে পুরাণ প্রসিদ্ধ যোগী হন।[৩]

ঐতিহাসিক টডের মতে সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে রাজা গজের সহিত খুরাসন রাজের গজনীরাজ্যে যুদ্ধ হয়। গজের পৌত্র রসালু ৬৯৭ খৃঃ হইতে আফগানিস্থানে হিন্দু রাজাদিগের মধ্যে যে যুদ্ধ চলিতেছিল তাহাতে যোগ দেন। বিভিন্ন গীতিকায় তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায়। রাজা গজ ৭ম শতাব্দীর শেষার্দ্ধের লোক হইলে, রসালু ও তাঁহার গুরু গোরক্ষনাথের কাল অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বলিতে হয়।

রসালুর কাল-সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে, কিন্তু তাঁহাকে সকলেই দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী কালের বলিয়াছেন। অতএব গোরক্ষের কালও দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে, ইহা অনুমান করা অন্যায্য নহে। অতএব গোরক্ষ যে কবীরাদির সমসাময়িক ছিলেন না, ইহা নিশ্চিত।

মুদ্রা ও মন্দিরাদি

রাজপুতবীর বাপ্পা গোরক্ষনাথের কৃপায় চিতোর পুনরুদ্ধার করেন এইরূপ একটী কাহিনী আছে।[৪] বাপ্পারাওয়ের যে মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা অষ্টম শতাব্দীর।[৫] বাপ্পার আদেশে উদয়পুরে যে মন্দির

১। কদলীরাজ্য, রাজমোহন নাথ, পৃ, ৭

২। E.R E , Vol. VI, 'Gorakhnath' by Grierson.

৩। Briggs, p. 239.

৪। সমাজ-পত্রিকা, ফাল্গুন, ১৩৩৬, "বাপ্পারাওর দৈবশক্তিলাভ", রাধাগোবিন্দ নাথ।

৫। Briggs, p 247.

প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাতে ৯৭১ খৃঃ উৎকীর্ণ দেখা যায়। এই মন্দিরের ভাণ্ডার-গৃহে নাথধর্ম্মীদের মন্দির ছিল, এইরূপ প্রবাদ আছে। গোরক্ষের সাহায্যে চিতোর জয় করিয়া বাপ্পা অষ্টম শতাব্দীতে উদয়পুরের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, ঐতিহাসিক টড এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

নেপালরাজ বরদেবের মুদ্রা হইতে তাঁহার কাল অষ্টম শতাব্দী ধার্য্য হইয়াছে। লেভির মতে বরদেবের পিতা নরেন্দ্রদেব অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজত্ব করেন। গোরক্ষের নেপাল-গমনকালে ইনি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, অতএব গোরক্ষ-কালও অষ্টম শতাব্দী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়।[১]

প্রত্নতত্ত্বের দিক হইতে এলোরার কৈলাস-মন্দিরের মহাযোগী কুণ্ডলধারী শিবমূর্ত্তির সহিত কুণ্ডলধারী নাথযোগীদের তুলনা করা যাইতে পারে। মন্দিরটী অষ্টম শতাব্দীর।

সোমনাথের 'পঞ্চলিঙ্গে'র মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় ১২৮৭ খৃষ্টাব্দে। উৎকীর্ণ লিপিতে গোরক্ষের নামও দেখা যায়, অতএব গোরক্ষ-কাল ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী ইহা নিশ্চিত।

আরকোটের শিবলিঙ্গের ন্যায় বৃহৎ লিঙ্গ দক্ষিণ ভারতের কুত্রাপি নাই। লিঙ্গোপরি কুণ্ডলধারী শিবমূর্ত্তি রহিয়াছে। মন্দিরটীর সংস্কার হয় ১১২৬ খৃষ্টাব্দে।

মুদ্রাদি, শিলালিপি, মন্দিরাদির প্রতিষ্ঠা-কাল প্রভৃতি হইতে কালনিরূপণ-বিধি সুপ্রচলিত হইলেও, গোরক্ষ-কাল-নির্ণয়ে ইহার দ্বারা বিশেষ সহায়তা পাওয়া যায় না। তবে এই কালগুলির কোনটীই দ্বাদশ শতাব্দীর পরবর্ত্তী নহে, ইহাই বিশেষ দ্রষ্টব্য।

১। E. R. E., Vol. VI, Gorakhnath.
২। See Briggs, Ch. XI, etc. for detailed description of coins, temples. etc.

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গোরক্ষনাথের কাল-সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত

পূর্ব্বোক্ত কিংবদন্তী, প্রবাদ, জনশ্রুতি, গীতিকা, শিলালিপি, প্রত্নতত্ত্ব, মন্দির-প্রতিষ্ঠা, জ্ঞানেশ্বরী, জনমশাখী, গোরক্ষনাথকী গোষ্ঠী, বীজক, যুদ্ধবিগ্রহ ও মুদ্রাদির বর্ণনা হইতে গোবক্ষনাথের কালনির্ণয় বড় সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। তথাপি চারিটী বিভাগে গোরক্ষের কাল-সম্বন্ধে মতামত বিভাগ করা যায়।

প্রথমতঃ কবীর, নানক প্রভৃতির সহিত ষোড়শ শতাব্দীতে গোরক্ষের বাক্যালাপ-বৃত্তান্ত আছে, কিন্তু উহার বহু পূর্ব্বেই গোরক্ষনাথ মৃত হইয়াছেন বলিয়া কবীর স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন। আমাদের দেশে সিদ্ধপুরুষদিগের মৃত্যুর পরেও সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিবার কথা সাধাবণে বিশ্বাস কবে, অতএব এইরূপ 'গোষ্ঠী' বা 'জনমশাখী' বৃত্তান্ত থাকা বিচিত্র নহে।

নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সংগৃহীত ষোড়শ শতাব্দীর রচনা অচ্যুতানন্দের 'শূন্যসংহিতায়' ৭০ অধ্যায়ে আছে—

নাগান্তক্ বেদান্তক যোগান্তক জেতে।
নানাপ্রতি বিধিরে রহিমে তোযচিতে॥
গোরক্ষনাথঙ্ক বিদ্যা বীরসিংহ আজ্ঞা।
মল্লিকানাথঙ্ক যোগ বাউলী প্রতিজ্ঞা॥
লোহিদাস কপিলঙ্ক সাক্ষি-মন্ত্র জেতে।
কহিলে জে যেমন্ত সে হোইছি গুপতে॥

অর্থাৎ নাগার্জ্জুনের মত, উপনিষদের মত, আসঙ্গের মতে যোগ, গোরক্ষের (হঠ) বিদ্যা, বীরসিংহের আজ্ঞা, মল্লিকানাথের যোগ, বাউলদের সাধন, লোহিদাস ও কপিলের সাক্ষি-মন্ত্র, সবই গুপ্ত হইয়াছে।

লামা তারানাথের মতে গোরক্ষ শিষ্যদল-সহ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শৈব সন্ন্যাসী হন। শূন্যসংহিতা-মতে গোরক্ষ ও মল্লিনাথ 'যোগারূঢ়' অর্থাৎ যোগাচার-সম্প্রদায়ভুক্ত, ইহাতে লোহিদাসের প্রব্রজ্যা ও নিরাকার ধ্যান বর্ণিত হইয়াছে, নাগার্জ্জুনের বিপরীত-সাধনের কথাও আছে।

ত্রিমূর্ত্তি-পূজা 'বুদ্ধমাতা আদিশক্তিসংঘচ্ছস্তি কহি' ও 'মনখান' শব্দ দ্বারা মন্ত্রযান, ও বৈষ্ণবরূপে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধদের অস্তিত্ব-কথা শূন্য-সংহিতায় আছে।[১] অতএব গোরক্ষনাথ যে ষোড়শ শতাব্দীর বহুপূর্ব্বের তাহা প্রমাণিত হইতেছে।

দ্বিতীয়তঃ, ভারতে হিন্দুমুসলমান-সংঘর্ষের প্রথম যুগে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে গোরক্ষনাথের সময় নির্ণয় করিতে হইলে গুগা কাহিনী, গোপীচাঁদের গীত, ভর্ত্তৃহরি ও পিঙ্গলার কাহিনী, সিন্ধুদেশের পীর পটাও বৃত্তান্ত, সোমনাথে পঞ্চলিঙ্গ-প্রতিষ্ঠা তন্মধ্যে গোরক্ষের মন্দির (১২৮৭ খৃঃ) এবং প্রধানতঃ জ্ঞানেশ্বরীর গুরুপরম্পরার উপর নির্ভর করিতে হয়, কিন্তু জ্ঞানেশ্বরীর রচনাকাল যদি প্রক্ষিপ্তবাদ হয় তবে ইহা প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

তৃতীয়তঃ, নেপালরাজ নরেন্দ্রদেবের সময়ে গোরক্ষের নেপালে গমন, বাপ্পারাওকে গোরক্ষের তরবারি-দান, রসালু ও তদীয় বৈমাত্র ভ্রাতা পুরাণ ভাগতের সহিত গোরক্ষের সম্বন্ধ, উদয়পুরে একলিঙ্গজীর মন্দির-প্রতিষ্ঠা, এলোরাতে কুণ্ডলধারী শিবমূর্ত্তি, দাক্ষিণাত্যের শিবলিঙ্গোপরি শিবমূর্ত্তি হইতে গোরক্ষকে সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীর বলা হয়। বৌদ্ধধর্ম্ম আলোচনা করিলে দেখা যায়, সপ্তম শতাব্দী হইতে মুসলমান-বিজয়ের পূর্ব্বে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্মের ক্রমশঃ পতন ও শৈবধর্ম্মের উত্থান হয়। শঙ্করের সময়ে (৭৮৮-৮৫০ খৃঃ) শৈবধর্ম্মের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। শঙ্কর শৈব যোগীদের মদ্যপানরত বলিয়া উপেক্ষা করেন। দক্ষিণভারতেও সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধ-শৈব-সংঘর্ষ প্রবলতম আকার ধারণ করে। নেপালে ৬২৭ খৃষ্টাব্দে ছয়টি শিবমন্দির ছিল, লেভি একথা বলিয়াছেন। অতএব বলিতে হইবে তৎপূর্ব্বেই শৈবধর্ম্মের সেখানে প্রচার হইয়াছিল।

চতুর্থতঃ, দাক্ষিণাত্যের শিবলিঙ্গ ও শিবমূর্ত্তিটি গোপীনাথ রাওর মতে দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীর। শালিবাহন-রাজকে কেহ বা ৭৮ খৃষ্টাব্দের লোক বলেন, আবার কেহ শালিবাহন-পুত্র রসালুকে ৪০০ খৃষ্টাব্দের বলিয়াছেন। এই সকল মতামত বিশেষ মূল্যবান্ নহে। অতএব গোরক্ষ প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বের হইতে পারেন না।

ডাঃ মোহন সিং গোরক্ষনাথ-সম্বন্ধে যে পুস্তক লিখিয়াছেন তাহাতে

১। Mod. Bud. in Orissa.—N. N. Vasu, pp. 122-30.

তাঁহাকে নবম বা দশম শতাব্দীর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ডাঃ মোহন সিং-এর মতে গোরক্ষ পূর্ব্ববঙ্গের লোক। গোরক্ষ-সহস্র-নামস্তোত্রে গোরক্ষের নিবাসস্থল-সম্বন্ধে ইঙ্গিত আছে, কিন্তু তাহা অস্পষ্ট। পশ্চিম বঙ্গদেশ বা ঐরূপ কোন স্থানের ইঙ্গিত বলিয়া মনে হয়। (বাগচী—কৌলজ্ঞান-নির্ণয়ে উক্ত পুথির উল্লেখ দ্রষ্টব্য।)

Sir Francis Younghusband ডাঃ সিংএর গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, যে যুগে উত্তর ভারতে হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, মুসলমান ধর্ম্ম-সম্প্রদায় সকলই প্রাধান্যের জন্য উন্মুখ ছিল, সেই যুগে গোরক্ষনাথের আবির্ভাব হয়। তিনি নবম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন ও দশম শতাব্দীতে দেহত্যাগ করেন। গোরক্ষ নিম্ন জাতির ছিলেন ও চলিত ভাষার ব্যবহার করিতেন। তাঁহার পুথি ভারতের বিভিন্ন স্থানে রচিত হইয়াছে। স্বাভাবিক জ্ঞানের অতীত সাধন বা কৃত্রিমতার প্রতি গোরক্ষ বীতরাগ ছিলেন। তিনি ব্রহ্মচর্য্যের উপদেশ দিতেন। বিবাহিত হইলেও খাদ্য, পানীয় বা ইন্দ্রিয়-সংযম দ্বারা ঈশ্বরতা লাভ হয় ইহাই তাঁহার মত ছিল।

Dr Betty Heimann উক্ত গ্রন্থের মুখবন্ধে বলিয়াছেন, গোরক্ষের যোগ বিশুদ্ধ রাজযোগ নহে, উহা হঠযোগও নহে, ঋদ্ধি তাঁহার লক্ষ্য নহে, হঠযোগের কঠিন সাধনও তাঁহার অনুমোদিত নহে।

গোরক্ষের যোগ রূপকবিশেষ, উহা উপনিষদের দর্শনকে স্মরণ করাইয়া দেয়। 'গোরক্ষবোধ' উপনিষদের তত্ত্বসকল স্মরণ করাইয়া দেয়, যথা —মন্ত্রই বীজ, বুদ্ধিই গর্ভকোষ, ধ্যানই ধৌতি, সন্তোষই আসন, ধ্যানই জ্ঞান, শব্দই কুলুপ, অশব্দই কুঞ্চিকা, শূন্যই মন্দির, শব্দ তাহার দ্বার। মধ্যযুগে প্রচলিত যোগসাধন হইতে গোরক্ষের যোগসাধন-পন্থার ভিন্নতা এই সকল উদাহরণ দ্বারা উপলব্ধ হয়।

ডাঃ বড়থ্বাল-এর মতে গোরক্ষ দশম শতাব্দীতে আবির্ভূত হন এবং গোরক্ষ হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ঐক্য-স্থাপনের চেষ্টা করেন।[১]

হিমালয় অঞ্চলে দুষ্টাত্মা-বশীকরণের যে সকল মন্ত্র আছে তাহাতে গোরক্ষের হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের শিষ্য থাকিবার উল্লেখ আছে। বাবা রতন হাজি কাবুলের বহু মুসলমানকে যোগী করেন। এই যোগীরা এখনও রতন হাজির ফকির নামে খ্যাত।

১। Nirguna School of Hindi Poetry—P. D. Barthwal, p. 289. Add Notes (1936 Ed.).

বাবা রতন হাজি গোরক্ষের শিষ্য ও গুগার গুরুরূপে প্রসিদ্ধ। গুগার কাল আনুমানিক ১০০০ খৃঃ।

মৎস্যেন্দ্রের শিষ্যমধ্যে গোরক্ষ প্রধানতম। প্রবাদ আছে যে তিনি পূর্ব্বে বৌদ্ধ ছিলেন, কিন্তু গোরক্ষ-রচিত 'কায়াবোধ'গ্রন্থের একটী বচনে তাঁহাকে 'পশ্বারম্ভক' বা পশুহত্যাকারী মনে হয়। সেক্ষেত্রে তাঁহার বৌদ্ধ হওয়া সম্ভব নহে।[১]

গোরক্ষনাথের শিষ্যমধ্যে গৈনীনাথ ও চর্পটীনাথ প্রধানতম।

মৎস্যেন্দ্র ও গোরক্ষনাথের কালনিরূপণ-প্রচেষ্টা

মৎস্যেন্দ্রনাথ ও তাঁহার শিষ্য গোরক্ষনাথের সম্বন্ধে বিভিন্ন কাল নির্দ্ধারিত হইয়াছে। প্রাচ্যের ও প্রতীচ্যের পণ্ডিতমণ্ডলী এই বিষয়ে অনেক বাদানুবাদ করিলেও এখনও কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর হয় নাই। এখানে প্রথমতঃ সংক্ষেপে পূর্ব্বালোচিত ঘটনাগুলির সারাংশ আলোচনা করিয়া, আমাদের স্থিরীকৃত সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিতেছি। যদিও ভারতীয় নীতি-অনুযায়ী মহাযোগীরা 'কালজয়ী,' তাঁহাদের কালনিরূপণের প্রথা নাই।

মৎস্যেন্দ্র, মীননাথ বা লুইপা এক ও অভিন্ন ছিলেন এবং তিনি পূর্ব্ব ভারতে সমুদ্র-উপকূলে জন্মগ্রহণ করেন, সে বিষয়ে প্রায় সকলে একমত। তাঁহার জন্মস্থান 'সন্দ্বীপে' বা 'চন্দ্রদ্বীপে,' পাঞ্জাব-কাহিনী-অনুসারে উহা 'সংগলদ্বীপ' বা 'সকলদ্বীপ,' মোহন সিং উহা বর্ত্তমান সিয়ালকোটের নিকট বলিয়া তাঁহার গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন।[২]

কিন্তু নিত্যাহ্নিকতিলকম্ পুথি (১৩৯৫) মতে মৎস্যেন্দ্রের জন্মস্থান বরণা, বঙ্গদেশে।[৩] মৎস্যেন্দ্র যোগিনী কৌলমার্গের বা চতুর্থ শাখার প্রতিষ্ঠাতা এবং তিনি কৌলশাস্ত্র কামরূপে প্রচার করেন, 'কামরূপে ইদং শাস্ত্রং যোগিনীনাং গৃহে-গৃহে'।[৪] গোরক্ষের জন্ম-সম্বন্ধে কোন পুথিতে উল্লেখ পাওয়া যায় না, যোগীরা তাঁহাকে 'ঈশ্বর-সন্তান' বলেন। গোরক্ষনাথ বঙ্গীয় রাজা মাণিকচন্দ্র রাজার সমসাময়িক, কারণ তদীয়

১। Some Aspects of the History and Doctrines of the Nathas by Gopinath Kaviraj. S. B. S., Vol. VI, pp. 19 ff.

২। গোরক্ষনাথ—মোহন সিং, পৃঃ ১১। ৩। কৌলজ্ঞাননির্ণয়, ভূমিকা,—বাগচী, পৃঃ ৬৮।

৪। কৌলজ্ঞাননির্ণয়। ২২।১০।

মহিষী ময়নামতী গোরক্ষের শিষ্যা; প্রবাদ অনুসারে তিনি পাঞ্জাব জালন্ধরের লোক।[১] তিনি বাঙ্গালী নহেন কারণ তাঁহার রচিত বাংলা কোন পদ পাওয়া যায় নাই, তবে তাঁহার সংস্কৃত ও হিন্দী রচনা পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু লুইপা বা মীননাথের বাংলা পদের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। মোহন সিং বলেন গোরক্ষই হিন্দী গদ্যের আদি রচয়িতারূপে পরিচিত।

গোরক্ষ মৎস্যেন্দ্রের শিষ্যরূপেই পরিচিত, কেবল গ্রীয়ারসন উল্লেখ করিয়াছেন যে গোরক্ষ মৎস্যেন্দ্র হইতে ষষ্ঠ পুরুষ।[২] ইহা স্বীকার করিলে ইঁহাদের কালনির্ণয়-সমস্যা কঠিনতর হইয়া পড়ে। কিন্তু এই মত স্বীকার করিবার যথেষ্ট কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না, কারণ আদিনাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথ এই তিনজনের নাম বিভিন্ন গুরু-পরম্পরায় প্রায়শঃ সর্ব্বত্রই এই ক্রমানুসারেই উল্লিখিত হয়। অতএব আমরা গোরক্ষকে মৎস্যেন্দ্রের ভারতবিখ্যাত শিষ্যরূপেই গ্রহণ করিয়া আলোচনায় অগ্রসর হইতেছি।

মৎস্যেন্দ্রের নামের সহিত নেপাল রাজ্যের নাম ঘনিষ্ঠভাবে বহু নেপালী কাহিনীতে যুক্ত হইতে দেখা যায়। নেপালের রথযাত্রা আমাদের দেশের রথযাত্রার অনুরূপ, ইহার সহিত মৎস্যেন্দ্রের নাম ঘনিষ্ঠভাবে (সম্ভবতঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতে) যুক্ত হইয়াছে। নেপালের ইতিহাস-প্রণেতা রাইট স্থানীয় উপকরণ হইতে বলেন যে, বরদেবের সময়ে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমভাগে, গোরক্ষনাথ নেপালে আগমন করেন। সিলভ্যাঁ লেভি প্রথম সূচনা করেন যে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে রাজা নরেন্দ্রদেবের সময়ে মৎস্যেন্দ্র নেপালে আগমন করেন।[৩] শহীদুল্লাহ্ লেভির মতের সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন যে, ৬৫৭ খৃষ্টাব্দে মৎস্যেন্দ্র নরেন্দ্রদেবের রাজত্বকালে নেপালে আগমন করেন। ইহা ব্যতীত শহীদুল্লাহ্ বলিয়াছেন যে, জালন্ধরিশিষ্য কানুপা, মৎস্যেন্দ্র, গোরক্ষ ও গোপীচাঁদ সমসাময়িক ছিলেন, এবং গোরক্ষ মৎস্যেন্দ্রের শিষ্য ছিলেন। গোপীচাঁদ রাজা বিমল-চন্দ্রের পুত্র ও মালবরাজ ভর্ত্তৃহরির ভাগিনেয় ছিলেন। বিমলচন্দ্র ধর্ম্মকীর্ত্তির সমসাময়িক ছিলেন, ধর্ম্মকীর্ত্তি বৌদ্ধজগতে খ্যাতনামা

১। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—দীনেশ সেন (৪র্থ সং), পৃঃ ৫৯।

২। J. A. S. B. 1878, p. 138. *Ref.* Singh's Gorakhnath, add notes, p. XIX.

৩। Le Nepal—S, Levi, p. 356.

(Schiefner-Geschichte, p. 122), ইটসিংও তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন। ধর্ম্মকীর্ত্তি ৬৫১ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন একথার উল্লেখও ইটসিং-এর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে আছে। ইটসিং ৬৭৩ খৃঃ ভারতে আসেন। অতএব শহীদুল্লাহর মতে মৎস্যেন্দ্র, গোরক্ষ, ভর্ত্তৃহরি, গোপীচাঁদ প্রভৃতি সপ্তম শতাব্দীর। ভর্ত্তৃহরিও ধর্ম্মকীর্ত্তির সমসাময়িক (Schiefner Geschichte, পৃঃ ১৮৮)।[১]

বাগচী এই মতের প্রতিবাদস্বরূপ বলিয়াছেন, নেপালের যে প্রাচীনতম ক্ষিতীশবংশাবলী পাওয়া গিয়াছে তাহাতে ৭ম শতাব্দীতে মৎস্যেন্দ্রের নেপালে আগমনের উল্লেখ না থাকায় ইহা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তাহা সন্দেহ, সম্ভবতঃ ইহা পরবর্ত্তী কালের যোজনা; উক্ত বৌদ্ধবংশাবলী ত্রয়োদশ শতাব্দীর। কিন্তু রাজগুরু বন্ধুদত্ত কর্ত্তৃক বুগম লোকেশ্বরের যাত্রা-প্রতিষ্ঠার কথা ইহাতে আছে। অতএব লোকেশ্বরের ও মৎস্যেন্দ্রের অভিন্নত্ব-প্রতিষ্ঠা এ পর্য্যন্ত সাধিত হয় নাই, বলা যাইতে পারে।[২] তদ্ব্যতীত মৎস্যেন্দ্রকে ধৃত করিয়া আনিবার নেপালী কাহিনী এরূপ অলৌকিক যে ইহা দ্বারা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া নিরাপদ নহে।

শহীদুল্লাহ ভর্ত্তৃহরি, ধর্ম্মকীর্ত্তি প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া মৎস্যেন্দ্রকে ৭ম শতাব্দীর স্থির করিয়াছেন বটে, কিন্তু এই ভর্ত্তৃহরি কে? যদি ভর্ত্তৃহরিকে গোপীচন্দ্রের মাতুল বলিতে হয় তবে ৭ম শতাব্দীর ভর্ত্তৃহরি তিরুমলয় উৎকীর্ণ লিপির রাজেন্দ্রচোলের দ্বারা পরাজিত রাজা গোপীচন্দ্রের মাতুল হইতে পারেন না, কারণ এই লিপি ১১ শতাব্দীর। দাক্ষিণাত্যের রাজেন্দ্রচোলের রাজত্বকালও ১১ শতাব্দীর প্রথমভাগে, পূর্ব্ববঙ্গে এই সময়ে চন্দ্রবংশীয় রাজাদের রাজত্ব ছিল। এই বংশের সহিতই গিরিলিপির সম্বন্ধ ছিল এ অনুমান স্বাভাবিক, যদিও পরম্পরাগত প্রবাদ দীর্ঘকাল পরে অনেকস্থলেই সম্বন্ধ-বিপর্য্যয় ঘটায়। তবে ৭ম শতাব্দীর ভর্ত্তৃহরি ও গোপীচাঁদ আমাদের ভর্ত্তৃহরি ও গোপীচাঁদ নহেন ইহা অন্ততঃ নিশ্চিন্তরূপে বলা যায়। অতএব লেভি আদি বঙ্গ ও নেপাল কাহিনীকে মূলস্বরূপ অবলম্বন করিয়া যে কাল নির্ণয় করিয়াছেন তাহার সহিত আমরা একমত নহি। প্রাচীন রাজবংশাবলীতে প্রধান প্রধান ঘটনার উল্লেখ থাকে, অতএব মৎস্যেন্দ্রের ন্যায় অসাধারণ

১। Les Chantes Mystiques—Sahidullah, pp. 27-28.

২। কৌলজ্ঞাননির্ণয়, ভূমিকা—বাগচী, পৃঃ ১৩।

যোগীর উল্লেখ না থাকা বিচিত্র। অবশ্য সর্ব্বক্ষেত্রে যে উল্লেখ থাকিবেই, এই সিদ্ধান্তও সমীচীন নহে, তবে তিরুমলয়-লিপি, গোপীচাঁদ-কাহিনী প্রভৃতিও ভাবিবার বিষয়। গোরক্ষকে অত্যন্ত প্রাচীন প্রমাণ করিবার চেষ্টায়, বিভিন্ন কাহিনীতে পঞ্চপাণ্ডব প্রভৃতির সহিতও ইঁহাকে যুক্ত করা হইয়াছে। ব্রীগ্‌স এই সকল কাহিনীর উল্লেখ করিয়াছেন (ব্রীগ্‌স, পৃঃ ২২৮ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য)।

লেভি কৌলজ্ঞাননির্ণয় প্রভৃতি পুথির দ্বারা সময়-নির্ণয়ের চেষ্টা করেন নাই। বাগচী প্রধানতঃ লিপির উপর নির্ভর করিয়া বলিয়াছেন যে, কৌলজ্ঞাননির্ণয় নামক পুথির রচনাকাল একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ, শাস্ত্রী উহার লিপিকাল নবম শতাব্দীর মধ্যভাগ স্থির করেন, বাগচী বহু প্রমাণ দিয়া উহা একাদশ শতাব্দীর বলিয়াছেন (বাগচী—কৌলজ্ঞাননির্ণয়, ভূমিকা, পৃঃ ১-৫)।

কৌলজ্ঞাননির্ণয়ে কৌলশাস্ত্রকে 'শিবসম্ভূত' বলা হইয়াছে এবং মৎস্যেন্দ্রকে শিবাবতার বলা হইয়াছে।[১] এই পুথিতে গোরক্ষের উল্লেখ-মাত্র নাই।

বাগচী বলেন কৌলজ্ঞান পুথির লিপিকাল একাদশ শতাব্দীর পরবর্ত্তী নহে, এবং ইহা দ্বারা সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে মৎস্যেন্দ্রকে তাহার একশত বৎসর পূর্ব্বের বলিতে হয়। পুথিতে মৎস্যেন্দ্র শিবাবতার বলিয়া উল্লিখিত হওয়ায় ("অহং সো ধীবরো দেবি," ভৈরব দেবীকে এই কথা কৌলজ্ঞান পুথিতে বলিতেছেন), মৎস্যেন্দ্র তাহার একশত বা ততোঽধিক বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন অনুমিত হয়, কারণ অবতাররূপে গণ্য হওয়া সময়-সাপেক্ষ। তদ্ব্যতীত অভিনব তাঁহার তন্ত্রালোকে (১১শ শতাব্দীর প্রথমে) মৎস্যেন্দ্র গুরুকে নমস্কার জানাইয়াছেন, তাহাতেও মৎস্যেন্দ্রকে 'শিবসমান' বলা হইয়াছে। অতএব মৎস্যেন্দ্র তাহার এক বৎসর পূর্ব্বের লোক, অর্থাৎ আনুমানিক ৯০০ খৃষ্টাব্দের, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে (বাগচী, পৃঃ ২৬)। অবশ্য অভিনবের নমস্য গুরু দ্বাদশ শতাব্দীর হইতে পারেন না, ইহা নিশ্চিত, তবে দশম শতাব্দীর না হইতেও পারেন। তন্ত্রালোকের প্রমাণ দ্বারা এবং মৎস্যেন্দ্র জীবিতকালেই পূজা পাইয়া থাকিলে, তাঁহাকে একাদশ শতাব্দীর বলা চলে। এই পুথিতেও গোরক্ষের উল্লেখ নাই।

১। কৌলজ্ঞান-নির্ণয়, ১৬।৩৫, ৩৭

এই প্রসঙ্গে পাণ্ডে-রচিত 'অভিনব গুপ্ত' হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি। পাণ্ডে বহু আলোচনা দ্বারা অভিনবের জন্মকাল ৯৫০-৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে স্থির করিয়াছেন।[১] অভিনব স্বরচিত গ্রন্থাদিতে লিপিকাল-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার দ্বারাই পাণ্ডে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। কাশ্মীরের লেখকরা সপ্তর্ষি অব্দ ব্যবহার করেন, ইহা কলিযুগের ২৫ বৎসর পরে আরম্ভ হয়। তন্ত্রালোকের কোন সঠিক লিপিকালের উল্লেখ পাণ্ডে করেন নাই। ক্রমস্তোত্র, বৃহতী বিমর্শিনী, ভৈরব-স্তোত্রের কাল অভিনব স্বয়ং উল্লেখ করিয়াছেন। দশম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে ও একাদশের প্রথম পাদে পুথিগুলি রচিত হয়।[২]

অভিনবের প্রপরম গুরু শিবদৃষ্টি-রচয়িতা সোমানন্দ পরম্পরাক্রমে মৎস্যেন্দ্রের সহিত যুক্ত ছিলেন। তিনি অদ্বৈত তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ত্র্যম্বকের উনবিংশতি বংশধররূপে নিজের পরিচয় দিয়াছেন। ত্র্যম্বক, অমরদক ও শ্রীনাথের দ্বারা শৈবাগম-সম্প্রদায়ের তিনটী শাখা প্রতিষ্ঠিত ও তাঁহাদের নামেই পরিচিত হয়। ত্র্যম্বক-কন্যার বংশ দ্বারা কামরূপে চতুর্থ শাখার প্রতিষ্ঠা হয়। ইহার প্রতিষ্ঠাতা মীন বা মচ্ছেন্দ্রবিভু। এই চতুর্থ শাখার নামান্তর 'অর্দ্ধ-ত্র্যম্বক' শাখা এবং কামরূপ পীঠ ('অর্দ্ধ-ত্র্যম্বক পীঠ') নামে পরিচিত। তন্ত্রালোকের ভাষ্যে ইহার উল্লেখ আছে, যথা—

> ভৈরব্য-ভৈরব্যাৎ প্রাপ্তং যোগং ব্যাপং ততঃ প্রিয়ে।
> তৎসকাশাত্তু সিদ্ধেন মীনাখ্যেন বরাননে।
> কামরূপে মহাপীঠে মচ্ছেন্দ্রেন মহাত্মনা॥ (১২৪ ভাষ্য)

তন্ত্রালোকের প্রথম আহ্নিকে যে স্থলে মচ্ছেন্দ্র বিভুকে নমস্কার জানান হইয়াছে, তাহার ভাষ্যে মচ্ছেন্দ্রকে তুর্য্যনাথ বলা হইয়াছে, অর্থাৎ 'তুর্য্য' বা চতুর্থ শাখার প্রতিষ্ঠাতা।

তন্ত্রালোকে অভিনব তন্ত্র ও কুল উভয় মার্গের আলোচনা করিয়াছেন এবং উভয় মার্গের গুরুকেই নমস্কার জানাইয়াছেন। কৌলমার্গে শম্ভুনাথ তাঁহার গুরু ছিলেন, তাই তাঁহাকেও তিনি নমস্কার জানাইয়াছেন (তন্ত্রালোক ১।৩১), জালন্ধরে গিয়া অভিনব শম্ভুনাথের

১। অভিনব গুপ্ত—পাণ্ডে (১৯৩৫), পৃঃ ৬, ৭, ৮।

২। Geschichte der indischin Litterature—M. Winternitz (1922),—p. 19.

নিকট কৌলিকমার্গ শিক্ষা করেন ও আত্মজ্ঞান লাভ করেন। কুলমার্গ, অৰ্দ্ধ-ত্র্যম্বক-মথিকা প্রভৃতি একই শাখার বিভিন্ন নাম।

পাণ্ডে সোমানন্দকে অভিনবের প্রপরম গুরুরূপে নবম শতাব্দীর ধার্য্য করিয়া সেই হিসাব-অনুসারে ১৯ পুরুষ পূর্ব্বের ত্র্যম্বককে ৪র্থ শতাব্দীর বলিয়াছেন। ইহার দ্বারা মৎস্যেন্দ্রের কালনির্ণয়ের কোন সহায়তা হয় না। পাশুপত, কৌল সম্প্রদায় প্রভৃতির প্রতিপত্তি-বিস্তার সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বে নহে, অর্থাৎ গুপ্তবংশের পরে, পূর্ব্বে নহে। ইহার আলোচনা পরে করা হইতেছে।

তিব্বতী ভাষায় রক্ষিত কালিদাসের 'মঙ্গলশতকে' মৎস্যেন্দ্রের উল্লেখ থাকিলেও এই পুথি-রচয়িতা যে শকুন্তলা-কাব্যলেখক নহেন ইহা নিশ্চিত।

অতএব এক্ষেত্রে বলা যায়, সোমানন্দ ত্র্যম্বকের যথার্থই উনবিংশতিতম বংশধর ছিলেন কিনা সন্দেহ, কারণ কালপ্রভাবে ভ্রান্তি হওয়া বিচিত্র নহে। উপরন্তু গুরুক্রমে ২৫ বৎসরের কম ব্যবধানও দুই গুরুর মধ্যে ধরা যাইতে পারে, যথা জ্ঞানেশ্বরের গুরু তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নিবৃত্তিনাথ মাত্র দুই বৎসরের জ্যেষ্ঠ ছিলেন। একশত বৎসরের মধ্যে ছয়-জন গুরু ধার্য্য করিলে ত্র্যম্বকের কাল ৭ম শতাব্দী হয় এবং মৎস্যেন্দ্রকেও ঐ শতাব্দীর বলা চলে। তাহা হইলে লেভি আদির সহিত কাল মিলিলেও প্রচলিত কাহিনী, গাথা, গিরিলিপি প্রভৃতির বিচার দ্বারা ইহা স্থির সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করা চলে না। তুকারাম-শিষ্যা বহীনা বাঈও এইরূপ দীর্ঘ একটি তালিকা দ্বারা তাঁহার গুরুপরম্পরার উল্লেখ করিয়াছেন। অবশ্য বহীনা বাঈ সপ্তদশ শতাব্দীর, তাঁহার কালও জানা যায় (১৬২৮-১৭০০ খৃঃ); তাঁহার গুরুপরম্পরা-মধ্যে:

আদিনাথ
পার্ব্বতী (মৎস্যরূপী মৎস্যেন্দ্রের শ্রবণ)
গোরক্ষনাথ
গৈনীনাথ
নিবৃত্তিনাথ (বালক যোগী)
ধ্যানেশ্বর (না জ্ঞানদেব?)

১। I. H. Q, I., p. 739. *Ref.* Bagchi Intro., p. 19, 26.

সচ্চিদানন্দ

ইঁহার পরবর্ত্তী কালে

বিশ্বম্ভর বা কৃষ্ণচৈতন্য (১৪৮৫-১৫৫৩)

রাঘব চৈতন্য

কেশব চৈতন্য

বাবাজী চৈতন্য

তুকবা তুকারাম (১৬০৮-১৬৪৯ খৃঃ)

বহীনা বাঈ (১৬২৮-১৭০০ খৃঃ)।[১]।

কবীর চৌরাসী সিদ্ধের উল্লেখ করিয়াছেন (কবীর গ্রন্থাবলী, নাগরী প্রচারিণী সংস্করণ, পৃ ৫৪, ৯৯, ১৮৯ ইত্যাদি) এবং গোরক্ষ, ভর্ত্তৃহরি, গোপীচাঁদেরও উল্লেখ করিয়াছেন। গোরক্ষাদির উল্লেখ কবীরের 'শব্দ'তেও আছে—'কেতে মুনিজন গোরক্ষ কহিয়ে তিনভী অন্ত ন পায়া' (১৮।৪) 'সিদ্ধ অনন্ত বহিখোজ পরহৈ' (১৮।৬) (বীজক রীবা সংস্করণ; বম্বই, ১৯৬১ সম্বৎ)। এই গ্রন্থের সাখীতে (৪২ নং, পৃ ৫৪৫) 'গোরখ রসিয়া যোগকে' ইত্যাদি আছে। এইরূপ বহু স্থলে কবীর গোরক্ষ, ভর্ত্তৃহরি ও গোপীচাঁদের উল্লেখ করায় একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে যে কবীরের সহিত গোরক্ষের মিলন ও যোগ-সম্বন্ধীয় বাদানুবাদ হইয়াছিল। ইহার মূলে সত্য থাকিতে পারে না, কারণ কবীর চতুর্দ্দশ এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক, অতএব এই মিলন আধ্যাত্মিকরূপে ব্যতীত সাধিত হওয়া সম্ভবপর নহে।

এখন গোরক্ষনাথকে যাঁহারা দ্বাদশ শতাব্দীর বলিয়াছেন তাঁহাদের যুক্তির অবতারণা করিব। ভাণ্ডারকার এবং চট্টোপাধ্যায় মহারাষ্ট্র ভাষায় রচিত জ্ঞানেশ্বরী গ্রন্থের (ইহার রচনাকাল ১২৯০ খৃঃ) শিষ্যপরম্পরার উল্লেখ হইতে সাধারণ নিয়ম অনুসারে হিসাব করিয়া গোরক্ষকে দ্বাদশ শতাব্দীর সিদ্ধ বলিয়াছেন। এই হিসাবে গোরক্ষের গুরু মৎস্যেন্দ্রকেও দ্বাদশ শতাব্দীর বলিতে হয়। রাণাডের মহারাষ্ট্র-রহস্যবাদে বর্ণিত হইয়াছে যে, নিবৃত্তিনাথের জন্ম হয় ১২৭৩ খৃষ্টাব্দে ও দেহান্ত হয় ১২৯৭ খৃষ্টাব্দে। জ্ঞানেশ্বরের গুরু নিবৃত্তিনাথ, তিনি জ্ঞানেশ্বর বা জ্ঞানদেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন এবং বালক বয়সেই গৈনীনাথ হইতে দীক্ষা লাভ করেন। জ্ঞানেশ্বরীতে যে গুরুপরম্পরার উল্লেখ আছে তাহা এইরূপ :

১। শ্রীগ.স., পৃ ৭৬; বাগচী, ভূমিকা, পৃ ২২ তুলনীয়।

শঙ্কর

পার্ব্বতী (মৎস্যেন্দ্রের শ্রবণ)

মৎস্যেন্দ্রের সহিত সপ্তশৃঙ্গী পর্ব্বতে বিকলাঙ্গ চৌরঙ্গীর সাক্ষাৎ এবং তাঁহাকে পূর্ণাঙ্গ করা,

গোরক্ষনাথ

গৈনীনাথ

নিবৃত্তিনাথ

জ্ঞানদেব (১২৭৫—১২৯৬ খৃঃ)।[১]

জ্ঞানদেব বা শ্রীজ্ঞানেশ্বর মহারাজ-রচিত গীতা-ভাষ্যের নাম 'ভাবার্থ-দীপিকা' বা 'জ্ঞানেশ্বরী'। ইহার রচনা-কাল যে ১২৯০ খৃষ্টাব্দ তাহা একপ্রকার নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে। গোদাবরীর দক্ষিণ তীরে ১২১২ শকে জ্ঞানদেব ইহা রচনা করেন, তাহা তিনি নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন।

রাণাডের মহারাষ্ট্র-রহস্যবাদের মধ্যে নামদেবের দাসী জনাবাঈ-এর উল্লেখ আছে, তিনি তাঁহার অভঙ্গীতে নিবৃত্তির জন্ম ১২৬৮ খৃঃ, জ্ঞানদেবের জন্ম ১২৭১ খৃঃ, সোপানদেবের ১২৭৪ খৃঃ ও মুক্তা বাঈয়ের ১২৭৭ খৃঃ বলিয়াছেন।[২]

জ্ঞানদেব মহারাষ্ট্র প্রদেশের সুবিখ্যাত কবি ও রহস্যবাদী। দান্তে বা সেণ্ট জন অফ দি ক্রসের সহিত ইঁহার তুলনা করিলেও অন্যায্য হয় না।[৩] অতএব জ্ঞানদেবের কাল ও তাঁহার রচিত জ্ঞানেশ্বরী লইয়া অনেকেই আলোচনা করিয়াছিলেন। পণ্ডিত রঘুনাথ মাধব ভাগবতের মতে জ্ঞানদেবের জন্ম হয় ১১৯৭ শক বা ১৩৩২ সম্বতে, নিবৃত্তিনাথের জন্ম হয় ১১৯৫ শকে। ইঁহাদের পিতা সন্ন্যাস-গ্রহণের পর গুরু রামানন্দের আদেশে (কারণ গুরু তদীয় পত্নীকে পুত্রবতী হইতে আশীর্ব্বাদ করিয়া ফেলিয়াছিলেন) পুনরায় গৃহী হওয়ায় সমাজচ্যুত হন। চারিটী পুত্রকন্যা জন্মগ্রহণ করিবার পর দুঃখে স্বামীস্ত্রী তাঁহাদের গৃহী-দেহ ত্রিবেণীতে অর্পণ করিয়া

১। জ্ঞানেশ্বরী ১৮।১৭৫২-৫৬

Mysticism in Maharashtra, p. 31. Hist. of Ind. Phil., Vol. VII, p. 31 (1933),
Or. & Dev. of the Beng. Lang—S. Chatterji, p. 122.
An Outline of the History and Teachings of the Nath Panthiya Siddhas.
Third. Ort. Con. Pro. p. 495 Con. Pro. p , 495.

২। Mysticism in Maharashtra, p. 190.

৩। Ibid., Intro., p. 3.

পুনরায় সন্ন্যাস লন। ইহার পূর্ব্বেই নিবৃত্তিনাথের পর্ব্বতগুহায় গৈনীনাথ-দর্শন ও দীক্ষালাভ ঘটে। জ্ঞানদেব উপনয়নার্থে আগ্রহ প্রকাশ করিলে সমাজচ্যুত বালককে কেহ উপনয়ন দিতে স্বীকৃত হইলেন না, তখন জন্মস্থান আলন্দী হইতে ভ্রাতারা ভগ্নীসহ পৈঠান গমন করেন, সেখানে জ্ঞানদেব মহিষের মুখে বেদোচ্চারণ প্রভৃতি সিদ্ধি দেখাইয়া পণ্ডিতবর্গকে মুগ্ধ করেন ও অবতাররূপে গণ্য হন। তখন আলন্দীতে ফিরিয়া জ্ঞানদেব ১২১২ শকে মহারাষ্ট্র-ভাষায় 'ভাবার্থ দীপিকা' নামক গীতাভাষ্য রচনা করেন। ইহা প্রাচীন মহারাষ্ট্র-ভাষায় রচিত। 'অমৃতানুভব' গ্রন্থ ইহার পরে রচিত হয়; ১২১৮ শকে মাত্র ২১ বৎসর বয়ঃক্রমকালে জ্ঞানদেব সজ্ঞানে সমাধি-গ্রহণ করেন, পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহার হস্তদ্বয় ধারণ করিয়া তাঁহাকে সমাধিস্থ করেন। জ্ঞানদেব নিজের রচনাতেই ২১ বৎসর বয়সে সমাধি-গ্রহণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।[১] নামদেব, বিশোবা, জনাবাঈ প্রভৃতি সকলের অভঙ্গীতেই জ্ঞানদেবের ১২৯৬ খৃষ্টাব্দে সমাধি-গ্রহণ করার কথা আছে। সেক্ষেত্রে তাঁহার জন্ম ১২৭৫ খৃষ্টাব্দে ধরিতে হয়।

জ্ঞানেশ্বরীর রচনাকাল ও জ্ঞানেশ্বরের জন্ম ও সমাধিকাল স্থির হইল বটে, ইহা হইতে জ্ঞানদেবের প্রপরম গুরু গোরক্ষের সময় নির্দ্ধারিত হওয়াও স্বাভাবিক, কিন্তু এই গুরুপরম্পরা যে নির্ভুল একথা বলা কঠিন। বাগচী বলেন, গোরক্ষ বা মৎস্যেন্দ্রের মহারাষ্ট্র-দেশের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ছিল না, অতএব তাঁহারা পাঞ্জাব, গুজরাট, নেপাল প্রভৃতি দেশের সহিত যেরূপ আধ্যাত্মিক যোগে যুক্ত ছিলেন, সেইরূপ মহারাষ্ট্র-দেশের সহিত যুক্ত ছিলেন, অতএব মহারাষ্ট্র-প্রবাদ আক্ষরিকভাবে নির্ভর-যোগ্য নহে।[২]

আমাদের মনে হয় গুরুপরম্পরায় ছেদ থাকা অসম্ভব নহে, এবং গোরক্ষের পরবর্ত্তী কালে কোন গুরুর মহারাষ্ট্র-দেশে গমন ও নাথধর্ম্ম প্রচার করা অসম্ভব নহে। কারণ নাথ যোগীদের ভারতের সর্ব্বত্র গতিবিধি ছিল এবং গোরক্ষের শিষ্য (মতান্তরে সতীর্থ) ধরমনাথ কচ্ছ-প্রদেশে মঠ স্থাপনা করেন। ধীনোধরের মঠ অদ্যাপি প্রসিদ্ধ। তিনি ১৩৮২ খৃষ্টাব্দে কচ্ছ-প্রদেশে গমন করেন।

১। জ্ঞানেশ্বরী (১৯৩৩, সংশোধিত ২য় সং, এলাহাবাদ), ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

২। বাগচী—ভূমিকা, পৃ ২৫, ২৬

ধরমনাথের শিষ্য দ্বাদশ শতকের শেষভাগে বা ত্রয়োদশের প্রথমে জাঠদিগকে দূরীভূত করিয়া রায়ধনকে বরার রাজসিংহাসনে স্থাপিত করেন।[১] খক্কর-প্রকাশিত প্রবন্ধে ধরমনাথের শিষ্যপরম্পরায় একশিষ্য ভিখারীনাথের ১৫৪৫ সম্বৎ ও তৎপরবর্ত্তী শিষ্য প্রভাতনাথের ১৬৬৫ সম্বৎ লিখিত হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে ১২০ বৎসরের ব্যবধান রহিয়াছে, অবশ্য সিদ্ধগণ দীর্ঘজীবী হইতেন ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত।[২]

জ্ঞানেশ্বরের জন্মকাল ১২৭৩ খৃষ্টাব্দ		
নিবৃত্তির	,,	১২৭৫ খৃষ্টাব্দ
গৈনীনাথের	,,	১২৭৫ – ১০০ = ১১৭৫ খৃষ্টাব্দ
গোরক্ষের	,,	১১৭৫ – ১০০ = ১০৭৫ খৃষ্টাব্দ
মৎস্যেন্দ্রের	,,	১০৭৫ – ১০০ = ৯৭৫ খৃষ্টাব্দ

খক্করের হিসাবানুসারে ১২০ বৎসরের দীর্ঘ ব্যবধান না ধরিয়া সিদ্ধেরা দীর্ঘজীবী হইতেন এই অনুমানে যদি ১০০ বৎসরের ব্যবধান গুরু-শিষ্য-মধ্যে ধরা যায় (কেবল নিবৃত্তি ২ বৎসরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন এ বিষয়ে সকলেই একমত), তাহা হইলে গোরক্ষের জন্মকাল আনুমানিক ১০৭৫ খৃষ্টাব্দ ও মৎস্যেন্দ্রের জন্মকাল আনুমানিক ৯৭৫ খৃষ্টাব্দ হইয়া পড়ে। তাহা হইলে 'কৌলজ্ঞান' পুথির রচনাকাল একাদশ শতাব্দীর সহিতও সামঞ্জস্য থাকে এবং তন্ত্রালোক-রচনাকালে অভিনবের পক্ষেও মচ্ছেন্দ্রবিভুকে নমস্কার জানান অসম্ভব হয় না। অতএব আমাদের অনুমানে মৎস্যেন্দ্র দশম শতাব্দীর ও গোরক্ষ দশমের শেষভাগের বা একাদশের প্রথমের। জ্ঞানেশ্বরীর গুরুপরম্পরা অনুসারে প্রচলিত ব্যবধান ধরিয়া গোরক্ষকে দ্বাদশ শতাব্দীর ধরিলে অন্যান্য প্রমাণের সহিত বিরোধ ঘটে।

রসরত্নসমুচ্চয় নামক কবিরাজী রাসায়নিক গ্রন্থে নিত্যনাথ, গোরক্ষনাথ প্রভৃতির নামোল্লেখ আছে, গ্রন্থকর্ত্তা নিজেকে বাগ্‌ভট বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তদনুসারে গ্রন্থের রচনাকাল খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী বা তৎপূর্ব্ব বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। কিন্তু আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রতিপন্ন

১। গোপীচন্দ্রের গান (২য় খণ্ড)—ভূমিকা, পৃ ১৪

২। ঐ পৃ ১৫ খক্করের প্রবন্ধের নাম—কচ্ছে কানফাটাদের ইতিহাস—I. A., Vol. VII, p. 49

করিয়াছেন যে, এই গ্রন্থ অষ্টাঙ্গহৃদয়-প্রণেতা বাগ্ভট্টের লেখনী-প্রসূত হইতে পারে না, ইহা খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ বা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর গ্রন্থ।[১]

শব্দপ্রদীপ-রচয়িতা রাজবৈদ্য সুরেশ্বর স্বীয় পরিচয়ে লিখিয়াছেন যে তাঁহার পিতা ভদ্রেশ্বর রাজা রামপালের প্রধান চিকিৎসক এবং ভদ্রেশ্বরের পিতামহ দেবগণ গোবিন্দচন্দ্রের রাজসভায় 'বৈদ্যগণাগ্রণী' ছিলেন। শব্দপ্রদীপের রাজা গোবিন্দচন্দ্র ও রাজেন্দ্রচোলের গোবিন্দচন্দ্র অভিন্ন হইলে, খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে গোপীচন্দ্রের আবির্ভাব ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এই গোবিন্দচন্দ্র কে তাহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় নাই।[২]

গোবিন্দচন্দ্রের মাতা ময়নামতী গোরক্ষের শিষ্যা এবং হাড়িপা বা জালন্ধরি ময়নামতীর গুরুভ্রাতা—এ প্রবাদ বঙ্গদেশে বহু শতাব্দী ধরিয়া যোগীদের গাথার মধ্য দিয়া বংশানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে। গোরক্ষ ময়নামতী ও তাঁহার স্বামী মাণিকচন্দ্রের সমসাময়িক হইলে, তাঁহাকে একাদশ শতাব্দীর বলিতে হয়। গোবিন্দচন্দ্র ও গোপীচন্দ্র একই ব্যক্তির বিভিন্ন নাম।

গোপীচন্দ্র ঢাকার অন্তঃপাতী সাভারের রাজা হরিশ্চন্দ্রের জামাতা ছিলেন কি না তাহাও নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় না। ভট্টশালী-সম্পাদিত 'ময়নামতীর গানে' আভাস পাওয়া যায় যে দাক্ষিণাত্যের রাজা রাজেন্দ্র চোল তদীয় এক কন্যাকে গোবিন্দচন্দ্রের মহিষীরূপে অর্পণ করিয়া সন্ধি স্থাপন করেন।[৩] তবে হরিশ্চন্দ্রের কন্যা অদুনাই প্রধানা মহিষী ছিলেন; গ্রীয়ার্স্‌ন প্রভৃতি সংগৃহীত বঙ্গীয় গাথায় গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস উপলক্ষে অদুনার বিলাপ বর্ণিত হইয়াছে। তিরুমলয়ে উৎকীর্ণ গিরিলিপি হইতে রাজেন্দ্রচোলের হস্তে গোপীচন্দ্রের পরাজয়-কাহিনী আছে; এই লিপি ১০১২ খৃষ্টাব্দের (মতান্তরে ১০২৫ খৃঃ)। (গোপীচন্দ্রের কাল-নির্ণয় অন্যত্র করা হইয়াছে) গোপীচন্দ্রের পিতা মাণিকচন্দ্রকে ধর্ম্মপালের ভ্রাতা বলা হয় এবং পালবংশীয় রাজা দেবপালের সময়ে গোরক্ষের আবির্ভাব হয় এরূপ মতও প্রচলিত আছে, কিন্তু বর্ত্তমান জ্ঞানে মাণিকচাঁদের যে সময় নির্দ্ধারণ করা হইতেছে (খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দী) তাহা

১। গোপীচন্দ্রের গান (২য় খণ্ড), ভূমিকা পৃ ১৬
২। " " পৃ ১৯
৩। ময়নামতীর গান—দীনেশ সেনের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে উল্লেখ, পৃ ৫৬ (৫ম সং)

পালবংশীয় বিখ্যাত রাজা ধর্ম্মপালের বহু পরবর্ত্তী। মাণিকচন্দ্রের সহিত ধর্ম্মপালের কোনরূপ সম্বন্ধ-স্থাপন (হ্যামিল্টন, গ্রীয়ার্স ন, গ্লোজিয়ার প্রভৃতি এই মতের প্রবর্ত্তক) প্রচলিত কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া স্থাপিত। গ্রীয়ার্স ন তাঁহাদিগকে প্রতিদ্বন্দ্বী নৃপতি বলিয়াছেন, কিন্তু এই বিশ্বাসের উপযুক্ত কোন কারণ নাই।[১] গোপীচন্দ্রকে মহীপালের সমসাময়িক বলা হয় (৯৭৮-১০৩০ খৃঃ); ইহা সত্য হওয়া অসম্ভব নহে। (শাস্ত্রীর উল্লেখ, ব্রীগ্ স, পৃ ২৭৫।) কারণ রাজেন্দ্র চোল দ্বারা উভয়েই পরাজিত হন।

কোন কোন তন্ত্রে মৎস্যেন্দ্রাদির উল্লেখ আছে, শক্তিরত্নাকর-তন্ত্রে মীননাথের নাম আছে, শাবর-তন্ত্রে দ্বাদশ কাপালিক গুরু ও দ্বাদশ শিষ্যের নাম আছে, শিষ্যমধ্যে মীননাথ, গোরক্ষ ও চর্পটীর নাম পাওয়া যায়।[২] চক্রসম্ভার-তন্ত্রের গুরুপরম্পরায় জালন্ধরিপা, কৃষ্ণ, গুহ্য, বিজয়পা, তিলোপা ও নারোপার নাম পাওয়া যায়। তিলোপা-শিষ্য বিক্রমশীলার বিহারের অধ্যক্ষ নারোপা, দীপঙ্করের গুরু ছিলেন। তিলোপা যে মহীপালের সমসাময়িক ছিলেন সে সম্বন্ধে সকল তিব্বতী সূত্রই একমত, মহীপালের সময় আনুমানিক ৯৭৮-১০৩০ খৃ। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ৫৮ বৎসর বয়সে ১৯৩৫ বা ১০৩৮ খৃষ্টাব্দে তিব্বতে যান তাহাও জানা আছে, অতএব দীপঙ্কর-গুরু নারোপা দশম শতাব্দীর শেষ বা একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের সিদ্ধপুরুষ। জালন্ধরি ও তিলোপার মধ্যে তিনটী নাম পাওয়া যায়; বাগচী বলেন সে ক্ষেত্রে মৎস্যেন্দ্র ও গোরক্ষও ৯০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বের হইতে পারেন না।[৩]

আদিসিদ্ধাচার্য্য লুইপার কাল বাংলাপদ হইতে নবম শতাব্দী ধার্য্য করা হইয়াছে, লুইপাদের বংশে তিলপাদ নামে সিদ্ধাচার্য্যও সহজিয়া গান রচনা করিয়াছেন, শাস্ত্রী মহাশয় আমাদের এ কথা জানাইয়াছেন।[৪]

লুইপা চর্পটী ও নাগার্জ্জুনের সমসাময়িক এ প্রসিদ্ধিও আছে, তুচী চর্পটীর কাল দশম শতাব্দী স্থির করিয়াছেন, আলবেরুণী রসায়নাচার্য্য নাগার্জ্জুনকে দশম শতাব্দীর বলিয়াছেন, লুইপা ও মৎস্যেন্দ্র অভিন্ন হইলে মৎস্যেন্দ্রকেও দশম শতাব্দীর বলিতে হয়। দশম শতাব্দীর শেষে লুইপা

১। গোপীচন্দ্রের গান (২য়), পৃ ৩১, ৩২
২। কৌলজ্ঞান নির্ণয়-ভূমিকা, বাগচী, পৃ ১৯
৩। বাগচী, ভূমিকা, পৃ ২৭। বৌদ্ধগান ও দোহা, শাস্ত্রী-সম্পাদিত, পৃ ২২।
৪। বৌদ্ধগান ও দোহা, শাস্ত্রী, পৃঃ ১৬।

দীপঙ্করকে 'অভিসময়বিভঙ্গ'নামক পুথি মুখে মুখে ব্যাখ্যা করেন (সং, অবতারিত) এবং দীপঙ্কর তাহা লিপিবদ্ধ করেন, পুথির ভণিতায় যুগ্ম নাম দেখিয়া ইহাই অনুমিত হয়। অতএব লুইপা-মৎস্যেন্দ্র দীপঙ্কর অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন ও দশম শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বা একাদশের প্রথমে বর্ত্তমান ছিলেন বলা যায়। শহীদুল্লাহ্‌ তারানাথ ও লেভির উপর নির্ভর করিয়া লুইপাকে সপ্তম শতাব্দীর বলিয়াছেন।[১]

হঠযোগপ্রদীপিকায় (৪।১) মৎস্যেন্দ্রাদির উল্লেখ আছে, কিন্তু গ্রন্থটী অপ্রাচীন হওয়ায় তাহার সিদ্ধ-তালিকা (১।৫-৮) নির্ভরযোগ্য নহে। এই তালিকা অনুসারে মৎস্যেন্দ্র ও মীননাথ ভিন্ন ব্যক্তি। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মিথিলা-রাজকবি জ্যোতিরীশ্বরের বর্ণ (ন) রত্নাকরে ৮৪ সিদ্ধের তালিকা আছে, তন্মধ্যে প্রথমেই মীন, গোরক্ষ, চৌরঙ্গীর নাম আছে, তৎপরে ষষ্ঠ স্থান হাড়িপার ও উনবিংশ স্থান জালন্ধরের।[২]

আবার ভোটিয়া গ্রন্থমতে জালন্ধরই আদিনাথ, তিনি ঘণ্টাপাদের প্রশিষ্য এবং মৎস্যেন্দ্র, কাহ্নপা ও তাতিপার গুরু, গোরক্ষ জালন্ধরের প্রশিষ্য।[৩]

নবনাথের বিভিন্ন তালিকা পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা দ্বারাও সময়-নির্ণয় সম্ভবপর নহে। "গোরক্ষ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহে"র তালিকায় আদিনাথ, মৎস্যেন্দ্র ও গোরক্ষের নাম আছে।[৪]

শাস্ত্রী মহাশয় "বেণের মেয়ে"-রচনাকালে রাজগুরু লুইপার কাল আনুমানিক ১০০০ খৃষ্টাব্দ ধার্য্য করিয়া গ্রন্থরচনা করিয়াছেন। যোগী-সম্প্রদায়ের নানা কথা এই গ্রন্থে আছে।[৫]

লুইপা ওড়িয়ানের রাজকর্ম্মচারী ছিলেন, তাঁহার পূর্ব্বনাম সামন্তশম্ভু ছিল এবং তিনি শবরীর নিকট তন্ত্রে দীক্ষা লন, একটী তিব্বতী গ্রন্থে এইরূপ উল্লেখ আছে। (এই গ্রন্থের নাম, পৃষ্ঠা প্রভৃতির জন্য বাগচীর ভূমিকা, পৃ ২৩ দ্রষ্টব্য।) চৌরাশী সিদ্ধের ইতিহাসে লুইপার জন্ম ওড়িয়ানে বলা হইয়াছে। তখন ওড়িয়ানের রাজা ছিলেন

১। বঙ্গদেশের ইতিহাস, পৃ ৩৪১ ও ফুটনোট। বাগচী, ভূমিকা, পৃ ২৮। বৌদ্ধ গান ও দোহা, পৃ ২১।

২। বৌদ্ধগান ও দোহা পৃঃ ৩৫, ৩৬। 4th, Ort Confer : S. Chatterji's বর্ণরত্নাকর।

৩। গঙ্গা, পৃ ২৫২, জালন্ধরনাথ

৪। গো সি. স. পৃ ৪০

৫। বেণের মেয়ে, ১ম পরিচ্ছেদ

ইন্দ্রভূতি।[১] ওড়িয়াম বঙ্গদেশে অবস্থিত ছিল ইহা দাসগুপ্ত প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছেন।[২]

আবার লুইপাকে ধর্ম্মপালের কায়স্থ বা লেখক বলা হইয়াছে, ধর্ম্মপালের কাল আনুমানিক ৭৯৬-৮০৯ খৃষ্টাব্দ। শবরপা ধর্ম্মপালের রাজ্যে আগমন করিলে লুইপা তাঁহার নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন, দ্বারিকপা ও ঢেণ্টীপা লুইপার শিষ্য। বস্তুতঃ লুইপা আদিসিদ্ধাচার্য্য নহেন, তাঁহার অত্যধিক প্রভাববশতঃ তিনি আদি বা প্রথম বলিয়া গণ্য হন। লুইপার রচিত পাঁচখানি গ্রন্থ আছে।[৩]

মীননাথ মৎস্যেন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষরূপে বর্ণিত হন, তাঁহার রচিত বাংলা পদ আছে। মীনপাদের রচিত 'বোধিচিত্ত' নামক পুথি আছে।[৪]

দাক্ষিণাত্যের প্রবাদ অনুযায়ী গোরক্ষাদি দশম শতাব্দীর শেষপাদ বা একাদশের প্রথমপাদের সিদ্ধ। দে ও বাগচী এই মত সমর্থন করিয়াছেন।[৫] অভিসময়বিভঙ্গের ভণিতা হইতেও এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয়, তন্ত্রালোক অনুসারেও মৎস্যেন্দ্র একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বের।

কুমিল্লায় চন্দ্রনাথ, আদিনাথ, ময়নামতী প্রভৃতির নামে পাহাড় ও মন্দির আছে, ইহাদের 'নাথ'-পূজারী আছে। অতএব ইহা দ্বারাও নাথ-সম্প্রদায়ের সহিত গোপীচন্দ্র-বংশের সম্বন্ধের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, প্রথম রাজেন্দ্র চোল দেবের রাজত্বকাল ১০৩৫ খৃ পর্য্যন্ত। তিনি ১০২৩ খৃ বঙ্গদেশে অভিযান করেন এবং বঙ্গবিহারাধিপতি মহীপালকে পরাজিত করেন। রাজেন্দ্র চোল জয়ী হইয়া 'গঙ্গাইকোণ্ডা' উপাধি গ্রহণ করেন। পালবংশের ইতিহাস অনুসারে—

প্রথম রাজা গোপাল (আনুমানিক ৭৫০ খৃষ্টাব্দ)
দ্বিতীয় রাজা ধর্ম্মপাল (আনুমানিক ৭৯৬—৮০৯ খৃষ্টাব্দ)
তৃতীয় রাজা দেবপাল (নবম শতাব্দীর)

১। কদলী রাজ্য, পৃ ১১

২। I. H. Q. XI, p. 192. N. Das Gupta's article.

৩। গঙ্গা, পৃ ২৪৮

৪। বঙ্গদেশের ইতিহাস (দের প্রবন্ধ), পৃ ; ৩৪৩ ; বৌদ্ধগান ও দোহা, পৃ ৯৬

৫। বঙ্গদেশের ইতিহাস, পৃ ৩৪১, Ref. B. A Saletore.

ইহার ভগিনী ময়না ধর্ম্মপূজায় রামাই পণ্ডিতকে সাহায্য করেন।

নবম রাজা মহীপাল (৯৭৮—১০৩০ খৃষ্টাব্দ)

রাজেন্দ্র চোল ইহার রাজ্য আক্রমণ করেন।

নয়াপালের রাজত্বকালে ১০৩৮ খৃষ্টাব্দ অতীশা তিব্বতে যান।[১]

তান্ত্রিক আচার খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে প্রচারিত হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তম অষ্টম শতাব্দীতে উদ্দাম আকার ধারণ করে (৭ম শতাব্দীর মধ্যভাগে হিউএন্‌ৎস্যাং বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তির সহিত শক্তিমূর্ত্তি দেখেন, লামাধর্ম্ম, ওয়াডেল, পৃ ১২৮) এবং নবম দশম শতাব্দীতে চরম সীমায় উপনীত হয়। রাজশেখরের গ্রন্থাদি হইতে জানা যায় যে 'কৌল-প্রথা' লোকপ্রিয় ছিল। সমগ্র "কর্পূরমঞ্জরী" গ্রন্থে কৌল বা ভৈরবানন্দের নিন্দাবাচক একটীও শব্দ নাই, আধুনিক পাঠকের নিকট কৌলের বর্ণনা অরুচিকর হইলেও, তান্ত্রিক গ্রন্থাদি হইতে বর্ণনার সত্যতা-সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। ভৈরবচক্রে কৌলেরা শক্তির পূজার নিমিত্ত একত্র হইতেন, ইহাতে সর্ব্বশ্রেণীর প্রবেশাধিকার ছিল। সর্ব্বশ্রেণীর স্ত্রীলোকেরাও ইহাতে যোগদান করিত। ইহাদের 'কৌলাঙ্গনা' আখ্যা দেওয়া হইত।[২]

গুহ্যসমাজ-নামক বৌদ্ধতন্ত্র গ্রন্থের অষ্টাদশ অধ্যায়ে প্রজ্ঞাভিষেক বা দীক্ষার্থীকে প্রজ্ঞা বা শক্তির সহিত যুক্ত করিবার প্রথার বর্ণনা আছে। এই গ্রন্থ খৃষ্টীয় তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীর। বৈশ্য, শূদ্র, রজক প্রভৃতি শ্রেণীর কন্যারাই শক্তি হইত।

সাধকদের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার মাংস আহারে বিধি ছিল। সমাজের কোন নিয়ম মান্য করিতে তাহারা বাধ্য ছিল না। মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ, স্তম্ভন, আকর্ষণ, শান্তিক ইত্যাদি বিষয়ও এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। শত্রুনাশ, বৃষ্টিপাত, সর্পবিষ হইতে মনুষ্যকে পুনর্জীবিত করা প্রভৃতিও আলোচিত হইয়াছে।[৩]

'মালবিকাগ্নিমিত্রের' চতুর্থ দৃশ্যে সর্পবিদ্যার উল্লেখ আছে, অথর্ব্ব বেদের সময় হইতেই সর্পবিদ্যা, যাদুবিদ্যা বা মায়া ইত্যাদি প্রচলিত। বাণের 'হর্ষচরিতের' অষ্টম গ্রন্থে দেখা যায় যে একাবলী-সাহায্যে বাণ

১। The Oxford History of India, V. Smith, pp. 211, 186 (1923)

২। Magic and Miracle, K. Mitra pp. 34, 35.

৩। Magic & Miracle, K. Mitra, pp. 35, 86.

বিষক্রিয়া হইতে রক্ষা পান এবং সকল প্রকার কার্য্যে সাফল্য লাভ করেন। 'মৃচ্ছকটিক' নাটকে যোগরোচনা নামক মায়াময় প্রলেপ ব্যবহারে অদৃশ্য হইবার কথা আছে। পালি গ্রন্থাদিতেও এই বিদ্যার উল্লেখ আছে। ইচ্ছামত রূপ-ধারণ, আকাশমার্গে গমন ইত্যাদি বিভূতি জৈন গ্রন্থেও পাওয়া যায়। বুদ্ধদেব পিণ্ডোলা ভরদ্বাজকে আকাশমার্গে গমনের জন্য তিরস্কার করেন। কিন্তু জৈনগ্রন্থে আকাশমার্গে গমন করিয়া নিত্য পঞ্চতীর্থ-দর্শনের বৃত্তান্ত আছে।

'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকে কাপালিক-বর্ণনা আছে, ইহা একাদশ শতাব্দীতে রচিত। ভবভূতির 'মালতীমাধব' অষ্টম শতাব্দীর, ইহাতেও কাপালিক-বৃত্তান্ত আছে। বাণের 'হর্ষচরিত' সপ্তম শতাব্দীতে রচিত হয়, হর্ষ পাশুপত ছিলেন, গ্রন্থেও যাদুবিদ্যার কথা আছে। অতএব কাপালিক পাশুপত আদি সম্প্রদায় গুপ্তবংশের পরে অর্থাৎ সপ্তম অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বে প্রতিপত্তি লাভ করে নাই, ইহা একপ্রকার নিশ্চিত।[১]

১। Ibid., pp. 23, 24, 18, 19, 16, 13.

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

লুইপাদ, মৎস্যেন্দ্র, মীননাথ ভিন্ন না অভিন্ন ?

লুইপাদ, মৎস্যেন্দ্র ও মীননাথ এক ও অভিন্ন ব্যক্তি না ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি তৎসম্বন্ধে বিদ্বৎকুলে যথেষ্ট বাদানুবাদ হইয়াছে।

মীননাথ, মৎস্যেন্দ্র

এখানে এই দুই জনের ব্যক্তিত্ব-সম্বন্ধে প্রথমে আলোচনা করিব। বঙ্গদেশের প্রচলিত মতানুসারে মীননাথ পুত্র, মৎস্যেন্দ্র তাঁহার পিতা, আবার তিব্বতীমতে মীননাথ মৎস্যেন্দ্রের পিতা।[১] অথবা পূর্ব্ব পুরুষ।[২] বাগচী দেখাইয়াছেন যে কৌলজ্ঞাননির্ণয় পুথির মধ্যবর্ত্তী অধ্যায়ের ভণিতায় 'মীননাথ' এর নাম ও পুথির শেষ দিকের ভণিতায় 'মৎস্যেন্দ্রে'র নাম পাওয়া যায়, অতএব মীননাথ মৎস্যেন্দ্রের পুত্র হইতে পারেন না। তদ্ব্যতীত অকুলবীরতন্ত্র পুথির এক খণ্ডের ভণিতায় 'মীননাথে'র নাম এবং প্রায় অনুরূপ আর একখণ্ড অকুলবীরতন্ত্রের ভণিতায় 'মৎস্যেন্দ্রের' নাম পাওয়া যায়, অতএব বুঝা যায় যে পুথিদ্বয় রচিত হইবার কাল পর্য্যন্ত মীননাথ ও মৎস্যেন্দ্রনাথ এই উভয় নাম প্রতিশব্দরূপেই ব্যবহৃত হইত, অতএব উভয়ে এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।[৩] তিব্বতে ও নেপালে মৎস্যেন্দ্র নাথধর্ম্ম-প্রচারের সময়ে যথেষ্ট সম্মান পাইয়াছেন, ভারতবর্ষেও তাঁহার প্রতি দেবত্ব আরোপণ করিয়া তাঁহাকে শিবসদৃশ বলা হইয়াছে।[৪] নেপালে মৎস্যেন্দ্রনাথ বুগানের লোহিত অবলোকিতেশ্বর-রূপে পূজা পান। মীননাথ তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বা সানু মৎস্যেন্দ্রনাথ-রূপে পূজা পান। উভয়েই প্রায় তুল্য জাঁকজমক-সহকারে পূজা পাইয়া থাকেন। এই অনুসারে মৎস্যেন্দ্র ও মীননাথ ভিন্ন হইয়া পড়েন।[৫]

আমাদের অনুমান হয় মীননাথ ও মৎস্যেন্দ্র অভিন্ন, কারণ তন্ত্রালোক-ভাষ্যে আছে। (১।২৪)—"ভৈরব্যা ভৈরবাৎ প্রাপ্তং যোগং

১। গঙ্গা—পুরাতত্ত্বাঙ্ক, পৃ: ২৫৪। ২। বঙ্গদেশের ইতিহাস, পৃ ৩৪৩।

৩। বাগচী, ভূমিকা, পৃ, ৭, ৮।

৪। I. H. Q., 1930, pp. 178-81 Legend of Matsyendranath-Chakravarti.

৫। বাগচী, ভূমিকা, পৃ ১২।

ব্যাপ্য ততঃ প্রিয়ে। তৎসকাশাত্তু সিদ্ধেন মীনাখ্যেন বরাননে। কামরূপে মহাপীঠে মচ্ছেন্দ্রেণ মহাত্মনা”—ইহা দ্বারা মীন ও মৎস্যেন্দ্র এক ব্যক্তি বলিয়াই মনে হয়। আবার তন্ত্রালোকে কৌলদের কথা আছে, মীন বা মচ্ছেন্দ্রবিভু কামরূপে মহাপীঠে কৌলমার্গের প্রতিষ্ঠা করেন। কৌলজ্ঞান পুথিতেও কৌলদের কথা আছে, ভণিতায় ‘যোগিনী কৌলের মচ্ছন্দ্রপাদ অবতারিত’ ইত্যাদি কথা আছে; অতএব মীননাথ ও মৎস্যেন্দ্র যে অভিন্ন তাহা একপ্রকার নিশ্চিতরূপেই বলা চলে।

লুইপাদ, মৎস্যেন্দ্র

এখন লুইপাদ ও মৎস্যেন্দ্র ভিন্ন না অভিন্ন তাহাই বিবেচ্য। তিব্বতীমতে লুইপা ওড়িয়ান-বাসী ও ওড়িয়ান রাজার কর্ম্মচারী ছিলেন, শাবরীপা সে দেশে গমন করিলে, লুইপা তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং তদবধি তাঁহার পূর্ব্ব নাম ‘সামন্তশোভা’ বা ‘সামন্তশম্ভু’ ত্যাগ করেন। এই ওড়িয়ান গৌহাটীর উত্তরে, আধুনিক হোজাই নামক স্থানে এবং বঙ্গদেশের মধ্যেই ছিল বলিয়া দাসগুপ্ত স্থির করিয়াছেন।[১] লুইপাদ বাংলায় চর্য্যা ও গ্রন্থ রচনা করেন। তিব্বতীদের মধ্যে ইনি নিজ অসীম ক্ষমতা বলেই ‘আদিসিদ্ধ’নাম অর্জ্জন করিয়াছেন, বস্তুতঃ তিনি ‘আদিসিদ্ধ’ নহেন।[২] তিব্বতীমতে শাবরীপা তাঁহার গুরু, ভারতীয়মতে শাবরী মৎস্যেন্দ্রের পরবর্ত্তী কালের সিদ্ধ।[৩]। ভারতীয়-মতে মৎস্যেন্দ্র আদিসিদ্ধরূপে বর্ণিত হন, তিব্বতে লুইপা সেই স্থান গ্রহণ করায় ও উভয়েই জাতিতে কৈবর্ত্ত বিবেচিত হওয়ায় ইহাদের অভিন্ন বলিয়াই অনুমান হয়।

লুইপার নামান্তর লুহিপাদ, লোহিপা, লোহিতপাদ প্রভৃতি। কামরূপের প্রধান নদীর নাম ব্রহ্মপুত্র বা ‘লোহিত’, তাই দেশের নাম লোহিত্য এবং ঐ দেশবাসী বলিয়া মৎস্যেন্দ্রের নাম লুহিপাদ বা লুইপা হওয়া অসম্ভব নহে। তেঙ্গুরের ক্যাটালগে লুইকে বঙ্গবাসী বলা হইয়াছে, তিব্বতী ‘গ্রাব ও টাব’ গ্রন্থে তাঁহাকে কামরূপের কৈবর্ত্ত-সন্তান বলা হইয়াছে।[৪]

লুই অর্থে লোহিত বা রোহিত (রোহিত > লোহিত > লুই)

১। কদলীরাজ্য, পৃ ২৬, ৩১।
২। গঙ্গা পুরাতত্ত্বাঙ্ক পৃ ২৪৮।
৩। হ যো-প্র, ১৫,।
৪। কদলীরাজ্য, পৃ ১১।

অর্থাৎ মৎস্যদের রাজা হইতে পারে, মৎস্যেন্দ্র পদের অর্থও তাহাই।[১] লুইএর নামান্তর মৎস্যান্ত্রদ, তাঁহার নামে রাঢ়দেশে পাঁঠী ছাড়িয়া দেওয়া হয় ও ময়ুরভঞ্জে তাঁহার পূজা হইয়া থাকে।[২]

মতান্তরে মীনপা আসামের কৈবর্ত্ত ও লোহিত্য নদীতে মৎস্য ধরিতেন, ইঁহার পুত্র মৎস্যেন্দ্র ও শিষ্য গোরক্ষ। চর্পটী মীনপার গুরু ছিলেন, মীনপার বাংলা পদ আছে।

তিব্বতী ভাষায় লুই অর্থে মৎস্যোদর, ভারতীয়মতেও মৎস্যেন্দ্র মৎস্যোদর হইতে উদ্ধারপ্রাপ্ত। তিব্বতী কাহিনীমতে শিবই কৌলাগম-প্রচারার্থ কৈবর্ত্তরূপে মৎস্যোদরে আবির্ভূত হন এবং মীন, মচ্ছেন্দ্র, বজ্রপাদ প্রভৃতি নামে পরিচিত হন। তাঁহার মৎশীন্দ বা অতশীন্দ, অছেন্দ্র প্রভৃতি নামও প্রচলিত আছে। তিব্বতী চিত্রে মৎস্যেন্দ্র মৎস্য-পরিবৃত ও মৎস্য-অন্ত্র আহারে রত দেখা যায়। শাস্ত্রী ইহার সুন্দর চিত্র বর্ণন করিয়াছেন "রাজার গুরু মাছের আঁতড়ি খাইতে ভালবাসেন, পোটা ও তেল খাইতে ভালবাসেন। সুতরাং এত যে গাড়ী গাড়ী মাছ রাজ-বাড়ীতে গেল, সে মাছের দরকার থাক আর না থাক, মাছের তেল, আঁতড়ি ও পোটার বেশী দরকার।" ইহা ১০০০ খৃষ্টাব্দের এক ভোজ-সভার বর্ণনা। তৎপরে লুইপার বর্ণনা আছে, যথা—লুইপার মাথা নেড়া, লম্বা দাড়ী, গোপ কামান, পরণে আলখাল্লা, তাহার গায়ে ছোট লাল রংয়ের রেশমের ও পাটের বাকলের টুকরা লাগান।[৩]

মীননাথের বাংলাপদ ও 'বোধিচিত্ত'বিষয়ে পুথি আছে, মীননাথ ও মৎস্যেন্দ্র অভিন্ন। অতএব তিনি সহজসিদ্ধির প্রথম আচার্য্য। সহজসিদ্ধি মন্ত্রযান ও বজ্রযানের ব্যতিক্রম এবং ইহাই নাথপন্থের সূত্রপাত। লুইপার নামে বজ্রযানের পুথি আছে, মৎস্যেন্দ্রের নামে নাই। চন্দ্রদ্বীপের মৎস্যেন্দ্র কৌল ছিলেন (যোগিনী কৌল), তারানাথও বলেন লুইপা যোগিনী-পদ্ধতি প্রচলিত করেন, অতএব চন্দ্রদ্বীপের মৎস্যেন্দ্র ও লুইপা অভিন্ন ব্যক্তি এবং বাঙ্গালী।

হঠযোগের সহিতও যোগিনী-কৌলমার্গীদের যথেষ্ট সম্বন্ধ ছিল, কারণ মৎস্যেন্দ্রাসন প্রভৃতি হঠযোগ মার্গে আছে। কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রসারে

১। বাগচী, ভূমিকা, পৃ ২৪।　২। বৌদ্ধগান ও দোহা, পৃ ১৮।

৩। বেণের মেয়ে, ১ম পরিচ্ছেদ, শাস্ত্রী।

মীননাথ ও মৎস্যেন্দ্রকে তাঁহার পূজারী বলা হইয়াছে।[১] অতএব লুই, মীননাথ ও মৎস্যেন্দ্র এক ও অভিন্ন ব্যক্তি, ইহাই আমাদের বক্তব্য।

লুইপাদ ও মৎস্যেন্দ্রের ধর্ম্মমত-বিচার

বাঙ্গালী বৌদ্ধ ও শৈব তান্ত্রিক সিদ্ধাচার্য্যেরা অপভ্রংশে সাধন-ঘটিত যে সকল কবিতা বা পদ লিখিয়াছেন তাহা 'দোহা' নামে পরিচিত। এই দোহাগুলি বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম রূপ, ইহা শ্রীযুক্ত সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গবেষণার সাহায্যে নিশ্চিতভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই দোহাগুলি বিশেষ মাধুর্য্যমণ্ডিত ও ইহাদের বাহ্য অর্থ ব্যতীত গভীর অর্থও আছে, তবে বহুল প্রচারের ফলে পাঠান্তর ও পাঠ-বিকৃতি হইয়াছে মনে হয়। তথাপি যেটুকু বুঝিতে পারা যায়, তাহার গভীর অর্থ সর্ব্বত্র প্রকাশ করা নিরাপদ্ নহে, কারণ ইহা সাধন-সঙ্কেত দ্যোতনা করে। ধর্ম্মই সাহিত্যের আদি উপজীব্য, পদকর্ত্তারা জন-সাধারণের জন্য সহজবোধ্য ভাষায় পদ রচনা করেন, এইরূপে তান্ত্রিক বজ্রাচার্য্য ও শৈব নাথাচার্য্যদিগের হস্তে বাঙ্গলা সাহিত্যের ভিত্তিস্থাপন হইল।[২]

পদকর্ত্তারা 'সিদ্ধাচার্য্য' নামে খ্যাত ছিলেন, ইঁহাদের আবির্ভাব-কাল লইয়া অদ্যাপি যথেষ্ট মতভেদ আছে, শহীদুল্লাহ্ এর মতে প্রাচীনতর সিদ্ধাচার্য্য লুইপাদাদি খৃষ্টীয় সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীর, বাগচী ও চট্টোপাধ্যায়ের মতে তাঁহাদের আবির্ভাব-কাল দশম হইতে দ্বাদশ শতকের মধ্যে।

চর্য্যাপদগুলির সমসাময়িক বিষ্ণুর দশাবতারস্তোত্র পাওয়া গিয়াছে; ইহার মধ্যে 'মৎস্যাবতার-বন্দনা' মূলে প্রাচীন বাঙ্গলায় রচিত ছিল বলিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অনুমান করেন। এই বিষ্ণুর দশাবতারস্তোত্র 'মানসোল্লাস' নামক যে গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে তাহা ১০৫১ শকাব্দে অর্থাৎ ১২২৯-৩০ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রে রচিত হয়। ভাষা মূলতঃ বাঙ্গলা হইলেও, যথেষ্ট বিকৃতি ঘটিয়াছে।[৩]

নেপালে চর্য্যাপদের পুথি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় আবিষ্কার করেন। ইহার প্রথম পুথি 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ে'র ভাষা বাঙ্গলা, অপরগুলি

১। বঙ্গদেশের ইতিহাস, পৃ ৩৪১-৪৪। ২। বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস, সুকুমার সেন, পৃ ৩৫।
৩। বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস, সুকুমার সেন, পৃ ৩৫, ৩৬।

অপভ্রংশে রচিত। চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয় চতুর্দ্দশ হইতে ষোড়শ শতকের মধ্যে অনুলিখিত বলিয়া অনুমান হয়। টীকাকার লুইপাদকে পদকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, যদিও টীকা-রচনার বহুপূর্ব্বে চর্য্যাপদগুলি রচিত হয়, কারণ টীকার মধ্যে বহু পাঠান্তর পাওয়া যায়। একটী পদের ব্যাখ্যায় (চর্য্যা ২১) টীকাকার মীননাথের ভণিতাযুক্ত এক বাঙ্গলা দোহা উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা—

তথাচ পরদর্শনে মীননাথ—

কহন্তি গুরু পরমার্থের বাট
কর্ম্ম কুরঙ্গ সমাধিক পাট।
কমল বিকসিল কহিহ ণ জমরা
কমলমধু পিবিবি ধোকে ন ভমরা ॥[১]

অর্থাৎ গুরু পরমার্থের পথ বলিতেছেন, ইহা কর্ম্মরূপ কুরঙ্গের সমাধি-কপাট। কমল ফুটিলে শামুক (জোংরা > জমরা) তাহা কহে না, কিন্তু কমলমধু-পানে ভ্রমরের ভুল হয় না।

চর্য্যাপদগুলিতে বিভিন্ন পদকর্ত্তার নাম পাওয়া যায়। লুইপাদ-রচিত দুইটী চর্য্যা ইহাতে আছে (১, ২৯ সংখ্যক)। এই লুইপাদ 'আদি বজ্রাচার্য্য নামে উল্লিখিত হইয়াছেন, এই মতে ইনি আদি চর্য্যাকারও। এই লুইপাদ আর মৎস্যেন্দ্রনাথ বা মীননাথ অভিন্ন, ইহা বাগচী মহাশয় প্রতিপন্ন করিয়াছেন। মৎস্যেন্দ্র বা মীননাথ শৈব তান্ত্রিক ও যোগীদের মধ্যে আদিসিদ্ধ। লুই< লোহি< রোহিত = মৎস্যেন্দ্র, মীন, এইরূপে অর্থ করা সম্ভবতঃ অসঙ্গত নহে।

তেঙ্গুরের ক্যাটালগের মতে লুই বাংলা দেশের লোক, রাঢ়দেশে তাঁহার পূজা প্রচলিত। সিদ্ধাচার্য্য লুই ব্যতীত কাহ্নুপাদের নাম সুপরিচিত, তবে একাধিক কাহ্নুপাদ ছিলেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। মাণিকচন্দ্র-ময়নামতীর গানের হাড়িপার নামান্তর জালন্ধরিপাদ, ইনি শৈব তান্ত্রিক যোগী ছিলেন, ইহার শিষ্য কানুপা বা কাহ্নুপা (চর্য্যা ৩৬), বলিয়াছেন 'শাখি করিব জালন্ধরিপাত্র', ইহা দ্বারা জালন্ধরিপাদ তাঁহার গুরু ছিলেন তাহা বুঝা যায়। কয়েকটী চর্য্যা হইতে কাহ্নুপাকে কাপালিক যোগী বলিয়া অনুমান করা যায়, যথা—নিঘিণ কাহ্ন কাপালি

১। বৌদ্ধগান ও দোহা—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পৃ ৩৭, ৩৮।

জোই লাঙ্গ' অর্থাৎ আমি নির্ঘৃণ উলঙ্গ কাপালিক যোগী কাহ্ন। এই কাপালিকের ডোমনী সহ চৌষট্টি পাপড়ীযুক্ত পদ্মে চড়িয়া নৃত্য করিবার উল্লেখও দোহায় আছে।

এই চর্য্যাপদগুলির রচনাকাল লইয়া যথেষ্ট মতভেদ আছে। বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাসে খ্রীষ্টীয় ১২০০ হইতে ১৩৫০ সাল পর্য্যন্ত নিশ্চিহ্ন পদক্ষেপে চলিয়া গিয়াছে, কারণ বাঙ্গলা দেশে এই সময়ের ইতিহাস অভূতপূর্ব্ব সংঘর্ষ, দ্বন্দ্ব ও বিক্ষোভের কাহিনী মাত্র। পালবংশের রাজ্যকালে উচ্চজাতীয় ব্যক্তিরা ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ এই উভয় মতেরই আদর করিতেন, খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে বৌদ্ধতান্ত্রিক পণ্ডিত ও সাধকদিগের জন্য দক্ষিণ রাঢ়ের কায়স্থ অধীশ্বর পাণ্ডুদাস সুপ্রসিদ্ধ পাণ্ডুভূমি-বিহার নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। সেন রাজাদের আমলেও জনসাধারণ প্রধানতঃ শৈব ও বৌদ্ধতান্ত্রিক মতাবলম্বী ছিল বলিয়া মনে হয়, ইহারা অনাচরণীয় জাতি বলিয়া পরিগণিত হইত। যাহারা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের আশ্রয়ে আসিল তাহারা নবশাখরূপে গৃহীত হইল।[১]

দ্বাদশ শতাব্দীতে মুসলমান-সংঘাতের ফলে বৌদ্ধতান্ত্রিক ধর্ম্ম লোপ পাইলে শাক্ত তন্ত্রের মধ্যে তাহার দেবদেবী আশ্রয় গ্রহণ করিল। আবার ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও অনার্য্য দেবতার সমাবেশ হইল। 'ধর্ম্মঠাকুরে' ইনি ব্রাহ্মণ্য দেবতা বিষ্ণু ও শিব, বৌদ্ধস্তূপের প্রতীক কচ্ছপ-রূপে পূজিত এবং নামহীন অনার্য্য দেবতা, ইহার বাহন উলূক বা বানর। ইঁহার ধ্যানের মন্ত্র বৌদ্ধ বজ্রযানের 'শূন্য' মন্ত্র। আবার ইঁহার মুসলমানের প্রতি পক্ষপাতিত্ব যথেষ্ট।[২] অনার্য্যের দেবতা ক্রূর, অযথা নিষ্ঠুর, পূজা আদায় করিবার জন্য জঘন্য কার্য্যেও তৎপর, যেমন মনসামঙ্গলের মনসা। শৈব নাথপন্থী যোগীদের যেখানে আর্য্যেতর ধর্ম্ম-বিশ্বাসে ছাপ পড়িয়াছে যেমন 'গোরক্ষবিজয়' প্রভৃতি কাব্য, সেখানে আর্য্যদেবতাদেরও হীনকার্য্যে নিযুক্ত দেখা যায়। ইহার উদাহরণ গোরক্ষবিজয়ের দেবী পার্ব্বতীর গোরক্ষকে পরীক্ষা। মুসলমান অভিযানের ফলে স্থানীয় অনার্য্য মনোভাব সুব্যক্ত হইল, তৎফলে মনসার ছড়া, ধর্ম্মের ছড়া, শিবের ছড়া, রাধাকৃষ্ণের ধামালী প্রভৃতির দ্বারা অপৌরাণিক সাহিত্যের পত্তন হইল। এই সকল কাহিনীর মূলে যে একই মনোভাব ছিল তাহার প্রমাণ 'সৃষ্টিপত্তন'-

১। বা-সা-ই, সুঃ সেন, পৃ ৫১, ৫২। ২। শূন্যপুরাণ, পৃ ২৩২ নিরঞ্জনের উষ্মা।

বর্ণনা। আবার সহজিয়া বাউলপন্থীদের রচনায় ইহার অনুরূপ আর এক ধরণের সৃষ্টিপত্তনের কথা আছে। এই দুই কাহিনীই কোন পুরাণে নাই।[১] চর্য্যাপদগুলিতে সৃষ্টিপত্তনের কোন উল্লেখ নাই। গোরক্ষ-বিজয়, শূন্যপুরাণাদির সৃষ্টিপত্তন-কথা এই নিবন্ধের অন্য অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

এই চর্য্যাপদগুলির সাধনেঙ্গিতের সহিত নাথপন্থীদের সাধনের সামঞ্জস্য বা বিরোধ আছে কিনা তাহাই আমাদের আলোচ্য। ইহার দ্বারা শাস্ত্রী, টুচী ও বাগচী মহাশয়ের মৎস্যেন্দ্রনাথ ও লুইপাদ অভিন্ন ইহা প্রমাণিত হয় কিনা তাহাও বিবেচ্য।

গোরক্ষ-সম্প্রদায়ে প্রচলিত হঠযোগের গ্রন্থে মৎস্যেন্দ্রনাথ-প্রবর্ত্তিত একটী কষ্টসাধ্য আসন ও তাহার ফলের কথা আছে, যথা—

বামোরুমূলার্পিতদক্ষপাদং
জানোর্ব্বহির্ব্বেষ্টিতবামপাদম্।
প্রগৃহ্য তিষ্ঠেৎ পরিবর্ত্তিতাঙ্গঃ
শ্রীমৎস্যনাথোদিতমাসনং স্যাৎ (হ. যো. প্র. ১।২৬)

এই আসন প্রতিদিন অভ্যাসের ফলে জঠরাগ্নি প্রদীপ্ত হয়, দুঃসহ প্রচণ্ড রোগসমূহ শীঘ্র বিনাশ পায়, কুণ্ডলিনী অর্থাৎ আধার-শক্তির প্রবোধ হয়, কখনও নিদ্রাভাব উপস্থিত হয় না এবং চন্দ্র যে তালুর উপরিভাগ-স্থিত হইয়া সর্ব্বদা অমৃতক্ষরণ করিতেছেন, তাহার নিবারণ হয়। (১।২৭ হ. যো. প্র.)।

আদিনাথ শঙ্কর হঠযোগের উপদেষ্টা—"আদিনাথঃ শিবঃ সর্ব্বেষাং নাথানাং প্রথমো নাথঃ। ততো নাথসম্প্রদায়ঃ প্রবৃত্ত ইতি নাথসম্প্রদায়িনো বদন্তি। মৎস্যেন্দ্রাখ্যশ্চ আদিনাথশিষ্যঃ।" (টীকা, হ. যো. প্র. ১।৫)। অন্যত্র আছে "যেন আদিনাথেন উপদিষ্টা গিরিজায়ৈ হঠযোগবিদ্যা —। তথাচোক্তং গোরক্ষনাথেন সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতৌ" (টীকা ১।১ হ. যো. প্র.)।

গোরক্ষ-সংহিতায় গোরক্ষনাথের উপদেশ "আসনং প্রাণসংরোধঃ প্রত্যাহারশ্চ ধারণা" এবং "যোগশাস্ত্রঞ্চ পরমং যোগিনাং সিদ্ধিদায়কম্"— এতদ্ব্যতীত গোরক্ষনাথ কায়াসাধনের প্রধান নেতা ছিলেন, যোগের

১। বা. সা. ই. পৃ ৫৮, ৫৯।

কঠোর নিয়ম দ্বারা দেহ-সংযম ও চিত্তবৃত্তি-নিরোধ ছিল মৎস্যেন্দ্র-গোরক্ষের পন্থা। কিন্তু লুইপাদের চর্য্যাপদে

"সঅল সমাহিঅ কাহি করিঅই।

সুখ দুখেতে নিচিত মরি অই।" (চর্য্যা ১) অর্থাৎ সকল প্রকার সাধনা দ্বারা কি হইবে, তাহাতে সুখ-দুঃখে নিশ্চয় মৃত হইবে। তিনি মহাসুখ লক্ষ্য করিয়া গুরুর নিকট হইতে সহজানন্দ মহাসুখ লাভের উপায় জানিয়া লইতে উপদেশ দেন "দিঢ় করিঅ মহাসুখ পরিমাণ। লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ।" অতএব লুইপাদ কষ্টসাধ্য সাধনপদ্ধতির সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন বলিয়া মনে হয়।[১]

হঠযোগীর নিকট মূল-বন্ধ, জালন্ধর-বন্ধ ও ওড্ডিয়ান-বন্ধ, এই কয়টী সাধনার শ্রেষ্ঠ পন্থা—

মহাবন্ধং সমাসাদ্য উড্ডীন-কুম্ভকং চরেৎ।

মহাবেধঃ সমাখ্যাতো যোগিনাং সিদ্ধিদায়কঃ॥ ১।৭০

গোরক্ষ-সংহিতা—প্রসন্ন কবিরত্ন।

কিন্তু লুইপাদ পূর্ব্বোক্ত চর্য্যাতেই বলিয়াছেন—

এড়িএউ ছান্দক বান্ধ করণ কপাটের আস।

সুন পাখ ভিড়ি লেহুরে পাস।

অর্থাৎ বন্ধাদির সাধনা ত্যাগ করিয়া কেবল শূন্যপক্ষ নৈরাত্ম্য-ধর্ম্মকে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন কর।

পরবর্ত্তী কালেও কৌলতান্ত্রিকদের মধ্যে এই ভাবই প্রচারিত হইয়াছে।[২]

লুইপাদের সাধনার পদ্ধতিতে ভ্রূযুগলের মধ্যে আজ্ঞাচক্রে ইড়াপিঙ্গলার সঙ্গমস্থলে ধমনচমণ পিঁড়িতে অর্থাৎ অলি ও কালির মিলনস্থলে পদ্মাসনে সমাসীন নিজগুরুর মূর্ত্তি ধ্যান করার কথা আছে। এইরূপ গুরুধ্যান পরবর্ত্তী কালে 'ঘেরণ্ড-সংহিতায়' এবং 'বিশ্বসারতন্ত্রে' আছে। আরও পরবর্ত্তী কালে কঙ্কালমালিনী-তন্ত্রে ঐ স্থানে গুরুর বাম উরুতে উপবিষ্টা গুরুপত্নী-ধ্যানেরও উল্লেখ আছে।[৩]

১। 'কদলীরাজ্য'—রাজমোহন নাথ, পৃ ১৪ ২। কদলীরাজ্য, রাজমোহন নাথ, পৃ ১৫।

৩। ঐ পৃ, ১৬।

আজ্ঞাচক্রে ত্রিকোণাকার মণ্ডলকে অকথাদি মণ্ডল, হলক্ষ মণ্ডল, ত্রিবেণীর ঘাট ইত্যাদি বলে। অ-ন বীজ অলি, ইড়া বা চন্দ্রনাড়ী-বেষ্টিত, ক-ল বীজ 'কালি' পিঙ্গলা বা সূর্য্যনাড়ী-বেষ্টিত। এই স্বর ও ব্যঞ্জনের বীজ-বেষ্টিত ইড়া ও পিঙ্গলার সঙ্গমস্থল ভ্রূযুগলের মধ্যে অবস্থিত।

নাথসম্প্রদায়ের ধ্যান এইরূপ নহে, তাঁহারা আজ্ঞাচক্রে নাদ-বিন্দুর ধ্যান করেন, জ্যোতির্ম্ময় বিন্দুর ধ্যান করিয়া কর্ণে নাদ শ্রবণ করাই তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য। গোরক্ষনাথ মূঢ়গণেরও সম্মত নাদোপাসনা প্রচলিত করিয়া রাজা হইতে ভিখারী সকলেরই পূজ্য হন। মৎস্যেন্দ্রনাথেরও লক্ষ্য মনের সহিত নাদের বিলয়-সাধন করিয়া পরব্রহ্ম পরমাত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করা (ব্রজেন্দ্রকুমার বিদ্যারত্ন সম্পাদিত হঠ-প্রদীপিকা, ৪র্থ উপদেশ, ১০০-১০২)। লুইপাদের লক্ষ্য 'মহাসুখ'। লুইপন্থী সহরপাদের দোহায় নাদবিন্দু সাধনের নিষ্প্রয়োজনীয়তার কথা আছে। সদ্‌গুরুর বদনামৃতলহরীর প্রভাবে নাদবিন্দুর কল্পনা ত্যাগ করিলেও মহাসুখ পাওয়া যায়—

নাদ ন বিন্দু ন রবি ন শশিমণ্ডল।
চিঅরাঅ সহাবে মুকুল। (চর্য্যা ৩২)
পার উআরেঁ সোই মজিই
তুজ্জণ সঙ্গে অবসরি জাই॥ ঐ

টীকাকার বলিয়াছেন, "পারেতি পরমার্থেন তদেব বোধিচিত্তং যোগিবরৈরনুগম্যতে। তদনু তস্য গুরুপ্রসাদাৎ মহামুদ্রাসিদ্ধিং প্রাপ্নুবন্তি তে। দেআর (?) ভবে পৃথক্‌জনৈরনুগম্যতে। তেন তে মোহাদিদুর্জ্জনসঙ্গমেন সংসারসমুদ্রে মজ্জংতীতি।"[১]। সরহপাদ আরও বলেন, মনকে বায়ুর সহিত যুক্ত করিয়া রবিশশির মধ্যে চালিত না করিয়া শুধু বটের ছায়ায় অর্থাৎ সদ্‌গুরুর আশ্রয়ে থাকিলেই সমস্ত লাভ হয়। (চর্য্যাপদ-টীকা, পৃ ১৫ "জাহি মণ পবণ ন সঞ্চরই" ইত্যাদি)। কাহ্নুপাদও বলেন, "অলি এঁ কালি এঁ বাট রুন্ধেলা", সদ্‌গুরু-প্রসাদে এই বর্ত্ম উন্মুক্ত হইতে পারে। এই প্রকারে নানা পদে গুরুর মাহাত্ম্য-বর্ণন ও তাঁহার কৃপায় সমস্ত লাভের কথা আছে।

উপরি উক্ত বিবরণ হইতে বলিতে হয় মৎস্যেন্দ্র ও লুইপাদের ধর্ম্মমতে বা সাধনার পদ্ধতিতে সামঞ্জস্য নাই, গোরক্ষসংহিতার কঠোর নিয়মের সহিত, লুইপাদের বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্ম্মের (কৌলজ্ঞাননির্ণয়ের) মিল নাই। বৌদ্ধ সহজিয়া লুইপাদকে তাঁহার ভক্তেরা 'মৎস্যেন্দ্রাবতার'

১। চর্য্যাচর্য্য-বিনিশ্চয়, পৃ ৫০। বৌদ্ধগান ও দোঁহা, শাস্ত্রী দ্রষ্টব্য।

বলিয়া প্রচার করেন, কিন্তু নাথপন্থের মৎস্যেন্দ্রের সহিত তাঁহার ধর্মের কোনও মিল নাই॥[১]।

অপরপক্ষে ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় কৌলজ্ঞাননির্ণয়ের ভূমিকায় (পৃ ২৩, ২৪) প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে লুইপাদ ও মৎস্যেন্দ্র অভিন্ন। তাহার নিম্নরূপ কারণ তিনি দেখাইয়াছেন :

১। তিব্বতী মতে লুইপা আদিসিদ্ধ। ভারতীয় মতে মৎস্যেন্দ্র আদিসিদ্ধ।

২। লুইপার শবরীপার সহিত সম্বন্ধ ছিল, হঠযোগপ্রদীপিকার মতে মৎস্যেন্দ্রের পরেই শাবরানন্দ 'শ্রীআদিনাথ মৎস্যেন্দ্র শাবরানন্দ ভৈরবঃ'।

৩। লুইপা ও মৎস্যেন্দ্র উভয়েই কৈবর্ত্ত।

লুই অর্থে লোহিত, রোহিত বা মৎস্যরাজঃ, ইহা মৎস্যেন্দ্রের সহিত একার্থবোধক।

৪। লুই শব্দের তিব্বতী অনুবাদ ña lto pa অর্থাৎ মৎস্যোদর।

ভারতীয় মতে মৎস্যেন্দ্রের মৎস্যোদরে জন্ম হয়, ইহার সহিত কৌলজ্ঞাননির্ণয়ের ৩৫, ৩৬ শ্লোক (পৃ ৬০) তুলনীয়। লুইপার অন্য তিব্বতী নাম মৎস্যান্ত্রদ, ইহাও মৎস্যজাত হইবার ইঙ্গিত। তিব্বতী চিত্রে লুইপাকে মৎস্যের পৃষ্ঠে অঙ্কিত করা হইয়াছে এবং তিনি মৎস্যের অন্ত্র আহারে রত এইরূপ দেখান হইয়াছে।

কৌলজ্ঞাননির্ণয়ের ৩৫ ও ৩৬সংখ্যক শ্লোক যথা :

অহং সো ধীবরো দেবি কৈবর্ত্তত্বং ময়া কৃতঃ
আকৃষ্য তু তদা মৎস্যং যস্মিজাল-সমীকৃতঃ ।৩৫।
মৎস্যোদরন্তু তৎস্থোহয়ং গৃহীতশ্চ কুলাগমং ।
বদন্তি বিদিতা লোকে পশ্চমী মানবর্ত্তিতাঃ ।৩৬।

ধীবররূপী শিব এইরূপে মৎস্যোদর হইতে কুলাগম উদ্ধার করেন।

এইরূপে বাগচী মহাশয় মৎস্যেন্দ্র ও লুইপাদের অভিন্নতা-প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছেন। যোগশাস্ত্রে ও নাথসাহিত্যেও ইঁহাদের অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। বহু তান্ত্রিক গ্রন্থে মৎস্যেন্দ্র ও

১। কদলীরাজ্য, পৃ ১৮।

গোরক্ষের উল্লেখ আছে, মৎস্যেন্দ্রের নামের বিকৃতির কথা অন্যত্র উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—

'মীননাথ, মচ্ছন্দপাদ, মচ্ছেন্দ্রপাদ, মোচন্দর প্রভৃতি।'

লুইপাদের ধর্ম্মমত বৌদ্ধ সহজিয়া মত। তাহা কালক্রমে বঙ্গদেশে রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছিল কিনা তাহা বিচার্য্য। সপ্তম শতাব্দীতে ইয়ুন চাঙ্গের সময়ে বঙ্গের সর্ব্বত্র বহু বৌদ্ধমঠ ছিল। হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় মতই সমাজে প্রচলিত ছিল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু রাজা শশাঙ্ক বৌদ্ধ মতের প্রতিকূল ছিলেন। ক্রমশঃ মধ্যবঙ্গেও বেদানুমোদিত ক্রিয়াকাণ্ড প্রতিষ্ঠালাভ করিল। কিন্তু প্রান্ত ভাগে সমাজের নিম্নস্তরে বৌদ্ধপ্রভাব বলবৎ রহিয়া গেল। পাল রাজাদের সময়ে কিঞ্চিৎ বিকৃত বৌদ্ধমতের সমধিক প্রচলন ছিল বলিয়া মনে হয়। বঙ্গে প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ তন্ত্রের মিশ্রণে নূতন ভাবের সাধনা ও পূজাপদ্ধতির সৃষ্টি হয়। তাহা রাজা গণেশের পূর্ব্ববর্ত্তী কালে রামাই পণ্ডিত 'ধর্ম্মপূজা'র নামে প্রচার করেন, ইহাতে বৌদ্ধধর্ম্মের আচারাদির আভাস আছে, কালে ইহা শিবপূজায় পরিণত হয়। নিম্ন শ্রেণীর লোকেরাই সাধারণতঃ ধর্ম্মের 'দেয়াসীন' হইয়া থাকে।

বৌদ্ধ সহজ-সাধনা রূপান্তরিত হইয়া কি ভাবে শাক্ত ও বৈষ্ণব-মতে প্রবেশ-লাভ করিল তাহা বিবৃত হইতেছে :—

"যেকালে শ্রীমৎ-শঙ্করাচার্য্যের বিশেষ প্রচারিত আধ্যাত্মিক জ্ঞান-যোগের মত কালবশে উত্তর-ভারতে দুর্ব্বোধ্য ও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল; প্রাচীন পুরাণ ও তন্ত্রের মহাশক্তিবাদ বৌদ্ধতন্ত্রের মিশ্রণে ক্রমশঃ অর্ব্বাচীন তন্ত্রোক্ত শাক্ত ও শৈবমতে পরিণত হওয়ায় ধর্ম্মজ্ঞান, শিক্ষা ও সাধনের অপব্যবহারে গৌড়ীয় শাক্তসমাজ যখন অর্থশূন্য কর্ম্ম-সাধনায় ব্যাপৃত ছিল, ঠিক সেই সময়েই গণেশের অবতার (চতুর্দ্দশ শতাব্দী)। শৈব বা শাক্ত সাধক সেকালে ফেৎকারিণী বা উড্ডামরেশ্বর তন্ত্রের উৎকট সাধনার সন্ধানে নিরত, কেহবা 'কামধেনু'র সহযোগে 'মাতৃকা-ভেদ' সমাধা করিয়া 'কুলার্ণবে' পার্থিব তনু ভাসাইবার উপকরণ-সংগ্রহে ব্যাপৃত।......গৌড়দেশ অতি প্রাচীনকাল অবধি শক্তিসাধনের ক্ষেত্র বলিয়া উল্লিখিত আছে, কিন্তু যে তান্ত্রিক উপাসনায় 'পরাৎপর' জ্ঞান-লাভের আকাঙ্ক্ষায় 'সর্ব্বশাস্ত্র পারদক্ষ, জিতেন্দ্রিয় সত্যবাদী ব্রাহ্মণ শান্তমানস' গুরুদেবের অনুসন্ধান করা আবশ্যক এই নির্দ্দেশ

আছে, যাহাতে 'উত্তমা মানসী পূজা বাহ্যপূজা কনীয়সী' বলিয়া সাধকের উপাসনার সংজ্ঞা নির্ণীত হইয়াছে এবং সিদ্ধিলাভ-কামনায় শিষ্যের ব্রহ্মচর্য্য-নিয়ম-পালন সর্ব্বথা বিহিত হইয়াছে, সেই তান্ত্রিক মতেই আবার কালবশে বামাচারে পঞ্চতত্ত্বে (পঞ্চমকারে) আরম্ভ করিয়া কৌলাচারের অপব্যবহারে সাধকের রাক্ষসভাব আনিয়া ফেলিয়াছে। বামাচার ও বীরাচারের মতের ক্রমশঃ অধঃপতনের ফলে প্রতিপক্ষকে 'পশ্বাচারী' সংজ্ঞা দিয়া সংজ্ঞারহিত 'বীর' সাধক ভ্রষ্টাচারে নিজেই বিকট পশুভাবে উত্থান করিয়াছেন! কৌল, দণ্ডী প্রভৃতিরাই প্রথম প্রথম চক্র করিয়া মকার সাধন করিতেন এবং ইহারই নাম দেওয়া হইয়াছিল 'মহাবিদ্যা'। শেষে অর্থাদিলোলুপ গৃহীও বামাচারীর সাহায্যে সাংসারিক ফললাভের আশায় অভিচার-ক্রিয়াদি করাইয়া লইত। সাধারণ গৃহী ব্রাহ্মণ বা অপর সৎজাতীয় লোক অবশ্য কোন কালেই বামাচারের পক্ষপাতী ছিল না।......শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব সকলের জন্যই তন্ত্রমন্ত্রের বিধান ছিল, কালবশে সহজ পূজা উৎকটভাব ধারণ করিতেছিল। বৌদ্ধভাবের সহজ-সাধনাও বাঙ্গালী হিন্দুসমাজে প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। কেহ কেহ মনে করেন সহজ-সাধনা এবং বৌদ্ধতান্ত্রিক ভাবের উন্নতি করিয়াই বঙ্গদেশে নবীন তান্ত্রিক সাধনাকে গঠন করিয়া লওয়া হইতেছিল। বৌদ্ধগান ও দোঁহা হইতে ঠিক এতটা সপ্রমাণ হয় মনে হয় না।[১]"

ধর্ম্মভাব বাঙ্গালীর মজ্জাগত, কামকলার উত্তেজনাও দেশের প্রকৃতির নিমিত্ত এখানে অধিকতর, সুতরাং উভয়ে মিলিতে অধিক সময় লাগে না। তাই অর্ব্বাচীন বৌদ্ধের সহজ-সাধনা, বৈষ্ণবের যুগল এবং শাক্ত তান্ত্রিকের পঞ্চতত্ত্বে যোগিনী-সাধন ইত্যাদি ব্যাপারে বাঙ্গলার নরম মাটিতে সত্বর পুষ্পে ফলে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। এইভাবে তান্ত্রিক সাধনার অপব্যবহারে চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতে বাঙ্গালী শাক্ত-সাধক ইন্দ্রিয়সেবাকে ধর্ম্মের অঙ্গীভূত করিয়া লইতেছিল। মাধুর্য্যরসে পতিভাবের ভজন, হৃদয়ের ব্যাকুলতা, একান্ত নিষ্ঠার জ্ঞাপক, ইহা ব্যক্ত করিতে বাঙ্গালী সমাজে পরতন্ত্রা নারীর ভাবই লক্ষ্য হইয়া থাকে। তাই বাঙ্গলায় পরকীয় মতের কল্পনা, যোষিৎ-সম্ভোগরূপ প্রেমের ভিতর দিয়া সহজ-পন্থার 'মহাসুখ'বাদের সহিত মিলিয়াছে। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি

১। মধ্যযুগে বাঙ্গলা—কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ ১৮-২১ ও ফুটনোট পৃ ২১।

যাহা হিন্দু বৈষ্ণবের প্রধান কাম্য, তাহাই এইভাবে বিকৃত হইয়াছে। ভোগাসক্ত বাঙ্গালী বৈষ্ণব পরকীয়া সাধনার পক্ষপাতী হইয়াছে। সেইজন্যই বৌদ্ধ দোঁহায় 'সহজসুখ' ধর্ম্মের অঙ্গীভূত, শাক্ততন্ত্রে পঞ্চতত্ত্ব 'মকার-সাধনা'য় এবং বৈষ্ণবের প্রেম 'কামে' পরিণত হইয়াছে। সময়ে সময়ে আগমবাগীশের মত সাধক শাক্তমতের এবং নরোত্তম প্রভৃতির মত সাধু বৈষ্ণবের মধ্যে প্রাণ-সঞ্চারের উদ্যম করিলেও অধঃপতিত বঙ্গীয় সমাজে সাধারণ লোক ধর্ম্মবিষয়ে নির্জ্জীব অবস্থাতেই কালাতিপাত করিয়াছে।"[১]

নব মৎস্যেন্দ্রনাথ ও নব গোরক্ষনাথ-বৃত্তান্ত

শ্রীযুক্ত রাজমোহন নাথ মহাশয় হঠযোগী ও নাথসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক মৎস্যেন্দ্রনাথ এবং বৌদ্ধ সহজিয়া তান্ত্রিক ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক লুইপাদ (মৎস্যেন্দ্র)-মধ্যে যে ভেদ বর্ণন করিয়াছেন তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। ওড্ডিয়ান রাজকর্ম্মচারী সামন্ত শোভা বৌদ্ধতন্ত্রে দীক্ষা লাভ করিয়া লুইপাদ নামে খ্যাত হন, কারণ তিনি লোহিত্য দেশের লোক ছিলেন। লুইপাদ সহজ-ধর্ম্ম প্রচার করেন ও দোঁহা রচনা করেন। এই নব মৎস্যেন্দ্র বা লুইপাদ 'কৌলজ্ঞান-নির্ণয়'ও রচনা করেন, কিন্তু নাথপন্থের মৎস্যেন্দ্র বা মীননাথ সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হন এবং পরবর্ত্তী কালে নারীর মায়াপাশে আবদ্ধ হন ইত্যাদি কাহিনী সুপরিচিত। ইনি ভুবনবিজয়ী সিদ্ধ নামে পরিচিত। নাথধর্ম্মে কঠোর হঠযোগ-প্রণালী প্রচলিত আছে। নাথধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মৎস্যেন্দ্রই আদি মৎস্যেন্দ্র, আর সহজ-ধর্ম্মের প্রচারক লুইপাদ-মৎস্যেন্দ্র নব-মৎস্যেন্দ্রনাথ রূপে নাথমহাশয় কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছেন। অতএব :—

(ক) মৎস্যেন্দ্র (মীননাথ)—নাথধর্ম্মের আদিগুরু।

(খ) মৎস্যেন্দ্র (লুইপাদ)—দোঁহা ও কৌলজ্ঞান-রচয়িতা নব-মৎস্যেন্দ্রনাথ।

নব গোরক্ষনাথ—নাথধর্ম্মের প্রচারক গোরক্ষনাথ কায়াসাধনের নেতা, এবং বৌদ্ধ রমণবজ্র স্বধর্ম্মত্যাগী গোরক্ষনাথ 'নব গোরক্ষনাথ'। এই নব-গোরক্ষ লুইপাদের সহজধর্ম্মে আকৃষ্ট হন, এই সম্প্রদায়ের কেন্দ্রস্থান বাখরগঞ্জের চন্দ্রদ্বীপ। প্রাচীন নাথসম্প্রদায়ের গ্রন্থাদি [গোরক্ষ-সংহিতা,

---

১। মধ্যযুগে বাঙ্গলা—কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ ৮৭১, ৮৭৪।

গোরক্ষ-শতক ও গোরক্ষসহস্রনামের অনুকরণে ইঁহারাও ভাঙ্গা সংস্কৃত ভাষায় ঐরূপ গ্রন্থ রচনা করেন, এই সকল গ্রন্থ চন্দ্রদ্বীপে রচিত হয়। 'কৌলজ্ঞাননির্ণয়'ও তখন রচিত হয়।

নাথপন্থের এবং সহজিয়াপন্থের গোরক্ষ-সংহিতায় ভেদ আছে। প্রসন্ন কবিরত্ন কর্ত্তৃক সূত্রাকার নাথ-গোরক্ষ-সংহিতা অনূদিত হইয়াছে, অন্যটী দেবীশ্বর-সংবাদ আকারে রচিত। নাথমহাশয়ের মতে নাথপন্থের গোরক্ষ গোপীচাঁদের সন্ন্যাসের সহিত জড়িত নহেন। নব-গোরক্ষই গোপীচাঁদকে সন্ন্যাসী করেন ও বাঙ্গলাদেশে নাথসম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন। আদি মৎস্যেন্দ্র বা গোরক্ষ-প্রবর্ত্তিত নাথধর্ম্ম যোগশাস্ত্রানুযায়ী। অতএব :—

(ক) গোরক্ষনাথ—নাথধর্ম্মী কায়সাধনের নেতা।

(খ) নব-গোরক্ষনাথ—রমণবজ্র—সহজিয়াধর্ম্মের প্রচারক ও গোপীচাঁদের সন্ন্যাসের সহিত জড়িত। বঙ্গে নাথসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক।[১]

১। কদলীরাজ্য—রাজ মোহন নাথ, পৃ ১০, ১৪, ১৮, ৪১।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অন্যান্য নাথযোগীদের কালনির্ণয়-চেষ্টা

গোপীচন্দ্রের কালনির্ণয়

ইতিপূর্ব্বে গোরক্ষ প্রভৃতি নাথসিদ্ধদিগের সহিত গোপীচন্দ্রের সম্বন্ধ কি ও গোপীচন্দ্রের ঐতিহাসিকতা কতটুকু সে সম্বন্ধে আমরা প্রশ্ন তুলিয়াছি (পৃ ২৪)। রাজা গোপীচন্দ্র সিংহাসন ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হন, এই কাহিনী অদ্যাপি সুপ্রচলিত। ময়ূরভঞ্জের গীত-গায়কের বর্ণনায় গোপীচন্দ্রকে ব্রহ্মচন্দ্রের পুত্র ও তারাচন্দ্রের পৌত্র বলিয়া মনে হয়।[১] নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়, দুর্গাচরণ শাস্ত্রী মহাশয় প্রভৃতি বিভিন্ন দেশ হইতে গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস-সম্বন্ধীয় পুথি সংগ্রহ করিয়াছেন। এই কাহিনীসকল পালরাজাদের গৌরবময় যুগের। একটি গাথায় আছে গোবিন্দচন্দ্রের রাজধানী ছিল পাটিকানগর—এই পাটিকানগর সম্ভবতঃ কমলাঙ্ক বা বর্ত্তমান কুমিল্লার রাজধানী ছিল।[২] ময়নামতী পাহাড়ে প্রাপ্ত একটি তাম্রশাসনে (১১৪১ শকের) পট্টিকেরা নগরের উল্লেখ আছে।[৩] রংপুরেও অদ্যাপি পাটিকাপাড়া বর্ত্তমান। শরৎচন্দ্র দাস মহাশয়ের মতে কুমিল্লার রাজধানী 'চাটিগ্রাম' ছিল।

তিরুমলয় উৎকীর্ণ শিলালিপিতে রাজেন্দ্র চোল কর্ত্তৃক গোবিন্দচন্দ্রের পরাজিত হইবার কথা আছে। এই লিপির কাল ১০১২ খৃঃ (মতান্তরে ১০২৫ খৃঃ)। এই গোবিন্দচন্দ্র ও বঙ্গীয় গীতিকার গোপীচন্দ্র যিনি 'ষোলদণ্ডের রাজা আমি বঙ্গ অধিকারী' এক ও অভিন্ন হইলে কালনির্ণয়-সমস্যা দূর হয়।

চন্দ্ররাজাদের প্রথম রাজা চন্দ্রদেব, তিনি প্রধান বলিয়া ধাড়ী, দুর্ল্লভ মল্লিকের গোবিন্দচন্দ্রের গীতে আছে—

> সুবর্ণচন্দ্র মহারাজা ধাড়ীচন্দ্র পিতা—
> তার পুত্র মাণিকচন্দ্র শুন তার কথা

একাদশ শতাব্দীর উৎকীর্ণ শিলালিপিতে চন্দ্রবংশের পরিচয় পাওয়া

১। বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় (১ম), পৃ ২০ ২। গোপী. গান, পৃ ১০১ ৩। গোপী. গান, ভূমিকা, পৃ ২৬

যায়।[১] মাণিকচন্দ্র রাজাই গোবিন্দচন্দ্রের পিতা, এ কথা সুকুর মামুদ প্রণীত গোবিন্দচন্দ্রের সন্ন্যাসে পাওয়া যায়, কিন্তু শরৎ দাস মহাশয় অন্যরূপ বংশাবলী দিয়াছেন।[২]

অধুনা দুইটী শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে—'পাইকাপাড়া' ও 'সন্দীপে'র। এই পাইকাপাড়া ঢাকার মুন্সীগঞ্জে, ইহাতে বাসুদেব মূর্ত্তি আছে ও গোবিন্দচন্দ্রের রাজত্বকালের বলিয়া উল্লিখিত আছে।[৩] ইহার দ্বারাও কোন সমাধান হয় না। ঢাকা জেলার সাভারের রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাল একাদশ শতাব্দী। কিন্তু হরিশ্চন্দ্র-পুত্র মহেন্দ্রের যে লিপি সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দ্বারা হরিশ্চন্দ্র রাজা ও গোপীচন্দ্রের সময়ের সামঞ্জস্য রাখা কঠিন হইয়া পড়ে।[৪]

গোপীচন্দ্র পালরাজাদিগের সমসাময়িক হইলে দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বের, কারণ বখতিয়ার খিলজী দ্বাদশ শতাব্দীতে পালরাজাদের উচ্ছেদ-সাধন করেন। অতএব ময়নামতীর গুরু গোরক্ষনাথও একাদশ শতাব্দীর প্রতিপন্ন হন। রাজা মাণিকচন্দ্র ধর্ম্মপালের ভ্রাতা-রূপেও খ্যাত। কিন্তু এই 'ধর্ম্মপাল' নাম প্রকৃত নহে, গৌরব-বর্দ্ধনার্থ পূর্ব্ববর্ত্তী কোন স্বনামধন্য রাজার নাম ব্যবহার করা রীতি ছিল, এক্ষেত্রেও তাহা হইয়াছে, এইরূপ মনে করা যাইতে পারে।[৫] গোবিন্দচন্দ্র রাজা মহীপালের (৯৭৮-১০৩০ খৃঃ) সমসাময়িক, গোবিন্দচন্দ্রের পর তদীয় মন্ত্রী ভবচন্দ্র (১০৩৯-১০৫০ খৃঃ) রাজা হন, এইরূপ প্রসিদ্ধিও আছে। 'হবুচন্দ্র' রাজার 'গবুচন্দ্র' মন্ত্রী। গোবিন্দচন্দ্রের রাজধানী রংপুর জেলায় পাটিকা-নগরে ছিল, গৌড়ের ইতিহাসে ইহার উল্লেখ আছে।

শব্দপ্রদীপ-রচয়িতা সুরেশ্বরের প্রপিতামহ গোবিন্দচন্দ্রের রাজ-বৈদ্যগণাগ্রণী ছিলেন, সুরেশ্বর একাদশ শতাব্দীর শেষপাদের সন্দেহ নাই, কিন্তু এই গোবিন্দচন্দ্র কে? কনৌজের গোবিন্দচন্দ্রের সময়ে তাঁহার সভায় শ্রীহর্ষ ছিলেন। অতএব এই গোবিন্দ বঙ্গীয় গোপীচাঁদ হইবেন তাহার স্থিরতা কি?

উপসংহারে বলা যায় গোবিন্দচন্দ্রের কাহিনীগুলিতে খৃষ্টীয় দশম ও

১। গোপী. গান, ভূমিকা, পৃ ২৭ ২। গোপী. গান, ভূমিকা, পৃ ৪

৩। Some Hist. Aspects of the Inscriptions of Bengal by B. C. Sen, p. xxxii.

৪। গোপী. গান, ভূমিকা, পৃ ১৯

৫। Cal. Review, Aug. 24, 1919., p. 359. 'Ramai Pandit'.

একাদশ শতাব্দীর যে সকল বর্ণনা আছে তাহা পালরাজাদিগের রাজত্ব-কালের। পালরাজাদের গৌরবের অবসানে তাঁহাদের কীর্ত্তিগায়ক যোগি-জাতি ভারতের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিত ও গোপীচাঁদের গীত গাহিয়া ভিক্ষার্জ্জন করিত। গোপীচন্দ্রের মাতা গুরু গোরক্ষনাথের নিকট 'মহাজ্ঞান' লাভ করেন, ইহার উল্লেখও গীতিকায় পাওয়া যায়। অতএব গোরক্ষের কাল একাদশ শতাব্দী হইলে ময়নামতীর ও গোপীচন্দ্রের কাল উহার বহু পরবর্ত্তী নহে ইহা নিশ্চিত।

চৌরঙ্গীনাথের কালনির্ণয়

মৎস্যেন্দ্রনাথের শিষ্য-মধ্যে গোরক্ষনাথ সমধিক প্রসিদ্ধ হইলেও তাঁহার অন্যতম শিষ্য চৌরঙ্গীনাথও অজ্ঞাত নহেন। বিমাতার আদেশে চারি হস্তপদহীন হওয়ায় ভারতের পূর্ব্বদেশের দেবপাল রাজার পুত্র 'চৌরঙ্গী' নামে খ্যাত হন। মীনপাদ বা নামান্তরে অচিন্ত্য দেশ-ভ্রমণ-কালে ইঁহাকে দীক্ষাদান করেন, ও জনৈক রাখাল বালককে ইঁহার সেবার ভার দেন। এই বালকই ভবিষ্যতে 'গোরক্ষনাথ' নামে প্রসিদ্ধ হন। চৌরঙ্গী দ্বাদশবৎসর ধ্যানান্তে সিদ্ধিলাভ করিলে তাঁহার হস্তপদ পূর্ব্ববৎ হয়।[১]

সম্ভবতঃ চৌরঙ্গীনাথের পিতা দেবপাল বঙ্গীয় পালরাজাদের তৃতীয় রাজা। ডাঃ মোহন সিংএর মতে তিনি সালবাহনের পুত্র ও গোরক্ষ-মৎস্যেন্দ্রের শিষ্য। পাঞ্জাবের ইতিবৃত্ত অনুযায়ী সালবাহন-পুত্রের নাম পূরণ-ভগত; চৌরঙ্গীনাথেরই পূর্ব্বনাম পূরণ। গিরীশচন্দ্রের 'পূর্ণচন্দ্র' নাটক ইঁহাকে অবলম্বন করিয়াই রচিত। যদি পূর্ব্বোক্ত তিব্বতীয় বৃত্তান্ত প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা হয়, তবে চৌরঙ্গীনাথ খৃষ্টীয় নবম শতকের প্রথমার্দ্ধে বর্ত্তমান ছিলেন বলিতে হয়। দেবপালের পুত্র বা পৌত্র কেহ রাজত্ব করেন নাই, সম্ভবতঃ চৌরঙ্গীনাথের রাজ্যত্যাগই ইহার কারণ।[২]

দেবপালের ভগিনী ময়না ধর্ম্মপূজার প্রতিষ্ঠাতা রামাই পণ্ডিতকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন, শাস্ত্রী ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। (শাস্ত্রী, উল্লেখ ব্রীগ স্, পৃ ২৪৫)।

১। শহীদুল্লাহ, চৌরঙ্গীনাথ, উদ্বোধন—আশ্বিন, ১৩৪৮—Grünwedelএর উল্লেখ।

২। ঐ, আশ্বিন, ১৩৪৮

হঠযোগ-প্রদীপিকাতে

"শ্রীআদিনাথ-মৎস্যেন্দ্র-শাবরানন্দ-ভৈরবাঃ।
চৌরঙ্গী-মীন-গোরক্ষ-বিরূপাক্ষ-বিলেশয়াঃ॥"

ইত্যাদি মহাসিদ্ধারা হঠযোগের প্রভাববশতঃ কালজয়ী হইয়া ভূমণ্ডলে বিচরণ করিতেছেন এইরূপ বৃত্তান্ত আছে।

শূন্যপুরাণে 'আদ্যনাথ মীননাথ সিঙ্গা চরঙ্গিনাথ দণ্ডপাণি আর কিন্নরী'র (বসুমতী সাহিত্যমন্দির সংস্করণ, পৃ ২২৩) উল্লেখ আছে। সিঙ্গা অর্থে সর্ব্বাঙ্গনাথ নামে ৮৪ সিদ্ধের অন্যতম ও ধর্ম্মপূজার দ্বারপাল মহাসাঙ্গই বা সাঙ্গরাজা। চরঙ্গিনাথ = চৌরঙ্গীনাথ, ইঁহার নামে কলিকাতার 'চৌরঙ্গী' নামে পথ কি? কালীঘাটের 'কালী' কাহারো মতে চৌরঙ্গীনাথের প্রতিষ্ঠিত। দণ্ডপাণি অর্থে যম[১]। মহাদেবের সহিত এই সকল সিদ্ধপুরুষ যজ্ঞস্থানে আসিয়া ভোজনে বসিলেন। এই সিদ্ধগণের উল্লেখ কি শূন্যপুরাণের নব্য অংশে পরবর্ত্তী কালের যোজনা?

গোরক্ষবিজয়ে আছে অনাদ্যের শরীর হইতে শিব, মীননাথ, হাড়িফা, কানফা, গাভুর, গোরক্ষনাথ ও গৌরী জন্মগ্রহণ করেন। গাভুর অর্থে যুবক, এই গাভুর সিদ্ধাই নামান্তরে 'চৌরঙ্গীনাথ'। মৎস্যেন্দ্রনাথ বলিতেছেন—

এক সিস্য আছে মোর জতি গোরখাই।
আর সিস্য আছে মোর গাভুর সিধাই॥ (সিদ্ধাই)
দুই সিস্য য়াছে মোর আহ্মি জানি ভালে॥২।

সিদ্ধগণ মহাদেবের ভোজে নিমন্ত্রিত হইলে পার্ব্বতী কামবাণে সকলকে বিদ্ধ করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, একমাত্র গোরক্ষনাথ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন, অন্যেরা তাঁহাদের কল্পনা অনুযায়ী অভিশাপ প্রাপ্ত হইলেন। গাভুর সিধাই ছদ্মবেশী দেবীকে পাইলে হস্তপদহীন হইতেও স্বীকৃত হওয়ায় দেবীর অভিশাপে গাভুর সিধাই এমন স্থানে জন্মলাভ করিলেন যে রাজ্ঞী বিমাতা তাহাকে কামনা করেন, যুবরাজ সে প্রস্তাবে অসম্মত হওয়ায় রাজ্ঞীর মিথ্যা দোষারোপে নির্দ্দোষ যুবরাজ জহ্লাদ-কর্ত্তৃক হস্তপদবিহীন হইয়া নগরের বাহিরে পড়িয়া থাকেন।

(গোরক্ষবিজয়, পৃ ২১, তু. মীনচেতন, পৃ ৪)

১। শূন্যপুরাণ, পৃ ২২৩ টীকা। ২। গোরক্ষ-বিজয়, পৃ ১০০।

কদলীরাজ্যে মীননাথের চেতনা হইলে গোরক্ষনাথকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

তোমারে দেখিয়া মোর পাট্টা হেন বুক।
মিত্তু কালে না দেখিলুম গাভুর সিধার মুখ॥

(গোরক্ষবিজয়, পৃ ১১৬)

ইহা হইতেও মৎস্যেন্দ্রনাথের সহিত গাভুর সিধা বা চৌরঙ্গীর সম্বন্ধ বুঝা যায়। চৌরঙ্গীর পিতা দেবপাল হইলে, নবম শতকের প্রথমার্দ্ধে চৌরঙ্গীনাথ বর্ত্তমান ছিলেন এই সিদ্ধান্ত করা ব্যতীত উপায় নাই। তৃতীয় পালরাজা দেবপালের সময়ে বঙ্গদেশে 'ধর্ম্ম'পূজার প্রচলন হয়। ইহার প্রবর্ত্তক রামাই পণ্ডিত দশম শতাব্দীর।

এই গাভুরী সিদ্ধকে 'হে বজ্রতন্ত্র'-লেখক ও বজ্রযানের ভাষ্যকার বলিয়া ডাঃ সুশীল দে উল্লেখ করিয়াছেন[১]। গাভুর ব্যতীত কালীপাদ (লুইপার বংশধর), অমিতাভ কামারী (বিরূপার বংশধর), বীণাপাদ (বঙ্গীয় রাজপুত্র), কঙ্কণ, দারিক (লুইপা ও নারোপার শিষ্য) এবং ধর্ম্মপদ (কৃষ্ণের বংশধর)-রচিত বজ্রযানের পুথির উল্লেখ ডাঃ দে করিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই পূর্ব্বদেশীয়, তবে বঙ্গদেশের কি না বলা কঠিন। পালরাজাদের সময়ে ইঁহারা বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারে সহায়তা করেন। দশম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম্মই ধর্ম্মপূজার আবরণ গ্রহণ করে। ইহা দেবপালের রাজত্বকালের কথা।

হাড়িসিদ্ধা বা জালন্ধরিনাথের উৎপত্তি-কথা

তিব্বতী ভাষায় লিখিত 'প্যাগ্ শ্যাম্‌জোন্‌বজান'-নামক গ্রন্থে আছে —বঙ্গের রাজা গোপীচন্দ্র সিদ্ধা বালপাদকে (অপর নাম হাড়িপা বা জালন্ধর সিদ্ধ) জীবন্তে মাটীতে পুতিয়া রাখেন। দ্বাদশবর্ষ পরে হাড়িপার শিষ্য কানফা সিদ্ধ (কানুপা বা কৃষ্ণাচার্য্য) গুরুকে মুক্ত করেন। বালপাদ বা হাড়িপা সিদ্ধের সিন্ধু-দেশে জন্ম, 'হাড়িফার যতগুণ কর্ণ পাতিয়া শুন যেরূপ জন্মিল জলন্ধর' (গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস, পৃ ৪৪১)—তিনি জাতিতে শূদ্র ছিলেন, ওড্ডিয়ানে থাকিয়া তিনি যোগধর্ম্ম শিক্ষা করেন। বৌদ্ধ তান্ত্রিক ও ঐন্দ্রজালিক শাস্ত্রে তাঁহার এত অধিকার জন্মিয়াছিল যে,

১। বঙ্গদেশের ইতিহাস—পৃ ৩৪৯ (ডাঃ দের প্রবন্ধ)

একবার অবন্ত দেশে দেবতার নিকট বলি দিবার নিমিত্ত আনীত কয়েক হাজার পাঁঠা তাঁহার মন্ত্রবলে নেকড়ে বাঘে পরিণত হইয়া যায়। তাঁহার মন্ত্রবলে নেপাল মন্দিরের প্রধান শিবলিঙ্গ ভগ্ন হইয়া যায়।[১] ময়নামতীর উদ্যানে বসিয়া জলপানের ইচ্ছা হইলে তাঁহার ইচ্ছায় ডাব গাছ হইতে নামিয়া আসিয়া তাঁহার মুখে জল প্রদান করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিত। এহেন সিদ্ধ হাড়িপার নিকট ময়নামতীর পুত্র গোপীচন্দ্র সন্ন্যাসধর্ম্ম লইতে অসম্মত হইলে ময়না তাঁহার পুত্রকে বলিতেছেন—

"এমন কথা না বলিও বেটা হাড়ি জ্যান না শোনে।
মহাশাপ দিবে সিদ্ধা হাড়ি মরবু আপনে॥
এ দেশিয়া হাড়ি নয় বঙ্গদেশে ঘর।
চান্দ সুরজ রাখছে দুই কানের কুণ্ডল॥
আপনি ইন্দ্ররাজা ঢুলায় চত্তর (চামর)।
চন্দ্রের পিষ্ঠে আন্দে বাড়ে কুরুমের পিঠে খায়।
আপনি মাও লক্ষি রসই করি দ্যায়॥

'বঙ্গদেশে' ঘর অর্থে বিদেশী, কারণ সেই-দেশীয়েরা আগন্তুক মাত্রের নিবাস 'বঙ্গদেশ' ও তাহারা জ্ঞানবুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ এইরূপ ভাবিত। ময়না পুত্রকে বলিতেছেন—

গোরক্ষনাথ হয় গুরু, হাড়ি ধর্ম্মের ভাই,
দোন জনে জ্ঞান শিখেছি এক গুরুর ঠাই।

বুঝান খণ্ড, পৃ ৬৪

ইহা দ্বারা হাড়িপার গুরু যে 'গোরক্ষনাথ' তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। মাতাকে বহুপ্রকারে অগ্নি, জল ইত্যাদির দ্বারা পরীক্ষা করিয়া গোপীচন্দ্র তাঁহার মহাজ্ঞান দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া হাড়িপার শিষ্য হইতে সম্মত হইলেন। রজনী-প্রভাতে গোপীচন্দ্র হাড়িপার নিকট গিয়া দেখেন হাড়ি কাঁধে কোদাল লইয়া কাজে চলিয়াছেন, যমের পুত্র মেঘনাল (মেঘের নাল হইতে অভ্রের উৎপত্তি) তাঁহার মাথায় ছত্র ধরিয়াছেন, স্বয়ং মাতা বসুমতী তাঁহার বসিবার জন্য খাট আনিয়া দিলেন, তারপর—

এক হুঙ্কার সিদ্ধাএ দিলেন ছাড়িয়া॥
ঊনশত কোদাল মাত্র দর্খল চাছিয়া। (দর্খল = গণ্ডী)

১। কাদলী রাজ্য, পৃ ৫, ৯।

সোনার ঝাড়ু এ জাএ খলা ঝাড়ু দিয়া। (খলা = আবর্জ্জনা)
সুবর্ণ কেটেরা এ জাএ চন্দন ছিটিআ॥
চন্দন ছিটিআ পুনি গেলেন উড়িয়া
উনশত টুকরি আনি সব ফেলাইল।
তা দেখি গুপিচান্দে আশ্চর্য্য হইল॥

তাহার পর আড়াই প্রহর বেলা হাড়িসিদ্ধার 'পঞ্চ কামিনী' লইয়া স্নান করিতে ব্যতীত হইল (এই পঞ্চ কামিনী শক্তি লইয়া সাধনের ইঙ্গিত কি?) স্নানান্তে সিদ্ধা ভাঙ্গ খাইয়া ক্ষুধায় অস্থির হইয়া রাজোদ্যানের নারিকেল, আম, কাঁটাল, কলা, শশা ইত্যাদির সদ্ব্যবহার করিয়া নারিকেল-মালা খোলাসহ আবার গাছে লাগাইলেন। তাহা দেখিয়া রাজা গুবিন্দাই বলিলেন "হেন জ্ঞান পাইলে আমি জুগী হইয়া যাই"।

ইহার পরেও হাড়িপা কাটামুণ্ড মনুষ্যের মুণ্ড জুড়িয়া দেখাইয়া মেহেরকুলের রাজাকে পরীক্ষা দিয়াছেন। মহানদী হাড়িপার হাঁটুর সমান জল হইয়া গেল, গঙ্গাদেবী বসিতে খাট দিলেন, গোর্খমন্ত্র স্মরণ করা মাত্র বসুমতী তাঁহাকে সাহায্য করিতে আসিলেন, তখন সিদ্ধার হুঙ্কারে 'কণ্ঠ পরে মুণ্ড গোটা পড়ে লম্ফ দিয়া' ও সিদ্ধা হাসিয়া এক লাথি মারিলেন,—

"লাথি খাই ম্রেতা মনিষ্য উঠিল শীঘ্র গতি,
চারিদিকে হেরিয়া উঠি লড় দিল,
তা দেখি গুবিচান্দে হাসিতে লাগিল"।[১]

শিষ্য গোপীচন্দ্রকে সুরিপুনগরে জনৈকা নটীর নিকট হাড়ি সিদ্ধা বান্ধা রাখিয়াছিলেন, নটী তাঁহাকে অশেষ কষ্ট দেওয়াতে হাড়ির শাপে নটীর অবস্থা হইল—

"বাদুর হইয়া রহ ভুবন ভিতরে
দিনেতে উপাস কর রাত্রিতে ভৈক্ষন
দিবসে উলটা হইয়া টাঙ্গনে রহিবা।" (টাঙ্গনে = শূন্যে)

গোপীচন্দ্রও হরষিত মনে গৃহে ফিরিলেন।

শবল-রচিত জলন্ধর-স্তোত্র আছে। কেরলী-নামক স্থানে জলন্ধর শবলের প্রতি কৃপা করেন এবং শবল পদরচনা করিয়া ইহার বন্দনা

১। গোপী. পাঁচালী, ২য় খণ্ড, পৃ ৩৭৪, ৩৭৫
২। Report on the Search of Hindi Mss. (1902), p. 4.

করেন। যোধপুর-রাজ মানসিংহের প্রতিও জলন্ধর কৃপা করেন বলিয়া মানসিংহ জলন্ধরকে বন্দনা করিয়া ষোড়শটি পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন।

নিরঞ্জন-পুরাণ গ্রন্থে জলন্ধরের কথা আছে। বঙ্গীয় গোপীচাঁদ, উজ্জয়িনীর ভর্তৃহরি, চর্পট প্রভৃতির সহিত জালন্ধরের নাম সংশ্লিষ্ট। গোগা, ছটীক নাথ, রামসিংহ, ভীম, বণিক অগিল, পালানপুরের বণিক-সন্দহাল্লা প্রভৃতি ইঁহার শিষ্য। ইঁহার বহু অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে ; যথা, কাহ্না নামক জন্মমূককে কবিত্ব-ক্ষমতা-অর্পণ, জনৈক রাজ-পুত্রকে রামচন্দ্র নামে অদ্ভুত তরবারি-দান ইত্যাদি।

চর্পট-রচিত অনন্তবাক্যে জলন্ধরকে রাজা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। 'সত্যং সত্যং বদতি চর্পটো রাজেতি।' মহাশাস্ত্র বাক্যে ময়নামতী ইঁহাকে ভ্রাতা বলিয়াছেন। ভর্তৃহরিও রাজা হইয়া জলন্ধরের আদেশে রাজ্যত্যাগ ও সিদ্ধিলাভ করেন। সিদ্ধসাহিত্যে ইঁহার নাম 'বিচারনাথ'।

গোগা-সম্বন্ধেও বহু কাহিনী প্রচলিত ; যথা—

১। গোরক্ষের বরে চৌহান রাজবংশে জন্ম হয়।

২। ১১৫০ খৃঃ জীবিত ছিলেন।

৩। পৃথ্বীরাজ চৌহানের সমসাময়িক ছিলেন।

৪। ১০২৪ খৃঃ মহম্মদ গজনীর সহিত যুদ্ধে স্বীয় পুত্রসহ নিহত হন।

রামসিংহ গৌড়-জাতীয় ছিলেন। জালন্ধর কালিয়নদীর তীরে ইঁহার প্রতি কৃপা করেন। শিষ্য ভীমকে জালন্ধর সমস্ত ঋদ্ধি একাধারে অর্পণ করেন। বর্ণরত্নাকরে সিদ্ধ-তালিকায় ইঁহার নাম আছে।

বঙ্গীয় রাজা তিলকচাঁদের পুত্র গোপীচাঁদ মাতৃ-আজ্ঞায় রাজ্য ত্যাগ করিয়া জালন্ধর-শিষ্য হন। মহাশাস্ত্র-বাক্যে ও মারহাটী-প্রবাদে ত্রিলোকচন্দ্রের নাম পাওয়া যায়। হিন্দীতে উহা তিলকচন্দ ও পুরাতন বাংলা সাহিত্যে ত্রৈলোক্যচন্দ্র রূপ ধারণ করিয়াছে। মহাশাস্ত্র-বাক্যে রাজার বৈরাগ্যকাহিনী সংক্ষেপে আছে। মাতা ময়নামতীর উপদেশ অতুলনীয়, তাঁহার দৃষ্টান্তও বিরল। এই কাহিনী সমগ্র উত্তর ভারতে প্রচারিত হইয়া বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর স্থান অধিকার করিয়াছে।

গোপীচাঁদ সিদ্ধরূপে 'শৃঙ্গারীপাব' নামেও পরিচিত। সিদ্ধান্ত-বাক্যে জালন্ধরের সহিত গোপীচাঁদের প্রশ্নোত্তর বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

গোপীচন্দ্র প্রশ্ন করিতেছেন—

ভো স্বামিন্! পৃচ্ছামি কথয় অন্তর্যামিন্—
বসতৌ স্থীয়তে তদা কন্দর্পো ব্যাপ্নুতে।
বনে স্থীয়তে তদা ক্ষুৎ সন্তাপয়তি।
আসনে স্থীয়তে তদা স্পৃশতি মায়া।
পথি গম্যতে তদা ছিদ্যতে কায়ঃ।
মিষ্টং ভক্ষ্যতে তদা বর্ধতে রোগঃ।
কথয় কথং সাধ্যতে যোগঃ।

জলন্ধর উত্তর দিতেছেন—

শ্রোতব্যোঽবধূত তত্ত্বস্য বিচারঃ
য এষ সকল-শিরোমণি-সারঃ।
সংযতাহারে কন্দর্পো ন ব্যাপ্নুতে।
বাহ্যারম্ভে ক্ষুন্ন সন্তাপয়তি।
সিদ্ধাসনে নহি স্পৃশতি মায়া।
বাদপ্রমাণে ন ছিদ্যতে কায়ঃ।
জিহ্বায়াঃ সুখায় ন কর্ত্তব্যো ভোগঃ।
মনঃ পবনৌ চ গৃহীত্বা সাধনীয়ো যোগঃ।

তৎপরে নাথমার্গের আদর্শ বলিতেছেন—

অল্পমশ্নাতি স তু কল্পয়তি জল্পতি
বহু ভুনক্তি স তু রোগী।
দ্বয়োরপি পক্ষয়োর্যঃ সন্ধিং বিচারয়তি
স তু কোঽপি বিরলো যোগী।[১]

অন্যত্র জালেন্দ্রনাথের জন্মবৃত্তান্ত এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে হস্তিনাপুরের অপুত্রক রাজা পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করাতে অগ্নিদেবতা প্রসন্ন হইয়া এক সুন্দরকান্তি পুত্র দান করেন, রাণী ইহার লালন-পালন করেন। ইহার উৎপত্তির পরে মৎস্যেন্দ্র বিভূতি লইয়া তাহার মুখে দান করেন

(১) S. B. S., Vol. VI, p. 25 ff.

যাহাতে বালক কখনও ব্যাধিগ্রস্ত না হয় ও সমস্ত ভারতে তাহার নাম চিরস্থায়ী হয়। এই বালক অন্তরীক্ষ নারায়ণের অবতার ছিলেন। কুমারের ষোড়শ বর্ষ উপস্থিত হইলে তাহার বিবাহের প্রস্তাব চলিতে থাকে। বিবাহ দ্বারা সংসারের চক্রে আবদ্ধ হইতে হয়, মিত্রদের নিকট বিবাহের এইরূপ ব্যাখ্যা-শ্রবণে কুমার দেশত্যাগী হন। বনমধ্যে অকস্মাৎ অগ্নি প্রজ্বলিত হইতে দেখিয়া কুমার ভীত হইলে, অগ্নি তাহাকে পুত্র-সম্বোধনে আশ্বস্ত করেন ও বালকের ইচ্ছায় মহাদেবের নিকট দীক্ষার্থে লইয়া যান। মহাদেব কুণ্ডলাদি দিয়া উপদেশ দান করেন ও 'জালেন্দ্র' নামকরণ করেন এবং মৎস্যেন্দ্রের সাধনস্থল মার্ত্তণ্ড পর্ব্বতের নাগবৃক্ষের তলে তপস্যা করিতে বলেন। তাঁহার উপদেশানুসারে বালক দ্বাদশবর্ষ-ব্যাপী ঘোর তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন। অজপা নামক হংসমন্ত্রের ধ্যানে বালক লীন হইয়া অস্থিচর্ম্মসার হইলেন। দ্বাদশবৎসরান্তে মৎস্যেন্দ্র ঐ স্থানে অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়া জালেন্দ্রনাথকে আসন হইতে বিমুক্ত করিয়া ঘোর তপস্যা হইতে নিবৃত্ত করেন। কিয়ৎ দিবস তথায় অবস্থানেব পর উভয়ে আবার ভ্রমণে নির্গত হন।

(যোগিসম্প্রদায়াবিষ্কৃতি, পৃ. ৮৬-৯২)

ভর্তৃহরিনাথ

নাথসম্প্রদায়-মধ্যে ভর্ত্তৃর বিশিষ্ট স্থান আছে। তিনি রাজা ছিলেন এবং বৈরাগ্যের নিমিত্ত সংসারত্যাগী হন। গোরক্ষনাথ ইঁহার গুরু ছিলেন। ভর্তৃহরি ঐতিহাসিক ব্যক্তি, কারণ তিনি রাজা, অতএব ভর্তৃহরিকে মূল করিয়া গোরক্ষনাথের সময় নির্ণয় করা সহজসাধ্য হওয়া উচিত। কিন্তু একাধিক ভর্ত্তৃর উল্লেখ আছে এবং ভর্ত্তৃ-ভ্রাতার নাম 'বিক্রম' হইলেও, কোন্ বিক্রম ইহা লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে।

কথিত আছে ভর্ত্তৃ উজ্জয়িনীর রাজা ছিলেন, অতএব উজ্জয়িনী হইতে প্রাপ্ত ইতিহাসের উপর নির্ভর করিয়া কিছু আলোচনা করা যাইতেছে। ইহা দ্বারা একাধিক ভর্ত্তৃ ও বিক্রমের সমস্যার হয়ত সমাধান হইতে পারে।

উজ্জয়িনীতে চন্দ্রগুপ্ত নামে এক অপুত্রক রাজা ছিলেন, তাঁহার একমাত্র কন্যা বিবাহযোগ্যা হইলে সর্ব্বগুণসম্পন্ন ও পুত্রস্থানে অধিকার

করিবার যোগ্য জামাতার অনুসন্ধান করিয়া কন্যা সমর্পণ করা হইল। এই জামাতার নাম গোবিন্দ ভগবান্, তিনিও উজ্জয়িনীবাসী ছিলেন। কিন্তু বিজাতীয় ক্ষত্রিয়কন্যা বিবাহ করার দরুন জামাতা পুনর্ব্বার এক ব্রাহ্মণকন্যা ও তৎপরে বৈশ্য ও শূদ্রকন্যাও বিবাহ করিলেন। এই চারি স্ত্রীর যথাক্রমে চারিটী পুত্র হইল। ব্রাহ্মণীর ভর্ত্তৃ, ক্ষত্রিয়ার বিক্রম, বৈশ্যার ভট্ট, ও শূদ্রার শংখ। এই চারি পুত্রকে বিংশতি বৎসর লালন-পালন করিয়া তাহাদের রাজদরবারে উপস্থিত করা হইল, রাজা তাহাদের পুত্র বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন। ক্রমশঃ যুদ্ধবিদ্যায় ইঁহারা নিপুণ হইলেন। এমন সময়ে কোন পূর্ব্বদেশীয় রাজা চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য আক্রমণ করিলেন। চারি পুত্র অসম সাহসের সহিত সেই রাজার রাজধানী পাটনা হস্তগত করিলেন। ইহার পরে ভর্ত্তৃকে উজ্জয়িনীব রাজ্যভার অর্পণ করিয়া চন্দ্রগুপ্ত পাটনাবাসী হইলেন, কিন্তু কিছুদিন পরেই স্বর্গগত হইলেন। তখন ভর্ত্তৃ এক বিশাল রাজ্যের অধিকারী হইলেন, তাহা সত্ত্বেও তাহার ব্যভিচারিণী পত্নী সৈন্ধসেনা বা সিন্ধুমতীব ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হইয়া রাজা বনবাসী হইলেন। তখন সিংহাসনে বিক্রম অধিষ্ঠিত হইলেন। বিক্রমের শালিবাহনেব সহিত যুদ্ধ হয়, এই যুদ্ধে বিক্রম নিহত হন। শালিবাহন বিজয়ী হইয়া নিজ সম্বতের প্রতিষ্ঠা করিলেন, এই সম্বৎ আজ ১৮৪৫ (সন ১৯২৪, বি. স. ১৯৮০)। অতএব বিক্রমাদিত্য-সম্বৎ-প্রতিষ্ঠাতা বিক্রম শালিবাহন-কর্ত্তৃক যুদ্ধে নিহত বিক্রম অপেক্ষা ১৩৫ বর্ষের পূর্ব্বের লোক। চন্দ্রগুপ্তের পুত্রবৎ ভর্ত্তৃ বনবাসী হইয়া পতঞ্জলি-রচিত বৈয়াকরণ-মহাভাষ্যের বাক্যপদীয় রচনা করেন, ইঁহার ভ্রাতা ভট্ট ভট্টিকাব্য রচনা করেন, এই ভর্ত্তৃ গোরক্ষের শিষ্য হওয়া সম্ভব নহে, কারণ যোগীরা নিজনামে পুস্তক লিখিয়া প্রসিদ্ধ হইবার চেষ্টা মাত্র করেন না, শিষ্য হইবার পূর্ব্বের রচনা হইলেও অন্য তথ্যে মিল নাই; যথা, ইঁহার স্ত্রী ব্যভিচারিণী ছিলেন ও তাঁহার নাম ছিল 'সিন্ধুমতী'।

গোরক্ষশিষ্য ভর্ত্তৃর পত্নীর নাম পিঙ্গলা। তিনি পতিব্রতা ছিলেন, তাঁহার পাতিব্রত্য ধর্ম্মই ভর্ত্তৃকে সন্ন্যাস লইবার প্রতিজ্ঞা হইতে বিরত করিতে থাকে, এই সকল বৃত্তান্ত প্রাচীনকাল হইতেই যোগিসমাজে ও অন্যত্র প্রসিদ্ধ আছে। ইহার অতিরিক্ত এই ভর্ত্তৃ গোপীচন্দ্রের মাতুল ছিলেন।

এই ভর্ত্তৃ গোবিন্দ ব্রাহ্মণের পুত্র, যদি গোরক্ষ-শিষ্য হন, তবে গোপীচন্দ্রের জন্মদাত্রী মাতা কোথায় ছিলেন? ইহার পিতা গোবিন্দ ব্রাহ্মণের যদি কোন কন্যা থাকিয়া থাকে, তবে তাহার ক্ষত্রিয়ের সহিত বিবাহ হওয়া অসম্ভব। আর চন্দ্রগুপ্তের যদি অন্য কন্যা হইয়া থাকে তবে সে ভর্ত্তৃর ভগিনী হইতে পারে না। এই সকল কারণে মনে হয় আমাদের অভীষ্ট প্রথম ভর্ত্তৃ ও বিক্রমই ভ্রাতৃসম্বন্ধে আবদ্ধ ছিলেন। তথাপি এই যুক্তির উপর নির্ভর করা কঠিন, কারণ ইতিহাসে যাহা লিপিবদ্ধ থাকে, তাহাই বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া ধরা হয়। কিন্তু যথার্থ ইতিহাসও পাওয়া কঠিন। অলবার রাজা ভর্ত্তৃকাহিনীর অনুসন্ধানে উজ্জয়িনীতে লোক প্রেরণ করিয়াও যথাযথ তথ্য-লাভে সমর্থ হন নাই। উপসংহারে বলা হইতেছে যে, প্রথম ভর্ত্তৃ ও বিক্রম পরস্পরের ভ্রাতৃসম্বন্ধ ছিল ও এই ভর্ত্তৃই শ্রীনাথজী গোরক্ষনাথজীর শিষ্য হন।[১]

অতএব উক্ত লেখকের মতে গোপীচন্দ্রের মাতুল ভর্ত্তৃ গোরক্ষশিষ্য ছিলেন না। গোবিন্দ ব্রাহ্মণের পুত্র এবং চন্দ্রগুপ্তের দৌহিত্র ভর্ত্তৃই গোরক্ষ-শিষ্য ছিলেন। এই ভর্ত্তৃর ভ্রাতা বিক্রমকে শালিবাহন পরাজিত করিয়া নিজ সম্বৎ প্রতিষ্ঠা করেন, এই শালিবাহন-সম্বৎ আজ ১৮৬৫ (খৃঃ ১৯৪৪এ)। অতএব ইহা দ্বারা গোরক্ষের সময় নির্ণয় করিতে হইলে ভর্ত্তৃ-বিক্রমেরও কিছু পূর্ব্বে তাঁহার কাল-নির্ণয় করিতে হয়, ইহা অসম্ভব মনে হয়।

অন্য ভর্ত্তৃর জন্ম-কাহিনী,—তিনি দেবতা মিত্রাবরুণের পুত্র, মৃত্তিকা-ভাণ্ডে তাঁহার জন্ম হয়, এই ভাণ্ডের নাম ভর্থী, তাই পরে তাঁহার 'ভর্থী' নাম হয়। এক হরিণী ইঁহাকে স্তনদানে বর্দ্ধিত করে। কালক্রমে উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমের সাহচর্য্যে ভর্ত্তৃ রাজনীতিতে পটু হন। একদা মৃগয়াকালে এক হরিণী বধ করিয়া তিনি হরিণীর দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়েন ও অকস্মাৎ গোরক্ষের সহিত বনমধ্যে সাক্ষাৎ হওয়ায় হরিণের জীবনদান-অনুরোধের প্রতিদানে নিজে সন্ন্যাস লইতে প্রতিশ্রুত হন। গোরক্ষও এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন, তিনি প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। ভর্ত্তৃ গোরক্ষ-সমভিব্যাহারে নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, কিন্তু পতিব্রতা স্ত্রী পিঙ্গলার অভিশাপ-ভয়ে দীক্ষা লইতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে বিক্রমের রাজ্যে ভর্ত্তৃর ধর্ম্মভগিনী ও গোপীচন্দ্রের জন্মদাত্রী

১। যোগিসম্প্রদায়াবিষ্কৃতি পৃ. ৫৫০-৫৩।

মৈনাবতী উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার অনুরোধে গোরক্ষ কিয়ৎকাল উজ্জয়িনীতে বাস করেন। ভর্ত্তৃ পিঙ্গলার নিকট নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেও সন্ন্যাসগ্রহণ করিলেন না। অন্যদিন মৃগয়ায় গিয়া তাঁহার পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ হইল, তখন মৃগবধ করিয়া সেই রক্তে বস্ত্র রঞ্জিত করিয়া মৃত্যুসংবাদ-সহ তাহা প্রাসাদে প্রেরণ করিলেন, তাহা দর্শনে পিঙ্গলা প্রাণত্যাগ করিলেন। ভর্ত্তৃও সেই শোকে গোরক্ষেব শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন, সেই অবধি ভর্ত্তৃ 'ভর্ত্তৃনাথ'।

এই ভর্ত্তৃর ধর্ম্মভগিনী মৈনাবতীই (বা ময়নামতী) গোপীচন্দ্রের মাতা ছিলেন, গোপীচন্দ্র জালেন্দ্রনাথকে কূপে নিক্ষেপাদি কষ্ট দিবার পর তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই কাহিনী বঙ্গদেশের গীতিকার বিষয়বস্তু।

শ্রীজ্ঞানেশ্বর মহারাজ

পাঞ্জাব ও সংযুক্ত-প্রদেশে নানক ও কবীরেব যেরূপ আদর, মহারাষ্ট্র-প্রদেশে জ্ঞানদেবের সেইরূপ আদর। তাঁহাব বিস্তৃত জীবনী 'জ্ঞানেশ্বরী' নামক গীতা-ভাষ্যে পাওয়া যায়। ইনি যোগেন্দ্র-গোরক্ষনাথের শিষ্য ও মহাত্মা গৈনীনাথের প্রশিষ্য ছিলেন। মহারাষ্ট্র-ভাষায় ইনি 'যোগিসম্প্রদায়াবিষ্কৃতি', 'গীতাভাষ্য', 'অমৃতানুভব' আদি গ্রন্থ রচনা করেন।[১] অতএব জ্ঞানদেবকৃত জ্ঞানেশ্বরীতে যে নাথগুরুপরম্পরার উল্লেখ আছে ইতিপূর্ব্বে তাহা হইতে গোরক্ষের কালনির্ণয়ের চেষ্টা করা হইয়াছে। গোরক্ষনাথ জ্ঞানদেবের পিতামহ গোবিন্দপন্থের গৃহে আগমন করেন ও কয়েক পুরুষ ধরিয়া ইঁহাদের নাথসম্প্রদায়ের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। জ্ঞানেশ্বরীর রচনা-কাল ১২৯০ খৃঃ।[২] জ্ঞানদেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম নিবৃত্তিনাথ, একস্থলে নিবৃত্তিনাথ বলিয়াছেন গোরক্ষনাথ তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিরসায়নের গূঢ় রহস্য বুঝাইয়াছেন, অতএব নিবৃত্তিনাথের সহিত গোরক্ষের সাক্ষাৎ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় (নিবৃত্তিনাথের কাল ১২৭৩-১২৯৭ খৃষ্টাব্দ)।[৩]

১২৭৫ খৃঃ জ্ঞানদেবের (পরে জ্ঞানেশ্বর) জন্ম হয়। মহারাষ্ট্রে

১। যোগিসম্প্রদায়াবিষ্কৃতি, ভূমিকা, পৃ চ।

২। ব্রীগ.স—গোরক্ষনাথ, পৃ ২৪২।

৩। কল্যাণ, সন্ত' অঙ্ক, শ্রীগুরু নিবৃত্তিনাথ, পৃ ৪৮৭, ৪৯০। History of Indian Philosophy Vol. VII, p 31. Indian Mysticism by Ranade.

আলন্দী নামক স্থানে বিট্‌ঠল পন্থ ও রুক্মিণীবাঈ ব্রাহ্মণ-দম্পতীর তিন পুত্র ও এক কন্যা হয়। সন্ন্যাস অবলম্বনের পর গুরুর আদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর এই চারি সন্তানের জন্ম হয়, তাই এই পরিবার সমাজচ্যুত হন। জ্যেষ্ঠপুত্র নিবৃত্তিনাথ নাথগুরু গহনীর কৃপা লাভ করেন এবং নিবৃত্তিনাথ স্বীয় ভ্রাতাভগিনীদের দীক্ষা দান করেন। আলন্দীর ব্রাহ্মণেরা জ্ঞানদেবকে দীক্ষা দিতে অস্বীকৃত হওয়ায়, জ্ঞানদেব যোগশক্তি-বলে ষণ্ডকে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করাইতে লাগিলেন, তৎকালে ব্রাহ্মণেরা বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে 'জ্ঞানেশ্বর' অর্থাৎ জ্ঞানের যথার্থ অধিকারিরূপে মান্য করিতে লাগিলেন। মাত্র পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে জ্ঞানেশ্বর ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যা করিতে থাকেন, তাহা জনৈক সচ্চিদানন্দকর্ত্তৃক 'জ্ঞানেশ্বরী' নামে সংগৃহীত হয়। নামদেব জ্ঞানেশ্বরের পরমবন্ধু ছিলেন, ইঁহারা একত্রে তীর্থ-পর্য্যটন ও ভাগবতধর্ম্ম প্রচার করেন। কায়সিদ্ধ মহাযোগী ছঙ্গা বটেশ্বরও জ্ঞানেশ্বরের যোগবলের নিকট মস্তক নত করেন। জ্ঞানেশ্বর মাত্র ২১ বৎসর বয়সে জীবন্ত সমাধি গ্রহণ করেন, তাঁহার পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহাকে সমাধিস্থ করেন।[১]

জ্ঞানেশ্বরের ন্যায় তদীয় ভগিনী মুক্তাবাঈ যোগধর্ম্ম-পরায়ণা ছিলেন, তাঁহার রচিত অভঙ্গীগুলিতে যোগবিষয়ক নাদবিন্দু, শূন্যাশূন্য, অনাহতধ্বনি, সহস্রদল, অজপা প্রভৃতি বহু কথা আছে।

গহনীনাথ, চর্পটনাথ প্রভৃতির উৎপত্তি-কথা

প্রবাদ যে কতিপয় বালকের অনুরোধে গোরক্ষ তাহাদের মৃত্তিকা দিয়া মনুষ্যমূর্ত্তি নির্ম্মিত করিয়া দেন ও তাহাতে প্রাণসঞ্চার করেন। এই মূর্ত্তিরূপী কালে 'গহনীনাথ' নামে প্রসিদ্ধ হন। ইনি নবনারায়ণের একজন।

ব্রহ্মার কৃপায় বালুকারাশির মধ্যে নবনারায়ণের পিপ্পলায়নের অবতার জন্মগ্রহণ করেন। ইনি গুরু মৎস্যেন্দ্র-কর্ত্তৃক দীক্ষিত হইয়া ঘোর তপস্যায় নিযুক্ত হন। দ্বাদশ বৎসর অন্তে ইনি 'চর্পটনাথ' নামে খ্যাত হন। ইঁহার অষ্ট মহাসিদ্ধ যোগী শিষ্য হয়।[২]

নাথসম্প্রদায়ে বাবা আমনাথজী সিদ্ধরূপে গণ্য। ইনি গোদাবরী

১। কল্যাণ-কল্পতরু, জানুয়ারী, ১৯৫১, 'জ্ঞানেশ্বর'; জ্ঞানেশ্বরী-ভূমিকা।

২। যোগিসম্প্রদায়াবিষ্কৃতি, পৃ ৭৯-৮৫, ১০৭-১১৫

তটে যোগাভ্যাস করিতেন। ইঁহার পঞ্চশিষ্যসহ ইনি সমাধি গ্রহণ করেন এইরূপ খ্যাতি আছে।[১]

শ্রীগম্ভীরনাথজী

যোগিরাজ শ্রীগম্ভীরনাথজী শ্রীগোরক্ষনাথের আধ্যাত্মিক বংশধর-রূপে প্রসিদ্ধ। বর্ত্তমান যুগে ইনি মহাসিদ্ধ পুরুষরূপে খ্যাত। ইঁহার পূর্ব্বজীবনের কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, "প্রপঞ্চ সে ক্যা হোগা ?" অর্থাৎ এ সব বিষয় জানিয়া আধ্যাত্মিক জীবনের কি উন্নতি হইবে ?

গম্ভীরনাথজী গোরক্ষপুরের মোহন্ত বাবা গোপালনাথজীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। গম্ভীরনাথ দেখিতে যেমন সুপুরুষ ছিলেন, তাঁহার চরিত্রবলও সেইরূপ অসাধারণ ছিল। যৌবনে নাথযোগি-সম্প্রদায়ের জনৈক অওঘর মহাপুরুষের সঙ্গলাভে তাঁহার বৈরাগ্য জন্মে। একরাত্রে তিনি সকলের অজ্ঞাতসারে সংসার ত্যাগ করেন। গোপালনাথজী তাহাকে সন্ন্যাস দেন এবং দেবীপাটানের শিবনাথজী তাঁহাকে কুণ্ডল ধারণ কবান। তাঁহার স্বাভাবিক নিস্তরঙ্গ গাম্ভীর্য্যের নিমিত্ত তাঁহার গম্ভীরনাথ নাম হয়।

দীক্ষান্তে গম্ভীরনাথ তীর্থ-পর্য্যটন ও সাধনে নিযুক্ত থাকেন। কালক্রমে গোরক্ষপুরের মঠে উপযুক্ত মোহন্তের অভাব হয় এবং গম্ভীরনাথকে মোহন্তপদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হয়। তিনি পদগ্রহণে অস্বীকৃত হইলে সুন্দরনাথ মোহন্তপদে বৃত হইলেন। কিয়দ্দিন পরে গোরক্ষপুরের মঠের তত্ত্বাবধান ও সেবার ভার লইয়া মঠাধ্যক্ষরূপে গম্ভীরনাথকে গোরক্ষপুরেই বসবাস করিতে হয়। এই সময়ে তাঁহার সেবা ও ব্যবহারে জনসাধারণ ও ভক্তগণ মুগ্ধ হন। কালীনাথ, শক্তিনাথ, নিবৃত্তিনাথ, অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রায় ছয়শত বাঙ্গালী গম্ভীরনাথের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ধন্য হন। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় 'আশাবতীর উপাখ্যানে' বাবাজীর গুণ-কীর্ত্তন করিয়াছেন—তবে তাঁহার নাম দেন নাই।

বাবা গম্ভীরনাথ দানশীল বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন, প্রয়াগের কুম্ভমেলায় ইঁহার দানশীলতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। গোরক্ষ-

---

১। কল্যাণ, সন্তঅঙ্ক, পৃ ৬৩৫ 'নাথসম্প্রদায়ে মহাসিদ্ধ'

পূর্ব্বেও ইনি অতিথি-সেবার জন্য খ্যাত ছিলেন এবং সময়ে সময়ে অলৌকিক উপায়ে অপ্রত্যাশিতরূপে আগত বহু অতিথিকে তৃপ্তিসহকারে ভোজন করাইয়া বিদায় দিয়াছেন।

বাবাজী কলিকাতায় আগমন করিলে শত শত ধর্ম্মার্থী ইঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। ১৩২৩ বঙ্গাব্দের পৌষমাসে বাবা গম্ভীরনাথজীর ব্যাবহারিক জীবনের অবসান হয়, তাঁহার নিকট সন্ন্যাসপ্রাপ্ত বাঙ্গালী ভক্ত সাধু শান্তিনাথ ও নিবৃত্তিনাথ অদ্যাপি গোরক্ষপুরের মঠে সাধন-ভজনে নিরত আছেন। সেখানে শান্তিনাথজীব দর্শনলাভের সৌভাগ্য আমাব হয়।

(গম্ভীবনাথজীর জীবনী—'গম্ভীবনাথ প্রসঙ্গ'—অক্ষয়কুমার বন্দ্যো-পাধ্যায়, 'প্রয়াগধামে কুম্ভমেলা'—মনোবঞ্জন গুহঠাকুরতা, ও 'আশাবতীব উপাখ্যান'—বিজয়কৃষ্ণ বচিত দ্রষ্টব্য।)

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বিভিন্ন নাথ সিদ্ধ যোগীদের নাম ও শ্রেণী-বিভাগ

সাধারণতঃ 'নবনাথ' নামে কানফাটা-সম্প্রদায়ের সিদ্ধ যোগীদের প্রসিদ্ধি আছে। তাহাদের মৎস্যেন্দ্র, গোরক্ষ, চর্পট, মঙ্গল, ঘুগো, গোপী, প্রাণ, সুরত, ও চম্বা এই তালিকা পাওয়া যায়। শাস্ত্রী মহাশয় নেপালের তালিকা-মতে প্রকাশ, বিমর্ষ, আনন্দ, জ্ঞান, শল্য, পূর্ণ, স্বভা, প্রতিভা ও সুভগ এই নাম দিয়াছেন। এই নামসকল রূপক-বিশেষ। তদ্ব্যতীত নয়টী চক্রের অধীশ্বর-রূপে নবনাথের কল্পনা করা হইয়াছে ইহাও সম্ভব। গোরক্ষনাথ তালুচক্রের সাধনা-দ্বারা ক্রোধ ও লিঙ্গ-জয়ী হইয়া তালুচক্রের অধীশ্বর হইয়াছেন, মৎস্যেন্দ্র খেচরী-মুদ্রা-সাধনে জিহ্বার অধীশ্বর হইয়াছেন, অতএব মৎস্যেন্দ্র ও গোরক্ষ প্রকৃত নাম নহে এইরূপ মতামত প্রচলিত আছে। নবদ্বারের নাম 'নবনাথ' হওয়াও আশ্চর্য্য নহে।

গোরক্ষ তালুচক্রের দেবতা ও তাঁহার শক্তির নাম 'সিদ্ধান্ত', আদিনাথ হইতে মৎস্যেন্দ্র যে জ্ঞানলাভ করেন তাহা ঈশ্বর-সন্তান গোরক্ষনাথকে দান করেন, উদয়নাথাদি মৎস্যেন্দ্রের পুত্র—এইরূপ বিবৃতিও আছে। আদিনাথ, উদয়নাথ, সত্যনাথ, সন্তোষনাথ, গজকর্ণ, অত্তঘোর, মচ্ছেন্দ্র, চেরঙ্গ, গোরক্ষ—এই নবনাথ-তালিকাও প্রচলিত।

গোরক্ষ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহে (পৃ ৪০) আদিনাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথ, দণ্ডনাথ, সত্যনাথ, সন্তোষনাথ, কূর্ম্মনাথ, ভবনার্জি ও তাঁহার ঈশ্বর-সন্তান-শ্রীগোরক্ষনাথের উল্লেখ আছে। রোজ ও কীট্‌স্ সাহেবও বিভিন্ন তালিকা দিয়াছেন, কিন্তু বিভিন্ন তালিকায় বিভিন্ন নাম পাওয়া গেলেও আদিনাথ, মৎস্যেন্দ্র ও গোরক্ষের নাম সাধারণ। কল্পদ্রুম তন্ত্রের 'গোরক্ষ-সহস্রনাম-স্তোত্রে' এক গোরক্ষনাথই নবভাবে নবনাথরূপে কল্পিত হইয়াছেন। তিনিই নিরঞ্জন, নিরাকার, নির্বিকল্প, নিরাময়, বিধি, বিষ্ণু ও শিবস্বরূপ। গোরক্ষ-সিদ্ধান্ত সংগ্রহে (পৃ ৫১) নবনাথ-পরিচয় আছে এবং নবনাথের স্থিতিবর্ণনাও আছে (পৃ ৪৪, ৪৫); অষ্ট দিকে অষ্ট নাথ, মধ্যে এক নাথ—এইরূপে নবনাথের স্থিতিব্যবস্থা হইয়াছে।

নবনাথ ব্যতীত দ্বাদশ সিদ্ধা, ৮৪ সিদ্ধা, দ্বাদশ পন্থ ও অনন্ত সিদ্ধারাও কানফাটা যোগী-সম্প্রদায়ে প্রসিদ্ধ। সিদ্ধারা হিমালয়বাসী, ৮৪ সিদ্ধা নানককে তাঁহাদের অলৌকিক বিভূতি দেখান, নানকসাখীতে নানকের সহিত গোরক্ষের সাক্ষাৎ-বৃত্তান্ত আছে। ৮৪ সিদ্ধা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে অবতীর্ণ হন, ও তাঁহারা এখনও ভূমণ্ডলে সিদ্ধ-দেহে বিচরণ করেন এইরূপ বিশ্বাস প্রচলিত আছে। গ্রাম্য লোকদের মধ্যে সিদ্ধাদের পূজা প্রচলিত আছে।

হঠযোগ-প্রদীপিকায় (পৃ ২) আছে—আদিনাথই প্রথম সিদ্ধ, তিনি পার্ব্বতীকে হঠযোগ উপদেশ দিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থে (পৃ ৬) হঠবিদ্যাধিকারীদেরও নাম আছে। নাথ-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা আদিনাথ, মৎস্যেন্দ্র তাঁহার শিষ্য, শবর, ভৈরব, চৌরঙ্গী, বিরূপাক্ষ, কাণেরী, নিত্যনাথ, বিন্দুনাথ, অল্লাম, ঘোড়াচোলী, টিংটিণি ইত্যাদি মহাসিদ্ধা হঠযোগ-প্রভাবে "খণ্ডয়িত্বা কালদণ্ডং ব্রহ্মাণ্ডে বিচরন্তিতে।" সন্তদের-বচনেও নাথসিদ্ধদের উল্লেখ বারংবার পাওয়া যায়।

নাথ-সাহিত্যে 'নাথ' নামটী অনেক সময়ে গভীর আধ্যাত্মিক অর্থেই ব্যবহৃত হয়, মৎস্যেন্দ্র ও গোরক্ষের নামের ব্যাখ্যায় যোগলব্ধ তুরীয় অবস্থারূপে বর্ণিত হয়, যথা যিনি পাশ (মৎস্য) বা বন্ধন ছেদ করিতে সমর্থ তিনিই মৎস্যেন্দ্রনাথ।

ভারতীয় নীতি অনুযায়ী নাথদের অযোনিজ উদ্ভব কল্পনা করা হয়, নাথ-মার্গের নামান্তর সিদ্ধ-মার্গ, অবধূত-মার্গ বা যোগ-মার্গ। বৌদ্ধ-সিদ্ধাচার্য্যদের মধ্যে বহু নাথ সিদ্ধের নাম পাওয়া যায়। রসেশ্বর সিদ্ধ মধ্যেও কয়েকজন সিদ্ধের নাম নাথ সিদ্ধদের সহিত সাধারণ, যথা—কপিল, নাগার্জ্জুন, চর্পটী ইত্যাদি। কাপালিক সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তকও আদিনাথ বা শিব, ইঁহাদের দ্বাদশ গুরু ও দ্বাদশ শিষ্যের নামের সহিত নাথ সিদ্ধদের নামের ঐক্য আছে, যথা—নাগার্জ্জুন, সত্যনাথ, ভীমনাথ, গোরক্ষনাথ, জালন্ধর ইত্যাদি। বঙ্গীয় গীতিকায় গোরক্ষ, হাড়িপা, জালন্ধরিপা প্রভৃতির বারংবার উল্লেখ পাওয়া যায়। বৌদ্ধ ও শৈবযোগী মধ্যে বহু নাম সাধারণ, নাথ ও জৈনদের মধ্যেও কয়েকটী নাম সাধারণ, যথা আদিনাথ। তান্ত্রিক সাহিত্যে বিশেষতঃ ত্রিপুরাখণ্ডে বহু সিদ্ধের নাম আছে। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের লোক-গণনায় দেখা গিয়াছে যে জৈন তীর্থঙ্করদের নামের সহিত দ্বাদশপন্থী যোগীদের কতক নামের ঐক্য আছে

শ্রেণী-বিভাগ—কানফাটা বা নাথযোগীদের গুরুপরম্পরা-নির্ণয় কঠিন হইলেও প্রধান প্রধান গুরুর নামে দ্বাদশ (মতান্তরে ত্রয়োদশ) শাখা আছে, যথা :—সৎনাথ, রামনাথ, ধরমনাথ, লক্ষ্মণনাথ, দারিয়ানাথ, গঙ্গা-নাথ, বৈরাগ (ভর্ত্তৃহরি) রাওল (নাগনাথ), জালন্ধরিপা, ঐপন্থ, কপলানী, ধজ্জপনাথ, (ও কানিপা)। এই যোগীরা সকলেই শক্তির উপাসক, প্রবাদ আছে যে স্বয়ং শক্তি হইতেই এই বিভিন্ন শাখার উৎপত্তি হইয়াছে।

পাঞ্জাবের টিলামঠে প্রবাদ আছে যে, অষ্টাদশ শ্রেণী শৈবপন্থী ও দ্বাদশ শ্রেণী গোরক্ষনাথীর দ্বন্দ্ব উপস্থিত হওয়ায় প্রত্যেকের ছয়টী করিয়া শ্রেণী অবশিষ্ট থাকে, তাহারা সকলেই গোরক্ষনাথের পন্থ মানিয়া লয়। শৈবদের মধ্যে—

১। কচ্ছপ্রদেশের কান্থারনাথ
২। পেশোয়ার ও রোটকের পাগলনাথ
৩। আফগানিস্থানের রাওল
৪। পংখ
৫। মাড়ওয়ারদের বন
৬। গোপাল বা রামকে

গোরক্ষপন্থীদের মধ্যে

১। হেথনাথ
২। বোম্বাইয়ের দেবী বিমলার 'ঐপন্থে'র কোলিনাথ
৩। চাঁদনাথ কাপলানী
৪। জয়পুরের পাওনাথ (জালন্ধরপা, কানিপা, গোপীচাঁদ এই শ্রেণীর)
৫। বৈরাগ রতন নাথ
৬। ধজ্জনাথ, (মহাবীর), ইঁহারা বিদেশীয়।

এই দ্বাদশ পন্থ হইতে কানফাটা-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। সম্ভবতঃ শৈবরা গোরক্ষনাথের রীতিনীতিও মানিয়া চলিতে স্বীকৃত হওয়ায় উহারাও গোরক্ষপন্থী-মধ্যে গণ্য হয়।

১। সৎ-নাথী—পুরীতে ইঁহাদের প্রধান মঠ, থানেশ্বর, কর্ণাল, ভেওয়াতেও ইঁহাদের মঠ আছে। মূলতঃ ইঁহারা শৈবপন্থী। বিভিন্ন বর্ণের বস্ত্রখণ্ড-নির্ম্মিত টুপী, আলখাল্লা ও চাদর-ধারণ ইঁহাদের বিশেষত্ব। ধর্ম্মনাথ ও তাঁহার কচ্ছ সহযাত্রী গরীবনাথ এই সম্প্রদায়ের।

২। রামনাথী—ইহারা শৈব, দিল্লীতে ইহাদের মঠ আছে, দাস গোপালনাথীরা প্রধানতঃ যোধপুরে বাস করে। রামচন্দ্রের সহিত সম্পর্ক নাই, ভুলক্রমে রামচন্দ্রের সহিত ইহাদের নাম জড়িত করা হয়।

৩। ধর্ম্মনাথী—এই সম্প্রদায় সৎ-নাথী রাজা ধরমের প্রবর্ত্তিত, ইনি যোগী ছিলেন। কচ্ছ প্রদেশের প্রসিদ্ধ মঠ ধীনধোর ইহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। মতান্তরে ধর্ম্মনাথ গোরক্ষের শিষ্য ছিলেন।

ধীনধোর মঠে ইহার পূজা হয়। এই মঠের যোগীরা এবং মোহন্ত স্বয়ং ব্রহ্মচারী। পার্ব্বত্য অঞ্চলের বামাচারী তান্ত্রিকেরা নিজেদের ধর্ম্মনাথী বলে।

৪। লক্ষ্মণনাথী—গোরক্ষনাথের পর ইনি পাঞ্জাবের টিলা মঠের মোহন্ত হন। এই পন্থের দুইটী বিভাগ আছে নটেশ্রী ও দরয়া, প্রথম দল টিলাতে ও দ্বিতীয় দল সমতল ভূমিতে বাস করে।

৫। দরয়ানাথী—সিন্ধু প্রভৃতি পশ্চিম ভারতে ইহাদের পীঠস্থান। দরয়ানাথীরা মূলতঃ হেথনাথী অর্থাৎ গোরক্ষ-সম্প্রদায়ের আদিম পন্থী। সিন্ধুদেশে প্রতিবৎসর ইহাদের মহোৎসব হয়, হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতি এই মহোৎসবে যোগদান করেন।

৬। গঙ্গানাথী—কপিলমুনির শিষ্য গঙ্গানাথ-প্রবর্ত্তিত পন্থ। ইহাদের সহিত কায়নাথী ও রতননাথীদের সম্বন্ধ আছে।

৭। বৈরাগী (ভর্ত্তৃহরি)—ভোজরাজের পুত্র ভর্ত্তৃহরি উজ্জয়িনীর সিংহাসন ত্যাগ করিয়া বৈরাগী হন, রতননাথ ইহার শিষ্য। প্রবাদ আছে যে, পত্নীর শোকে ইনি গোরক্ষের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। মুসলমানেরাও ইহাকে শ্রদ্ধা করেন। কাবুলে ইহাদের পীঠস্থান আছে।

৮। রাওল (নাগনাথী)—মুসলমান যোগীরাই 'রাওল' নামে প্রসিদ্ধ, ইহারা যাযাবর বৃত্তির জন্য খ্যাত। রাওলপিণ্ডে ইহাদের প্রধান আশ্রম।

৯। জালন্ধরিপা-পন্থ—জালন্ধর নাথ-পন্থ ত্যাগ করিয়া 'পা'-পন্থের প্রবর্ত্তন করেন। 'পা' শব্দটী তিব্বতী, ইহার অর্থ অধিকারী। পা-পন্থীরা শৈব। কানিপা, গোপীচাঁদ প্রভৃতি এই পন্থের।

১০। 'ঐ'পন্থী—গোরক্ষের শিষ্যা বিমলা মাঈ ইহার প্রতিষ্ঠাত্রী, 'মাঈ'শব্দ 'ঐ'শব্দে রূপান্তরিত হইয়াছে। ইহারা বক্র খঞ্জ-যষ্টি ব্যবহার করেন। রোটকে ইহাদের মঠ আছে, তন্মধ্যে কোন মূর্ত্তি নাই।

হরিদ্বারেও ইঁহাদের বৃহৎ মঠ আছে। দাবিস্থানে 'ঐ'পন্থীর উল্লেখ আছে, দাবিস্থান-রচয়িতা 'ঐ'পন্থীর সিদ্ধদেহ যোগীদের স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাহার বর্ণনা আছে।

১১। কাপালানী – গোরক্ষ-শিষ্য কপিলমুনি-দ্বারা প্রবর্ত্তিত।

গঙ্গাসাগরে ইঁহাদের আশ্রম। দম্‌দমের নিকট ষাট্‌গাছি গ্রামের 'গোরক্ষ বাসলী' নামক স্থানের মোহন্তেরা এই শ্রেণীর। প্রবাদ আছে যে গোরক্ষনাথ এই স্থানে ধ্যান করিবার মানসে কপিলমুনিকে গঙ্গা-সাগরে গিয়া অবস্থান করিতে উপদেশ করেন, বর্ত্তমান পূজারীর নিকট আমি এই কিংবদন্তীর কথা শুনিয়াছি।

১২। ধ্বজনাথী—ইঁহারা ধ্বজাধারী, মহাবীর হনুমানের সহিত ইঁহাদের যোগ আছে। সিংহল, পেশোয়ার, অম্বালাতে ইঁহাদের বসবাস।

১৩। কানিপা-পন্থ—জালন্ধরিপা গোপীচাঁদ-কর্ত্তৃক কূপমধ্যে আবদ্ধ থাকাকালে, কানিপা মোহন্ত-পদ গ্রহণ করিয়া এই পন্থ প্রবর্ত্তিত করেন। কথিত আছে কানিপা বামাচারী ছিলেন, 'গোপীচাঁদ' বা 'সিদ্ধ-শৃঙ্গারী' এই সম্প্রদায়ভুক্ত। গোপীচাঁদ হইতে বঙ্গীয় শেপলা বা সাপুড়ে জাতির উদ্ভব। তৎকালে বঙ্গদেশে ও আসামে শক্তিপূজা প্রচলিত ছিল।

নাথ-যোগীদের বিভিন্ন সম্প্রদায়

গোরক্ষনাথীদের ব্রহ্মচর্য্য-পালন বিধি। ধীনোধর, দেবীপাটান ও গোরক্ষপুরে বিবাহ একেবারেই নিষিদ্ধ। স্ত্রীলোক মঠের বাহিরে কার্য্য করিলেও মঠ-মধ্যে তাহাদের প্রবেশাধিকার নাই। সন্ন্যাসই যোগীর আদর্শ, তথাপি বিবাহিত যোগীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে।

কাশীধামের কাল-ভৈরবের মন্দিরের পূজারী বিবাহিত, তিনি সস্ত্রীক মন্দিরের বাহিরে বাস করেন। ব্রাহ্মণ পুরোহিত দ্বারা কানফাটা-যোগীদের বিবাহানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। প্রসিদ্ধ মঠ-মধ্যেও বিবাহিত যোগী দেখা গিয়াছে, ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে বুকানন গোরক্ষপুরের মঠে বিবাহিত যোগীদের বাস ও তাঁহাদের শিক্ষা-সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন। বিবাহিত যোগীদের নাম ঘরবারী, বিন্দীনাগী, সমযোগী ও গার্হস্থ্য, ব্রহ্মচারীদের নাম 'মঠধারী'। বিবাহিত যোগীরাও কুণ্ডলাদি ধারণ করেন ও যোগাভ্যাস করেন, ইঁহাদের নিজ সম্প্রদায়ের বাহিরে কিন্তু স্বজাতির মধ্যে বিবাহ-রীতি প্রচলিত আছে।

নৈনিতাল, আলমোরা, সিমলা পাহাড়ে ধর্ম্মনাথী ও সং-নাথী গার্হস্থ্য যোগী আছে। ইহাদের সন্তানেরাও কেহ কেহ যোগী হয়। এই যোগীরা তন্তুবায়ের, মণিহারীর, সৈন্যদলে যোগদানের বা উত্তমর্ণাদির কার্য্য-দ্বারা সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করে। সিমলা পাহাড়ের শবদাহী যোগীদের সহিত অন্য যোগীরা আহারাদি করে না। সিমলা পাহাড়ের উত্তরে কুণ্ডলধারী নাথ-যোগীদের বাস, ইহারা সামান্যতঃ সাধন ও শিবপূজা করে, প্রধানতঃ শাক-সব্‌জী-উৎপাদন ও অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ায় পৌরোহিত্য করে।

পাঞ্জাবের গার্হস্থ্য যোগীদেব নাম 'রাওল,' ইহাবা গীত গাহিয়া ভিক্ষা করে ও হস্তগণনা-দ্বারা জীবিকার্জ্জন করে। 'সংযোগ' নামে আর একটি বিবাহিত সম্প্রদায় আছে। কুলুর গার্হস্থ্য যোগীদের নাম 'নাথ,' আম্বালাতে বিবাহিত যোগীদের নাম 'যোগীপদ'। বিধবা-বিবাহও ইহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। কাংরাতে 'অন্দরলা' এবং 'বাহিরলা' নামে দুইটী গোরক্ষ-সম্প্রদায় আছে, প্রবাদ যে গোরক্ষ মৎস্যেন্দ্রের দুই পুত্রকে কাহারও অলক্ষ্যে বলি দিবাব নিমিত্ত দুইটী ছাগ প্রদান করেন, দ্বিতীয় পুত্র আসিয়া বলিল চন্দ্র-সূর্য্য সাক্ষী নাই এরূপ স্থান নাই, সেই প্রিয় হইল, গোবক্ষ তাহাকে বক্ষে ধাবণ করিলেন, অন্যটীকে বিতাড়িত করিলেন, সেই হইতে 'অন্দবলা' ও 'বাহিরলা'-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়।

যুক্ত প্রদেশের যোগীরা নিম্ন শ্রেণীব উপযোগী কার্য্য করে। বোম্বাই প্রদেশের যোগীরা মনিহারী ও মুক্তাপ্রবালাদি বিক্রয় করে।

বঙ্গদেশ ও আসামের যোগীজাতির বিস্তারিত ইতিহাস পাওয়া যায়।[১] বুকাননের মতে গোপীচন্দ্রের সময়ে ইহারা পুরোহিতের কার্য্য করিত, কিংবা উত্তর-পূর্ব্ব বঙ্গের প্রবাদ-মতে ইহারা শঙ্কর-শিষ্য ছিল, মদ্যপানাসক্ত হওয়ায় শঙ্কর-কর্ত্তৃক জাতিচ্যুত হয়। রংপুরের চূণোযোগীরা নিজেদের গোপীচাঁদের পুরোহিতের বংশধর বা শিবগোত্র বলে, ভিক্ষাই তাহাদের উপজীবিকা। ময়নামতী, মাণিকচাঁদ ও গোপীচাঁদের গীত ইহারা গাহিয়া থাকে। এই সকল গীতিকায় হাড়িপা গুরু হইয়াও নিম্ন শ্রেণীর বা বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিলেন দেখা যায়, অতএব শঙ্কর-কর্ত্তৃক জাতিচ্যুত হইবার কাহিনীর মূলে হয়ত কিঞ্চিৎ সত্য আছে। হাড়িপা, কানিপার

১। Dist. Gazetter of E. Bengal and Assam. Webster. p. 41 (1910)

শিষ্য ছিলেন। হাড়িপা দীর্ঘকাল জালন্ধরে বাস করেন বলিয়া 'জালন্ধারীপা' নামে অভিহিত হন।

বঙ্গীয় যোগী জাতির মধ্যে বহু বিভাগ আছে, হেলয়রা কৃষিকার্য্য ও তন্তুবায়ের কার্য্য করে। থিয়রেরা ভিক্ষা করে ও চূণ তৈয়ারী করিবার জন্য ঝিনুক পোড়ায়। ইহারা নিরক্ষর মদ্যপানাসক্ত, এই দুই শ্রেণীর পরস্পরের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত নাই। রংপুরের চুণোতি যোগীরা চূণ তৈয়ারী করে, এবং পানাতি যোগীরা পান উৎপাদন করে।

পূর্ব্ববঙ্গে মাস্ত ও একাদশী নামে দুইটী যোগী-সম্প্রদায় আছে। ইহারা পরস্পরের অন্ন গ্রহণ করে না, কিন্তু পরস্পরের জলপাত্র হইতে জলপান করে, ইহাদের মধ্যেও অন্তর্বিবাহ প্রচলিত নাই। মাস্ত যোগীরা ত্রিপুরা, নোয়াখালী ও বিক্রমপুরের দক্ষিণে বাস করে, একাদশীরা বিক্রমপুরের উত্তরে ও অধিকাংশ ঢাকায় বাস করে। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে একমাত্র ত্রিপুরাতেই প্রায় ৬৮,০০০ যোগী ছিল।[১] মাস্তরা অষ্টসিদ্ধার বংশধর, একাদশীরা নাথ-শিষ্যের বংশধর-রূপে পরিচিত। মাস্ত ও একাদশী যোগীর মধ্যে অশৌচকাল লইয়াও মতভেদ আছে। মাস্তরা মাসাবধি এবং একাদশীরা একাদশ দিবস পর্য্যন্ত অশৌচ পালন করে। যোগীদের মধ্যে যাহারা দ্বীপে বাস করে তাহাদের নাম 'সন্দ্বীপ' যোগী ও যাহারা স্থলে বাস করে তাহাদের 'ভুলুয়া' আখ্যা দেওয়া হয়। যাহারা কৃষিকার্য্যরত তাহাদের হালোয়া যোগী বলে, সম্ভবতঃ 'হাল' শব্দ হইতে এই নামের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহারা তন্তুবায়-কার্য্য ত্যাগ করায় জাতিচ্যুত হয়।

বিবাহ-উৎসবে মাস্ত যোগীরা মাতামহী প্রমাতামহী প্রভৃতির পূজা করে, ইহারা উপবীত ধারণ করে, মৃতকে সমাধিস্থ করে ও পুত্র কর্ত্তৃক মুখাগ্নি করায়। মাস্ত যোগীদের ক্রিয়ানুষ্ঠানের নিমিত্ত ব্রাহ্মণ পুরোহিত নাই, অধিকারী পুরোহিতের কার্য্য সম্পন্ন করে। এই অধিকারীরা যোগী কন্যাও বিবাহ করিতে পারে। একাদশী যোগীদের ব্রাহ্মণ পুরোহিত আছে, ইহাদের 'বর্ণশ্রমণ' বলা হয়, 'মহাত্মা' নামেও ইহারা পরিচিত। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে এক বিক্রমপুরেই শতাধিক মহাত্মা বাস করিত। একাদশী যোগীরা কৃষ্ণোপাসক, কেহ কেহ শক্তির উপাসনা করিয়া থাকে, বৈষ্ণব যোগীর সংখ্যাও ইহাদের মধ্যে কম নহে। বৃদ্ধ-শাতাতপীয়-সংহিতা ও

১। Dist. Gazetter of E. Bengal & Assam. Webster p. 26. (1910)

চন্দ্রাদিত্য পরমাগমসংহিতা ইহাদের শাস্ত্ররূপে গণ্য।[১] মাস্থ ও একাদশী উভয় শ্রেণীর পূর্ব্বপুরুষই যোগী ছিলেন বলিয়া প্রবাদ। ইহারা সাধারণতঃ তন্তুবায়, এক্ষণে কৃষিকার্য্য, স্বর্ণকারের কার্য্য, ঝিনুক দাহের কার্য্য ও সরকারী বিভাগে সামান্য বেতনের কার্য্য করিয়া থাকে।

যুক্ত প্রদেশের মাস্থ যোগীদের প্রধান বাসস্থান বৃন্দাবন, মথুরা গোকুল। ইহাদের প্রধান তীর্থ কাশী, গয়া ও চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড।

পূর্ব্ববঙ্গের নোয়াখালি বিভাগের দালাল বাজারের জমিদারেরা মাস্থ যোগীদের শীর্ষস্থানীয়, ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে এই বংশের এক যোগী সরকার কর্তৃক রাজা উপাধি ও নিষ্কর জমি প্রাপ্ত হন।

পশ্চিম বঙ্গের ধর্ম্ম-ঘোরিরা যোগীদের অন্যান্য যোগীরা অবজ্ঞা করে, কারণ ইহারা ধর্ম্ম, শীতলা প্রভৃতির উপাসক। ইহাদের মধ্যে মৎস্যেন্দ্র, গোরক্ষাদি শ্রেণী-বিভাগ আছে। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে ৩,৫০,০০০ র অধিক যোগী বাস করিত। নিজামরাজ্যে 'দাভরে' ও 'রাওল' নামে গোরক্ষসম্প্রদায়ের দুইটী বিভাগ আছে। দভর নামক ঢোল সহ গীত গাহিবার নিমিত্ত ইহাদের নাম দাভরে হইয়াছে। দ্বাদশ বৎসর বয়সে ভৈরবের মন্দিরে উৎসর্গীকৃত বালক-বালিকাদের ইহারা দীক্ষা দেয় ও কুণ্ডল ধারণ করায়। ইহাদের বিবাহে ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হয়। ইহারা মদ্যমাংসাদি ভক্ষণ করে ও ভিক্ষাবৃত্তি-করে। রাওল যোগীরাই সংখ্যায় অধিক। ইহারা কর্ণে শঙ্খকুণ্ডল ধারণ করে। ইহারা কুল্‌বী, রাজপুত ইত্যাদি জাতি হইতে দীক্ষিত হইয়াছে। দাভর ও রাওলদের মধ্যে ভৈরবাদি হিন্দু দেবতার পূজা প্রচলিত আছে, হিন্দুর উৎসবাদিতে ইহারা যোগদান করে, মৎস্যেন্দ্র-গোরক্ষ-প্রবর্ত্তিত পন্থানুসরণ করে এবং ত্রিশূল ও লিঙ্গ ধারণ করে।

বোম্বাই প্রদেশে যোগীদের 'গুজরাট' ও 'মারাঠা' ভেদ আছে। আবার কর্ণাটক ও কানাড়া যোগীও আছে। ইহারা ব্রহ্মচারী ও গার্হস্থ্য উভয় শ্রেণীর। মারাঠা যোগীদের দ্বাদশ শাখা আছে, প্রবাদ যে গোরক্ষ-নাথই ইহার প্রবর্ত্তনকারী। বহু বিবাহ বা বিধবা বিবাহে ইহাদের আপত্তি নাই, ইহারা যাযাবর শ্রেণীর, পুরুষেরা গেরুয়া ধারণ করে ও হস্তিদন্তের কুণ্ডল পরে, মেয়েরা ঘাঘ্‌রা পরিয়া অশ্বোপরি গৃহসামগ্রী-সহ গ্রাম হইতে

১। প্রবাসী, চৈত্র, ১৩২৯—যোগীজাতি প্রবন্ধ, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

গ্রামান্তরে স্বামী-সহ ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহারা ইন্দ্রজাল-পারদর্শী, গোরক্ষ ও মৎস্যেন্দ্র ইহাদের দেবতা, গোপীচাঁদের গাথা ইহাদের প্রিয় গীত।

কাঙ্কাণের সাবন্তবাদীর নাথ-গোস্বামীরা কুণ্ডল ধারণ করে ও বিবাহাদিতে 'শ্রীগোরক্ষ' মন্ত্র উচ্চারণ করে।

পুণাতে গার্হস্থ্য যাযাবর যোগী-সম্প্রদায় গোপীচাঁদের গীত গাহিয়া ভিক্ষা করে, ইহারাও কুণ্ডলধারী ও গোরক্ষ-মৎস্যেন্দ্রের উপাসক। মদ্য-মাংসাদি-ভক্ষণ ও অহিফেন-সেবন ইহাদের মধ্যে প্রচলিত।

বেলগাঁওতে এক যোগী-সম্প্রদায় সস্ত্রীক বাস করে, ভিক্ষা ও কৃষি-কার্য্য ইহাদের উপজীবিকা।

বেরার প্রদেশের নাথ-সম্প্রদায়ের অষ্টাদশ শাখা বর্ত্তমান, তন্মধ্যে অবধূত, কানফাটা ও গোরক্ষ-শাখাই প্রধান। নব নাথের নাম অনুযায়ী নব শাখাও দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বপুরুষের উল্লেখ করিতে হইলে ইহারা আদি-নাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথের নাম করে। কানফাটা-যোগীরা কর্ণের কোমল নিম্ন ভাগ ছেদন করে ও গোরক্ষ-যোগীরা কর্ণের উপাস্থি ভেদ করিয়া কুণ্ডল ধারণ করে। উৎসবাদিতে গোরক্ষ শাখার যোগীদের স্থান উচ্চতর।

বেরারের বিবাহিত যোগীদের নাম 'সম্‌যোগী', ইহারা বয়নাদি করে ও কবচ-বিক্রয়, ভাগ্য-গণনা ও ষণ্ড-প্রদর্শন দ্বারা ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়।

শিবরাত্রিতে ইহারা গোরক্ষ-মৎস্যেন্দ্রের গীত গাহে, দেবী-পূজাও ইহাদের মধ্যে প্রচলিত। এই যোগীরা সমাজের সকল শ্রেণী হইতেই দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে। কেবল অবিবাহিত যোগীরা 'যোগী' নামে পরিচিত।

দাক্ষিণাত্যের যোগীরা ইন্দ্রজাল-প্রদর্শন ও ভিক্ষাবৃত্তি করিয়া থাকে। সর্পাদির ক্রীড়া দেখান ও কাঁচের পুঁতি বিক্রয়ও ইহাদের ব্যবসায়। ইহারা অধিকাংশই দারপরিগ্রহ করে, ইহাদের স্ত্রীরা উল্‌কীর কার্য্যে বিশেষ পারদর্শিনী। ইহারাও যাযাবর, কুম্ভীরাদির মাংস ইহারা ভক্ষণ করে। বিবাহ-সময়ে বরপক্ষ মুদ্রা ও শূকরদান করে, সেই শূকরবধে উৎসব ও ভোজনাদি হয়। এই যোগীদের নাম 'পামুল' অর্থাৎ সর্প। ইহারাও মৃত দেহ সমাধিস্থ করে।

মহারাষ্ট্র ও টুলুভাষী এক 'যোগী পুরুষ'-সম্প্রদায় আছে, ইহাদের প্রধান মঠ কাদিরীতে। ইহারা ভৈরব ও গোরক্ষের পূজা করে। ইহাদের

মধ্যে বিবাহিত যোগীরা কর্ণবেধ করে না, অপরেরা করে। ইহারা কণ্ঠে উপবীত-সহ শিঙ্গা ধারণ করে, ইহাদের বিবাহে ব্রাহ্মণ পৌরোহিত্য করে। ইহারা মৃতদেহ দাহ করে না, ব্রাহ্মণকে দান করে ও কাককে আহার্য্য দেয়, ভিক্ষা ও মাল-বহন ইহাদের উপজীবিকা।

যুক্ত প্রদেশের পশ্চিমে ভাদ্দরী যোগী ও নন্দী যোগীরা সূচীজীবী, রেশমের সূতা-কর্ত্তন ইহাদের ব্যবসায়। চৌহান, গহেলাট প্রভৃতি রাজপুত নামের গোত্র ইহাদের মধ্যেও আছে। 'ডোমযোগী' নামে এক সম্প্রদায় আছে, তাহারা ভিক্ষুক। নেপালের পর্ব্বতের নিম্ন দেশে হারুজাতিরা বাস করে, তাহাদের মধ্যে এক শ্রেণীর নাম যোগী।

শেপালা নামে গোরক্ষ-সম্প্রদায়ের যোগীরা সালুসাপের অস্থি-নির্ম্মিত কুণ্ডল ধারণ করে, ইহারা সাধারণতঃ তাঁবুতে বাস করে ও সর্প-ক্রীড়া প্রদর্শন করে। কর্ণবেধ-সময়ে ইহারা গোরক্ষনাথকে নৈবেদ্য অর্পণ করে। হিন্দুস্থানের মধ্যেই হিংলাজ-গুটিকা ক্রয় করিয়া ইহারা ধারণ করে। ইহাদের উপবীত নাই, শিখদের ন্যায় কেশ ও শ্মশ্রুধারণ ইহাদের রীতি। ইহারা নিজেদের কানিপা শিষ্যরূপে পরিচয় দেয়, কিন্তু যোগসাধন করে না। ভারতের সর্ব্বত্র ইহারা সস্ত্রীক ভ্রমণ করে, মুসলমানের আহার-গ্রহণে ইহাদের আপত্তি নাই বলিয়া ইহারা হিন্দুর ঘৃণ্য। কানিপা বৃশ্চিক ও সর্পাহারের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে গোরক্ষনাথ-কর্ত্তৃক এক ভোজ-সভা হইতে বিতাড়িত হন—এই কাহিনী প্রচলিত আছে। অতএব কাণিয়োপা বা শেপালাদের সম্পূর্ণরূপে গোরক্ষপন্থী বলা চলে না।

বগুড়ায় এক বৌদ্ধ যোগী-সম্প্রদায়ের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তাহারা তান্ত্রিক ও শৈব আবরণে আত্মগোপন করিয়া আছে। বগুড়া এক সময়ে হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধদের লীলাভূমিতে পরিণত হয়। বগুড়ার তিন ক্রোশ উত্তরে মহাস্থান নামক স্থানটাই প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন। বুদ্ধদেব এক পৌণ্ড্র-রাজকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের অন্তর্গত কোটিকপুর জৈনতীর্থ-বিশেষ, খৃঃ পূঃ ৭০০ অব্দে পার্শ্বনাথ স্বামী এই রাজ্যে জৈনধর্ম প্রচার করেন। চীন পরিব্রাজক যুয়নচঙ্‌ পৌণ্ড্র-রাজ্যে দিগম্বর-জৈনদের আবাসস্থল, বৌদ্ধদের সঙ্ঘারাম ও হিন্দুদের দেবালয় দেখেন। বৃহন্নীলতন্ত্রমতে পুণ্ড্রবর্দ্ধন পীঠস্থান, সুবেশাদেবীর পীঠ এ স্থানে আছে। কাশ্মীর-রাজ এখানকার রাজকুমারীকে বিবাহ করেন, বঙ্গের রাজকুমারী কল্যাণ দেবীর প্রতিষ্ঠিত মন্দির অদ্যাপি কাশ্মীরে

বর্ত্তমান। নয়পালের সময়ে ১০৩০ খৃষ্টাব্দে, বঙ্গে তান্ত্রিক মতের প্রাধান্যের যুগে, হিন্দু ও বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের আচার-ব্যবহার অনেকটা শিথিল হইয়া উঠে, তৎপরে শৈবমতের প্রচারের যুগে বৌদ্ধ-যোগীরা ইহাদের সহিত মিলিত হইয়া আত্মগোপন করে, লবঙ্গ বা লক্ষ্মণসেনের সময়ে বৌদ্ধ-যোগী গোরক্ষ-শিষ্যেরা শৈব-সন্ন্যাসী হয়। বর্ত্তমান যুগী প্রভৃতি জাতির মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের আভাস পাওয়া যায়, বগুড়ায় প্রচলিত 'যুগীয়া কাচ' নামক গ্রাম্য সঙ্গীত বৌদ্ধ শূন্যবাদের পরিচায়ক। বগুড়ায় যোগীর ভবন নামে গ্রাম ও মঠ আছে, ভবন-শব্দ হিন্দুর ব্যবহার্য্য নহে, হিন্দুরা আশ্রম, মঠ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করে। যোগীর ভবনের মোহন্ত কানফাটা-সম্প্রদায়-ভুক্ত, এখানে গোরক্ষমন্দির ও গোরক্ষকুই নামে একটী মঠ বর্ত্তমান।[১]

নাথ-পন্থের সহিত যুক্ত অন্যান্য যোগী-সম্প্রদায়

পুণায় মুসলমান সিদ্ধ 'হাণ্ডী ফরঙ্গনাথ' গোরক্ষনাথ ও আরঙ্গজেবের শিষ্যরূপে পরিচিত। পাঞ্জাবের সৎ-নাথীর জাফির পীরেরাও মুসলমান। ইহারা রঞ্জ ও বালকেশ্বরনাথের শিষ্য, কিন্তু ইহারা হিন্দুদের সহিত আহারাদি করে না।

রাজা রসালুর শিষ্য সম্প্রদায় 'মাননাথী' নামে পরিচিত। ইহারা পেশোয়ার ও ঝিলাম নদীতীরে বাস করে। জ্বালামুখীতে ইহাদের মঠ আছে। পঙ্গলনাথ বা অর্দ্ধনাথ এই পন্থের। ইনি এক্ষণে মুক্ত পুরুষ কৈলাসবাসী যোগী, দমদম 'গোরক্ষ বাসলী'তে ইঁহার চিত্র দেখিয়াছি।

অঘোরী যোগীরা অওঘড় বা অওঘর যোগী হইতে উদ্ভূত, ইহারা শবাহারী, ইহারা গোরক্ষপূর্ব্ব যুগের যোগী।

নিমনাথ ও পরেশনাথ জৈন, ইঁহারা মৎস্যেন্দ্র-পুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। ইঁহারা সরোতোরা ও পূজ নামে দুই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক।

কন্থরনাথীরা ব্রহ্মচারী, ইঁহারা ধীনোধরের মঠের অনুরূপ রীতি-নীতি পালন করেন। গোরক্ষ-শিষ্য শরঙ্গনাথ 'বাওয়াজী-কা পন্থে'র প্রবর্ত্তক। ইঁহাদের দশটী শাখা আছে।

দত্তাত্রেয়-শিষ্য লালপাদরীরা গোরক্ষনাথীদের সংস্পর্শে থাকে। দত্তাত্রেয় কৃষ্ণাবতার, কৃষ্ণ দত্তাত্রেয়-রূপে দশম শতাব্দীতে অত্রীর

১। প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩১৭, বগুড়ায় বৌদ্ধ-যোগী, লেখক—হরগোপাল দাস কুণ্ডু।

স্ত্রীর সতীত্ব পরীক্ষা করেন এই রূপ কিংবদন্তী আছে। পুণার বহু-স্থানে দত্তাত্রেয়ের মন্দির আছে। ত্রিমূর্ত্তির প্রতীকরূপে ত্রিমুণ্ডধারী দত্তাত্রেয়-মূর্ত্তিও একটী মন্দির-মধ্যে আছে। দত্তাত্রেয় জাতিচ্যুত ব্রাহ্মণ ও অঘোরী ছিলেন।

৺অক্ষয় দত্ত লিখিয়াছেন—সচরাচর দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ প্রকার যোগী গণিত হইয়া থাকে (পৃ ১৩২, ভা-উ-স, ২য় ভাগ), তন্মধ্যে রামপন্থী যোগী, সিদ্ধিকেবলী যোগী, কাণ্‌ফট্‌, অওঘড়, মচ্ছেন্দ্রী, শারঙ্গীহার, ভুরীহার, ভর্ত্তৃহরি, কাণিপা, অঘোরপন্থী, প্রভৃতি সম্প্রদায় আছে।

ইহা ব্যতীত বহু ক্ষুদ্র সম্প্রদায় আছে যাহারা গোরক্ষনাথকে নিজেদের গুরু বলিয়া গণ্য করে, যথা :—

রুখড়, সুখড়, গুদড়াদি সম্প্রদায়। ইহারা কানফাটাদের ন্যায় কুণ্ডলধারী।

সন্তদের মধ্যে সাধ-নামক শ্রেণী গোরক্ষের উপাসক, ইহাদের মঠে গোরক্ষের নাম অঙ্কিত আছে, আবার কাবুলের বহু মুসলমান গোরক্ষ-শিষ্য বাবা রতন হাজি দ্বারা 'যোগী'-সম্প্রদায়ভুক্ত হন। রতন হাজি সম্ভবতঃ মুসলমান ছিলেন, তিনি গোরক্ষের গুরু নামেও পরিচিত।[১]

ভেক বরাহ-পন্থ বা কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি—ইঁহারা বিভিন্ন মঠের পরিদর্শন, মোহন্ত-নির্ব্বাচন আদি কার্য্য করিয়া থাকেন। হরিদ্বারে ইহাদের মঠ আছে, বিভিন্ন সম্প্রদায় হইতে ইহার দ্বাদশ সভ্য নির্ব্বাচিত হন, দ্বাদশ বৎসরান্তে কুম্ভমেলায় পুনর্নির্ব্বাচন হয়। ইতিমধ্যে কোন মীমাংসার প্রয়োজন হইলে প্রয়াগ বা উজ্জয়িনীর মেলায় তাহা নিষ্পন্ন হয়; সভাপতির নাম যজ্ঞেশ্বর, দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার পদ থাকে। মোহন্ত-নির্ব্বাচন পূর্ব্ব মোহন্ত-দ্বারা হইলেও সমিতির অনুমোদন-সাপেক্ষ। ধীনোধরের মোহন্তের নাম 'পীর', প্রথানুযায়ী রাও কর্ত্তৃক নূতন মোহন্ত নির্ব্বাচিত হন, প্রকৃত পক্ষে পূর্ব্ব মোহন্তই উঁহাকে নির্ব্বাচন করিয়া যান। দেবী পাটানের মোহন্ত উক্ত সমিতি দ্বারা নির্ব্বাচিত হন। কানফাটাদের মধ্যে টিলা মঠের মোহন্তই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য। কিছুদিন পূর্ব্বে গোরক্ষ-পুরের মোহন্ত-নির্ব্বাচন-সম্বন্ধে বিবাদ হইলে সরকারী কর্ম্মচারী এই দ্বাদশ যোগীর স্বাক্ষরসহ অনুমোদনপত্র অনুযায়ী কার্য্য করেন।

১। Nirguna School of Hindi Poetry—Barthwal, pp. 289, 306.

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মঠ ও তীর্থস্থানাদি

হিন্দুদিগের তীর্থস্থানসমূহ কানাফাটাদিগেরও তীর্থবিশেষ, ইঁহারা হিন্দুর শিব, ভৈরব ও শক্তির মন্দির দর্শন করে, ইঁহাদের নিজেদেরও বহু মন্দির এবং মঠ সমগ্র ভারতে বিশেষতঃ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বিদ্যমান। তন্মধ্যে কয়েকটী মঠ বিশেষ প্রসিদ্ধ, এমন কি গোরক্ষ যুগের পূর্ব্বেও সেগুলি তীর্থরূপে পরিগণিত হইত।

বঙ্গদেশে—দমদমের নিকট 'গোরক্ষ বাসলী' নামক গোরক্ষ ক্ষেত্র আছে। এখানকার গোরক্ষ মন্দির মধ্যে তিনটী নরমূর্ত্তি আছে, উহারা দত্তাত্রেয়, গোরক্ষনাথ ও মৎস্যেন্দ্রনাথের বলিয়া কথিত হয়। উপস্থিত (১৯৪৪ খৃঃ) এখানকার মোহন্তর নাম বুধনাথ, তিনি কপলানী শ্রেণীর নাথপন্থী, অপর কয়েকজন যোগী, অওঘর ইত্যাদিরও এখানে বাস। মূর্ত্তি তিনটীর অঙ্গে গেরুয়া বসন, শেলীনাদ ও কুণ্ডল পরিহিত। গোরক্ষ মন্দিরের উত্তর পশ্চিমে একটী ধূনী প্রজ্বলিত, কথিত আছে স্বয়ং গোরক্ষনাথ দ্বারা ইহা প্রজ্বলিত হয়। গোরক্ষের পূর্ব্বে কপিলমুনি এই স্থানে সাধনা করিতেন, গোরক্ষের অনুজ্ঞায় তিনি গঙ্গাসাগরের তীরে চলিয়া যান, মন্দির মধ্যে কপিলমুনিরও একটি ক্ষুদ্র শ্বেত প্রস্তরের মূর্ত্তি আছে। গোরক্ষ মন্দিরের বিপরীতে শিব মন্দির আছে, ভৈরব, হনুমান, কালী, মনসা প্রভৃতিও বিদ্যমান। মনসার মন্দিরে মানতের পুঁতি বাঁধা থাকে, মানত পূর্ণ হইলে উহা গোরক্ষনাথকে অর্পণ করা হয়। মন্দির উদ্যানের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে একটি বৃহৎ লাল সমাধি আছে, তদ্ব্যতীত বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাধিতে উদ্যানের কিয়দংশ পূর্ণ। মন্দিরের ভাণ্ডার ঘর, অতিথিগৃহ, মোহান্তর বাসস্থান আদি দেখিয়া ইহাদের অবস্থা মন্দ নহে বলিয়া আমাদের ধারণা হয়। অধুনা বহু মাড়োয়ারী ভক্ত এই স্থানে যাতায়াত করেন ও দক্ষিণাদি দিয়া থাকেন। হুগলী জেলায় ত্রিবেণীর চারি ক্রোশ পশ্চিমে, মহানাদ গ্রামে জটেশ্বর মন্দির ও বশিষ্টগঙ্গা নামে জলাশয় আছে। ইহাও গোরক্ষ ক্ষেত্র। কথিত আছে একটি দক্ষিণাবর্ত্ত শংখ ঐ স্থানে পতিত হইয়াছিল তাতে বায়ু লাগিয়া মহানাদের উৎপত্তি হয়, উহা

শ্রবণ করিয়া দেবতারা তথায় আসিয়া জটেশ্বর মন্দির ও বশিষ্ট গঙ্গা প্রতিষ্ঠা করেন এবং স্থানটীর নাম 'মহানাদ' রাখেন। এইস্থানে নাথপন্থী যোগীর নিবাস আছে, তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী হইতে উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচিত হয়।

৺দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলিয়াছেন ৺কালীঘাটের কালী গোরক্ষনাথ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু ইহা কত দূর সত্য তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে। প্রতাপাদিত্যের সময়ে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়, এইরূপ দলিলাদি পাওয়া গিয়াছে। দিনাজপুরে গোরক্ষকুই, রঙ্গপুরে গোরক্ষ মণ্ডপ আছে, ঐ সকল স্থানে বুদ্ধমূর্ত্তিও দেখা যায়। গোরক্ষপুর, দক্ষিণাপথের অন্তর্গত কাজলী, পেশোয়ার ও দ্বারকায় এই চারি স্থানে নাথপন্থীদের প্রধান তীর্থ। হরিদ্বারের গোরক্ষ সুরঙ্গ, নেপালের পশুপতিনাথও গোরক্ষর নামের সহিত যুক্ত।

সিকিমে—চঙ্গচিলিঙ্গ মঠে যে ত্রিমূর্ত্তি আছে, তন্মধ্যে গোরক্ষমূর্ত্তিই বিশেষ ভাবে সজ্জিত।

নেপালে—পশ্চিম নেপালে গোরক্ষ গুহা আছে, হাঁটু গাড়িয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়, গুহা মধ্যে গোরক্ষনাথের মূর্ত্তি আছে, কথিত আছে গোরক্ষ এই স্থানে বাস করিতেন, সেই জন্য ঐ স্থানের নাম 'গোরখ' ও অধিবাসীদের নাম 'গুর্খা' হইয়াছে।

কাঠ মাণ্ডু অর্থে কাঠ মন্দির, ১৬০০ খৃঃ ঐ স্থানে গোরক্ষের নামে মন্দির স্থাপিত হয়। ইহার চতুষ্পার্শ্বে মৎস্যেন্দ্র-গোরক্ষ সম্পর্কিত বহু মন্দিরাদি আছে। কাঠ মাণ্ডু বা পাটনের তিন মাইল দূরে বাগমতীতে মৎস্যেন্দ্র মন্দির আছে। শিব পশুপতি নাথেরও ঐ স্থানে মন্দির আছে। সাওয়ারী কোটে রতননাথ মঠে একটি প্রস্তরখণ্ড আছে। তন্মধ্যে গোরক্ষ আত্মা বদ্ধ আছে এইরূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। কুমায়ুন ও ঘরওয়াল পাহাড়ে ভৈরবের বহু মন্দির আছে, বিভিন্ন যোগীদের নামের সহিত তাহারা সংশ্লিষ্ট। খৃঃ পূর্ব্ব ২৪৯ অব্দে অশোক তাঁহার কন্যা চারুমতী সহ নেপাল ভ্রমণে যান। চারুমতী পশুপতি নাথ মন্দিরেই তৎপরে বাসারম্ভ করেন, এইরূপ প্রবাদ আছে।[১]

তুলসীপুর—নেপালের অনতিদূরে হিমালয়ের তলদেশে কানফাটা সম্প্রদায়ের 'দেবীপাটান' নামক মন্দির বিদ্যমান। উহা যুক্ত প্রদেশের বলরামপুরের রাজ্যের তুলসীপুরে অবস্থিত। দেবীর ৫১টী পীঠের মধ্যে

১। Monograph of the Religious Sects of India. D. A. Pai p. 62.

দেবীপাটান একটি, এইস্থানে দেবীর দক্ষিণহস্ত পতিত হয়। পত্ ধাতু হইতে 'পাটান' শব্দের উৎপত্তি, দেবীপাটানের আর একটি নাম পাতালেশ্বরী, সীতাদেবীর এই স্থানে নাকি পাতাল প্রবেশ হয়। প্রাচীনতম শৈব মন্দির মধ্যে এই স্থানের মন্দির গণ্য। কর্ণের নামের সহিতও এই স্থান যুক্ত, কর্ণের নামে মন্দিরও আছে। শীতলা ও হোলীর দেবী হুলীকার পূজাও এখানে হইয়া থাকে।

চৈত্র মাসের শেষে দেবীপাটানে বিপুল মেলা বসিয়া থাকে, তখন লক্ষাধিক জনসমাগম হইয়া থাকে। বলরামপুরের রাজারাই এই মেলার পৃষ্ঠপোষক। মেলার উদ্বোধনকার্য্য নেপালের সওয়ারীকোট বা ড্যাং কাংড়ার কানফাটা যোগীদের মঠের মোহন্ত দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। মন্দির হইতে তাঁহার বাসস্থান ষাইট মাইল, এই দীর্ঘ পথ বহিয়া মেলার সময়ে মহাসমারোহে শোভাযাত্রা করিয়া গোরক্ষ-আত্মাবদ্ধ প্রস্তরখণ্ডটী লইয়া যাওয়া হয়। মোহন্তেরা সুসজ্জিত হইয়া তৎসহ গমন করেন ও পথিমধ্যে অর্ঘ্যাদি গ্রহণ করেন। বলরামপুরের রাজমোহন্তেরা বাদ্যসহকারে ইঁহাদের অভ্যর্থনা করেন, দেবী পাটানের মোহন্ত মন্দির সোপানতল হইতে অভ্যর্থনাদি করিয়া ইঁহাদের লইয়া যান। তৎপরে চারি দিবস ধরিয়া পূজাপাঠ, প্রসাদ বিতরণাদি চলে। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে ভক্তদল পরিক্রমা করিতে করিতে আবিষ্ট হইয়া নৃত্য করেন ও দেবীকে কি কি পূজা দিতে হইবে তাহা দেবী কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া বলিতে থাকেন। দেবী মন্দিরের রক্ষক হিসাবে ভৈরববেরও পূজা হয়। পূজা শেষে ভোগ্যাদি ভৈরব সহচর কুকুরদিগকে প্রদান করা হয়।

দেবীপাটান মন্দির ও মঠের অধিবাসীরা হঠযোগে পারদর্শিতার জন্য প্রসিদ্ধ, নয়টী নিস্কর গ্রাম হইতে ইহাদের ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। গোরক্ষের প্রশিষ্য রতননাথ কর্ত্তৃক দেবীপাটানের মন্দির স্থাপিত হয়। রতননাথের পূজা নেপালে হইয়া থাকে; মন্দিরের সম্মুখে নাগরী শিলালিপি আছে, তাহা দ্বারা গোরক্ষের সময় হইতে এই স্থানের মাহাত্ম্য প্রচারিত আছে তাহা প্রমাণিত হয়।

কাশ্মীর শ্রীনগর—শিবাবতার রূপে এস্থানে গোরক্ষের পূজা হয়, একটি গৃহ মধ্যে ছয় ইঞ্চি পরিমিত গোরক্ষ মূর্ত্তি আছে, তদ্ব্যতীত উপস্থিত বিশেষ কিছু নাই, ইহা পূর্ব্বে গোরক্ষ-ক্ষেত্র ছিল এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। অমরনাথ কানফাটাদের বিশেষ তীর্থ, এস্থানে বরফের শিবলিঙ্গ দৃষ্ট হয়।

নৈনিতাল আল্‌মোরা—ধর্ম্মনাথ সম্প্রদায়ভুক্ত যোগীদের এস্থানে বাস, নন্দীদেবীর মন্দিরটী তিনশত বৎসরের প্রাচীন। ভৈরব, পার্বতী, ও গোরক্ষের ত্রিমূর্ত্তিও একটি মন্দির মধ্যে আছে। মন্দির মধ্যে লিঙ্গ পূজাও প্রচলিত, এই মন্দিরের যোগীরা সৎনাথী সম্প্রদায়ের।

'কান' নামক স্থানে আল্‌মোরার পীর বাস করেন, ইনি ধর্ম্মনাথী, কথিত আছে গোরখালীরা আল্‌মোরা জয় করিয়া দুর্গ স্থাপন করে ও মৃত্তিকাতলে প্রাপ্ত অস্থি ও কুণ্ডলাদি কান সহরে প্রোথিত করিয়া যোগীদের জন্য নূতন আশ্রম নির্ম্মাণ করাইয়া দেয়।

হরিদ্বার—গোরক্ষনাথের সহিত হরিদ্বার বিশেষভাবে যুক্ত। এই স্থানের একটি গুহা ও সুরঙ্গ কানফাটাদের নামে প্রচলিত। 'ঐ' পন্থীদের প্রসিদ্ধ মঠ এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত। দরিয়াপন্থ ও দ্বাদশপন্থদের মঠের জন্যও হরিদ্বার প্রসিদ্ধ।

যুক্তপ্রদেশ—চুণারে ভর্ত্তৃহরির দুর্গ আছে। এলাহাবাদের গোরক্ষ পন্থীর জীর্ণপ্রায় প্রতিষ্ঠান ও ভৈরবের মন্দির আছে।

বৃন্দাবন, মথুরা, গোকুল, মান্ত যোগীদের তীর্থ বা থান রূপে গণ্য, ইহারা শিবরাত্রি ও জন্মাষ্টমী পালন করে, বটবৃক্ষ তলে সিদ্ধেশ্বরী দেবীর পূজাও করে। যজ্ঞডুমুর, বট, তুলসী ইহাদের নিকট পবিত্র। (প্রবাসী, 'যোগিজাতি'—চৈত্র ১৩২৯)।

গোরক্ষ ত্রেতাযুগে গোরক্ষপুরে আসেন, মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন ও এই স্থানে দেহরক্ষা করেন এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে আলাউদ্দিন উক্ত মন্দিরটীকে মস্‌জিদে পরিণত করেন, অষ্টাদশ শতাব্দীতে আরঙ্গজেব কর্ত্তৃক পুনর্গঠিত নবমন্দির পুনরায় মস্‌জিদে পরিণত হয়। অবশেষে ১৮০০ খৃঃ বুদ্ধনাথ তৃতীয়বার মন্দির স্থাপিত করেন, ইহা অদ্যাপি পুরাতন গোরক্ষপুর নামে প্রসিদ্ধ ও নূতন গোরক্ষপুরের পশ্চিমে অবস্থিত।

গোরক্ষপুরের গোরক্ষ মন্দির সুসজ্জিত, গদির উপর চরণ রক্ষিত, উহা পুষ্পাদি দ্বারা নিত্য পূজিত হয়। গোরক্ষ প্রজ্বলিত একটি প্রদীপ অদ্যাপি মন্দির মধ্যে জ্বলিতেছে দেখিয়াছি। মন্দিরের পশ্চিমে কালীমূর্ত্তি ও সম্মুখে লিঙ্গ স্থাপিত আছে। ভৈরব এই মন্দিরের প্রহরী, প্রত্যহ তিনবার পূজা হয়। আঙ্গিনা মধ্যে বিভিন্ন সমাধি ও গম্ভীরনাথজীর মন্দির আছে। দক্ষিণে হনুমান, উত্তরে পশুপতি নাথের

মন্দির। পূর্ব্বদিকে তৃণাচ্ছাদিত গৃহমধ্যে গোরক্ষ-ধুনি জ্বলিতেছে, মন্দিরোদ্যানে বহু সমাধি দৃষ্ট হয় তথায় নিত্য সন্ধ্যাদীপ জ্বালা হয়। মন্দির-আঙ্গিনার বাহিরে ভীমের প্রকাণ্ড শায়িত মূর্ত্তি আছে। গোরক্ষপুরে ভৈরব ও বালাসুন্দরীর (সম্ভবতঃ শাক্তদের ত্রিপুরাসুন্দরী?) পূজা হয়।

গোরক্ষপুরের মঠ স্বয়ং গোরক্ষ-কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। মোহন্ত-নির্ব্বাচন পূর্ব্ব মোহন্ত দ্বারা হয়, অন্যথা জনসাধারণের মতানুযায়ী হয়। বালকবালিকাদের নষ্ট স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত এই স্থানের মোহন্তদের পূজা বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। এই মঠের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ আটটী গ্রাম দেবোত্তর সম্পত্তিরূপে আছে। গোরক্ষ-মঠের মোহন্ত ৩৬০টী বিভিন্ন মঠের স্বত্বাধিকারী হইলেও নিকটবর্ত্তী তুলসীপুরের মঠের উপর তাঁহার অধিকার নাই, মোহন্ত ধর্ম্মনাথ-সম্প্রদায়ের।

বারাণসী—এ স্থানে ভৈরবের লাঠ, কালভৈরবের মন্দির ও সহর হইতে কিছু দূরে গোরক্ষের টিলা অবস্থিত। কানফাটাদিগের আশ্রমের এখানে ধ্বংসোন্মুখী অবস্থা—টিলার পুথি, মূর্ত্তি প্রভৃতি অপহৃত হইয়াছে, সন্ধান করিয়াও আমি কোন পুথি পাই নাই। মন্দিরটী পাহাড়ের উপর অবস্থিত ও মন্দির-মধ্যে প্রস্তরে অঙ্কিত জালন্ধরিনাথের চরণ আছে, প্রধান মন্দিরের পূর্ব্বদিকে চারিটি ক্ষুদ্র মন্দির আছে, তন্মধ্যে একটিতে গোরক্ষ-চরণ আছে।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে বারাণসীতে ১৫৯ জন কানফাটা যোগী ছিল, তন্মধ্যে ৬৩টী যোগিনী ছিল। তাহারা টিলা ও কালভৈরবের মন্দিরে বাস করিত।

পেশোওয়ার—এই স্থানে 'গোরক্ষক্ষেত্র' নামে কানফাটা যোগীদের আশ্রম ছিল, ইহার বৃত্তান্ত বাবর ও আবুল ফজলের বর্ণনায় পাওয়া যায়। পেশোওয়ারের 'রতননাথ' যোগী বিখ্যাত ছিলেন, তিনি কর্ণে কুণ্ডল ধারণ করিতেন না, বলিতেন উহা তাঁহার হৃদয়ে লুক্কায়িত আছে। কোহাট, জালালবাদ ও কাবুলে নাথ যোগীদের মন্দির আছে। সেয়ালকোটে গোরক্ষের শিষ্য পুরাণ ভাগতের নামে একটা প্রসিদ্ধ কূপ আছে। পালামপুরের নিকট যে গোরক্ষ মন্দির আছে, সেই স্থান-সম্বন্ধে কিংবদন্তী যে, গোরক্ষনাথ ঐ স্থান হইতে অদৃশ্য হইয়া যান, তাই মন্দিরের নাম 'বিরাগলোক' অর্থাৎ বৈরাগীর অলোপ। মন্দিরমধ্যে গুগা, গোরক্ষ প্রভৃতির অশ্বারোহী মূর্ত্তি আছে।

লাহোর—এই স্থানে 'ঐ'-পন্থের মঠ, সমাধি ও শিবমন্দির আছে।

অমৃতসহর—ইহা 'দ্বাদশপন্থী'দের মিলনক্ষেত্র। এই স্থানে শিবের মন্দির আছে।

অম্বালা—এই স্থানে গুগা ও গোরক্ষের মন্দির আছে। প্রবাদ যে গুগা গোরক্ষের শিষ্য ছিলেন।

রোটাস—রোটাস দুর্গ সন্নিকটে কালনাথ যোগীদের আশ্রম ছিল।

কিরাণা—এই স্থানে অওঘর যোগীদের মঠ আছে। এখানকার 'পীর' একবার নির্ব্বাচিত হইয়া গেলে আর পাহাড়ের নিম্নে নামিতে পারেন না।

টিলা—পাঞ্জাবে গোরক্ষ-সম্প্রদায়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মঠ ঝিলামের ২৫ মাইল দূরে অবস্থিত, ইহার নাম 'গোরক্ষ টিলা', ইহার উচ্চতা ৩,২৪২ ফুট, পর্ব্বতগাত্র অমসৃণ ও দুরারোহ, এই স্থান হইতে হিমালয়ের দৃশ্য অতীব মহান্। এই টিলা বহুপুরাতন তীর্থবিশেষ। বাল্মীকি-কন্যার বিবাহ-বর্ণনায় টিলার উল্লেখ পাওয়া যায়। গোরক্ষের নিকট রঞ্জ এই টিলামধ্যে দীক্ষা নেন। চৈত্রমাসে টিলায় মেলা হয়। সম্রাট আকবর এই টিলার ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ কয়েকটি গ্রাম অর্পণ করিয়া যান।

সিন্ধুদেশ—করাচী হইতে ৭০ মাইল দূরে মাকলী পাহাড়ের উপত্যকা-ভূমিতে হিংলাজ-তীর্থপথে 'নগর ঠঠ' নামক স্থানে ঠুমরা নামক এক প্রকার শ্বেতপ্রস্তরের পুঁতি সংগ্রহ করা নাথপন্থীদের অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। এই স্থানে পার্ব্বতী শিবাদেশে খেচরান্ন প্রস্তুত করেন, কিন্তু অসুর-হত্যার ফলে উহা রক্তকলুষিত হওয়ায়, পার্ব্বতী উহা ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করেন,—ফলে চাউল হইতে যে ছোট ছোট প্রস্তর হয় তাহার নাম 'হিংলাজ' বা 'ঠুমরা' ও ডাইল হইতে তাহা অপেক্ষা সামান্য বড় যে প্রস্তর হয় তাহার নাম 'আশাপুরী'। উভয় পুঁতিই যোগীরা সাদরে ধারণ করেন।

বেলুচীস্থান—মকরান-কূলে হিংলাজতীর্থ, ইহা সিন্ধুনদীর উৎপত্তির স্থান হইতে ৮০ মাইল দূরে। হিঙ্গুল-নদীর তীরে হিংলাজ পাহাড়ের নিম্নে মন্দির আছে, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ম্যাসেন সাহেব পর্ব্বতগাত্রে চন্দ্র ও সূর্য্যের প্রতীক অঙ্কিত থাকিতে দেখেন।[১] ৫১টি দেবীর পীঠের

১। ব্রীগস্, পৃ ১০৬। E. R. E., Vol. VI, p. 715. গোল্ডস্মিথ সাহেবও ১৮৬১ খৃঃ উক্ত চিহ্ন দেখেন।

মধ্যে হিংলাজ অন্যতম, ইহা অতি পুরাতন তীর্থ, যোগীদের বিশ্বাস হিংলাজের তীর্থ না করিলে যোগসিদ্ধ হওয়া যায় না। মুসলমানেরাও এখানে আগমন করে ও পার্ব্বতীদেবীকে 'বিবি নানী' বলে। খৃঃ পূঃ ৩০০০ অব্দেও 'নানী দেবী' পূজিত হইতেন, গঙ্গা হইতে ইউফ্রেটীস পর্য্যন্ত তাঁহার পূজা প্রচলিত ছিল। সমগ্র ভারতে এই দেবীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হইত।

কোটেশ্বর—হিংলাজ-তীর্থ এক্ষণে মুসলমানের অধিকারে বলিয়া তথা হইতে প্রত্যাগমনকালে গোরক্ষনাথীরা দক্ষিণ বাহুতে 'যোনিলিঙ্গ' অঙ্কিত করিয়া হিন্দুত্ব প্রতিপন্ন করেন। করাচীর অনতিদূরে কোটেশ্বর নামক স্থানে শিবমন্দিরে এই চিহ্ন-কার্য্য সমাধা করা হয়। এই চিহ্নটী এইরূপ ৬, এই নিবন্ধের প্রথম পৃষ্ঠার চিত্রে উহা দেখান হইয়াছে।

কচ্ছপ্রদেশ—এই স্থানে ধীনোধরের দ্বিতল মঠই প্রসিদ্ধ। পর্ব্বতোপরি জঙ্গলবেষ্টিত মন্দিরের মধ্যে ধর্ম্মনাথের প্রস্তরমূর্ত্তি রক্ষিত আছে, পর্ব্বতটী ১,২৬৪ ফুট উচ্চ, ইহাতে আরোহণ কষ্টসাধ্য। ধীনোধর অর্থে 'সহিষ্ণুতার ধারক', ধর্ম্মনাথ দ্বাদশ বৎসর মস্তকোপরি দণ্ডায়মান হইয়া এই স্থানে প্রায়শ্চিত্ত করেন, তাই ধীনোধর ধর্ম্মনাথের পাপ ও অনুতাপের ভার ধারণ করিয়াছে। ধর্ম্মনাথ ১৩৮২ খৃষ্টাব্দে পেশোওয়ার হইতে কচ্ছপ্রদেশে আসিয়া মঠ স্থাপন করেন।

কাঠিওয়াড়—ইহার বহুস্থান গোরক্ষনাথের সহিত যুক্ত। কথিত আছে ইহার পাহাড় গোরক্ষনাথের প্রিয় আবাসস্থল ছিল। এই স্থানে 'গোরক্ষমণ্ডী' প্রসিদ্ধ, গুহামধ্যে মৎস্যেন্দ্র ও গোরক্ষের মূর্ত্তি আছে।

বোম্বাই—সাতপুরা, সাতারা প্রভৃতি স্থান গোরক্ষের সহিত যুক্ত, পায়েধুনী যোগীদের পুরাতন আবাসস্থল। এই স্থানের মন্দিরের ভার কানফাটা যোগীদের উপর ন্যস্ত। পায়েধুনীতে চরণ বা পা আছে। গণেশপুরী নামক স্থানে বহু উষ্ণ প্রস্রবণ আছে, তাহার একটির নাম 'গোরক্ষমচ্ছিন্দর'। এই স্থানে দুইটী দুর্গ আছে, তাহাদের নাম 'গোরক্ষগড়' ও 'মচ্ছিন্দরগড়'। নিকটবর্ত্তী গুহাগুলিতে প্রাচীনকাল হইতে বসবাসের নিদর্শন আছে।

রাজপুতানা—একলিঙ্গজীর মন্দিরের সহিত বাপ্পারাও ও কানফাটা যোগীদের নাম যুক্ত। সকল শ্রেণীর কানফাটা যোগী এই স্থানে বাস করে। মন্দিরের অধিকারীর নাম 'গোঁসাই', তিনি ললাটে রক্তবর্ণ

শিব-চিহ্ন ধারণ করেন, ইহার অধীনে বহু কানফাটা যোগী আছে। উজ্জয়িনীতে একটী গুহামধ্যে গোপীচাঁদ ও গোরক্ষের মূর্ত্তি আছে, মৎস্যেন্দ্রের চরণও ঐ স্থানে বিদ্যমান। গুহার ঊর্দ্ধদিকে একটী সুড়ঙ্গ-মুখ আছে, উহার দ্বারা বারাণসী পর্য্যন্ত গমন করা যায়—এইরূপ জনশ্রুতি।

উড়িষ্যা—পুরীতে কানফাটাদের সৎ-নাথী সম্প্রদায়ের যোগীদের ক্ষুদ্র মঠ ও মন্দির আছে। মোহন্তের পরিধানে কন্থার বস্ত্র, এবং তিনি টুপী ও তৃণনির্ম্মিত বস্ত্রাচ্ছাদিত 'সুদর্শন'নামক গদা ধারণ করেন, ইহাই তাঁহার বিশেষত্ব।

দাক্ষিণাত্যে—আমেদাবাদের উত্তরে গোরক্ষনাথের নামে পর্ব্বতশ্রেণী আছে।

ভারতের বহু স্থানে গোরক্ষনাথের নামে যোগাশ্রম আছে। তন্মধ্যে গোণ্ডা জিলায় পাটেশ্বরী, গোরক্ষপুর, মহারাষ্ট্রপ্রান্তে ওড্যা, ভোগমতী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। (কল্যাণ সন্ত অঙ্ক, পৃ ৪৭৯)।[১]

নাথ-সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতা

যোগীরা প্রধানতঃ শৈব, কিন্তু ধীনোধরের মঠে ধর্ম্মশালায় বিষ্ণুমূর্ত্তি আছে। গোরক্ষমন্দিরের সহিত হনুমান, রামচন্দ্র, কালী প্রভৃতিরও মন্দির দেখা যায়।

বঙ্গদেশে গোরক্ষ, মৎস্যেন্দ্র, হাড়িপা প্রভৃতিকে বৌদ্ধ যোগী বলা হয়। নেপালে মৎস্যেন্দ্র অবলোকিতেশ্বরের অবতাররূপে পূজা পান। নবনাথ ও ৮৪ সিদ্ধার পূজাও নাথযোগীরা করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে গোরক্ষের পূজাই প্রধান এবং শিব আদিনাথরূপে মান্য। কানফাটা যোগীরা মৎস্যেন্দ্র ও গোরক্ষের পূজা করেন, এমন কি সন্তরাও তাঁহাদের নমস্য বলিয়া গিয়াছেন।

হিংলাজদেবী যোগীদের উপাস্য, মন্দিরটী এক্ষণে মুসলমানদের অধিকারে।

শিবকেই নাথযোগীরা ভৈরব, কালভৈরব, নন্দভৈরব, একলিঙ্গ প্রভৃতি নানামূর্ত্তিতে পূজা করিয়া থাকেন। ভৈরবমূর্ত্তি শৈব ও শাক্ত

(১) এই বিবরণ বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্রিকা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। দমদম, কাশী, গোরক্ষপুর ইত্যাদি স্বয়ং দর্শন করিয়াছি

উভয়ের উপাস্য। কালভৈরবের মূর্ত্তি শ্রেষ্ঠ। গোরক্ষ-সম্প্রদায়ের গ্রন্থ 'সিদ্ধসিদ্ধান্ত-সংগ্রহে' ভৈরবের 'অষ্টমূর্ত্তি'র নাম আছে। যথা—

শিবাদ্ ভৈরব এতস্মাৎ শ্রীকণ্ঠোঽহতঃ সদাশিবঃ।
ঈশ্বরোঽস্মাদ্রুদ্র আসীত্ততো বিষ্ণুস্ততো বিধিঃ॥১।৩

নাথপন্থীরা শিব ও গোরক্ষ উভয়েরই পূজা করেন, ইঁহাদের মন্দিরে পশুবলিও প্রচলিত। নাথপন্থীরা যোগী নামে প্রসিদ্ধ ও ইন্দ্রজাল-প্রদর্শনে সিদ্ধ।[১]

সাধারণতঃ কাপালিকেরা ভৈরবের পূজা করেন। "প্রবোধচন্দ্রোদয়ে" ইহার বর্ণনা আছে। "গোরক্ষসিদ্ধান্ত-সংগ্রহে" (পৃ ১৮) নাথ-দ্বারা কাপালিক পন্থা প্রবর্ত্তিত হইবার কথা আছে।

ভৈরবের মূর্ত্তিতে অষ্ট হস্ত ও মুণ্ডমালা, সর্পের অনন্ত ও কুণ্ডল দৃষ্ট হয়। কৃষ্ণকুকুর-বাহন ভৈরবমূর্ত্তিও দেখা যায়। কাশীর শিবমন্দিরের প্রহরী ভৈরব, সমগ্র কাশীধামের ভারও তাঁহার উপর ন্যস্ত। পাঞ্জাবের প্রতি সহরে ভৈরবের মন্দির আছে। দেবীপাটানে ভৈরবের পূজান্তে কুকুরদের প্রসাদ-বিতরণের রীতি আছে, কারণ শ্বাই ভৈরবের সহচর।

কানফাটাদের মধ্যে অম্বা ও জগদম্বা-পূজা প্রচলিত আছে। তিনি শিবের শক্তি, তাঁহার জননক্রিয়া ও যোগীর সিদ্ধিলাভের সহায়রূপ দুইটী ক্রিয়া আছে। তন্ত্রশাস্ত্রে দেহস্থ চক্রসাধনে প্রতিচক্রের অধিষ্ঠাতা দেবের সহিত দেবীরও উল্লেখ আছে। নাথ-সম্প্রদায়ের সাধনে কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ একটী প্রধান অঙ্গ। এই কুণ্ডলিনী 'পিণ্ডসংসিদ্ধিকারণী, পুরুষের নিবৃত্তি উদ্যমরূপিণী' এবং শক্তিরূপা। অর্থাৎ কুণ্ডলিনী শক্তি মানবের দেহরক্ষায় সিদ্ধিদাত্রী এবং পুরুষের নিবৃত্তিমার্গের সহায়স্বরূপ। নবচক্রসাধনে নাথগণ কুণ্ডলিনীকে একমাত্র সহায় বলিয়া জানেন।[২]

নাথদিগের মহাপীঠস্থান কামাখ্যা, সেখানে দেবীর পূজা হয়। সপ্তম শতাব্দীতে হিউ-এন-সাং এই তীর্থ দর্শন করেন। মহাভারতে কামরূপ-রাজধানীর উল্লেখ আছে।

শক্তিপূজার প্রণালী দ্বিবিধ—দক্ষিণাচার ও বামাচার, বামাচারে পঞ্চমকার-সাধনা আছে, দক্ষিণাচারে তাহা নাই। কাপালিকেরা

(১) Monograph of the Religious Sects of India. Pai. p. 70.
(২) সি. সি. প. ৪।১৮।২০, নিবন্ধের পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

বামাচারী, দুর্গাপূজা, চক্রপূজা তাহাদের সাধনা।[১] কানফাটাদের মধ্যে যোনি ও লিঙ্গপূজা এবং শ্রীচক্রপূজা প্রভৃতি আচার রহিয়াছে। শ্রীযন্ত্রের পূজারী দেবীর সহিত একাত্মা হইয়া আত্মোপলব্ধি করেন। নাথপন্থের অনুমোদিত গ্রন্থে পঞ্চমকার-সাধনের ইঙ্গিত নাই, ইঁহারা শক্তির উপাসক হইলেও মাতৃকা বা মন্ত্রের উল্লেখ ইঁহাদের সাধনে নাই। সহজোলী প্রভৃতি কয়েকটী মুদ্রাসাধন ইঁহাদের মধ্যে প্রচলিত থাকিলেও, স্পষ্টতঃ শক্তি লইয়া সাধনার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না, তবে অনুরূপ সাধকসম্প্রদায়ের মধ্যে এই সকল মুদ্রাসাধনে স্ত্রীলোকের উপস্থিতি ও সঙ্গ অনিবার্য্য ছিল। ভৈরবীচক্রে শক্তি-সাধনার সহিত তিব্বতী yab-yum বা যুগনদ্ধরূপ পূজা তুলনীয়।

---

(১) Shakti & Shakta (2nd Ed.), p. 89.

নবম পরিচ্ছেদ

মৎস্যেন্দ্র ও গোরক্ষনাথাদি-সম্পর্কিত কয়েকটি স্থানের নির্দ্দেশ

অধুনা বহুশতাব্দী পরে সুনিশ্চিতভাবে কোন স্থানের নির্দ্দেশ সম্ভবপর নহে, তথাপি নিম্নলিখিত স্থান কয়টীর নির্দ্দেশের চেষ্টা করিতেছি :—

পূর্ব্বদেশ—ষোড়শ শতাব্দীর ভোটিয়া গ্রন্থ রত্নাকরজোপমে মীননাথ ও মৎস্যেন্দ্র পূর্ব্বদেশের লোক ছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কথিত আছে পূর্ব্বদেশে লৌহিত্য নদীতে মীননাথের পুত্র 'মৎস্যেন্দ্র' দ্বাদশ বৎসর মৎস্যোদরে বাস করেন, পিতা ও পুত্র উভয়েই কৈবর্ত্ত ছিলেন (গঙ্গা-পুরাতত্ত্বাঙ্ক, পৃ ২৪৩-৪৪)। কামরূপের প্রধান নদী ব্রহ্মপুত্র 'লোহিত' নামে পরিচিত, এই দেশের অধিবাসী-রূপে মৎস্যেন্দ্রের নাম লোহিতপা ও ক্রমশঃ লুইপা হওয়া বিচিত্র নহে। অতএব 'পূর্ব্বদেশ' যে কামরূপে ছিল, এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হয় না।

নাথমহাশয়ের মতে বৌদ্ধসহজিয়া লুইপাদ-মৎস্যেন্দ্রের জন্মস্থান কামরূপের নগাঁও জিলার হোজাই অঞ্চলে। (কদলীরাজ্য, পৃ ৪০)। মৎস্যেন্দ্র বা মীননাথ কদলীদেশের অধিপত্নীর মোহপাশে আবদ্ধ হইয়া যোগধর্ম্ম ভুলিয়া যান, বঙ্গীয় গীতিকাব্যে বারবার এই কথার উল্লেখ পাই। এই কদলীদেশ কোথায় ?

কদলীদেশ—এই কদলীদেশ স্ত্রী-স্বাধীনতার দেশ বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহার বর্ণনা যথা—

> এস্থানে স্ত্রীরাজা স্ত্রীপ্রজা স্ত্রী রাজ্যের দেওান।
> নারী বিনে নাহি রাজ্যে পুরুষের ত্রাণ ॥
>
> (গোপী-সন্ন্যাস, ভট্টশালী, পৃ ১৫)

এই কদলীরাজ্যের অবস্থিতি-সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত আছে, যথা :—

(ক) ভট্টশালী-মতে উহা কামরূপ, মণিপুর, ব্রহ্মদেশ।[১]

(খ) শহীদুল্লাহ্-মতে উহা কাছাড় জিলায়।[২]

---

(১) ময়নামতীর গান, ভট্টশালী-সম্পাদিত, পৃ ১২২ পাদটীকা।

(২) Les chantes Mystiques, p 27.

(গ) চাকলাদার-মতে উহা উত্তর পশ্চিম সীমান্তে।[১]

(ঘ) (রাজমোহন) নাথ-মতে উহা কামরূপের নগাঁও জিলায়।[২]

তারানাথের গ্রন্থে আছে কান্‌ফাসিদ্ধা কদলী যাওয়ার পথে বঙ্গদেশে গুরু বালপাদ বা হাড়িসিদ্ধাকে মৃত্তিকা-মধ্য হইতে উদ্ধার করেন। গোরক্ষ-বিজয় গ্রন্থে আছে কান্‌ফা যোগী কামরূপ, পাটন, লঙ্কাপুরী ও ডাহুকা হইতে ফিরিবার পথে বকুলেতে গোরক্ষনাথের সহিত সাক্ষাৎ করেন। গোরক্ষ গুরুর উদ্ধারার্থ বকুল হইতে কদলীদেশে গমন করেন। প্রাচীনকালে বঙ্গের কিয়দংশ কামরূপের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কামরূপের সন্নিহিত ভূভাগ 'কদলীর দেশ' নামে পরিচিত ছিল। মহা-ভারতের বনপর্ব্বে ও যোগিনীতন্ত্রের উত্তরখণ্ডে কদলীবনের উল্লেখ আছে।[৩] বর্ত্তমানেও কামরূপের নগাঁও জিলায় 'কদলী' নামে একটী মৌজা আছে এবং সেই মৌজার নিকটবর্ত্তী স্থানে হাজার হাজার নাথ-যোগীর বাস আছে। কদলী পর্ব্বতে বাদুড়-পূর্ণ 'বাদুলী কুরুং' নামে গুহা আছে।[৪] সুতরাং প্রাচীন কদলীর দেশ বর্ত্তমান নগাঁও জেলাব 'কদলী' হওয়া বিচিত্র নহে। গীতিকাব্যে আছে গোরক্ষনাথ গুরু উদ্ধাব করিয়া কদলী-রমণীদের বাদুড় হইয়া বৃক্ষে ঝুলিয়া থাকিবার অভিশাপ দেন, নগাঁওবাসীরা বাদুড়কে বান্দুলী বা বাদুলী বলে, সংস্কৃত—বাতুলি। 'বাদুলী কুরুং'এর অসংখ্য বাদুড় হইতেই কি ষোলশত অভিশপ্ত রমণীর বাদুড় হইয়া যাইবার কল্পনা করা হইয়াছে ?

কান্‌ফা কামরূপ হইতে পাটন ও তথা হইতে লঙ্কাপুরী গিয়া-ছিলেন। বর্ত্তমান গৌহাটির কুড়ি মাইল পূর্ব্বদিকে 'পাটন' নামক গ্রাম এবং ৯৫ মাইল পূর্ব্বে 'লঙ্কা' মৌজা আছে। এই লঙ্কার সন্নিকটে হোজাই, বকুলিয়া প্রভৃতি স্থানে অদ্যাপি বহু ভগ্ন মন্দির আছে। নাথমহাশয় অনুমান করেন এই 'হোজাই' বৌদ্ধতান্ত্রিকদের উড্ডিয়ান বা ওড্ডিয়ান। গৌহাটির উত্তরে বর্ত্তমানকালেও 'উদীয়ানা' নামে একটী গ্রাম আছে।[৫]

বিজয়নগর—গোরক্ষ-বিজয় গ্রন্থে আছে গোরক্ষ 'বিজয়নগর ছাড়ি বকুলেতে য়াইলা'। বর্ত্তমান বিজনীরাজ্যের অন্তর্গত গোয়ালপাড়া

---

(১) Social Life in Ancient India—pp. 59, 60. 'কদলীরাজ্যে' উল্লেখ।
(২) কদলীরাজ্য—পৃ ৩৮।
(৩) গোপীচন্দ্রের গান—২য় খণ্ড, পরিশিষ্ট, পৃ ১০১ 'ভৌগোলিক সংস্থান'।
(৪) কদলীরাজ্য—রাজমোহন নাথ, পৃ ৩৫-৩৭।
(৫) ঐ —পৃ ২৭, ৩১।

অঞ্চলে গোরক্ষ-পর্ব্বত, যোগিগুম্ফা ইত্যাদি স্থান আছে। সম্ভবতঃ এই অঞ্চলেই পূর্ব্বে 'বিজয়নগর' ছিল।[১]

ওড্ডিয়ান, লঙ্কাপুরী, জাহোর—তিব্বতীমতে সিদ্ধাচার্য্য লুইপা প্রথম জীবনে সামন্তশোভা নামে পরিচিত ছিলেন ও ওড্ডিয়ান-নৃপতি ইন্দ্রভূতির কর্ম্মচারী ছিলেন।[২] ওড্ডিয়ানে তিনি বাঙ্গালী শবরীপাদের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।[৩] ওড্ডিয়ান এক সময়ে বৌদ্ধতান্ত্রিকদের একটী প্রধান পীঠস্থান ছিল। যাদুবিদ্যার জন্য ওড্ডিয়ান খ্যাত ছিল। ওড্ডিয়ান-রাজকুমারী লক্ষ্মীঙ্করা ও তাঁহার ভ্রাতা ইন্দ্রভূতি উভয়েই যাদু-বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন এবং পরে উভয়েই ৮৪ সিদ্ধার তালিকায় স্থান পাইয়াছিলেন।

এই ওড্ডিয়ানের অবস্থিতি-সম্বন্ধেও বিভিন্ন মতামত আছে :

(ক) শাস্ত্রী-মতে উহা উড়িষ্যায়। ভট্টাচার্য্য-মতে উহা আসামে।

(খ) লেভি-মতে উহা উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের সোবাট উপত্যকায়।

(গ) (নলিনী) দাসগুপ্ত-মতে উহা বঙ্গদেশে।

কথিত আছে ওড্ডিয়ানের রাজা ইন্দ্রভূতি জাহোরের রাজকন্যাকে বিবাহ করেন এবং লঙ্কাপুরীর যুবরাজ ওড্ডিয়ান-রাজকুমারী লক্ষ্মীঙ্করাকে বিবাহ করেন। অতএব ওড্ডিয়ান, জাহোর ও লঙ্কাপুরী একই অঞ্চলে অবস্থিত বলিয়া ভট্টাচার্য্যমহাশয়ের অনুমান।[৪] কামরূপ বা কামাখ্যা অদ্যাপি যাদুবিদ্যার জন্য প্রসিদ্ধ, সেই নিমিত্ত ভট্টাচার্য্যমহাশয় ওড্ডিয়ান রাজ্য আসামে ছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ভট্টাচার্য্যমহাশয়ের পিতা শাস্ত্রীমহাশয় 'তন্ত্রসার' গ্রন্থের পীঠস্থানের নাম হইতে ওড্ডিয়ানকে উড়িষ্যা বলিয়াছেন। কিন্তু তন্ত্রসারের উড্ডীশ নামটী উড়িষ্যার এবং উড্ডিয়ান পৃথক্ ভাবে উল্লিখিত থাকায়, ওড্ডিয়ান উড়িষ্যায় হইতে পারে না।

চীনদেশের গ্রন্থ হইতে সোবাট উপত্যকায় ওড্ডিয়ানের অবস্থিতি-সম্বন্ধে জানা যায়। লেভির মতামত উল্লেখ করিয়া বাগচীমহাশয় তাহার বিশদ বিবরণ দিয়াছেন।[৫] কিন্তু প্রশ্ন হওয়া স্বাভাবিক যে ওড্ডিয়ান উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের সোবাট উপত্যকায় অবস্থিত হইলে

১। কদলীরাজ্য—পৃ ৩৮।
২। Studies in the Tantras—Bagchi, p. 39
৩। কদলীরাজ্য, পৃ ১১।
৪। সাধনমালা—দ্বিতীয় ভাগ, ভূমিকা পৃ ৩৮।
৫। Studies in the Tantras. p. 38

জাহোর ও লঙ্কাপুরী কোথায়? ওড্ডিয়ান-রাজকর্ম্মচারী লুইপা বাংলা ভাষায় পদ রচনা করিলেন কিরূপে? বাগচীমহাশয় জানাইয়াছেন—ওড্ডিয়ান-নৃপতি ইন্দ্রভূতি জাহোর ও তথায় অবস্থিত লঙ্কাপুরী নামে একটী সমাধি-দর্শনে গমন করেন। এই জাহোর কাশ্মীর ও নেপালের সীমান্তে অবস্থিত। ভট্টাচার্য্যমহাশয় সাধনমালার ভূমিকায় ঢাকার সাভারকে জাহোর বলিয়া স্থির করিয়াছেন, আবার নিজেই বলিয়াছেন লঙ্কাপুরী আসামের 'লঙ্কা' হইলে, ওড্ডিয়ান তাহার সন্নিকটে হইবে। নাথমহাশয় অধ্যাপক জেকবির উল্লেখ করিয়া আসামের লঙ্কাকে লঙ্কাপুরী স্থির করিয়াছেন এবং তাহার সন্নিকটে জাহোর দেশ ছিল বলিয়াছেন। লঙ্কার সন্নিকটে বর্ত্তমান হোজাই অঞ্চল তাঁহার মতে প্রাচীন ওড্ডিয়ান।[১] দাসগুপ্তমহাশয় অনেক যুক্তির দ্বারা ওড্ডিয়ান বঙ্গদেশে অবস্থিত ছিল বলিয়া প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছেন।[২] কিন্তু লুইপার জন্ম বঙ্গদেশে এবং প্রথম কর্ম্মস্থল ওড্ডিয়ানে এই প্রবাদই প্রচলিত, তাঁহার জন্ম ওড্ডিয়ানে এ কথা ৮৪ সিদ্ধার ইতিহাস হইতে নাথমহাশয় উদ্ধৃত করিয়াছেন। অতএব ওড্ডিয়ানের উপস্থিতি বঙ্গদেশে একথা প্রমাণ করিবার সার্থকতা নাই।[৩] সিদ্ধদের জন্মস্থান-সম্বন্ধে কিংবদন্তীরও বিশেষ মূল্য নাই, কারণ যখন যে দেশে যে সিদ্ধা প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন, তাঁহার জন্মস্থানের নির্দ্দেশও সেখানে করিবার চেষ্টা হইয়াছে, এরূপ উদাহরণ সর্ব্বত্রই দেখা যায়। বুদ্ধদেব মগধ-কোশলের বাহিরে কোথাও যান নাই, কিন্তু পরবর্ত্তী বৌদ্ধ সাহিত্যে তাঁহার বঙ্গদেশ-ভ্রমণের কথা পাওয়া যায়। অতএব জন্মস্থান-সম্বন্ধে কিংবদন্তীও এই আলোকে গ্রহণ করিতে হইবে। লুইপাদের জন্মস্থান 'বরণা বঙ্গদেশে' তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী এক অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে, ভোটিয়া-গ্রন্থ-মতেও তিনি পূর্ব্বদেশের লোক, এ কথাও এই অধ্যায়ের প্রথমেই উল্লিখিত হইয়াছে। প্রবাদ আছে তিনি ওড্ডিয়ানে রাজকার্য্য করিতেন অতএব বাঙ্গালী লুইপা ওড্ডিয়ানের রাজকর্ম্মচারী হইলেও তাঁহার পক্ষে বাংলায় পদ-রচনা অসম্ভব ব্যাপার নহে। নাথযোগীরা ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিতেন ইহাও সুবিদিত। গোরক্ষবিজয়ে (পৃ ১৫) আছে "পশ্চিমে গেলেন গোর্খ, উত্তরে মিনাই" তুলনীয়—গোপীচন্দ্রের পাঁচালী (পৃ ৩৯৪) "পশ্চিম কুলের যোগী গোরক্ষনাথ"।

১। কদলীরাজা, পৃ ১৮-৩১। ২। I. H. Q, XI, p. 192
৩। কদলীরাজা, পৃ ১১।

কামলাক গৌড়ের সহর

রাজা গোপীচন্দ্রের জন্ম গৌড়বঙ্গদেশে। গোপীচন্দ্রের পৈত্রিক দেশ ত্রিপুরা জিলায়, তিনি সেখান হইতে গৌড়, কামলাক ইত্যাদি যাইবার কথা বলিতেছেন এই উল্লেখ গোপীচন্দ্রের গানে (পৃ ৩২৫) পাওয়া যায়। এই গৌড় প্রাচীন শ্রীহট্ট, উহা উত্তরবঙ্গের রাজধানী গৌড় নহে এবং কামলাক বর্ত্তমান কুমিল্লা। অদ্যাপি কুমিল্লায় ময়নামতীর পাহাড় ইত্যাদি বর্ত্তমান। বঙ্গদেশের বাহিরে যে সকল কাহিনী প্রচলিত আছে তাহাতেও গোপীচন্দ্রের জন্মস্থান গৌড়বঙ্গে বলা হইয়াছে, পদ্মপুরাণে শ্রীহট্ট-গৌড়ের উল্লেখ আছে।[১] অতএব মৎস্যেন্দ্রের আদিনিবাস ও প্রচারস্থল বঙ্গদেশে এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত বোধ হয় না। তবে গোরক্ষনাথের জন্মস্থান অদ্যাপি রহস্যাবৃত। পরবর্ত্তী কালের বিভিন্ন প্রবাদের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া তাঁহার বৃত্তান্ত নবনব রূপ ধারণ করাতে পূর্ব্ব কথা সকলে বিস্মৃত হইয়াছে। ইহার একমাত্র কারণ গুরু অপেক্ষা শিষ্যের প্রসিদ্ধি; এবং সম্ভবতঃ অজ্ঞাতকুলশীলে তাঁহার জন্ম। এই নিমিত্ত তাঁহাকে ঈশ্বর-সন্তান বলা হইয়াছে।[২]

ডাড়ার সহর

গোপীচন্দ্রের পাঁচালীতে (পৃ ৩৮৯) পাই মীননাথ কদলীর দেশে, কানুপা ডাড়ার সহরে ও হাড়িপা গৌড় সহরে যাইবার অভিশাপ পান, কেবল গোর্খনাথের ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম লইবার কথা। এই ডাড়ার সহর কি রাঢ় বা বর্ত্তমান বাংলাদেশের পশ্চিমাংশের কোন সহর? প্রবাদ আছে হাড়িপার জন্ম সিন্ধুদেশে, বুঝান খণ্ডের (পৃ ৬১) ময়নামতী বলিতেছেন:

> এমন কথা না বলিও বেটা হাড়ি জ্যান না শোনে।
> মহাশাপ দিবে সিদ্ধা হাড়ি মরুবু আপনে॥
> এ দেশিয়া হাড়ি নয় বঙ্গদেশে ঘর।
> চাঁদ সুরজ রাখছে দুই কানের কুণ্ডল॥

এই বঙ্গদেশ অর্থে পূর্ব্বোক্ত শ্রীহট্ট না জ্ঞানবুদ্ধিতে বঙ্গদেশের লোক শ্রেষ্ঠ এই বিশ্বাসে কথাগুলি উচ্চারিত?

১। গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস, টীকা, পৃ ১০১। গোপীচন্দ্রের গান (২য় ভাগ) দ্রষ্টব্য।
২। গো, সি, সি, পৃ ৪০।

দশম পরিচ্ছেদ

নাথ-সম্প্রদায়ের আচার, সংস্কার, দীক্ষা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াদি ও ব্যবহার্য্য দ্রব্যসকল

নাথ-যোগীদের মধ্যে খাদ্যাখাদ্য-সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। ধীনোধরের যোগীরা নিরামিষ-ভোজী। স্থানান্তরের যোগীরা 'মৎস্য' আহার করেন না, কারণ মৎস্যেন্দ্র 'মৎস্য' হইতে জাত হন, কিন্তু মাংসাহার ইঁহাদের মধ্যে নিষিদ্ধ নহে। যোগীদের মধ্যে জাতি-বিচার না থাকিলেও মুসলমান যোগীদের সহিত হিন্দু যোগীদের একত্রে আহার করিতে দেখা যায় না। অন্নবিতরণ নাথপন্থীদের মধ্যে বিশেষ গৌরবের বিষয়, ধীনোধর, দেবীপাটান, কামাখ্যা, গোরক্ষপুর, টিলা প্রভৃতিতে দশহরার দিন উৎসব ও প্রসাদ-বিতরণ প্রচলিত আছে।

কানফাটাদের মধ্যে ঔষধ ও কবচাদি-বিতরণের প্রথা দেখা যায়। কাশীধামে ময়ূরপুচ্ছ-ব্যজনী দ্বারা কুদৃষ্টির ক্ষমতা রোধ করিতেও দেখা যায়। গোরক্ষপুরের মোহন্তজী শিশুদের কঠিন রোগ দূর করিতে সমর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

শ্বাসপ্রশ্বাস হইতে কার্য্যের শুভাশুভ ফলাফল-নির্ণয় যোগীদের মধ্যে প্রচলিত আছে। কমলাকান্তের 'সাধক-রঞ্জন' গ্রন্থের শেষভাগে শ্বাসপ্রশ্বাস-বিচার-করা আছে।[১]

পাঞ্জাবে যোগীরা 'আঙ্গোলা' বৃক্ষের পূজা করেন। ইহা শিবের নামের সহিত যুক্ত, ব্রাহ্মণেরা এই পূজার প্রসাদ গ্রহণ করেন না।

শিবরাত্রিতে প্রধান প্রধান মঠে গুরু গোরক্ষাদির চরণ-পূজা হয়, নাগপঞ্চমীর দিনও প্রয়াগ, কাশীধাম প্রভৃতি স্থানে বিশেষ উৎসব হয়, এই সময়ে হিন্দু ও মুসলমান যোগীরা 'গুগাগীত' গাহিয়া ভিক্ষা করেন। কথিত আছে গুগা বাসুকির জামাতা ছিলেন। শিবরাত্রিতে সমস্ত রাত্রি 'গোরক্ষগীত' গাহিবার রীতি আছে।

নেপালে কার্ত্তিক মাসে কালভৈরবের পূজা ও শোভাযাত্রা হয়। তবে মৎস্যেন্দ্রের রথযাত্রাই নেপালের বিশেষ উৎসব। আমাদের দেশের জগন্নাথের রথযাত্রা ও স্নানযাত্রার ন্যায় মৎস্যেন্দ্রের উৎসব হইয়া থাকে।

১। সাধকরঞ্জন—প্রাণায়াম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

নাথসম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পরকে 'আদেশ' শব্দ দ্বারা অভিবাদনের রীতি আছে। ইহার অর্থ 'তুমি ব্রহ্মস্বরূপ' এই আদেশ শব্দ 'আদীশ' শব্দের অশুদ্ধরূপ, কারণ 'আদেশ' শব্দ অনুজ্ঞাসূচক, ইহা নমস্কার বা ঈশ্বরবোধক হইতে পারে না।[১]

দীক্ষা-অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়াদি-সংস্কার

গোরক্ষনাথীদের মধ্যে বিভিন্ন জাতি আছে, মুসলমানরাও এই পন্থে দীক্ষা গ্রহণ করে। পৌষ হইতে চৈত্র মাসাবধি নাথপন্থীদের দীক্ষা-গ্রহণের প্রশস্তকাল। ছয়মাস পর্য্যন্ত সংযম শিক্ষা দিয়া গুরু শিষ্যকে দীক্ষা দেন। ইহার পর কর্ণবেধের নিমিত্ত গুরু তীক্ষ্ণাগ্র ছুরিকা তিনবার শিষ্যকে দেখাইয়া নিবৃত্ত হইতে বলেন, শিষ্য অসম্মত হইলে তাহাকে 'অওঘর' করা হয়, ইহা দীক্ষার নিম্নস্তর-বিশেষ। ইহাতে ছুরিকা মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া শিষ্য প্রতিজ্ঞা করে যে, সে বিবাহ করিবে না, কার্য্যগ্রহণ বা ব্যবসা করিবে না, হিংসা করিবে না, অপমানিত হইলেও রাগ করিবে না ও কর্ণদ্বয় সযত্নে রক্ষা করিবে। এই 'কুণ্ডল' শিব ধারণ করেন বলিয়া নাথযোগীদের ইহা প্রিয়। তৎপরে শিষ্যকে গেরুয়া বস্ত্র দেওয়া হয়। পার্ব্বতী স্বীয় রক্তে বস্ত্র রঞ্জিত করিয়া গোরক্ষনাথকে উহা প্রদান করেন, এই বিশ্বাসে যোগীরা গেরুয়া বসন ধারণ করেন।

নাথপন্থীদের শিখাচ্ছেদ অর্থে জাতিত্যাগ করা। অওঘররূপে ছয়মাস অতীত হইলে ভৈঁরোর সম্মুখে 'শিব-গোরক্ষ' মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শিষ্যের উভয় কর্ণে এক ইঞ্চি পরিমাণ ছিদ্র করা হয়। এই ছিদ্র শুষ্ক হইলে কুণ্ডল ধারণ রীতি। তখন গুরু কর্ণে মন্ত্র দেন, "ধার্ম্মিক হও, উপযোগী হও," এবং তাহাকে 'শিংনাদ' সহ উপবীত পরাইয়া দেন। তৎপরে শিষ্যের অঙ্গে ভস্ম লেপন করা হয় এবং তাহার নূতন নামকরণ হয়। এইরূপে দীক্ষা-অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হয়। দীক্ষান্তে কেহ কেহ আজন্ম ব্রহ্মচারী থাকেন, কেহবা গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করেন। স্ত্রীলোকেরাও দীক্ষা গ্রহণ করিতে পারেন। ইহারা 'যোগিনী' বা 'নাথিনী' নামে পরিচিত হন।

কোন যোগীর মৃত্যু ঘটিলে, তাহার মৃতদেহ সমাধিস্থ করা হয়। হিন্দুর বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার জন্য মুখাগ্নি করা হয়। মৃতদেহ

১। যোগিসম্প্রদায়াবিষ্কৃতি, চন্দ্রনাথ যোগী, পৃ ৪৪৭।

ধ্যানোপযোগী আসনবদ্ধ করিয়া ধৌত করিয়া ভস্ম লেপন করা হয়। তৎপরে নূতন বস্ত্র, জপমালা, চন্দন ও দেহটি উন্নত রাখিবার জন্য খঞ্জযষ্টি দেওয়া হয়। জলপূর্ণ অলাবুপাত্র ও ভোজ্যদ্রব্য স্থাপন করিয়া মৃত্তিকা দ্বারা দেহটি আচ্ছাদিত করিয়া তদুপরি সমাধি রচিত হয়। যোনিলিঙ্গ দ্বারা সমাধি চিহ্নিত করিয়া মৃতের পাদুকা ও বিল্বপত্র স্থাপিত হয় এবং প্রদীপ জ্বালিয়া রাখা হয়। ত্রয়োদশ দিবসে শংখধ্বনি করিয়া সমাধি-ক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। ঐদিন সমাগতদের ভোজন করান ও অর্থদান করা হয়।[১]

নাথযোগীদের ব্যবহার্য্য দ্রব্যসকল

কানফাটা যোগীরা 'কুণ্ডল' ব্যতীত এক প্রকার ঔর্ণ উপবীত ধারণ করে, তাহার নাম 'সেলী'। তাহাতে নয়টি করিয়া সূত্র থাকে। সেলীর মধ্যে 'নাদ' নামে দুই তিন অঙ্গুলি প্রমাণ কৃষ্ণ বর্ণ শিংএর প্রস্তুত বংশীর ন্যায় বস্তু থাকে ইহার নামান্তর শিংনাদ, উহা গলদেশে ধারণ করিবার নিয়ম। ব্রাহ্মণের উপবীত ও শিখাকে নাথপন্থীরা মিথ্যা বলেন, কিন্তু নিজেরা কুণ্ডল ও সেলী-নাদ ধারণ করেন। শৈব ধর্ম্মের নিয়ম অনুসারে গেরুয়া বস্ত্র-পরিধান, জটা-ধারণ, ভস্ম-লেপন ও ললাটে ত্রিপুণ্ড্র-ধারণ নাথযোগীদের মধ্যে প্রচলিত। মতান্তরে ঔর্ণ উপবীতে গ্রথিত 'পবিত্রী' নামক বলয়াকার দ্রব্য থাকে, তাহা পার্ব্বতীর প্রতীক। এই পবিত্রী হইতে শিংনাদ লম্বিত থাকে। 'শিংনাদ' ও 'পবিত্রী' জগৎকারণের প্রতীকরূপে যোগীরা ধারণ করেন। শিব এই শিঙ্গা-ধারণের আদেশ দেন এইরূপ প্রবাদ আছে। ইহা কৃষ্ণহরিণের শৃঙ্গে নির্ম্মিত হয়। পবিত্রী গণ্ডারের শৃঙ্গে বা ধাতুর দ্বারা নির্ম্মিত হয়।

নাথযোগীদের রুদ্রাক্ষের মালা অপেক্ষা হিংলাজ-তীর্থের ঠুম্‌রা ও আশাপুরীর মালা-ধারণ অধিক প্রিয়। এই মালায় ১০৮টি বা ততোধিক গুটিকা থাকে। সপ্ত নক্ষত্রসহ চন্দ্রের উদয় ও অস্ত গণনা করিয়া ৯ সংখ্যা ধরিলে তাহার সহিত দ্বাদশ রাশির যোগে ৯ × ১২ = ১০৮ বীজ-সংখ্যা হয়। তন্ত্র ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে এই সংখ্যাটীর বিশেষ গুরুত্ব আছে, এই স্থানে তাহার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক।

১। E. R. E. Kānphātās অধ্যায়ে বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

শৈবসন্ন্যাসীর একটি নাম 'সভগ্ন-ভ্রজ', কানফাটা যোগীরাও ধুনি বা শ্মশানের ভস্মদ্বারা দেহ লেপন করেন, ও ললাটে 'ত্রিপুণ্ড্র' ধারণ করেন। হিংলাজ-তীর্থপ্রত্যাগত যোগীরা দক্ষিণ বাহুকে 'যোনিলিঙ্গ'-চিহ্নিত করেন। দীক্ষার সময়ে মস্তক-মুণ্ডনের রীতি থাকিলেও তৎপরে যোগীরা প্রায়ই জটা ধারণ করেন। যোগীদের হস্তে কেদার-বদরীর পিত্তল, স্বর্ণ, লৌহ বা গণ্ডারের চর্ম্মে নির্ম্মিত বলয়ও দেখা যায়।

যোগীদের সাধনের পক্ষে 'ধুনি' অত্যাবশ্যক। প্রসিদ্ধ মঠ-সকলে অদ্যাপি গোরক্ষ বা ধর্ম্মনাথের নামের সহিত যুক্ত ধুনি দেখা যায়। যোগীরা যে ভিক্ষাপাত্র ব্যবহার করেন, তাহা পশ্চিম-সমুদ্র-তীরবর্ত্তী নারিকেলমালার বা অলাবুর। চিবুকভার ন্যস্ত করিবার জন্য 'আচল' নামক খণ্ড-যষ্টিও ব্যবহৃত হয়। পূজার সময়ে 'দৌর' নামক ঢোল বাজাইয়া যে সকল যোগীরা ভিক্ষা করেন তাহাদের নাম 'দৌর-গোঁসাই'। (E. R. E. Kānphātās দ্রষ্টব্য)

যোগী-জাতির পরিচায়ক চিহ্নরূপে যজ্ঞোপবীত, দণ্ড, শিখা ইত্যাদি ধারণ-সম্বন্ধে নাথযোগীরা বলেন শুভ্র উপবীত হইতে বল ও তেজ বৃদ্ধি পায়। সূত্র মানবের ব্রহ্মভাবের সূচনা করে, তাই উহার নাম 'সূত্র'। এই যথার্থ সূত্রধারক যোগীর চেতনা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই সূত্র কদাপি অশুচি হয় না, কারণ এই সূত্রের নাম 'জ্ঞানযজ্ঞোপবীত' এবং ইহা দেহের অন্তর্গত। অগ্নির যেমন একটি 'শিখা' থাকে তেমনি যোগীর শিখা 'জ্ঞানময়ী শিখা', সেইরূপ যোগীই যথার্থ 'শিখী', অন্যেরা মাত্র কেশধারী। যথার্থ ব্রহ্মবিদের জ্ঞানময়ী শিখা ও তন্ময়তারূপ উপবীত আছে। জ্ঞানরূপ 'দণ্ড' যাহার আছে সেই যথার্থ দণ্ডী, যে পরমাত্মা ও আত্মার ভেদ ভুলিয়া মিলন বা 'সন্ধ্যা' করিতে সমর্থ সেই যথার্থ সন্ধ্যাকারী। যে যোগী মনোদণ্ড, কর্ম্মদণ্ড ও বাগ্‌দণ্ডধারী, সেই যথার্থ 'ত্রিদণ্ডী', বাগ্‌দণ্ডসম্পন্ন ব্যক্তি নিরঞ্জন দেবকে জানিতে সমর্থ হন।[১]

যোগীদের দীক্ষা-গ্রহণ-সময়ে 'বিভূতিস্নান' বিধি, ইহার অর্থ পৃথিবী-তুল্য সহিষ্ণু হও, 'জলস্নান' অর্থে মেঘের জল-বর্ষণের ন্যায় সমদৃষ্টিসম্পন্ন হও। 'নাদ'ধারণ অর্থে শব্দ-ধারণ, কারণ শব্দই গুরু। উর্ণাদি-নির্ম্মিত 'জনেউ' (সূত্র) ধারণ-দ্বারা সংসার হইতে পৃথকত্বের স্মরণ হইবে এবং

১। গো. সি. স. পৃ ৫০, পরমহংস উপ, পৃ ১৫০, গোরক্ষ-বিজয়খণ্ডের, পৃ ৩০।

'কুণ্ডল'ধারণ দ্বারা আদিনাথের স্মরণ হইবে[১], এই নিমিত্ত এই সকল ব্যবহার বিধি। এই কুণ্ডলের এক নাম 'দর্শন' ও যোগীর নাম 'দর্শনী', অর্থাৎ যোগীর পরমাত্মা-দর্শন হইয়াছে। প্রবাদ যে পাণ্ডবেরা মৃত আত্মীয়দের পিণ্ডদান-সময়ে গণ্ডারচর্ম্ম-নির্ম্মিত পাত্রে জলদান করেন, সেই নিমিত্ত গণ্ডারের শৃঙ্গে নির্ম্মিত কুণ্ডলকে নাথযোগীরা পবিত্র জ্ঞানে ধারণ করেন[২]। 'দর্শন' বৃহদাকার, ইহার পরিধি ৭ ইঞ্চি ও গুরুত্ব ৫ তোলা, অতএব কর্ণের উপাস্থি ভেদ না করিলে উহা ধারণ করা সম্ভব নহে। যদি কোন প্রকারে 'দর্শন' ভাঙ্গিয়া যায়, তবে অন্যের সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিবার নির্দ্দেশ আছে। যদি 'কুণ্ডল' অপহৃত হয় তবে সে যোগীর পক্ষে মুখ-প্রদর্শনও নিষিদ্ধ। কুণ্ডলের সাধারণ নাম 'মুদ্রা'। অস্থূল আয়ত মুদ্রার নাম 'দর্শন', ও নলাকৃতি মুদ্রার নাম 'কুণ্ডল', কুণ্ডলকে পবিত্র জ্ঞানে পবিত্রীও বলা হয়।

১। যোগিসম্প্রদায়াবিষ্কৃতি, পৃ ১৯, ২০, ৪৪০।

২। গোরক্ষনাথ—ব্রীগ্‌স, পৃ ৮।

একাদশ পরিচ্ছেদ

গোরক্ষ-সাহিত্য ও বঙ্গসাহিত্যে গোরক্ষের যোগ-পরিচয়

ইতিপূর্ব্বে আমরা লুইপাদ-রচিত 'দোহা' বা 'পদে'র কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। শৈবযোগীরাই প্রথমে সহজবোধ্য অসংস্কৃত ভাষায় পদ রচনা করেন, তথাপি মৎস্যেন্দ্র-গোরক্ষাদির নামে কয়েকখানি সংস্কৃত পুথি প্রচলিত আছে, আজ বহু শতাব্দী পরে তাহারা প্রামাণ্য কিনা সে বিচার পণ্ডিতবর্গ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের সিদ্ধান্ত অনুসারে এই প্রাচীন পুথিগুলিকে কৃত্রিম বলা চলে না। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের রচনা হিসাবে বাংলা 'গোরক্ষ-বিজয়' 'ময়নামতীর গান' ইত্যাদি ধরিলেও, কাহিনীগুলিকে প্রাচীন বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িপা ও কানুপা এই চারি সিদ্ধার মাহাত্ম্য বহুপূর্ব্ব হইতেই বঙ্গদেশে প্রচারিত হয়। অথচ 'মীনচেতন' প্রভৃতি পুথি ১২২৪ সনে রচিত, গোরক্ষ-বিজয়ের পুথিখানি তাহার কিছু পূর্ব্বে রচিত বলিয়া অনুমিত হয়, সম্ভবতঃ উহা ১১৮৪ সনের। গোরক্ষ-বিজয়ের ভূমিকায় (পৃ ১৯, ২০) এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ আছে। (সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাবলী—সং ৬৪, ১৩২৪)। এই সকল সিদ্ধার স্বরচিত ও প্রামাণ্য গ্রন্থমধ্যে ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয়ের সম্পাদিত 'কৌলজ্ঞান-নির্ণয়' অন্যতম। ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচীমহাশয় নেপাল দরবারের গ্রন্থাগারে মৎস্যেন্দ্রের ভণিতা-যুক্ত পাঁচটী সংস্কৃত ভাষায় রচিত পুথি পান, তন্মধ্যে 'কৌলজ্ঞান-নির্ণয়' প্রাচীনতম। ডাঃ বাগচীর মতে ইহা ১১শ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত, শাস্ত্রীমহাশয় ইহার লিপি দেখিয়া ইহাকে নবম শতাব্দীর মধ্য-ভাগের বলিয়া স্থির করেন।[১] কৌলজ্ঞাননির্ণয় ব্যতীত অকুলবীরতন্ত্রের দুইখানি পুথি এবং 'কুলানন্দতন্ত্রম্' ও 'জ্ঞানকারিকা'—মোট এই কয়টী পুথি বাগচীমহাশয় দেখিয়াছেন। কোন পুথিতেই লেখকের নাম নাই, ভণিতায় মচ্ছেম্নপাদ, মচ্ছেন্দ্রপাদ, মৎস্যেন্দ্রপাদ, মীনপাদ, মীননাথ, মৎস্যেন্দ্র ও মচ্ছিন্দ্রনাথপাদ আছে। পুথির মধ্যে মীননাথ ও শেষে

১। কৌলজ্ঞাননির্ণয়—বাগচী, ভূমিকা, পৃ ৩।

মৎস্যেন্দ্রনাথ থাকায় উভয় নামই একই ব্যক্তির বলিয়া মনে হয়। সম্ভবতঃ সাধারণ্যে তিনি দুই নামেই পরিচিত ছিলেন। কাহারও কাহারও মতে মীননাথ মৎস্যেন্দ্রের পুত্র, পুথির শেষে 'মীননাথ' নাম পাইলে উহা অসম্ভব মনে হইত না। এতদ্ব্যতীত অকুলবীরতন্ত্রের অনুরূপ দুই খণ্ড পুথিতে মীননাথ ও মচ্ছেন্দ্রনাথ নাম পাওয়ায়, দুইটী নাম একই ব্যক্তির বলা যায়।

মৎস্যেন্দ্রসম্প্রদায়ের আরও কয়েকটী পুথির অংশমাত্র ডাঃ বাগচী নেপালের পুথিশালায় পান, তন্মধ্যে ঃ

১। শ্রী কামাখ্যাগুহ্য সিদ্ধির—কয়েকটী মাত্র পৃষ্ঠা আছে। উহাতে কয়েকটী গুরুর নাম ও অষ্টম পটলের ভণিতায় 'মৎস্যেন্দ্রে'র নাম আছে।

২। অকুলাগমতন্ত্র—ইহাতে মৎস্যেন্দ্রের নাম নাই, লিপিকাল সপ্তদশ শতাব্দী। 'অকুল' শব্দ, আসনাদি, সমাধি ইত্যাদি, পঞ্চমকারের গূঢ়ার্থ, যজ্ঞোপবীত-বর্জ্জনাদি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

৩। গোরক্ষশতকম্—ইহাতে যোগবর্ণনা, চক্রাদি-বর্ণনা ও হঠযোগ আছে।

৪। গোরক্ষভুজগম্—১৭৩০ খৃষ্টাব্দের লক্ষ্মীধার-রচিত নয়টী গোরক্ষস্তব।

৫। গোরক্ষসহস্রনামস্তোত্রম্—বিশেষ কিছু নাই।

৬। গোরক্ষ-সংহিতা—ষোড়শ শতাব্দীর লিপি। দেবী ও ঈশ্বরে কথোপকথন, সৃষ্টিবিধি, নাড়ীকথন, দেহমধ্যস্থ ছয়টী দ্বীপ, লবণাদি সমুদ্রের ব্যাখ্যা ও নির্দ্দেশ আছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের সহিত অকুলবীরতন্ত্রের মিল আছে, ইহাতে সাম্প্রদায়িক নীতি ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

৭। নিত্যাহ্নিক-তিলকম্-১৩৯৫ খৃষ্টাব্দের। শাস্ত্রীও ইহার উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা 'কৌল' বা পশ্চিম শাসন-সম্প্রদায়ের, ইহাতে গুরুপরম্পরা ও তাঁহাদের জন্মস্থান দেওয়া আছে। ইহাতে মৎস্যেন্দ্র-সম্বন্ধে যে বিবৃতি আছে তাহার উল্লেখ এই নিবন্ধের তৃতীয় পরিচ্ছেদে করা হইয়াছে।

শাস্ত্রীমহাশয়ের সম্পাদিত বৌদ্ধগান ও দোহার পরিশিষ্টে (পৃ৪॥৶) লুইপাদ-রচিত শ্রীভগবদভিসময়নাম, অভিসময়বিভঙ্গ ইত্যাদি পঞ্চ গ্রন্থের নাম আছে।

'মৎস্যেন্দ্র-সংহিতা' নামে যোগবিষয়ক এক পুথি (মৎস্যেন্দ্রনাথের রচিত) পাওয়া যায় বলিয়া 'কল্যাণে' উল্লিখিত হইয়াছে।[১] আমি ইহার সন্ধান পাই নাই। এই পুথির উল্লেখ চন্দ্রনাথ যোগীকৃত 'গোরক্ষ-বিকাশের' পরিশিষ্টে আছে। 'গোরক্ষ-সংহিতা'-সম্বন্ধে ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচীমহাশয় কৌলজ্ঞাননির্ণয়ের পৃ ৬৪র ফুটনোটে বলিয়াছেন প্রসন্ন কবি-রত্নের সঙ্কলিত গ্রন্থ তিনি পান নাই। কিন্তু উক্ত গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য নহে, তবে উহার বিষয়বস্তু ভিন্ন। নাথপন্থের এই গোরক্ষ-সংহিতা সূত্র আকারে রচিত। ইহাতে যোগাঙ্গ, ধ্যান, ধারণা প্রভৃতির বিষয় আছে। ডাঃ বাগচীর নেপালে প্রাপ্ত গোরক্ষ-সংহিতা পুথির বর্ণনা পূর্ব্বেও দেওয়া হইয়াছে।

গোরক্ষনাথের নামে আরও কয়েকখানি সংস্কৃত পুথি প্রচলিত আছে যথা :—

(ক) গোরক্ষ-শতক
চতুরশীত্যাসন
জ্ঞানামৃত
যোগচিন্তামণি
যোগমহিম
যোগমার্ত্তণ্ড
যোগসিদ্ধান্তপদ্ধতি
বিবেকমার্ত্তণ্ড
সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতি।[৩]

(খ) গোরক্ষকলা
গোরক্ষসহস্রনাম
গোরক্ষপিষ্টিকা
গোরক্ষগীতা
ইহা ব্যতীত হিন্দীতে বহু কবিতা পাওয়া যায়।[২]

কাশ্মীর মহারাজের গ্রন্থাগারের সংস্কৃত-সিরিজ মধ্যে ১৯১৯ সালে 'জন্মমরণ-বিচার' প্রকাশিত হয়, তন্মধ্যে 'অমরৌঘ-শাসনম্' নামে সংস্কৃত পুথি সিদ্ধ গোরক্ষনাথকৃত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

'গোরক্ষ-বোধ' পুথি প্রাচীন হিন্দীতে রচিত। তেসিতরির মতে উহা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর। 'গোরক্ষনাথকী বচন' সপ্তদশ শতাব্দীতে বণারসী দাস নামক জনৈক জৈন দিগম্বর পুরোহিত কর্ত্তৃক প্রণীত হয়।[৪]

১। কল্যাণ, যোগাঙ্ক, পৃ ১৮৩।
২। E. R. E., Vol. VI, Gorakhnath.
৩। কল্যাণ, যোগাঙ্ক, পৃ ১৮৪।
৪। E. R. E, Vol XII, p. 834. শ্রীগ.সু, পৃ ২৫২, ফুটনোট।

শিব-সংহিতা, শিবপুরাণ, শিবরহস্য প্রভৃতি গোরক্ষনাথীদের মধ্যে প্রচলিত গ্রন্থ। ঘেরণ্ড-সংহিতা ১৮৭৭ সালে কলিকাতা হইতে ভুবনচন্দ্র বসাক কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গোরক্ষ-সম্প্রদায়ের রীতিনীতি শিব-সংহিতা ও ঘেরণ্ড-সংহিতায় আছে। ঘেরণ্ড বাঙ্গালী বৈষ্ণব ছিলেন, চণ্ড কপালী নামক শিষ্যের উদ্দেশ্যে তিনি গ্রন্থ রচনা করেন, ইহাতে ষট্‌কর্ম্মাদি বর্ণিত হইয়াছে। শিবসংহিতা তান্ত্রিক গ্রন্থ, ইহার ৫ম অধ্যায়ে শিবপার্ব্বতীর কথোপকথন আছে, হঠযোগ-প্রদীপিকার ন্যায় ইহাও গোরক্ষ-সম্প্রদায়ের অনুমোদিত গ্রন্থ।

মৎস্যেন্দ্র হঠযোগের আদি প্রচারকর্ত্তা—এইরূপ প্রবাদ আছে। শিব ইহার আদি বক্তা। হঠযোগে মৎস্যেন্দ্রাসনম্ মৎস্যেন্দ্রনাথাভিমতম্, পদ্মাসনম্ ইত্যাদি আছে, কৌল-জ্ঞাননির্ণয়ের তৃতীয় পটলে (২-৩) কুললক্ষণ-বর্ণনা আছে। হঠযোগ-প্রদীপিকায় (৪।১৪) ইহার অনুরূপ শ্লোক আছে।

অতএব হঠযোগ মৎস্যেন্দ্র-প্রবর্ত্তিত বলিয়া যে প্রবাদ আছে তাহাব মধ্যে কিঞ্চিৎ সত্য নিহিত আছে বলা যায়। (বাগচী কৌলজ্ঞান-ভূমিকা, ।৶০)।

সাত্মারাম যোগীন্দ্র বা চিন্তামণি সম্ভবতঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে হঠযোগপ্রদীপিকা রচনা কবেন—ইহার মূল গোরক্ষের রচিত গোবক্ষ-পদ্ধতি' 'গোরক্ষ-শতক' প্রভৃতি সংস্কৃত পুথি। কাশীধামে গোরক্ষ-শতক পুথি 'জ্ঞানশতক' নামে প্রচলিত,—ইহাও গোরক্ষনাথ-বিরচিত। 'গোরক্ষ-শতক' ও 'গোরক্ষ-সংহিতা'র মিশ্রণে 'গোরক্ষ-পদ্ধতি'র উৎপত্তি হইয়াছে, গোরক্ষ-পদ্ধতির মধ্যেই গোরক্ষ সংহিতা ও গোরক্ষ-শতক উভয় নাম পাওয়া যায়, আবার পুণায় প্রাপ্ত পুথিতে 'শিব-যোগশাস্ত্র' নামও আছে।[১]

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের মতে গোরক্ষ-পদ্ধতি ও গোরক্ষ-শতক হইতে নাথমার্গীদের সাধনপদ্ধতি বুঝা যায়, কিন্তু ডাঃ মোহন সিং ইহার প্রতিবাদস্বরূপ বলিয়াছেন গোরক্ষ-নাথের সাধন-পদ্ধতি পরবর্ত্তী কালের উপনিষদের ন্যায়, বামাচারীদিগের সহিত তাঁহার কোন সংশ্রব ছিল না, যদিও গোরক্ষ-বোধের ১৩১ ও ১৩২

১। ব্রীগ.স পৃ ২৫৩।

শ্লোকদ্বয়ের অনুবাদ হইতে তাঁহাদের হঠযোগী বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যায়।[১] হিমালয়স্থ গাড়োয়াল জেলার অন্তর্গত টেহরী রাজধানীতে হিন্দীতে রচিত 'গোরক্ষ-পদ্ধতি' হরিদ্বার হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। Farquhar মতে গোরক্ষ-কল্প নামক পুথি হিন্দীতে গোরক্ষ-পদ্ধতিরূপে প্রচারিত হইয়াছে।[২] ইহার প্রথম একশত শ্লোক গোরক্ষ-শতকের অনুরূপ. দ্বিতীয় শতকে হিন্দীতে প্রাণায়াম-প্রত্যাহারাদির বর্ণনা আছে, ইহার কাল নিরূপণ করা কঠিন। গোরক্ষ-শতকের টীকা শঙ্কর কর্ত্তৃক কাশীবাসকালে রচিত হয় স্বীকার করিলে, মূল পুথি শঙ্কর-পূর্ব্ব যুগেব বলিতে হয়। গোরক্ষ-শতকে যোগ ও তন্ত্রের সমন্বয় আছে।

গোবক্ষ-সংহিতা, গোরক্ষ-কৌমুদী, বিবেকমার্ত্তণ্ডযোগ (রামেশ্বর ভট্ট প্রণীত), গোরক্ষ-গীতা, গোরক্ষ-সহস্রনাম ইত্যাদি সংস্কৃতে রচিত।[৩] বলভদ্রকৃত 'সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ' ও 'গোবক্ষ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ' এই উভয় পুথি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজমহাশয়ের সম্পাদনায় ১৯২৫ সালে সরস্বতী-ভবন, বেণারস হইতে মুদ্রিত হইয়াছে। গোরক্ষ-সম্প্রদায়ের নানা বিষয়ের অবতারণা এই পুথিদ্বয়ে আছে।

গোবক্ষ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহে নাথ, গুরু, শিষ্য প্রভৃতির বর্ণনা. ত্যাগ ও ভোগের বহস্য, নবনাথ, ৮৪ সিদ্ধ, পুরুষ-লক্ষণ, অবধূত-লক্ষণ, কাপালিক-মার্গ, দ্বৈতাদ্বৈতমত, সিদ্ধমত, নাদ ও বিন্দুসন্তান, নাদানুসন্ধান, কায়াসিদ্ধি প্রভৃতি বহুবিষয় বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে,—ইহা হইতে নাথ-সম্প্রদায়েব মধ্যে যে নিম্নলিখিত সংস্কৃত পুথি প্রচলিত ছিল তাহা বুঝা যায় :—

শ্রীনাথকৃত সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি	অমনস্ক	গীতা
নিত্যনাথকৃত-সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি	বিবেকমার্ত্তণ্ড	তন্ত্রমহার্ণব
অবধূতগীতা	ধ্যানবিন্দূপনিষৎ	ক্ষুরিকোপনিষৎ
সূতসংহিতা	মুণ্ডকোপনিষৎ	গোরক্ষোপনিষৎ
ব্রহ্মবিন্দূপনিষৎ	মনুস্মৃতি	বৃহদারণ্যকোপনিষৎ
কৈবল্যোপনিষৎ	উত্তরগীতা	ছান্দোগ্যোপনিষৎ
তেজোবিন্দূপনিষৎ	বায়ুপুরাণ	কালাগ্নিরুদ্রোপনিষৎ

১। ডাঃ সিং, পৃ ১০, ব্রীগ্‌স্‌, পৃ ২৫৬

২। যোগি-সখা, ১৩২৮, পৃ ৯৫ ; ৩০৪। ব্রীগ্‌স্‌, পৃ ২৫৫।

৩। ব্রীগ্‌স্‌, পৃ ২৫২, ইহাতে ২৬টী গ্রন্থের নাম আছে।

পরমহংসোপনিষৎ
নাথসূত্র
ভর্ত্তৃহর্য্যুক্তি
বৃহস্বৃচব্রাহ্মণ
শিবোপনিষৎ
শ্রীগোরক্ষসহস্রনামস্তোত্র
(কলপদ্রুমতন্ত্রে)
(রাজগৃহে শ্রীকৃষ্ণকৃত)
ললিতাখণ্ড
(ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের সারসংগ্রহে)
একাদশস্কন্ধ ভাগবত
ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ

ব্রহ্মোপনিষৎ
সর্ব্বোপনিষৎসার
রাজগুহ্য
শক্তি-সংগমতন্ত্র
সনৎসুজাতীয়বচন
(মহাভারতে)
হঠপ্রদীপিকা
শাবরতন্ত্র
ষট্‌শাম্ভবরহস্য
কাবেষয়গীতা
যোগবীজ
সিদ্ধান্তবিন্দু

কপিলগীতা (পদ্মপুরাণ)
তন্ত্রমহার্ণব
ষোড়শনিত্যাতন্ত্র
তারাসূক্ত
শিবপুরাণ

উক্ত 'অমনস্ক' পুথিটী ১২৯৯ সালে উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'শাস্ত্রশতক' গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে (১ম সংস্করণ, ২নং হরিমোহন বসু লেন, কলিকাতা)। 'যোগবীজম্' পুথিটী ১৮৮৬ সালে ভুবনচন্দ্র বসাক প্রকাশিত করেন।

বলভদ্রকৃত সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহে পিণ্ডোৎপত্তি-বিচার, পিণ্ডবিচার, পিণ্ডসংবিত্তি, পিণ্ডাধার, পিণ্ড ও পরমপদ, অবধূত ও সিদ্ধিবর্জ্জনে নিরুত্থান-দশালাভ-বৃত্তান্ত রহিয়াছে। গোরক্ষসম্প্রদায়ের যোগবৃত্তান্ত, যথা—ষট্‌পিণ্ডের বিচার, ষোড়শাধার, ত্রিলক্ষ্য, পঞ্চব্যোমসাধন, গোরক্ষমতে প্রচলিত চতুষ্পীঠতত্ত্ব, পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডের একতা, কুলাকুলের বিচার, শিবশক্তির সম্বন্ধ, নিরুত্থানদশা, সামরস্যসাধন প্রভৃতি ইহাতে আছে। ক্ষপণক, যোগী বা সিদ্ধই অবধূত, তিনি পরমহংস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তিনিই প্রকৃত যোগী, এইরূপ মূল্যবান্ সংজ্ঞা এই পুথিতে আছে। শাণ্ডিল্য গোত্রের বলভদ্র কাশীধামে এই পুথি কৃষ্ণরাজার আদেশে রচনা করেন, বলভদ্রের কাল-নির্ণয় হয় নাই। পুথির চতুর্থ ও পঞ্চম উপদেশে নিম্নলিখিত পুথির উল্লেখ আছে—

ললিতস্বচ্ছন্দ
তত্ত্বসার
জঠরসংহিতানিবন্ধ

কিন্তু এই পুঁথিগুলিরও কাল-নির্ণয় না হওয়াতে বলভদ্রের কাল-নিরূপণ সম্ভবপর হয় নাই। তথাপি এই পুথি যে সাম্প্রদায়িক তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

হঠযোগপ্রদীপিকার (পৃ ২) টীকায় আছে 'তথা চোক্তং গোরক্ষ-নাথেন সিদ্ধসিদ্ধান্ত-পদ্ধতৌ'—এই পুথি হরিদ্বার নাথব্রহ্মচর্যাশ্রম হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার অনুলিপি-সাহায্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পুথিমধ্যে আছে তাহা জানা যায়:

মহেশ্বরাবতার গোরক্ষকৃত সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি ছয়টী অধ্যায়ে উপদেশাকারে গ্রথিত হইয়াছে, যথা—পিণ্ডোৎপত্তি, পিণ্ডবিচার, পিণ্ড-সংবিত্তি, পিণ্ডাধার, পিণ্ড(পরম)পদ, সমরসভাব ও শ্রীনিত্যাবধূত।

গ্রন্থটী প্রধানতঃ পদ্যে লিখিত। অন্যান্য মান্য গ্রন্থ হইতে শ্লোকোদ্ধারও আছে। সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ নামক যে গ্রন্থের কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে উহা 'সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি'র সংক্ষেপসার-সংগ্রহ মাত্র। 'সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি' গোরক্ষনাথকৃত বলিয়া নাথসম্প্রদায়ে প্রসিদ্ধি আছে, ইহা একটী গুরুত্ববিশিষ্ট পুথি। ইতিপূর্ব্বে যে গ্রন্থতালিকা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে নিত্যনাথকৃত ও শ্রীনাথকৃত সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতির উল্লেখ করা হইয়াছে, এই বিভিন্ন গ্রন্থকর্ত্তার নাম সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহে পাওয়া যায়। তদ্ব্যতীত অন্য প্রমাণাভাব। পুথিটী বিভিন্ন স্থান হইতে আমি সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাতে একমাত্র গোরক্ষনাথের নাম পাইয়াছি। ইহাতে নাথসম্প্রদায়ের বিশিষ্ট দার্শনিক মত ও যোগপদ্ধতির অনেক তথ্যের ইঙ্গিত আছে। নাথধর্ম্ম যে অদ্বৈতবাদ এবং শক্তির প্রসর-সঙ্কোচভাবকে আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও সংহারকে আভাস রূপে গণনা করে তাহারও ইঙ্গিত এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। গ্রন্থের ৬ষ্ঠ উপদেশে সাম্প্রদায়িক বহু নাম ও সংজ্ঞার লৌকিক ও আধ্যাত্মিক অর্থ বিচার করিয়া আধ্যাত্মিক আদর্শই যে তাঁহাদের অভিপ্রেত তাহা সুস্পষ্টভাবে দর্শিত হইয়াছে। বঙ্গদেশের বাহিরে নিম্নলিখিত গ্রন্থ প্রচলিত আছে:—

ময়ুরভঞ্জে গোবিন্দচন্দ্র-গীত, উড়িয়া ভাষায় রচিত।

পদুমাবৎ—মালিক মহম্মদ জৈয়সী রচিত।

গাথা—লক্ষ্মণদাস-রচিত।

সিহরকি গোপীচন্দ্র—গঙ্গারামকৃত।

গোপীচন্দ্র রাজাকে খেল—প্রহ্লাদীরাম পুরোহিত।

সন্তলীলামৃত—মহারাষ্ট্র-কবি মহীপতি (১৭১৫-৯০ খৃঃ)।

গোপীচাঁদ নাটক—পুণার আপ্পাজি গোবিন্দ-রচিত (১৮৬৯ খৃঃ)।

গোপীচাঁদ পুথি—হিন্দীতে রচিত।[১]

অক্ষয় দত্ত লিখিয়াছেন—গোরক্ষনাথ নয়নাথের একনাথ, অর্থাৎ নয়জন প্রধান গুরুর একটি গুরু। ইনি সুপণ্ডিত ছিলেন। গোরক্ষ-সংহিতা ব্যতিরেকে 'গোরক্ষ-শতক' ও 'গোরক্ষ-কল্প' নামে তাঁহার দুইখানি সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। 'গোরক্ষসহস্র' নামক গ্রন্থও তাঁহারই কৃত বোধ হয়।[২]

৺অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণমহাশয় লিখিয়াছেন—জনৈক কবি বানার্সি দাসের ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক গোবক্ষনাথকে বচন, গোরক্ষনাথকী গোষ্ঠী, কুলাঞ্জিপটল, যোগসার, যোগান্ত আগমসার, ব্রহ্মবোধ, পুণ্যনাথ-রচিত অর্জ্জুনগীত প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে নাথদের মূলনীতি-সম্বন্ধে অতি অল্পই জানিতে পারা যায়। গ্রন্থগুলি হইতে এই মাত্র জানা যায় যে শিব তাঁহাদের পরমেশ্বর এবং তাঁহাদের মতে শিবের সহিত এক হইতে পারিলেই জীবের মুক্তি। তবে এই মুক্তি যোগ-সাধনের দ্বারা লভ্য।[৩]

যোধপুরের বাণীভাণ্ডাবে 'গোরক্ষবোধে'র অনুসন্ধান করিয়া বিদ্যা-ভূষণমহাশয় জানিয়াছেন যে, গ্রন্থখানি আর বাণীভাণ্ডারে নাই, বহু অনুসন্ধানে তিনি আর একখানি গোরক্ষ-বোধের সন্ধান পাইয়া তাহার আলোচনা করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থের সহিত এই গ্রন্থের পার্থক্য আছে, কারণ ইহাতে কবীর-পন্থীদের মতামত প্রবেশ করিয়াছে। কবীর ও নানকপন্থীরা নাথমতের সহিত ভাবের বিনিময় করায় প্রকৃত নাথমতের অর্দ্ধেকেরও বেশী লোপ পাইয়াছে, পরবর্ত্তী নাথগুরুরা স্বীয় প্রয়োজন অনুসারে মতামতের পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। অথচ ডাঃ মোহন সিং যোধপুর গ্রন্থাগার হইতে 'গোরক্ষ-বোধ' পুথি পাইয়াছেন, ডাঃ সিং তাঁহার রচিত 'গোরক্ষনাথ' গ্রন্থের পরিশিষ্টে ইহার অনুবাদ দিয়াছেন, তাহা হইতে কয়েকটি প্রশ্নোত্তর উদ্ধৃত করিতেছি—বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রবন্ধ হইতেও কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া উভয় গোরক্ষ-বোধে প্রভেদ দেখাইতেছি :—

১। জ্ঞান-ভারতী—প্রভাত মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত, শান্তিনিকেতন। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, দীনেশ সেন (৫ম সং), পৃ ৬৪।

২। ভা. উ. স. (২য় খণ্ড) পৃ ২১৬ 'কন্‌ফট্‌ যোগী'।

৩। প্রবাসী, ১৩২৯ চৈত্র, যোগিজাতি প্রবন্ধ, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

গোরক্ষের প্রথম প্রশ্ন—মন কি? মৎস্যেন্দ্রনাথের উত্তর—মন চঞ্চল, বিদ্যুৎ হইতেও উহা চঞ্চল।

দ্বিতীয় প্রশ্ন—মন কোথায় থাকে? উত্তর—জীবহৃদয়ে মনের বাস। হৃদয়াভাবে মন অনুপব্রহ্মে বাস করে, ব্রহ্মের উপমা নাই বলিয়া তিনি অনুপ।

পবন মনের জীবনস্বরূপ, ইহা জন্মমৃত্যুর সন্ধিস্থল, নাভিমূল ত্যাগ করিয়া পবন নিরঞ্জনে অবস্থান করে। পবনের উৎপত্তি শব্দ হইতে। শব্দ ওঁকারধ্বনি। আকাশ স্পন্দিত হইলে ধ্বনির উদ্‌ভব হয়। সুতরাং বায়ুর উৎপত্তি ও লয়স্থান নাদ। স্থির বায়ু মাতাস্বরূপ ব্রহ্ম। চঞ্চল মন স্থির হইয়া শূন্যে থাকে, তখন ওঁকারধ্বনি শ্রুত হয়। ওঁকারধ্বনি শব্দের পরাবস্থা। (বিদ্যাভূষণসংগৃহীত প্রবাসী, পৃঃ ৭৬২, চৈত্র ১৩·৯)

গোরক্ষের প্রশ্ন (৩৯-তম শ্লোক)—নাদের উৎপত্তি কোথায়, ইহার স্থিতি ও বিলয় কোথায়?

মৎস্যেন্দ্রের উত্তর (৪০-তম শ্লোক)—নাদের উৎপত্তি অবগতিতে (unknowable) বা ওঁকারে, ইহার শূন্যে স্থিতি, পবনের মধ্যে লয় ও নিরঞ্জন (formless) এর সহিত বা আকাশের সহিত মিলন সম্ভব।

প্রশ্ন ৪১। নাদের যদি শব্দ না থাকে, শক্তির যদি গতি না থাকে, আমাদের আশার নিমিত্ত যদি স্বর্গ না থাকে তাহা হইলে প্রাণপুরুষ কোথায় বসতি করিবে?

উত্তর ৪২। নাদে শব্দ আছে, বিন্দুতে গতি আছে, গগন আমাদের মধ্যে আকর্ষণ আনে, কিন্তু এই সকল না থাকিলে বায়ু বা প্রাণপুরুষ নিরন্তরে বাস করিত। নিরন্তর = within (সিং সংগৃহীত)। বিদ্যাভূষণমহাশয়ের 'গোরক্ষ-বোধে' পবনের উৎপত্তি শব্দ হইতে, বায়ুর উৎপত্তি ও লয়স্থান নাদ ইত্যাদি বুঝায়। ডাঃ সিংএর 'গোরক্ষ-বোধ' হইতে নাদের শূন্যে স্থিতি পবনের মধ্যে লয়, ইত্যাদি বর্ণনা পাওয়া যায়।

তনুত্যাগ হইলে মন পবনে মিশিয়া যায়, পবন শব্দে মিশিয়া যায়, শব্দ প্রাণে মিশিয়া যায়, প্রাণ ব্রহ্মে মিশিয়া যায়, ব্রহ্ম হংসে মিশিয়া যায়। হংস সুরতিতে মিশে, শূন্য ওঁকারে মিশে। ওঁকার কালে মিশে, কাল জীবে মিশে, জীব শিবে মিশে। শিব নিরঞ্জনে মিশে, নিরঞ্জন জলে মিশে। (অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, প্রবাসী, চৈত্র ১৩২৯, পৃঃ ৭৬৩)

ইহার সহিত ডাঃ সিং-এর পুস্তকের প্রশ্নোত্তর-শ্লোক ৪১, ৪২, তুলনীয়। শ্রীযুক্ত বিদ্যাভূষণের দ্বারা প্রাপ্ত গোরক্ষ-বোধে ৬০টী শ্লোকসংখ্যা আছে, ডাঃ সিং দ্বারা প্রাপ্ত গোরক্ষ-বোধে, ১৩৩টী শ্লোকসংখ্যা আছে। হিন্দী 'গোরক্ষ-বিকাশ' নামক গ্রন্থে গোরক্ষবোধের ১২২টী শ্লোক আছে। এই গ্রন্থ সদানন্দ যোগী জালন্ধর হইতে প্রকাশিত করিয়াছেন। তেসিতরির মতে 'গোরক্ষ-বোধে' শৈব ও যোগতত্ত্ব সম্মিলিত। মাধবাচার্য্যের শৈব-সম্প্রদায়ের সহিত ইঁহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, একথা বলা যাইতে পারে। পতঞ্জলির যোগতত্ত্ব ও উপনিষদের যোগতত্ত্বের সহিত ইঁহাদের যোগতত্ত্বের যে নিকট সম্বন্ধ আছে তাহা চক্র, কৌশল, নাদ, পবন ও হংস প্রভৃতির আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যায়।[১] 'চক্রাদির বর্ণনা' নিবন্ধের সিদ্ধান্ত ও সাধনা অংশে করা হইয়াছে, এস্থলে কেবল কয়েকটি প্রশ্নোত্তর উদ্ধৃত করিতেছি, যথা—

প্রশ্ন ৫৭। কোন্ চক্রে চন্দ্রের নিরোধ কর্ত্তব্য? উত্তর—ঊর্দ্ধচক্রে।
কোন্ চক্রে সন্ধি (Union) কর্ত্তব্য? উত্তর—অধশ্চক্রে।
কোন্ চক্রে পবন-নিরোধ কর্ত্তব্য? উত্তর—পশ্চিমচক্রে।
কোন্ চক্রে জ্ঞানের উদয় হয়? উত্তর—হৃদয়চক্রে।
কোন্ চক্রে ধ্যান কর্ত্তব্য? উত্তর—কণ্ঠচক্রে।
কোন্ চক্রে বিশ্রাম কর্ত্তব্য? উত্তর—আজ্ঞা বা জ্ঞানচক্রে।

প্রশ্ন ৩৭। চন্দ্রসূর্য্য কোথায় থাকে, নাদবিন্দু কোথায় থাকে, হংস কোথায় চড়িয়া জল খায়, উল্টা-শক্তিকে কোন্ ঘরে আনিয়া বিশ্রাম করান হয়?

উত্তর ৩৮। চন্দ্র ঊর্দ্ধে, সূর্য্য অধে, নাদবিন্দু হৃদয়ে, হংস আকাশে চড়িয়া জলপান করে, উল্টা-শক্তিকে (Reserved power) নিজ ঘরে আনিয়া বিশ্রাম করান হয়।[২] এই প্রশ্নোত্তর ৩৭, ৩৮, ডাঃ সিং-এর গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। গোরক্ষবিকাশ গ্রন্থের শ্লোক ২৫ ও ২৬ ইহার অনুরূপ।

গ্রীয়ারসনের মতে 'গোরক্ষ-বোধ' একাদশ বা চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে রচিত হয়। ডাঃ সিং এরমতে উহা একাদশ শতাব্দীর বা তৎপূর্ব্বের। ইহার ভাষা মারাঠী, গুজরাটি, রাজস্থানী-মিশ্রিত পাঞ্জাবী, তথাপি সরল ও

১। E. R. E, Vol. VI, Gorakhnath, Grierson.
২। Gorakhanath—Singh, Appendix, pp. 8 ff.

স্পষ্ট, মাঝে মাঝে আরবী, ফারসী শব্দও আছে। কাশী কারমাইকেল লাইব্রেরীতে ইহার একটী খণ্ডিত মুদ্রিত পুস্তক আছে। শিবরাম শর্ম্মা ১৯১১ সালে বেনারস হইতে উহা প্রকাশিত করেন।[১]

যোধপুর বাণীভাণ্ডারে রক্ষিত 'শিস্ত প্রমাণ গ্রন্থ' নামক পুথিখানি মাত্র ডাঃ মোহন সিং-এর মতে গোরক্ষের রচনা, কিন্তু ডাঃ সিং উহা দেখেন নাই। তবে গোরক্ষনাথের নামে নিম্নলিখিত পুথিগুলি প্রচলিত বলিয়া ডাঃ সিং তাঁহার গোরক্ষনাথ গ্রন্থে জানাইয়াছেন (পৃ ১১):—

১। তিব্বতী পুথি, কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে জনৈক অধ্যাপকের নিকট আছে। ডাঃ সিং পুথির নাম দেন নাই।

২। গাথা ও পদ্য, রাগ রামকেলী—পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত, ১৭০১ খৃষ্টাব্দের। অনুলিপি নম্বর ৬৭৪।

৩। লাহোরে প্রাণসঙ্গলী পুথির অনুলিপি ১৭০১, ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দের। মাঙ্গাতে প্রাণসঙ্গলীর অনুলিপি ১৬০৬ খৃষ্টাব্দের।

৪। শব্দ শ্লোক—লাহোরে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে গুরুমুখীতে মুদ্রিত।

৫। বনবশী বিলাস,—বনারসী দাসকৃত, ১৫৪৬ খৃষ্টাব্দে, ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই সহরে মুদ্রিত।

৬। জনমশাখী, নানক, লাহোর হইতে মুদ্রিত ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে বনবশী বিলাসের উল্লেখ কল্যাণ-যোগাঙ্কে দ্রষ্টব্য।

জৈসীকৃত পদুমাবৎ কাব্যে (১৫২০ খৃষ্টাব্দ) গোরক্ষের 'শ্রুত-শব্দ-যোগ' কথা আছে। নামদেব, কবীর, নানক প্রভৃতির রচনাতেও 'অনহদ্-যোগ' বৃত্তান্ত আছে, উল্টা-সাধনের ইঙ্গিতও আছে। এই 'উল্টা-সাধন' নাথযোগীদের বৈশিষ্ট্য।

ডাঃ সিং গোরক্ষের রচনার নমুনা-স্বরূপ কয়েকটী পদ্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা :—অনত ন ভরমো সিধা তেরী কাইআং মধে সার। রহাউ। বোলতে কা খোজ করনা।

জীবতে হী উলটি মরণা। সহিজ হী অকাস চরনা। কাহে জম কা দণ্ড ভরনা উতর পরনা পার।[২]

অর্থাৎ হে সিদ্ধ, অন্যস্থানে গমন করিও না, তোমার দেহমধ্যেই সত্য আছে।

১। E. R. E., Vol XII (pp. 834-35). গোরক্ষবাণী—পীতাম্বর বড়থ্বাল. ভূমিকা, পৃ ১৯।
২। Gorakhnath—Singh, Appendix.

যে কথা কয় (অর্থাৎ 'শব্দ') তাহার সন্ধান কর, উল্টা সাধন দ্বারা জীবন্তে মর, সহজভাবে আকাশে গমন কর, তাহা হইলে মৃত্যুর হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়া তুমি পারে যাইবে।

গোরক্ষের সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী কালের নাথযোগীদের, 'পা' সিদ্ধাদের, আচার্য্য ও অবধূতদের, হিন্দু ও মুসলমান ভক্তদের ও শিখ গুরুদের ভাষা একটী বিশেষরূপ ধারণ করিয়াছিল, বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত রহস্যবাদীরা একই জলবায়ু গ্রহণ করিয়া পরস্পরের মধ্যে ভাবের যে আদান-প্রদান করিতেছিলেন ও মধ্যযুগের রহস্যবাদের প্রসারক্ষেত্রের বৃদ্ধি করিতেছিলেন, তাহারই ফলে এইরূপ একটী ভাষার সৃষ্টি সম্ভব হয়। নাথদিগের ভাষা অপভ্রংশ, মহারাষ্ট্রী ও রাজপুত ভাষা মিশ্রিত, পা-দিগের ভাষা অধিকাংশই প্রাকৃত। ভাষাদ্বারা বিচার করিলে গোরক্ষনাথ ও গোপীচাঁদকে রাজপুতানার অধিবাসী বলিতে হয়।[১]

গোরক্ষ-গোপীচাঁদ কাহিনী নাটকাকারেও ভারতে প্রচলিত। গোপীচাঁদের গৃহত্যাগ বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগের ন্যায়ই হৃদয়স্পর্শী, এই করুণ কাহিনী অম্বালা-প্রদেশের জগাধ্রীনগরে অভিনীত হইয়া থাকে।

নেপালে নেওয়ারী ভাষায় রচিত গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস-বিষয়ক একটী বাংলা নাটক পাওয়া উহা কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় রক্ষিত আছে। (উহা ১৬২০-৫৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়)।[২]

নেপালের এই নাটকের শেষাংশের সহিত দুর্ল্লভ মল্লিকের গোবিন্দচন্দ্রের গীতের শেষাংশের বেশ মিল আছে।

মহারাষ্ট্র প্রদেশে হরিহর কর্ত্তৃক ভর্ত্তৃহরি-নির্ব্বেদ নাটক রচিত হয়। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার প্রাচ্য সভার পত্রিকায় গ্রে সাহেব উহা প্রকাশিত করেন।[৩]

ডাঃ পীতাম্বর বড়থ্বাল এলাহাবাদ হইতে ১৯৪২ সালে প্রকাশিত তাঁহার সঙ্কলিত 'গোরক্ষ-বাণী'র ভূমিকায় (পৃ ১৯) লিখিয়াছেন যে 'সবদী' গোরক্ষের সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক রচনা, কিন্তু উহা গোরক্ষ-বোধের ন্যায় পরিচিত নহে। সবদীর ভাষার নমুনাস্বরূপ কিছু শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি—

বসতী ন সূন্য সূন্য ন বসতী অগম অগোচর এসা।
গগন সিখর মহি বালক বোলৈ তাকা নাঁব ধরহুগে কৈসা।

১। Ibid., pp. 38-40. *Re* Goraksha's language.
২। Briggs, p. 206. বা. সা. ই. সুকুমার সেন, পৃ ৯৫৫, ৯৬১
৩। E. R. E., Vol. VI. Gorakhnath.

অর্থাৎ পরমতত্ত্ব অগম ও অগোচর উহাকে বস্তি অর্থাৎ আছে বা শূন্য অর্থাৎ নাই, এরূপ বলা যায় না, উহা ভাবাভাব সৎ ও অসৎ-এর ঊর্দ্ধে। উহা আকাশে কথা কহিবার বালক অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্রের ব্রহ্ম, তিনি পাপ-পুণ্যহীন বালকের ন্যায় বিরাজ করেন, তাঁহার নাম কি প্রকারে রাখা যাইতে পারে? কারণ তিনি নাম ও রূপের অতীত বস্তু।

অদেখি দেখিবা দোখ বিচারিবা অদিসিটি রাখিবা চীয়া।
পাতাল কী গঙ্গা ব্রহ্মাণ্ড চড়াইবা, তহা বিমল জল পীয়া।
ইহাঁ হী আছে ইহাঁ হী অলোপ। ইহা হী রচিলে তীনি ত্রিলোক
অছে সগৈ রহৈ জূবা। তা কারণি অন ত সিধা জোগেস্বর হূবা।

অর্থাৎ অদেখাকে (পরব্রহ্মকে) দেখিবে, দেখিয়া বিচার করিবে। যাহা আঁখি দ্বারা দেখা যায় না, তাহাকে চিত্তে রাখিবে। পাতালের (মণিপুর-চক্র) গঙ্গাকে (কুণ্ডলিনী) ব্রহ্মাণ্ডে (সহস্রারে) প্রেরণ করিয়া যোগী নির্ম্মল জল পান করিবে।

এইখানে সহস্রারে পবব্রহ্ম অলোপ বা লুপ্ত হইয়া আছেন, ত্রিলোকের রচনা এইখান হইতে হইয়াছে। অক্ষয় পরব্রহ্ম সর্ব্বদা সঙ্গে আছেন, সেই কারণে অনন্ত সিদ্ধ যোগমার্গে প্রবেশ করিয়া যোগেশ্বর হইয়াছেন।[১]

পণ্ডিত সদানাথ যোগী "গোরক্ষ-বিকাশ" নামে যে গ্রন্থটী জালন্ধর হইতে প্রকাশিত করিয়াছেন,তাহাতে গোরক্ষনাথ মৎস্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতি রচিত গ্রন্থের এক তালিকা দিয়াছেন,তন্মধ্যে গোরক্ষনাথের নামে প্রচলিত আছে:—

গোরক্ষসংহিতা	কায়বোধ
যোগমহিমা	ব্রহ্মজ্ঞান
যোগ সিদ্ধান্ত পদ্ধতি	সিদ্ধান্তভাস্কর
বিবেক মার্ত্তণ্ড	নামলক্ষণাবলী
চতুঃ শীত্যাসন	যোগপ্রদীপিকা
সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি	অমৃত-সিদ্ধি
গোরক্ষ-পদ্ধতি	গোরক্ষশতক
হঠযোগ-প্রদীপিকা	গোরক্ষবোধ
জ্ঞানদীপবোধ	খেচরী বিদ্যা

প্রভৃতি অর্দ্ধশতাধিক গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন।

১। গোরখ-বাণী, বড়থ্বাল, পৃ ১, ২।

মৎস্যেন্দ্রনাথের রচিত—মৎস্যেন্দ্রনাথ-সংহিতা, মৎস্যেন্দ্রনাথ-পদ্য-শতক, মহাদেব-মৎস্যেন্দ্রসংবাদ, নাড়ীতত্ত্ব—এই কয়টীর নামোল্লেখ করিয়াছেন।[১] সিদ্ধগণ-মধ্যে ঘোড়াচলী, চতুরঙ্গীনাথ, ভর্তৃহরি, চরপটী, গোপীচাঁদ প্রভৃতির রচনাবলী প্রচলিত আছে।

দত্তাত্রেয়ের সহিত গোরক্ষনাথের যে তর্ক হয় তাহাব পুথি দত্ত-গোরক্ষগোষ্ঠী নামে খ্যাত। কবীরের সহিত তর্কগ্রন্থও গোরক্ষনাথকী গোষ্ঠী নামে খ্যাত। বিষ্ণুপুরাণে (৪র্থ-২১) ও শ্রীমদ্‌ভাগবত-পুরাণে (১।৩, ২।৭) দত্তাত্রেয়-বৃত্তান্ত আছে, ইনি মহর্ষি অত্রির পুত্র, অলর্ক ও প্রহ্লাদকে আত্মবিদ্যা উপদেশ দেন।[২]

Prof. Theodore Aufrecht তাঁহার Catalogus Catalogorumএ গোরক্ষের রচিত নিম্নলিখিত সংস্কৃত গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন এবং গোরক্ষকে মীননাথের শিষ্য বলিয়াছেন :—

১। গোরক্ষশতক বা জ্ঞানশতক

২। চতুরশীত্যাসন

৩। জ্ঞানামৃত

৪। যোগ-চিন্তামণি

৫। যোগ-মহিমা

৬। যোগ-মার্ত্তণ্ড

৭। যোগ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি

৮। বিবেক-মার্ত্তণ্ড

৯। সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি[৩]

জালন্ধরিনাথের কৃপায় যোধপুর রাজবংশের মানসিংহ মাড়োয়ারের রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হন, তাই তিনি গুরুর প্রশংসা করিয়া স্বয়ং নাথ-প্রশংসা, নাথচরিত, ইত্যাদি ষোড়শটী গ্রন্থ রচনা করেন ও তাঁহার সপ্তদশ সভাসদেরাও বহু গ্রন্থ রচনা করেন। এই সকল পুথি উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্ত্তী কালের রচনা। গোরক্ষনাথের প্রচলিত গ্রন্থ সকলও মানসিংহ সংগ্রহ করেন। তাহাদের ভাষার সহিত দ্বাদশ শতাব্দীর পরবর্ত্তী কালের ভাষার সাদৃশ্য আছে।[৪]

১। গোরক্ষ-বিকাশ, সদানাথ যোগী (কৈলাস আশ্রম, জালান্ধর) পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

২। জীবনী-কোষ, শশী বিদ্যালঙ্কার, দত্তাত্রেয় দ্রষ্টব্য। রেঙ্গুন, ১৩৩৬ খৃঃ প্রকাশিত।

৩। Report on the Search of Hindi—M. S. S., 1902, p. 5,

৪। Report on the Search of Hindi—M. S. S, 1902, pp 44, 4, 26.

১৭০৯ খৃষ্টাব্দে সংগৃহীত কবীরের বাণীর জয়পুরের এক সংগ্রহ-গ্রন্থে গোরক্ষনাথের কয়েকটী গ্রন্থের পরিচয় আছে, শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় তাহার উল্লেখ করিয়াছেন (দাদূ, পৃ ১৭৬)। যথা—পন্দ্রহতিথি গ্রন্থ, নির্ভর-বোধগ্রন্থ, প্রাণসংগলী, মিথাদর্শন-যোগগ্রন্থ, অনভয়মাত্রবোধ-গ্রন্থ, মচ্ছন্দগোরখবোধ-সংবাদ, আত্মবোধ, যোগগ্রন্থ, রোমাবলীগ্রন্থ জ্ঞানবতীক বা সারিকবোধ ইত্যাদি। যোগেশ্বরী-সব্দী নামে গোরক্ষ-রচিত একটী পুথি ও নবনাথ-রচিত পদাবলী ক্ষিতিবাবু জয়পুরের জনৈক অবধূতের নিকট দেখেন। পদাবলীতে গৌড়ীয় নাথপদও আছে যথা—

"অদেখ দেখিবা, দেখি বিচারিয়া, আকৃষ্ট রাখিবা" ইত্যাদি,

"পাতাল গঙ্গা স্বর্গে চড়াইবা" ইত্যাদি।

১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে রচিত মচ্ছেন্দ্রনাথজী কা পদ যোধপুরে গ্রন্থাগারে আছে এবং গোরক্ষের নামে প্রচলিত যোধপুর গ্রন্থাগারে এই সকল পুথি আছে—

		শ্লোকসংখ্যা
১।	জ্ঞান-সিদ্ধান্ত-যোগ	৭৫ শ্লোক
২।	যোগেশ্বরী সাখী	৬১৫ "
৩।	গোরক্ষনাথজী কা পদ	৩৫০ "
৪।	জ্ঞান-তিলক	৭৫ "
৫।	দত্ত-গোরক্ষ-সংবাদ	১০১ "
৬।	বিরাট-পুরাণ	২৭০ "
৭।	নরবে বোধ	১৬০ [২৫]

এতদ্ব্যতীত গোরক্ষের নামে প্রচলিত আরও যে সকল পুথি উক্ত গ্রন্থাগারে আছে তাহাদের নাম—

গোরক্ষনাথজী কা পদ	
গোরক্ষনাথ জীকে ফুটকারা গ্রন্থ	১৩৫০ খৃঃ
গোরক্ষ-সংহিতা	১৮১০ খৃঃ
গোরক্ষ-সংহিতা-ভাষা	১৮১০ খৃঃ
যোগেশ্বরী-সাখী	১৩৫০ খৃঃ। [২৬]

যোধপুর রাজ মানসিংহ গোরক্ষ-রচিত গ্রন্থাদির সংগ্রহ করেন,

২৫। Ibid., p 44.

২৬। Ibid., appendix I

গোরক্ষের নামে সপ্তবিংশ গ্রন্থ প্রচলিত আছে, ইহাদের অক্ষর দেবনাগরী।

১। গোরক্ষবোধ
২। রামবোধ
৩। গোরক্ষ-গণেশ-গোষ্ঠী
৪। মহাদেব-গোরক্ষ-সংবাদ
৫। গোরক্ষ-দত্ত-গোষ্ঠী
৬। কম্ভড়বোধ
৭। নষ্টমুদ্রা
৮। পঞ্চমাত্রী-যোগ
৯। অভয়-মাত্রা
১০। দয়াবোধ
১১। নরবেবোধ
১২। অংকলিশ্রিলোক
১৩। কাফরবোধ
১৪। গোরক্ষনাথজী কা সতরাকলা
১৫। আত্মবোধ
১৬। প্রাণ-সংকলী
১৭। জ্ঞান-চৌতীষা
১৮। জ্ঞান-তিলক
১৯। সংখ্যা-দরশন
২০। রহরাস
২১। নাথজী কা তিথ
২২। বত্রীশ লছণ
২৩। গ্রন্থ রোমাবলী
২৪। ছন্দ গোরক্ষনাথজী কা
২৫। কিসন অসতুতি করি
২৬। সিদ্ধইকবীস গোরক্ষনাথজী কা
২৭। শিষ্ট প্রমাণ গ্রন্থ।[১]

ইহা ব্যতীত 'গোরক্ষ-গোষ্ঠী' নামক একটী হিন্দী পুস্তিকা পাইয়াছি। তাহা বাবা লক্ষণদাসজী কর্ত্তৃক বেনারস হইতে প্রচারিত হইয়াছে। যোধপুর, মান্দ্রাজ, কাশী, হরিদ্বার, তাঞ্জোর প্রভৃতি স্থান হইতে সংস্কৃতে গোরক্ষনাথ-রচিত 'সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি' 'অমরৌঘ-প্রবোধ' 'যোগমার্ত্তণ্ড' 'আত্মবোধ' 'গোরক্ষ-উপনিষদ্', 'যোগ-বিষয়' (মৎস্যেন্দ্র বিরচিত) ও গোপীচাঁদ প্রভৃতি বিভিন্ন সিদ্ধাদের রচিত যে সকল পদ ও পুথি আমি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি. তাহা সাধারণ্যে প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা আছে। নাথ-সাহিত্যের সমালোচনামূলক গবেষণার উদ্দেশ্যে এইগুলি লইয়াই এক্ষণে আমি আলোচনা করিতেছি।

এক্ষণে বঙ্গদেশে বঙ্গভাষায় রচিত মীননাথ, গোরক্ষনাথ, গোপীচন্দ্র সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ প্রচলিত আছে তাহার উল্লেখ করিব। মৎস্যেন্দ্র বা মীননাথের নাম চলিত বঙ্গভাষায় 'মোচন্দরে' দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার প্রভাব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ন হয় নাই। বঙ্গভাষার পুথিগুলি অধিকাংশই অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত।

১। Ibid p. 26

১। গোরক্ষ-বিজয়—প্রাচীনতম পুথির লিপিকাল ১১৮৪ সাল, ফয়জুল্লা মরহুম প্রণীত, আব্দুল করিম সম্পাদিত। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ হইতে ১৩২৪ সালে প্রকাশিত।

২। মীন-চেতন—প্রাচীনতম পুথির লিপিকাল ১২২৪ সাল, শ্যামাদাস সেন প্রণীত। নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত ও প্রকাশিত, ঢাকা সাহিত্য-পরিষদ্, ১৩২২।

৩। গোপীচন্দ্রের পাঁচালী—ভবানীদাস বিরচিত ৪। গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস—সুকুর মহম্মদ বিরচিত	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গোপীচন্দ্রের গান নামে প্রকাশিত, ১৯২৪
৫। গোপীচন্দ্রের গীত ৬। ময়নামতীর গান	নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত ঢাকা সাহিত্য-পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত।

৭। গোবিন্দচন্দ্রগীত - দুর্লভ মল্লিক সঙ্কলিত, শিবচন্দ্র শীল কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত, ১৩০৮ সাল।

৮। মাণিকচন্দ্রের গান—রংপুর হইতে গ্রীয়ারসন সংগৃহীত ও সঙ্কলিত। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত।

৯। নেপালে প্রাপ্ত বাংলা নাটক 'গোবিন্দচন্দ্রের সন্ন্যাস'-বিষয়ক। পুথিটী কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় রক্ষিত আছে।[১]

বঙ্গ-সাহিত্যে গোরক্ষের যোগ-পরিচয়

বঙ্গভাষায় রচিত গোরক্ষ-বিজয় প্রভৃতিতে গোরক্ষের পরিচয় অল্লাধিক পাওয়া যায়। যথা—দেবী মহাদেবকে প্রশ্ন করিতেছেন :—

"সপ্তবার মর যদি হও সপ্তবার।
একবার মর তুমি একখানি হাড় ॥
*　　*　　*　　*　　*
তুহ্মি কেনে তর গোসাঞি আহ্মি কেন মরি।
হেন তত্ত্ব কহ দেব জোগে জোগে ধরি ॥" (গোরক্ষ-বিজয়, পৃঃ ১২)

১। বা. সা. ই. সুকুমার সেন. পৃ ৯৫৫

অর্থাৎ আমি যতবার জন্মাই ততবার মরি, তুমি অমর, তোমার কোন পরিবর্ত্তন নাই কেন? তুমি কেন পরিত্রাণ পাও, আমি কেন মরি? এই তত্ত্ব যুগে যুগে অপরিবর্ত্তনীয়, তুমি ইহার কারণ বল। দেবীর প্রশ্নে মহাদেব ক্ষীরোদ সাগরে গিয়া তাঁহাকে পরমতত্ত্ব কথা শুনাইলেন, নিদ্রিতা দেবী তাহা শুনিতে পাইলেন না। 'মহাজ্ঞান' লাভ করিলেন মৎস্যরূপী মীননাথ। এই 'মহাজ্ঞান' দ্বারাই মরণশীল দেহের পরিবর্ত্তন সাধিত হয় ও অমরত্ব লাভ হয়, সেই শুদ্ধ বা পক্কদেহই শিবতনু নামে খ্যাত।

শিবভক্ত চারিসিদ্ধা যোগসাধনে রত, দেবী, মহাদেবের অনুমতি লইয়া তাঁহাদের ছলনা করিলেন। সিদ্ধারা দেবীর ছলনায় মুগ্ধ হইলেন ও "জেমত মাগিলা তবে তেমত পাইলা বর" (পৃ ২১)। একমাত্র গোরক্ষ দেবীকে মাতৃরূপে কামনা করিলেন এবং দেবীর সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। পরাজিতা দেবী গোরক্ষের উদরে মক্ষিকারূপে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিলেন, গোরক্ষ দশমীদ্বার রুদ্ধ করিয়া আসনে বসিলেন, পরে দেবীর অনুরোধে তাঁহাকে মুক্ত করিলেন, কিন্তু দেবীর তাহাতে কাকলি ভাঙ্গিল। দেবী প্রতিশোধ লইবার জন্য এক বরপ্রার্থিনী কন্যাকে গোরক্ষনাথকে বর দিয়া বসিলেন। গোরক্ষ বিবাহে বাধ্য হইলেন, কিন্তু বিবাহের রাত্রিতে কন্যাকে মাতৃ-সম্বোধন করিলেন এবং ছয় মাসের শিশুর রূপ ধারণ করিয়া স্তন্যপান করিতে চাহিলেন। কন্যা ক্রুদ্ধা হইয়া অভিযোগ করিলে, গোরক্ষ নিজ বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে লাগিলেন "আহ্মি নহি স্ত্রী-পুরুষ", দেবী তোমাকে বর দিয়া তোমার সহিত কপটতা করিয়াছেন, কারণ আমার শরীর (যোগ-সাধনার দ্বারা) কাষ্ঠবৎ শুষ্ক হইয়াছে, আমি গন্ধহীন পুষ্পের ন্যায়। তুমি পুত্রবতী হইতে চাহতো আমার এই 'কর্পটী' ধৌত করিয়া জলপান কর। (পৃ ৩৭, ৩৮)

উপরোক্ত বিবরণ হইতে বুঝা যায় গোরক্ষ সংযমী পুরুষ ছিলেন এবং যোগসাধনায় তাহার শরীর শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় হইয়াছিল। দেবী বারংবার পরীক্ষা করিয়াও তাহাকে পরাজিত করিতে পারেন নাই, কন্যার বরপ্রার্থনা পূর্ণ করাও দেবীর পরীক্ষা।

মীননাথ কিন্তু দেবীর আজ্ঞায় কদলীর দেশে ষোলশত কদলী লইয়া দিন যাপন করিতে করিতে হীনবীর্য্য হইলেন, কানফা যোগীর নিকট

এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া গোরক্ষ গুরুর উদ্ধারে চলিলেন। গোরক্ষ 'কর্ণে কৌড়ি' দিয়া যোগীর বেশ ধারণ করিলেন ও শূন্যে ভর করিয়া বায়ুপথে চলিতে লাগিলেন। শূন্যে বিচরণ-ক্ষমতা হইতে গোরক্ষের সিদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। মীননাথের পুত্র বিন্দুনাথকে ধোপার পাটে আছড়াইয়া মারিয়া পুনরায় জীবিত করাও তাঁহার অন্যতম সিদ্ধিপ্রদর্শন। (পৃ ১৮২)

অবশেষে নটীর বেশে গোরক্ষ মীননাথের সভায় প্রবেশের পথ পাইলেন। তাঁহার রূপ দেখিয়া গুরু মুগ্ধ হইলেন, গোরক্ষ বলিলেন "আমি তোমার পুত্রবধূ, তোমার পাটেশ্বরী হইব কিরূপে?" গোরক্ষ নৃত্য করিতে করিতে নিজের সত্যকার পরিচয় দিলেন। মীননাথ অবিশ্বাস করিলে গোরক্ষ শূন্যে ভর করিয়া নৃত্য করিলেন, তৎপরে জলমধ্যে থালা রাখিয়া নৃত্য করিলেন। তথাপি মীননাথ কদলীদের মোহ ত্যাগ করিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। তখন গোরক্ষ গুরুকে বলিলেন "তুমি গুরু অজ্ঞান হইয়া এ কিরূপ কাজ করিলে? তুমি দ্বারমুক্ত করিয়া রাখিলে এবং সেই পথে চোর প্রবেশ করিল, তুমি গুরু হইয়া

> "আপনে ডুবালা গুরু কায়া আপনার।
> ডুবিল তোহ্মার নৌকা কাছি গেল ছিড়ি।
> তোহ্মার সকল ভরা করিলেক চুরি ॥
> আহ্মার বচন তুহ্মি কিছু নাহি লও।
> পড়িছ কদলির ভোলে মনে ভাবি চাও।" ইত্যাদি।
>
> (পৃ ১০৬-১০৮)।

মীননাথ স্বীয় গুরু মহাদেবের দোহাই দিয়া বলিলেন তিনি গঙ্গা গৌরী দুই নারী লইয়া বাস করেন। গোরক্ষ বলিলেন "তোমার গুরু নিরন্তর ভোগ-সাধনে রত, তথাপি কোন সময়ে তাঁহার বিস্মৃতি ঘটে না। "হরি মনিষ্যি নহে, জান অনাদিনিধন, ভাবিআ দেখহ গুরু তুমি কোন জন।"(পৃ ১১২)। শিবের অঙ্গে চারিচন্দ্রের সঙ্কেত ব্যাপিয়া আছে, এই সাধন করিতে পারিলে পরিত্রাণ লাভ হয়। এই শিব একমূর্ত্তি নহেন, তিনি জগৎ জনের জীব, সর্ব্বভোগ তিনি আহার করেন।" (পৃ ১১৩) আদি, নিজ, উন্মত্ত ও গরল এই চারিচন্দ্র-মধ্যে যে তিনচন্দ্র সংবরণ করিয়া গরলচন্দ্র ভক্ষণ করে সেই রক্ষা পায়। তুমি গুরু কোন কর্ম্ম করিলে,

জ্ঞান ভুলিয়া শক্তিহীন হইলে। তুমি আপনার ধন দিয়া ঘর শূন্য করিলে "প্রদীপ নিবিলে বাপু কি করিব তৈলে?" (তুলনীয়-প্রদীপ নিবিলে কি করিবে তৈলে-গোপীচন্দ্রের পাঁচালী, পৃ ৩:৬, গোপীচন্দ্রের গান, ২য় খণ্ড দ্রষ্টব্য)। তুমি গুরু উলটিয়া যোগ ধর (ইহা উল্টা সাধনের ইঙ্গিত), কায়া স্থির কর, নিজ মন্ত্র স্মরণ কর, গোরক্ষের বাক্যে নিজ পিণ্ড রক্ষা কর (পৃ ১১৫), কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহকে 'খেমাই'এর চাকরি করিতে দাও, অর্থাৎ অধীন কর, সকল ছাড়িয়া 'খেমাই'কে রাজা কর (পৃ ১৫২)। 'খেমাই' অর্থে সংযম, সংযমই দেহের রাজা, গরলচন্দ্র অর্থে শুক্র (তুলনীয়-"কদাচিৎ নিজচন্দ্র না করিবা ব্যয়, বার বৎসরের আয়ু একদিনে ক্ষয়" [পৃ ১৮৮])।

এই চারিচন্দ্র-সাধনের কথা বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যেও আছে। শোণিত, শুক্র, মল ও মূত্র, এই চারিটি দেহনির্গত পদার্থকে জীব পিতা ও মাতা হইতে প্রাপ্ত হয়, অতএব উহাদিগকে ত্যাগ না করিয়া পুনরায় শরীর-মধ্যে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ইহাই 'চারিচন্দ্র-ভেদ' বা 'গায়ত্রী-ক্রিয়া' নামে প্রচলিত। ইহা অতীব গুহ্য ব্যাপার। মল, মূত্র ও শুক্র এই তিনের সমবেত নাম 'ত্রিবেণী' বা 'ত্রিকুটি' বীজমার্গী সম্প্রদায় শুক্রকেই 'পরব্রহ্ম' বলিয়া বিশ্বাস করে, কারণ শুক্র হইতেই সমস্ত জীবের উৎপত্তি হয়। ইহাদের ভজনালয়ে গোরক্ষ প্রভৃতি বিরচিত ভজন গীত হয়।[১] গোরক্ষ-বিজয়ের উল্লিখিত স্থানে (পৃ ১১৩) এই চারিচন্দ্র-ভেদের কথাই উক্ত হইয়াছে মনে হয়।

অন্যত্র গোরক্ষ বলিতেছেন 'উল্টা সাধন' দ্বারা অর্থাৎ শুক্রের প্রবাহ ঊর্দ্ধমুখে নীত করিয়া দেহমধ্যে মহারসের সঞ্চার কর। "যদি সে সাধিবা কায়া উলটি ধর জোগ উলটিয়া ধর গুরু সুমেরুর কলা। দশমীর দ্বার ভেদি ঢোকে ঢোকে তোল উজাউক মহারস ভরৌক খালজোর (পৃ ১৪৫)।" 'উল্টা-যোগ' অর্থে সুষুম্নার পথে কুণ্ডলিনী শক্তিকে ঊর্দ্ধে নীত করা, তাহার ফলে মহারস অর্থাৎ শুক্র ক্ষয় না হইয়া দেহস্থ শক্তি বৃদ্ধি করিবে, আয়ু বর্দ্ধিত হইবে। ইহাই পূর্ব্বোক্ত হিন্দী সাহিত্যে বর্ণিত "জীবতে হি উলটি মরণা" অর্থাৎ উল্টা সাধন দ্বারা জীবন্মৃত হও। যোগধর্ম্মের প্রধান লক্ষ্য আয়ু-রক্ষা, বীর্য্য-রক্ষার দ্বারাই আয়ু বর্দ্ধিত করা সম্ভব। ইহাতেই

১। ভা-উ-স. (১ম), পৃ ১৭৩, ২৩৬, ২৭১, বাউল সংন্যাসী ও বীজমার্গী সম্প্রদায়।

জীবিত থাকিয়াও মৃতের ন্যায় ব্যবহার বা সংযত জীবন, ইহাই নূতন জীবন। তাই গোরক্ষ বলিতেছেন : "হে গুরু, সংযম না করিয়া তুমি কামরসে তনু ভাসাইলে (পৃ ১২৩, ১২৪) এখনও ভাবিয়া দেখ—

"কায়া সাধ, কায়া সাধ, মাদলে হেন বোলে" (পৃ ৯৪)।

তুলনীয়—পৃঃ ৯৫, ৯৯, ১৩০, ১৫০।

গোরক্ষ বারংবার গুরুকে কায়া সাধন করিতে অনুরোধ করিতেছেন, কারণ ইহার দ্বারা অজরত্ব ও অমরত্ব লাভ হয়। এই কায়া-সাধনে 'শঙ্খিনী' নাড়ী সহায়।

সরুয়া সংখিনী সঙ্গে একা ভেদি কাল
পরিচয় করি হাসা বন্দি কর কাল॥ (পৃ ১৪৪)।

এই 'সংখিনী' বা নাগিনীর সাহায্যে কালজয়ের বিবরণ অতঃপর দেওয়া হইতেছে।

গুরু মীননাথ বলিতেছেন, "উলটি সাধিতে যোগ গাত্র-বল নাই, কেমতে সাধিব যোগ বিপতে (বিপথে) মরিমু" (পৃ ১১৬)। তথাপি গোরক্ষের অদম্য উৎসাহ, গুরুকে তিনি বলিতেছেন—

"সট্‌চক্র ভেদ গুরু খেলাউক উজান॥
মেরু মূলে রহিবে চন্দ্র না টুটিবে কলা।
বেঙ্কা নালে সাধ গুরু না করিয় হেলা॥
ইঙ্গিলা পিঙ্গিলা বুঝিবা বাউ সন্ধি।
রবি শশি চলিয়াছে তারে কর বন্দি॥

* * *

উলটিয়া হৌক পুষ্প পুনি কর ধ্যায়ান।
বুঝ বুঝ য়াএ গুরু তত্ত্ব ব্রাহ্ম জ্ঞান।
চাপ তিন তিহড়ি উড়িয়া জাউক ধুয়া।
আনল জ্বালহ গুরু স্থির কর কায়া।
ত্রিপিনী করিয়া স্থির কর্ণে দেঅ তালী॥"

(পৃ ১৪৭, ১৪৮)।

ইহা ষট্‌চক্র-ভেদের সঙ্কেত. বেঙ্কানাল-পথে কুণ্ডলিনী শক্তিকে উর্দ্ধে নীত করিবার ও শ্বাসপ্রশ্বাস (রবিশশি) বশ করিয়া, অধোমুখী পুষ্প অর্থাৎ সহস্রার-মধ্যে ধ্যান-নিমগ্ন হইবার ইঙ্গিত। সুপ্তা কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিত হইলে অনল জ্বলিয়া উঠিবার ন্যায় অনুভূতি হয়, এইরূপে

অক্ষয় বীর্য্যভাণ্ডার সঞ্চয় করিয়া কায়াসাধন কর্ত্তব্য। ইহার সহিত তুলনীয় চর্য্যাপদ ৪নং তিঅড্ডা চাপী জোইনী দে অঙ্কবালী ইত্যাদি, অর্থাৎ ললনা, রসনা ও অবধূতিকা (ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার নামান্তর) নাড়ীত্রয়কে চাপিয়া নিরাভাস কর, এইরূপে 'মহামুদ্রা' সাক্ষাৎকার হইবে। নাথযোগীদের মধ্যে 'মহামুদ্রা' সাক্ষাৎকার হওয়া অর্থে 'মহাজ্ঞানে'র বা যোগযুক্তজ্ঞানের প্রকৃত অধিকারী হওয়া। এই জ্ঞান-লাভের জন্য 'উল্টা সাধন' নামক একটী অতীব কঠিন সাধন ইঁহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। এই সাধনে নাড়ীত্রয়কে স্ববশে আনিয়া 'মহারস' বা বীর্য্যকে উর্দ্ধমুখে নীত কবিয়া রক্ষা করিতে হয়। এই সাধনের উপব নাথযোগীরা বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করিতেন, ইহাই তাঁহাদের জীবন্মৃত অবস্থা বা সাধন-দ্বারা নতুন জীবন লাভ, এই জীবন্মুক্তির জন্য নাথযোগিগণেব যোগমধ্যে 'কালজয়' ও 'কায়াসাধনে'ব বৈশিষ্ট্য ছিল (সাধনা-অংশে দ্রষ্টব্য)। যোগীদের উল্টা সাধনের নিমিত্ত 'বঙ্কনালে'ব অবস্থিতি জানা কর্ত্তব্য। 'ব্রহ্ম-সংকলী' প্রভৃতি বৈষ্ণব-সাহিত্যেও 'বঙ্কনালে'র কথা পাওয়া যায়। বৈষ্ণব-সহজিয়াদের মধ্যে সুফী, বাউল প্রভৃতি উত্তর ভারতের মধ্যযুগের সাধকদের মধ্যে, নাথযোগীদের মধ্যে এবং উড়িষ্যা-প্রদেশেও এই উল্টা সাধন প্রচলিত ছিল। লিঙ্গজয়ের প্রধান সহায় এই সাধন। অতএব সাধকদের মধ্যে গুপ্তভাবে 'বঙ্কনালে'র সাহায্যে সাধনতত্ত্ব প্রচারিত হইত। 'কায়াসাধন' বা শারীরিক পবিবর্ত্তন-দ্বারা দীর্ঘজীবী হওয়ার উপর নাথযোগীর প্রাধান্য দিতেন, তাহাও বঙ্কনালের অবস্থিতি না জানিলে সম্ভবপর নহে।

গোরক্ষ গুরুকে উপরোক্ত শ্লোকে বলিতেছেন :

"মেরুমূলে রহিবে চন্দ্র না টুটিবে কলা।
বেঙ্কানালে সাধ গুরু না করিও হেলা॥"

ইহার দ্বারাও বঙ্কনালের অবস্থিতি ও তাহার দ্বারা সাধনের বিষয় গুরুকে সচেতন করিয়া দিবার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই সাধন-ফলে 'মেরুমূলে রহিবে চন্দ্র' অর্থাৎ বীর্য্য বা চক্র রক্ষা হইবে এবং 'না টুটিবে কলা' অর্থে দেহ ভগ্ন হইবে না, এইরূপ ইঙ্গিত বুঝা যায়। চন্দ্রের ষোড়শ কলার মধ্যে অমৃত অন্যতম, তাহা রক্ষা করিলেই দেহ-রক্ষা সম্ভবপর হয়। গোরক্ষ-বিজয়, ময়নামতীর গান, রূপকথা প্রভৃতিতে সর্ব্বত্র "প্রদীপ নিবিলে তেল দিয়া কি হইবে? জল চলিয়া গেলে আইল বাঁধিয়া ফল কি?" প্রভৃতি

উপদেশ পাওয়া যায়। সংস্কৃত উদ্ভট কবিতাতেও 'নির্ব্বাণদীপে কিমু তৈলদানম্' প্রভৃতি আছে। নাথযোগীরা চন্দ্র ও সূর্য্য দ্বারা ইড়া-পিঙ্গলার ইঙ্গিত করিতেন, ইহার একটির দ্বারা ক্ষয় (সূর্য্য দ্বারা) ও অন্যটীর দ্বারা রক্ষা হয়। এই 'চন্দ্র'ই 'মহারস' নামে পরিচিত, ইহাই সোম বা অমৃত রস। মানব-দেহ মস্তক-মধ্যে সহস্রার চক্র হইতে তালুমূল পর্যন্ত একটী ক্ষীণ নাড়ী আছে, তাহার নাম 'শঙ্খিনী', এই নাড়ীর পথ বক্র বলিয়া ইহা 'বঙ্কনাল' নামেও পরিচিত। এই শঙ্খিনী নাড়ীকে দুইটী মুখযুক্ত সর্পরূপে গোরক্ষবিজয়ে উল্লেখ করা হইয়াছে—"ফিরাও খেলাও গুরু দুই মুখ সাপে"। (পৃ ১৪১) ইহার একটী মুখ 'দশমীদ্বার' নামে পরিচিত (সাধনা-অংশে চতুর্থ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। এই পথে সহস্রার হইতে মহারস দেহমধ্যে সঞ্চারিত হয়, অজ্ঞান মানবের দেহস্থ অন্যান্য নবদ্বার-পথে উহা বিনষ্ট হয়, একমাত্র যোগীরা এই 'নবদ্বার' রুদ্ধ করিতে জানেন। শঙ্খিনী নাড়ীর অন্য মুখ দ্বারা বীর্য্য ঊর্দ্ধমুখে নীত হয় এবং দেহরক্ষা হয়, ইহাই উল্টা সাধন বা বিপরীত সাধন। অমৃত বা চন্দ্র যাহাতে সূর্য্যের অগ্নিতে পড়িয়া নষ্ট না হয় এবং মৃত্যু না ঘটে, সে বিষয়ে যোগীরা সর্ব্বদা সচেষ্ট। এই নিমিত্ত দশমীদ্বার রুদ্ধ করিয়া যোগীরা মহারস রক্ষা করেন। গোপীচন্দ্রের গানে মাতাপুত্রের প্রশ্নোত্তরের উল্লেখ ইহার পরেই করা হইয়াছে, তাহাতে "তৃসা লাগিলে জল কোথা হইতে আসে, সে জল কে খায়" ইত্যাদি প্রশ্ন আছে। উত্তরে মাতা বলিতেছেন ঃ

"তৃসা লাগিলে জল আইসে শূন্য হইতে।
তৃসা লাগিলে জল তোর খায় হুতাশনে ॥"

ইহার অর্থ অমৃত সহস্রার-রূপ শূন্য হইতে ক্ষরিত হয়, তোমার দেহমধ্যস্থ কালাগ্নি তাহা শোষণ করিয়া তোমার বিনাশ সাধন করে। চর্য্যাপদ নং ৩, অমরৌঘশাসন প্রভৃতি গ্রন্থেও 'দশমীদ্বার' কথা আছে। ইহাদের সবিশেষ বর্ণনা নিবন্ধের চক্রাদি অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে। 'খেচরী'মুদ্রা-সাধন-দ্বারা যোগীরা কিরূপে 'মহারস' রক্ষা করিয়া অমর বা দীর্ঘজীবী হইতেন, উল্টা সাধনের পদ্ধতি কি, ইত্যাদি সাধনা-অংশের 'কায়সিদ্ধি'র মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া পুনরুল্লেখ করা হইল না।

বৌদ্ধ সহজিয়া দোহায় মত্ত হস্তী, নৌকা প্রভৃতির উপমা পাওয়া যায়। গঙ্গা, যমুনার মধ্য দিয়া নৌকা বাহিত করিয়া চক্রের উদ্দেশ্যে গমন ইত্যাদি বর্ণনা চর্য্যাপদে আছে। (চর্য্যাপদ ১৩, ১৪, ৯, ১০ (ইত্যাদি দ্রষ্টব্য)।

গোরক্ষবিজয়ে "ডুবিল তোহ্মার নৌকা কাছি গেল ছিড়ি" এবং নৌকা যথাযথভাবে বাহিত করিতে না পারিলে দৃঢ় দাঁড়ও খসিয়া যায় ইত্যাদি বর্ণনা আছে। গোরক্ষ গুরুকে বলিতেছেন : "তুমি স্বেচ্ছায় অঘাটে নৌকা আনিয়া ডুবাইয়াছ। গঙ্গা-যমুনা শুষ্ক হইয়াছে, অর্থাৎ তুমি যোগ-সাধন ভুলিয়াছ। মত্ত হস্তী (পৃ ১৪১) ও সর্পের উল্লেখ (১৪১ পৃ) গোরক্ষবিজয়েও পাওয়া যায়। ইহাতে 'ব্রহ্মনালে'র যে উল্লেখ আছে 'ব্রহ্মনালে উজানে সুধিব সুনিশ্চিত' (পৃ ১৪২), তাহার সহিত চর্য্যাপদের 'অবধূতি মার্গ' তুলনীয়, ইহাই 'সুষুম্না'পথ, ইহা যোগিগণের সর্ব্বদা চিন্তনীয় (ছই হোই যাই সো ব্রাহ্ম নাড়িআ, চর্য্যা ১০)। কুণ্ডলিনীকে সহস্রারে প্রেরণফলে অমরত্ব-লাভ হয়। সহস্রদল কমলই বৌদ্ধ সহজিয়াদের মহাসুখের আবাসস্থল, ইহাই শৈবগণের 'শিবস্থান', ও বৈষ্ণবের 'হরিস্থান'। গোরক্ষ গুরুকে বলিতেছেন : "তুমি ডাকাতের হাতে ধন সমর্পণ করিয়াছ" (পৃ ১২১) ইত্যাদি—"অতএব আমার সহিত পুনরায় যোগ-পরিচয় কর।" (পৃ ১৩৭)।

ইঙ্গিতে গোরক্ষ মীননাথকে বলিতে লাগিলেন :

মুখখানি হাল গুরু জিহ্বাখানি ফাল।
অমর পাটনে জেন যেত করে হাল॥
উচ্চ নীচ জমিখানি তাতে কৃষি হয়।
জদি হয়ে গৃহবাসী সে জমি চসয়॥

(গোরক্ষবিজয়, পৃ ১৩৭, ১৩৮)।

তন্ত্রমতে মদ্যমাংস পানাহারের বিধি আছে, ইহাতে খেচরী মুদ্রা-সাধন ও তাহার ফলে অমৃত-পানের ইঙ্গিত করা হইয়াছে। যে তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিয়াছে (গৃহবাসী জন) সে ইহার সাধন করিয়া থাকে। ইহার পর চন্দ্রসূর্য্য বশীভূত করিয়া যোগ-সাধন ও বিন্দু-রক্ষার ইঙ্গিত করা হইয়াছে। তৎপরে কায়া-পরিচয়, অজপা-জপ, শরীর-বিয়োগে প্রাণ কোথায় যায়? শব্দ উঠিলে ধ্বনি কোথায় যায়? ইত্যাদি হিন্দী গোরক্ষ-বোধের অনুরূপ প্রশ্নোত্তর আছে (গোরক্ষবিজয়, পৃ ১৮৯, ১৯১ ইত্যাদি)। গোরক্ষ বলিয়াছেন :

"গুরুজী এসা কাম ন কীজৈ জাতে অমী মহারস ছীজৈ।
নদী ঢিগ বিরখা নারী সঙ্গ পুরখা অলপু জীবণু কী আসা॥"

ইত্যাদি বাক্যে গুরুকে মহারস রক্ষা করিবার ও উল্টা সাধন করিবার

অনুরোধ পাওয়া যায়। "জীবতে হি উলটি মরণা" (গোরক্ষ-পত্ত) দ্বারাও উল্টা সাধনে জীবন্তে মৃত হইবার উপদেশ পাওয়া যায়। অন্যত্র গোরক্ষ বলিতেছেন :

দিবস কৌ বাঘনি সুরিনরি মোহৈ, রাতি সাইর সোখৈ।
মুরখ লোকা অন্ধলা পশুআ নিতি প্রতি বাঘিনী পোখৈ।
(সমুদ্র শোষে)।

ইহার সহিত তুলনীয়—

"অভাগিয়া নরলোকে কিছুই নহি বুঝেরে।
ঘরে ঘরে পালস্তে বাঘিনী।" ইত্যাদি (গোরক্ষবিজয়, পৃ ১৮৭)।

তাই সাধন-তন্ত্রে বারংবার প্রদীপ নিভিতে না দিবার উল্লেখ আছে। অর্থাৎ বিন্দু ক্ষয় হইলে দেহ-রক্ষা অসম্ভব।

গোরক্ষ এইরূপে গুরুকে 'শূন্য' জ্ঞান দিয়া পাগল করিয়া তুলিলেন এবং কদলীদের বাত্বর হইয়া থাকিবার অভিশাপ দিলেন। ইহাতে ক্রমশঃ মীননাথের চেতনা হইল। তিনি তাঁহার পুত্র বিন্দুনাথ ও গোরক্ষনাথের সহিত বায়ুপথে অন্তর্হিত হইলেন। গোরক্ষবিজয় গ্রন্থে "রাধাকানু বঞ্চিল এহি থিতিতলে" দ্বারা বৈষ্ণবের প্রেম-সাধনার ইঙ্গিত পাওয়া যায় (পৃ ১৬৮)। বৈষ্ণব 'সখী' বা 'মঞ্জরী'সহ প্রেমসাধনা করেন, বৌদ্ধ সহজিয়া 'উত্তর-সাধিকা' লইয়া ভজন-সাধনা করেন, তান্ত্রিক 'শক্তি' লইয়া সাধনা করেন, নাথমার্গে 'মুদ্রা'-সাধন থাকিলেও শক্তি লইয়া সাধনার কোন স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় না, অতএব 'বৈষ্ণব' অর্থে 'সাধু' হইতে পারে (পৃ ৪৩)। দেখা যায় এই গ্রন্থের বহুস্থানে 'বৈষ্ণব মিনাই' বলা হইয়াছে। গোরক্ষ স্ত্রীকে মাতৃ-সম্বোধন করাতে বুঝা যায় যে, বৈষ্ণবের ও নাথদের সাধন-পদ্ধতি ভিন্ন ছিল।

গোরক্ষের ন্যায় বায়ুপথে গমন, দিব্যচক্ষু, দিব্যশ্রোত্র প্রভৃতি সিদ্ধি বৌদ্ধদের মধ্যেও আছে। বুদ্ধের 'দশবল'-কথা চর্য্যাপদেও আছে।[১]

এই নিবন্ধে সৃষ্টি-পত্তনের প্রসঙ্গে 'শূন্যপুরাণে'র উল্লেখ করা হইয়াছে। উল্লুকের উপদেশে প্রভু সৃষ্টি করিলেন, প্রভুর কনক পৈতা ছিঁড়িয়া জলে ফেলা হইল, তাহা হইতে সহস্র মস্তকযুক্ত 'বাসুকি নাগে'র

১। অভিধর্মকোশঃ, ৭ম কোশস্থানম্, পৃ ১১৫। চর্য্যাপদ ৯ "দশবল রঅণ" ইত্যাদি।

জন্ম হইল। তাহার আহারের নিমিত্ত কানের কুণ্ডল ফেলিয়া ভেকের সৃষ্টি করা হইল, তাহাতে বাসুকি তুষ্ট হইলেন। তৎপরে বাসুকির মস্তকে প্রভুর গলার মলদ্বারা নবদ্বীপা পৃথিবী সৃষ্টি হইল। প্রভুর ঘর্ম্মে আদ্যা দেবীর ও আদ্যা হইতে ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরের জন্ম হইল। এস্থানে 'বাসুকি' অর্থে 'কুণ্ডলিনী শক্তি'। তাহার জাগরণ 'শব্দব্রহ্ম' দ্বারা হয়, ইহা বুঝাইতে 'কানের কুণ্ডল' জলে নিক্ষেপ করা হইল। তাহাতে বাসুকির তুষ্টি হইল বর্ণিত হইয়াছে, অর্থাৎ শব্দ দ্বারা কুণ্ডলিনী জাগরিতা হইলেন। কর্ণে কুণ্ডল ধারণ করা হয়, অর্থাৎ কর্ণ হইতে শব্দজ্ঞান হয়, বাসুকি নাগের জন্ম ও কর্ণের কুণ্ডল দ্বারা শব্দব্রহ্ম-দ্বারা কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ-দ্বারা যোগসাধনের ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

শূন্যপুরাণের "সোনার সে নৌকা রূপার কেরআল" এবং লোহ মোহ কাম ক্রোধ" ইত্যাদির সহিত (পৃ ১০৩, ৫১, ২২৬) বৌদ্ধগান ও দোহার পাঞ্চকেডুআল (১৪।৩) ও নৌকার উপমা এবং রাগ দেশ মোহ লইআ ছার। পরম মোহ লবএ মুক্তি হার" (চর্য্যা ১১) তুলনীয়।

শূন্যপুরাণে আছে গোসাঞি কৃষিকর্ম্মে মন দিলেন, প্রথমে মন ও পবন হেলায় সৃজন করিলেন (পৃ ১৮৩, বসুমতী সংস্করণ)। এস্থলে মন অর্থে চেতনা, পবন অর্থে প্রাণবায়ু। যোগমতে তনুত্যাগ হইলে মন পবনে মিশে। শরীরস্থ পঞ্চবায়ুর সামঞ্জস্যে 'প্রাণ' সম্ভব, প্রাণের লক্ষণ 'মনন', জীবহৃদয়ে মনের বাস, পবন মনের জীবন-স্বরূপ, অতএব জন্মমৃত্যুর সন্ধিস্থল হইল 'পবন', যোগের এই ইঙ্গিত বঙ্গভাষায় রচিত শূন্যপুরাণে করা হইয়াছে। এই গ্রন্থে (পৃ ১৮৮) মৃতকে জীবনদানরূপ সিদ্ধি-বর্ণনা ও নাথপন্থের পবিত্র পীঠস্থান 'হিংলাজ' ও হিঙ্গুলা দেবীর উল্লেখও আছে (পৃ ১৮৯)। শূন্যপুরাণাদিতে সৃষ্টিকথা ও নাথসম্প্রদায়ে প্রচলিত সৃষ্টিতত্ত্ব-বর্ণনা সিদ্ধান্ত অংশের পঞ্চম পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসে যোগসাধনায় 'নামজপে'র মাহাত্ম্য-বর্ণনা আছে—'নিজ নামের বলে, পাথর ভাসিল জলে' (পৃ ৪১৩)। ইহাতে 'অজপা' নামের ধ্বনির কথাও আছে (পৃ ৪৫১, ৪৯৮ ইত্যাদি)। এই 'নিজনাম-সাধন'ই যোগধর্ম্মে 'অজপাজাপ' নামে খ্যাত, ইহার দ্বারা মৃত্যু হইতেও অব্যাহতি-লাভ হয় (পৃ ৪৯৯)।[১] হিন্দীতেও বচন আছে:

১। গোপীচন্দ্রের গান, ২য় খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

"ভয়ো মেঁ্য নিজ নামকা বন্দা।" গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসে বিন্দু, মন, পবন, শরীরতত্ত্ব, চন্দ্রসূর্য্য, চৌদ্দভুবন, ভেদ ইত্যাদি নানা বিষয়ের অবতারণা আছে (পৃ ৫০০, ৫০১, ৫০২, ৪৯৯)। হাড়িপা নীচকর্ম্ম করিলেও সর্ব্বদা নাম-জপে মগ্ন থাকিতেন।

এই অজপাজপ অর্থে স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাসের দ্বারা সাধ্য 'হংস' বা 'সোঽহং' মন্ত্র। নাথজাপে মহাজ্ঞানের বিশিষ্ট স্থান আছে, নিজ সাধনার সহিত গুরূপদিষ্ট জ্ঞানযুক্ত হইলে জীবের 'মহাজ্ঞান' হয় অর্থাৎ 'যোগযুক্ত জ্ঞান' লাভ করিয়া সাধক অমর হন। এই মহাজ্ঞানের স্বরূপ-ব্যাখ্যা নিবন্ধের সাধন অংশে করা হইয়াছে। বঙ্গীয় গীতিকাব্যে ময়নামতীর গুরুকৃপায় 'মহাজ্ঞান'-লাভের কথা আছে। স্বামীকে ময়নমতীর এই আড়াই অক্ষরের মহাজ্ঞান দিয়া অমর করিতে চাহিলে, স্বামী তাঁহার শিষ্যত্ব-গ্রহণে অস্বীকৃত হন। তথাপি যোগবলে তিনি স্বামীকে একশত বৎসর বাঁচাইয়া রাখেন (পৃ ৪৫০, গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস) এবং গুরুর কথায় পুত্রের মাত্র উনবিংশতি বৎসর আয়ু জানিয়া তাঁহাকে হাড়িপার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে বলেন। হাড়িপা শঙ্করের নাম-জপে সদা মগ্ন এবং মহাজ্ঞানের অধিকারী, তথাপি তিনি নীচ কর্ম্ম (হাড়ি বা মেথরের কাজ) করেন, রাজপুত্র হইয়া গোপীচন্দ্র তাহার শিষ্যত্ব-গ্রহণে অস্বীকৃত হইলেন। পুত্র বলিলেন : হাড়িপার যদি মহাজ্ঞান থাকিবে তবে সে নীচ কর্ম্ম করে কেন? মাতা উত্তর দিলেন : "মহাদেবীর শাপে তোমার ঘরে খাটে" (পৃ ৩৬৯, গোপীচন্দ্রের পাঁচালী)। তবু পুত্র বুঝিয়াও বোঝেন না, অবশেষে গোপীচন্দ্র হাড়িপাকে ত্রিবেণীর ঘাট কি? নিরঞ্জনের বাস কোথায়? ইত্যাদি নানা প্রশ্ন করিয়া তাঁহার জ্ঞান পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। স্বীয় মাতাকে সন্দেহের চোখে দেখিয়া অগ্নিপরীক্ষা, জল-পরীক্ষা, কেশের সাঁকোতে পার হওয়া প্রভৃতি দুরূহ পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। রাণী ময়নামতী গুরুর নাম স্মরণ করিয়া সকল পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হইলেন। ইহাতেও পুত্র সন্তুষ্ট না হইয়া মাতাকে বলিলেন : তুমি যদি আমার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে পার তবে "কাল প্রাতে সন্ন্যাস হব বঙ্গের বিনোদিয়া" (পৃ ৮০, বুঝানখণ্ড)।

পুত্র একে একে নিম্নরূপ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন :

"চারি চকরি পুকুরখানি মা মধ্যে ঝলমল।
কোন বিরিখের বোটা আমি মা কোন বিরিখের ফল॥

কেবা আহ্নি কেবা বাড়ি মা কেবা বসিয়া খাই।
কারে লইয়া শুইয়া থাকি মা কেবা নিদ্রা যাই॥
আকাশ নড়ে জমিন নড়ে নড়ে পবন পানি
সপ্ত হাজার আনল নড়ে নিনড় কোন খানি।
কোনঠে রইল গয়া গঙ্গা কোনঠে বানারসি
কোনঠে রইল জপতপ আমার কোনখানে তুলসি॥
কোনঠে রইল বড়সি মা কোনঠে রইল সূতা।
কোনঠে রইল বড়সির হিপ কোনখানি ফুলতা॥
তৃসা নাগলে মা তৃসা আইসে কথা হানে।
তৃসার জল ফুটিক মা যায় কোন জনে॥
বাও নাই বাতাস নাই মা পাতা ক্যান নড়ে।
দুই বিরিখের এক ফল কোন বিরিখে ধরে॥"

(পৃ ৭৭, বুঝানখণ্ড)

পুত্রের ইত্যাকার প্রশ্নে মাতা হবষিত হইলেন, পুত্রের তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইতেছে তাহা বুঝিতে পারিলেন। তাই উত্তরে বলিলেন: "বাছা, তুমি উত্তম প্রসঙ্গ করিয়াছ, রাজা হইলেই সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ হওয়া যায় না," এই বলিয়া তিনি একে একে সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিলেন, যথা—

ওরে যাদুধন, তুমি মনবৃক্ষের বোটা ও তনুবৃক্ষের ফল, দুই বৃক্ষের একটীমাত্র ফলকে জননী যত্নে ধারণ করেন, অর্থাৎ পিতার রেত ও মাতার রজে সন্তানের উৎপত্তি ও মাতৃগর্ভে স্থিতি হয়। চারি চকরি পুকুরখানির মধ্যে প্রকৃতিদেবী ব্যক্ত হইয়া (ঝলমল করিয়া) বিরাজ করিতেছেন, (বৌদ্ধমতে ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ এই চারিভূতের দ্বারা বেষ্টিত চতুষ্কোণ পৃথিবী কল্পিত হইত) তন্মধ্যে মাতা সযত্নে পুত্রকে ধারণ করেন, সন্তানের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ তাহার পিতা ও মাতা। সেই গাছের নাম মনুহর অর্থাৎ মন, আর ফলের নাম রসিয়া অর্থাৎ জীবদেহ। আর "কাটিলে বাঁচে গাছ না কাটিলে মরে" অর্থাৎ পুত্রের নাড়ীচ্ছেদ করিলে তবেই সে বাঁচে, নহিলে মরে। এইরূপে "দুই বিরিখের একটি ফল" জননী ধারণ করেন। তোমার হৃদয়-মধ্যেই গয়া, গঙ্গা ও বারাণসী অবস্থান করিতেছে অর্থাৎ দেহমধ্যেই ইড়া, পিঙ্গলা ও তাহাদের মধ্যবর্ত্তী সুষুম্না (বারাণসী) অবস্থিত রহিয়াছে, আর তোমার মুখই তোমার

জপতপ বা ইষ্টমন্ত্র-সাধনের সহায়, তোমার মস্তকে অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্রে তোমার তুলসী অর্থাৎ উপাস্য-দেবতার বাসস্থান।

পুত্র প্রশ্ন করিয়াছেন: "কেবা অন্ধি কেবা বাড়ি ইত্যাদি, অর্থাৎ কর্ত্তা ও ভোক্তা কে? শয়ন ও নিদ্রা কাহাকে বলে? জগতে সমস্তই চঞ্চল, স্থির কোন্‌টী? গয়াগঙ্গাদির অবস্থান কি? নামজপাদির কারণ কি? পরদেবতা (তুলসী) কোন্ স্থানে থাকেন? বড়শি (সুষুম্না) কোথায়, সূতা অর্থাৎ বায়ু কি? বড়শির ছিপ্ (মেরুদণ্ড) কোথায় এবং ফুলতা বা চোখই বা কোথায় আছে? ক্ষুৎপিপাসাদি শারীরিক চেষ্টা কিরূপে হয়, তাহা নিবারিত হয়ই বা কিরূপে? বিনা বাতাসে কোন্‌টা নড়ে, বাতাস নাই তবু চোখের পাতা কেন নড়ে? আকাশ, জমিন, সপ্ত হাজার অনল সবই নড়ে, তবে নিনড় কোন্‌টী?"

উত্তরে মাতা বলিলেন: "তুমি মনে আন্দ, তনে বাড়, আত্মময় বসি খাও"। মানব জীবিত হইয়া শয়ন করে, এবং মৃতরূপে মানবের মহানিদ্রা-প্রাপ্তি হয়। জগতে সবই চঞ্চল, কিন্তু 'নিনড় কপালখানি', গয়াগঙ্গাদি তোমার শরীরে, মস্তকে যে তুলসী (দেবতা) তাঁহাকে জপাদির দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। তোমার সুষুম্নাও দেহমধ্যে, আর বায়ুই তাহার সূতা "মিরডারা তোর বড়সির ছিপ, পবন হইল ডোর সুতা, মূলকণ্ঠ তোর বড়সির পোট, দুই রাঙ্কি ফুলতা"—যেদিন এই ফুলতা জলে ডুবিবে সেইদিন তোমার মা অনাথ হইবে। যোগসাধনের প্রধান সহায় সুষুম্না নাড়ী। ইহা মেরুদণ্ডের মধ্যে অবস্থিত, পবন-সাহায্যে শুক্র বা মহারসকে এই পথে উর্দ্ধে নীত করিতে হয়। বড়শির পোট অর্থাৎ গ্রন্থিস্বরূপ তোমার মূলকণ্ঠ, এবং তোমার দুই চক্ষু (রাঙ্কা) তোমার ফুলতা (ফাতনা) স্বরূপ, উহা ডুবিলেই তোমার মৃত্যু ঘটিবে ও তোমার মা অনাথ হইবেন। ক্ষুৎপিপাসাদি শারীরিক চেষ্টা আপনি ঘটে ও আপনি নিবারিত হয়। বিনা বাতাসে চোখের পাতা নড়ে, আকাশ, পৃথিবী ও সপ্ত আশার তেজ-পদার্থ সবই নড়ে, কিন্তু বাছা তোমার অদৃষ্টখানি নিনড়, তাই কথা শোন, হাড়ির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া কালজয়ী হও, অর্থাৎ মৃত্যুকে জয় কর।

যোগসাধনে মহারস বা শুক্র সহস্র কোটা রত্নসদৃশ মূল্যবান্ (গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস, পৃ ৪৩৮)। ঋগ্বেদে মানুষের আয়ুর পরিমাণ শত বৎসর, কিন্তু যোগসাধনে অমর হওয়া যায়। এই সাধনের সহায় তিনটী প্রধান নাড়ী, যথা—

মেরুদণ্ড পাশে উজ্জ্বল প্রকাশে
রবি শশী দুই জনা।
ইড়া বামস্থানে পিঙ্গলা দক্ষিণে
মধ্যে নাড়ী সুষুমনা ॥
বামে ভাগীরথী মধ্যে সরস্বতী
দক্ষিণে যমুনা বয়।
মূলাধারে গিয়ে একত্র হইয়ে
ত্রিবেণী তাহারে কয় ॥ (সাধকরঞ্জন)

এই মূলাধারকে লক্ষ্য করিযা "বড়সির পোট" বা গ্রন্থি বলা হইয়াছে। রাজা অবশেষে শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন, যোগবলে স্বর্গমর্ত্ত্য-পাতাল-দর্শন, শব্দচক্রভেদ, চৌদ্দভুবন-ভেদের তত্ত্ব, দেহমধ্যে নিরঞ্জন বা ধর্ম্মের বাস প্রভৃতি তত্ত্বকথা জানিলেন। চন্দ্রসূর্য্য বা ইড়াপিঙ্গলার বশীকরণ করিয়া সুষুম্না-পথে সাধন করিয়া যোগসিদ্ধ হইলেন। এইরূপে ভোগী রাজা যোগী সাজিলেন।

আমার স্বল্পজ্ঞান-দ্বারা বঙ্গ-সাহিত্যে নিহিত 'নাথ-যোগতত্ত্বে'র ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি, যোগবৃত্তান্ত অপ্রকাশ্য বলিয়া সাঙ্কেতিক ভাষার ব্যবহারে অর্থনির্ণয়-ব্যাপারও এক কঠিন সমস্যা হইয়া উঠে। তথাপি নাথযোগীদের মধ্যে কুণ্ডলিনী-জাগরণ, ষট্‌চক্রভেদ, ইড়াপিঙ্গলার বশীকরণ ইত্যাদি ও ব্রহ্মচর্য্য-সাধন যে প্রচলিত ছিল তাহার নিদর্শন ও অকাট্য প্রমাণ এই বঙ্গগীতিকা-সমূহে যে দুষ্প্রাপ্য নহে তাহা দেখাইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

নাথপন্থের সহিত তন্ত্র, কৌলমার্গ, রহস্যবাদী বৌদ্ধ ও শৈব-সম্প্রদায়ের সম্বন্ধ-বিচার

পূর্ব্বে তৃতীয় পরিচ্ছেদে নাথপন্থের মূল কোথায় সে সম্বন্ধে আমরা প্রশ্ন তুলিয়াছি, মূল অনুসন্ধান করিতে হইলে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী বা সমসাময়িক পন্থাদির সহিত নাথপন্থের কি সম্বন্ধ সে সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন। আমরা নিম্নলিখিত অধ্যায়ে একে একে সেই সম্বন্ধে বিচার করিতেছি :—

(ক) নাথপন্থের সহিত তন্ত্রের যোগাযোগ

নাথপন্থীদের শৈবতান্ত্রিক বলা হয়, বৌদ্ধধর্ম্মেও তন্ত্র প্রবেশলাভ করিয়াছিল, অতএব সহজিয়াদের বৌদ্ধতান্ত্রিক বলা হয়, কিন্তু বৈষ্ণব-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের সহিত ইহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। নাথপন্থের উপরেও তন্ত্রের প্রভাব স্বীকার্য্য।

তন্ত্র ও তাহার উপাসনাপদ্ধতি কেবল বাংলার নহে, ইহার গূঢ় আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক রহস্য সমগ্র ভারতের অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রের শ্রদ্ধাকর্ষণ করে। তন্ত্রের বিকৃত আচারই ইহার মূল ও মুখ্য আদর্শ নহে।[১]

ভারতের বিভিন্ন দেশে তন্ত্রের আলোচনার প্রমাণ পাওয়া যায়—কাশ্মীরে অভিনব গুপ্ত, দাক্ষিণাত্যে ভাস্কর রায়, লক্ষণ দেশিক, রাঘব ভট্ট প্রভৃতির নাম সুপ্রসিদ্ধ। শঙ্করাচার্য্যের 'প্রপঞ্চসার' ও লক্ষণ দেশিকের 'সারদাতিলকে'র নির্দ্দেশ অনুসারে তান্ত্রিককৃত্য সম্পাদিত হয়। বাংলাদেশে কৃষ্ণানন্দের 'তন্ত্রসার' প্রসিদ্ধ। উড়িষ্যায় পূর্ণানন্দের 'তত্ত্বানন্দতরঙ্গিণী', কাশীনাথ তর্কালঙ্কারের 'শ্যামাসপর্য্যাবিধি' সুবিদিত। পূর্ণানন্দের 'পুরশ্চর্য্যার্ণব' নামক বৃহৎ গ্রন্থ অদ্যাপি বর্ত্তমান। গয়া, পাঞ্জাব, কাশ্মীর, নেপাল, বোম্বাই প্রভৃতি বাংলার বাহিরে বহুস্থানে শাক্ত-মন্দির আছে।[২]

বঙ্গদেশের তান্ত্রিক বৌদ্ধেরা এক সময়ে যে বিরাট্ সাহিত্যের সৃষ্টি

১। প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩৪১, শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তীর প্রবন্ধ।
২। প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৪৩ ঐ ঐ ঐ

করেন তাহার মূল সংস্কৃত গ্রন্থাদি লুপ্ত হইলেও, তিব্বতী ভাষায় তাহাদের অনুবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সপ্তম শতাব্দীর চীন পরিব্রাজকেরা ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

তিব্বতীয় ঐতিহাসিক লামা তারনাথের মতে পাল-নৃপতিদের রাজত্বকালে বহু বজ্রাচার্য্যের প্রাদুর্ভাব হয়, তাঁহারা সিদ্ধিবলে নানা অলৌকিক ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান করিতেন। এই সময়ে রচিত বহু তান্ত্রিক গ্রন্থও তৎকালীন প্রভাবের সাক্ষী দেয়।

বৌদ্ধধর্ম্মে ক্রমশঃ কিরূপে তন্ত্রের প্রবেশলাভ ঘটে, তাহার বিবরণ ওয়াডেল সাহেবের রচিত গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায়। তিনি বলেন, পাতঞ্জল খৃঃ পূঃ ১৫০ অব্দে যোগধর্ম্মের প্রচার করেন, বুদ্ধ তৎপ্রতি দৃষ্টি দেন এবং ধ্যানের প্রচার করেন, আসঙ্গ মহাদল বৌদ্ধদের মধ্যে উহার প্রচলন করেন। আসঙ্গ পেশওয়ারের বৌদ্ধসন্ন্যাসী ছিলেন, স্বার্থসিদ্ধির জন্য তিনি অষ্টসিদ্ধির ব্যবহার করিতেন এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে।

(খড়্গ, অঞ্জনা, পাদলেপা, অন্তর্দ্ধান, রসরসায়ন, খেচর, ভূচর ও পাতাল বৌদ্ধ-তন্ত্রের অষ্টসিদ্ধি। সাধনমালা, ভূমিকা ও দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ৩৫০ দ্রষ্টব্য)। এই সম্প্রদায়-ভুক্ত সিদ্ধদের যোগাচার্য্য বলিত। এইরূপে বৌদ্ধধর্ম্মে তন্ত্রের প্রবেশ-লাভ হয়। ষষ্ঠ শতাব্দীর অন্তে বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্মে শক্তিপূজা বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করে। শক্তিপূজার সহায়ে সিদ্ধিলাভ উদ্দেশ্য ছিল। হিয়ুন স্যাং ৭ম শতাব্দীর মধ্যভাগে বোধিসত্ত্বদের মূর্ত্তিসহ শক্তিমূর্ত্তি দেখেন। তিব্বতে আনুমানিক ৬৪০ খৃঃ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মে তান্ত্রিকতা প্রবেশ করিয়া ক্রমশঃ অধোগতির পথে অগ্রসর হয়। নাগার্জ্জুন 'মন্ত্র'-সহায়ে সিদ্ধিলাভ-কথা প্রচার করেন, ইহাই 'মন্ত্রযান'-নামে পরিচিত। কথিত আছে নাগার্জ্জুন দক্ষিণ ভারত হইতে ইহা শিক্ষা করেন। যোগাচার্য্যদের মধ্যে চক্র, মন্ত্র প্রভৃতি অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সিংহল দেশে অজন্তা গুহার চিত্রে আকাশ-গমনাদি সিদ্ধি দৃষ্ট হয়।

দশম শতাব্দীতে উত্তর ভারতে কাশ্মীর ও নেপালে কালচক্র-যান নামক তান্ত্রিকতার প্রচার হয়, ইহাদের উপাস্য দেবতা ও দেবী হেবজ্র ও কালী। ইহারা মন্ত্রযানের পূজাপদ্ধতি গ্রহণ করিলেও নিজেদের 'বজ্রযান'-সম্প্রদায় বলিত, সিদ্ধদের নাম ছিল 'বজ্রাচার্য্য'। বজ্রযান হইতেই লামাধর্ম্মের উৎপত্তি, ইহাতে ভূতপিশাচাদির পূজা আছে।

বঙ্গদেশে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব ছিল। বেণ্ডল সাহেব ১৪৪৬ খৃঃ পর্য্যন্ত রচিত বৌদ্ধপুঁথি বঙ্গদেশে পাইয়াছেন।

সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বে তিব্বতে চীনদেশের 'তাও'-ধর্ম্মের অনুরূপ 'বন' (Bon)-ধর্ম্মের প্রাধান্য ছিল। ইহাতে দৈত্য-দানবের নৃত্য প্রভৃতি অনুষ্ঠান ছিল। তিব্বতরাজ ৬৪১ খৃষ্টাব্দে চীন রাজকুমারীকে বিবাহ করেন, তিব্বতরাজের নেপালী ও চীনদেশীয় রাজ্ঞীদ্বয়ের সহায়তায় তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার হয়। অষ্টম শতাব্দীতে ভারত হইতে গুরু পদ্মসম্ভব আমন্ত্রিত হইয়া তিব্বতে যান ও লামাধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন। পদ্মসম্ভব তান্ত্রিক যোগাচার্য্য ছিলেন, তিনি যাদুবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার পঞ্চবিংশতি শিষ্যও বিভিন্ন সিদ্ধিলাভ করেন। তিব্বতীদের বিশ্বাস পদ্মসম্ভব অদ্যাপি যোগদেহে বিরাজ করিতেছেন। তিব্বতীদের ধর্ম্ম মূলতঃ শৈব হইলেও তৎসহ যন্ত্র, মন্ত্র, দেব, দানব, সর্ব্বোপরি মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের মিশ্রণে যাহা সৃষ্ট হইল তাহার সহিত কর্ম্মবাদ যুক্ত হইয়া তিব্বতীদের মধ্যে প্রচলিত হইয়া উঠিল। অতীশ এই বিকৃত লামাধর্ম্মের উন্নতি-সাধনের চেষ্টা করেন। অদ্যাপি লামাধর্ম্মে বিচিত্র অনুষ্ঠান-পদ্ধতির সমাবেশ দেখা যায়।[১] গুরু পদ্মসম্ভবের তিব্বতী চিত্র যথা—তাঁহার দক্ষিণ হস্তে বজ্র, বাম হস্তে রক্তপূর্ণ নরকপাল এবং তাঁহার পূজায় নরবলির ব্যবস্থা। তাঁহার দুই পার্শ্বে দুই স্ত্রীমূর্ত্তি আছে।

নালন্দা, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুরী, জগদ্দল, সোমপুরী ও পাণ্ডুভূমির মহাবিহারসমূহ বৌদ্ধধর্ম্ম ও সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল। ইহাদের মধ্যে প্রথম তিনটী বিহার-প্রদেশে ও অন্যগুলি বঙ্গদেশে অবস্থিত ছিল। গৌড়েশ্বর পালরাজারা ইহাদের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। নালন্দা বিহারের অধ্যক্ষও তাঁহারা নিযুক্ত করিতেন। ধর্ম্মপাল কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিক্রমশীলার বিহার ক্রমশঃ নালন্দার প্রভাব ক্ষুণ্ণ করিয়া তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্মের কেন্দ্ররূপে প্রসিদ্ধ হয়।

উত্তরবঙ্গে একাদশ শতাব্দীতে রামপাল জগদ্দল বিহারের প্রতিষ্ঠা করেন। এই সকল মহাবিহারে খৃষ্টীয় অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া হইত। বিহারের মঠের অধ্যক্ষেরা তিব্বতের রাজার নিমন্ত্রণে তিব্বতে গমন করিতেন এবং রাজার উৎসাহ

১। লামাধর্ম্ম—ওয়াডেল, পৃ ১৫, ১৬, ১৭, ১৯, ১২৮, ১৩১, ১৪১।

প্রাপ্ত হইয়া সংস্কৃত হইতে তিব্বতী ভাষায় তান্ত্রিক গ্রন্থাদির অনুবাদ করিতেন। গ্রন্থকারগণ অনেকেই পূর্ব্বভারতের তথাপি তিব্বতে তাঁহারা পূজা পাইয়াছেন। ডাক্তার পি. কর্দ্দিয়ে এই সকল অনূদিত গ্রন্থের একটী তালিকা করিয়াছেন। এই তালিকার দুইটী বিভাগ আছে, যাহাতে বুদ্ধের বচন আছে তাহাকে 'কেঙ্গুর' বলে, অবশিষ্ট সমস্ত গ্রন্থের নাম 'তেঙ্গুর'; তেঙ্গুরের এক অংশে তন্ত্রের পুথির টীকার নাম আছে।[১]

বৌদ্ধতন্ত্রে তারা, মঞ্জুশ্রী প্রভৃতি দেবদেবী ও ইন্দ্রজাল, মারণ, উচাটন প্রভৃতি যে সকল আচারাদির বর্ণনা আছে, তাহাদের সহিত ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। মধ্যযুগের সংস্কৃতির ধাবা বুঝিতে হইলে তান্ত্রিক সাহিত্যের আলোচনার প্রয়োজন। সান্ধ্যভাষার ব্যবহার ও যৌনসম্বন্ধের ইঙ্গিত মধ্যযুগেব সকল ধর্ম্মসাধনায় দেখিতে পাইবার কারণ—সাধ্যবস্তুর প্রতি সাধকের আকর্ষণ বর্দ্ধিত কবা। বৌদ্ধ-তান্ত্রিকাচার্য্যেরা অনেকেই উচ্চশ্রেণীর দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন ও দর্শনগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বঙ্গদেশের শীলভদ্র, দীপঙ্কর, শ্রীজ্ঞান, শান্তরক্ষিত, অভয়ঙ্কর গুপ্ত প্রভৃতির নাম কে না জানেন, ইঁহারা বৌদ্ধমঠের অধ্যক্ষতা করিয়াছেন। ইঁহারা ব্যতীত শান্তিদেব, জ্ঞানশ্রী মিত্র, দিবাকরচন্দ্র, কুমারচন্দ্র, পুত্তলি, নাগবোধি, টঙ্কদাস, প্রজ্ঞাবর্ম্মন, কম্বল, কুক্কুরি প্রভৃতি বাঙ্গালী ছিলেন। ইঁহাদের কেহ কেহ ৮৪ সিদ্ধার অন্তর্গত এবং মহামায়া যোগিনীকৌল ও নাথপন্থের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।[২]

মৈত্রেয়ের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া অসঙ্গ খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে মহাযান-বৌদ্ধধর্ম্ম-মধ্যে তন্ত্রের প্রচলন করেন। অসঙ্গের সময় হইতে মহাযানী বৌদ্ধ নির্ব্বাণের জন্য কামনা না করিয়া বোধিসত্ত্বরূপে পুনর্জ্জন্ম-লাভের কামনা করেন, এইরূপে তাঁহারা হীনযানদের অবজ্ঞা করিতে আরম্ভ করেন।[৩]

তন্ত্রপূর্ব্ব-যুগে ভারতে যাহা-কিছু সুন্দর ও উচ্চ আদর্শ বিশিষ্ট ছিল, তন্ত্রশাস্ত্রে তাহা গৃহীত হইয়াছে। ইহাই ভারতীয় তন্ত্রের বৈশিষ্ট্য।

১। বৌদ্ধগান ও দোঁহা, পরিশিষ্ট, পৃ /০ দ্রষ্টব্য।
২। উদ্বোধন—বৈশাখ ১৩৪৯, 'তান্ত্রিক বৌদ্ধসাহিত্যে বাঙ্গালীর অবদান' রাসমোহন চক্রবর্ত্তী
৩। Bud. Art in India.—Grunwedel, Trans. by Jas Burgess, p. 190.

জ্যোতিষী, ফলিতজ্যোতিষ, রসায়নবিদ্যা, সামুদ্রিক বিদ্যা, জন্মকুণ্ডলী প্রভৃতির সহিত যুক্ত হইয়া ভারতীয় তন্ত্র ধর্ম্ম, দর্শন, কুসংস্কার, নীতি ও পঞ্চমকারের বিচিত্র সমন্বয়-স্বরূপ হইয়াছে। মধ্যযুগের সভ্যতার ইতিহাস এই শাস্ত্রেই আবদ্ধ।[১]

শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে নাথধর্ম্ম প্রবল হইয়া উঠিলে বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয় জাতিই নাথদের পূজা করিত। মৎস্যেন্দ্রনাথের গ্রন্থে বৌদ্ধধর্ম্মের নাম না থাকিলেও তিনি নেপালী বৌদ্ধদিগের প্রধান দেবতা, তাঁহার রথযাত্রা নেপালের একটী প্রধান উৎসব। গোরক্ষনাথের উপর নেপালী বৌদ্ধেরা সকলে সন্তুষ্ট না থাকিলেও তাঁহার পূজাও অনেকে করিয়া থাকে, তিব্বতেও তাঁহার পূজা হয়।

জৈন, বৌদ্ধ, আজীবক ইত্যাদি যে সকল ধর্ম্মকে বৌদ্ধেরা তৈর্থিক বলিত, তাহারা আর্য্যধর্ম্মের উপর নির্ভর করে না, বঙ্গ, মগধ ও চের জাতির প্রাচীন ধর্ম্মের উপরই উহারা স্থাপিত, বঙ্গদেশের পক্ষে ইহা কম গৌরবের নহে। ইহাদের উৎপত্তি পূর্ব্বভারতে, বঙ্গ, মগধ ও চের জাতির মধ্যে বৈদিক ধর্ম্মে বৈরাগ্য নাই, সন্ন্যাস আশ্রমে ভিক্ষাবৃত্তি আছে, কিন্তু জৈন ইত্যাদি ধর্ম্মে গৃহস্থাশ্রম-ত্যাগ আছে, জন্মজরামরণ বা ত্রিতাপ-নাশের বিষয় আছে, 'আমি কে' 'কোথা হইতে আসিলাম' ইত্যাদি দর্শনের বা চিন্তার কারণ আছে।[২]

আচার-ব্যবহার হইতেও আর্য্য ও জৈন-বৌদ্ধদের ভেদ লক্ষণীয়। আর্য্যদের নিত্যস্নান বিধি, জৈনরা 'মলধারী'; আর্য্যেরা উষ্ণীষ, উপবীত এবং উপানৎ ধারণ করিতেন, জৈনরা উষ্ণীষ ও উপানৎ ত্যাগ করিতেন এবং একবস্ত্র ধারণ করিতেন। আর্য্যেরা দুইবার আহার করিতেন, বৌদ্ধেরা বারটার মধ্যে একবার আহার বা উপবাস করিতেন। আর্য্যেরা উচ্চাসন ব্যবহার করিতেন, বৌদ্ধদের উচ্চাসন-গ্রহণ বিধি ছিল না, আর্য্যেরা সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করিতেন, বৌদ্ধ ও জৈনরা মাতৃভাষাতেই লেখাপড়া করিতেন। অতএব উত্তর বা দক্ষিণ ভারত হইতে বৌদ্ধ বা জৈনধর্ম্মের উৎপত্তি হয় নাই, পূর্ব্বাঞ্চল হইতেই হইয়াছে। ইহা বলা অনুচিত হইবে না যে সাংখ্য-মতের উপর বৌদ্ধ-জৈন-মত প্রতিষ্ঠিত। তাহার প্রবর্ত্তক

১। সাধনমালা, দ্বিতীয় খণ্ড, ভূমিকা, পৃ ৮/০

২। প্রবাসী, বৈশাখ ১৩২২—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অভিভাষণ 'নাথপন্থ'। অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলন।

কপিল মুনি ও পঞ্চশিখও পূর্ব্বাঞ্চলের। মহাবীর পার্শ্বনাথ প্রভৃতি পূর্ব্বাঞ্চলেই ভ্রমণ করিয়াছেন।[১]

নাথধর্ম্মকে হিন্দুতন্ত্র ও বৌদ্ধযোগতন্ত্রের সংমিশ্রণ বলা যাইতে পারে। তন্ত্রের উৎপত্তি কোথায় তাহাই আমাদের বিচার্য্য। তন্ত্রের মধ্যে ইন্দ্রজালের একটী বিশিষ্ট স্থান আছে, দেবীর পূজাদ্বারা শক্তি লাভ করিবার জন্য মন্ত্র ইত্যাদির আবশ্যকতা আছে। বৈদিকযুগ হইতেই ইন্দ্রজালের ব্যবহার ও তৎপ্রতি সাধারণের শ্রদ্ধার নিদর্শন দেখা যায়। পুরোহিতেরা মন্ত্রদ্বারা দেবদেবীকে বশীভূত করিতে পারেন ইহা সমাজে স্বীকৃত হইত। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানের নিমিত্ত বহু মন্ত্র রহিয়াছে, সম্ভবতঃ তৎকালের পুরোহিতেরা এইরূপ বহু মন্ত্রই জানিতেন, তাহার কয়েকটি মাত্র বেদে স্থান পাইয়াছে।[২] পুরোহিতেরা উত্তম দর্শনীর লোভে দার্শনিক মন্ত্রগুলিকে নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রকৃত তাৎপর্য্য হইতে ভিন্ন অর্থে ব্যবহার কবিতেন ও ভোজবিদ্যার জন্য নূতন নূতন মন্ত্রের সৃষ্টি করিতেন।

তন্ত্রাদির প্রচলনে দ্বাদশ শতাব্দীতে এদেশে অলৌকিক কাহিনীর প্রচলন হয়, দেখা যায় বিদেশীয় লোকগীতির মধ্যেও এই সকল কাহিনীর সহিত সাদৃশ্য বর্ত্তমান। ময়নামতীর গোদা যমকে মন্ত্রের দ্বারা তাড়না করিবার সহিত দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রচলিত য়ুরোপীয় গল্পের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। সম্ভবতঃ ভারত হইতে উপাখ্যানগুলি বিদেশে ছড়াইয়া পড়ে।[৩] ভোজবিদ্যার প্রাধান্য সর্ব্বত্রই,—যজ্ঞে, ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে; বাণপ্রস্থের নিয়মে। নৈতিক চরিত্রের এই অবনতিতে জ্ঞানীব্যক্তি দিগের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয় তাহার ফলে ব্রহ্ম, আত্মা প্রভৃতি দার্শনিক বিচারের পুনরালোচনা হইতে লাগিল।[৪]

ভোজবিদ্যার বিষয় চারিটী গ্রন্থে ছিল, তন্মধ্যে অথর্ব্ববেদের 'কৌশিক সূত্রে' ভোজবিদ্যার অনুষ্ঠান-বিষয়ে বহু বিবরণ আছে, 'ঋগ্‌বিধানে' ঋগ্বেদের মন্ত্র উচ্চারণ দ্বারা যে কুহকের বিস্তার হয় তাহার বিবৃতি আছে। 'সামবিধান ব্রাহ্মণে' সামবেদের মন্ত্র, অন্ধবিশ্বাসীদের জন্য কিভাবে

১। পূর্ব্বপৃষ্ঠার ২এর নির্দ্দেশ দ্রষ্টব্য।
২। ফারকার, পৃ ২১।
৩। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—দীনেশ সেন, ৫ম সং, পৃ ৬৫।
৪। Oldenburge Die Lehre des Upanisbaden—ফারকার, পৃ ৩২ উল্লেখ।

প্রযোজ্য তাহা নির্দ্দেশিত হইয়াছে। সামবেদের অন্তর্গত 'অদ্ভুত ব্রাহ্মণে' কুপ্রভাবের শক্তিনিরোধের ব্যাখ্যা আছে।[১]

ক্রমশঃ বৌদ্ধযুগেও ভোজবিদ্যার প্রভাব দেখা যায়। দীঘনায়কের ৩২ সূক্তে ও Khuddakapathaতে সর্প, দুষ্টাত্মা, দানব প্রভৃতির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য মন্ত্রের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।[২]

শাক্তধর্ম্মেও ইন্দ্রজালের ব্যবস্থা আছে। মালতীমাধব গ্রন্থে বলিদান, চক্রপূজা বা বামাচার, পঞ্চ-মকার-সাধন প্রভৃতির বর্ণনা আছে। চক্রপূজার দ্বারা পুনর্জন্ম-নিরোধ হয়, এইরূপ বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে দেবীপূজা আমাদের দেশে বিশেষভাবে প্রচারিত হয়। দেবীপূজায় মন্ত্রসাধন, নাড়ীতত্ত্বের জ্ঞান, বিশেষভাবে দেহমধ্যে সুপ্তা কুণ্ডলিনীর জাগরণ ইত্যাদির অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়।[৩] জনসাধারণকে দেবীমূর্ত্তি-গঠন, মন্দির-নির্ম্মাণ ইত্যাদি সম্বন্ধে শিক্ষা ও মন্ত্রদ্বারা দীক্ষা দেওয়া হইত। এই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম জাপান তিব্বতাদিতে প্রচারিত হইতে থাকে। সম্ভবতঃ খৃঃ ৭৮৮ অব্দে শঙ্করাচার্য্য দাক্ষিণাত্যে জন্মগ্রহণ করেন, বেদান্ত-সূত্রের, গীতার ও উপনিষদের ভাষ্যাদি ইঁহার দ্বারা রচিত হয়। শঙ্করের পরমগুরু গৌড়পাদাচার্য্য অদ্বৈতবাদী এবং বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন, মাণ্ডূক্য-কারিকা ও উপনিষদের বহু ভাষ্য ইনি রচনা করেন। গৌড়পাদ ও শঙ্করের শিক্ষার সহিত মহাযান-দর্শনের অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষিত হয়, ইহা দ্বারা বহু হিন্দু তার্কিক তাঁহাদের ছদ্মবেশী বৌদ্ধ প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে শঙ্করের প্রচলিত মায়াবাদ বৌদ্ধমত, কিন্তু প্রথম যুগের উপনিষদে অদ্বৈতবাদ আছে ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে মায়াবাদও আছে। তথাপি শঙ্কর ও তাঁহার পরমগুরু গৌড়পাদের মহাযান-দর্শন-দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়া বিচিত্র নহে।

শঙ্করের প্রভাব উত্তর হইতে দক্ষিণ ভারত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, তাহার প্রমাণ দাক্ষিণাত্যে রামায়েৎ সম্প্রদায় ও উত্তরে শৈবাদ্বৈতবাদীরা বহুদিন পর্য্যন্ত শঙ্কর দর্শন-রূপান্তরিত ভাবে শিক্ষা দেন। শাক্তদের মধ্যে শঙ্কর সম্ভবতঃ দক্ষিণাচার প্রচার করেন, ইহাদের মধ্যে পশুবলি প্রভৃতি অনুষ্ঠান

১। ফারকার, পৃ ৪১, ৪২
২। ফারকার, পৃ ৭১।
৩। ঐ পৃ ১৬৭ ইত্যাদি পৃ ২১৩ পর্য্যন্ত।

নাই। দাক্ষিণাত্যের কাঞ্চিভারাম নামক স্থানে দেবীমন্দিরের পুরোহিতেরা নিজেদের শঙ্করের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেন, ইঁহারা দক্ষিণাচারী, প্রবাদ আছে—শঙ্কর এই দেবীকে পশুবলি গ্রহণ করিতে নিষেধ করেন।

দাক্ষিণাত্যে বহু ভাগবত-পুরোহিত আছেন, ইঁহাদের মতে বিষ্ণু ও শিব অভিন্ন, ইঁহারা সকলেই বৈষ্ণব। ইঁহাদের মধ্যে 'পাঞ্চরাত্র-সংহিতা' ও কয়েকটি মন্দিরে 'বৈখানস-সংহিতা' ব্যবহারের রীতি আছে। কাশ্মীরে দশম শতাব্দীতে ও তামিল-প্রদেশে একাদশ শতাব্দীতে পাঞ্চরাত্র সংহিতার প্রচার হয়। ইহার মতের সহিত শৈবাগম ও পূর্ব্বকালীন তন্ত্রের (হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় তন্ত্রেরই) বিস্ময়জনক সাদৃশ্য আছে। ইহা দ্বারা অনুমিত হয় প্রথম পাঞ্চরাত্র-সংহিতা খৃঃ ৬০০-৮০০র মধ্যে রচিত হয়। এই সময়ের মধ্যে শৈবাগম, হিন্দু ও বৌদ্ধতন্ত্র-সকলও রচিত হয়।

গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহে (পৃ ১৩) প্রাচীন বৈখানস, পাঞ্চরাত্র প্রভৃতি সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে, ইহা দ্বারাও উহাদের প্রাচীনত্ব বা গোরক্ষ-পূর্ব্ব যুগে অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়।

উক্ত সংহিতাগুলি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-মধ্যে শাক্ত-ধর্ম্ম-প্রবেশের পরিচায়ক। এই হিসাবে ইহাদের মূল্য আছে। শৈবাগমের ন্যায় সংহিতাতেও জ্ঞানপাদ, যোগপাদ, ক্রিয়াপাদ ও চর্য্যাপাদ নামে চারিটী বিভাগ আছে। শাক্ত-মতের যোগ, নাড়ীতত্ত্ব প্রভৃতিও বৈষ্ণব-সংহিতায় পাওয়া যায়। মন্ত্র, ইন্দ্রজাল, কবচ প্রভৃতিরও ব্যাখ্যা বহুস্থানে আছে। মন্ত্র-যন্ত্রাদির ব্যবহারের কথাও আছে। দাক্ষিণাত্যে ললাটতিলকে শুভ্রমধ্যে রক্তবর্ণ চিহ্ন ধারণ করিতে দেখা যায়, উহা শক্তির চিহ্ন।

শৈবমতের মধ্যে শাক্তমতের আবির্ভাব আগম-শাস্ত্রের প্রভাবের পরিচায়ক।

সংহিতার ন্যায় আগমেরও চারিটী বিভাগ আছে। 'শিব-শক্তি' হইলেন চিৎস্বরূপ, তিনি শিব ও জড়জগতের মধ্যবর্ত্তী ধর্ম্মবিশেষ, তিনিই মানবের বন্ধ ও মোক্ষের কারণ, তিনিই পরা বাক্, শব্দের ব্যক্ত ও অব্যক্ত ভাবের যোজনাকারী, ইহাই মন্ত্র-তন্ত্রের মূল।

শিব পশুপতি, জীব পশু, জীবমধ্যে চিৎশক্তির আবাস। কিন্তু জীব পাশবদ্ধ, এই পাশ তিনপ্রকার আণব (বা অবিদ্যা), কার্ম্ম (কর্ম্মের ফলাফল), ও মায়ীয় (সংসারের কারণস্বরূপ মল)। এই মায়ীয় মল শঙ্করের মায়াবাদ নহে।

শৈবদের মধ্যে কাশ্মীর-শৈবাগম যেরূপ প্রচলিত ছিল, শাক্ত-সম্প্রদায়-মধ্যে তন্ত্রের সেরূপ প্রচলন ছিল। নবম শতাব্দী হইতে তিন শত বৎসর ধরিয়া শৈবাগমের নব নব রূপ দেখা যায়, এই মতে জগৎ 'মায়া' নহে, উহা শিবের 'আভাস', ইঁহাদের মতে সৃষ্টিতত্ত্ব অনেকাংশে সাংখ্যের অনুরূপ হইলেও 'ত্রিক' বা শিবশক্তি ও অণু বা পতি-পাশ-পশু সম্বন্ধেও ইঁহারা বিচার করিয়াছেন। সম্ভবতঃ শঙ্করের কাশ্মীর-ভ্রমণের পর বসুগুপ্তের 'শিবসূত্র' ৮৫০ খৃঃ রচিত হওয়ায় পূর্ব্ববর্ত্তী আগম হইতে ইহাতে অদ্বৈতবাদ স্পষ্টতররূপে বর্ত্তমান। আগম-মতে দ্বৈতবাদ প্রচলিত ছিল ও কাশ্মীর-শৈব-সাধনার উহাই ভিত্তিস্বরূপ।[১]

তন্ত্রমধ্যে ৬৪টী তন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। কুব্জিকামত-তন্ত্রের রচনা-কাল ৭ম শতাব্দী, লিপি হইতে এইরূপ অনুমান করা যায়। এই পুঁথি হইতে তন্ত্র যে ৬০০ খৃষ্টাব্দেও প্রচলিত ছিল, এইরূপ ধারণা হয়। বাণের 'চণ্ডী-শতক' ৭ম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে রচিত, ভবভূতির 'মালতী-মাধব' ৮ম শতাব্দীর প্রারম্ভে রচিত। সংহিতা ও আগমের ন্যায় তন্ত্রেরও চারিটী বিভাগ আছে—জ্ঞান, যোগ, ক্রিয়া ও চর্য্যা। ক্রিয়াতে মন্দির-নির্ম্মাণাদি বিধি আছে ও চর্য্যাতে সাধনপ্রণালী আছে।

শিবপত্নী শক্তিই শাক্তের প্রধান উপাস্য দেবী। শক্তি বিনা শিব শববৎ, শক্তিই মূলা প্রকৃতি। ইহাতে বেদান্তের মায়াবাদের অনুরূপ কিছু নাই। 'যোগ' শাক্তদিগের সাধনের একটী প্রধান অঙ্গ। উপনিষদের 'ওঁ' মহামন্ত্র-সাধনে শক্তির সিদ্ধিলাভ হয়, 'ওঁ'-এর প্রতিবর্ণের সহিত শক্তি জড়িত আছে। নাদ, বিন্দু, বীজ সৃষ্টির মূলস্বরূপ, তন্মধ্যে শক্তিই শব্দ, ইহাই অনন্তবাক্, বা পরাবাক্। শক্তিমন্ত্রের বর্ণগুলি অথর্ব্ববেদের সময় হইতেই উচ্চারিত হইতেছে, মন্ত্রদ্বারাই শক্তির বিকাশ হয়। ষট্চক্র-সাধন-দ্বারা কুণ্ডলিনীর জাগরণও শাক্তসম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য। চক্রপূজা ৬০০ খৃঃ হইতে প্রচলিত হয়, ইহাতে সর্ব্বশ্রেণীর অধিকার আছে। মন্ত্র, যন্ত্র ও মুদ্রা শাক্তসাধনের অঙ্গ, শাক্ততিলক শৈব ত্রিপুণ্ড্রের ন্যায়, মণ্ডল ও ন্যাস বা হস্তভঙ্গীর দ্বারা দেহমধ্যে দেবীর আবির্ভাব-রীতিও শাক্তসম্প্রদায়ে প্রচলিত আছে। শাক্তধর্ম্মে সর্ব্বশ্রেণীর প্রবেশাধিকার থাকায় বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্ম ক্রমশঃ হীনবল হইতে থাকে। বৌদ্ধেরাও ক্রমশঃ হিন্দুর দেবদেবীতে ও মন্ত্রশক্তিতে আস্থাবান্ হইতে

১। J. C. Chatterjee—Kashmir Saivism. (1914) pp. 7-10, 36 (a).

লাগিল। তৎফলে মহাযান-বৌদ্ধদিগের মধ্যে পঞ্চবোধিসত্ত্ব ও তাঁহাদের শক্তির আবির্ভাব হইল। চক্রপূজা প্রভৃতি বামাচারও বৌদ্ধদিগের মধ্যে দেখা দিল। তারনাথের মতে ষষ্ঠ শতাব্দীতে বৌদ্ধতন্ত্র রচিত হইল, তাহার প্রমাণ :ম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে রচিত 'তথাগত-গুহ্যক', হিন্দুদিগের কুব্জিকাতন্ত্রও এই সময়ে রচিত। ষষ্ঠ শতাব্দীর রচিত 'মহাদেব-সূত্র' মন্ত্র-সম্বন্ধীয় নিবন্ধ, নবম শতাব্দীর 'পঞ্চকর্ম্ম' তান্ত্রিক যোগবিষয়ে রচিত। মহাযানদিগের 'ধারণী' অর্থাৎ মন্ত্রোচ্চারণে ধর্ম্মজীবন রক্ষিত হইবে এই বিশ্বাস তন্ত্রমধ্যে বিশিষ্ট স্থান পাইয়াছে। অবলোকিতেশ্বরের মন্ত্র 'ওঁ মণিপদ্মে হুম্' উচ্চারণে সিদ্ধিলাভ হয় এই বিশ্বাসও আছে। ৭৪৭ খৃঃ পদ্মসম্ভব তিব্বতে যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন তাহা তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্ম, গুরু পদ্মসম্ভব তান্ত্রিক সিদ্ধপুরুষ ছিলেন।

বৌদ্ধধর্ম্মে তন্ত্রের প্রবেশ হইলেও জৈনধর্ম্মে হয় নাই। জৈনমন্দিরে দেবীমূর্ত্তি থাকিলেও তাঁহার পূজা-বিধি নাই, জৈনরা নাড়ীতত্ত্ব ও দেহস্থ চক্রের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও তাহাদের বিশেষ সাধন করেন না।

মধ্যযুগের (৫৫০-৯০০ খৃঃ অঃ) শৈবদের এইরূপ বিভাগ করা যায়। (ফারকার, পৃ ১৯০ দ্রষ্টব্য):—

পাশুপাত শৈব—

পাশুপাত
লকুলীশ পাশুপাত
কাপালিক
নাথ
গোরক্ষনাথী
রসেশ্বর

} ছয়টী বিভাগ

আগমিক শৈব—২৮টী আগম আছে তন্মধ্যে শৈবাগম স্বল্প, রুদ্রাগম অধিক-সংখ্যক। যথা:—

শৈব সিদ্ধান্ত (সংস্কৃত সম্প্রদায়)
তামিল শৈব
কাশ্মীর শৈব
বীর শৈব
তামিল ও বীর শৈবরা নিজেদের 'মাহেশ্বর' বলে। পাশুপাত না বলিলেও ইহাদের দর্শন পৌরাণিক পাশুপাত দর্শনের ভিত্তিতে গঠিত।

কাপালিক—অষ্টম শতাব্দীতে রচিত 'মালতীমাধবে' কপালকুণ্ডলা অঘোরঘণ্টার শিষ্যা, উভয়েই যোগসাধক। ৬ষ্ঠ শতাব্দী হইতে কাপালিকদের অভ্যুদয় হয়, ইহাদের আচার বামাচারী শাক্তদের অনুরূপ।

নাথ—ইহাদের মূল অনুসন্ধান অতীব কঠিন। গোরক্ষনাথীরা শৈব, কিন্তু আধুনিক নাথেরা, যথা—তাঞ্জোরের ভাস্কর রায় শাক্ত। পাশুপত শৈবের শাখা বিশেষ।

পাশুপত শৈব—বাণ ও হিয়ুংস্যাং ইহাদের উল্লেখ ও প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন। শঙ্কর ইহাদের মতের খণ্ডন করিয়াছেন, কারণ ইহাদের মতে ঈশ্বর ক্রিয়মাণ হইলেও জগৎসৃষ্টির মূল কারণ নহেন, ইহা উপনিষদের বিরুদ্ধ মত।

লকুলীশ—ইহারা পাশুপতের শাখা, গুজরাটের। ৭ম শতাব্দীর পূর্ব্বেই ইহাদের দর্শন প্রচলিত থাকায় নব শৈবাগম ইহারা গ্রহণ করে নাই। লকুলীশ শিবের অবতার। মহীশূর, রাজপুতানায় ইহাদের প্রচার আছে।

কানফাটা—ইহারা নাদ মুদ্রা ধারণ করে, ইহাদের মন্ত্র 'শিব-গোরক্ষ'। গোরক্ষনাথ 'হঠযোগ' ও 'গোরক্ষশতক' রচনা করেন। হঠযোগ-প্রদীপিকা গ্রন্থ, ঘেরণ্ডসংহিতা ও শিবসংহিতা পুস্তকদ্বয় হইতেই রচিত। ঘেরণ্ডসংহিতা ও প্রদীপিকার বর্ণনীয় বিষয় অনুরূপ। শিবসংহিতায় হঠযোগ ও শাক্তযোগের কথা আছে। (ফারকার, পৃ ৩৪৮)।

উইলসন সাহেবের মতে কাপালিক সম্প্রদায় অধুনা কানফাটাদের সহিত মিলিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বে উহারা বিভিন্ন সম্প্রদায় ছিল। কাপালিকদের ছয়মুদ্রা ধারণ রীতি ছিল—কণ্ঠী, স্বর্ণালঙ্কার, কুণ্ডল, শিরোভূষণ, ভস্ম ও উপবীত ধারণ। সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ মুদ্রা হইতেছে ভগাসনে বসিয়া ধ্যান, তাহা হইতেই নির্ব্বাণলাভ হয়।[১]

দাবিস্তানে উক্ত হইয়াছে গোরক্ষনাথ হইতেই সকল যোগী সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে।[২]

নাথসিদ্ধেরা সিদ্ধযোগী ছিলেন, প্রাচীন কাল হইতেই বিভূতিসম্পন্ন যোগীর বর্ণনা পাওয়া যায়। অথর্ব্ববেদের পঞ্চদশ অধ্যায়ে ব্রাত্য যোগীর বর্ণনা আছে, ইহারা বৈদিক সংস্কার মানিতেন না, তথাপি বিশেষ প্রকার দীক্ষা দ্বারা ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইতেন। ব্রাত্যরা শিবের উপাসক ছিলেন, শ্বাসপ্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রণ দ্বারা পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের যোগসাধনাও ইহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। ইহারা গীত গাহিয়া দেশদেশান্তর পর্য্যটন করিতেন, ইহাদের বেশ অদ্ভুত ছিল, হস্তে বর্শা ও করঙ্ক ধারণ করিতেন। ব্রাত্যের

১। ব্রীগস, পৃ ২২৭। ২। দাবিস্তান, ২য় ভাগ, পৃ ১২৯।

শক্তিও দেবীরূপে পূজিত হইত, তান্ত্রিক সাধন ইঁহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল, তৎসহ যোগসাধনও ছিল।[১]

প্রোফেসার রাধাকৃষ্ণ তাঁহার ভারতীয় দর্শন গ্রন্থের প্রথম ভাগের তৃতীয় অধ্যায়ে অথর্ব্ববেদ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে যোগীরা তপস্যার দ্বারা পঞ্চভূতকে জয় করিতেন, ইন্দ্রিয় বশীভূত হইলে পরমানন্দে মগ্ন হওয়া যায়, তাহাও তাঁহারা জানিতেন। বৈদিকযুগে ইন্দ্রজালের বিশিষ্ট স্থান ছিল, পঞ্চধুনির মধ্যে বসিয়া জপ বা উর্দ্ধবাহু হইয়া একপদে দণ্ডায়মান হওয়ার লক্ষ্য একই ছিল,—প্রকৃতিকে জয় করিয়া দেবতাকে স্ববশে আনা। ঋগ্বেদেও মন্ত্রাদির দ্বারা স্বার্থসিদ্ধি দেখা যায় কিন্তু অথর্ব্ববেদে ইহার অধিক প্রচার হয়।[২]

আলবেরুণীও অষ্টসিদ্ধির বর্ণনা করিয়াছেন।[৩] তাঁহার কাল খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দী।

যোগীরা প্রধানতঃ শৈব, শিব যোগিশ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণিত হন। যোগীদের পাশুপত-শৈব নামে প্রসিদ্ধি আছে নেপালে গোরক্ষনাথীদের কাহিনীতে ও বঙ্গদেশের গীতিকায় তান্ত্রিকতার সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের মিশ্রণ দৃষ্ট হয়। পাশুপত-শৈবদের চারিটী বিভাগ আছে—পাশুপত, লকুলীশ, কালামুখ ও কাপালিক। অঘোরী শৈব অদ্যাপি মধ্যে মধ্যে দৃষ্ট হয়, পাশুপত প্রভৃতি শৈব সম্প্রদায় অধুনা লুপ্ত। কানফাটারা অবশ্য পাশুপতদের ন্যায় মহেশ্বরের পূজা করেন। দাক্ষিণাত্যে পাশুপতদের আদিগুরুরূপে লকুলীশের পূজা হয়। ডাঃ ভাণ্ডারকার মতে শৈব মাত্রই লকুল বা পাশুপত নামে অভিহিত হইত। ক্রমশঃ তাহা হইতে পাশুপত, কালামুখ ও কাপালিক এই তিন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়।[৪] ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি জয়, ক্ষমা শিক্ষা, ওঁকার জপ ও ধ্যান দ্বারা পশুর পাশ বা বন্ধন ছিন্ন করিয়া মোক্ষলাভই ইঁহাদের সাধন।

আনুমানিক ৪০০ খৃষ্টাব্দে রচিত বায়ুপুরাণে লকুলীশদের পাশুপতদের শাখারূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই সম্প্রদায় মধ্যে শরীর ও মন জয়ের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার বর্ণনা আছে। পঞ্চম শতাব্দীর শিলালিপিতেও ইঁহাদের পরিচয় পাওয়া যায়। ইঁহারা অষ্টম শতাব্দীতে

১। ব্রীগস, পৃ ২১২। ২। ভারতীয় দর্শন—রাধাকৃষ্ণ, ১ম ভাগ, পৃ ১২১।

৩। Alberuni's India, Vol I, Ch. VII, p. 69. যোগীর অণিমাদি সিদ্ধি বর্ণন।

৪। Vaisnavism, Saivism and Minor Religious Systems, p. 121, Bhandarkar.

নেপালে প্রবেশ করেন, ইহা যাদুঘরে রক্ষিত মুদ্রার বিবরণ হইতে জানা যায়। শঙ্কর ও রামানুজ পাশুপতদের উল্লেখ করিয়াছেন, এবং কাপাল, কালামুখ, পাশুপত ও শৈবদের বিষয় বলিয়াছেন। অতএব খৃষ্টীয় অষ্টম-নবম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইঁহাদের অস্তিত্ব স্বীকার্য্য। ডাঃ ভাণ্ডারকারও বলিয়াছেন, খৃঃ ৯৩৪-১২৮৫ পর্য্যন্ত শিলালিপিতে লকুল নামে শৈবদের অভিহিত হইতে দেখা যায়।[১] কার্য্য, কারণ, যোগ, আচার ও দুঃখান্ত, পাশুপতদের এই পঞ্চসাধন। পশুপতিই পতি, জীব তাঁহার পশু, জীব পাশদ্বারা আবদ্ধ। 'দুঃখান্ত' অর্থে মোক্ষ বা পাশ মোচন। ভস্ম দ্বারা দেহ আচ্ছাদন প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা মোক্ষ ও ক্ষমতালাভ হয়।

মহাকাব্যে পাশুপতদের স্থান বিশেষ উচ্চে নহে। মহারাষ্ট্র গীতিকায় পাশুপত শৈব দস্যুরূপে চিত্রিত হইয়াছেন, উইলসন সাহেব ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। ফারকার সাহেব বলিয়াছেন, লকুলীশরা লিঙ্গপূজার প্রাধান্য স্বীকার করিত এবং দেহের নানা স্থানে লিঙ্গচিহ্ন অঙ্কিত করিত। বরোদা রাজ্যে লকুলীশ মন্দিবের কথাও ফারকার সাহেব বলিয়াছেন। বরোদার লাট প্রদেশে শিব গদাধারী মূর্ত্তিতে দেখা দেন। পাশুপত সাধনপ্রণালী খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতেও প্রচলিত ছিল। সুবিখ্যাত হর্ষ এই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। মাড়োয়ার, রাজপুতানা প্রভৃতিতে ইহা প্রসার লাভ করিয়া ৫৫০-৯০০ খৃঃ মধ্যে দাক্ষিণাত্যে প্রবেশলাভ করে। তথায় দশম শতাব্দীতে লকুলীশের অবতার দেখা দেয় এবং একাদশ হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত কালামুখদের আধিপত্য থাকে। উত্তর ভারতেও দশমশতাব্দীর লকুল মূর্ত্তি কাশ্মীরের নিকটবর্ত্তী মন্দির মধ্যে দেখা যায়। মন্দির গাত্রে শিলালিপিতে লকুলীশের প্রশংসা আছে। এই মন্দির ৭৯১ খৃষ্টাব্দের। দ্বাদশ শতাব্দীর শিলালিপি হইতে লকুলীশ ও কালামুখকে অভিন্ন বলিয়া ডাঃ ভাণ্ডারকার অনুমান করেন। উভয়কেই আবার পাশুপত বলা হইয়াছে। 'কালামুখ'দের ললাটে কৃষ্ণ চিহ্নমাত্র পার্থক্য আছে। ইহারা মহাকালের উপাসক, ভৈরবের ইহারা ভৃত্য। ইহাদের সহিত নরভুক্ 'অঘোরী'রাও জড়িত। বঙ্গদেশে ও আসামে এখনও বামাচারী অঘোরীদের অসাধ্য সাধন করিতে দেখা যায়, খাদ্যা-খাদ্যের বিচার ইহাদের নাই।[২]

১। ত্রীগ.স পৃ ২২০, ২১৯। ২। ত্রীগ.স পৃ ২২১—২২৪।

ষষ্ঠ শতাব্দীর 'দশকুমার চরিতে' কাপালিকদের বর্ণনা আছে, সপ্তম শতাব্দীতে মহারাষ্ট্রে ইহাদের প্রভাব ছিল। হিউ এন-ৎস্যাং (খৃ ৬৩০-৬৪৫). ভারতে থাকেন, তিনিও ইহাদের নরকপালধারী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 'মালতীমাধব' অষ্টম শতাব্দীতে রচিত হয়, ইহাতেও কাপালিকের দর্শন পাই। উহারা নগ্ন, মৃতদেহের ভস্মাচ্ছাদিত, ত্রিশূল ও কমণ্ডুলধারী, মদ্যপায়ী, রুদ্রাক্ষধারী; নরবলি ইহাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ। কাপালিকের সঙ্গিনী কাপালিনী, ভৈরবাদেশে ইহারা অষ্টসিদ্ধিলাভ করে। 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটক একাদশ শতাব্দীতে রচিত হয়, ইহাতেও কাপালিক বর্ণনা আছে। এই কাপালিক কপালধারী, কপালপাত্র হইতে মদ্যপানরত ও নরখাদক। এই কাপালিক হরি, হর প্রভৃতি দেবতাকে স্বীয় বশে আনিয়াছে এবং পার্ব্বতীর ন্যায় সুন্দরী কামিনীকে সে ভোগ করিয়া পরমানন্দ লাভ করে। অষ্টসিদ্ধি কাপালিকের আয়ত্তাধীন। ভবভূতির মালতীমাধবের কাপালিকের নাম অঘোরঘণ্টা, তিনি চামুণ্ডার উপাসক, কপালকুণ্ডলা অঘোর ঘণ্টার শিষ্যা, উভয়েই যোগের সাধক। কাপালিকেব চিত্র ভয়াবহ। নায়ক মাধব ইহাকে হত্যা করিয়া নায়িকাকে উদ্ধার করেন। দশকুমার চরিতে বর্ণিত কাপালিক চিত্রও ভয়াবহ, তিনি রাজকন্যা কনকলেখাকে বলি দিতে উদ্যত, কিন্তু তৎসহ রাজকন্যার উদ্ধার কাহিনীও বর্ণিত হইয়াছে।

উপরোক্ত বিবরণ হইতে এবং ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে রচিত 'তথাগত গুহ্যক' প্রভৃতি বৌদ্ধতন্ত্র গ্রন্থ হইতে বলা যায় যে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্ম্মেই তন্ত্রের প্রবেশ লাভ ঘাটে, তৎফলে বৌদ্ধতান্ত্রিকাচার্য্য ও হিন্দু কাপালিক প্রভৃতির অভ্যুদয় হয়। পাশুপত শৈবদের সহিত নাথপন্থের সাধনায় সাদৃশ্য ছিল। নাথেরা শিব বা আদিনাথের উপাসক, পাশুপতেরা পশুপতি বা মহেশ্বরের উপাসক। পশুপতিই শিব। যোগসাধন নাথদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তথাপি তন্ত্রের সহিত যোগা-যোগও ছিল। অতএব নাথধর্ম্মকে তন্ত্র ও যোগ তত্ত্বের সংমিশ্রণ বলা যাইতে পারে। মূলতঃ নাথেরা শৈব। তন্ত্রের পিণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডের একত্ব -অনুভূতি সাধন, ও শক্তি-পূজা নাথদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। জৈনধর্ম্মে এইরূপ কোন সাধনার কথা পাওয়া যায় না। জৈনগ্রন্থ 'পাহুঁড়া দোঁহা'তে ইন্দ্রিয় বিষয় ত্যাগ ও যোগসাধনার প্রয়োজনীয়তার ইঙ্গিত মাত্র আছে। এই গ্রন্থ একাদশ শতকে রচিত হয়. মুনি রামসিংহ ইঁহার প্রণেতা। তন্ত্র

সাধনার দ্বারা দেবতাদের সাহায্যে সিদ্ধিলাভ নাথদের অন্যতম লক্ষ্য। বৌদ্ধরাও সুখ ও ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তির নিমিত্ত তন্ত্রের সাধনা করিতেন। যোগ-তন্ত্রে ও অনুত্তর যোগতন্ত্রে দেবতাদের শক্তিদের আলিঙ্গন বদ্ধ হইয়া নির্ব্বাণ সুখে মগ্ন থাকার বর্ণনা আছে।[১]

তন্ত্র হিন্দুর পঞ্চম বেদ নামে খ্যাত। ইহাতে আগম ও নিয়ম এই দুই বিভাগ আছে, আগমে সদাশিব দেবীকে উপদেশ দিতেছেন, নিয়মে দেবী সদাশিবকে উপদেশ দিতেছেন। সারদাতিলক তন্ত্রে যন্ত্র, মন্ত্র, চক্র, কুণ্ডলী ও পাশুপতদর্শনের উল্লেখ পাওয়া যায়। 'গণকারিকা' নামক গ্রন্থে পাশুপতদর্শনের সিদ্ধান্তের বিশদ বিবরণ আছে।[২] মাধবচার্য্যের সর্ব্বদর্শন সংগ্রহেও ইহার উল্লেখ আছে। তাহার বহুপূর্ব্বে মহাভারতে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়।[৩] গণকারিকার সারতত্ত্ব—'চর্য্যাবিধিদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ এবং পরমৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তি ও চরম দুঃখনিবৃত্তি এই উভয় বিধ মুক্তি লাভ করিতে পশু সক্ষম'। শাস্ত্রজ্ঞান ও যোগানুষ্ঠান উভয়ের আবশ্যকতা আছে। শিবসামীপ্যলাভ হইলে ক্রিয়ার উপশম বা শান্তি হয়। মুক্তির প্রথম উপায় 'প্রসাদ', ইহাই নাথ ও কাশ্মীর শৈবাদ্বৈত মতে 'শক্তিপাত'।

বাসশ্চর্য্যা জপধ্যানং সদারুদ্রস্মৃতিস্তথা।
প্রসাদশ্চৈব লাভানামুপায়াঃ পঞ্চ নিশ্চিতঃ॥[৪]

শঙ্কর ৬৪টী তন্ত্র দেখেন, দত্তাত্রেয় উহাদের রচয়িতা। মন্ত্রসাধনই তন্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। তন্ত্রের সাধক পশু, বীর ও দিব্য ভেদে ত্রিবিধ, তন্মধ্যে দিব্যসাধকই 'কৌল' নামে পরিচিত। কৌলের পক্ষে ভাল বা মন্দ নাই, পাপ বা পুণ্য নাই, বিষদ্বারা বিষক্ষয়ের ন্যায় কৌলপক্ষে যে পথ পিচ্ছল ও দুর্গম সেই পথ অবলম্বন করিয়াই শিবত্ব প্রাপ্তি লক্ষ্য, ইহাই কৌলনীতি বা নাথনীতি, কারণ নাথসিদ্ধেরা 'কৌল' নামেই পরিচিত ছিলেন। ইহার দ্বারা নাথপন্থের সহিত তন্ত্রের যোগাযোগ সূচিত হইতেছে।

(খ) নাথমার্গের সহিত কৌলমার্গের সম্বন্ধ বিচার

নাথসিদ্ধগণ কৌল ছিলেন এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। আমাদের আধুনিক জ্ঞানে বিভিন্ন কৌল-সম্প্রদায়-নির্ণয় কষ্ট সাধ্য হইলেও একাদশ

১। সাধনমালা ২য় খণ্ড, ভূমিকা পৃ ১৪৭। ২। গণকারিকা আচার্য্য ভাসর্বজ্ঞ বিরচিত।
৩। কল্যাণ বেদান্তঅঙ্ক পাশুপাত সিদ্ধান্ত ও বেদান্ত পৃ ৪৪৭। ৪। গণকারিকা শ্লোক ৭।

শতাব্দীতেও ভারতে উহারা অপরিচিত ছিল না। কৌলজ্ঞাননির্ণয় পুথিতে সিদ্ধপংক্তি ও গুরুপংক্তির উল্লেখ আছে (নবম পটল), মহাকাল, দেবী কোট, বারাণসী, প্রয়াগ, অট্টহাস্য ও জয়ন্তীক্ষেত্রে এবং কামাখ্যা, পূর্ণগিরি, ওড়িয়ানা ও অর্ব্বুদ নামক চতুস্পীঠে যে সকল সিদ্ধার পূজা হইত তাহা উক্ত পংক্তিদ্বয়ে উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীবিল্বপাদ, বিচিত্রপাদ, শ্বেতপাদ, ভট্টপাদ, মচ্ছেন্দ্রপাদ, বৃহীষপাদ, বিন্ধ্যপাদ, শবরপাদ প্রভৃতি অষ্টাদশ গুরু এবং মুঞ্চিপাদ সূর্য্যপাদ প্রভৃতি দশ সিদ্ধার উল্লেখ আছে। গুরুদের মধ্যে মচ্ছেন্দ্রনাথ যে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন তাহা পুরুষানুক্রমিক কিম্বদন্তী হইতে নিশ্চিত রূপে বলা যায়। প্রাচীন উপাখ্যানেও মৎস্যেন্দ্র কর্ত্তৃক কুলাগম বা কুলশাস্ত্রের উপদেশ দানের বৃত্তান্ত আছে।[১]

কৌলজ্ঞান নির্ণয় পুথির রচনাকাল ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচীর মতে একাদশ শতাব্দী। এই পুথি রচিত হইবার বহু পূর্ব্বেই কৌলসম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হয়, একথার উল্লেখ উক্ত পুথিতেই পাওয়া যায় যথা—

দুর্ল্লভং সিদ্ধিসন্দোহং গোপিতব্যং প্রযত্নতঃ।
দাতব্যং পূর্ব্বসিদ্ধস্য অব্দমেকপরীক্ষিতম্ ॥৫ ৩৫
শ্রুয়তে দেবি পারম্পর্য্যক্রমাগতম্ ॥৬।৮
কৌলিকন্তু ইদং দেবী কর্ণাৎ কর্ণাসমাগতম্ ।৬।৯
এতত্তু কুলবিজ্ঞানম্ পারম্পর্য্যক্রমাগতম্ ॥১৪।৭৯

বিশিষ্ট কৌল সম্প্রদায়গুলি ও তাহাদের গুরুদের নাম উক্ত পুথিতে আছে। যথা বৃষণোত্থ কৌল, বহ্নিকৌল, মহাকৌল, সিদ্ধকৌল সিদ্ধামৃত কৌল, মৎস্যোদর ও যোগিনীকৌল।[২]

পঞ্চ পঞ্চাশিকা যোগপ্রণালীর ব্যাখ্যাও কৌলশাস্ত্রে আছে, এই বিভিন্ন যোগপ্রণালীর নাম কুলসাগর, কুলোঘো, হৃদয়, সম্বর, সৃষ্টিকৌল, মহাকৌল, তিমির, সিদ্ধামৃতকৌল, শক্তিভেদকৌল, জ্ঞানকৌল, সিদ্ধেশ্বর, বজ্রসম্ভব ইত্যাদি।[৩]

১। কৌলজ্ঞান নির্ণয়—১৬ পটল।
২। কৌলজ্ঞান নির্ণয় ১৪।৩৩ ৩৪, ১৬।৪৭—৪৯
৩। ঐ ঐ পটল ২১

ভাব বর্জ্জিত অবস্থা ও একাত্মা হইবার সাধনা। এই সহজ সাধন কৌলজ্ঞাননির্ণয়ে ও অকুলবীরতন্ত্রেও বর্ণিত হইয়াছে। এই সহজাবস্থা লাভ হইলে সাধক স্বয়ং ব্রহ্মা, হরি, রুদ্র, ঈশ্বর, শিব, পরমদেব, সাংখ্য, পুরাণ, অর্হন্ত, বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন, এবং সাধক স্বয়ং দেবী, স্বয়ং গুরু, স্বয়ং ধ্যান, স্বয়ং ধ্যাতা, স্বয়ং সর্ব্বত্র দেবতারূপে বিরাজ করেন। (অকুল বীরতন্ত্র 'এ' ২৪-২৬ শ্লোক)।

বৌদ্ধসিদ্ধারা 'আগমপোথী ইষ্টমালা' (চর্য্যা ৪০), প্রভৃতিকে সহজ সিদ্ধিলাভের পথের অন্তরায় স্বরূপ মনে করেন। পক্ব শ্রীফলের বাহিরে গন্ধলুব্ধ ভ্রমর যেরূপ ভ্রমণ করে, বাহ্য আগমাদি জ্ঞানদ্বারা লভ্য পরমার্থসত্যাভিমানী পণ্ডিতেরাও সেইরূপ।[১]

কৌলজ্ঞাননির্ণয়ের তৃতীয় পটলে (৩০, ৩১) লৌকিক মার্গ বর্জ্জনের কথা ও আধ্যাত্মিক মার্গে উৎকর্ষ সাধনের কথা আছে, লৌকিক-মার্গসকলে সিদ্ধি বা মুক্তি নাই। অকুলবীরতন্ত্রে "ন যজ্ঞং নোপবাসঞ্চ ন ক্রিয়া [illegible]ভেদকম্ ন জপো নার্চ্চনং স্নানং ন হোমং নৈব সাধনম্" ইত্যাদি দ্বার[illegible] লৌকিক বিধি ত্যাগ ও 'বেদসিদ্ধান্ত শাস্ত্রাণি কায়ক্লেশপরাণি' বিদ্যাহঙ্ক[illegible]র পাণ্ডিত্য গর্ব্বিতদের অকুলবীর জানিবে না ইত্যাদি আছে।[২]

বিভিন্ন [illegible] কৌল ও বৌদ্ধতান্ত্রিকদের মধ্যে পঞ্চ কুলের উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা,—নটী, রাজকী, ডোম্বী, চণ্ডালী ও ব্রাহ্মণী। বিভিন্ন তীর্থে যে সকল যোগিনী ও [illegible]কিনী বাস করে তাহারাও শক্তির অংশ, এইরূপ বিশ্বাসও প্রচলিত আছে। এই তীর্থ সকল দেহমধ্যেই অবস্থিত আছে ও যৌগিক নাড়ীগুলির সহিত [illegible]দহস্থ তীর্থ বা পীঠের যোগাযোগ আছে। বৌদ্ধতন্ত্রে পীঠ, উপপীঠ, ক্ষেত্র [illegible] ছন্দঃ এই চারিশ্রেণীর তীর্থের উল্লেখ আছে। উপক্ষেত্র ও উপ[illegible]ন্দর উল্লেখও আছে।

পীঠ—জালন্ধর, ওড্রিপ্রণা[illegible] অর্ব্ব[illegible] কামরূপ, পূর্ণগিরি।

উপপীঠ—মালব, [illegible]কুলসাগ।

ক্ষেত্র—মুম্মুনি, দেবকোল, শ[illegible]কমরিপাঠক।

উপক্ষেত্র ও ছন্[illegible] [illegible]দ। গোদাবরী [illegible]পক্ষেত্র, হরিকেল, সৌরাষ্ট্র, কলিঙ্গ ও চরিত্র ছন্দ ও উপছন্দ। (হে বজ্রতন্ত্র [illegible]

১। কৃষ্ণাচার্য্য পাদের দোহাকোষ ২ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত।

২। অকুলবীরতন্ত্র-এ-শ্লোক ৪৩ ইত্যাদি ও শ্লোক ৫৯, ৬০, ৬১।

কৌলজ্ঞাননির্ণয়েও পীঠ, উপপীঠ, ক্ষেত্র, ডাকিনী ও যোগিনীর উল্লেখ আছে। চতুষ্পীঠ যথাক্রমে কামাখ্যা, পূর্ণগিরি, ওডিয়ান ও অর্ব্বুদ।[১]

ক্ষেত্র,—করবীর, মহাকাল, দেবীকোট, বারাণসী, প্রয়াগ, অট্টহাস্য, চরিত্র, একাম্র ও জয়ন্তী। যোগিনীরা ক্ষেত্রজা ও পীঠজা, তদ্ব্যতীত যোগজা, মন্ত্রজা, সহজা, কৌলজা ও অন্ত্যজা। বিবাহিতা শক্তির নাম 'সহজা' অন্য স্ত্রীর নাম 'কৌলজা' ও 'অন্ত্যজা'। কৌলজ্ঞাননির্ণয় মতে এই শক্তি দ্বিবিধা—বহিঃস্থা ও আধ্যাত্মা, দেহ মধ্যেই ইহাদের উপলব্ধি করিবার নির্দ্দেশ আছে। এই শক্তির সহিত দেহস্থ পীঠাদির সম্বন্ধও বর্ণিত হইয়াছে।[২]

কৌলজ্ঞাননির্ণয়ের পঞ্চদশ পটলের নাম 'পরমবজ্রকরণম্' অর্থাৎ পরমবজ্রে দীক্ষা ('বজ্র' শব্দ ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রে নাই, অতএব উহার মূল সম্ভবতঃ বৌদ্ধ)। তদ্ব্যতীত 'শান্তিকা', 'পোষ্টিকা' আদি শব্দ ব্রাহ্মণ্য-তন্ত্রে নাই, কিন্তু বৌদ্ধ 'জ্ঞানসিদ্ধি' ও 'তথাগত গুহ্যকে' আছে (১৮, পৃ ১৬৮) কৌলজ্ঞাননির্ণয়ে শান্তিকা (যাহা মনের শান্তি আনে), এবং পোষ্টিকা (যাহা মনের শক্তি বৃদ্ধি করে) শব্দ থাকাতে বৌদ্ধতন্ত্রের সহিত ইহাব সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। কৌলজ্ঞানের একাদশ পটলে যে পঞ্চ পবিত্রাণি 'বিষ্ঠা ধারামৃতং শুক্রং রক্তমজ্জাবিমিশ্রিতম্' ও গোমাংসাদি ভক্ষণেব কথা আছে, তাহা স্থূলার্থে গ্রহণ বিধি কি না সন্দেহ। বৌদ্ধ অনঙ্গবজ্রের 'প্রজ্ঞোপায় বিনিশ্চয়া সিদ্ধি'তে, ইন্দ্রভূতির 'জ্ঞানসিদ্ধি'তে ও 'তথাগত গুহ্যকে' রহস্যময় খাদ্য ও পানীয়ের বর্ণনা আছে।[৩]

পরবর্ত্তী বৌদ্ধতন্ত্র ও যোগিনী কৌলে উপরোক্ত সাদৃশ্য থাকিবার নিমিত্ত ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে উভয় মতই [illegible]ধারণ মূল ভিত্তির আশ্রয়ে বর্দ্ধিত হইয়াছে। কিন্তু ব[illegible] তন্ত্রজ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া কিছু নির্ণয় করিয়া বলা ক[illegible]।

'কর্দ্দমে চন্দনেহ ভিন্নং পুত্রে শত্রৌ [illegible]

ইত্যাদি ভেদাভেদ জ্ঞানদূর এবং উ[illegible] [illegible]ধর্মিক [illegible], ইহা শেষে 'কুলার্ণব' নামক ব[illegible] [illegible]আচারে পরিণত

১। কৌলজ্ঞাননির্ণয়, অষ্টম প[illegible]
২। ঐ [illegible]ত্যাদি।
৩। অভিধর্মকোশঃ, ভূমিকা [illegible]
৪। কৌলজ্ঞাননির্ণয়, ভূমিকা পৃ [illegible] ডাঃ বাগচী।

হইয়াছে। দক্ষিণাচারের মতে বৈদিক নিয়মে দেবীর আরাধনা করিয়া সাত্ত্বিক বা রাজসিক বলিদানের ব্যবস্থা আছে, মদ্যাদি নিষেধ। বামাচারে পঞ্চ-মকার বিধেয়।[১]

বর্ত্তমান কুলার্ণব তন্ত্রে বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার, দক্ষিণাচার, বামাচার, সিদ্ধান্তাচার এবং কৌলাচার (২য় উল্লাস) এই সপ্তবিধ আচারের বর্ণনা আছে। বিশ্বসার তন্ত্রে 'আচারো দ্বিবিধো দেবি বাম-দক্ষিণ-ভেদতঃ' বলা হইয়াছে।

মদ্যং মাংসং চ মৎস্যং চ মুদ্রা মৈথুনমেবচ।
মকার-পঞ্চকং দেবী দেবতা প্রীতিকারকম্॥[২]

এই পঞ্চ-মকার সাধনা 'বামাচার' ও এই পঞ্চ মুদ্রা রহিত যে আচার তাহাই 'দক্ষিণাচার'।

কুলার্ণব তন্ত্রের পঞ্চম উল্লাসে পঞ্চমকারের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, সেখানে পঞ্চ-মকারের 'বাসনা' শব্দের দ্বারা উল্লেখ করা হইয়াছে, এই বাসনা অর্থে সংস্কার বা সূক্ষ্মরূপ, ইহার অর্থ ইচ্ছা বা ভাবনা নহে। সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় 'কৌলমার্গ রহস্যে' বাসনার অর্থ 'ভাবনা' করিয়াছেন, ইহা সঙ্গত মনে হয় না।[৩] সূক্ষ্মরূপ অর্থ ধরিলে পঞ্চমুদ্রার এইরূপ ব্যাখ্যা হয়,—মূলাধারস্থিত সুপ্তা কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগরিত করিয়া সুষুম্নাপথে সহস্রদলে নীত করিলে শিবের সহিত (কুণ্ডলিনী) শক্তির যে আত্যন্তিক সম্মেলন বা সমরসতা প্রাপ্তি হয় ও তাহার দ্বারা যে আনন্দের অনুভূতি সাধকের হৃদয়ে হয়, তাহাই 'মৈথুন'। এই সুখের বা আনন্দের অনুভূতির অবস্থায় সহস্রার হইতে যে অমৃতক্ষরণ হয় তাহাই 'মদ্য'। জ্ঞান খড়্গের দ্বারা পাপ ও পুণ্যরূপ [illegible]লিই 'মাংস ভক্ষণ', বলির পর মাংস ভক্ষণ প্রথা, অর্থাৎ সাধকের [illegible] চিত্ত লয় বিধি। চিত্তলয়ের জন্য বাহ্য ইন্দ্রিয়কে সং[illegible] করাই 'মৎস্যাশী' হওয়া ও কুণ্ডলিনী শক্তির প্রবোধনে [illegible] দ্বারাই শক্তি সাধনা।[৪]

শ্রীগুরু[illegible] বাসনা উপলব্ধি কর্ত্তব্য, যে সাধক যথাযথ [illegible] পরম অবস্থায় পৌঁছাইতে

১। মধ্যযুগে [illegible] ১ম উল্লাস।
৩। কৌলম[illegible]
৪। কুলার্ণব[illegible]

সক্ষম তিনিই 'জীবন্মুক্ত'। পূর্ণাভিষিক্ত জীবন্মুক্ত যোগীর পক্ষে পঞ্চ-মকারের বাহ্য অনুষ্ঠানেও আপত্তি নাই, যদ্যপি বাসনা উপলব্ধির নিমিত্ত অর্থাৎ. চরম লক্ষ্যে পৌঁছাইবার জন্যই কুলার্ণবের পঞ্চম ও ষষ্ঠাদি উল্লাসে বাহ্য পঞ্চমুদ্রার কথা আছে। তৎসহ সাধককে সাবধান করাও হইয়াছে যে দুইখানি তীক্ষ্ণ অসির মধ্য দিয়া গমন বা ব্যাঘ্রের কণ্ঠালিঙ্গন বা বিষধর সর্পকে ধারণ যেরূপ কঠিন, এ সকল আচরণ বা কুলসাধনা তাহা অপেক্ষাও অসাধ্য ব্যাপার। অতএব বুঝা যাইতেছে, চিত্তে সাত্ত্বিক বৃত্তির উন্মেষ হইয়া চিত্ত বিশুদ্ধ না হইলে কুলসাধন অকর্তব্য। চৈতন্যরূপ অগ্নিতে সুষুম্নাপথে বিশ্ব প্রপঞ্চকে বা বৃত্তি সকলকে আহুতি দিতেছি, সাধকের এইরূপ ভাবনা করাই শ্রেয়ঃ। সারদাতিলকের সঙ্কলন-কর্তা লক্ষ্মণেন্দ্র দেশিক, 'সৌন্দর্য্য লহরী'র টীকাকার লক্ষ্মীধর, মহাপণ্ডিত তান্ত্রিক দার্শনিক ভাস্কর রায় (ললিতসহস্রনাম ভাষ্যকার) বামাচারী হইয়াও বামাচারের অনুকূল ছিলেন না। উপযুক্ত অধিকার লাভ করিয়া কুলাচার দ্বারা মুক্তিলাভ করা যাইতে পারে তাঁহারা এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশের প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক নিবন্ধকার তন্ত্রসার লেখক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশও কুলাচারের অনুষ্ঠানে শিবসদৃশ ব্যক্তির প্রয়োজন, এ কথা বলিয়াছেন।[১]

বৈদিক যোগ সাধন প্রণালী ও তান্ত্রিক যোগ সাধন প্রণালীর চরম লক্ষ্য এক হইলেও অনুষ্ঠান পদ্ধতি ভিন্ন, জীবের মুক্তিই উভয়ের লক্ষ্য হইলেও বৈদিক সাধনে কুণ্ডলিনী উদ্বোধন বা ষট্‌চক্রসাধন তত্ত্ব নাই, তান্ত্রিক মতে ষট্‌চক্রভেদ ও দেহস্থ সুপ্ত কুণ্ডলিনী শক্তির চৈতন্য সম্পাদন একটি প্রধান ব্যাপার। কঠ, শ্বেতাশ্বতরাদি উপনিষদে ও পাতঞ্জল দর্শনে বৈদিক যোগকথার আলোচনা আছে।

তন্ত্রের অনুশীলন কর্তা কতিপয় বিদ্বানের মত যে শাক্তমার্গ [illegible] নিমিত্ত বৈদিক অনুষ্ঠানের নিকট ঋণী, কারণ বামদেব্যাদি অনেক বিধানে পরযোষ আদি প্রয়োগ [illegible] Shakti and Shakta p. 440 —448) [illegible] সম্ভবতঃ কৌ[illegible] বিশেষতঃ তৎপরবর্তী তন্ত্রের প্রভাব পড়ে, কারণ কুলার্ণব [illegible] তন্ত্রে মদ্যমাংসাদির প্রত্যক্ষ প্রয়োগের নিন্দা আছে [illegible] শ্লোক)। কৌলাচারের মুখ্য কেন্দ্র কামাখ্যা: [illegible] ভারতের পূর্ব [illegible] স্থিত, সম্ভবতঃ এই কারণেই

১। বামাচার, শ্রীহারাণচন্দ্র শাস্ত্রী, উদ্বোধন, আশ্বিন ১৩৩৮।

তিব্বতী প্রভাব পড়ে। গান্ধর্ব্বতন্ত্রে, তারাতন্ত্রে (১।২), রুদ্র যামলে (১৩ পটল), বিষ্ণু যামলে (১-২ পটল), মহাচীন তিব্বতে পঞ্চ-মকার বিশিষ্ট পূজা বশিষ্ঠদ্বারা কৃত হয় ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। এই উল্লেখ দ্বারা তিব্বতী প্রভাবের কথা স্বীকার করা যায়। এই পঞ্চ তত্ত্ব অন্তর্যোগ বিশিষ্ট। এই মৎস্য মাংস আহারের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

কৌল দ্বিবিধ—'উত্তরকৌল' ও 'পূর্ব্বকৌল'। পূর্ব্বকৌল শ্রীচক্রে স্থিত যোনিপূজা করেন, উত্তরকৌল ইহার ও অন্যমুদ্রার প্রত্যক্ষ সাধন করেন, তাই সমাজে এই বামাচার নিন্দনীয়। প্রকৃতপক্ষে পূর্ব্বকৌলের সাধনা অসঙ্গত কিছু নাই।[১] কৌলাচারের অতিরিক্ত শ্রীবিদ্যার উপাসক 'সময়াচারী' নামে বিখ্যাত, শঙ্কর এই মতানুলম্বী ছিলেন, 'সময়' অর্থে হৃদয়াকাশে চক্রভাবনা দ্বারা পূজা বিধান বা শিব শক্তির সামরস্য সাধন। লক্ষীধর সময়মার্গী ছিলেন, তিনি কৌলমার্গের নিন্দা করিলেও কৌল ও সময়মার্গে নিতান্ত ঘনিষ্ঠতা আছে, যিনি পরমকৌল তিনি সত্যকার সময়মার্গী। লক্ষীধরের বর্ণনা অনুযায়ী আধারচক্র বা যোনির প্রত্যক্ষ রূপে পূজাকারী 'কৌল' ও ভাবনাকারী 'সময়মার্গী'। অতএব সময়মার্গে অন্তর্যাগকে মহত্ত্ব দেওয়া হয় ও পঞ্চমুদ্রার অনুকল্প ব্যবহার সমর্থিত হয়। ভাস্কর রায় ললিত সহস্রনাম ভাষ্যের প্রথমেই 'কুল' শব্দের অর্থ দিয়াছেন 'মূলাধার চক্র' "কুঃ পৃথিবীতত্ত্বং লীয়তে যস্মিন্ তদাধারচক্রং কুলম্" ইহার ত্রিকোণ বা যোনিও সংজ্ঞা। ভাস্কর রায় কুল' শব্দে আরও ব্যাখ্যা করিয়াছেন যথা—"কুলঃ সজাতীয়সমূহঃ। স চ একঃ বিজ্ঞানবিষয়-স্বরূপঃ স্বাজাত্যাপন্ন জ্ঞাতৃজ্ঞেয়জ্ঞানরূপত্রয়াত্মকঃ। ততঃ সা ত্রিপুটী কুলম্।"[২]

যে সাধকের পূর্ণ অদ্বৈতজ্ঞান হইয়াছে তিনিই কৌল। তাহা [illegible] সাধকের অভিন্নত্ব জ্ঞান হয়, যথা—

কর্দ্দমে চন্দনেহ [illegible] ত্রৌ তথা প্রিয়ে।
শ্মশানে ভবনে [illegible] তৃণে।
ন ভেদো [illegible] ঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

(ভাবচূড়ামণিতন্ত্র)

এই কৌল সাধনা বেদা [illegible] ার স্বরূপ। এই সাধন

১। ভারতীয় দর্শন, বলদেব উপাধ্যায় [illegible]
২। ঐ ঐ পৃ ৫৩[illegible]

গুপ্ত বলিয়া কৌল বাহিরে নিজেকে প্রকাশ করেন না। নিম্নলিখিত শ্লোকে কৌলের যথার্থ বর্ণনা আছে,—

অন্তঃ শাক্তা বহিঃ শৈবাঃ সভামধ্যে চ বৈষ্ণবাঃ।
নানারূপধরাঃ কৌলা বিচরন্তি মহীতলে ॥[১]

বৈদিককাল হইতেই তন্ত্র সাধন প্রচলিত কিন্তু উহা সর্ব্বদা গোপনীয় ছিল। সর্ব্বসাধারণে বৈদিক পূজা করিতেন, তান্ত্রিক পূজার অধিকারী অল্প ব্যক্তি ছিলেন। উপনিষদে বর্ণিত বিভিন্ন বিদ্যার আধার ভিত্তি তান্ত্রিক বলিয়া প্রতীতি হয়। বৃহদারণ্যক (৬।২) ও ছান্দোগ্য (৫।৮) বর্ণিত পঞ্চাগ্নি বিদ্যার প্রসঙ্গে 'যোষা বা গৌতমাগ্নিঃ' আদি রূপকের অর্থ কি? ছান্দোগ্যের (৩।১ -১০) মধু বিদ্যার রহস্য কি? সূর্য্যের ঊর্দ্ধমুখী রশ্মি সকল মধুনাড়ী, গুহ্য আদেশ মধুকর, ব্রহ্মই পুষ্প, উহা নিঃসৃত অমৃত সাধ্য নামক দেবতা উপভোগ করেন, এই পঞ্চ অমৃত বর্ণনে যে গুহ্য আদেশকে মধুকর বলা হইয়াছে ইহা গোপনীয় তান্ত্রিক আদেশ ভিন্ন অপর কি হইতে পারে?[২] অতএব উপনিষদের সময়েও তন্ত্রের গুপ্ত প্রচলন ছিল বলা যায়। তান্ত্রিক উপাসনা অদ্বৈতবাদের উপর স্থাপিত। তন্ত্রের শক্তি-কল্পনা বৈদিক। ঋগ্বেদের 'বাগম্ভৃণী সূক্ত' (১০।১২৫)তে শক্তিতত্ত্বের পূর্ণ বিকাশ আছে, তন্ত্রের ক্রিয়ামার্গের উপাসক নিজ উপাস্যের সহিত তাদাত্ম্য স্থাপিত করেন, 'দেবোভূত্বা যজেদ্‌দেবম্'—ইহাই লক্ষ্য। তন্ত্রের পরমতত্ত্ব মাতৃরূপা। কলিযুগে (বিনা হ্যাগমমার্গেণ কলৌ নাস্তি গতিঃ,—মহানির্ব্বাণ) তন্ত্রবিনা গতি নাই। আগম সপ্তলক্ষণযুক্ত গ্রন্থ যথা—সৃষ্টি, প্রলয়, দেবার্চ্চন, সর্ব্বসাধন, পুরশ্চরণ, ষট্‌কর্ম্ম (বশীকরণাদি), সাধন ও ধ্যানযোগ। বেদের জ্ঞানই তন্ত্রের 'ক্রিয়াত্মক' রূপ, কতিপয় তন্ত্রের মূল ভিত্তি বেদে, যথা প[illegible] ইত্যাদি। শারদাতিলকের ভাষ্যকার রাঘবভট্ট তন্ত্রকে 'স্মৃ[illegible] বেদের তৃতীয় কাণ্ড উপাসনা কাণ্ডের অন্তর্গত 'তন্ত্র'। মনু স্মৃ[illegible]কাকার কুল্লুকভট্ট হারীত ঋষির বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলিয়া[illegible], বৈদিক ও তান্ত্রিক। ভাস্কর রায় তন্ত্রকে স্মৃতিশাস্ত্রের [illegible]। বেদ ও তন্ত্র উভয়ই শিব হইতে উৎপন্ন। বেদ উচ্চ[illegible] সর্ব্ববর্ণের জন্য উন্মুক্ত।[৩]

১। কৌলমার্গ রহস্য, সতীশচন্দ্র সিদ্ধা[illegible]
২। ভারতীয় দর্শন, বলদেব উপাধ্যায়, [illegible]
৩। ঐ ঐ বলদেব উপাধ্যায়, [illegible]।

শাক্তের সপ্তবিধ আচার মধ্যে 'বামাচার' মাত্র অবৈদিক। শাক্তের বেদ, বৈষ্ণব, শৈব ও দক্ষিণাচার পশুভাবাপন্ন অবিদ্যাযুক্ত সংসারাবদ্ধ জীবের জন্য, বাম ও সিদ্ধান্ত আচার বীরভাবাপন্ন অর্থাৎ অদ্বৈতজ্ঞানের কণামাত্র আস্বাদনে কৃতকার্য্য সাধক বা বীরের জন্য এবং একমাত্র 'কৌলাচার' দিব্য ভাবাপন্ন সাধকের জন্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। দ্বৈতজ্ঞান লোপ করিয়া অদ্বৈতজ্ঞানে স্বীয় সত্তা উপাস্যের সত্তায় নিমজ্জিত করিয়া যে অদ্বৈতানন্দে মগ্ন থাকে সেই সাধক দিব্য সাধক। শাক্তমতের 'তিন ভাব' ও 'সপ্ত আচাবে'র মধ্যে কঠিনতম ভাব ও আচার 'দিব্য' ও 'কৌল' ইহা নাথসম্প্রদায়ের অনুমোদিত, ইহা কম গৌরবের কথা নহে।

"কুঃ পৃথিবীতত্ত্বং লীয়তে যত্র তৎ কুলং আধারচক্রং
তৎ সম্বন্ধাল্লক্ষণয়া সুষুম্না মার্গোঽপি।"

অতএব 'কুল' অর্থে সুষুম্নামার্গ বা যাহাতে পৃথিবীতত্ত্ব লীন হয় সেই আধারচক্র। এবং 'কৌল', 'কুল', 'অকুলে'র সম্বন্ধ যথা—

কুলং শক্তিরিতি প্রোক্তম্, অকুলং শিব উচ্যতে
কুলেঽকুলেঽস্য সম্বন্ধঃ কৌলমিত্যভিধীয়তে॥

অর্থাৎ শিবশক্তির সামরস্যকে 'কৌল' বলে। আর কুলে যুক্ত দেবীকে কৌলিনী বলে।[১]

নিবৃত্তির পথে পঞ্চ-মকার লইয়া সাধন যে কত কঠিন ব্যাপার তাহা সহজেই অনুমেয়। গুরু উপদেশে ঘৃণালজ্জাদি অষ্টপাশ ছিন্ন করিয়া বাসনাকে ঊর্দ্ধমুখী করিতে হয়, ভেদজ্ঞান দূর কবিতে হয়। শ্মশানবাসী যোগী হইয়া অষ্টাদি যোগ সাধন করতঃ কৌলাচারী হওয়ার অধিকারী হওয়া যায়, এই সময়ে সাধকের সোঽহংভাব, দিক্কাল বিচার, ভেদাভেদ বা মানাপমানের প্রতীতি থাকে না। বিশ্বসাবতন্ত্রে কৌলের লক্ষণ এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে—

দিক্কালনিয়মো নাস্তি [illegible]নিয়মো ন চ।
নিয়মো নাস্তি [illegible]শ মহামন্ত্রস্য সাধনে॥
কচিৎ [illegible]ভ্রষ্ট, কচিৎ ভূতপিশাচবৎ।
নানাবে[illegible]াঃ কৌলাঃ বিচরন্তি মহীতলে॥

কৌলের অন্ত[illegible] বাসনা [illegible] হইয়া মহাকালী বাস করেন,

১। কল্যাণ, শক্তি অ[illegible] ২৫৩, ২৫৪ দয়াশঙ্কর রবিশঙ্কর

এক জীবনে কৌল না হইলেও পূর্ব্ব সাধনা বৃথা যায় না, কৌলাচারে উপনীত হইলে মোক্ষলাভ হয় ইহা গীতাতেও আছে।[১]

মন্ত্রশাস্ত্রকে সাধারণতঃ তন্ত্র বলে। মন্ত্রশাস্ত্রে ত্রিবিধ ভাব ও সপ্তবিধ আচারের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভাব—দিব্য, বীর ও পশু। আচার—বেদ, বৈষ্ণব, শৈব, দক্ষিণ, বাম, সিদ্ধান্ত ও কৌল। বৈদিক ও তান্ত্রিক ক্রিয়া অনুষ্ঠান ভাব দ্বারা করিলে ফললাভ অবশ্যম্ভাবী। রুদ্র যামলতন্ত্রে আছে –

ভাবেন লভ্যতে সর্ব্বং ভাবেন দেব দর্শনম্।
ভাবেন পরমং জ্ঞানং তস্মাদ্ ভাবাবলম্বনম্॥

ভাব দ্বারাই সর্ব্বপ্রকার লাভ হয়—দেবদর্শন, পরমজ্ঞানলাভ ইত্যাদি। অতএব উপযুক্ত ভাবালম্বনে কর্ম্মবিধি মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের ৪র্থ উল্লাসে আছে। যাহার যে প্রকার ভাব ও সাধনে অধিকার সে তাহার অনুকূল অনুষ্ঠান করিলে ফলপ্রাপ্তি হইবে। ভাবচূড়ামণি তন্ত্রেও আছে—

বহুজপাৎ তথা হোমাৎ কায়ক্লেশাদি বিস্তরৈঃ।
ন ভাবেন বিনা দেব যন্ত্রমন্ত্রাঃ ফলপ্রদাঃ॥

ভাবচূড়ামণি, সময়াচার, কুমারীতন্ত্র, জ্ঞানদীপ, বিশ্বসার, সর্ব্বোল্লাস, কামাখ্যা কুব্জিকা, রুদ্রযামল প্রভৃতি তন্ত্রে ত্রিবিধ ভাবের উল্লেখ আছে। তন্ত্রশাস্ত্রে আছে দিব্যভাব উত্তম, বীরভাব মধ্যম, পশুভাব অধম। রুদ্রযামলের ষষ্ঠ পটলে আছে প্রথমে পশু, পরে বীর ও তৎপরে ক্রমশঃ দিব্য ভাব অবলম্বনীয়। অতএব মনে হয় ক্রমশঃ তমঃ, রজঃ ও সত্ত্ব গুণাধিক মনোভাবের দ্বারা সাধনার কথা বলা হইয়াছে। একভাব অন্য ভাবের হেতু, পশু হইতে বীর, বীর হইতে দিব্যভাব হয়। দিব্যভাবে স্থিতসাধক বিশ্ব ও দেবতায় ভেদ দেখেন না।

ত্রিবিধ ভাবের অন্তর্গত সপ্ত আচারের কথা বিশ্বসার তন্ত্রে ও অন্যান্য তন্ত্রেও বর্ণিত হইয়াছে। কুলার্ণব তন্ত্রের ২য় উল্লাসে আছে—

সর্ব্বেভ্যশ্চোত্তমা বেদা বেদেভ্যো বৈষ্ণবং পরম্।
বৈষ্ণবাদুত্তমং শৈবং শৈবাদ্দক্ষিণমুত্তমম্।
দক্ষিণাদুত্তমং বামং বামাৎ সিদ্ধান্তমুত্তমম্।
সিদ্ধান্তাদুত্তমং কৌলং কৌলাৎ পরতরং ন হি।

১। শ্রী ভারতী, চতুর্থ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, মহানির্ব্বাণতন্ত্র, সতীশ দেব।

পশুভাব মধ্যে—বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার ও দক্ষিণাচার ;
বীরভাব মধ্যে—বামাচার ও সিদ্ধান্তাচার ;
দিব্যভাব মধ্যে—কৌলাচার শ্রেষ্ঠ।

কুলাচারে প্রবৃত্ত সাধক পূর্ণব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী। তাঁহার পঙ্ক ও চন্দন, পুত্র ও শত্রু প্রভৃতিতে ভেদ নাই। তিনি সর্ব্বভূতে নিজ আত্মাকে ও নিজ আত্মায় সর্ব্বভূতকে দেখেন।[১]

পূর্ব্বে যে—ন ভেদো যস্য দেবেশি স এব কৌলিকোত্তমঃ।
চিন্তয়েদাত্মনাত্মানং সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিমান্ ॥

বলা হইয়াছে,—নাথ সিদ্ধদেরও ইহাই লক্ষ্য। নাথদেরও 'কৌল' বলিত।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত যে সকল কাব্য নাটকাদি পাওয়া যায় তাহাতে কৌল বা ভৈরবের বিবরণ পাওয়া যায়। কর্পূরমঞ্জরী, প্রবোধ চন্দ্রোদয়, মালতীমাধব, প্রভৃতি গ্রন্থে কাপালিকের বর্ণনা পাওয়া যায়। সে সময় কৌলেরা সমাজে নিন্দনীয় ছিলেন না, এই সকল গ্রন্থ হইতে ইহা অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না।

ভাব মানস ধর্ম্ম, আচার তাহারই বহিঃপ্রকাশ। পশ্বাচারে পঞ্চতত্ত্বের অনুকল্পের ব্যবহার আছে। বীরভাব মধ্যে দক্ষিণাচার, বামাচার ও সিদ্ধান্তাচার আছে অর্থাৎ বীরাচার-সাধক প্রথমে নিজকে শিব ভাবিয়া শক্তির পূজা করেন, পরে নিজকে শক্তি মনে করিয়া শক্তির পূজা করেন ও সর্ব্বশেষে শিবের সহিত অদ্বৈতভাব প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার ঊর্দ্ধে দিব্যাচার, তখন সাধকের সকল ভাববর্জ্জিত অবস্থা হয়, এবং তিনি 'কৌল' নামে পরিচিত হন। তখন তাঁহার পক্ষে কোন নিয়ম বা বন্ধন থাকে না।

নিগম তত্ত্বে আছে—

কৌলানাং নিয়মো নাস্তি নিষেধস্য বিধেঃ শিবে।
দিব্যানাঞ্চ তথা জ্ঞেয়ং মুক্তিমাত্রং বিভেদকম্ ॥৪॥
দিব্যানাং তেজসি ভাবে ভাবাতীতং প্রকাশিতম্
তেজঃ স্যাৎ পরমাণুশ্চ সর্ব্বব্যাপিনিরঞ্জনম্ ॥৫॥
কৌলানাঞ্চ তথৈবোক্তমভাবে ভাববর্জ্জিতং।
প্রসঙ্গাৎ কথয়াম্যস্য দিব্যস্যাপি চ লক্ষণম্ ॥৬॥[২]

১। ভাব ও আচার, অটল বিহারী ঘোষ, কল্যাণ শক্তি অঙ্ক।
২। সর্ব্বোল্লাস তন্ত্রম্, রাসমোহন চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত ষষ্ঠোল্লাস ৪-৬ শ্লোক।

ইহা হইতে কৌলের পক্ষে কোন নিয়ম নাই তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। দিব্যাচারীর জ্ঞান তেজে পর্য্যবসিত হয়, তাহাদ্বারা সমগ্র জগৎ স্বীয় উপাস্য দেবতার বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠে এবং সাধক এমন একটী স্তরে পৌছান যেখানে জ্ঞান ও জ্ঞেয়ে ভেদ থাকে না।

'রহস্য-পূজাপদ্ধতি'তে কৌল এবং চক্রানুষ্ঠান সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা আছে—

কৌলতন্ত্রে – বিনামাংসৈর্বিনামৎস্যৈর্নার্চ্চয়েৎ পরদেবতাং
নিরামিষার্চ্চনাদ্দেব্যা বীরোঽপি পশুতাং ব্রজেৎ।

অতএব পঞ্চতত্ত্ব বিনা পূজা নিষ্ফল। রাত্রিতে রহস্য পূজা বিধি অর্থাৎ গোপনে আচার বিধি, দিবসে পূজা করিলে গোপনে করিতে হয়। মহারাত্রিতে পূজা ফলদায়ক, পঞ্চতত্ত্বের অভাবে অনুকল্প দ্বারা কার্য্য বিধেয়, কিন্তু কর্ম্মলোপ করা নিষেধ। স্বশক্তি উপযুক্ত হইলে তাহাকে লইয়াই সাধন বিধেয়, নহিলে অন্য শক্তি গ্রহণে জাতি বিচার করা নিষিদ্ধ। শক্তি হইবে সুরূপা, তরুণী, অলোলুপা, সুশীলা, শঙ্কাহীনা। চক্রানুষ্ঠানে প্রথমে বিজয়া নিবেদন বিধি, তুলসী বিজয়ার নামান্তর অর্থাৎ সঙ্কেত। চক্রানুষ্ঠানে আটজন ও তাহাদের আটটী শক্তি, মোট ষোল জনের আবশ্যক। পাষণ্ড, মূর্খ ও পামরের সহিত অনুষ্ঠান অবিধেয়, যে সকল কৌল মদ্যপানাসক্ত, স্ত্রীলোলুপ, নিজকর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট, কুলশাস্ত্রের দোহাই দিয়া লোককে প্রতারিত করে ও পানভোজনলুব্ধ তাহাদিগকে পাষণ্ড বলে। কুলজ্ঞানহীন ব্যক্তি মূর্খ, যে ব্যক্তি অন্যের বাক্য অবহেলা করে ও আপনার বুদ্ধিকে প্রশস্ত বলে সে পামর।[১]

'তন্ত্রাভিলাসীর সাধুসঙ্গ' গ্রন্থে পঞ্চ তত্ত্বের ব্যাখ্যা এইরূপ আছে— ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে যে সুধা অনবরত ক্ষরিত হইতেছে তাহাই মদ্য, মাংস অর্থে বাক্‌সংযম অর্থাৎ 'মা' শব্দ দ্বারা রসনা ও তাহার অংশ বাক্য বুঝায়, সেই বাক্য ভক্ষণই মাংস ভক্ষণ এবং

"গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে মৎস্যৌ দ্বৌ চরতঃ সদা।
তৌ মৎস্যৌ ভক্ষয়েদ্ যস্তু স ভবেন্মৎস্যসাধকঃ॥"

অর্থাৎ গঙ্গাযমুনা বা ইড়াপিঙ্গলার মধ্যে রজঃ ও তমঃ দুই মৎস্য চলিতেছে, তাহাদের যে ভক্ষণ করিতে পারে সেই যথার্থ মৎস্য-সাধকরূপে গণ্য।

১। রহস্য পূজাপদ্ধতি, জগমোহন তর্কালঙ্কার, জ্ঞানেন্দ্র নাথ তন্ত্ররত্ন কর্ত্তৃক সঙ্কলিত পৃ ৫, ১০।

তৎপরে 'মুদ্রা'—সহস্রার মহাপদ্মে কর্ণিকার মধ্যে শ্বেতবর্ণ পারদের ন্যায় চন্দ্রসূর্য্য হইতেও জ্যোতিষ্মান অতীব কোমল স্নিগ্ধ কুণ্ডলিনী রূপ আত্মা বিরাজ করেন, তাহাকে যে জানিয়াছে সেই ব্যক্তিই মহান্ প্রাজ্ঞ মুদ্রার সাধকরূপে বিদিত। তৎপরে 'মৈথুন'—ইহার নাদ বিন্দুযোগ বা শিব-শক্তির মিলন সাধন, আত্মা ও কুলকুণ্ডলিনী শক্তির এই মিলনে যে সাধক রত সেই মৈথুনের সাধক।[১] অনেকে তন্ত্রকে কামশাস্ত্র বলিয়া ভ্রম করিবার জন্য শক্তিসাহিত্য ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়াছে। শাক্তধর্ম্মের ধ্যেয় জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার, ব্যষ্টির সহিত সমষ্টির অভেদ সিদ্ধি। তান্ত্রিক উপাসনার লক্ষ্য উপাসক-উপাস্যের সহিত তাদাত্ম্য স্থাপন, অতএব ইহা অন্তর্যাগ। ষড়্দর্শনের ন্যায় তন্ত্রেরও পঞ্চদর্শন আছে, (দেবীভাগবত, নীলকণ্ঠ টীকা, পৃ ৩, টীকা ৪।১৫।১২)। বেদান্তের সিদ্ধান্তের সহিত তন্ত্রের দার্শনিক সিদ্ধান্তের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। পুরাণে ও উপপুরাণেও শক্তি বা পরমেশ্বরী পরব্রহ্মের সহিত অভেদ কল্পিত হন। (উক্ত টীকার ভূমিকা দ্রষ্টব্য; হরিচরণ বসুর সংস্করণ পৃ ২৯)। 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' শাক্তকেও এই ভাবনা বদ্ধমূল করিতে হয়। ইহাতে আত্মসংযম আছে, ইহা সত্য যে পঞ্চ-মকার বা ষড়্বিধ অভিচার অনুষ্ঠান বিধি থাকিলেও উহা মাত্র কৌলমার্গেই প্রচলিত। ব্রাহ্মণাদির নিমিত্ত প্রতীক পূজাই বিধি, উপরে তাহার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। 'শ্যামপ্রদীপ' গ্রন্থে ইহার বিবৃতি আছে। পরানন্দ সম্প্রদায়ে পঞ্চবলিও নিষেধ আছে, (G. O. S. পরানন্দ সূত্র, পৃ ২৩)। কুলার্ণব তন্ত্রে আছে, কৌলমার্গে গমন শাণিত খড়্গের উপর গমনাগমনের ন্যায়, সর্প বা ব্যাঘ্র লইয়া ক্রীড়া করা হইতেও ইহা ভীষণ (২।১২২)। যাহাদের মনে বিকার নাই, পঞ্চ-মকারের বিধান মাত্র তাহাদের জন্য। ইহারাই বীর, তাই কৌলমার্গ যোগীর পক্ষেও দুর্গম। ইহাতে সাধকের ভোগের দ্বারা সিদ্ধি লাভের কথা আছে, ত্যাগের দ্বারা নয়, কিন্তু ইহাতে আছে 'পূর্ণ আত্মসংযম', অতএব ইহা কামশাস্ত্র নহে।[২]

তন্ত্রে চক্রের সাধনে মাতঙ্গিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়, ইহারা সাধারণতঃ নিম্নশ্রেণীর, তান্ত্রিক সাধনায় ইহাদের আবশ্যকতা আছে। খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দী হইতে তন্ত্রের সাধন আরম্ভ হইয়া, ৭ম ও ৮ম শতাব্দীতে

১। তন্ত্রাভিলাসীর সাধুসঙ্গ, পৃ ১২, ১৩ প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়।
২। শাক্তধর্ম্ম, চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, পৃ ৫১২ কল্যাণ, শক্তি অঙ্ক।

ক্রমবর্দ্ধমান হইয়া ৯ম ও ১০ শতাব্দীতে সাধনের উচ্চতম স্তরে উপনীত হয় এইরূপ অনুমিত হইয়াছে। রাজশেখরের গ্রন্থাদি হইতে জানা যায় কৌলজ্ঞান সাধারণ্যে সুপরিচিত ছিল। কর্পূরমঞ্জরী মধ্যে ভৈরব বা কৌলের নিন্দা নাই, তৎকালে কৌলাঙ্গনার বিশেষ আদর তান্ত্রিক সাধনার মধ্যে দেখা যাইত। তৃতীয়, চতুর্থ শতাব্দীর গুহ্য সমাজ নামক বৌদ্ধতান্ত্রিক গ্রন্থেও শিষ্যের প্রজ্ঞাভিষেক অর্থাৎ প্রজ্ঞা বা শক্তি বরণের কথা আছে। সাধক বৈশ্য, চণ্ডাল বা শূদ্রকন্যা প্রজ্ঞারূপে গ্রহণ করিতেন, গুরু ইহার সহায় থাকিতেন।[১] তন্ত্রের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আরও প্রমাণ পাওয়া যায়।

খৃঃ ৯৪৯ এ সোমদেব রচিত 'যশস্তিলকচম্পু'তে ভাস বর্ণিত বীরাচারের প্রতি বিদ্রূপের উল্লেখ আছে, যথা—

পেয়া সুরা প্রিয়তমামুখমীক্ষণীয়ং
গ্রাহ্যঃ স্বভাবললিতৌ বিকৃতশ্চ বেশঃ।
যেনেদমীদৃশমদৃশ্যত মোক্ষমার্গং
দীর্ঘায়ুরস্তু ভগবান্ স পিনাকপাণিঃ। (আশ্বাস ৫)।

খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে রচিত মহেন্দ্র বিক্রমের 'মত্তবিলাস প্রহসনেও' উক্ত শ্লোকটী পাওয়া যায়; বামমার্গের জনৈক কাপালিক বর্ণন প্রসঙ্গে উহা উক্ত হইয়াছে, সম্ভবতঃ পূর্ব্বতন কবি ভাসের নিকট তিনি ঋণী।

উক্ত সোমদেবের 'নীতিবাক্যামৃত'র টীকায় নারদ বর্ণিত কৌলাচারের নিন্দা আছে।

এই দুইটী সূত্র হইতেও হিন্দুতন্ত্র বা কৌলাচার যে খৃষ্টীয় ২য়, ৩য় শতাব্দীতে প্রচলিত ছিল এবং উহা বৌদ্ধতন্ত্রের নিকট ঋণী নহে, তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে।[২]

পরবর্ত্তী যুগে বৌদ্ধ ও জৈন সাধনার মধ্যেও তন্ত্রের বীরাচারের প্রবেশ ঘটে। বৌদ্ধতন্ত্রের আদিগ্রন্থ 'গুহ্যসমাজতন্ত্রে' উক্ত হইয়াছে যে ইন্দ্রজাল বৌদ্ধনীতির বিরুদ্ধ এবং উহা অংশত গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। 'শক্তি' নির্ব্বাচনেও জাতিবিচার পুনঃপ্রবর্ত্তিত হইয়াছে।[৩] অসঙ্গের সময় হইতে (খৃঃ তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দী) বৌদ্ধধর্ম্মে তন্ত্রের প্রবেশলাভ হয়।

, সুফী ও

১। Magic & Miracle in Jaina Literature, Kalipada Mitra, p. 34, ?
২। সর্ব্বোল্লাসতন্ত্র, ভূমিকা, পৃ ১৯ দীনেশ ভট্টাচার্য্য।
৩। G. O. S. গুহ্য সমাজতন্ত্র, পৃ ৯৪।৯৫

তান্ত্রিক গ্রন্থে "একাকী ভোগরহিতো নারীং গচ্ছেৎ" বা "নির্ব্বিকারেণ কামিনীমধ্যে জপঞ্চরেৎ" প্রভৃতি বাক্য আছে, ইহা ব্যতীত বীরভাবের সরলভাবেই উল্লেখ আছে। প্রশ্ন হইতে পারে ব্রহ্মজ্ঞানেই যদি সমাধিলাভ সম্ভব হয়, তবে বীরভাবের এই ভয়াবহ অনুষ্ঠানের প্রয়োজন কি? উত্তরে বলা যায়, শাক্ত সম্প্রদায় 'শক্তি'কে চরমসত্তা রূপে নির্দ্দেশ করেন নাই, তাঁহারা অদ্বৈতবাদীদের পরব্রহ্মের স্বরূপের ন্যায় এক চরমসত্তা স্বীকার করিয়াছেন, প্রভেদ এই যে সৃষ্টিকে তাঁহার খেলারূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন অর্থাৎ 'ব্রহ্মখেলা জগৎ সর্ব্বং, খেলার্থং হি পরংব্রহ্ম সাকারো হি যুগে যুগে'। ব্রহ্মজ্ঞান চরমলক্ষ্য প্রাপ্তির উপায় স্বরূপ, দেহান্তে ব্রহ্মের সহিত মিলনই লক্ষ্য, 'দেহান্তে ব্রহ্মভাক্ ভবেৎ' ইহা প্রকৃতির জ্ঞান বিনা হয় না। নিত্যাপ্রকৃতি ত্রিবিধরূপে ব্যক্ত,—মানবদেহে সূক্ষ্মরূপে, বিবিধ বর্ণ মধ্যে জ্যোতিরূপে এবং নারীতে স্থূলরূপে।[1] তান্ত্রিক সাধক এই ত্রিবিধরূপের সামঞ্জস্য সাধনে রত। 'সেকোদ্দেশ' গ্রন্থের টীকায় শিষ্যের মুদ্রা সাধন মধ্যে গুহ্য, কুম্ভ ও প্রজ্ঞাভিষেক বা কর্ম্ম, জ্ঞান ও মহামুদ্রা সাধনের কথা আছে[2]

স্বীয় পিণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডের অনুভূতি তান্ত্রিক সাধনের উৎকর্ষ। ভারতের অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অন্তঃপূজার মূলেও এই পিণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডের সাধন আছে। গুরুই শিব-শক্তির প্রতীক, তিনিই সাধনের পথপ্রদর্শক। গুরুর নির্দ্দেশে অন্তঃপূজা ও বহিঃপূজার সংশ্লেষণ কর্ত্তব্য। বীরাচারের মূলকথা এই যে অন্তঃপূজার পূর্ণত্বের নিমিত্ত বাহ্যপূজার প্রয়োজন। যে সাধক স্বীয় আন্তরজ্ঞানের দ্বারা বাহ্য সকল বস্তুকে বিশুদ্ধ বোধ করিতে পারে, মাত্র তাহারই বাহ্যপূজার অধিকার আছে। 'কেবলী' বা কেবলানন্দলুব্ধ সাধকের পক্ষে বাহ্যপূজা হইতে অব্যাহতির বিধি আছে। তাঁহারা স্ব-সাধনে মগ্ন হইয়া থাকেন। তান্ত্রিক সাধকদের মধ্যে অধিকারী ভেদ আছে, কিন্তু জাতি বা ধর্ম্মের বিচার নাই।

তান্ত্রিক সাধনে 'যন্ত্রের' ব্যবহার প্রচলিত, ইহা বৈদিক অনুষ্ঠানের ন্যায় নহে। বৈদিক অনুষ্ঠানে নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতির সূক্ষ্মতম নিয়ম পালনে খৃষ্টীয় ২য় ...ক রত থাকায় যজ্ঞেশ্বরের সন্ধান পাওয়া অর্থাৎ প্রকৃত আত্মার ...ন করা সাধকের পক্ষে দুষ্কর হইত। উপনিষদ পরমাত্মার সন্ধান

১। তন্ত্র... সর্বোল্লাসতন্ত্র, উল্লাস ৬৩।২৩, ৬২।২৭ ইত্যাদি।
২। শাস্ত্রী... O. S নারোপা বিরচিত, সেকোদ্দেশ টীকার ভূমিকা পৃ ২০।

দিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহাকে অনুভব করিবার নির্দ্দেশ দেন নাই। তান্ত্রিক এই উভয়ের সামঞ্জস্য সাধন করিলেন শক্তিকে অভিষিক্ত করিয়া, ইহা দ্বারা উপাসনার মধ্যে যে প্রাণের সঞ্চার হইল, তাহা দ্বারা ভারতের সর্ব্বজাতির ও সর্ব্বশ্রেণীর সাধকের মিলিত হইবার সুযোগ হইল। এইখানে বৈদিক অনুষ্ঠান বা ঔপনিষদিক উপাসনা হইতে তান্ত্রিক সাধনের শ্রেষ্ঠত্ব, তাই বীরাচারের অনুষ্ঠান সাধারণের নিকট ভীতিপ্রদ মনে হইলেও, তান্ত্রিক সাধকের প্রেয়।

(গ) ভারতের মধ্যযুগের রহস্যবাদীদের সাধনার সহিত নাথ সাধনার সম্বন্ধ বিচার।

ভারতের ধর্ম্মজগতের বিভিন্ন চিন্তাধারাপ্রসূত যে সকল ধর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছে তন্মধ্যে অন্তর্নিহিত একটি যোগসূত্র বিদ্যমান আছে। ইতিহাসের পৃষ্ঠা রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের সহিত ধর্ম্মজগতের যোগাযোগের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, কালের নির্ম্মম হস্তে বহু মন্দির ও মস্‌জিদ বিনষ্ট হইয়াছে, তথাপি ভারতের চিন্তাধারার বিশিষ্টতা লোপ পায় নাই, তাহার ফল্গুধারা বিভিন্ন ধর্ম্মের মধ্য দিয়াই বহু যুগ হইতে সমভাবে প্রবাহিত হইতেছে। এই কারণে মধ্যযুগের রহস্যবাদী সন্ত ও সুফীদের সহিত নাথদের সাধনার তুলনা করিলে একটি যোগসূত্র যতই ক্ষীণ হউক না কেন, লক্ষিত হয়। ইহাদের দৃষ্টিভঙ্গী ভিন্ন হইলেও, ইহাদের মধ্যে সাধনাগত ঐক্য আছে। প্রাচীন যুগের পাতঞ্জল, বৌদ্ধ, জৈনাদি সম্প্রদায়ের যোগসাধনা সুবিদিত, নাথ, সন্ত ও সুফীদের সাধনার অন্তরালেও এই 'যোগ' সুস্পষ্ট বিদ্যমান। সন্ত কবীরের উপদেশে বৈষ্ণবীয় প্রেম ও ভক্তির সহিত বেদান্তের তত্ত্বমসির অপূর্ব্ব মিশ্রণ আছে, তৎসহ নাথযোগের অনুরূপ সাধন কথাও আছে। নাথযোগে সুফী ও সন্ত সাধনার অনুরূপ প্রেম বা ভক্তির দৃষ্টিভঙ্গী না থাকিলেও নাথ, নিরঞ্জনী ও সন্তমতের ঐক্য আছে। সন্তদের মধ্যে 'সাধ' শ্রেণী নাথগুরু গোরক্ষনাথের পূজা করেন, কবীর-গোরক্ষের মিলন-কথাও ধর্ম্মজগতে প্রচলিত আছে, দাদূও গোরক্ষনাথের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন।

দিনাজপুরের বালিয়াদীঘির ফকীরদের সাধনামধ্যে সুফী ও নাথযোগীদের সাধ[illegible] মিশ্রণ দেখা যায়।[1]

---

(১) গোরক্ষনাথ, ডাঃ সিং, পৃ ৬২, ৬৩।

কথিত আছে, সন্তকবি কবীর জাতিতে মুসলমান ছিলেন, কিন্তু গোরক্ষ-সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার যোগ ছিল। আবার গোরক্ষ-শিষ্য বাবা রতন হাজিও বলিয়াছেন : "হিন্দু মুসলমান উভয়ে খোদার ভৃত্য, আমরা যোগী—কাহারও মধ্যে ভেদ দেখি না", ইহা দ্বারা সন্ত-সম্প্রদায়ের কবীরের সহিত নাথপন্থীদের যোগাযোগ নির্দ্দেশিত হয়। মধ্যযুগের সাধকেরা সকলেই একটি পথ নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টার ফলে প্রাচীন বৈদিক ধর্ম্মসহ জ্ঞান ও ভক্তির ধারা, ন্যায়ের বিধান, তান্ত্রিক সাধন যোগীদের সাধন প্রভৃতি ধর্ম্মজগতে উদিত হয়। নাথযোগীরা উত্তর ভারতে ভর্ত্তৃহরি-সম্প্রদায় নামে পরিচিত ছিল। তাহারা মুসলমান হইয়াও হিন্দুর ন্যায় গৈরিক ধারণ করিত ও গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসের করুণ গীত গাহিয়া মানব-হৃদয় জয় করিত, হিন্দুর বহু পার্ব্বণে ইহাদের উপস্থিতি অনিবার্য্য ছিল। কালক্রমে নাথ ও নিরঞ্জনী সম্প্রদায় হইতে বঙ্গদেশে আউল, বাউল প্রভৃতি বহু সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। সকল সাধনের মুখ্য উদ্দেশ্য ভগবৎপ্রাপ্তি বা জীবাত্মা-পরমাত্মায় মিলনসাধন। সুফী সাধকও হিন্দু যোগীর সহিত অদ্বৈতবাদের সূত্রে আবদ্ধ। মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্বেও সুফী সাধক মৈনুদ্দিন চিশ্‌তী, মখতুম আলি প্রভৃতি সুফীধর্ম্ম প্রচার করিয়া হিন্দু-মুসলমানে ঐক্য স্থাপন করেন।

নাথযোগীরা বলেন, জীবমধ্যে ঈশ্বরের শুদ্ধচৈতন্যশক্তি অবিদ্যা দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে, সেই আবরণ দূর হইলে জীব আবার শিব হইবেন। সুফী সাধক মনসুর হালাজ, শিবদয়াল প্রভৃতি সন্ত সাধক বলেন জীবাত্মা পরমাত্মার মিলন স্বীকার করিলেও মিলনের মধ্যেও ভেদ অনিবার্য্য, অর্থাৎ জীব জীবই এবং ঈশ্বর ঈশ্বরই, ইহাদের মধ্যে ভেদাভেদ শূন্য মিলন হইতে পারে না। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজও এই কথা বলিয়াছেন। সমুদ্রের একবিন্দু জলেও যেরূপ সেই জলের বৈশিষ্ট্য আছে, কিন্তু সমুদ্র ও একবিন্দু জলে যেরূপ পরিমাণগত ভেদ আছে, সেইরূপ জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভেদ হইলেও তাহাদের মধ্যে ভেদ আছে, জীবাত্মা পরমাত্মার 'অণু'রূপ মাত্র। তথাপি জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগ হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই স্বীকার করিয়াছেন। সুফী সাধক বোগদাদের জুনিয়াদ ও মনসুর হালাজ 'অনল হক্' বা সোঽহং উচ্চারণ করিয়া মৃত্যুকে বরণ করেন।[১] কবীর একদিকে

১। The Idea of Personality in Sufism, Nicholson, p. 9 ff. Nirguna School of Hindi Poetry Barthwal, p 15.

রামানন্দের চরণে বেদান্ত শিক্ষা করেন, আবার শেখ তাকীর নিকট স্থফী ধর্ম্মও শিক্ষা করেন, তাই মুসলমান হইলেও কবীরের সাধনায় বৈষ্ণবীয় ভক্তি ও প্রেম আছে। কবীরের রাম কোন অবতার বিশেষ নহেন, রাম বা গোপাল অর্থে তিনি সেই চরম সত্যকে নির্ণয় করিয়াছেন। সন্তেরা মূলতঃ অদ্বৈতবাদী, ইহাদের মধ্যে ভেদ থাকিলেও কেহই দ্বৈতবাদী ছিলেন না। ভারতের মধ্যযুগে সন্ত সাধনার বিকাশ, ধর্ম্মজগতে তাহাদের সাধনার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে, কারণ উহা বল্লভাদির ন্যায় কোন সম্প্রদায় বিশেষের মত নহে, উহা 'সুরত' বা স্রোতের ধারা মাত্র। যিনি সৎকে উপলব্ধি করিয়া সত্যস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন তিনিই সন্ত। কবীরাদি মূর্ত্তি উপাসক ছিলেন না তাই ইঁহাদের 'নিগু´ণী' বলা হয়. নিরঞ্জনের উপাসক 'নিরঞ্জনী', এই সম্প্রদায় নাথ-সম্প্রদায়ের প্রসার, ডাঃ পীতাম্বর বড়থ্বাল এইরূপ মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। ইঁহারা নাথ ও নিগু´ণ সম্প্রদায়ের মধ্যবর্ত্তী সম্প্রদায় বিশেষ, কারণ নিরঞ্জন ব্রহ্ম হইতে অবতারাদির উৎপত্তি স্বীকার করিলেও ইঁহারা তাঁহাদের পূজা করেন না। কবীর, কামাল, দাদূর দর্শনের সহিত ইঁহাদের দর্শনের অপূর্ব্ব মিল দেখা যায়; রামানন্দকে এই পথের প্রদর্শক বলা যাইতে পারে। সন্তদের মূলগত সিদ্ধান্ত তিনটি,—ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস, পরমাত্মা জীবাত্মার স্বরূপগত একতায় বিশ্বাস, আত্মার নিত্যতা ও সোঽহং সাধনায় প্রত্যয়। কবীরাদি সন্তেরা 'সুরত' শব্দ যোগের দ্বারা মিলন স্থাপনের উপদেশ দিয়াছেন। ধ্বনি দ্বারা আমরা ভাব ব্যক্ত করি, তাই সন্ত কবিরা অন্তর-ধ্বনির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে বলিয়াছেন। কারণ নিরঞ্জনকে যে উপলব্ধি করিয়াছে সে মূক ও বধির উভয়ই, মূকের ন্যায় সে মিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া ইঙ্গিতে সুখ বর্ণনা করে। সাজাহান-পুত্র দারা সেখ রচিত 'রিসালা-ই-হক্‌নামা' পুস্তিকায় সত্যের অনুসন্ধান ও তৎপরে ধ্যান, নামস্মরণ ও অনাহত-নাদশ্রবণের দ্বারা মিলনসাধন সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে।[১]

এই সুরত শব্দযোগ বস্তুতঃ কবীরাদির বহু পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত। নাথমার্গে ইহার বিশেষ সাধন ছিল, তাঁহারা ইহাকে 'অজপাজপ' বলিতেন। নাথপন্থের গ্রন্থাদিতে অজপাজপের বিশেষ মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। যোগমার্গের নাদানুসন্ধানই সন্তদের 'অনহদ্ নাদ'—এই নাদকে আশ্রয় করিয়াই পরম সত্যকে [illegible]লব্ধি করা যায়, ইহাই উভয় মার্গের বৈশিষ্ট্য।

১। English Translation of the above book by S. C. Vasu.

চিত্তবৃত্তিকে শব্দে বা মন্ত্রে লয় করিবার উপদেশ প্রাচীন যুগ হইতেই বর্ত্তমান রহিয়াছে, ইহারই নামান্তর 'মন্ত্রচৈতন্য'। মন্ত্র বা নামজপের মাহাত্ম্য অতুলনীয়, ইহার সাহায্যে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে সহজে লীন হইবার সূচনা বিভিন্ন উপনিষাদিতেও পাওয়া যায়।[১]

উপনিষদে প্রণবের প্রশস্তি আছে, নাথমার্গে প্রণব সাধনার বিশিষ্ট স্থান আছে, সন্তমধ্যেও 'সওনাম' বা সত্যনামের এইরূপ প্রশস্তি আছে। সন্তেরা সুরত শব্দযোগের দ্বারা নামের পরে যে ভূমিতে পদার্পণ করেন তাহা নিঃশব্দ বা 'অনামীলোক' নামে পরিচিত। কবীর এই সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"তা পর অকহ লোক হৈ ভাই
পুরুষ অনামী তহাঁ রহাই
জো পহুঁচৈ জানৈসে বাহী
কহন সুনন সে ন্যারা হৈ।"

এই অবস্থাই তত্ত্বাতীত অবস্থা, অথবা সহজিয়া সম্প্রদায়ের সহজাবস্থা। সন্তগণ ইহাকে 'বিগম দেশ' অর্থাৎ সুখদুঃখাতীত দেশরূপে আখ্যাও দিয়াছেন। এই অবস্থায় যে সুখের অনুভূতি হয় তাহার নাম নিরতি বা নৃত্য। সুফিরা ভাবাবেশে যে দৈহিক নৃত্য করেন তাহার নাম 'দৌর নৃত্য', তাঁহারা আল্লার নাম উচ্চারণ সহকারে নৃত্য করেন, কিন্তু সন্তদের 'নিরতি' কোন বাহ্যক্রিয়া নহে। সাধকের স্মৃতিলাভ হইলে কোন প্রকার দৈহিক ক্রিয়া নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়ে, এই অনুভূতি বর্ণনাতীত, তাই নাথ-সিদ্ধেরা ইহার নাম দিয়াছেন 'উন্মনী' অবস্থা অর্থাৎ মন হীন অবস্থা। এই উন্মনী অবস্থাপ্রাপ্তিই সুখদুঃখাতীত পরম প্রকাশের মধ্যে স্থিতি। সুফীদের 'সমা' বা বামপদমূলে ভর করিয়া চক্ষুর্দ্বয় বন্ধ করিয়া হস্তদ্বয় প্রসারিত করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া মিলন-অনুভূতির যে সাধন আছে অর্থাৎ চক্ষু বিনা রূপদর্শন, কর্ণ বিনা ঝঙ্কার শ্রবণ, পদ বিনা নৃত্য ইত্যাদি ভাবসাধন, তাহা ক্ষণিক। কিন্তু সহজ সমাধি বা উন্মনী দশাপ্রাপ্তি স্থায়ী। তাই মীরার গুরু রৈদাস চামার পাদুকা সীবনকালেও সম্মুখে চতুর্ভুজ হরিমূর্ত্তি দেখিয়া গাহিতেন :

প্রভুজী—তুম চন্দন, হম পানী। জাকী [illegible] অঙ্গবাস সমানী।
প্রভুজী—তুম ঘন বন, হম মোরা। জৈসে [illegible] চিতবত চন্দ চকোরা।

---

(১) নাদবিন্দু উপ. ৩০, ৩৮, ৪১, ৪৫ শ্লোক, ধ্যানবিন্দু উপ, ৬ শ্লোক তুলনীয়।

প্রভুজী—তুম দীপক, হম বাতী। জাকি জ্যোতি বরৈ দিন রাতি।
প্রভুজী—তুম মোতি, হম ধাগা। জৈসে সোনহি মিলত সুহাগা।
প্রভুজী—তুম স্বামী, হম দাসা। ঐসী ভক্তি করৈ রৈদাস॥
(কল্যাণ, সন্তঅঙ্ক—রৈদাস পৃ ৫০৭)

চিতোরের রাণী মীরাবাঈ এই প্রেমের আকর্ষণে সকল ত্যাগ করেন, তাঁহার ভজনও হিন্দী-সাহিত্য জগতে অতুলনীয়,—যেমন মর্ম্মস্পর্শী তেমনি গভীর। রাণা বিষ পাঠাইয়া, সর্প পিটারা প্রেরণ করিয়াও কোন রকমে মীরাকে বিনাশ করিতে পারেন নাই, শ্রীকৃষ্ণের নাম স্মরণ করিয়া বিষ গ্রহণ করিলে তাহা অমৃত হইল এবং—

"সাপ পিটারা রাণা ভেজা মীরা হাত দিয়ো যায়।
নায় ধায় যব দেখন লাগি, শালিগরম গৈ পায়।"

ইহাই সন্তসাধনার মূলমন্ত্র,—নামজপ বা 'সুমিরণ'; ইহার দ্বারাই অসম্ভব সম্ভব হয়, মর্ত্ত্যলোকবাসী স্বর্গের আস্বাদ পাইয়া থাকে। কবীরের ন্যায় অদ্বৈতবাদী দাদূ সন্তসাধকদের অন্যতম গুরু, রামনাম জপ তাঁহার সম্প্রদায়ের বিশেষত্ব। এই 'রাম' বেদান্তের নির্গুণ পরমব্রহ্মের অনুরূপ, তাই তাঁহার মূর্ত্তি বা মন্দির নাই, সন্তসাধনা তাই সকলের পক্ষে সুলভ, ব্যয়সাপেক্ষ বাহ্যবস্তুর প্রয়োজন ইহাতে নাই। এই নিমিত্ত সন্তমত ইতর-ভদ্র সকলের মধ্যে প্রতিপত্তি লাভ করে, বিশেষ করিয়া সমাজের নিম্নস্তরের ব্যক্তিরা ইহার আশ্রয় গ্রহণ করেন। সন্তদের মধ্যেও যোগীদের ন্যায় কোন জাতিবিচার না থাকায় কবীরকে সমাজ-সংস্কারক আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে; বস্তুত তিনি সকল ধর্ম্মের সারগ্রাহী ছিলেন এবং সকল জাতির পক্ষে সুলভ সহজ পন্থার নির্দ্দেশ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, সমাজ-সংস্কারক রূপে তিনি এ সকল করেন নাই। তবে একেশ্বরবাদ প্রচার, জাতিভেদ দূরীকরণ, দেব বা দানবের পূজা নিষেধ, কুরীতি দমন ইত্যাদির উপদেশ তিনি দিয়াছেন। সন্তবাণীতে বৈরাগ্যের ও সৎসঙ্গের ভূরি ভূরি উপদেশ আছে। সদ্‌গুরুই একমাত্র পথ-প্রদর্শক। দাদূ বলিয়াছেন, 'দাদূ এসা গুরু মিল্যা, জীব ব্রহ্ম করি লেই"। নাথযোগীরাও বারংবার সদ্‌গুরু লাভের উপদেশ দিয়াছেন: "দুর্ল্লভা সহজাবস্থা সদ্‌গুরোঃ করুণাং বিনা"। একমাত্র গুরুকৃপায় সিদ্ধিলাভ

হয় ইহাই নাথমার্গে স্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে : "সিদ্ধিগুরুবাক্যেন লভ্যতে।" সুফীসাধকও 'মুরসিদ' বা গুরুকে মান্য করিয়া চলেন।

"যা আছে পিণ্ডে তাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে" ইহা সকল যৌগিক সম্প্রদায়ের মত। পারস্য লেখক মহম্মদ-অল্-নসফী ইহার অনুরূপ কথা বলিয়াছেন।[১] এই ক্ষুদ্র দেহরূপ ভাণ্ডে বিশ্ব প্রতিভাসিত হইয়া আছে, ইহাই ইহার তাৎপর্য্য (সি, সি, স, ৩।২)। শরীর মধ্যে আধ্যাত্মিক কয়েকটি কেন্দ্র আছে, সন্তদের সাঙ্কেতিক ভাষায় তাহাকে 'কবল' (কমল) বলে, তান্ত্রিক সাধনে ইহাকে 'চক্র' বলে। এই বিভিন্ন কেন্দ্রের সহিত সাধন বলে ব্রহ্মাণ্ডের লোকসকলের সম্বন্ধস্থাপন সম্ভব, ইহা রাধাস্বামী-সম্প্রদায়, সন্ত-সম্প্রদায়, নাথ-সম্প্রদায় প্রভৃতি বিবৃত করিয়াছেন। দেহমধ্যে সুপ্তা শক্তিকে জাগরিত করিয়া তাহার সাহায্যে ব্রহ্মাণ্ডের সহিত সম্বন্ধস্থাপন করিতে হয়। 'সুমিরণ' বা 'নাম-স্মরণ' এই সুপ্তা শক্তিকে জাগরিত করিবার প্রক্রিয়াবিশেষ, সন্তদের মধ্যে ইহা গোপনীয় সাধন। নাথযোগীরা হঠযোগের সহায়ে সুপ্তা শক্তিকে জাগরিত করেন ইহাই সন্ত ও নাথমধ্যে ভেদ। উভয়ের উদ্দেশ্য পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের যোগস্থাপনা, কিন্তু প্রণালী ভিন্ন। তথাপি নাথ-সাধনমার্গের জীবন্মুক্তি, ত্রিকুটী, সহস্রদলকমল, নাড়ী, চক্র, অজপাসাধন প্রভৃতির উল্লেখ সন্তদের 'সাখী'তেও পাওয়া যায়। কবীর জীবন্মুক্তের বর্ণনা দিয়াছেন, চরণ দাসও বলিয়াছেন—

জব হো এক দুসরা নাসৈ
বন্ধ মুক্তি কী রহৈ ন সসৈ॥
মৃতক অবস্থা জীবত আবৈ।
করম রহিত অস্থির গতি পাবৈ॥

যিনি বর্ত্তমান জীবনে জীবিত থাকিয়াই কর্ম্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তিনি জীবন্মুক্ত যোগী। মুক্তজীব আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিয়া ব্রহ্মের ন্যায় সচ্চিদানন্দস্বরূপ হয়, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ব্রহ্মে ও জীবে ভেদ দূর হয় না, কারণ মুক্তজীবও বদ্ধজীবের ন্যায় অণুমাত্র, এবং মুক্ত হইয়াও জীব সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে পারেন না, অতএব জীবন্মুক্ত যোগীও ব্রহ্মাশ্রিত।

১। Oriental Mysticism, Palmer. See Intro. by Arbery.

বাবা রামলালজী তাঁহার রচিত 'শব্দে' ত্রিকুটী, অজপাজপ, ষট্‌চক্র, বঙ্কনাল প্রভৃতির কথা বলিয়াছেন। সন্তদের মধ্যে 'শূন্যে'র সাধনাও আছে; বৌদ্ধ, নিরঞ্জনী, নাথপন্থী, সহজিয়া, বাউল ও সন্তেরা অনেকে নিজেদের শূন্যের উপাসক বলিয়াছেন, শূন্য সাধনার দ্বারা সহজাবস্থা লাভ করিবার নিমিত্ত এই সকল সহজবাদীরা শূন্যকে স্বীকার করিয়াছেন। আচার্য্য ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের মতে ক্ষুদ্রতম তৃণের বা পুষ্পের বিকাশের জন্যও উন্মুক্ত আকাশের প্রয়োজন হয়; যেখানে প্রাণের বিকাশ নাই সেখানে আকাশ বা শূন্যেরও প্রয়োজনীয়তা নাই। ধর্ম্মরূপ জীবন্ত বস্তুর বিকাশের জন্য শূন্যতার আবশ্যকতা আছে, এই শূন্যতা নাস্তি-ধর্ম্মাত্মক নহে, ইহা ভাবাত্মক জীবনধারার স্বরূপ। সহজ মতে তাই গুরুকে শূন্য পদবী দেওয়া হয়। "সতগুরু শূন্য সমান হৈ" রজ্জবজী ইহাঁর দ্বারা গুরু-প্রণামের মধ্য দিয়াই সীমাহীন নিরঞ্জনে মগ্ন হইবার উপায় বলিয়াছেন। জপতপ মিথ্যা, সহজ নিরঞ্জনের সহিত যুক্ত হওয়াই সহজাবস্থা, গুরুই তাঁহাকে বুঝিবার সুগম উপায় স্বরূপ।[১] রহস্যবাদীদের মধ্যে দৈববাণী দ্বারা দীক্ষালাভও প্রচলিত।[২]

কবীরের রচিত বলিয়া 'গোরক্ষনাথকী গোষ্ঠী' নামক যে পুস্তকের প্রসিদ্ধি আছে, তাহাতে গোরক্ষনাথের সহিত কবীরের ধর্ম্মবিচারের বৃত্তান্ত আছে। কবীর বা দাদূ কেহই পণ্ডিত ছিলেন না, তাঁহারা ভগবানের মাধুর্য্যকেই চিনিয়াছিলেন। জালালুদ্দিন রুমী বলিয়াছেন, "শাস্ত্রপাঠ দ্বারা তিনি লভ্য নহেন, কারণ বুদ্ধি প্রীতির বিরুদ্ধ।" নাথমতে ও বৌদ্ধ সহজিয়া মতেও তিনি বাক্যমনের অতীত, অতএব পুথিপাঠ ও জপতপ মিথ্যা (চর্য্যা ৪০, গো, সি, স পৃ ২৪ তুলনীয়)। সুফীসাধক চিশ্‌তীর সমাধি হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের সম্মানিত, চিশ্‌তী যে গোপনীয় সাধন শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, তাহাতে ত্রিকুটীধ্যান ও হঠযোগের আসন প্রভৃতির সাধন আছে। অনহদ্‌নাদের অনুরূপ সাধনের নাম 'শগলে সৌতে'। ভারতীয় সুফীদের মধ্যে কুণ্ডলিনী, সহস্রার প্রভৃতির চর্চ্চা ছিল। তাঁহারা উল্টা বাণীরও ব্যবহার করিয়াছেন। জীবনযাত্রা হওয়া চাই নদীর মত সহজ, নদী নিরন্তর তীরবর্ত্তী বনস্পতি ও মানবদের তৃপ্ত করিয়া যেরূপ সমুদ্রের দিকেই চলিয়াছে, তেমনি সহজ-সাধক

১। সন্তোকী সহজ শূন্য সাধনা—কল্যাণ সাধনাঙ্ক (১ম ভাগ), পৃ ৩৮৪, আচার্য্য ক্ষিতিমোহন সেন।
২। Initiation, Annie Besant.

জীবনপথে অগ্রসর হইবেন, এই ভাবই হইল সাধনার সহজ ভাব; এই ভাবের সহিত নাথপন্থের সহজাবস্থা লাভের ঐক্য আছে। কথিত আছে সন্তগুরু দাদূ এক সময়ে নাথপন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার নাম হয় 'কুম্ভারীপাব্'; ইহা নাথযোগীদের মধ্যে প্রসিদ্ধ নাম।[১] সহজ দেহমধ্যেই অবস্থিত, কারণ দেহের বাহিরে কিছু নাই, এই মত বাউল, সহজিয়া ও সুফীদের মধ্যেও প্রচলিত। সুফীরাও দেহকে দেব-মন্দির বলিয়াছেন।

সন্তমধ্যে পরমজ্যোতির প্রকাশকে অনন্ত বা পরব্রহ্মের তেজ বলা হয়, উহা অসংখ্যচন্দ্রের ন্যায় জ্যোতিষ্মান্ হইয়াও স্নিগ্ধ, সাধকের মন সে স্থানে উপনীত হইলে 'বিন-মন-সা' হয়, অর্থাৎ অমনস্ক বা মনঃশূন্য অবস্থা হয়। ইহাই রামের মধ্যে আত্মলীন হওয়া। এই সাধনের সহিত নাথ-সাধনের বিশেষরূপ সাদৃশ্য আছে। নবধা ভক্তিমার্গের আলোচনা করিয়া সন্তকবি অন্তিম সমস্যায় বলিয়াছেন—

মেরা মুঝমে কুছ নহী, জো কুছ হৈ সো তেরা।
তেরা তুঝকো সৌপতে, ক্যা লাগে মেরা॥—কবীর

"তেরা তুঝকো সৌপতে ক্যা লাগে মেরা।" ইহাই সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন। ইহার পর মৌন হওয়া ব্যতীত উপায় নাই।[২]

(ঘ) নাথপন্থের সহিত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সম্বন্ধ বিচার

নাথ ও বৌদ্ধসাধনা—নাথসিদ্ধদিগকে কেহ বৌদ্ধ, আবার কেহ ব্রাহ্মণ্য যুগের শৈব বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ নাথমার্গে হিন্দুর তন্ত্র ও বৌদ্ধ সহজিয়াদের রহস্যবাদের অপূর্ব্ব মিশ্রণ আছে। নাথ-হঠযোগ সাধনার সহিত বৌদ্ধসহজিয়া সাধনার সাধর্ম্ম্য আছে। উভয় মতেই চিত্তের সমতা লাভ উদ্দেশ্য, কিন্তু প্রণালীতে কিঞ্চিৎ ভেদ আছে। বৌদ্ধধর্ম্মের পতনের যুগে, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরুত্থানের কালে নাথপন্থের বহুল প্রচার দেখা যায়। হিন্দুর তন্ত্র ও শৈবাগম নাথদর্শনের উপর

১। দাদূ, ক্ষিতিমোহন সেন, পৃ ৩০, ৩৭ ইত্যাদি, উপক্রমণিকা।

২। নিবন্ধের এই অধ্যায়ের কিয়দংশ 'মধ্যযুগের সন্ত ও নাথসাধনা' নামে ১৩৫২ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত করি।

বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে, বৌদ্ধসহজিয়াদের মতের সহিত নাথমতের কোন কোন বিষয়ে ঐক্য থাকিলেও নাথপন্থা মূলতঃ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সহিত যুক্তমার্গ বিশেষ।

হিন্দু ও বৌদ্ধতন্ত্রের শিব ও শক্তি, প্রজ্ঞা ও উপায় সম্বন্ধে একই প্রকার ধারণা দেখা যায়। বৌদ্ধসহজিয়া মতে 'মহামুদ্রা' সাক্ষাৎকার হইলেই সিদ্ধি লাভ হয়, এই মহামুদ্রা শূন্যতার ও করুণার অভেদত্ববোধ। হিন্দুতন্ত্রের যাহা শিব ও শক্তি, বজ্রযান ও সহজযানের তাহাই শূন্যতা ও করুণা। ইহাদের মিলনে 'মহাসুখ' অনুভূত হয়, ইহাই 'এবম্'কার রূপে বর্ণিত হয়। ইহাই চন্দ্রসূর্য্যের যোগ, বিন্দু উভয়ের মধ্যস্থল। হিন্দুতন্ত্রে এই মিলন 'ষট্‌কোণ' বা ঊর্দ্ধমুখ ও অধোমুখ ত্রিকোণ দ্বারা বর্ণিত হয়, উভয় ত্রিকোণের মধ্যবিন্দুর সংযোগই মিলন, এই মিলনই 'সামরস্য'।

সহজমতে বিন্দু অনাহত ও তজ্জাত অক্ষরমালার বাচক। ইহার বহির্দ্দেশে যে কালচক্র আবর্ত্তিত হইতেছে, জীব তাহা আশ্রয় করিয়া সংসারে ভ্রমণ করে। কালচক্র সমাপ্তিতে বিন্দুস্থান অধিকার করিয়া জীবের মহামুদ্রা সাক্ষাৎকার হয় ও নির্ব্বাণ লাভ হয়। নাথমতেও বিন্দু হইতে নাদ, নাদ হইতে কলার উৎপত্তি (নিবন্ধের নাথবিন্দু কলা অধ্যায় দ্রষ্টব্য), দ্বিবিন্দু ক্রমশঃ এক মহাবিন্দুতে পরিণত হইয়া যে অদ্বৈতভাবের উৎপত্তি হয় তাহাই নিত্য অবস্থা,—

উভয়োঃ সঙ্গমাদেব প্রাপ্যতে পরমং পদম্।

(গোরক্ষ-শতক, ৭৪ শ্লোক)।

চিত্ত এই অবস্থায় 'অমনস্ক' হয়, ইহা নির্ব্বাত দীপের সহিত তুলনীয়, এই অবস্থাকে বলা হইয়াছে—

"লবণং তোয়সম্পর্কাৎ যথা তোয়সমং ভবেৎ।
মনোঽপি ব্রহ্মসম্পর্কাৎ তথা ব্রহ্মময়ং ভবেৎ॥"—অমনস্ক (১।২৩-২৬)

নাদ ও বিন্দুর মিলনই বৌদ্ধদের প্রজ্ঞা-উপায়ের মিলন। বৌদ্ধ সাধনায় চন্দ্রসূর্য্যের উল্লেখ বারম্বার পাওয়া যায়। বঙ্গীয় গাথাতেও হাড়িসিদ্ধা চন্দ্রসূর্য্যের কুণ্ডল ধারণ করিতেন এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়, কিন্তু ইহার দ্বারা নাথেরা যে বৌদ্ধ ছিলেন তাহা প্রমাণিত হয় না। চন্দ্র-সূর্য্যের মিলন অর্থে 'আ ত্মানুভূতি'। তন্ত্রমতে সৃষ্টির মূল উপাদান চন্দ্র,

চন্দ্র যেখানে বিন্দুরূপে স্থিত সেখানে কম্পন বা সৃষ্টি নাই, ইহাই চন্দ্রের নিত্য কলা। ইহা হইতে সুধাক্ষরণ হইলে সৃষ্টির আবির্ভাব হয়। এই বিন্দু ও নাদই উপায় ও প্রজ্ঞা বা গ্রাহক ও গ্রাহ্য; ইহাদের মিলনে 'নির্ব্বাণানন্দ'-প্রাপ্তি হয়। সহজিয়া মতে উষ্ণীষকমলে এবং তন্ত্রমতে সহস্রারে এই আনন্দের অনুভূতি হয়।

সহজিয়া বৌদ্ধের শূন্য সমাধি বা সহজ অবস্থা লাভ নাথমার্গের সমরস সাধনার সহিত তুলনীয়।

"কশ্চিৎ সমরসং রসসংস্থিতম্।" ইত্যাদি

(অকুলবীরতন্ত্র-B.-১১৬, ১১৭ ইঃ)

সহজিয়া মতে গুরুর উপদেশে শুদ্ধ জ্ঞানের উদয় হয়, ইহাই 'জ্ঞানমুদ্রা'। সেই গুরুর স্বরূপ 'যুগনদ্ধরূপ' বা প্রজ্ঞা-উপায়ের সমরস বিগ্রহ। নাথমতেও গুরু-উপদেশে শিব-শক্তির পার্থক্য পরিহার করিয়া সাধক যে তত্ত্বাতীত অবস্থায় পৌঁছান তাহাই পরম পদ (নিবন্ধের সিদ্ধান্ত অংশের প্রথম পরিচ্ছেদে 'পরমপদ' দ্রষ্টব্য)।

নাথমতে বৌদ্ধসহজিয়া ও জৈনমতে শূন্য-সাধনার কথা আছে। বৌদ্ধমতে চতুর্থ বা তুরীয় 'শূন্য'ই বজ্রগুরুর অধিষ্ঠান। যোগাচার সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা মৈত্রেয় 'সর্ব্বশূন্যতা'র কথা বলিয়াছেন।[১] হঠযোগ-প্রদীপিকাতে 'শূন্য' কথা আছে, ইহা যোগের বিভিন্ন স্তরের সহিত যুক্ত।[২] জৈন ধর্ম্মে পাহুড়া দোহাকার 'শূন্য'র প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই।[৩]

সহজিয়া মতে মধ্যপথ বা ডোম্বীর (বা সুষুম্নার) শোধন করিতে হইলে ললনা ও রসনার (বা ইড়াপিঙ্গলার) সংযোগ কর্ত্তব্য, তন্ত্রেও ইড়া-পিঙ্গলার সংযোগ দ্বারা সুষুম্না পথ উন্মুক্ত হইবার কথা আছে। চর্য্যাপদ ও হঠযোগ-প্রদীপিকাতে 'বারুণী'র কথা আছে, ইহার অর্থ চঞ্চল বিন্দু। 'সহজ' শব্দ বজ্রযানের, নাথপন্থে পরমপদই সহজ। উভয় মতেই যোগের প্রাধান্য স্বীকার করা হইয়াছে।

১। Doctrine of Maitreya Nath, Tucci, p. 21.

২। হ-যো-প্র ৪।৭০ ইঃ

৩। Pahuda Doha, H. Jain, No. 212. সুণ্ণ ণ হোই…ইত্যাদি।

বজ্রদেহ, যোগদেহ, রসময়ী তনু ও সিদ্ধদেহ মূলতঃ একই, যোগ-সূত্রেও 'বজ্রসংহননরূপ কায়সম্পৎ'এর উল্লেখ আছে। সিদ্ধদেহ ব্যতীত নাথদের 'মহাজ্ঞান' ধারণ অসম্ভব (সাধনা-অংশে কায়সিদ্ধি অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

নাথমতে যে দ্বাদশ মুদ্রার উল্লেখ পাওয়া যায় তাহাতে বজ্রোলী, সহজোলী প্রভৃতি নাম বজ্রযান, সহজযানকে স্মরণ করাইয়া দেয়; ইহাদের মধ্যে যোগাযোগ থাকা বিচিত্র নহে, তথাপি এই কারণে নাথদের বৌদ্ধ বলা চলে না।

বঙ্গদেশে কর্ত্তাভজার দল ও ধর্ম্ম ঠাকুরের উপাসকদিগের প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলা হয়। কর্ত্তাভজা অর্থে গুরুকে যে ভজনা করে, নেপালে তাহারা 'গুভাজু' নামে পরিচিত। কর্ত্তাভজা লালশশীর পদে গুরুর উপদেশ বিনা সহজ পথ অবলম্বনে বিপদের সম্মুখীন হইবার কথা আছে।[১]

উপরোক্ত নানা কারণে বঙ্গদেশে প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, বৌদ্ধধর্ম্মের পতনের যুগে শৈব ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধেরা আত্মরক্ষা করেন এবং নাথগণও এইরূপ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। বস্তুতঃ নাথেরা বৌদ্ধ ছিলেন না, তবে তাঁহাদের আচার ও অনুষ্ঠান পদ্ধতি মিশ্রিত হওয়ায় অর্থাৎ না হিন্দু, না বৌদ্ধ হওয়ায় নাথদের বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে শৈবধর্ম্ম গ্রহণ করার ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে। মৎস্যেন্দ্র 'শৈব' ছিলেন, তিনি নেপালে শৈবধর্ম্মই প্রচার করিতে গিয়াছিলেন। কেবল গোরক্ষ পূর্ব্বে বৌদ্ধ ছিলেন এইরূপ একটি কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, কিন্তু গোরক্ষের জাতি বা জন্মস্থান সম্বন্ধে অদ্যাপি কোন স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। ডাঃ মোহন সিং তাঁহার গোরক্ষনাথ গ্রন্থে গোরক্ষ সম্বন্ধে প্রবাদের প্রতিবাদ করিয়াছেন।

বৌদ্ধাচার্য্যদের ৮৪ সিদ্ধতালিকায় শৈব নাথসিদ্ধদের নাম থাকায় নাথদের বৌদ্ধ বলিয়া ভ্রম হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু গোরক্ষ সম্প্রদায়ের মন্ত্র 'শিব-গোরক্ষ', ইহাদের তীর্থ শৈবতীর্থ এবং পরিচ্ছদ শৈবযোগীর অনুরূপ। হাড়িসিদ্ধার সিদ্ধি ভক্ষণের স্পৃহাও শৈব পূজারীকে স্মরণ করাইয়া দেয়। নাথ যোগীরা নিজেদের 'শিবগোত্র' বলেন (নাথদের

১। বঙ্গসাহিত্য পরিচয়, দীনেশ সেন, পৃ ২৬, ১৮৩৪।

উদ্ভব ইতিহাসে ইহার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে)। আদিনাথ পার্ব্বতীকে বলিতেছেন, "অহং সো ধীবরো দেবী" অর্থাৎ আমি ধীবররূপী মৎস্যেন্দ্র, অতএব নাথসিদ্ধদের বৌদ্ধ হওয়া সম্ভব নহে। গোরক্ষনাথ পশু হত্যাকারী ছিলেন এইরূপ বিবরণও পাওয়া যায়, ইহা পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। তথাপি বৌদ্ধ ৮৪ সিদ্ধার তালিকায় মৎস্যেন্দ্র, গোরক্ষ, চৌরঙ্গী প্রভৃতি কিরূপে স্থান পাইলেন এবং বৌদ্ধ তান্ত্রিক সহজিয়াদের সহিত নাথদের কিরূপে সম্বন্ধ ঘটিল তাহা বিচার্য্য।

বুদ্ধের নির্ব্বাণলাভের ৪০০।৫০০ বৎসর পর হইতে জনসাধারণের মানসিক ভাব পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা যায়। ক্রমশঃ বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে তন্ত্র ও মন্ত্র স্থান লাভ করিল, ফলে মন্ত্রযান প্রভৃতির উৎপত্তি হইল। বর্ত্তমান গুণ্টুর জিলায় (দক্ষিণ ভারতে) অবস্থিত শ্রীপর্ব্বত ও ধান্যকটক যাদুবিদ্যার জন্য প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে; সৌদামিনী নামক বৌদ্ধভিক্ষুণী শ্রীপর্ব্বতে শিক্ষার্থে যান, ভবভূতির 'মালতী-মাধবে' তাহার উল্লেখ আছে। বাণ, নাগার্জ্জুন প্রভৃতিও শ্রীপর্ব্বতের সহিত অপরিচিত ছিলেন না। এইরূপে দাক্ষিণাত্যে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি হয় ও ক্রমশঃ ৮৪ সিদ্ধার দ্বারা উহা উত্তর ভারতে প্রচারিত হয়। তন্মধ্যে নাথসিদ্ধেরাও অন্যতম। রাহুল সাংকৃত্যায়ন বলিয়াছেন, সরহপা (৭৬৯-৮০৯ খৃঃ) আদি-সিদ্ধ, তিনি নালন্দার অধিবাসী ছিলেন, মীনপা (৮০৯-৮৪৯ খৃঃ) কামরূপের ধীবর, গোরক্ষের জাতি ও দেশের বর্ণনা পাওয়া যায় না, তিনি মীনপার শিষ্য ছিলেন, এই মীনপা মৎস্যেন্দ্রের পিতা নামে খ্যাত। তৎসংগৃহীত 'বংশবৃক্ষ' পরপৃষ্ঠায় দেওয়া হইল।

এই বংশবৃক্ষ প্রধানতঃ পঞ্চ প্রধান গুরুর গ্রন্থাবলী হইতে রাহুল সাংকৃত্যায়ন কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে, এই গ্রন্থ চীনের সীমান্তের মঠে মুদ্রিত। আমি বংশবৃক্ষের প্রয়োজনীয় অংশটুকু মাত্র উদ্ধৃত করিলাম। উক্ত লেখক বিরূপা, গোরক্ষ, ভুসুকু ও জালন্ধরের কাল দেবপালের সমসাময়িক (৮০৯-৮৪৯ খৃঃ) ধার্য্য করিয়াছেন, আদি সিদ্ধার কাল ৭৬৮-৮০৬ খৃঃ এবং শেষ সিদ্ধ কালপার কাল ১১৭৫ খৃঃ ধার্য্য করিয়াছেন। (বংশবৃক্ষে দুইবার মৎস্যেন্দ্র ও জালন্ধরপার নাম কেন?)

('গঙ্গা' পুরাতত্ত্বাঙ্ক দ্রষ্টব্য। জানুয়ারী ১৯৩৩ সাল)

চৌরাশী সিদ্ধার বংশবৃক্ষ
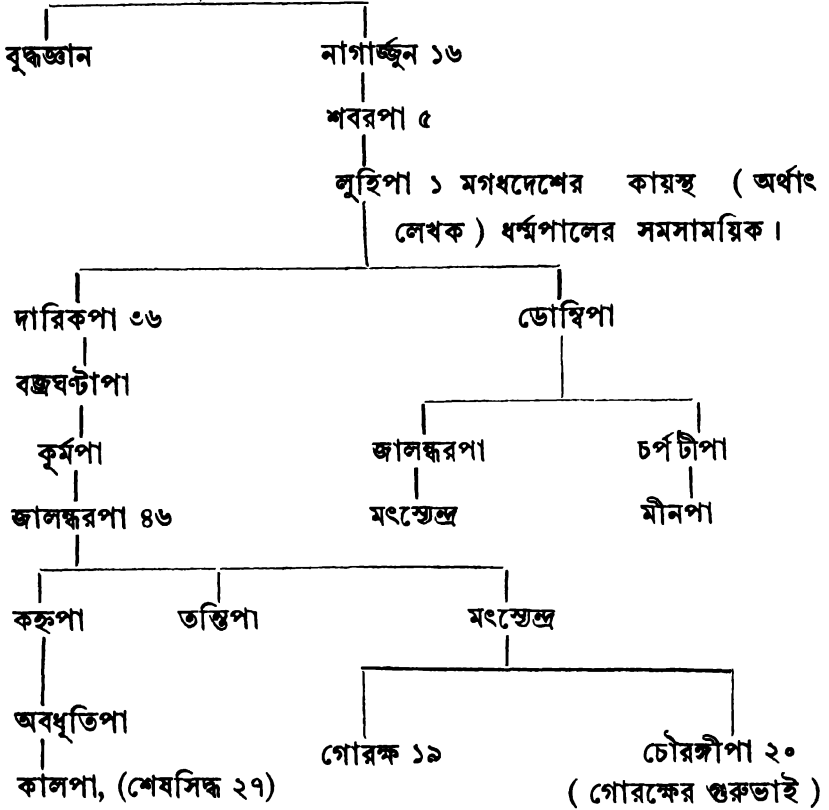
এই সিদ্ধদের চিত্র ভোটিয়া গ্রন্থ হইতে উক্ত লেখক সংগ্রহ করিয়া মুদ্রিত করিয়াছেন। 'গঙ্গা' পুবাতত্ত্বাঙ্ক ও কল্যাণ যোগাঙ্ক পৃ ৪৭৩ ইঃ দ্রষ্টব্য।

সিদ্ধাদের রচনাকে উক্ত লেখক হিন্দীর প্রাচীনতম নিদর্শন বলেন, কিন্তু চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উহাকে বাংলার প্রাচীনতম রূপ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন।[১]

খৃষ্টপূর্ব্ব যুগে বৌদ্ধ গ্রন্থে 'একাভিপ্পায়ো' সাধন দেখা যায়, পাশ্চাত্যে Gnostic Rosicrucianদের মধ্যেও অনুরূপ প্রথা ছিল, বৌদ্ধসহজিয়া সাধনেও ইহার ইঙ্গিত স্পষ্ট।[২] কিন্তু স্ত্রী লইয়া সাধন হইলেও ইহা কামের

১। Origin & Development of the Bengali Language by Dr. S. Chatterji দ্রষ্টব্য।

২। Post-Chaitanya Sahajiya Cult, M. Bose, pp. 76, 101, 105, 116 etc.

সাধনা নহে কারণ ইহাতে বাহ্যসুখ বা সন্তান উৎপাদন নাই। অগ্নি বিনা যেমন দুগ্ধ আবর্ত্তন সম্ভবে না, তেমনি নারী বিনা কামনার শুদ্ধি হয় না, ইহা গোস্বামীদেরও মত ছিল। খৃষ্টান মিষ্টিকদের মধ্যেও ঈশ্বরকে পতিভাবে ভজনা প্রেমের সাধনা।[১]

ডাঃ মোহন সিং বলিয়াছেন গোরক্ষ সম্বন্ধে এদেশে ভ্রান্ত ধারণা আছে যে তিনি বৌদ্ধ ছিলেন; বস্তুতঃ গোরক্ষের ধর্ম্ম উপনিষদের ধর্ম্ম, সন্তদের উপর গোরক্ষের দর্শন যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। গোরক্ষ-প্রচলিত ধর্ম্মে জৈনদের 'জত' নামক চূড়ান্ত ব্রহ্মচর্য্য, বৌদ্ধদের বিজ্ঞানবাদ ও শূন্যবাদ এবং বজ্রযান, ও তন্ত্রের লয় ও কুণ্ডলিনী যোগ, সহজিয়া মত, কৌল মত, হঠযোগের সাধন প্রভৃতির অপূর্ব্ব মিশ্রণ আছে। পরবর্ত্তী কালে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সম্প্রদায়ের সাধনরীতি ও পারিভাষিক শব্দ স্বভাবতঃই নাথধর্ম্মে ব্যবহৃত হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না। গোরক্ষের 'নাদানুসন্ধান' বা শব্দযোগ উপনিষদেও পাওয়া যায়। হঠসাধন গোরক্ষের পন্থা ছিল না, বরং হঠের বিপরীত 'সহজ' যোগই তাঁহার সাধন ছিল। তিনি সহজ-আনন্দলাভের উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।[২]

(ঙ) নাথসম্প্রদায়ের সহিত শৈব সম্প্রদায়ের সম্বন্ধ বিচার

নাথ ও শৈব সাধনা—নাথপন্থের সহিত শৈব ও শাক্ত তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের কি সম্বন্ধ ছিল তাহাই আমাদের আলোচ্য। বৈদিককাল হইতেই শিব বা রুদ্রের পূজা প্রচলিত ছিল, যজুর্ব্বেদ ও তৈত্তিরীয় আরণ্যকে সমস্ত জগৎকে রুদ্ররূপ বলা হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতরেও (৩।১১) শিবের বর্ণনা আছে। কিন্তু অথর্ব্ববেদের পূর্ব্বে পশুপতি বর্ণন নাই। বামন পুরাণে শৈবদের চারিটি সম্প্রদায়ের কথা আছে—শৈব, পাশুপত, কালদমন ও কাপালিক। ন্যায়বর্ত্তিকার খ্যাতনামা রচয়িতা উদ্যোতকর পাশুপতাচার্য্য ছিলেন। কাপালিক প্রভৃতি সম্প্রদায় অধুনা লুপ্ত, ইহাদের দর্শন এক প্রকার অজ্ঞাত। কাশ্মীর শৈবদের প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন বা 'ত্রিক্‌দর্শন' এবং দাক্ষিণাত্যের 'শৈবসিদ্ধান্ত' মত ও 'বীর-শৈবসিদ্ধান্ত' বিশেষভাবে আলোচিত হওয়ায় এখনও উহাদের দর্শন লুপ্ত হয় নাই, উহাদের গ্রন্থাদিও দুর্ল্লভ নহে। নাথেরা শৈব ছিলেন

১। Mysticism, Underhill, Pt. I?, p. 170.
২। Gorakhnath, Singh, p. vii, 25, 30.

একথা পূর্ব্বে স্বীকার করা হইয়াছে, অতএব ত্রিকদর্শন ও বীর-শৈব, শৈব-সিদ্ধান্ত দর্শন প্রভৃতির সহিত নাথ দর্শনের মিল থাকা বিচিত্র নহে।

দক্ষিণে তামিলদেশে ৭ম, ৮ম শতাব্দীতে ৮৪ জন শৈব সন্তের আবির্ভাব হয়, ইঁহাদের মত শৈব-সিদ্ধান্ত মত নামে পরিচিত। ভগবান শঙ্কর হইতে ২৮টী তন্ত্রের উদ্ভব হয়। জয়রথ তন্ত্রালোকের টীকায় তাহাদের নাম দিয়াছেন। কর্ণাটে দ্বাদশ শতকে বসব কর্ত্তৃক বীর-শৈব মত প্রচারিত হয়। বীর-শৈবরা কণ্ঠে লিঙ্গ মূর্ত্তি ধারণ করিতেন, নাথেরাও কণ্ঠে 'শিংনাদ' ধারণ করেন। বীর-শৈবরা সর্ব্বজাতির নিমিত্ত ধর্ম্ম প্রচার করিতেন, ইঁহাদের মত 'লিঙ্গায়েৎ' বা 'জঙ্গম' নামে পরিচিত। কাশীতে জঙ্গম বাড়ীতে ইঁহাদের জ্ঞান-সিংহাসন আছে।

ত্রিক্‌দর্শনের নামান্তর 'স্পন্দবাদ', ইহা কাশ্মীর শৈবাদ্বৈতবাদ নামে খ্যাত। পশু, পাশ ও পতি এই তিন তত্ত্ব ত্রিক্‌দর্শনের মূল তত্ত্ব। অভিনব-রচিত তন্ত্রালোকের টীকায় এই দর্শন ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই দর্শনের মূল প্রবর্ত্তক আচার্য্য বসুগুপ্ত (আনুমানিক ৮০০ খৃঃ)। ইনি শিব-সূত্রের উদ্ধারকর্ত্তা। অভিনবের তন্ত্রসার, মালিনীবিজয়বার্ত্তিক, পরমার্থসার প্রভৃতিও ত্রিক্‌দর্শনে প্রসিদ্ধ। এগুলি একাধারে সাহিত্য ও দর্শন। অভিনবের উপযুক্ত শিষ্য ক্ষেমরাজ স্বচ্ছন্দতন্ত্র টীকা, শিব-সূত্র-মর্শিনী প্রভৃতির রচয়িতা।

শাক্ততন্ত্র কাশ্মীর, কাঞ্চী ও কামাখ্যায় রচিত হয়। কামাখ্যা কৌলমতের মুখ্যস্থান। কৌলমার্গের মতে তন্ত্রসংখ্যা চতুঃষষ্টি। কাশ্মীরে ও কাঞ্চীতে শ্রীবিদ্যার পূজা হয়, ইহার আচার্য্য দত্তাত্রেয়, অগস্ত্য ও গৌড়পাদ। গৌড়পাদের উপযুক্ত শিষ্য শঙ্কর সৌন্দর্য্যলহরীতে কবিত্ব ও তান্ত্রিকতার সমাবেশ দেখাইয়াছেন। কৌলমতে পূর্ণানন্দ, ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতির নামও প্রসিদ্ধ।

বীর-শৈব-সিদ্ধান্ত মতে স্থূল চিদচিৎশক্তিবিশিষ্ট জীব ও সূক্ষ্ম চিদচিৎশক্তিবিশিষ্ট শিবের অদ্বৈত বা সামরস্য সাধনা আছে। শিব ক্রীড়ার জন্য স্পন্দনের সৃষ্টি করেন, এইরূপে সামরস্য বিভেদ হইয়া তিনি জীব ও শিব হইলেন। শিব ও শক্তি অভেদ। জীব আপন স্বাভাবিক ভক্তিশক্তি দ্বারা পরমশিবের সহিত একভাব প্রাপ্ত হইলে জীবের মুক্তি হয়। শক্তির দ্বারা পরমশিব হইতে জগতের পরিণাম হয়, অন্যথা জীবে ও শিবে ভেদ নাই।

শৈবসিদ্ধান্তমতে শিব, শক্তি ও বিন্দু রত্নত্রয়, ইহাই সমগ্র জগতের মূল স্বরূপ। শিব জগতের কর্ত্তা, শক্তি করণ, বিন্দু উপাদান। এই বিন্দুই মহামায়া, শব্দব্রহ্ম, কুণ্ডলিনী, বিদ্যাশক্তি ও ব্যোম। বিন্দু ক্ষুব্ধ হইলে একদিকে শুদ্ধদেহ, ইন্দ্রিয়, ভোগ্য ও ভুবনের উৎপত্তি হয়, অন্যদিকে শব্দের উৎপত্তি হয়। 'শব্দ'—সূক্ষ্ম নাদ, অক্ষর বিন্দু ও বর্ণভেদে ত্রিবিধ। ইহার কারণভূত বিন্দু জড় হইয়াও শুদ্ধ। জড় শক্তির সহিত শিবের তাদাত্ম্য হয় না, কারণ শিব চেতন। পরমেশ্বর নিজ সমবায়িনী শক্তি দ্বারা বিন্দুতে আঘাত করিলে শুদ্ধজগৎ হয়, মায়ার ক্ষোভে অশুদ্ধ-জগতের উৎপত্তি হয়। শিবের সংজ্ঞা 'পতি', তিনি 'পঞ্চকৃত্যকারী'। জীব, অণু বা পশু, ইহার ত্রিবিধ মল থাকিলেও জীব কর্ত্তা। জীব পাশ দ্বারা বদ্ধ, সেই পাশ বা মল অপগত হইলে মুক্তি হয়। তন্ত্রমতে মল জ্ঞান বা কর্ম্ম দ্বারা দূর হয় না, ক্রিয়া দ্বারা হয়। ক্রিয়ার সহিত চৈতন্যের উদয় হয়, ইহাদের সংযোগে 'জীবন্মুক্তি' হয়।[১]

কাশ্মীর ত্রিক্‌বাদ বা প্রত্যভিজ্ঞাবাদে আছে "শিব এব গৃহীত পশুভাবঃ", ইহাই এই বাদের মূল প্রতিপাদ্য। শিবই দৃশ্য, শিবই দ্রষ্টা, তিনিই বেদ্য, তিনিই বেত্তা। তিনি আপন স্বাতন্ত্র্যশক্তি-মহিমায় নর্ম্মরভসে বা খেলার ঔৎসুক্যে[২] এই জগৎকে আপনার বোধগগনে প্রতিবিম্ববৎ প্রকাশিত করিয়াছেন,[৩] তিনি আপনাকে সঙ্কুচিত করিয়া অণুরূপে অবভাসিত হইতেছেন এবং অণুর ভোগ সিদ্ধ্যর্থে চরাচর জগৎ প্রকটিত করিতেছেন (তন্ত্রসার ৮ আঃ)। শিবের 'স্পন্দ' বা আত্মবিমর্শ হইতেই এই প্রপঞ্চের উৎপত্তি। শিব হইতে ক্ষিতি পর্য্যন্ত তত্ত্বের আবির্ভাব ও তিরোভাব বুঝাইবার নিমিত্ত এই মতবাদীরা সাংখ্যোক্ত পঞ্চ-বিংশতি তত্ত্ব ব্যতিরিক্ত আর একটী বা আরও এগারটী তত্ত্বের কথা বলেন। পরমশিব তত্ত্বাতীত হইলেও তাঁহাকে গণনায় ধরিলে তত্ত্ব ২৭টী বা ৩৭টী হয়।[৪]

অন্যান্য বাদের ন্যায় ত্রিক্‌বাদেও মোক্ষের কথা আছে। স্বস্বরূপের খ্যাতিই মোক্ষ, অর্থাৎ আমিই সেই পরমশিব এরূপ প্রত্যভিজ্ঞাই মোক্ষ।

১। ভারতীয় দর্শন, উপাধ্যায়, পৃ ৫৪৫ ইঃ
২। ঈশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞাসূত্র ৫।৬
৩। তন্ত্রসার, তৃতীয় আঃ, 'সর্বমিদং ভাবজাতং বোধগগনে প্রতিবিম্বমাত্রম্'।
৪। তন্ত্রালোক, ১১ আঃ ২৪ ; তন্ত্রসার ১০ আঃ পৃ ১১১।

মুক্তির পথে জ্ঞানের ক্রমিক উৎকর্ষে অণু শিব স্বস্বরূপের উপলব্ধি করে। পরমেশ্বর স্বাত্মপ্রচ্ছাদন ক্রীড়ার দ্বারা পশু বা অণু হন, সুতরাং সেই আচ্ছাদন দূর না করিলে অণু মুক্তির পথে যাইতে পারে না। তাঁহার এই ইচ্ছাই 'শক্তিপাত'। পরমেশ্বর স্বাতন্ত্র্যশক্তিসার বলিয়া তাঁহার শক্তিপাত নিরপেক্ষ এবং তৎফলে অণু স্বস্বরূপের উপলব্ধি করে অর্থাৎ পরমশিবত্বে অবস্থান করে (তন্ত্রসার ১১ আঃ)।

ত্রিকমতে শিবই খেলার ঔৎসুক্যে জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন ; ইহার দ্বারা তাঁহাতে 'ইচ্ছার' কল্পনা করা অসঙ্গত হইবে না। নাথমতে শিব ও শক্তি অভিন্ন অর্থাৎ সকলের মূলে যে চিৎস্বরূপ পরমেশ্বর আছেন, তাঁহার সহিত চিৎশক্তি সদাযুক্ত হইয়া থাকেন, সেই শক্তির ক্রিয়াশীল অবস্থায় ব্যক্ত জগতের উদ্ভব হয়, নিষ্ক্রিয় অবস্থায় জগতের লয় হয়। শক্তিযুক্ত শিবই সৃষ্টির আদিকারণ, তিনি সৎ, সর্ব্বচৈতন্যের আধার বলিয়া চিৎ এবং ইচ্ছাদি শক্তি তাঁহার কলা বলিয়া তিনি 'সকল' পরমেশ্বর। শক্তি ইচ্ছারূপিণী, মহাপ্রলয়ের অন্তে পুনর্বিকাশের ইচ্ছাই শক্তির 'ইচ্ছা' নামে খ্যাত। ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া—শক্তির এই তিনটী রূপ আছে। আবার জগতের লয় অবস্থায় "শিবমধ্যে গতা শক্তিঃ ক্রিয়ামধ্যস্থিতঃ শিবঃ। জ্ঞানমধ্যে ক্রিয়া লীনা ক্রিয়া লীয়তি ইচ্ছয়া। ইচ্ছাশক্তির্লয়ং যাতি যত্র তেজঃ পরঃ শিব।"[১] (এই নিবন্ধের সাধনা-অংশে নাদবিন্দুকলা অধ্যায়ে ইহার বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।)

ইতিপূর্ব্বে যে শৈবসিদ্ধান্ত মত বর্ণন করা হইয়াছে—যাহাতে শিব, শক্তি ও বিন্দুকে 'রত্নত্রয়' বলা হইয়াছে তাহার সহিত নাথদর্শনের অনেকাংশে মিল আছে। পরশিব ও পরাশক্তির মিলনে যে জগৎ সৃষ্টির ইচ্ছা হয় তাহাই বিন্দুরূপে খ্যাত। বিন্দু হইতে আদিশব্দ বা নাদের উৎপত্তি হয়, উহা হইতে সৃষ্টির আরম্ভ। গোরক্ষ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহে উক্ত হইয়াছে "বিন্দুঃ শিবো রজঃ শক্তি বিন্দুরিন্দু রজো রবিঃ। উভয়োঃ সঙ্গমাদেব প্রাপ্যতে পরমং পদম্।" (পৃ ৪১)

এই পরমপদ প্রাপ্তি নাথসিদ্ধদের লক্ষ্য, অতঃপর পরমপদের দর্শন ব্যাখ্যাত হইতেছে।

১। কৌলজ্ঞাননির্ণয়—২।৬,৭,

দ্বিতীয় ভাগ

সিদ্ধান্ত-অংশ

প্রথম পরিচ্ছেদ

পরমপদ বা পূর্ণ সত্যের স্বরূপ, সামরস্য

নাথসিদ্ধগণের সমস্ত সাধনার চরম লক্ষ্য পরমপদ প্রাপ্তি। সর্ব্বতত্ত্বের উর্দ্ধে পরমপদের অবস্থান। উহা বাচ্য-বাচক-ভেদবিরহিত। তজ্জন্য নাথগণ উহার নির্নাম বা অনামা আখ্যা দেন। "সর্বতত্ত্বোর্ধ্ব-বৃত্তিত্বান্ নির্নামি পরমং পদম্।"[১] পরমতত্ত্ব বা পরং ব্রহ্ম স্বয়ং পূর্ণ অনাদিনিধন এক অখণ্ড অব্যক্তস্বরূপ কার্য্যকারণ-কর্ত্তৃত্বহীন এবং কুলাকুলের অতীত অবস্থা।[২] সৃষ্টিকালে ইহা হইতেই সমুদায় ভাব-পদার্থ প্রসূত হয় এবং প্রলয়ে ইহাতেই লীন হয়।[৩] সেই সর্ব্বকারণের কারণ পরতত্ত্বই মুমুক্ষুর সাধন-নিষ্ঠার চরম লক্ষ্য বিবক্ষায় পরমপদ নামে অভিহিত হয়।

পরমপদ অর্থে শ্রেষ্ঠ স্থান বা অবস্থা বা গতি বুঝায়। জীবের যে অভীষ্টতম চরমগতি তাহাই পরম পদ। "যদ্ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।"[৪] যে অবস্থা বা পদ লাভ করিলে জীবকে জন্মমৃত্যুর দ্বার দিয়া পুনঃ পুনঃ সুখদুঃখমোহাত্মক এই সংসারে অবশভাবে গতাগতি লাভ করিতে হয় না তাহাই পরমপদ। জনন-মরণজ দুঃখের অনুভবকারী জীব তন্নিরাকরণে উৎসুক হইয়া গুরূপদিষ্ট মার্গের অনুসরণপূর্ব্বক যে সামরস্যাত্মক অবস্থা লাভ করে তাহাই পরমপদ।[৫] সাধন-বলে যাবতীয় জৈব চাঞ্চল্যের তিরোধানে চিৎ-স্বাত্ম-সুখ-বিশ্রান্ত[৬] নিরুত্থিতি রূপ পরম-শ্রীলাভ করিয়া জীব যে অনন্যভাবে স্বস্বরূপে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় তাহাই পরম-পদ।[৭]

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং নাধিকং মন্যতে ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥

(গীতা, ৬।২২)

অর্থাৎ গীতার ভাষায় যাহা লাভ করিলে অন্য কোন লাভকে অধিক মনে

১। সি. সি. স. ৪।৩৪
২। সি. সি. স. ১।৪; সি. সি. প. ১।৪,৫
৩। "শক্তিপ্রসর সঙ্কোচৌ জগতঃ সৃষ্টিসংহৃতি"। সি. সি. প; ৪।২০ সি. সি. স. ৪।২৪
৪। গীতা, ১৫।৬
৫। সি. সি. স. ৫।৫৯; সি. সি প ৫।৪৫
৬। সি. সি. প. ৫।৫৮
৭। সি. সি. স. ৫।৬০

হয় না, যাহাতে স্থিতিলাভ করিলে গুরুদুঃখের দ্বারাও বিচলিত হইতে হয় না, সেই সর্ব্বানন্দময় নিশ্চল পদই পরম-পদ।[১] জাগ্রৎ-স্বপ্নাদি চতুরবস্থার অতীত শান্তিনিলয়[২] তুরীয়াতীত স্বাত্মজাগর অবস্থাই পরম-পদ। পরম-পদারূঢ় যোগী সর্ব্বাবস্থায়ই বিজ্ঞাতা হন।[৩]

মন-বুদ্ধির অতীত, পরিচ্ছিন্ন সত্তা সংবিৎকলার ঊর্দ্ধস্থ উহাপোহ-রূপ তর্কের অনধিগম্য পরম-পদ[৪] সর্ব্বপ্রকার উপাধিশূন্যতা ও নিরুপাধিতা-হেতু স্বসংবেদ্য।[৫] চরাচর নিখিলের অত্যন্ত বিভাসক আত্মবেদ্য পরম-পদ[৬] এক অখণ্ড পরিপূর্ণ স্বভাব। ইহা একাধারে বিশ্বরূপ ও বিশ্বোত্তীর্ণ। "অখণ্ড-পরিপূর্ণাত্মা বিশ্বরূপো মহেশ্বরঃ"।[৭] শ্রুতিও বলেন পরম-পদরূপ ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে অক্ষম হইয়া বিষয়বিজ্ঞানসহ নামসকল তাঁহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়। যিনি এই ব্রহ্মসম্বন্ধী আনন্দকে জানেন তিনি সর্ব্ব ভয়ের কারণ হইতে মুক্ত হন।

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন ॥[৮]

মুক্তিই জীবের পরম-পুরুষার্থ। নাথ-স্বরূপে অবস্থানই মুক্তি, উহাই পরম-পদ।[৯] ভাবাভাববিনির্মুক্ত নাশোৎপত্তিবিবর্জ্জিত সর্ব্বসঙ্কল্পনাতীত দ্বৈতাদ্বৈত-বিলক্ষণ সমতত্ত্বই নাথ-স্বরূপ।[১০]

নির্গুণং বামভাগে চ সব্যভাগেঽদ্ভুতা নিজা।
মধ্যভাগে স্বয়ং পূর্ণস্তস্মৈ নাথায় তে নমঃ ॥

(গো. সি. স., ১ম শ্লোক)।

এই শ্লোকে বামভাগে যে নির্গুণের অবস্থানের কথা বলা হইয়াছে তাহা দ্বারা নাথ-স্বরূপের একভাগ এক ব্যবহারে নির্গুণ-স্বরূপ কল্পনা করা হয়, ইহাই উক্ত হইতেছে। পুনঃ ইহার সব্যভাগে যে অদ্ভুতা নিজা শক্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহা ইচ্ছাশক্তি বা সর্ব্বসাকার ব্রহ্মকারিণী-ভূতা শক্তি। ইহাও একভাগে এক ব্যবহারে সগুণ ব্রহ্মমূলভূতা বলিয়া কল্পনা করা হয়। মধ্যভাগে সর্ব্বস্থাধার বা সর্ব্বশিরোমণিরূপ

১। সি. সি. প. ৫।৫৬
২। সি. সি প. ৩।১৩
৩। সি. সি. প. ৫।৫৫
৪। সি. সি. স. ৫।৪,৫,৬
৫। সি. সি. প. ৫।৩,৪
৬। সি. সি. স. ৫।৩
৭। সি সি. স ৩।৪০
৮। তৈ. উ. ২।৯
৯। গো. সি. স. পৃ ১০
১০। অমনস্ক ও অবধূত গীতা, গো. সি. স. পৃ ১০, ১১

নির্গুণ ও সগুণ উভয়ের ঐক্যস্বরূপ 'নাথ' কল্পনা করা হইয়াছে। নাথ-স্বরূপ সত্য-অসত্য জড়-চৈতন্য সর্ব্বভাবের সাম্য-স্বরূপ দ্বৈতাদ্বৈতের ঊর্দ্ধবর্ত্তী অবাঙ্‌মনসগোচর। যাহাতে দ্বৈতের কল্পনা নাই, অদ্বৈতের বিকল্পও যাহাতে নাই, সেই দ্বৈতাদ্বৈতের ঊর্দ্ধবর্ত্তী চৈতন্য-স্বরূপকেই 'নাথ' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। অপরন্তু মনোবাগতীত বিশ্বোত্তীর্ণতা এবং মনোবাঙ্‌ময় বিশ্বরূপতা এতদুভয়াত্মক পূর্ণতাই নাথ-স্বরূপ।[১] এতদুভয়ের সহিত সামরস্যই মোক্ষ। "মোক্ষঃ সমরসো ভবেৎ। বিশুদ্ধমিত্থমাত্মানং পশ্যেত চাত্মনাত্মনি।"[২] বিগলিত সর্ব্বভেদ সমরস-ময় মোক্ষপদে আত্মা কর্ত্তৃক আপনাতেই বিশুদ্ধ আত্মা উপলব্ধ হন। সামরস্যাত্মক পরম-পদে সম্যক্ চৈতন্যবিশ্রান্তির ফলে[৩] সমস্ত অনাত্ম ভাবেব উপশান্তি হইলে স্বপিণ্ডলীন হয় এবং চবাচব আত্মভাবে অঙ্গীকৃত হইয়া স্বয়ং চিদ্‌বিলাসের প্রকাশ হয়।[৪] মুণ্ডকোপনিষদেও উক্ত হইয়াছে আত্মসাক্ষাৎকারী বিদ্বান্ সাধক যখন সুবর্ণেব ন্যায় স্বয়ংজ্যোতিঃ, সর্ব্বজগতের অবিনাশী কর্ত্তা, পরমেশ্বর, পরিপূর্ণ-স্বরূপ ও জগৎ-কারণ ব্রহ্মকে দর্শন করেন তখন সেই বিদ্বান্ পুণ্য ও পাপ সমূলে নাশ কবিয়া বিগতক্লেশ হন এবং পরমসাম্য প্রাপ্ত হন।[৫]

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥
(মুণ্ডক উপনিষদ্ ৩।১।৩)

পরতত্ত্বে উপনীত সাধক তাদাত্ম্য লাভ করেন। তাদাত্ম্য অনুভবের ফলে সর্ব্বভেদ বিগলিত হয়। "তদনুভবতঃ ভেদবিরহঃ।"[৬] ভেদের বিগলনই সমরসতা। তখন "লোকা ন লোকা, বেদা ন বেদা, দেশা ন দেশা, যজ্ঞা ন যজ্ঞা, মাতা ন মাতা, পিতা ন পিতা,··· তাপসা ন তাপসা ইতি একমেব পরম্", এই প্রকার অখণ্ড একত্বেরই জ্ঞান হয়।[৭]

নিরুত্থান দশায় স্বপ্রকাশ একবেদ্য শিবভাবই কুলাকুলস্বরূপ সামরস্যের ভূমি।[৮] প্রবহমাণ নদীসমূহ যেরূপ নাম ও রূপ ত্যাগ করিয়া সাগরের সহিত একতা প্রাপ্ত হয় তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞ নাম ও রূপ

১। গো. সি. স. পৃ ৫২, ৭৩
২। অমরৌঘ শাসন ২৫ শ্লোক
৩। সি. সি. স ৫।৩৫
৪। সি. সি. প. ৫।৮৩, ৮৪
৫। মুণ্ডক উঃ ৩।১।৩
৬। সি. সি. স. ৫।১১
৭। গো. সি. স. পৃ ১০ ; ব্রহ্মোপনিষদ
৮। সি. সি. স. ৪।৪,৫

হইতে বিমুক্ত হইয়া অব্যাকৃত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্বপ্রকাশ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন।[১] ইহাই সামরস্য। এই সামরস্যের উদয়ে চলন আর থাকে না, সঙ্কোচ একেবারে কাটিয়া যায়, ইহাই নিস্পন্দত্ব ও নিরন্তরত্ব।[২] তখন আত্মা নিজ শক্তির মহিমায় ব্যাপকতা লাভ করিয়া সমগ্র বিশ্বরূপে ও তদুত্তীর্ণ রূপে একই সঙ্গে প্রকাশ পায়। "বিশ্বাতীতং যদা বিশ্বমেকমেবাবভাসতে।"[৩] এই যুগপৎ বিশ্বরূপ ও বিশ্বাতীত ভাবই পূর্ণ সত্যের স্বরূপ।

জীবভাবে বহু সংকীর্ণ ভাবের সমাবেশ আছে। ইহা ভূত ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি অহঙ্কার ও চৈতন্য-রূপ বহুভেদ-সংশ্লিষ্ট। তত্ত্বদৃষ্টিতে এক পরম কারণ হইতেই বহুর উদ্ভব। কিন্তু বহুতে বহুরূপে অভিমানী হইয়া জীব[৪] আপন মৌলিক পূর্ণত্ব ও একরসত্ব হইতে বিচ্যুত হইয়াছে। গুরুকৃপা-সহায়ে সাধনদ্বারা আপন পূর্ণত্ব অনুভব করিবার যোগ্যতাও জীবের আছে। "জ্ঞানং মুক্তিঃ স্থিতিঃ সিদ্ধির্গুরুবাক্যেন লভ্যতে।"[৫] সাধনবলে জীব আপন পরিচ্ছিন্ন বহির্মুখী ভাবকে সংবৃত করিয়া দেহাদিতে অভিমানাত্মক আবরণ উন্মোচন করিলেই স্বস্বরূপে অধিষ্ঠিত হইতে পারে। জ্যামিতির বিন্দুর উপমা হইতে এই তত্ত্বটী বুঝা যাইতে পারে। নাথগণের দৃষ্টিতে শক্তির প্রসর ও সঙ্কোচ হইতে সৃষ্টি ও সংহার। স্থির অচঞ্চল বিন্দুই যেন মূল কারণ। বিন্দুর গতি হইতে রেখার উৎপত্তি, সেই রেখা বহুমুখী হইয়া বহু রেখার সৃষ্টি করিলে বহুবিধ ক্ষেত্রাদির উদ্ভব হয়। আবার বিন্দুর ঐ গতি বিপরীতমুখী হইলে ক্ষেত্র-রেখাদি বিলুপ্ত হইয়া একমাত্র বিন্দুই থাকে। "নিরুত্থানে স্বস্বরূপাখণ্ডৈব প্রতিভাতি সা।"[৬] সেইরূপ এক পরম কারণ পরতত্ত্ব হইতেই ষট্‌পিণ্ডাত্মক এই চরাচর প্রসৃত হইয়াছে। এই প্রসরের সঙ্কোচ হইলে চরাচর পুনরায় এক তত্ত্বে এক রসে উপনীত হইবে। বহুমুখী ভেদময় পরিচ্ছিন্ন জীবভাবও ঐ একই প্রণালীতে আপন বহির্মুখী চাঞ্চল্য সংবৃত করিয়া স্বস্বরূপে এক রসে উপনীত হইয়া আপনাকে পরম কারণের সহিত অভিন্ন জানিয়া যুগপৎ স্বীয় বিশ্বময় ও বিশ্বোত্তীর্ণ ভাবের উপলব্ধি করে। অর্থাৎ ভেদের অপগমে অভেদের

১। মুণ্ডক উপ, ৩।২।৮
২। সি. সি. স. ১।৭
৩। সি. সি. স. ৬।১০
৪। সোঽভিমান আত্মনো বন্ধঃ তন্নিবৃত্তি র্মোক্ষঃ; গো. সি. স. পৃ, ১০
৫। হ. যো. প্র. ৪।৮
৬। সি. সি. স. ৪।৩৬

উদয় হয়। অভিন্নত্বই পূর্ণত্ব, ভেদবিরহই সামরস্য। ভেদই দুঃখদায়ক, ভেদবিরহই পূর্ণানন্দ। জীবের স্বরূপানুসন্ধানের ফলে যে আত্মবোধ বা নিজাবেশের উদয় হয়, তাহা হইতে অমল-সুখ-চমৎকার-প্রাপক প্রকাশ-স্বরূপ সংবিদের উদয় হয়।[১]

"ততঃ সচ্চিদানন্দ-চমৎকারাদ্ অদ্ভুতাকার-প্রকাশ-প্রবোধঃ জায়তে। প্রবোধাদ্ অখিলমেতদ্ দ্বয়াদ্বয়-প্রকটতয়া চৈতন্যভাসাভাসকং পরাৎপর-পরমপদমেব প্রস্ফুটং ভবতি।"[২] তৎপরে সেই আনন্দ হইতে প্রকাশময় জ্ঞানের উদয় হয়, এবং এই প্রকাশের জ্ঞান হইতে দ্বৈতাদ্বৈততত্ত্বকে প্রকটিত করিয়া চৈতনাভাস দ্বারা আভাসিত পরমপদ প্রস্ফুট হয়।

শক্তির সমস্ত চঞ্চলতা সংবৃত হইলে শক্তি নিরুত্থানাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া শিব-স্বরূপে আত্মলীনা হয়। কারণ যখন স্বভাবতঃ আত্মলীন বা নিরুত্থানদশা হয় তখনই শিব, যখন শক্তি সক্রিয় বা সঞ্জাত তখনই শক্তি; এই নিরুত্থানদশাতেই কুল ও অকুল বা শিব ও শক্তি প্রতিষ্ঠিত, উহাই সহজাবস্থা। উহাই সামরস্যের ভূমি।[৩] উহাই পূর্ণ সত্য। তন্ত্রসারেও উক্ত হইয়াছে, "স্বভাব এব পরমোপাদেয়ঃ স চ সর্বভাবানাং প্রকাশরূপ এব।"[৪] অর্থাৎ স্বভাব বা সহজাবস্থাই পরম উপাদেয় পূর্ণ সত্য। উহাই সর্ব্বভাবের প্রকাশক স্বপ্রকাশ।

যাহা সর্ব্বগত হইয়াও আপন মাহাত্ম্যে স্থির ও পরিপূর্ণ দ্বৈতাদ্বৈত হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ ও নিত্য-স্বরূপ বা নিরন্তর[৫], ভাবগম্য নিরাকার ও দৃষ্টিগোচর সাকার এতদুভয়ই যাহাতে প্রতিষ্ঠিত অথচ যাহা ভাবাভাব-বিনির্মুক্ত অন্তরাল-স্বরূপ, ভেদাভেদবর্জ্জিত কেবল-স্বরূপ, তাহাই পূর্ণ, তাহাই সত্য।[৬]

এই পূর্ণ সত্যের কোন হেতু নাই, কোন দৃষ্টান্ত নাই সুতরাং ইহা অহেতুক স্বয়ংসিদ্ধ। ইহা মনোবুদ্ধ্যাদির অগোচর, মহাশূন্যাত্মক বিজ্ঞানস্বরূপ আনন্দ-ঘন-তত্ত্ব।

হেতু-দৃষ্টান্ত-নির্মুক্তং মনোবুদ্ধ্যাদ্যগোচরম্।
ব্যোমবিজ্ঞানমানন্দং তত্ত্বং তত্ত্ববিদো বিদুঃ॥ (বিবেক-মার্ত্তণ্ড।[৭])

১। সি. সি স. ৫।১১, সি সি. প ৫।৮
২। সি. সি প ৫।৮
৩। সি. সি. স. ৪।৫,৬ ; সি. সি. প. ৪।১,৩
৪। অভিনব গুপ্ত, তন্ত্রসার পৃ ৫
৫। গো. সি স. পৃ ১১
৬। গো সি স. পৃ ৩৪
৭। গো সি. স. উদ্ধৃত পৃ ৪১

এক ব্যবহারে যাহা নির্গুণ অন্য ব্যবহারে যাহা সগুণ এতদুভয়ের আধারভূত সর্ব্বস্যাধার[১] ও ঐক্যভূমি নাথ-অবস্থাই পূর্ণ সত্যের স্বরূপ। ইহাতে নির্গুণ ও সগুণ ঐক্যপ্রাপ্ত হয়, দ্বৈতাদ্বৈত, সত্যাসত্য, জড় ও চৈতন্য সমস্ত ভাবজাতই সমতা প্রাপ্ত হয়।[২]

দ্বৈতমতে ব্রহ্ম সক্রিয়, অদ্বৈতমতে ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়। কিন্তু ক্রিয়া ও অক্রিয়ার কোনটাই নিরন্তর নহে বলিয়া অক্ষর নহে। "সর্ব্বদা ক্রিয়ৈব ন ভবতি, সর্ব্বদা হ্যক্রিয়ৈব চ ন ভবতি।" ক্রিয়াও নিরন্তর নহে, অক্রিয়াও নিরন্তর নহে। "ক্রিয়াক্রিয়ে দ্বয়েঽপি শক্তি-তৎস্থ এব।" ব্রহ্মে ক্রিয়া ও অক্রিয়া দুই শক্তিই আছে।[৩] বিশ্বময়ত্বই তাঁহার সক্রিয় সগুণ ভাব, আর বিশ্বোত্তীর্ণত্বই তাঁহার নিষ্ক্রিয় নির্গুণ ভাব। "অকর্ত্তৃ তৎকর্ত্তৃ চ তৎ পরং পদম্"।[৪] পরম-পদ বা নাথ-স্বরূপে কর্ত্তৃতা অকর্ত্তৃতা দুই-ই আছে। সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় ইত্যাকার একদেশী দৃষ্টিতে তাঁহার পূর্ণত্বের নির্দ্দেশ হয় না।[৫] যোগবীজে উক্ত হইয়াছে, "পরিপূর্ণস্বরূপং তৎ সত্যমেতদ্ বরাননে। সকলং নিষ্কলঞ্চৈব পূর্ণতাচ্চ তদেব হি"॥[৬] সকলত্ব ও নিষ্কলত্ব এই দুই মিলিয়াই তাঁহার পূর্ণত্ব। পূর্ণত্বের অধিগমেই চরম-সত্যের অধিগম হয়। সামরস্যই সেই পূর্ণ সত্য, পূর্ণ সত্যই পরমপদ বা সহজাবস্থা।

বিবেক-মার্ত্তণ্ডে সামরস্যের বিষয় নিম্নের উপমা দ্বারা বুঝান হইয়াছে—

যথা ঘৃতে ঘৃতং ক্ষিপ্তং ঘৃতমেব হি জায়তে।
ক্ষীরে ক্ষীরং তথা যোগী তত্ত্বমেব হি জায়তে॥

ঘৃতে ঘৃত এবং ক্ষীরে ক্ষীর নিক্ষিপ্ত হইলে যেমন যথাক্রমে ঘৃত ও ক্ষীরই হয়, সেইরূপ যোগীও পরতত্ত্বে উপনীত হইয়া তত্ত্বের সহিত সম্যক্ সমতা প্রাপ্ত হন।[৭] এই উপমা দ্বারা সমরসীকরণের রহস্য খ্যাপিত হইয়াছে। ঘৃত হইয়া ঘৃতে প্রবেশ করিতে হইবে, ক্ষীর হইয়া ক্ষীরে প্রবেশ করিতে হইবে। জীব-ভাবের সমস্ত দোষ ও মল পরিহারপূর্ব্বক, নির্ম্মল ও নির্দ্দোষ হইয়া "স্বরূপে সচ্চিদানন্দে স্থিতিম্ আপ্নোতি কেবলম্",[৮] অর্থাৎ প্রথমে

১। গো. সি. স. পৃ ৭৩
২। গো. সি. স. পৃ ৭৩
৩। গো. সি. স. পৃ ৭১
৪। গো. সি. স. পৃ ৫২
৫। গো. সি স. পৃ ৭১
৬। যোগবীজ ২৫, ২৬
৭। বিবেকমার্ত্তণ্ড, গো সি. স. পৃ ৪১
৮। যোগবীজ, ১৩৩ শ্লোক

ভেদময় বিশ্বকে অতিক্রমপূর্ব্বক নির্ব্বিকল্পপদে আরূঢ় হইলে পশ্চাৎ পরতত্ত্বের সহিত সামরস্য বিধানানন্তর বিশ্বময় ও বিশ্বাতীত ভাবের অধিগম হয়। বিশ্বের পরিচ্ছিন্ন প্রকাশকে পশ্চাতে রাখিয়া সকল প্রকাশ্যের প্রকাশক পরতত্ত্বে মিলিত হইলে নিরুত্থান-দশাপ্রাপ্ত সিদ্ধযোগী দেখেন, "তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।"[১] তখন পরিত্যক্ত বিশ্ব আপন বিশ্বোত্তীর্ণ স্বভাবে অঙ্গীকৃত হয়। ইহাই সমরসীকরণ।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে—সামরস্যাত্মক সহজাবস্থা বা পরম-পদ-লাভই নাথমার্গিগণের সাধনের চরম লক্ষ্য। এই সাধনে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে প্রবল পুরুষকার ও গুরুকৃপার অর্থাৎ সর্ব্বান্তর্যামী পরমশিবের শক্তিপাতের[২] একান্ত প্রয়োজন। "তেন সন্দর্শিতে মার্গে স্বসংবেদ্যস্য দর্শনম্"—সদ্‌গুরু-প্রদর্শিত পথেই স্বসংবেদ্য পরম-পদের প্রাপ্তি সম্ভব।[৩] গুরুর পরা-কৃপা বিনা চিত্তবিশ্রান্তি-লাভ দুর্ল্লভ।[৪] কিন্তু "ন কর্মণা বিনা দেবি যোগসিদ্ধিঃ প্রজায়তে," বীর্য্য-সহকারে সাধন-রূপ কর্ম্ম বিনা যোগে সিদ্ধি লাভও হয় না।[৫] কারণ সেই পরমপদ সাধনশীল যোগিগণেরই অপরোক্ষানুভূতিগম্য—"তত্তু পদং তাদৃগ্‌-যোগিনামেব অপরোক্ষম্।[৬] সত্যবাদী হৃষ্টচিত্ত সুতরাং জিতেন্দ্রিয় এবং ক্ষোভাকাঙ্ক্ষাদি-দোষহীন মুমুক্ষুগণ বহু যত্ন ও উপায়-সহায়ে গুরু-প্রসাদে সেই পরমপদ লাভে সমর্থ হন।[৭] জ্ঞান ও যোগরূপ দুই উপায়ের দ্বারা পরমপদ সাধ্য। বীর্য্য-সহকারে খড়্গ চালিত না হইলে যেরূপ যুদ্ধে জয়লাভ করা যায় না, সেইরূপ জ্ঞানহীন যোগ ও যোগহীন জ্ঞান দ্বারা সিদ্ধিলাভ সম্ভবপর নহে।[৮] জ্ঞানযুক্ত যোগ দ্বারাই সিদ্ধিলাভ সম্ভব। এক্ষণে কিরূপ জ্ঞান ও যোগ দ্বারা পরমপদ-প্রাপ্তি সম্ভবপর হয় তাহার আলোচনা করা যাইতেছে।

পরিচ্ছিন্ন দেহাভিমান বা সঙ্কল্প ত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বব্যাপক পরমনাথ পরমেশ্বরকে যথাতথ্যতঃ উপলব্ধি করিয়া জীব মুক্ত হয় এবং তাদৃশ হয়। "তং সঙ্কল্পং বিহায় সর্ব্বব্যাপকং পরমনাথং যথাতথ্যেন পশ্যত্যথ মুক্তো

১। কঠ উঃ ২।২।১০ শ্বেতা উঃ ৬।১৪
২। সি. সি. প. ৫।৬৫
৩। সি. সি. স. ৫।৮
৪। সি. সি. প. ৫।৮১
৫। যোগবীজ ১৫০ শ্লোক
৬। গো. সি. সি. পৃ ১১
৭। সি. সি. প. ৫।২১
৮। যোগবীজ ৬৩, ৬৪ শ্লোক

ভবতি তাদৃশ এব স্যাৎ"।[১] সঙ্কল্প বা দেহাভিমান থাকিলেই শীতোষ্ণ-সুখদুঃখাদি শস্ত্রাগ্নি জলমারুত নানাবিধ জীব-সংস্পর্শ এবং বহুতর মানস ব্যাধিদ্বারা শরীর পীড়িত হইয়া চিত্ত ও তৎসহ প্রাণ সংক্ষুব্ধ হয়।[২] এইরূপে বহু দুঃখের দ্বারা আকুলিতচিত্ত জীব দেহাবসানকালে তাৎকালিক ভাবনারূপ গতি লাভ করিয়া পুনঃপুনঃ জন্মমৃত্যু প্রাপ্ত হয়।[৩] অপক্ক পার্থিব জড়দেহই দুঃখের কারণ।[৪] যোগাগ্নিতে মহাভূতাদি তত্ত্বসকল যথোক্তক্রমে হুত হইলে সপ্তধাতুময় পার্থিব দেহ দগ্ধ হয় এবং অজড় শোক বর্জ্জিত মহাবল পক্ক যোগদেহ-লাভ হয়।[৫] চিত্ত নিরাকুল হইলেই যোগ সম্ভব। চিত্তের সহিত প্রাণ সম্বদ্ধ, প্রাণজয়েই চিত্ত জয়।[৬] এবং প্রাণাপানের সমাযোগে চন্দ্রসূর্য্যের ঐক্য-সম্ভূত যোগাগ্নি দ্বারাই সপ্তধাতুময় দেহ দগ্ধ হয়।[৭] তখন জন্মমৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়।[৮] জীবৎকালে যে সাধক প্রাণকে বিলীন করিতে সক্ষম হন, তাঁহার পিণ্ডপাত হয় না, অর্থাৎ দেহনাশ হয় না, চিত্ত সমস্ত দোষ হইতে মুক্ত হয় এবং শুদ্ধচিত্তে স্বাত্মজ্ঞান প্রকাশিত হয়।[৯]

প্রাণজয়ের সিদ্ধ-সম্মত উপায়ের বিষয় অন্যত্র সাধন-অধ্যায়ে আলোচিত হইবে। অধুনা নৈরুত্থ্য-লাভানন্তর পরম-পদের সহিত সমরসীকরণের বিষয় সংক্ষেপতঃ আলোচিত হইতেছে। অর্থাৎ জৈব-চাঞ্চল্য দূরীভূত হইলে জীবের পরমপদের সহিত যে তাদাত্ম্য হয় সেই বিষয় বিবৃত হইতেছে।

সহজ, সংযম, সোপায় ও অদ্বৈতাভিধেয় চতুর্বিধ অন্তরঙ্গ জ্ঞান-ভাবের ক্রমিক উদয়ে পরমপদে প্রতিষ্ঠা-লাভ হয়। বিশ্বাতীত পরমেশ্বরই বিশ্বরূপে অবস্থান করিতেছেন, ইহা জানিয়া বিশ্বকেও আপনার মধ্যে দর্শন করিতে পারাই সহজজ্ঞান। ইহার অপর নাম স্বাত্মসংবিৎ। বাহ্য জগতের সহিত সংস্পর্শে যে সমুদয় বৃত্তির উদ্রেক হয়, তাহাদিগকে সম্যক্ অবধানতার সহিত আপন আত্মায় প্রত্যাহৃত করিয়া ধারণা করাই সংযম। সংযমই সর্ব্বনিগ্রহ।

১। গো. সি. স. পৃ ২, ৩
২। যোগবীজ ৩৬, ৩৭ শ্লোক
৩। ঐ ৩৮, ৩৯ "
৪। ঐ ৩৪ "
৫। ঐ ৩৪, ৪৯ "
৬। যোগবীজ ১৩, ১৪ শ্লোক
৭। ঐ ৭০ "
৮। ঐ ৬৯ "
৯। ঐ ১৮, ১৯ "

বিষয়ের সংস্পর্শে তাহার প্রতিলৌল্যজনিত অথবা স্বতঃই বিবিধরূপে প্রকাশমান আত্মভাবকে সংবৃত করিয়া স্বস্বরূপে অবস্থান করাই সোপায়জ্ঞান। ইহাই স্বস্ববিশ্রান্তি। আর সকল ভেদহীন এমন কি দ্রষ্টৃদৃশ্য-ভাবহীন যে নির্ব্বিকল্প, নিত্যতৃপ্ত, নিরুত্থান অবস্থা তাহাই অদ্বৈত বা সাদ্বয় জ্ঞান, তাহাই পরম-পদ। এই অদ্বৈত-স্বরূপ পরম-পদে আরূঢ় যোগী নিত্যতৃপ্ত নির্ব্বিকল্প হইয়া নিরুত্থানদশায় অধিষ্ঠান করেন।[১]

সকল চাঞ্চল্যের বিশ্রান্তিই নিরুত্থান-দশা। সঙ্কল্পই সকল চাঞ্চল্যের মূল। দেহেন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির চাঞ্চল্য ও তৎকারণভূত সংস্কার নিরুদ্ধ হইলে সংকল্প নিরুদ্ধ হয়। সংকল্পের নিরোধে নির্ব্বিকল্পতার উদয়ে নৈরুত্থ্যলাভ হয়। নৈরুত্থ্যই সামরস্যের বা পরম-পদে স্থিতি-লাভের উপায়-ভূত। কিন্তু মাত্র নৈরুত্থ্যই পরম-পদ নহে। নৈরুত্থ্য-লাভের পর নিজাশক্তি বা পরাশক্তি বা উন্মনাশক্তির আশ্রয়ে কেবলী পুরুষ পরমাবস্থা বা পূর্ণব্রহ্মরূপে স্থিতিলাভ করে। তখন বিকল্প ও নির্ব্বিকল্পতার ভেদও তিরোহিত হইয়া যায়। পূর্ণব্রহ্ম সেইজন্য নির্ব্বিকল্প এবং বিশ্বোত্তীর্ণ হইয়াও বিশ্বময়। উহা যুগপৎ নিরাকার ও সাকার এবং সাকার দৃষ্টিতেও যুগপৎ অভিন্ন একাকার ও ভিন্ন অনন্তাকারময়। তখন বুঝা যায় এক পূর্ণই স্বস্বাতন্ত্র্য-বলে বা আপন স্বরূপ-মহিমায় আপন নিরঞ্জন-স্বরূপ হইতে অচ্যুত থাকিয়াও বিশ্বরূপে ভাসমান হয়।[২]

"গ্রস্তে স্ববেগ-নিচয়ে পদপিণ্ডমৈক্যং সত্যং ভবেৎ সমরসম্" পিণ্ডের নিখিল বেগ উপশান্ত হইলে তবেই পদপিণ্ডের সমরসময় ঐক্য নিষ্পন্ন হয়।[৩] গুরূপদিষ্ট পন্থায় স্বপিণ্ড হইতে পরপিণ্ড পর্য্যন্ত নিখিল পিণ্ডের জ্ঞান চিত্তে ধারণ করিয়া সম্যক্ অবহিত বা অবিপ্লবা স্মৃত্যারূঢ় হইয়া মুমুক্ষুগণ পরম-পদের সহিত রসসাম্য নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন।[৪]

উপনিষৎও বলেন—যে অবস্থায় মনের সহিত পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ব্যাপার-শূন্য হয় এবং বুদ্ধিও স্বকার্য্যে ব্যাপৃত হয় না, সেই অবস্থাকেই জ্ঞানিগণ উত্তম গতি বলিয়া থাকেন।

১। সি. সি. স. ৫।১৭-২৪; সি. সি. স. ৫।২৫-২৯

২। "মৃত্যুবিজ্ঞান ও পরমপদ", ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজের প্রবন্ধ, ভারতবর্ষ, ফাল্গুন, ১৩৪৭, পৃ ৩১০

৩। সি. সি. প. ৫।৮৪ ৪। সি. সি. স. ৫।২

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাহুঃ পরমাং গতিম্ ॥[১]
"যদা যাত্যমনীভাবং তদা তৎ পরমং পদম্।"[২]

কুণ্ডলিনী প্রবোধিত হইলে এবং কায়িক মানসিক সর্ব্ব কর্ম্ম নিঃশেষে পরিত্যক্ত হইলে সহজাবস্থা-লাভ হয়।

উৎপন্ন-শক্তি-বোধস্য ত্যক্তনিঃশেষকর্মণঃ।
যোগিনঃ সহজাবস্থা স্বয়মেব প্রজায়তে ॥[৩]

গীতাতেও উক্ত হইয়াছে—

সর্বদ্বারাণি সংযম্য মনোহৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্।
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্।[৪]

অর্থাৎ সকল ইন্দ্রিয়-দ্বার সংযত করিয়া মনকে হৃদয়ে নিরুদ্ধ করিয়া যোগধারণার আশ্রয়ে প্রাণসকলকে মস্তকে স্থাপন করিয়া একাক্ষর শব্দ ব্রহ্ম ওঁকার উচ্চারণ করিতে করিতে ও ভগবানকে স্মরণ করিতে করিতে যে দেহত্যাগ করিয়া প্রয়াণ করে, সে পরম গতি লাভ করিয়া থাকে।

তপসঃ প্রাপ্যতে সত্ত্বং সত্ত্বাৎ সংপ্রাপ্যতে মনঃ।
মনসঃ প্রাপ্যতে হ্যাত্মা-যমাপ্য না নিবর্ত্ততে।

(মৈত্রায়ণ্যুপনিষৎ ৪।৩)

অতএব বুঝা গেল মন-বুদ্ধির সহিত দেহেন্দ্রিয়কে ব্যাপার-শূন্য করাই পরাগতি লাভের মুখ্য সাধন।

যোগানুষ্ঠানদ্বারা কায়, মন ও প্রাণের সর্ব্বকর্ম্ম নিঃশেষে পরিত্যক্ত হইলে কিরূপে সহজাবস্থা-লাভ হয় তাহা এক্ষণে সংক্ষেপতঃ বর্ণিত হইতেছে। আসনদ্বারা দেহ স্থির ও কুম্ভক মুদ্রাদির দ্বারা সর্ব্বেন্দ্রিয়-দ্বার অর্গলবদ্ধ হইলে ইন্দ্রিয়সকল প্রত্যাহৃত হয় এবং বিভিন্ন নাড়ীতে সঞ্চরণশীল বায়ু বা প্রাণশক্তিসকল একমাত্র প্রাণরূপে পরিণত হইয়া নাড়ী-সামরস্য সম্পাদন করে। তৎপরে ধারণা-ধ্যান-সমাধিরূপ অন্তরঙ্গ সাধনদ্বারা নিষ্কম্পতা লাভানন্তর নৈষ্কর্ম্য-প্রাপ্তি হয়। অর্থাৎ আসনাদি

১। কঠ. উপ. ২।৩।১০
২। মৈত্রায়ণ্যুপনিষদ্ ৪।৭
৩। হ. যো. প্র. ৪।১১
৪। গীতা ৮।১২, ১৩

দ্বারা কায়িক ব্যাপার পরিত্যক্ত হইলে প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার-সহ মন ও বুদ্ধি সক্রিয় থাকে, এবং প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধিদ্বারা প্রাণেন্দ্রিয়-সহ মানসিক ব্যাপার নিবৃত্ত হইয়া ঐ ব্যাপার বুদ্ধিতে থাকে। অনন্তর পরম বৈরাগ্য দ্বারা বুদ্ধি-ব্যাপার নিবৃত্ত হইলে নির্ব্বিকার স্বরূপে অবস্থিতি হয়, ইহাই সহজাবস্থা।[১]

'নৈরুত্থ্যের স্বরূপ'—চাঞ্চল্যের একান্ত ও অত্যন্ত নিবৃত্তি, সম্যক্ চিত্তবিশ্রান্তি ও স্বস্বমধ্যে নিমগ্নতাই নিরুত্থান।[২] বাসনা বা আশয় ও ফলাকাঙ্ক্ষা হইতেই চাঞ্চল্যের উদ্ভব। সেইজন্য নৈরুত্থ্য লাভ করিতে হইলে প্রথমতঃ "স্বস্বাশয় প্রলয় কর্ম্ম মুখানুসন্ধি আবেশের" প্রয়োজন অর্থাৎ নিখিল বাসনার উন্মূলনকারী ভাবনারূপ ক্রিয়ার প্রয়োজন এবং সাধনজ সমস্ত সিদ্ধিফলের পরিহার একান্ত কর্ত্তব্য, "স্বসিদ্ধিফলবর্গম্ অপাস্য লব্ধনৈরুত্থ্য"।[৩] বাসনার উন্মূলনকারী ভাবনা বা চিত্ত-লয়কারী ক্রিয়া ও সিদ্ধিফলের ত্যাগ হইতে সর্ব্ববৃত্তির নিরোধক নিষ্কম্পতা বা স্থৈর্য্যের আবির্ভাব হয় "ভবতি কশ্চন তত্র নৈজঃ"। উক্ত নিষ্কম্পতা লব্ধ হইলে বা এজঃ অর্থাৎ চাঞ্চল্য দূর হইলে নিজাবেশ বা আত্মস্বরূপ-বোধের উদয় হয়। আত্মবোধের দৃঢ়তা হইতে নিবিড়তম নৈরুত্থ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন এক সর্ব্বব্যাপী নিত্য (বিতত ও সতত) আনন্দ-অবস্থার স্ফুরণ হইতে জ্ঞানৈকরস অমলসুখ চমৎকার প্রাপক স্বপ্রকাশ-বোধের উদয় হয় এবং সমস্ত ভেদজ্ঞান তিরোহিত হয়; ইহাই ভেদ-বিরহ।

এই বোধের সম্যক্ উদয় হইতে অপার অভিন্ন চৈতন্যভাসক পরম-পদ অধিগত হয় এবং যোগীর নিজ পিণ্ডেরও সংবেদন হয়।[৪] পরম-পদের সহিত নিজ পিণ্ডের তথা নিখিলপিণ্ডের অভিন্নত্ব-বোধ সুপ্রতিষ্ঠিত করাই সমরস-ক্রিয়া। পরম-পদের সহিত প্রাথমিক ঐক্য-বিধানের পর নিজ-পিণ্ড-পরীক্ষণ-রূপ যে স্বস্বরূপ কিরণানন্দের উন্মেষ হয় তাহার প্রত্যাহরণই সমরসক্রিয়া।[৫] এই উন্মেষ বিশ্ব বা বিকল্প হইতে নিজ নির্ব্বিকল্পস্বরূপের ভেদরূপ।[৬] এই উন্মেষের প্রত্যাহরণ বা বিকল্প হইতে নিজ নির্ব্বিকল্পস্বরূপের ভেদবোধের তিরোধান-রূপ

১। হ. যো. প্র ৪।১০, ১১

২। সি. সি. প. ৫।৮২

৩। সি. সি. স. ৫।৯, ১০

৪। সি. সি. স. ৫।১০, ১১, ১২

৫। সি. সি. স. ৫।১৩, ১৪ ; সি. সি. প. ৫।১১

৬। "মৃত্যুবিজ্ঞান ও পরমপদ" প্রবন্ধ, ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ, ভারতবর্ষ, ফাল্গুন ১৩৪৭, পৃ ৩১০

সমরস-ক্রিয়া দ্বারা যোগী আপন শক্তিপুঞ্জকে স্বীয় স্বাতন্ত্র্যশক্তির মহিমা-রূপে অনুভব করিয়া ("নিজ-কিরণ-পুঞ্জং নিজতয়া প্রপশ্যন্তঃ") তাহা হইতে নিখিলান্তর্ব্বর্ত্তী শক্তিসমূহের অনুসন্ধানপূর্ব্বক নিখিলকে স্বরূপে অঙ্গীকৃত করেন।[১] এই অঙ্গীকারের ফলে যোগী আপনাকে বিশ্বময় ও বিশ্বোত্তীর্ণ জানিয়া কৃতার্থ হন।

জীব নানাশক্তির সংঘাত, একই শক্তি ঊর্দ্ধ, মধ্য ও অধঃ-শক্তিরূপে জীবে ত্রিধা অধিষ্ঠিতা। অধঃশক্তির সঙ্কোচন অর্থাৎ বাহ্যেন্দ্রিয়-ব্যাপার হইতে মন-ইন্দ্রিয়াদির প্রত্যাহরণ, মধ্যশক্তির প্রবোধন বা প্রত্যক্-চেতনের স্বরূপাগম এবং ঊর্দ্ধশক্তির নিপাতন বা পরমতত্ত্বের নিজাশক্তির অবতরণরূপ কৃপার দ্বারা পরমপদ-লাভ হয়। ইহাই নিজাশক্তিসহ অনামা বা পূর্ণব্রহ্মরূপে স্থিতি, ইহাই সামরস্য।[২]

"সমরসীকরণের প্রাথমিক অবস্থায় আত্মা বিশ্বকে অতিক্রম করিয়া স্বীয় নির্ব্বিকল্প-পদে স্থিতিলাভ করে। পরে ভগবানের পরমাশক্তির অনুগ্রহে নিজ পূর্ণত্ব অনুভব করে। তখন বুঝিতে পারে ঐ পূর্ণ সামরস্য-ময় স্বরূপে একদিকে যেমন অনন্ত শক্তির সামরস্য, অপরদিকে তেমনি শক্তি ও শক্তিমানের সামরস্য। উহাতে বিশ্ব ও বিশ্বাতীত এক অখণ্ড বোধ বা প্রকাশরূপেই স্ফুরিত হয়। বন্ধন ও মোক্ষের ভেদ, সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্পের ভেদ, মন ও আত্মার ভেদ, এবং দৃশ্য ও দ্রষ্টার ভেদ চিরতরে বিগলিত হইয়া যায়। ঐ অবস্থাতীত অবস্থার উপলব্ধি করাই পরাগতি।[৩] উহাই সামরস্যাত্মক পরম-পদ। সামরস্যই পূর্ণ সত্যের স্বরূপ। এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রীনিত্যনাথ, সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতিতে বলিয়াছেন, "স্বয়ং জ্যোতিঃ সত্যমেকং জয়তি তব পদং সচ্চিদানন্দমূর্ত্তে"।[৪]

১। সি. সি স. ৫।১৪
২। অমরৌঘশাসনম্ (গোরক্ষনাথকৃত)—১ম শ্লোক
৩। "মৃত্যুবিজ্ঞান ও পরমপদ" প্রবন্ধ, ম. ম গোপীনাথ কবিরাজ, ভারতবর্ষ, ফাল্গুন, ১৩৪৭, পৃ. ৩১২
৪। গো. সি. স. পৃ ১১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পিণ্ডতত্ত্ব

নাথগণ বলেন সত্যবিচারে পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি বলিয়া কিছু নাই। তথাপি লোক-প্রতীতির অনুরোধে লয়োৎপত্তির বিষয় আলোচনা করিতে হয়।[১] একাকার অথচ অনন্তশক্তিমান পরমেশ্বর নিজ আনন্দস্বরূপে অবস্থিত থাকিয়াও বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ডের নানাকারে বিলসনপূর্ব্বক স্বয়ং স্বপ্রতিষ্ঠারূঢ় হন, ব্যবহার-দৃষ্টিতে এইরূপই উপলব্ধি হয়।[২] কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বাকাররূপে স্ফুরিত হইয়াও অলুপ্ত শক্তিমান পরমশিব নিত্যকালই আপন পূর্ণস্বরূপে অবশিষ্ট থাকেন, অর্থাৎ বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড নানারূপে তাহা হইতে প্রসৃত হইলেও তিনি পূর্ণই থাকেন।

শ্রুতিও বলেন—

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥[৩]

ওঁ উহা অর্থাৎ পরব্রহ্ম পূর্ণ, ইহাও অর্থাৎ নামরূপস্থ ব্রহ্মও পূর্ণ, পূর্ণ হইতে পূর্ণ উদ্গত হন, পূর্ণের অর্থাৎ কার্য্যব্রহ্মের পূর্ণত্ব গ্রহণ করিলে পূর্ণই মাত্র অর্থাৎ পরব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন।

সুতরাং ব্যবহার-দৃষ্টিতে ব্রহ্মাণ্ড ভাবের উপরম হইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই অব্যক্তস্বরূপ অনামা পরব্রহ্ম। সেখানে কার্য্য নাই, কারণ নাই, কুলাকুল নাই, স্বয়ং কর্তৃভাবও নাই।[৪] উহা স্বয়ংপূর্ণ অনাদিসিদ্ধ অখণ্ড একস্বরূপ লয়োৎপত্তিহীন পরমতত্ত্ব।[৫] এই পরমতত্ত্ব হইতেই চরাচর ব্রহ্মাণ্ড প্রসৃত হয়, এবং তাহাতেই লীন হয়। কিন্তু যাহা কার্য্য-কারণ-কর্তৃত্বহীন তাহা হইতে কিরূপে কার্য্যাত্মক ব্রহ্মাণ্ড উদ্ভূত হয়? তদুত্তরে নাথগণ বলেন, সেই অনাদিসিদ্ধ স্বয়ংপূর্ণ অনামা পরমতত্ত্বে ধর্ম্মাধর্ম্মিণী ইচ্ছামাত্র নিজাশক্তি অবিনাভবী রূপে চিরবিদ্যমান।[৬] সেই নিজাশক্তি হইতেই তাঁহার স্বয়ংকর্তৃত্বের আবির্ভাব হয়, তৈত্তিরীয় উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—

১। সি সি. প. ১।২
২। সি সি. প. ৪।১২
৩। ঈশোপঃ শান্তিপাঠ
৪। সি. সি. প ১।৪, সি. সি. স ১।৪
৫। সি. সি. প ১।৫
৬। সি. সি. প. ১।৫, সি. সি. স. ১।৫

অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত

তদাত্মানং স্বয়মকুরুত। তস্মাত্তৎ সুকৃতমুচ্যতে।[১]

অর্থাৎ এই অভিব্যক্ত জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বে অব্যাকৃত নামরূপ ব্রহ্মই ছিলেন। সেই অসৎশব্দবাচ্য ব্রহ্ম হইতেই ব্যাকৃত জগৎ উৎপন্ন হইল। তিনি নিজেই নিজেকে এইরূপ করিয়াছিলেন, সেইজন্য তাঁহাকে সুকৃত বা স্বয়ংকর্ত্তা বলা হয়। স্বয়ংকর্ত্তৃত্বের কারণভূতা নিজাশক্তির প্রসর হইতেই ক্রমশঃ অব্যক্ত পরমব্রহ্ম হইতে ব্যক্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উদ্ভূত হয়।[২] অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত বাহ্য স্থূলরূপের অভিব্যক্তি পর্য্যন্ত যে যে স্তর বা ক্রম আবির্ভূত হয় তাহাদের প্রত্যেকটীকে পিণ্ড বলা হয়। এইরূপ ষট্পিণ্ডের দ্বারা চরাচর সংসিদ্ধ হইয়াছে।

অনামার বা অব্যক্তের নিজাশক্তি হইতে প্রথম উন্মুখতারূপ পরাশক্তি, তৎপরে পরাশক্তি হইতে স্পন্দনমাত্র অপরাশক্তি, অপরাশক্তি হইতে সূক্ষ্ম অহন্তারূপ সূক্ষ্মাশক্তি, এবং সূক্ষ্মাশক্তি হইতে বেদনশীলা কুণ্ডলিনীশক্তি উদ্ভূতা হন।[৩]

সহজাবস্থায় অনামায় অন্তর্লীন নিজ, পরা, অপরা, সূক্ষ্মা ও কুণ্ডলিনীশক্তির প্রত্যেকটীতে পাঁচটী করিয়া গুণ বিদ্যমান আছে। নিজাদি পঞ্চশক্তির পঞ্চবিংশতি গুণকে আশ্রয় করিয়া বিশ্বোৎপত্তির প্রথম পর্ব্বরূপ পরপিণ্ড উদ্ভূত হয়।

নিজাপরাঽপরা সূক্ষ্মা কুণ্ডলিন্যাসু পঞ্চধা।

শক্তিচক্রমেণোত্থো জাতঃ পিণ্ডঃ পরঃ শিবে ॥[৪]

পরপিণ্ড হইতে অপরংপর, পরমপদ, শূন্য, নিরঞ্জন ও পরমাত্মা রূপ পঞ্চতত্ত্বাত্মক অনাদিপিণ্ড সমুৎপন্ন হয়। অপরংপর তত্ত্ব হইতে স্ফুরতামাত্র, পরমপদ হইতে ভাবনামাত্র, শূন্য হইতে স্বসত্তামাত্র, নিরঞ্জন হইতে স্বসাক্ষাৎকারমাত্র, পরমাত্মপদ হইতে পরমাত্মা-ভাবের আবির্ভাব হয়। অপরংপরাদি পঞ্চতত্ত্বের প্রত্যেকটীরও পাঁচটী করিয়া গুণ আছে।[৫]

অনাদি পিণ্ড হইতে পরমানন্দ, পরমানন্দ হইতে প্রবোধ, প্রবোধ

১। তৈত্তি, উপঃ ২।৭

২। শক্তিপ্রসরসঙ্কোচৌ জগতঃ সৃষ্টিসংহৃতী, সি. সি স ৪।২৪ ; সি. সি. প ৪।২০

৩। সি. সি স. ১।৫, ৬ ; সি সি. প. ১।৬,৮

৪। সি. সি. প. ১।১৬ ; সি. সি. স ১।১২ শক্তিপঞ্চকসম্ভূত পঞ্চবিংশতিসংশ্রয়াৎ।
পরপিণ্ডসমুৎপত্তিঃ সিদ্ধান্তজ্ঞৈঃ সমীরিতা ॥

৫। সি. সি. প ১।২৪, সি, সি, স ১।১৪-২০

হইতে চিদ্‌উদয়, চিদ্‌উদয় হইতে প্রকাশ, প্রকাশ হইতে সোঽহম্‌ভাবের আবির্ভাব হয়। পরমানন্দাদি পঞ্চতত্ত্ব ও তাহাদের প্রত্যেকের পাঁচটী করিয়া, সাকুল্যে পঞ্চবিংশতি গুণ লইয়া আদ্যপিণ্ড গঠিত।[১]

পর, অনাদি ও আদ্যপিণ্ড নিরাকার স্বরূপ। আদ্যপিণ্ডই সাকার সৃষ্টির বীজস্বরূপ। আদ্যপিণ্ড হইতে প্রথমে মহাকাশ, মহাকাশ হইতে মহাবায়ু, মহাবায়ু হইতে মহাতেজ, মহাতেজ হইতে মহাসলিল এবং মহাসলিল হইতে মহাপৃথ্বী আবির্ভূত হয়। তৈত্তিরীয় উপনিষদের দ্বিতীয় ব্রহ্মানন্দবল্ল্যধ্যায়ে আছে (২।১।৩)—

তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ।
বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। পৃথিব্যা ওষধয়ঃ।
ওষধীভ্যোঽন্নম্। অন্নাৎ পুরুষঃ।

অর্থাৎ প্রথমে ব্রহ্ম হইতে আকাশ, তৎপরে আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে অপ্, অপ্ হইতে পৃথিবী, এইরূপে পঞ্চভূতের উৎপত্তি হয়। ইহাদেরও পাঁচ পাঁচ করিয়া গুণ আছে। পঞ্চমহাভূত ও তাহাদের পঞ্চবিংশতি গুণই সাকার বা মহাসাকার পিণ্ড।[২] মহাসাকার পিণ্ডের মিলিত ভাবই শিব।

শিব হইতে ভৈরব, ভৈরব হইতে শ্রীকণ্ঠ, শ্রীকণ্ঠ হইতে সদাশিব, সদাশিব হইতে ঈশ্বর, ঈশ্বর হইতে রুদ্র, রুদ্র হইতে বিষ্ণু, বিষ্ণু হইতে ব্রহ্মা, এই পর্য্যায়ক্রমে মহাসাকার পিণ্ডের অষ্টমূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়াছে।[৩]

"স এব শিবঃ শিবাদ্ ভৈরবো ভৈরবাৎ শ্রীকণ্ঠঃ শ্রীকণ্ঠাৎ সদাশিবঃ সদাশিবাদ্ ঈশ্বরঃ ঈশ্বরাদ্ রুদ্রো রুদ্রাদ্ বিষ্ণু র্বিষ্ণোর্ব্রহ্মেতি মহাসাকার-পিণ্ডস্য মূর্ত্ত্যষ্টকম্।"

অষ্টমূর্ত্ত্যাত্মক শিবের অন্যতর মূর্ত্তি ব্রহ্মার দৃষ্টি বা অবলোকন হইতে সাকার পিণ্ডের পঞ্চভূত বা পঞ্চবিংশতি গুণের সমাবেশে নবনারীরূপ—অর্থাৎ জীবভূত—প্রকৃতিপিণ্ডের উৎপত্তি হয়। পঞ্চপঞ্চাত্মক জীবশরীরই প্রকৃতিপিণ্ড। জীবশরীরে অস্থিমাংসাদি পঞ্চভূম্যংশ, শোণিতাদি পঞ্চ-অপ্ অংশ, ক্ষুত্তৃষ্ণাদি পঞ্চতেজ অংশ, ধাবন-চলনাদি পঞ্চবায়ু অংশ এবং রাগদ্বেষাদি পঞ্চনভঃ অংশ সমাবিষ্ট। তজ্জন্য ইহা পঞ্চবিংশতি গুণযুক্ত

১। সি সি. প ১।৩০, সি সি স ১।২১-২৮
২। সি সি প. ২।৩১-৩৫; সি. সি স. ১।২৯ ৩৪
৩। সি সি প ১।৩৬; সি. সি. স. ১।৩৫, ৩৬

ভূতসমূহের পিণ্ড ভূতানাং পিণ্ড—বলিয়া অভিধেয়। প্রকৃতিপিণ্ডকে অবলোকনপিণ্ডও বলা হয়।[১]

"প্রাকৃত পিণ্ডে স্যুঃ পঞ্চভূতানি তদ্‌গুণাঃ"।[২]

নাথগণের দৃষ্টি অনুসারে জীব পঞ্চ অন্তঃকরণ বিশিষ্ট। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত ও চৈতন্য সেই পঞ্চ অন্তঃকরণ। প্রত্যেক অন্তঃকরণেরও পাঁচটী করিয়া গুণ আছে।[৩]

অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত প্রসৃত হইয়াছে। ব্যক্তও অব্যক্তে বিশ্রান্তি লাভ করে। যাহা ব্যক্ত তাহাই কুল, আর তাহার যাহা নিমিত্ত তাহাই অকুল। অকুলতা অব্যক্ত, কিন্তু তাহা অনামা হইতে ভিন্ন। অব্যক্ত অনামায় সর্ব্বপ্রকার কারণ ভাবের উন্মেষহীনতা; কিন্তু অব্যক্ত অকুলে কারণতা অর্থাৎ নিমিত্তত্ব ভাবের উন্মেষ আছে। অকুলরূপ নিমিত্ত বা কারণ হইতেই কুলরূপ ব্যক্ত কার্য্যের উদ্ভব। সেইজন্য নাথগণ বলেন—

অকুলং কুলমাধত্তে কুলং চাকুলমিচ্ছতি।
জলবুদ্‌বুদ্‌বন্ ন্যায়াদেকাকারঃ পরঃ শিব॥

অর্থাৎ অকুলই কুলকে ধারণ করিয়া আছে এবং কুল অকুলকেই আকাঙ্ক্ষা করে। জাতিবর্ণগোত্রাদিযুক্ত অখিলের যাহা নিমিত্ত তাহাই অকুল।[৫] জাতিবর্ণগোত্রাদিযুক্ত কুল পঞ্চাত্মক। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, কাল ও জীব এই পঞ্চের নাম কুলপঞ্চক। ইহাদেরও প্রত্যেকটীর পাঁচটী করিয়া গুণ আছে।[৬] তন্মধ্যে জীবের জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, তুরীয় ও তুরীয়াতীত এই পঞ্চ অবস্থাই তাহার পাঁচগুণ।[৭] সেইরূপ যে পঞ্চশক্তিকে লইয়া জীবের ব্যক্তিত্ব সেই বাসনাদি পঞ্চগুণযুক্ত ইচ্ছাশক্তি, স্বকুলাচারাদি পঞ্চগুণযুক্ত ক্রিয়াশক্তি, মদাদি পঞ্চগুণযুক্ত মায়াশক্তি, আকাঙ্ক্ষাদি পঞ্চগুণযুক্ত প্রকৃতিশক্তি এবং পরা পশ্যন্তী মধ্যমা বৈখরী ও ইষ্টমাতৃকারূপ বাক্‌শক্তিকে ব্যক্তিপঞ্চক আখ্যা দেওয়া হয়।[৮]

কাম কর্ম্ম চন্দ্র সূর্য্য ও অগ্নি এই পাঁচটীকে লইয়া ব্যক্ত ব্রহ্মাণ্ড বা প্রপঞ্চ গোচরীভূত রহিয়াছে ও সেইহেতু নাথদর্শনে এই পাঁচটী প্রত্যক্ষকরণ-পঞ্চক বা প্রত্যক্ষকৃতিহেতু নামে অভিহিত হয়। কামের পঞ্চগুণ, কর্ম্মের

১। সি. সি. প. ১।৩৮-৪৩; সি. সি স ১।৩৭-৪০
২। সি. সি. প. ১।৪১
৩। সি. সি. প. ১।৪৪-৪৯
৪। সি. সি. প. ৪।১১
৫। সি. সি. স. ৪।১০
৬। সি. সি প. ১।৫০; সি. সি. স. ১।৪৬
৭। সি. সি. প. ১।৫৫; সি. সি স. ১।৪৯
৮। সি. সি. প. ১।৫৬-৬১; সি. সি. স. ১।৫০-৫৩

পঞ্চগুণ, চন্দ্রের ষোড়শকলা, সূর্য্যের দ্বাদশকলা, এবং অগ্নির দশকলা প্রসিদ্ধ। এতদতিরিক্ত চন্দ্রের নিবৃত্তি বা অমৃতকলা, সূর্য্যের প্রকাশিকা বা নিজকলা ও অগ্নির পরাজ্যোতি নামে আরও এক একটী কলা আছে।[১]

কাম বা কামনা বা সংস্কার হইতে কর্ম্মের উদ্ভব, চন্দ্রসূর্য্যরূপ কালের বা ইড়াপিঙ্গলাবাহী প্রাণশক্তির আশ্রয়ে এবং অগ্নিরূপ শক্তির সহায়ে কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়। কাম ও কর্ম্ম নিবৃত্ত হইলে চন্দ্রের অমৃতকলা, সূর্য্যের প্রকাশিকা কলা এবং অগ্নির পরাজ্যোতিকলা যখন আপন আপন তেজ বর্ষণ করে তখন প্রপঞ্চত্ব নিবৃত্ত হয়। এইরূপে প্রত্যক্ষের যাহা কৃতিহেতু তাহাই প্রত্যক্ষের নিবৃত্তিহেতু।

মাতৃকুক্ষিতে জীব যে দেহ প্রাপ্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করে তাহার নাম গর্ভপিণ্ড।

অব্যক্ত অনির্দ্দেশ্য অনামা পরব্রহ্ম বা পরতত্ত্বের নিজাশক্তির প্রসর হইতে ক্রমশঃ অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত, নিরাকার হইতে সাকার, সূক্ষ্ম হইতে স্থূল ব্রহ্মাণ্ড প্রসৃত হইয়াছে। এই প্রসর বা আবির্ভাবে এক একটী স্তর বা পর্য্যায়ই এক একটী পিণ্ড। ষট্‌পিণ্ডের আনুক্রমিক আবির্ভাব এই অধ্যায়ের শেষে একটী চিত্রে সজ্জিত করিয়া দেখান হইতেছে।

পরমকারণ পরমেশ্বর হইতে কিরূপে স্থূলদেহবিশিষ্ট মনুষ্য ভ্রূণের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার একটি বিবরণ উল্লিখিত পর্য্যায় বা ক্রমবিভাগে দেখান হইয়াছে। স্থূলতম ভ্রূণ দেহ হইতে বিলোমক্রমে উত্তরোত্তর ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর কারণে পৌঁছিয়া সর্ব্বশেষে সর্ব্বকারণের মূল পরমকারণ পরমতত্ত্বে উপনীত হওয়া যায়। সেই পরমকারণ কিরূপে স্থূল জড় দেহবিশিষ্ট হইয়াছেন পিণ্ডসমূহের পরম্পরাক্রমে আবির্ভাব হইতে তাহাই বুঝান হইয়াছে। এই পিণ্ডতত্ত্বের আলোচনা হইতে নাথগণের সাধনের আদর্শ ও উপায় বুঝিতে পারা যায়।

সন্তকবিরা সত্যপুরুষ হইতে ষট্‌পিণ্ডের উদ্ভব কল্পনা করিয়াছেন। প্রথমে সত্যপুরুষ পঞ্চ অণ্ড সৃষ্টি করেন, তাহার দ্বারা পঞ্চব্রহ্ম নির্ণীত হয়। ষষ্ঠ অণ্ডের ব্রহ্ম হইলেন নিরঞ্জন, তিনি জ্যোতি বা মায়ার সাহায্যে বিশ্ব সৃষ্টি করেন। এই মায়া অনাদি। ব্রহ্ম হইতে প্রথমে আকাশ, তৎপরে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে অপ্, অপ্ হইতে পৃথিবী এই পঞ্চ তত্ত্বের উদ্ভব হয়, তাহা হইতেই বিশ্বের সৃষ্টি।

১। সি. সি. প. ১।৬২-৬৭; সি. সি. স. ১।৫৪-৬১

সত্যপুরুষের ও নিরঞ্জনের মধ্যে সহজ, ওঁকার, ইচ্ছা, সোঽহং, অচিন্ত্য ও অক্ষর এই ষট্‌পুরুষের বর্ণনা করা হইয়াছে, ইহাদের আবাসস্থল নির্ণয়ের জন্য উক্ত পিণ্ডসৃষ্টির কল্পনা।

নানক পঞ্চস্বর্গের বর্ণনা করিয়াছেন, সচ্চখণ্ডকে তিনি সর্ব্বোচ্চ স্বর্গ বলিয়াছেন, তাহার নিম্নে ধরমখণ্ড, সরমখণ্ড, জ্ঞানখণ্ড ও করমখণ্ড কল্পনা করিয়াছেন। ধরমখণ্ডে আচারনিষ্ঠ ধার্ম্মিকদের বাস, সরমখণ্ডে চৈতন্যাদির ন্যায় সাধকদের বাস, জ্ঞানখণ্ডে কৃষ্ণাদির ন্যায় জ্ঞানীর বাস, করমখণ্ডে রামাদির ন্যায় কর্ম্মীদের বাস, সর্ব্বোচ্চ সচ্চখণ্ড হিন্দুর সত্যলোকের বা বৌদ্ধের নির্ব্বাণ অবস্থার অনুরূপ। পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের অতীত, উচ্চ হইতে উচ্চতর হিন্দুর 'পরাৎপর'ই কবীরের 'অনামী পুরুষ' বা শিবদয়ালীর 'রাধাস্বামী'। সত্যপুরুষের উর্দ্ধে অগম ও অলখ পুরুষদ্বয়, তৎপরে রাধাস্বামী। আধুনিক রাধাস্বামী সম্প্রদায়ে—ইঁহারা শিবদয়ালের শিষ্য—নিরঞ্জন বা নির্গুণ পুরুষের উর্দ্ধে ব্রহ্ম, পরব্রহ্ম, সোঽহং পুরুষ, অলখ পুরুষ, অগম পুরুষ ও অনামী পুরুষের বর্ণনা আছে। ইঁহাদেরও উচ্চে রাধাস্বামী। এইরূপে উর্দ্ধে, তদূর্দ্ধে, তাহারও উর্দ্ধে ইত্যাদি কল্পনা করিলে রাধাস্বামীরও উর্দ্ধে 'ঈশ্বর' বিরাজ করেন এইরূপ কল্পনা করা যায় —কিন্তু ইহা সম্ভবপর নহে। কোন একস্থানে পূর্ণচ্ছেদ দেওয়া অবশ্যম্ভাবী। অতএব সগুণ নির্গুণের অতীতে অসীম সত্তা বিরাজমান, এই পর্য্যন্ত বলাই সঙ্গত।[১] নাথপন্থীর 'নাথ' বা 'পরমপদ' এই সগুণ ও নির্গুণের অতীত, ইহা পরমপদ অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পরম-সত্তার ভেদাভেদ নির্ণয় করিতে গেলে রূপান্তরিত হইতে হইতে তাহার সত্তা বিলোপ হইবার অবস্থা হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী সন্তরা নিরঞ্জন, অগম, অলখ, অনামী, সত্য ইত্যাদি শব্দ এক ঈশ্বরেরই প্রতিশব্দরূপে ব্যবহার করিয়াছেন।

জীবেরই মুক্তির প্রয়োজন। মুক্তি সাধনাসাধ্য। সুতরং মুক্তি লাভ করিতে হইলে, জীবের প্রকৃতি কি, জীবের স্বরূপ কি, তাহা স্থির করিয়া মুক্তির উপায়ভূত সাধনের নির্দ্ধারণ করিতে হয়। গর্ভপিণ্ডে ভ্রূণরূপে জীবের স্থূলজগতে আবির্ভাব। ভ্রূণ পিতামাতা হইতে জাত। পিতা-মাতা ও সন্তান সকলেই শরীরবিশিষ্ট। শরীরী জীব দেহ এবং মন,

১। 'নির্গুণ সম্প্রদায়', বড়থ্বল, পৃঃ ৩০, ৫০, ১১৭

বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত ও চৈতন্য এই পঞ্চ অন্তঃকরণযুক্ত। দেহ পঞ্চভূতের সম্মেলনে উদ্ভূত। জীব নামক ব্যক্তির পঞ্চ শক্তি আছে—ইচ্ছা, ক্রিয়া, মায়া, প্রকৃতি ও বাক্ এবং জীবের ব্যাপ্ত থাকিবার কারণ কাম, কর্ম্ম, চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি।

এই সমস্ত তত্ত্ব আলোচনাপূর্ব্বক সাধনের উপায় স্থির করিতে হয়। স্থূল ও সূক্ষ্ম নানা আবরণে জীব আবৃত। এই সমস্ত আবরণই শক্তির নানা রূপ। সেই সমস্ত শক্তির পরিশুদ্ধি ও আবরণ অপসারণের দ্বারা জীব স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে, ইহাই নাথগণের পিণ্ডতত্ত্ব আলোচনার উদ্দেশ্য।

ষট্‌পিণ্ডের আবির্ভাব

মহাসাকার পিণ্ড হইতে

পঞ্চ-পঞ্চাত্মক প্রকৃতিপিণ্ড নরনারীরূপ শরীর	ব্রহ্মার অবলোকন হইতে

গর্ভপিণ্ড

ভ্রূণ
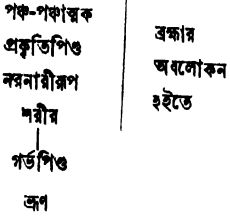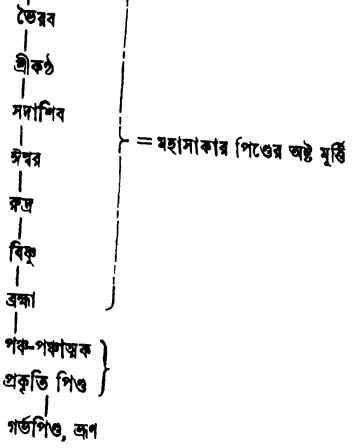
তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পিণ্ডাধার

অব্যক্ত পরমতত্ত্ব প্রকাশোন্মুখ হইলে পর্য্যায়ক্রমে যে যে অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া শেষ পর্য্যন্ত জড় চৈতন্যাত্মক জীবদেহের উৎপত্তি সাধিত হয় তাহার প্রত্যেকটী অবস্থা বা স্তরকে নাথদর্শনে পিণ্ড নামে অভিহিত করা হয়। নরনারীরূপ জীবশরীরও পিণ্ড শব্দের অভিধেয়। পিণ্ডসমূহ উৎপন্ন বা সৃষ্ট পদার্থ। সৃষ্টি এক প্রকার ক্রিয়া। ক্রিয়ার যাহা ফল তাহাই কার্য্য। কার্য্য থাকিলেই তাহার কর্ত্তা ও কারণ থাকিবে এবং সকল কার্য্যই শক্তিসাধ্য। সর্ব্বশক্তির প্রসর ও সংকোচের দ্বারাই জগতের সৃষ্টি ও সংহার সাধিত হয়।[১] প্রসরই সৃষ্টি ও সংকোচনই সংহার। অতএব অনন্তশক্তির যাহা শক্তিমান সেই পরাৎপর শিবই জগদাকারে স্ফুরিত হইতে সক্ষম।[২] কিন্তু শক্তি ব্যতিরেকে শক্তিমান অগ্রাহ্য। শক্তিহীন শিব ও শিবহীন শক্তি অকল্পনীয়। শিব ও শক্তি চন্দ্র ও চন্দ্রিকার ন্যায় এক ও অভিন্ন।

শিবস্যাভ্যন্তরে শক্তিঃ শক্তেরভ্যন্তরে শিবঃ।
অন্তরং নৈব জানীয়াচ্চন্দ্রচন্দ্রিকয়োরিব ॥[৩]

সে কারণ পরমশিবের সংবিৎস্বরূপা নিত্যপ্রবুদ্ধা পরাপর বিমর্শ-রূপিণী অপরংপরা নিজাশক্তিই নানা শক্তিরূপে কার্য্যাত্মক নিখিলপিণ্ডের জনয়িত্রী মূলসত্তা, চরম আশ্রয় বা আধার।[৪] তন্তু যেমন নানাসূত্ররূপে পটের আশ্রয়, শক্তিও তেমনি নানারূপে নিখিলপিণ্ডের আশ্রয়।[৫] বস্ত্র যেরূপ তন্তুরূপ উপাদানে প্রতিষ্ঠিত, নিখিলপিণ্ডও সেইরূপ শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত। নিমিত্ত শক্তিই উপাদান। এতদ্রূপ নিখিলপিণ্ডের চরম আধার বা আশ্রয় বলিয়াই নিত্যপ্রবুদ্ধা অপরংপরা নিজাশক্তির নাম পিণ্ডাধার।[৬]

নানাশক্তিস্বরূপেণ সর্ব্বপিণ্ডাশ্রয়াত্ততঃ।
পিণ্ডাধার ইতীষ্টাখ্যা সিদ্ধান্ত ইতি ধীমতাম্ ॥[৭]

১। সি সি. প. ৪।২০, সি সি. স. ৪।২৪
২। সি. সি. প. ৪।১৩, সি সি. প. ৪।২৬
৩। সি. সি স ৪।৩৭
৪। সি. সি. প ৪।১, ২৯, সি. সি. স ৪।১
৫। সি. সি স. ৪।৩
৬। সি সি. প. ৪।১, ২৯
৭। সি. সি. স. ৪।৩৮

পিণ্ড সম্পর্কে অপরংপরা নিজাশক্তির ত্রিবিধ অবস্থা লক্ষিত হয়। প্রথম, সৃষ্ট্যাত্মক প্রসর ও সংহারাত্মক সংকোচ। এতদুভয়েরই আদি ও অন্তরূপ পরম সাম্যাবস্থা, যখন শক্তি, বিমর্শের উপসংহারে, সহজতঃ আপনাতে উন্মীলিত নিরুত্থান দশায় আত্মলীনা থাকে। ইহাই শিব ভাব বা শক্তির উপাধিহীন নিষ্ক্রিয় পরমাবস্থা। দ্বিতীয়, পিণ্ডের প্রাকট্যাবস্থায় কার্য্য, কারণ ও কর্তৃভাবের অঙ্কুরবৎ উত্থানদশায় উন্মীলনকারিণী আধারশক্তিরূপা অবস্থা। তৃতীয়, প্রকটিত বিশ্বের বা শাস্ত্র ও লৌকিক দৃষ্টির (দৃষ্টানুশ্রবিক) যাবতীয় সাক্ষাৎকারের (ভাবের) সাক্ষিণী মাত্র, অত্যন্ত স্বপ্রকাশ স্বসংবেদ্য অনুভবমাত্রগম্যা চিদ্‌রূপা অবস্থা।[১]

শিবভাবই সামরস্যের নিজভূমি এবং কুলাকুলের স্বরূপ।[২] শিবস্বরূপে কুল ও অকুল দুই শক্তি নিহিত। জাতিবর্ণগোত্রাদিযুক্ত অখিল বিশ্বের যাহা একমাত্র নিমিত্ত তাহাই অকুল,[৩] এবং বিশ্বই কুল। অকুলই কুলকে ধারণ করিয়া আছে, অকুলরূপ নিমিত্ত হইতে কুল উদ্ভূত হয় এবং কুল অকুলেই লীন হয়। জলবুদ্বুদ বিদীর্ণ হইলে যেমন একাকার জল অবশিষ্ট থাকে সেইরূপ কুল অকুলে লীন হইলে একমাত্র শিবই থাকেন।

অকুলং কুলমাধত্তে কুলঞ্চাকুলমিচ্ছতি।
জলবুদ্বুদ্বন্ ন্যায়াদ্ একাকারঃ পরঃ শিবঃ ॥[৪]

অকুল হইতে কুলের উদ্ভব তথা বিশ্বের উদ্ভব এবং পুনরায় অকুলে লীন হওয়া, ইহাই বিমর্শ। বিমর্শরূপা শক্তি কুলরূপে পরা সত্তাদি পঞ্চভাবে বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছে।[৫] যাহা নিরাভাসের আভাসকারিণী, সূর্য্যাদিও যাহার আভায় আভাসিত হয়, সেই প্রকাশ-স্বরূপা শক্তিই পরাশক্তি।[৬] শক্তির যে ভাব দ্বারা অনাদিসিদ্ধ পরম অদ্বৈত অখণ্ড একতত্ত্ব অঙ্গীকৃত হয় তাহাই সত্তা।[৭] অপ্রমেয় অনাদিনিধন স্বভাবানন্দময় অহংভাবের দ্যোতনকারিণী শক্তিই অহন্তা।[৮]

১। সি সি. প. ৪।১
সি. সি. স ৪।৫, ২, ৪
২। সি. সি. প ৪।২ ; সি. সি. স ৪।৬
৩। সি. সি. প. ৪।৯
৪। সি সি. প. ৪।১১
৫। সি. সি. প ৪।৩
সি. সি. স. ৪।৬
৬। সি সি. প. ৪।৪, সি সি. স. ৪।৬, ৭
৭। সি সি. প ৪।৫, সি. সি. স. ৪।৭
৮। সি সি. প. ৪।৯, সি. সি স. ৪।৮

স্ফুরতা শক্তি দ্বারা স্বানুভবগম্য চিৎচমৎকারসুলভ নিরুত্থানদশা প্রস্ফুটিত হয়,[১] এবং পরাকলা শক্তির দ্বারা শুদ্ধ বুদ্ধ-স্বরূপ স্বয়ংপ্রকাশ আত্মতত্ত্ব উপলব্ধ হয়।[২]

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে শিবের শক্তির প্রসরে, চরাচর জগতের উদ্ভবে শিবের স্বরূপচ্যুতি ঘটে কি না? তাঁহার পরিপূর্ণতা ক্ষুণ্ণ হয় কি না? তদুত্তরে বক্তব্য স্বরূপচ্যুতি বা পরিপূর্ণতার লাঘব হয় না। তাহা যদি হইত তাহা হইলে জীবের পক্ষে শিবস্বরূপের উপলব্ধি হইবার কোন সম্ভাবনাই থাকিত না, কারণ যাহা নাই তাহার উপলব্ধি কিরূপে হইবে? অনন্তশক্তিমান্ শিব একাকার হইয়াও আপন আনন্দস্বরূপে অবস্থিত থাকিয়াও নানাকারে বিলসিত হন এবং আপন স্বরূপে সর্ব্বদাই প্রতিষ্ঠিত থাকেন। কারণ এই প্রসর বা বহিঃপ্রেরণ ব্যবহারিক, পারমার্থিক নহে।[৩] সেইজন্যই অনন্তাকারে স্ফুরিত হইয়াও অলুপ্ত শক্তিমান্ শিব স্বস্বরূপে পূর্ণরূপেই অবশিষ্ট থাকেন।[৪] শিবশক্তির সম্বন্ধ বিচারে ইহা সবিশেষ আলোচিত হইবে।

অনন্তশক্তিমান্ পরমেশ্বরই বিশ্বরূপ ও বিশ্বময় হইলেও সাধনার্থ যোগিগণ পরাপরস্বরূপা কুণ্ডলিনী শক্তির অনুশীলন করিয়া থাকেন।[৫] আধারশক্তিরই অপর নাম কুণ্ডলিনী। যোগিগণ অনুভব করেন যে সর্পবৎ কুণ্ডলিতভাবে ইহা প্রপঞ্চকে ধারণ করিয়া আছে। কুণ্ডলিনীই পিণ্ডসংসিদ্ধিকারিণী।[৬]

প্রবুদ্ধ ও অপ্রবুদ্ধরূপে কুণ্ডলিনী দ্বিধা অবস্থিত। অপ্রবুদ্ধভাবে ইহা দেহ ও চৈতন্যাত্মক, দেহপিণ্ডকে সংসিদ্ধ করিয়া পিণ্ডমধ্যে চেতনারূপে অধিষ্ঠিত। জীবের যাবতীয় চিন্তা ও কর্ম্ম উদ্যোগশালিনী কুণ্ডলিনীই প্রপঞ্চরূপে ধারণ করিয়া আছে।[৭] যতদিন কুণ্ডলিনী অপ্রবুদ্ধা থাকে ততদিন জীব প্রপঞ্চে মুগ্ধ হইয়া সংসারভোগে রত থাকে। অপ্রবুদ্ধা কুণ্ডলিনী প্রবৃত্তিরূপিণী। যোগসাধনা দ্বারা জীবের অশুদ্ধ পূর্ব্ব-কর্ম্ম সংস্কারজনিত বিকার অস্তমিত হইলে কুণ্ডলিনী ঊর্দ্ধগামিনী হইয়া জীবকে নিবৃত্তির পথে পরিচালিত করে।[৮] কুণ্ডলিনীর ঊর্দ্ধগমনই

১। সি. সি প. ৪।৭, সি সি. স. ৪।৮
২। সি. সি. প. ৪।৮
৩। সি. সি. প ৪।১২
৪। সি সি. প. ৪।১২
৫। সি. সি. প. ৪।১৪
৬। সি সি. প. ৪।১৪, সি. সি. স. ৪।১৮
৭। সি. সি. প. ৪।১৪, সি. সি, স. ৪।১৯
৮ সি. সি. প ৪।১৪, সি. সি. স. ৪।২০

তাহার জাগরণ। পূর্ণরূপে জাগ্রতা কুণ্ডলিনী নিরাধারা হইয়া চৈতন্যময় হইলে জগতের সমস্তই নিরাধারা হইয়া চৈতন্যময় হয়; তখন সর্ব্বতত্ত্বই স্বস্বরূপে উপলব্ধ হয়। উর্দ্ধগামিনী কুণ্ডলিনী শুদ্ধ বিমর্শরূপিণী। শুদ্ধ বিমর্শদ্বারাই স্বস্বরূপের অধিগম হয়।[১]

মূলাধারে প্রবুদ্ধে তু সিদ্ধির্ভবতি যোগিনাম্।[২]

আধারশক্তিকেই মূলশক্তি বলা হয়, যেহেতু জড়চৈতন্যাত্মক চরাচর জগৎসংবিদ্রূপা এই শক্তির প্রসর হইতেই উদ্ভূত এবং এই শক্তিতেই প্রতিষ্ঠিত।[৩] মানবদেহে এই একশক্তিই নবচক্রে নবধা অবস্থিত।[৪] কুণ্ডলিনীর প্রবোধে তৎসমুদায় শক্তিই প্রবুদ্ধ হইয়া কুণ্ডলিনীতে লীন হয় এবং কুণ্ডলিনী প্রবুদ্ধ হইয়া শিবস্বরূপে আত্মলীনা হইলে সহজাবস্থারূপ পরমপদ-প্রাপ্তি হয়।[৫]

শক্তি মূলতঃ এক হইলেও উর্দ্ধ, মধ্য ও অধঃ রূপে উহা তিন ভিন্ন শক্তিরূপে অভিহিত হয়।[৬] এই তিন শক্তির দ্বারা ত্রিবিধ প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। জীবদেহে এই শক্তিত্রয়ের ত্রিবিধ কেন্দ্রের কথাও নাথগণ বলেন। মূলাধারই অধঃশক্তির কেন্দ্র; হৃদয় মধ্যশক্তির ও সহস্রার উর্দ্ধশক্তির কেন্দ্র। অধঃশক্তির বশে জীব স্বভাবতঃ সংসারে মুগ্ধ, নানা উপাধিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং বাহ্যেন্দ্রিয় ব্যাপারে নিরত থাকিয়া নানা চিন্তায় মগ্ন হয়।[৭] অধঃশক্তিকে আকুঞ্চিত করিয়া তাহার অধোমুখতা বা সংসারমুখতা নিরস্ত করিতে হয়।[৮] দেহের অভিমানী জীবাত্মা দেহ হইতে দেহান্তরে, অর্থ হইতে অর্থান্তরে পরিভ্রামিত হইয়াও যে শক্তির দ্বারা আপন স্বপ্রকাশরূপ স্বস্বরূপের কথা ধারণা করিতে সমর্থ হয় তাহাই মধ্যশক্তি। স্থূল ও সূক্ষ্ম বা সাকার ও নিরাকাররূপে মধ্যশক্তির দ্বিবিধ ভেদ করা হয়।

সৃষ্টিঃ কুণ্ডলিনী খ্যাতা দ্বিধা ভগবতী তু সা।
একধা স্থূলরূপা চ লোকানাং প্রত্যগাত্মিকা॥
অপরা সর্ব্বগা সূক্ষ্মা ব্যাপ্তিব্যাপকবর্জ্জিতা।
তস্যাঃ ভেদং ন জানাতি মোহিতঃ প্রত্যয়েন তু॥

সি. সি. প. ৪।২৩

১। সি. সি. প. ৪।১৫
২। সি. সি. স. ৪।২৫
৩। সি. সি. প. ৪।১৯, সি. সি. স. ৪।২২
৪। সি. সি. স. ৪।২৩
৫। হ. যো. প্র. ৪।১০, ১১
৬। সি. সি. প. ৪।১৭
৭। সি. সি. প. ৪।১৮
৮। সি. সি. স. ৪।২৫

অর্থাৎ সৃষ্টিরূপা কুণ্ডলিনী স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে দ্বিধা বিদ্যমান। প্রত্যক্‌চেতনারূপাই স্থূল। সূক্ষ্মা শক্তি সর্ব্বগা হইলেও ব্যাপ্তি-ব্যাপকভাববর্জ্জিত। জীব বাহ্যপ্রত্যয়ে মুগ্ধতা বশতঃ সূক্ষ্ম মধ্যশক্তির উপলব্ধি করিতে পারে না।

নিখিল পদার্থের অভ্যন্তরে যে শক্তি ভ্রাম্যমাণ চিদ্‌রূপে বিদ্যমান এবং চরাচররূপ নিখিলগ্রাহ্য পদার্থের আধারভূতা হইয়াও বিগ্রাহ্য-স্বরূপা—অর্থাৎ গ্রহীতৃরূপা—সেই সাকারা সর্ব্বরূপা মধ্যকুণ্ডলীই স্থূলরূপা মধ্যশক্তি।[১] সূক্ষ্মরূপা মধ্যশক্তি নিরাকারা অর্থাৎ দেহাত্মবোধরহিতা, নিশ্চলস্বভাবা, অতএব ব্যাপ্তিব্যাপক-ভাববর্জ্জিতা এবং নিশ্চয়ভূতা অর্থাৎ অপ্রতিযোগিসত্তারূপা বা সর্ব্বনিরপেক্ষভাবে বিদ্যমানা। ইহা সদাপ্রবুদ্ধা নিরুদ্ধবৃত্তি নিশ্চল যোগীর ধ্যানগম্যা ও পরমানন্দদায়িনী।[২] এই পরাসংবিদ্‌রূপা সূক্ষ্মা মধ্যশক্তি গুরুকৃপাফলে স্বরূপদশায় বোধগম্যা। সূক্ষ্মা মধ্যশক্তির বোধ উদিত হইলে যোগিগণের পিণ্ডসিদ্ধি নিষ্পন্ন হয়।[৩] স্থূল মধ্যশক্তিই প্রবুদ্ধ হইলে সূক্ষ্মা শক্তিরূপে পরিণত হয়।

সৈব প্রসরসংকোচাৎ পর্য্যাবৃত্তিমুপাগতা।
নিত্যানন্দতয়া লোলা সূক্ষ্মাখ্যা তিমিরাকৃতি ॥
বুদ্ধেতি সিদ্ধাস্তামাহুঃ প্রসিদ্ধাঃ সিদ্ধবর্ত্মনি ॥[৪]

প্রসর ও সংকোচ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে—বহির্মুখতা ও অন্তর্মুখতা দুইই নিরুদ্ধ হইলে স্থূলা মধ্যশক্তি সূক্ষ্মরূপা হয়। সূক্ষ্মা মধ্যশক্তি তিমিরাকৃতি। অন্ধকারে যেমন যাবতীয় পদার্থ একাকার বোধ হয় মধ্যশক্তির প্রবুদ্ধাবস্থায়ও সমস্ত ভেদ বা বিকল্পজ্ঞান তিরোহিত হয়।

সর্ব্বতত্ত্বের উর্দ্ধে অবস্থিত অনামা পরমপদ যে শক্তির দ্বারা স্বসংবেদ্যরূপে অধিগত হয় এবং যাহা নানাপ্রকার সাক্ষাৎকার বা আধ্যাত্মিক উপলব্ধির কারণভূতা তাহাই উর্দ্ধশক্তি।[৫]

মধ্যশক্তিপ্রবোধেন অধঃশক্তিনিকুঞ্চনাৎ।
উর্দ্ধশক্তিনিপাতেন প্রাপ্যতে পরমং পদম্ ॥[৬]

১। সি. সি. প. ৪।২২
২। সি. সি. স. ৪।২৭, সি. সি. প. ৪।২২
৩। সি. সি. প. ৪।২৪, সি. সি. স. ৪।৩২. ৩৩
৪। সি. সি. স. ৪।২৮, ২৯
৫। সি. সি. প. ৪।২৫ ; সি. সি, স. ৪।৩৪, ৩৫
৬। অমরৌঘশাসনম্ ১ম শ্লোক

ঊর্দ্ধ, অধঃ ও মধ্য এই তিন শক্তির ত্রিবিধ ক্রিয়ার ফল পরমপদ-প্রাপ্তি হয়। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে ক্রিয়াভেদে একই শক্তির ত্রিবিধ আখ্যা। অধঃশক্তির স্বভাব বিষয়লোলতাকে আকুঞ্চিত করিয়া ঊর্দ্ধমুখী করণ, স্থূল অপ্রবুদ্ধ মধ্যশক্তির সূক্ষ্মা মধ্যশক্তিরূপে জাগরণ এবং ঊর্দ্ধশক্তির নিপাতন বা কৃপা হইতে পরমপদ প্রাপ্তি ঘটে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শিবশক্তির পরস্পর সম্বন্ধ বিচার

নাথগণ জগৎপ্রপঞ্চের অদ্বিতীয় পরমকারণকে শিব বা আদিনাথ নামে অভিহিত করেন। তিনি স্বরূপতঃ অনাদি অনন্ত স্বয়ংসিদ্ধ স্বপ্রকাশ নিত্য বস্তু। দেশকালের অতীত, সুতরাং সর্ব্ব-অবচ্ছেদহীন এবং সকল ভেদ ও বাধাশূন্য। অন্তরে বাহিরে এমন কিছুই নাই যাহা তাঁহার সত্তা হইতে অতিরিক্ত বা মূলতঃ বিভিন্ন। তিনি স্বয়ংসিদ্ধ ও স্বপ্রকাশ বলিয়া তাঁহার সত্তা, তাঁহার স্বরূপ, তাঁহার প্রকাশ তদতিরিক্ত কোন পদার্থের সাপেক্ষ নহে। তিনি স্বয়ং নিষ্কারণ হইয়া চরাচর সমস্তের একমাত্র কারণ। এই কারণতাই তাঁহার শক্তি। এই শক্তির সহিত তিনি নিত্যযুক্ত। শক্তিবলেই তিনি সৃষ্টি স্থিতি সংহার কর্ত্তা।

এই শক্তির সহিত শিবের সম্বন্ধ কি? এই শক্তি কি শিব হইতে ভিন্ন অথবা অভিন্ন? অথবা ভেদাভেদরূপ? ইহা কি শিবের কোন আগন্তুক বা নিমিত্তজ উদিত ধর্ম্ম? ইহা কি শিবেরই ন্যায় নিত্যবস্তু অথবা অনিত্যা? এই সমস্ত প্রশ্নের সমাধানে নাথগণ বলেন :—

"শিবস্যাভ্যন্তরে শক্তিঃ.শক্তেরভ্যন্তরে শিবঃ।"

অর্থাৎ শিবের অন্তরে শক্তি, শক্তির অন্তরে শিব। মূলতঃ ইহারা অভিন্ন, একই অদ্বিতীয় পরমতত্ত্ব দৃষ্টিভেদে শিব বা শক্তি আখ্যায় অভিহিত হন। শিবভাবের অখণ্ডচৈতন্য শক্তিতেও চিরবিদ্যমানা এবং শক্তির সক্রিয়তাও শিবভাবে সদা অনুস্যূত। তাই 'শিবের শক্তি' কথাটী প্রচলিত। শিব শক্তিযুক্ত হইয়া সর্ব্বাকারে স্ফুরিত হন। এই ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ অভেদে। যত্নর পুস্তক বলিলে, পুস্তক পদার্থ যত্ন হইতে এক পৃথক সত্তা এবং যত্ন তাহার অধিকারী। পুস্তক সম্পর্কে যত্নতে অধিকারিত্ব ধর্ম্ম মাত্র চিন্তনীয়। গৃহের ছাদ বলিলে ছাদ গৃহরূপ সমগ্রবস্তুর অংশমাত্র। ইহাতে অংশাংশী ধর্ম্ম মাত্র চিন্তনীয়। কিন্তু 'শিবের শক্তি' বলিতে এরূপ কিছুই বোধ্য নহে। শিবই শক্তি, শক্তিই শিব। একই বস্তু দৃষ্টি ও ব্যবহার ভেদে দুই সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। সুতরাং শিব-শক্তি দুই ভাব অন্যোন্যাশ্রয়ভূত। ধর্ম্ম বিনা ধর্ম্মী অকল্পনীয়। ধর্ম্মীকে

ছাড়িয়া ধর্ম্মেরও কোন সত্তা নাই, যেমন দাহিকা শক্তি বিনা অগ্নি অকল্পনীয়। অগ্নি ও দাহিকাশক্তিকে তত্ত্বতঃ পৃথক করা সম্ভব নয়। সেইরূপ শিব ও শক্তি তত্ত্বতঃ অভিন্ন।

"প্রসরাদ্ ভাসয়েৎ শক্তিঃ সঙ্কোচাদ্ ভাসয়েৎ শিবঃ।[1]

শক্তি যখন জগৎপ্রপঞ্চরূপে প্রকটিত, শিব তখনই সৃষ্টি স্থিতি সংহার কর্ত্তা। আবার শক্তি যখন জগৎপ্রপঞ্চরূপে প্রকটিত, তখন এক-মাত্র শুদ্ধ স্বপ্রকাশ শিবই থাকেন। সূর্য্য এই বিচিত্র জগতের প্রকাশক, কিন্তু প্রকাশ্য কিছু না থাকিলে সূর্য্য যেমন অদ্বিতীয়রূপে আপন মহিমায় বিরাজ করেন, সৃষ্টিস্থিতিসংহারাত্মক শক্তিকার্য্যের উপরাম শিবও সেইরূপ আপন বিশুদ্ধ মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত থাকেন। শক্তির উপলব্ধি হয় ক্রিয়াসম্ভূত কার্য্য দ্বারা। ক্রিয়ার যাহা কারণ তাহাই শক্তি। শক্তি যাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে তাহাই শক্তিমান বা শক্ত। কিন্তু শক্তি দ্বারা যখন কোন কার্য্য সম্পন্ন হয় না, শক্তি যখন স্বাশ্রয়ে লীন হইয়া থাকে তখনকার সেই ক্রিয়াহীন শান্তাবস্থাই বিশুদ্ধ শিবভাব। জগৎপ্রপঞ্চের বহিঃপ্রকাশও যেমন শক্তির কার্য্য, প্রপঞ্চের লয়ও সেইরূপ শক্তির কার্য্য। অতএব সৃষ্টিস্থিতিসংহাররূপ কার্য্যের দ্বারাই শক্তিকে বুঝিতে বা ভাবনা করিতে পারা যায়। সৃষ্টিস্থিতিসংহাররূপ কার্য্য না থাকিলে শক্তির আশ্রয়ে যে ভাবে অবস্থান করেন, তাহাই শিবভাব। বিকাশ ও সঙ্কোচশীলা চিদ্রূপা শক্তি একদিকে আপন চিদ্রূপতার ক্রমিক বিরোধ দ্বারা আপনাকে নামরূপের নানা আবরণে আবরিত করিয়া নানাভাবে পরিণত হইয়া স্থূল জড় পৃথিবী তত্ত্বরূপে অন্ত্যপরিণাম লাভ করেন। ইহাই শক্তির সৃষ্টিরূপ প্রকাশ বা প্রসরণ। অপরদিকে অচিদাবরণের ক্রমিক অপসরণ দ্বারা নিজ চিদ্রূপতার সম্যক উন্মেষসাধন করিয়া শিবস্বরূপে বিশ্রান্তি লাভ করেন। সিদ্ধসিদ্ধান্ত পদ্ধতিতে গুরু গোরক্ষনাথ বলেন:—"সৈব শক্তির্যদা সহজেন স্বাস্মিন্ উন্মীলিন্যাং নিরুত্থানদশায়াং বর্ত্ততে তদা শিবঃ স এব ভবতি"।[2] অর্থাৎ ক্রিয়াশীলা শক্তি যখন সঙ্কোচরূপ ক্রিয়ার দ্বারা আপন চিৎস্বরূপের সকল আবরণ উন্মোচন করিয়া তাহার স্পন্দনের পরিসমাপ্তি সাধন করে, তখনই তাহা

১। সি. সি. স. ৬।৯, গো. সি. স., পৃ ২ ২। সি. সি. প. ৪।১

শান্ত চিৎস্বরূপ শিব সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হয়। তখন শিব ও শক্তির ভাষাগত বৈকল্পিক ভেদও অপনীত হয়।

শক্তির প্রসব বা বিকাশরূপ ক্রিয়া দ্বারা সৃষ্টি, আর সঙ্কোচনরূপ ক্রিয়া দ্বারা সৃষ্টির উপসংহরণ।[১] এই দুই ক্রিয়া অবরোহণ ও অধিরোহণাত্মক, শক্তিমান শিব আপন নিগ্রহ-শক্তিবলে প্রপঞ্চ ও জীবরূপে অবরোহণ করিয়া পুনরায় অনুগ্রহ-শক্তিবলে স্বরূপে অধিরোহণ করেন। শিবশক্তি এক অদ্বিতীয় ভাব হইতে প্রপঞ্চের অনন্ত বৈচিত্র্যে যেন নিজেকে রূপান্তরিত করিলেন, আবার অনন্ত বৈচিত্র্য হইতে ভেদের তিরোধান দ্বারা এক অদ্বিতীয়রূপে যেন ফিরিয়া আসিলেন। একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে শিবের শক্তির এই প্রসর-সঙ্কোচের কোন কালিক আরম্ভ বা সমাপ্তি নাই। ইহা অনাদি-কাল হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্ত একইভাবে চলিতেছে ও চলিবে। কারণ অনাদিনিধন নিত্যবস্তুর স্বরূপ যোগ্যতাও নিত্য, সুতরাং তাহাও অনাদি অনন্ত। শক্তির অধিরোহণ ক্রিয়াই সমস্ত সাধনেব মূল কথা। ইহার দ্বারাই জীব শিবস্বরূপে অবস্থান করিতে পারে। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ইহা বলা যায়, যেন কোন পান্থ আপন শাশ্বত আলয় ছাড়িয়া চক্রাকারে পরিভ্রমণ করিয়া পুনরায় আপন আলয়ে ফিরিয়া আসিল। যোগী আপন সাধনাভ্যাসে সম্যক্ অধিরূঢ় হইয়া নিরুত্থান দশা লাভান্তর শিবস্বরূপে স্থিতি লাভ করিয়া থাকেন।

শক্তিব্যতিরেকে শক্তিমান অগ্রাহ্য। শক্তিমান বা শিব বস্তুতঃ শক্তিরই ক্রিয়াহীন বা উপাধিহীন পরমাবস্থা। শক্তিযুক্ত শিবই সর্ব্বতোমুখ, তিনি সর্ব্বাকারে স্ফুরিত হইতেও যেমন সক্ষম, সকল আকারকে সংবৃত করিতেও তেমনি সক্ষম। প্রসরণও তাঁহার সামর্থ্য, সঙ্কোচনও তাঁহার সামর্থ্য।[২] "শিবোঽপি শক্তিরহিতঃ কর্ত্তুং শক্তো ন কিঞ্চন।"

শিবঃ স্বশক্তিসহিতো হ্যভাসাদ্ ভাসকো ভবেৎ ॥[৩]
স্বশক্ত্যা সহিতঃ সোঽপি সর্ব্বস্যাভাসকো ভবেৎ ॥[৪]

১। "শক্তেঃ প্রসরসঙ্কোচৌ জগতঃ সৃষ্টিসংহৃতী"—সি. সি. স. ৪।২৪
২। সি. সি. প. ৪।১৩
৩। সি. সি স. ৪।১৬ ৪। সি. সি. প. ৪।১৬

স্বশক্তিকে আশ্রয় করিয়া স্বশক্তিবলে শিব চরাচর জগতের আভাসক হন। যাহা নিরাভাস বা অব্যক্ত ছিল শক্তির প্রসরে তাহা ভাসিত বা বিকশিত হয়। "অভাসাদ্ ভাসকো ভবেৎ।" আবার শক্তির সঙ্কোচে যাহা আভাসিত বা ব্যক্ত ছিল তাহা নিরাভাস বা অব্যক্ততা প্রাপ্ত হয়। শক্তি প্রসর ও সঙ্কোচাত্মক, শিব প্রসর ও সঙ্কোচের উপরমাত্মক। শক্তির প্রসরই সৃষ্টি এবং সঙ্কোচই সংহার; প্রসর ও সঙ্কোচের যাহা আদি ও অন্ত তাহাই সাম্যাবস্থা তাহাই নিরাভাস, তাহাই শিবাবস্থা। যখন এই সাম্যভঙ্গ হয় অর্থাৎ শক্তির স্ফুরণ বা প্রসরে স্তরানুসারে বিশ্বের আবির্ভাব হয় তখন শক্তি পরিণাম লাভ করে বা জগৎ আভাসিত হয়। শক্তির সঙ্কোচনক্রিয়ার অবসানকাল পর্য্যন্তও জগৎ আভাসিত হয়—ক্রমশঃ স্থূল-সূক্ষ্মভেদে। অতএব জগতের আভাসই শক্তিভাব এবং নিরাভাসই শিবভাব।

আভাস বৈচিত্র্যময়ী ও পরিণামী। অশেষ বৈচিত্র্য ও পরিণামের পশ্চাতে যে অপরিণামী একরস সদ্‌বস্তু আছে যাহাকে ভিত্তি করিয়াই বিচিত্র বৈচিত্র্যের উদ্ভব বা তিরোধান তাহাই শিবস্বরূপ—"the changeless principle of all our changing experience"।[১] শিব একরস, অপরিণামী। শক্তি পরিণামী। শিব হইতে শক্তির আবির্ভাব এবং তাহা হইতে ত্রিলোক, চতুর্দ্দশ ভুবনাদির উৎপত্তি। বিশ্বসৃষ্টির ইহাই রহস্য। শক্তির তিরোভাবে জগতের লয়। তথাপি শিব ও শক্তি সূর্য্য ও সূর্য্যকিরণের ন্যায় অভিন্ন। তাই শক্তির সাধনেই শিবত্বের উপলব্ধি হয়। সবিকল্প সমাধি দ্বারা যেরূপ নির্ব্বিকল্পে পৌঁছান যায়, তেমনি শক্তির উপাসনা দ্বারা শিবত্ব লাভ হয়। শক্তি-উপাসনা সাধন, শিবত্বলাভ তাঁহার ফল।

বিমর্শই শিবের শক্তি। পরাপর বিমর্শরূপিণী সংবিৎস্বরূপা শক্তিই নানাকারে বিশ্বের আধারভূতা।[২] এই বিশ্ব শক্তির বিলাস ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং সগুণ সক্রিয় বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ডরূপী শিব ও নির্গুণ নিষ্ক্রিয় শিব—শিবের এই দুই রূপই নাথগণ কর্তৃক অঙ্গীকৃত। সক্রিয়-নিষ্ক্রিয়ের সগুণ-নির্গুণের মিলনভূমিকেই তাঁহারা নাথস্বরূপ বলেন।

১। Shakti & Shakta, Woodroffe, p. 58. ২। সি. সি. প. ৪।২৯

শিব চিৎস্বরূপ। তাঁহার নিজাশক্তিও সংবিৎস্বরূপা।[১] এই নিজাশক্তি ইচ্ছামাত্রধর্ম্মা এবং ধর্ম্মিণী, অর্থাৎ শিব হইতে অভিন্ন।[২] শিবের নিজেকে নিজে জানাই তাঁহার আত্মবিমর্শ। ইহাই ইচ্ছামাত্র। বিমর্শ হেতুই "অস্মি" (আমি আছি = সৎস্বরূপতা), "প্রকাশে" (আমি প্রকাশিত হইব নিজের দ্বারা = চিৎস্বরূপতা), "নন্দামি" (আমি আনন্দিত হইব = আনন্দস্বরূপতা) এই ত্রিভাবের অধিগম হয়। বিমর্শ শিবের নিত্যধর্ম্ম। সুতরাং যখন বিমর্শ ছিল না, ইত্যাকার কালিক ব্যাপার কল্পনীয় নহে। কিন্তু ব্যবহারদৃষ্টিতে সৃষ্টি আদি প্রক্রিয়া বুঝিবার জন্য বলিতে হয় যখন বিমর্শ নাই এবং বহুর একীকরণও নাই—পরমকারণ পরাৎপর পরমেশ্বর নিজে[৩] আপনাতে আপনি বিদ্যমান—তখন তিনি অনামা অর্থাৎ বাচ্যবাচকভেদবর্জ্জিত নামরূপাতীত পরমব্রহ্ম। উহাই পরম শিবভাব। ব্যবহারদৃষ্টিতে ইহাই মহাপ্রলয় এবং তত্ত্বদৃষ্টিতে শিবের বিশ্বোত্তীর্ণভাব। কিন্তু তাঁহার অবিনাভাবী আত্মবিমর্শ বা ইচ্ছামাত্রধর্ম্মা নিজাশক্তিভাবে শিব হইতে কোনও ভাবান্তর উপলক্ষিত হয় না। ইহা ধর্ম্মী শিব হইতে অভিন্ন। সৃষ্টির প্রাগ্‌ভাবী অবস্থায় ক্রিয়াশব্দের প্রয়োগ যদিও সমীচীন নহে তবু ভাবপ্রকাশের সৌকর্য্যার্থে বলিতে পারা যায়, ইচ্ছামাত্র বা সত্তামাত্রই নিজাশক্তির ক্রিয়া। তৎপরে বহিঃপ্রকাশের সূক্ষ্ম উন্মুখতা হইতে পরাশক্তির অভিব্যক্তি। ইহা যেন অন্তরে এক অনির্দ্দেশ্য মৃদু প্রেরণা অনুভবের তুল্য। সুতরাং পরাবস্থায় শক্তিসত্তা শিবসত্তা হইতে অভিন্ন হইয়াও শিবরূপী না হইয়া যেন শিবস্থ বলিয়া প্রতিভাত হয়। ইহাই স্ফুটোন্মুখ পরাশক্তির বিশ্বোত্তীর্ণ শিবভাব হইতে অতি সূক্ষ্ম বিভেদ। এই সিসৃক্ষোপলক্ষিত শিব সম্পূর্ণরূপে অব্যক্ত থাকিয়াও যেন আত্মসংবিৎশীল চেতন পুরুষরূপে আত্মপ্রকাশ করিবার দিকে আর একপদ অগ্রসর করিয়া দিলেন।[৪]

বহির্বিকাশের তৃতীয় স্তরে শিবের ইচ্ছাশক্তির অন্তরে যে স্পন্দনের আবির্ভাব হয় তাহাও অন্তর্ভাব বিশেষ। ইহাকে অপরাশক্তি আখ্যা দেওয়া হয়। যাহা অনন্ত অপ্রমেয় নিস্পন্দ ছিল তাহা যেন আপনার মধ্যে স্পন্দনের ভূমি লাভ করিল। অদ্বৈত যেন দ্বৈতের

১। সি. সি. প. ৪।১
২। সি. সি. প. ১।৫
৩। সি. সি. প. ৪।১৩
৪। সি. সি. প. ১।৬, ১১

অভিমুখী হইল। বিশ্বোত্তীর্ণভাব হইতে বিভেদ আরও স্পষ্টতর হইল। নিজেকে বহুরূপে প্রকাশ করিবার ঔৎসুক্য যেন জাগরিত হইল। যাহা বীজ বা কারণরূপী ছিল তাহা যেন কার্য্যরূপে অভিব্যক্তির অভিমুখী হইল। গূঢ় স্পন্দনশীলা অপরাশক্তিযুক্ত শিবে যেন কর্ত্তৃভাবের আভাস প্রথম লক্ষিত হইল। শক্তির শক্ত তিনি—যেন শক্তিকে প্রকাশিত করিতেছেন, শক্তিকে অনুভব করিতেছেন, শক্তির একমাত্র অধিকারী রূপে অবস্থান করিতেছেন।[১]

এই স্বারসিক স্পন্দন আরও স্ফুটতর হইয়া চতুর্থস্তরে অহন্তা বোধমাত্রের উদয়ে শক্তি সূক্ষ্মা নামে অভিহিত হয়। সূক্ষ্মাশক্তির শক্তিমান শিব যেন নিজেকে নিজে জানিতে পারিলেন। এখন স্বয়ং-কর্ত্তৃভাব অধিকতর স্ফুট হওয়ায় শিবের ব্যক্তিত্ব বা অস্মৎপ্রত্যয়াত্মক ভাব উন্মেষ লাভ করিল। যাবৎ অহন্তা বা অহং বোধের উদয় হয় নাই তাবৎ শিবভাবে অকর্ত্তৃভাবই প্রকট ছিল—এখন শিব পুরুষবিশেষ, তাঁহাতে কর্ত্তৃবোধ জাগরিত হইয়াছে। কিন্তু ইদংভাবের উদয় না হওয়ায় তাহাতে অংশাঅংশীভাব নাই, তাঁহার অহংভাবে কোন ভেদ নাই। তিনি নিশ্চল অর্থাৎ বাহ্যক্রিয়াশূন্য, নিশ্চয়াত্মক ও নির্ব্বিকল্প। এখনও এক বহু হয় নাই সুতরাং কোন বিকল্পও নাই। সূক্ষ্মাশক্তি যেন শরীর এবং শিব যেন শরীরী। তথাপি এখনও তাঁহার বিশ্বোত্তীর্ণ স্বপ্রকাশ অদ্বৈতভাবের উপর দ্বৈতভাব বা প্রকাশ্যভাবের কোন ছায়াপাত হয় নাই।[২]

শক্তির উন্মেষের পঞ্চমস্তরে অহন্তামাত্রের স্ফুটতর বিকাশে বেদনার স্ফূর্ত্তি হয়। বেদনশীলা কুণ্ডলিনীতে জ্ঞান, ইচ্ছা ও অনুভব পূর্ণরূপে প্রবুদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে এখন প্রবলতা অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিমত্তা, প্রোচ্চলতা বা সর্ব্বাকারে আকারিত হইবার যোগ্যতা, প্রত্যঙ্মুখতা বা বিপরীতমুখতা অর্থাৎ একত্ব হইতে বহুত্বের অভিমুখতা এবং প্রতিবিম্বতা—দর্পণে যেমন সকল কিছুরই ছায়া ধারণ করে, সেইরূপ বহুভাবে শিব স্বরূপকে আভাসিত করিবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন। শিবের আশ্রয়ে কুণ্ডলিনী শক্তিতেই বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড সংকল্প বা কল্পনাকারে বীজভূত হইয়া রহিয়াছে। শিব যেন এই কল্পনাত্মক জগতের অধিষ্ঠাতা। এই দেহে

১। সি. সি. প. ১৭, ১২ ২। সি. সি. প. ১৮, ১৩

যেন তিনি অনুপ্রবিষ্ট। এই শক্ত্যাত্মকভাবময় ব্রহ্মাণ্ডের তিনিই উপাদান, তিনিই ইহার অধিষ্ঠাতা বা আত্মা, তিনিই ইহার প্রভু।[১]

কুণ্ডলিনী শক্তিকে আশ্রয় করিয়াই ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে স্থূল জগতের আবির্ভাব হয়। জগতের আবির্ভাব অর্থে শক্তির চিদ্রূপতার ক্রমিক আবরণ। শক্তির বিচিত্রাকারে স্ফুরণ অর্থেই নিজেকে নিজে আবরিত করা। চিদ্রূপা শক্তি জড়রূপে পরিণামিত হন। প্রসরমুখী শক্তিকে তন্ত্রে নিষেধব্যাপাররূপা বলা হইয়াছে। ইহাই তিরোহতি, নিরোধ বা নিগ্রহ। ইহা শক্তির বহির্মুখী ক্রিয়া বা প্রত্যঙ্মুখতা। প্রলয়োন্মুখে শক্তির অন্তর্মুখী ক্রিয়াদ্বারা শক্তি স্বকারণে প্রত্যাবৃত্ত হন। সমস্ত আবরণ উন্মোচিত করিয়া আপন সংবিৎস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। ইহাই অনুগ্রহ, ইহাই প্রাঙ্‌মুখতা। এই প্রত্যাবর্ত্তন সমষ্টি ও ব্যষ্টি উভয়-ভাবেই হইতে পারে। সমষ্টিভাবে হইলেই তাহা মহাপ্রলয়। সাধকের ব্যষ্টি জীবনে বহির্মুখী শক্তি অন্তর্মুখী হইয়া যখন পরমশিবে মিলিত হয় তখনই অখিলপিণ্ডের সহিত পরমপদের সমরসীকরণে একমাত্র শিবই থাকেন। সেখানে সমস্ত ক্রিয়ার উপশম হয়।

সংবিৎস্বরূপ পরমশিবই জড় ও অজড়াত্মক নিখিল পদার্থের অন্তর্নিহিত একমাত্র মূলসত্তা। ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয়ভাবেই শিবই চরাচর জগতের পরম কারণ। দেশকালাধীন বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ডরূপে আভাসিত হইয়াও শিব নিত্য আপন শাশ্বতস্বরূপে দেশ, কাল ও নামরূপের অতীত হইয়া বিদ্যমান। তিনি বিভুরূপে যাবতীয় পদার্থে অনুস্যূত থাকিয়াও শিবভাবে সর্ব্বাতীত শক্তিভাবে বিশ্বরূপ বিশ্বময় শিবভাবে বিশ্বোত্তীর্ণ।

শিব সর্ব্বাকার হইয়াও একাকার। স্বরূপতঃ অপরিচ্ছিন্ন, অনন্ত ও অসীম। একাকার শিব অনন্ত শক্তিমান্ রূপে নানাকারে বিলাস করিয়াও আপন চিৎস্বরূপে সদা প্রতিষ্ঠিত। শিবভাব সর্ব্বপ্রকার ভেদহীন বলিয়াই একাকার। স্বজাতীয়, বিজাতীয় বা স্বগতভেদ তাহাতে কল্পনীয় নহে। কারণ তিনিই একমাত্র কারণ, সকল কারণের পরমকারণ। জগৎপ্রপঞ্চে প্রতীয়মান ভেদ শক্তির কার্য্য। ইহাতে পরমকারণের স্বরূপের হানি হয় না। শিব অনন্ত শক্তিমান্ বলিয়াই নিত্য সর্ব্বাকারে আকারিত হইয়াও অলুপ্ত শক্তিমান্ এবং আপন এক অদ্বিতীয় ভাবে সদাই অবশিষ্ট থাকেন।

১। সি. সি. প., ১।৯, ১৪

অতএব একাকারোঽনন্তশক্তিমান্ নিজানন্দতয়াবস্থিতোঽপি নানাকারত্বেন বিলসন্ স্বপ্রতিষ্ঠাং স্বয়মেব ভজতি ইতি ব্যবহারঃ। অলুপ্তশক্তিমান্ নিত্যং সর্ব্বাকারতয়া স্ফুরন্ পুনঃ স্বেনৈব রূপেণ এক এব অবশিষ্যতে।[১] শিবস্বরূপের এই দ্বৈরূপ্য নাথগণের বিশিষ্ট সিদ্ধান্ত। সর্ব্বাকার হইয়াও একাকার। নানাকার হইয়াও সুখদুঃখমোহের অতীত, নিজানন্দে সদা আরূঢ়। শক্তিরূপে তিনি অশেষ বিশেষ, শিবরূপে তিনি পরম অবিশেষ।

শক্তির প্রসরে, বিকাশে বা উন্মেষে জগৎপ্রপঞ্চ বাচ্যবাচকরূপে প্রাদুর্ভূত হয়। শক্তির সঙ্কোচে অর্থাৎ স্পন্দনক্রিয়ার উপশান্তিতে বাচ্যবাচকরূপী জগৎপ্রপঞ্চও স্বকারণে লীন হয়—তখন বাচ্যবাচকভাবের উপশমাত্মক শিবই স্বস্বরূপে অবশিষ্ট থাকেন।

শিব ও শক্তি অভিন্ন, এ কথা নাথদর্শনে বহুশঃ অঙ্গীকৃত। অভিন্ন হইলেও ব্যবহারদৃষ্টিতে অর্থগত কিছু ভেদ বা পার্থক্য দৃষ্ট হয়। একটী উপমার দ্বারা এই পার্থক্যটী বুঝিবার চেষ্টা করা যাইতেছে। একটী নিষ্ক্রিয় নিশ্চল অনন্ত জ্যোতির্ম্ময় কেন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া অনন্ত রশ্মিজাল যেমন সর্ব্বতঃ বিকীরিত হইতে পারে, তেমনি সর্ব্বশক্তির কারণ বা আশ্রয়ভূত এক শিবভাব হইতে সমস্ত শক্তিভাব নির্গত হইয়া আবার শিবেই প্রত্যাবর্ত্তন করে। অনন্তশক্তির কেন্দ্র শিবে এই নির্গমন বা প্রত্যাগমন ক্রিয়াদ্বারা কোন অপচয় বা উপচয় ঘটে না।

দণ্ড ঘটের কারণ। ঘট যখন নির্ম্মিত হয় নাই, ঘট নির্ম্মাণ যখন সমাপ্ত হইয়াছে বা নির্ম্মিত ঘট যখন ভগ্ন হইয়া খর্পরে পরিণত বা খর্পর ধূলিতে পরিণত হইয়াছে, এই সমস্ত অবস্থাতেই দণ্ডে দণ্ডত্ব ধর্ম্ম তুল্যরূপে উদিত আছে, তাহার কোন অপচয় উপচয় নাই। কেবল ঘটের অপেক্ষায় দণ্ডে ঘটের কারণতা দৃষ্ট বা অদৃষ্ট। সেইরূপ সৃষ্টির অপেক্ষায় শিবশক্তির প্রসর সঙ্কোচ। শিবের শিবত্ব সর্ব্বাবস্থায়ই তুল্য অম্লানরূপে উদিত। সৃষ্টি না থাকিলে শক্তি অদৃষ্ট, সৃষ্টি থাকিলে শক্তি দৃষ্ট। কিন্তু সর্ব্বত্র সমভাবেই শিব হইতে অভিন্ন।

শক্তিভাব হইতেই সৃষ্টি স্থিতি সংহারাত্মক ক্রিয়ার উৎপত্তি। চিৎস্বরূপ শিবে কোন চাঞ্চল্য নাই। সৃষ্টিরূপ ক্রিয়ার উপশান্তি হইলে শক্তি যেখানে লীন হইয়া থাকে তাহাই শিবভাব। পুনঃ শিবভাব হইতে

১। সি. সি. প., ৪।১২

স্বারসিক অহংভাবের বিমর্শে শক্তির স্ফুরণে সৃষ্ট্যাদি কার্য্য সম্পন্ন হয়। শক্তির স্ফুরণ হইলেই তাহা ভাসিত হয়, অস্ফুরণে তাহা কারণে অনুপ্রবিষ্ট থাকে এই মাত্র বলা যায়। অতএব শক্তি শিবের শক্তি যাহা হইতে প্রসৃত হইয়া শেষপর্য্যন্ত সৃষ্ট্যাদির বহিঃপ্রকাশ ঘটায় এবং যাহাতে *প্রত্যাবৃত্ত হইলে সৃষ্ট্যাদি উপসংহৃত হয় তাহাই শিব।* *কার্য্যকারণ* ও কর্ত্তৃভাব যাহাদ্বারা স্ফুটভাবে উত্থিত হয় অথবা উত্থিত করিবার যোগ্যতা যাহার আছে তাহাই শক্তি। নিরুত্থানদশাই শিব।

কার্য্যকারণকর্ত্তৃণাম্ উত্থা(?)বস্থাকরং স্ফুটম্।
কর্ত্তুং শক্নোতি যৎ তস্মাৎ শক্তিরিত্যভিধীয়তে॥

*　　　*　　　*　　　*

সহজেনাত্মলীনা সা যদা সঞ্জায়তে তদা।
নিরুত্থানদশেত্যুক্তা শিবসংজ্ঞাঽপি তত্র হি॥[১]

শক্তি শিবভাব হইতে প্রসৃত হইয়া ক্রমশঃ কারণ সূক্ষ্ম ও স্থূলরূপ ধারণ করে। তেজঃপুঞ্জ হইতে বিকীরিত রশ্মি যেমন যতই আপন উৎপত্তিকেন্দ্র হইতে ক্রমশঃ দূরে প্রসৃত হয় ততই তাহার কিরণ ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হইয়া যায়, সেইরূপ চিৎস্বরূপ শিবভাব হইতে উদ্ভূত শক্তি যতই সূক্ষ্ম হইতে স্থূলরূপ পরিগ্রহ করে বা স্থূলরূপে আভাসিত হয় ততই তাহার চিৎস্বরূপের বহিঃপ্রকাশ আবরিত বা মন্দীভূত হয়। পুনরায় সেই শক্তি যখন সঙ্কোচ প্রক্রিয়া দ্বারা বিপরীতমুখে স্থূল হইতে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্ম হইতে কারণে প্রত্যাবৃত্ত হয় তখন তাহার চিদ্রূপতার প্রকাশ হয়। এইরূপে শক্তি যখন সম্পূর্ণরূপে স্বকারণে প্রত্যাবৃত্ত হয় একমাত্র চিৎস্বরূপই থাকে। তিনিই শিব।

চিৎস্বরূপ শিবেই আনন্দ ইচ্ছা জ্ঞান ও ক্রিয়া শক্তি আশ্রিত। ইহাদের উন্মেষেই সৃষ্টির প্রকাশ। সৃষ্টির প্রকাশে শক্তিকে তিনভাবে উপলব্ধি করিতে পারা যায়—প্রমাতা, প্রমেয় ও প্রমাণরূপে। প্রমাতৃত্বই শক্তির পরাভাব। যদ্দারা শিব হইতে ক্ষিতিতত্ত্ব পর্য্যন্ত সমস্ত তত্ত্ব সংবিদ্মাত্ররূপে ধৃত, দৃষ্ট ও ভাবিত হয়। প্রমেয়ত্বই শক্তির অপরা-ভাব। ইহা হইতেই ভেদজ্ঞান। আর প্রমাণাংশে ভেদাভেদাত্মক পরাপরাভাব।[২] প্রমাতা, প্রমাণ ও প্রমেয় অবিনাভাবী ভাবত্রয়।

১। সি. সি স, ৪।২, ৫　২। তন্ত্রসার, অভিনব গুপ্ত ৪ আঃ ২৮ পৃঃ

প্রমেয়ের উপসংহারে কার্য্যতঃ প্রমাণ ও প্রমাতারও উপসংহার হয়। প্রমাতা প্রমেয় প্রমাণরূপী শক্তি উপসংহৃত হইলে একমাত্র চিৎস্বরূপ শিবই থাকেন, ইহা আমরা তত্ত্বদৃষ্টিদ্বারা অনুমান করি। কারণ সমস্ত দৃষ্টির উপরম হইলে যাহা থাকে তাহা ব্যবহারিক কোন ভাবের সহিত তুলিত হইতে পারে না। তবে কি শিবস্বরূপ কেবল অনুমেয় বা কল্পনার বস্তুমাত্র? না, তাহা নহে, যোগী স্বশরীরে সমস্ত শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া শিবস্বরূপে লীন করিয়া শিবত্বে অধিরূঢ় হইতে পারেন। শিবতত্ত্বে সাক্ষাৎকার সম্ভব এবং তাহাই চরম লক্ষ্য।

তত্ত্বতঃ শিবশক্তি অদ্বৈত। কারণবস্তুতে যে কার্য্যোৎপাদনকারী ধর্ম্মবিশেষ আছে ও যে ধর্ম্ম তাহার সহিত অপৃথক, তাহাকেই 'শক্তি' বলে, যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তি। কার্য্যকারণ ও কর্ত্তৃভাব স্ফুটভাবে উত্থিত করিবার যোগ্যতা শক্তির আছে। নির্ব্বিশেষ শুদ্ধতত্ত্বরূপ চেতনস্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডের আধারের স্ত্রীরূপ 'চিতি', পুংরূপ 'চিৎ', অতএব চিৎ ও চিতি একই তত্ত্বের বিভিন্ন রূপ মাত্র। শিব ও শক্তির মধ্যেও দ্বৈতভাবের বা দেহদেহীর ভাব কল্পনা করা হয়।

চিতিশক্তি অনন্তরূপা, তথাপি শাস্ত্রে অন্তরঙ্গা, তটস্থা ও বহিরঙ্গা এই ত্রিবিধ রূপকেই প্রধান বলা হইয়াছে। অগ্নিরও কেবলমাত্র দাহিকা শক্তি নহে, তাহার পাবকতা, দাহিকা ও প্রকাশিকা এই তিনটী প্রধান রূপ আছে। ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তিই 'স্বরূপ'শক্তি। ভগবানের তটস্থা শক্তি অসংখ্য জীবে অগণিত বিন্দুরূপে প্রকাশিত হইয়াও তত্ত্বতঃ 'এক' ও মহান্, জীব ভগবানের সচ্চিদানন্দরূপের কণারূপ, অতএব জীব ও শিবে ভেদ থাকিলেও উহারা তত্ত্বত 'এক', জীবে ও শিবে যে শক্তিভেদ তাহা স্বরূপাত্মকও নহে, সর্ব্বথা বিজাতীয়ও নহে, তাই উহাকে 'তটস্থা' বলা হয়।

ভগবানের সৎ-চিৎ-আনন্দরূপে শক্তিরও ত্রিবিধ রূপ বর্ত্তমান— সন্ধিনী, সংবিৎ ও হ্লাদিনী। স্বয়ং সৎ বা একমাত্র পরমার্থ-সত্তাযুক্ত হইয়াও পরব্রহ্ম নিজের যে স্বরূপ শক্তিদ্বারা উৎপত্তি ও বিনাশ গ্রস্ত, সৎ ও অসদ্রূপে অনির্ব্বাচ্য প্রাপঞ্চিক বস্তুমাত্রকে কিছুকালের জন্য সত্তাযুক্ত করিয়া দেন ঐ শক্তির নাম 'সন্ধিনী' শক্তি। স্বয়ং স্বপ্রকাশ চিৎ-স্বরূপ ব্রহ্ম যে শক্তির দ্বারা অজ্ঞানমোহিত জীবের জ্ঞান সম্পাদন করাইয়া স্পর্শরূপরসাদিভোগ্য পদার্থের ভোক্তা বা জ্ঞাতা করেন, ঐ শক্তির

নাম 'সংবিৎ' শক্তি। স্বয়ং অনাদি অনন্ত আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম যে শক্তিদ্বারা নিজের আনন্দস্বরূপকে জীবের অনুভূতির বিষয় করাইয়া স্বয়ংও আত্মভূত পরমানন্দের সাক্ষাৎকার করেন ঐ স্বরূপশক্তির নাম 'হ্লাদিনী' শক্তি।[১]

ভগবানের তিনটী শক্তি—চিৎশক্তি, মায়াশক্তি ও জীবশক্তি। অদ্বৈতীরা যে বলেন, "ব্রহ্ম নিরশক্তি"—বৈষ্ণবদর্শন তাহা অনুমোদন করেন না। চিৎশক্তির ত্রিবিধ বিলাস—ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া, এই তিনটীর পারিভাষিক নাম হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ (বিষ্ণুপুরাণ ১।১২।৬৯)। অদ্বৈতীরা বিবর্ত্তবাদী। তাঁহারা বলেন, জীবের অবিদ্যার ফলে ব্রহ্ম বিশ্বরূপে প্রতিভাসিত হন। বৈষ্ণবেরা পরিণামবাদী, তাঁহারা বলেন, মায়াশক্তির দ্বারা মায়াধীশ ভগবান্ বিশ্বরূপে পরিণত হইয়াও অবিকৃত থাকেন। অন্তরঙ্গ চিৎশক্তি ও বহিরঙ্গা মায়াশক্তি ব্যতীত ভগবানের এক 'তটস্থা' শক্তি আছে—তাহাই 'জীবশক্তি'। অদ্বৈতীরা 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বেদবাক্যের উপর নির্ভর করিয়া জীব ও ঈশ্বরে অভিন্ন বা সোঽহং ভাব কল্পনা করেন, বৈষ্ণবদর্শন তাহার প্রতিবাদস্বরূপ বলেন জীব যখন শক্তি ও ঈশ্বর শক্তিমান তখন উভয়ে অভিন্নতা কিরূপে সম্ভব?[২]

বাস্তবিকপক্ষে শক্তির সহিত শক্তিমানের 'তাদাত্ম্য' সম্বন্ধ অর্থাৎ উহাদের মধ্যে 'ভেদ' দৃষ্ট হইলেও বস্তুতঃ উহারা 'অভেদ'। অতএব ভেদ ও অভেদ উভয় রূপই উপাসকের রুচি অনুসারে কল্পনীয়। দীপশিখা ও তাহার প্রকাশের মধ্যে অভেদত্ব থাকিলেও ভেদ আছে। কারণ দীপ থাকিলে প্রকাশ থাকে, না থাকিলে প্রকাশ থাকে না, অতএব তাহারা অভেদ। আবার দীপশিখায় যে দাহিকাশক্তি আছে, প্রকাশ মধ্যে তাহা নাই, অতএব উভয়ের মধ্যে ভেদ বর্ত্তমান। তথাপি শিব ও শক্তির, দীপ ও প্রকাশের সম্বন্ধ মধ্যে বৈলক্ষণ্য আছে। দীপশিখা জড় পদার্থ (যাহা কিছু দৃশ্য তাহাই জড়) তাই জড় পদার্থ হইতে তাহার প্রকাশ ভিন্ন হইতে পারে না ; কিন্তু শিব ও শক্তি এক চেতনস্বরূপেরই দুই রূপ তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তাই প্রকাশ বা শক্তি ভিন্নরূপ ধারণে সমর্থ। তাই শক্তি ও শক্তিমান অদ্বৈতরূপ হইয়াও

১। সাধনমার্গে শক্তিতত্ত্ব, ম ম প্রমথনাথ তর্কভূষণ, কল্যাণ, শক্তি অঙ্ক পৃঃ ১৩৭

২। প্রেমধর্ম্ম, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, (১৩৪৫) দশম অধ্যায়, পৃ ১৫৩ ইত্যাদি।

দ্বৈতরূপে প্রকাশিত। শক্তি শিবের সক্রিয় অবস্থা ইহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই ক্রিয়ার তারতম্য অনুসারে শক্তিই মায়া, মহামায়া, মূলাপ্রকৃতি, অবিদ্যা, কুণ্ডলিনী, পরাশক্তি ইত্যাদি নামে অভিহিত হন। শক্তিই ইন্দ্রজালের ন্যায় ক্ষণভরে পদার্থসৃষ্টি করিতে সমর্থ বলিয়া তিনি অঘটনপটীয়সী 'মায়া', সংসার উৎপন্ন করিবার ক্রিয়ারূপিণী বলিয়া তিনি 'মূলাপ্রকৃতি', মোহদ্বারা বহু পদার্থের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন করিতে সমর্থ বলিয়া 'অবিদ্যা' এবং শরীরস্থ সকল ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রীরূপে 'কুণ্ডলিনী' শক্তি। তন্ত্রের ডাকিনী হাকিনী ইত্যাদিও শরীরস্থ শক্তি। ঘেরণ্ড সংহিতাদিতেও শক্তি উপাসনার আবশ্যকতা বর্ণিত হইয়াছে, কারণ শক্তি ও শক্তিমানে 'তাদাত্ম্য'ভাব, শ্রীকণ্ঠের ব্রহ্মমীমাংসায় (১-২-১) "তাদাত্ম্যমনয়োর্নিত্যং বহ্নিদাহিকয়োরিব"[১] বলা হইয়াছে। "শাক্ত অদ্বৈতবাদের" উত্থানের কারণও দ্বৈতভাবে প্রকাশিত হইলেও শিবশক্তির অদ্বৈতরূপ। তন্ত্রশাস্ত্রে সিদ্ধিলাভের জন্য উপাসনার বিধি আছে—উহা দ্বিবিধ—আসুরী ও দৈবী, বা পঞ্চ-মকারযুক্ত ও সাত্ত্বিক, উভয়েরই ফল দিব্যসিদ্ধিলাভ। রাধাস্বামী সম্প্রদায় মতেও একই পরমতত্ত্বের দুইটী রূপ আছে। একটী স্থিরতার বোধক স্বরূপ 'হ্রদ', অপরটী গতির বিকাশ স্বরূপ 'ধারা'। শক্তির নির্ঝরে উপপ্লব বিনা ধারা প্রবাহিত হওয়া সম্ভব নহে, এই ধারাই 'রাধা' এবং হ্রদ 'স্বামী', অতএব রাধাস্বামী একই তত্ত্বের দুইটী রূপ, রাধা শক্তি, স্বামী শক্তিমান।

বিশ্বের অন্তর্গত যে নির্ব্বিকার সত্তা তাহাই শিব ; তাহার শক্তি চিৎ, আনন্দ, ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া এই পঞ্চরূপে অভিব্যক্ত। শক্তি যখন চিৎরূপে অবস্থিত থাকে তখন তাহা 'শিবতত্ত্ব', 'আনন্দ' শক্তি দ্বারা জীবনের সঞ্চার হয়, ইহাই শক্তিতত্ত্ব, স্ব-অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে 'ইচ্ছার' উন্মেষ, 'ইচ্ছা-শক্তিরূপা কুমারী' (শিবসূত্রবিমর্শিনী), শক্তি যখন অন্য বলবত্তর ইচ্ছাদ্বারা ব্যাহত না হয়, তখন সে 'শক্তি' ব্যাহত হইলে উহা 'অশক্তি' কিন্তু ব্যাঘাত দ্বারা অশক্তিই ক্রোধের রূপ ধারণ করে ও কাল পাইয়া নূতন 'শক্তি' হইয়া যায়।[২] ইহার অনন্তর যে 'জ্ঞান' অবস্থা তাহাই ঈশ্বরতত্ত্ব, ইহাতে জগৎকে উৎপন্ন করিবার ইচ্ছা ও শক্তি থাকে। ইহার পর জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের ভেদ হয়, ইহা হইতে 'ক্রিয়া'র আরম্ভ হয়, ইহাই

১। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ—সূর্য্যনারায়ণ শাস্ত্রী, শক্তি অঙ্ক, কল্যাণ, পৃঃ ১৬৮
২। শক্তিতত্ত্ব, কল্যাণ, শক্তিঅঙ্ক পৃঃ ১২২

শুদ্ধবিদ্যার অবস্থা। এই অলৌকিক পঞ্চতত্ত্ব শিবের পঞ্চধা শক্তির অভিব্যক্তরূপ।

সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব, শক্তি উপাসকের ষট্‌ত্রিংশতি তত্ত্ব, পুরুষের পঞ্চ আবরণ নিয়তি, কাল, রাগ, বিদ্যা, কলা, এবং কলা হইতে মায়া, শুদ্ধবিদ্যা, ঈশ্বর, সদাশিব, শিব ও শিবতত্ত্ব, এই ছয়টি তত্ত্ব। পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের সহিত একাদশ তত্ত্ব যুক্ত হইয়া ষট্‌ত্রিংশতি তত্ত্ব হয়। শিবতত্ত্ব স্বতন্ত্রতত্ত্ব, সদাশিব, ঈশ্বর ও শুদ্ধবিদ্যা বিদ্যাতত্ত্ব ও মায়া হইতে নিম্নের ৩২টি তত্ত্ব 'আত্মতত্ত্ব'রূপে খ্যাত।

ষট্‌শক্তি বা পরা, জ্ঞান, ইচ্ছা, ক্রিয়া, কুণ্ডলিনী ও মাতৃকা ; শক্তিব এই ষট্‌রূপও কল্পনা করা হইয়াছে। আবার পরমাত্মাস্বরূপা মহাশক্তিকে কেহ 'সগুণ' কেহ 'নির্গুণ' আখ্যায় অভিহিত করেন। মায়াশক্তি ক্রিয়াশীল থাকিলে উহার অধিষ্ঠানরূপ মহাশক্তি সগুণ, এবং নিষ্ক্রিয় অবস্থায় নির্গুণ, এক মহাশক্তি মধ্যে সগুণ ও নির্গুণরূপ পবস্পরবিরোধী গুণেরও নিত্য সামঞ্জস্য বর্ত্তমান। নির্গুণ অবস্থাতেও গুণময়ী মায়াশক্তি তন্মধ্যে নিহিত, আবার সগুণ অবস্থাতে উহা সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র বলিয়া বস্তুতঃ নির্গুণ, অতএব মহাশক্তিতে সগুণ ও নির্গুণ উভয় লক্ষণই বিদ্যমান।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সৃষ্টি ও সংহার—পিণ্ড উৎপত্তি বিচার

সৃষ্টি অর্থে যাহা অব্যক্ত ছিল তাহা ব্যক্ত হওয়া। আর সংহার তাহার বিপরীত অর্থাৎ ব্যক্তের অব্যক্ত হওয়া। কোন কিছুরই অত্যন্ত নাশ নাই। স্বকারণে লীন হওয়াই সংহার বা প্রলয়। কার্য্য থাকিলেই কারণ থাকিবে এবং কর্তৃত্বও থাকিবে। কারণ কার্য্যরূপে ব্যক্ত হয়। কিন্তু কার্য্য ব্যক্ত না হইলে কারণ শক্তিরূপে অবস্থান করে। কার্য্যের অপেক্ষায় কারণকে শক্তি বলা হয়। শক্তিমানকে আশ্রয় করিয়াই শক্তি অবস্থিত, শক্তি শক্তিমান হইতে ভিন্ন নহে। ধর্ম্মীর ধর্ম্মই উহার শক্তি। ধর্ম্ম হইতেছে বস্তুর বুদ্ধভাব। যাহা বুদ্ধ হয় তাহাই ব্যক্ত—যাহা বুদ্ধ হয় না তাহা অব্যক্ত। শক্তি যদি দৃষ্ট বা অদৃষ্ট ক্রিয়ার প্রবর্ত্তনা করে তবেই তাহা বুদ্ধ হয়। শক্তির প্রসর হইতেই ক্রিয়ার প্রবর্ত্তনা আর তাহার সংকোচ হইতে ক্রিয়ার নিবৃত্তি। অতএব শক্তির প্রসরই সৃষ্টি, আর সংকোচই সংহার। "শক্তিপ্রসরসঙ্কোচৌ জগতঃ সৃষ্টিসংহৃতী"।[১] শিবই শক্তির আধার। শক্তি যখন সংবৃত্ত তখনই শিবাবস্থা, শক্তির প্রতিপ্রসবে নিরুত্থান দশাই শিবভাব—

> প্রসরং ভাসয়েচ্ছক্তিঃ সংকোচং ভাসয়েচ্ছিবঃ।
> তয়োর্যোগস্য কর্ত্তা যঃ স ভবেৎ সিদ্ধযোগিরাট্ ॥[২]

সৃষ্টি সংহৃত হইলে সৃষ্টির কাবণভূত শক্তি যেখানে লীন থাকে তাহাই সর্ব্ব কাবণের কারণ।

> কার্য্যকারণকর্তৃত্বং যদা নাস্তি কুলাকুলম্।
> অব্যক্তং পরমং তত্ত্বং স্বয়ং নাম তদা ভবেৎ ॥[৩]

অব্যক্তের যাহা মূল তাহাই পরমতত্ত্ব। এই পরমতত্ত্ব হইতেই শক্তির প্রসরে জগতের বা পিণ্ডের উৎপত্তি। উৎপন্ন জগৎ নিরাকার ও সাকার ভেদে দ্বিবিধ। সাকারও সূক্ষ্ম এবং স্থূল ভেদে দ্বিবিধ। সাকার-নিরাকার এবং সগুণ-নির্গুণের অতীত পরমতত্ত্ব হইতে ক্রমশঃ পর্য্যায়ক্রমে

১। সি. সি. স, ৪।২৪
২। সি. সি. স, ৬।৯, গো সি. স পৃঃ ২
৩। সি. সি স, ১।৪

ষট্‌পিণ্ডের আবির্ভাবের কথা সিদ্ধগণ বলেন। প্রথম পরপিণ্ড হইতে অনাদিপিণ্ড, অনাদিপিণ্ড হইতে আদ্যপিণ্ড, তাহা হইতে সাকার, সাকার হইতে শিবের অষ্টমূর্ত্তিবিশিষ্ট মহাসাকার পিণ্ড এবং মহাসাকার পিণ্ডের অন্যতম মূর্ত্তি ব্রহ্মা হইতে তাঁহার দৃষ্টিপাতে প্রাকৃত বা অবলোকনপিণ্ড ও তৎপর গর্ভপিণ্ড হইতে জীবোৎপত্তি।

গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহে সৃষ্টির নিম্নলিখিত ক্রমের উল্লেখ আছে। সর্ব্বতত্ত্বাতীত অদ্বৈতোপরিবর্ত্তী সাকার-নিরাকারাতীত নাথ হইতে নিরাকার জ্যোতির্নাথের উদ্ভব। তাঁহা হইতে সাকার নাথ, তাঁহার ইচ্ছা হইতে সদাশিব ও তাঁহা হইতে ভৈরব উৎপন্ন হন। ভৈরবের শক্তি ভৈরবী হইতে বিষ্ণু, এবং বিষ্ণু হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। ব্রহ্মা হইতে সর্ব্বসৃষ্টির উৎপত্তি।[১] অনামা বা নাথ বা পরমতত্ত্ব হইতে পরপিণ্ড (অনাদিপিণ্ড) ও আদ্যপিণ্ডে প্রকাশই নিরাকার সৃষ্টি। আদ্যপিণ্ড হইতে উৎপন্ন পঞ্চমহাভূত ও ব্রহ্মার দৃষ্টি হইতে সৃষ্ট প্রাকৃত পিণ্ডাদিই সাকার সৃষ্টি।

অনামা বা পরমতত্ত্বে সর্ব্বশক্তিই অন্তর্লীনভাবে আছে। তাঁহা হইতে ষট্‌পিণ্ডাত্মক জগৎ উদ্ভূত হইলেও তিনি আপন স্বাতন্ত্র্য-মহিমায় পূর্ণই থাকেন। তিনি বিশ্বময় হইয়াও বিশ্বাতীত। তিনি একাধারে সর্ব্বাতীত বা সর্ব্বোত্তীর্ণ এবং সর্ব্বাত্মক উভয়ই।[২] বিশ্বের প্রাদুর্ভাব তাঁহার পরা ও অপরা আদি শক্তির উন্মেষ হইতেই হয়। তাঁহার নিজাশক্তির নিত্যতা, নিরঞ্জনতা, নিরুত্থতা প্রভৃতি যে পঞ্চগুণের কথা নাথগণ বলেন তাহা দ্বারা তাঁহার দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জ্জিত স্বপ্রকাশ স্বসংবেদ্য স্বরূপেরই নির্দ্দেশ হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে শক্তির প্রসরই সৃষ্টি, এই প্রসরের প্রথম উন্মেষই ঔন্মুখ্যাত্মা পরাশক্তি। সৃষ্টির প্রাগ্‌ভাবী উন্মুখতাই এই পরাশক্তির স্বরূপ, উন্মুখী শক্তির পরবর্ত্তী অবস্থা স্পন্দন মাত্রা অপরাশক্তি ইহা হইতে অস্ফুট অহন্তার আবির্ভাব—ইহাই সূক্ষ্মাশক্তি, তাহা হইতে চৈতন্যময়ী কুণ্ডলিনীশক্তির আবির্ভাব।[৩] কুণ্ডলিনী শক্তির পূর্ণতা, প্রতিবিম্বতা, প্রবলতা (প্রকৃতিরূপতা), প্রোচ্চলতা ও প্রত্যঙ্‌মুখতারূপ যে পঞ্চগুণের কথা নাথদর্শনে পাওয়া যায়[৪] তাহা হইতে বুঝা যায় সৃষ্ট জগৎ পরতত্ত্ব হইতে উদ্ভূত হইলেও

১। গো. সি. স., ৭২ পৃঃ
২। সি সি. স. ১।৪
৩। সি. সি. স. ১।৫, ৬ ও ১।১৩ ; সি. সি. প. ১।৫-৮
৪। সি. সি. স. ১।১১

পরতত্ত্ব খণ্ডিত হইয়া যায় না। ইহাই তাঁহার পূর্ণতা। পরমতত্ত্বের পঞ্চশক্তির পঞ্চবিংশতি ভাবকে আশ্রয় করিয়া অপরম্পর পরমপদাদি পঞ্চভাবান্বিত পরপিণ্ডের উদ্ভব। প্রথম ভাব অর্চ্চিমাত্র (জ্যোতিঃ-স্বরূপ) অস্তিতাপূর্ব্ব, দ্বিতীয় ভাব স্বয়ংবেদনা, তৃতীয় ভাব সেচ্ছামাত্র, চতুর্থ ভাব সত্তামাত্র, পঞ্চম ভাব স্ব-সাক্ষাদ্‌ভূ।[১] গোরক্ষ উপনিষদে সৃষ্টি-তত্ত্বের বিষয় নিম্নলিখিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। "আদৌ দেবো মহানন্দো নির্মমে দেবতা স্বয়ম্। তস্মাদিচ্ছা সুসম্পন্না ইচ্ছাজ্ঞানং ততঃ ক্রিয়া॥ ততো ব্যথাং বরারোহে পিণ্ড-ব্রহ্মাণ্ড-বুদ্বুদম্। অব্যক্তব্যক্তভাবেন বিচরামি জগত্রয়ম্॥" অর্থাৎ সৃষ্টির আদিতে শিবশক্তির প্রসরের পূর্ব্বে একমাত্র নির্ম্মম মহানন্দময় আদিদেবী আপন মহিমায় বিরাজিত থাকেন। সৃষ্টির প্রথমে তাঁহার স্বারসিক ইচ্ছার উদয় হইলে তাহা হইতে ক্রমশঃ জ্ঞান ক্রিয়ার উদয় হয়, তৎপরে ব্যথা ও তাহার সহিত পিণ্ড এবং ব্রহ্মাণ্ড বুদ্বুদাকারে উদ্ভূত হয়।[২] উল্লিখিত ভাবসকলের সহিত তন্ত্রোক্ত সৃষ্টির প্রাগ্‌ভাবী পরমশিবের চিৎ আনন্দ ইচ্ছা জ্ঞান ক্রিয়াশক্তির ক্রমশঃ উন্মেষে শিবশক্তি সদাশিব ঈশ্বর সদ্‌বিদ্যাতত্ত্বের আবির্ভাবের বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়।

শিব স্বপ্রকাশ স্বরূপ। তাঁহার আনন্দশক্তির উন্মেষ হইতে শক্তির প্রসর আরম্ভ। তাহার ফলে প্রথম আত্মবিমর্শদ্বারা তাঁহার স্বাবসিক অহং ভাবের উদয়। ইহা নাথদর্শনের পরাশক্তিস্ফুরণে উন্মুখতার সহিত তুলনীয়। তৎপরে অপরাশক্তি ও সূক্ষ্মাশক্তির স্ফুরণে যে স্পন্দন ও অর্দ্ধার্দ্ধ অহন্তার কথা বলা হয় তাহা ইচ্ছাশক্তি ও জ্ঞানশক্তি প্রভাবে অহম্ ইদম্ ও ইদম্ অহং ভাবের স্ফুরণের অনুরূপ। ক্রিয়াশক্তির প্রভাবে অহম্ ও ইদং যখন পৃথক রূপে ভাসিত হয় তখনই স্ববাহ্যে জগতের আবির্ভাব অনুভূত হয়।

পরপিণ্ডের আবির্ভাবের পর প্রসরোন্মুখ শক্তি পরমানন্দ, প্রবোধ, চিদুদয়, প্রকাশ ও সোঽহং এই পঞ্চতত্ত্বের সমন্বয়ে আদ্যপিণ্ডরূপে প্রাদুর্ভূত হয়। এই আদ্যপিণ্ড হইতেই সাকার সৃষ্টি। সাকার সৃষ্টির আদিতে পঞ্চমহাভূতের আবির্ভাব। এই পঞ্চমহাভূতের পঞ্চবিংশতি গুণের সমাবেশে

১। সি. সি. প, ১৷১৮ তেজ দ্রষ্টব্য (পরিশিষ্টে যোজিত)　　২। গো সি. স, পৃ ৪০

শিবাদি অষ্টমূর্ত্তি ও নরনারী-আত্মক প্রাকৃত পিণ্ডের আবির্ভাবের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

নাথদর্শনে ব্যক্ত জগৎকে কুলপঞ্চক আখ্যা দেওয়া হয়। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, কাল ও জীব এই পাঁচটী লইয়া কুলপঞ্চক। যাহা ব্যক্ত যাহা নামরূপ বা বর্ণগোত্রাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন ; তাহাই কুল, তাহাই সৃষ্টি ; আর যাহা "বর্ণগোত্রাদিরাহিত্যাদেকমেব" তাহাই অকুল।[১] তাহা সৃষ্টির অবসানেও অকুল, সৃষ্টির পূর্ব্বেও অকুল। অকুল হইতেই কুলের উদ্ভব এবং কুল হইতেই ব্যবহার সিদ্ধ হয়।

অকুলং কুলমাধত্তে কুলাদ্ ব্যবহৃতির্ভবেৎ।
অতঃ কুলাকুলস্থিত্যানীশঈশোপি শঙ্কতে ॥[২]

কুলাকুলের স্থিতিহেতু অব্যক্ত পরমতত্ত্বই ঈশ অর্থাৎ জগতের নির্ম্মাতারূপে শঙ্কিত হন।

"শিবঃ স্বশক্তিসহিতো হ্যভাসাদ্‌ভাসকো ভবেৎ"।[৩]

সৃষ্টিই আভাস, নিরাভাসই সংহার বা লয়। সর্ব্বমূল ও সর্ব্বকারণের কারণ যে পরমতত্ত্ব তাহা স্বপ্রকাশ। তিনি দেশ কাল প্রভৃতির দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, জ্ঞানমাত্র রূপ। তাঁহার অহংবিমর্শের ফলেই সমগ্র জগৎ প্রমাতৃবর্গের নিকট উৎপন্ন, স্থিত ও উপসংহৃত রূপে ক্রমশঃ ভাসমান হইতেছে। নূতন আভাসের বিষয়ীভাব উৎপত্তি বা সৃষ্টি, আভাস-ধারার বিষয়ীভাব স্থিতি এবং আভাসের বিষয় না থাকাই লয় বা সংহার। প্রকাশই শিব, বিমর্শই শক্তি, প্রকাশরূপ শিবদ্বারা বিমর্শশক্তিযোগে প্রকৃতি বা জগৎ যখন বহিঃবিসৃষ্ট হয় তখন তাহাকে বিসর্গ আখ্যা দেওয়া হয়। "বিসর্গ এব বিশ্বজননে ভগবতঃ শক্তিঃ।"[৪] বিসর্গাখ্যা বিমর্শশক্তি বিশ্বসৃষ্টির কারণ। শিবরূপ প্রকাশ যখন আপন বিমর্শশক্তিকে আপনার মধ্যে সংবৃত করেন তখনই বিশ্বের উপরম হয়। তাহাই সংহার। এইরূপে সৃষ্টি ও সংহার অনাদিকাল হইতে প্রবাহরূপে চলিতেছে। ঘটাদি ভূতলে উৎপন্ন হইয়া ভূতল হইতে ভিন্নরূপে ভাসমান হয় কিন্তু জগতের উৎপত্ত্যাদি সেইরূপ নহে, দর্পণে যেরূপ প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়, জগতের উৎপত্ত্যাদিও সেইরূপ পরপ্রভিভাতে তদ্ব্যতিরিক্তরূপে অজ্ঞানীর নিকট ভাসিত হয়। তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে ইহাই সৃষ্টি এবং সংহারের স্বরূপ।

১। সি. সি. স. ৪।১০
২। সি. সি স. ৪।১৪
৩। সি. সি. স. ৪।১৬
৪। তন্ত্রসার, তৃতীয় আঃ ১৭ পৃ

নাথদর্শনে সৃষ্টিপ্রবাহে আর একটী ধারার কথা দেখা যায়। তাঁহারা বলেন নাথ হইতে দুই প্রকার সৃষ্টি হয়, এক নাদরূপা, অপর বিন্দুরূপা। নাদ জ্ঞানরূপ সুতরাং শিষ্যশিষ্যানুক্রমে জ্ঞানধারার সংরক্ষণে নাদরূপা সৃষ্টি এবং পুত্রপৌত্রাদিক্রমে সন্তানধারার সংরক্ষণে বিন্দুরূপা সৃষ্টি। নাদসৃষ্টিও স্থূলসূক্ষ্মভেদে দ্বিবিধ। নাদবিন্দু সম্প্রদায়ের বিষয় পরে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে।

নাদ হইতেই শব্দের সৃষ্টি, শব্দসৃষ্টিও স্থূলসূক্ষ্মভেদে দ্বিবিধ, প্রণব, মহাগায়ত্রী ও যোগশাস্ত্র সূক্ষ্ম শব্দ সৃষ্টি। ব্রহ্ম গায়ত্রী, বেদত্রয়ী স্থূল শব্দসৃষ্টি। যোগশাস্ত্র হইতে তন্ত্রশাস্ত্র এবং বেদ হইতে স্মৃতিশাস্ত্র উৎপন্ন।[১] পরম্পরাক্রমে "নবনাথানাং পশ্চাদ্ দ্বাদশসিদ্ধাশ্চতুরশীতিশ্চ দ্বাদশোপস্থানো অনন্তসিদ্ধাশ্চ জাতাঃ। সদাশিবোভৈরবাদ্ বিষ্ণুর্ব্রহ্মা সূর্য্যশ্চন্দ্র ইন্দ্রাদি দেবতা জাতাঃ। পুনঃ যোগাৎ শেষযোগসাংখ্যযোগাদয়োঽনেকযোগা অনেক ভেদৈর্জাতাঃ।[২] এক হইতেই বহু ও বিচিত্রের উদ্ভব এই তত্ত্বই উপরোক্ত বিবরণ হইতে সংগৃহীত হয়।

নাথগণের দৃষ্টি অনুসারে বিগ্রহসৃষ্টিও দ্বিবিধ, প্রবৃত্তিরূপিণী ও নিবৃত্তিরূপিণী।[৩]

শক্তির অবরোহণ হইতে প্রবৃত্তিবিগ্রহ আর অধিরোহণ হইতে নিবৃত্তিবিগ্রহ। অবরোহণ স্বরূপতঃ প্রসররূপ এবং অধিরোহণ সঙ্কোচরূপ। সুতরাং প্রবৃত্তিই সৃষ্টিরূপা এবং নিবৃত্তি সংহাররূপা। জীবের পক্ষে প্রবৃত্তি হইতেই সংসার, নিবৃত্তি হইতে মোক্ষ বা জীবভাবের তিরোভব। সমষ্টিদৃষ্টিতে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি এবং সংহারও যেরূপ, ব্যষ্টি-দৃষ্টিতে জীবের সংসার ও মোক্ষও সেইরূপ। এই সৃষ্টি ও সংহৃতি তত্ত্বের যথার্থ জ্ঞানের উপরই নাথগণের সমগ্র সাধন-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত। নিশ্চল, নির্ম্মল, সদানন্দ দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জ্জিত পরমতত্ত্ব হইতে তাঁহার অন্তর্লীন শক্তির প্রসরে ব্রহ্মাণ্ড উদ্ভূত হইয়া যেমন প্রলয়কালে তাঁহাতেই সংহৃত হয়, জীবেরও সেইরূপ স্বপিণ্ডস্থ সমগ্র প্রবৃত্তিমুখী শক্তি সাধনবলে অন্তর্মুখী হইয়া ক্রমশঃ পরমতত্ত্বের সহিত সামরস্য লাভ করে। এই সমরস করণই পরমপদ-প্রাপ্তি।

১। গো সি. স. পৃ ৭২
২। গো সি. ৭২ পৃঃ
৩। গো সি. ৭২ পৃঃ

নাথ-সম্প্রদায়ে প্রচলিত বঙ্গ-সাহিত্যে সৃষ্টিপত্তন বর্ণনা

নাথসম্প্রদায়ের সংস্কৃত গ্রন্থে উল্লিখিত সৃষ্টি ও সংহার বর্ণিত হইয়াছে, নাথদের বঙ্গগীতিকাদিতেও সৃষ্টিপত্তন বর্ণনা পাওয়া যায়। অলেকনাথ বা 'নিরঞ্জন' গোঁসাই অনাদি ধর্ম্মনাথকে সৃষ্টি করেন, তৎপরে অলেকনাথের মুখামৃত হইতে স্থলের (জলের ?) সৃষ্টি হইল, অনাদিনাথ তাহার উপর আসন করিয়া বসিলেন। তৎপরে অলেকনাথ নিজ দেহের শক্তি হইতে (কা)'কেতুকা' দেবীকে সৃজন করিলেন। দেবী অনাদির পদান্তর সহ্য করিতে না পারিয়া মরিয়া গেলেন। তখন অলেকনাথ গঙ্গাকে সৃষ্টি করিয়া অনাদির জটায় স্থাপনা করিয়া উহাদের উপর সৃষ্টির ভার অর্পণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। অনাদির কৃপায় (কা)'কেতুকা' দেবী পুনর্জীবিতা হইলেন ও আদি অনাদি মিলিয়া সৃষ্টি আরম্ভ করিলেন। বাসুকি ও পাতাল সৃষ্ট হইল, বাসুকির মস্তকে ত্রিকোণ পৃথিবী স্থাপিত হইল। অনাদির মুষ্টির ভিতর অন্ধ-বধির ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব জন্মিলেন। অনাদি ছদ্মবেশে তাহাদের নিকট রন্ধনের জন্য অপোড়া পৃথিবী চাহিলে, একমাত্র শিব তাঁহার মাথার জটায় রন্ধন ভোজন করিতে বলিলেন। অনাদি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি লাভের উপায় বলিয়া দিলেন। শিব তাহা লাভ করিয়া, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে উপায় বলিয়া দিলেন। তৎপরে শিব অনাদিনাথের আজ্ঞায় গঙ্গা ও গৌরীকে বিবাহ করিলেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তপস্যায় বসিলে অনাদি শবরূপে আবির্ভূত হইলেন, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু ঘৃণায় পলাইলেন, শিব তাঁহার সৎকার করিলেন। দাহকালে অনাদির দেহের বিভিন্ন অংশ হইতে অষ্টসিদ্ধা ও নবনাথের উৎপত্তি হয়।[১]

নাথপন্থীয় যোগীরা শিব ও ধর্ম্ম নিরঞ্জন উভয়ের উপাসক। তাহাদের নিরঞ্জন 'অলেখ'। বৌদ্ধ ও শৈবধর্ম্মের সংমিশ্রণে নাথধর্ম্মের উৎপত্তি কল্পিত হয়। বজ্রযান, সহজযান, যোগী ও নাথসম্প্রদায়ের ধর্ম্মের সহিত যে ধর্ম্মঠাকুরের এককালে জ্ঞাতিত্ব ও সংস্পর্শ ছিল তাহার আভাস সৃষ্টিখণ্ডীয় আখ্যান ও প্রহেলিকা হইতে পাওয়া যায়। ইচ্ছাশক্তিমান্ ঈশ্বরই ধর্ম্মঠাকুর, তিনি শূন্যরূপ। তাঁহার ইচ্ছায় নিরঞ্জন পুরুষ ও মহামায়া প্রকৃতির সৃষ্টি হইয়াছে।[২]

১। সা. প. প. ৩১শ ভাগ, ২য় সংখ্যা, উল্লেখ শূন্যপুরাণের ভূমিকায় পৃ ২১।

২। শূন্যপুরাণ ভূমিকা পৃ ১১৩, ১৩১।

শূন্যপুরাণ নামে ধর্ম্মঠাকুরের যে পূজাপদ্ধতি আছে, তাহার সৃষ্টি-পত্তন বর্ণনার সহিত নাথপন্থের সৃষ্টিতত্ত্বের সাদৃশ্য আছে। শূন্যপুরাণের প্রথমেই অন্ধকারময় অবস্থার বর্ণনা করা হইয়াছে, যথা—

নহি রেক নহি রূপ নহি ছিল বন্ন চিন।
রবি সসী নহি ছিল নহি রাতি দিন॥
নহি ছিল জল থল, নহি ছিল আকাশ।
মেরু মন্দার ন ছিল না ছিল কৈলাস॥
নহি ছিল ছিষ্টি.... ...... ইত্যাদি।

এই মহাশূন্য মাঝে একমাত্র প্রভু বিরাজ করিতেন, তাঁহার দ্বিতীয় কেহ ছিল না। ঘোর অন্ধকার দ্বারা সকল আচ্ছন্ন ছিল। প্রভু শূন্যে ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহার সৃষ্টির বাসনা হইল, এই ইচ্ছার পরেই প্রাণের 'স্পন্দন' আরম্ভ হইল। সেই স্পন্দনরূপ পবন হইতে দুই 'অনিল' শ্বাসপ্রশ্বাস জন্মিলেন। এই শ্বাসপ্রশ্বাসের 'বিকাশ' ও 'সঙ্কোচ' অর্থও হইতে পারে। প্রভু জীব উদ্ধারার্থে বিশ্ব সৃষ্টি করিলেন,—"আপনি সিরজিল পরভু আপনার কাআ"। সেই পুরুষ হস্তপদহীন, অক্ষিহীন, পিতৃমাতৃহীন, তিনিই নিরঞ্জন বা নারায়ণ। তাঁহার ঘর্ম্ম হইতে আদ্যা-শক্তির উৎপত্তি, আদ্যার গর্ভে 'বম্ভা বিষ্ণু সিবের' উৎপত্তি এবং নিরঞ্জন ও আদ্যার যোগে সমস্ত জীবের সৃষ্টি।

এই নিরঞ্জন শূন্যমূর্ত্তি, এই কল্পনা মধ্যে বৌদ্ধদের প্রভাব স্পষ্ট, কারণ আদিবুদ্ধ বা আদিনাথ শূন্য হইতে প্রকাশিত। শূন্যপুরাণের সেতাই নীলাই কংসাই রামাই ও গোসাঞি, পঞ্চধর্ম্মপ্রচারক, ইহারা কি পঞ্চধ্যানীবুদ্ধার রূপান্তর? নিরঞ্জনের শূন্যমূর্ত্তি জ্যোতির্ম্ময় ও ধবলবর্ণ। বৌদ্ধদের শূন্যও স্বয়ংজ্যোতি, কারণ বৌদ্ধমতে আলোক হইতেই জাগতিক সকল পদার্থের উৎপত্তি। শূন্যের দুই রূপ, তন্মধ্যে নিরঞ্জন নিরাকার, ধর্ম্ম সাকার। কিন্তু অন্যত্র "দীপমন্ত অনল জেহেন নিকলয়। তনুমধ্যে হেনমতে আছে নিরঞ্জন"[১] দ্বারা নিরঞ্জনের মূর্ত্তির কল্পনা পাই। ধর্ম্মের বাহন উলূক, গজ ও কূর্ম্ম, তাঁহার আসন পদ্ম। ধর্ম্মঠাকুর ক্রমশঃ স্তূপ ও তৎপরে কূর্ম্মাকারে পূজা পাইয়া আসিয়াছেন। এই কূর্ম্ম

১। গোরক্ষবিজয়, পৃ ১৯৪।

বৌদ্ধ-দেবতা বা বৌদ্ধস্তূপের প্রতীক নহে, ইহা ধর্ম্মঠাকুরের পাদপীঠ, ধর্ম্ম সূর্য্যঠাকুর।[১]

গোরক্ষবিজয় গ্রন্থেও সৃষ্টিপত্তন বর্ণনা আছে। তাহা এইরূপ—

প্রথমে আছিলা প্রভু ন চিনি আপনা।
জে জন আছিল সঙ্গে সে কৈল চেতনা॥
চৈতন্য পাইয়া দেখে আপনা আকার।
আকার দেখিয়া তান জর্ম্মিল বিকার॥
এবা কোন জন হয়ে আছে মোর পাশ।
এ বলিয়া ধরিবারে মনে কৈল আশ॥[২]

অর্থাৎ প্রথমে প্রভু স্বয়ং নিজেকে না দেখিয়া অবস্থান করিতেছিলেন, ইহা তাঁহার বিশ্বাতীত (transcendental) বা তুরীয় অবস্থা, ইহাই প্রথমাবস্থা। প্রভুর মধ্যে যে শক্তি (জে জন = শক্তি) ছিলেন, তাঁহার দ্বারাই প্রভুর চৈতন্যের (consciousness) উদয় হইল, এই শক্তির সাহায্যেই প্রভু নিজেকে চিনিলেন। কারণ, গুণাবধারণের যোগ্য দ্বিতীয় জন না থাকিলে প্রথম জনের গুণ অজ্ঞাতই থাকিয়া যায়, তুলনা-মূলক বস্তুবিহীন অবস্থায় কোন 'স্থান' নির্ণয় সম্ভব নহে, অতএব শিবকে বুঝিতে হইলে শক্তির প্রয়োজনীয়তা আছে।

স্বীয় শক্তির রূপ দেখিয়া প্রভু বিস্মিত হইলেন, আকার দেখিয়া প্রভুর বিকার জন্মিল, শক্তিকে ধরিবার জন্য তিনি ইতস্ততঃ ধাবমান হইলেন। তৎপরে শক্তিকে ধরিয়া তাহাকে বিদীর্ণ করিলেন, তখন তাহা হইতে আকাশ ক্ষিতি আদি বিভিন্ন তত্ত্বের উদ্ভব হইল, ইহাই সৃষ্টির দ্বিতীয় বা উচ্চতর অবস্থা। ইহার পর কিয়ৎক্ষণ অচৈতন্য অবস্থায় ব্যতীত হইবার পর, চৈতন্যের উদয়ে বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, সৃষ্টি কিরূপে সম্ভব হইল? তিনি স্বয়ং যে সৃষ্টিকর্ত্তা তাহা তিনি বিস্মৃত হওয়াতেই তাঁহার এই বিস্ময়ের উৎপত্তি। জলে তরঙ্গবৎ তাঁহার ভাবনারাশির উদয় হইতে থাকিল এবং তাহা হইতে ক্রমশঃ ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি দেবতা ও কতশত 'মহামন্ত্রের' উদয় হইতে লাগিল। ভাবনার সঙ্গিত যে ঘর্ম্মের ধারা বহিতে লাগিল তাহা হইতে মন্ত্র, দেবতার যে সৃষ্টি, তাহাই সৃষ্টির তৃতীয় অবস্থা। অনাদ্য হইতে শিব, গোরক্ষ,

---

১। Cult of Dharma, Dr. S. Sen, p. 4.

২। গোরক্ষবিজয়, পৃ ১

মৎস্যেন্দ্রাদির জন্ম। মন্ত্র, দেবতাদির বাসস্থানের নিমিত্ত আকাশ, পাতালাদি সৃষ্টি হইল, ইহাই সৃষ্টির চতুর্থাবস্থা। সৃষ্টির বিভিন্ন অবস্থায় বৃক্ষের মধ্যে বীজের ন্যায় শিব শক্তিতে লীন হইয়া থাকেন—"আদ্য আছেন্ত অনাদ্য আছুতিয়া",[১] তাই শক্তি সৃষ্টিকর্ত্রীরূপে পরিচিত, বস্তুতঃ শক্তি মধ্যে শিব যোগমগ্ন হইয়া বিরাজ করেন এবং তিনি প্রকৃত সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়াও ঘট অর্থাৎ রূপবর্জ্জিত। যেমন গাছের মধ্যে বীজ ও বীজ মধ্যে গাছ, তেমনি শক্তি মধ্যে শিব এবং শিব মধ্যে শক্তি সদা বিরাজিত। ইহাই সৃষ্টি ও সংহার তত্ত্ব।

১। গোরক্ষবিজয়, পৃ ৩

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

জীব, ঈশ্বর ও জগৎ

শক্তি ও শক্তিমান নিত্য সম্বন্ধযুক্ত; তাহাদের সম্বন্ধ 'অহম্ মমেতিবৎ' অভেদ। শিব বা শক্তিমান নিজেকে মায়াশক্তির দ্বারা আবরিত করিয়া জীবসংজ্ঞা প্রাপ্ত হন, প্রাণিমাত্রেরই সাধারণ নাম জীব, এবং প্রাণিমাত্রেই দেহাবচ্ছিন্ন চেতন পুরুষ। স্বপ্রকাশ অবিনাশিরূপে বিদ্যমান শিব হইতে জ্ঞানশক্তির আবির্ভাব হয়, তাহা হইতে নাম ও রূপ দ্বারা ব্যক্ত সংসাবেব বা জগতেব উৎপত্তি, তাই শিবরূপ নিমিত্ত-কারণই হইতেই উপাদান-কারণ উদ্ভূত এবং নিমিত্ত ও উপাদান-কারণেব মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনের জন্যই শক্তিতত্ত্ব স্বীকৃত হয়, ইহাকে ঈশ্বর হইতে ভিন্ন বলা হয়, অথচ শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন তাহাও বলা হয়। চেতন স্বরূপ শিব সঞ্জীবক এবং জগৎ তাঁহাব দ্বারা সঞ্জীবিত জড় শক্তি। ঈশ্বব, জীব ও জগৎ তিনই তিনি স্বয়ং, ভোক্তা ভোগ্য ও ভোগও তিনি। সাংখ্যকারিকায় আছে "সৌক্ষ্যাত্তদনুপলব্ধির্নাভাবাৎ কার্য্যতস্তদুপলব্ধেঃ" অর্থাৎ অত্যন্ত সূক্ষ্ম হইবার কারণ জগতের উপাদানস্বরূপ শক্তির প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয় না, উহার অসৎ হইবার কারণে নহে, কারণ জগৎরূপ কার্য্য দ্বারাই তাহার কারণ জ্ঞান হয়।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে,

তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্
দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি
কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ॥ ১।৩

যে অদ্বিতীয় পরমাত্মা কাল ও জীব প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত নিখিল কারণ-সমূহকে যথানিয়মে পরিচালিত করেন, সেই দেবের স্বাত্মভূত ত্রিগুণাত্মিকা শক্তিকেই ব্রহ্মবাসিগণ সমাধি সহায়ে পরমাত্মার জগৎকারণত্বের সহায়রূপে দর্শন করেন। অর্থাৎ মায়াই সৃষ্টির পরিণামী কারণ, মায়া-শক্তি সহায়েই ব্রহ্ম জগতের কারণস্বরূপ হইয়া থাকেন। মায়া ত্রিগুণা-ত্মিকা "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্" (৪।১০ শ্লোক, শ্বেতাঃ উপঃ)। প্রকৃতিকে মায়া বলিয়া ও পরমেশ্বরকে মায়াধীশ বলিয়া জানিবে।

"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" (৬।৮ শ্লোক, শ্বেতাঃ উপঃ)—অর্থাৎ পরাশক্তি বা মায়া বিচিত্র কার্য্যকারিণী, এবং তিনি জ্ঞানরূপ বল দ্বারা যে সৃষ্টিক্রিয়া করেন তাহাও স্বাভাবিক অর্থাৎ মায়িক। 'জ্ঞানবলক্রিয়া' অর্থে জ্ঞান ও বলের দ্বারা যুক্ত ক্রিয়াশক্তি।

দেবীভাগবতে আছে—

"প্রকৃষ্টবাচকঃ প্রশ্চ কৃতিশ্চ সৃষ্টিবাচকঃ।
সৃষ্টৌ প্রকৃষ্টা যা দেবী প্রকৃতিঃ সা প্রকীর্ত্তিতা॥

অর্থাৎ সৃষ্টিতে প্রকৃষ্ট বা মুখ্যস্বরূপে যিনি জগতের সৃষ্টিকর্ত্রী, তিনিই 'প্রকৃতি'। এখানে উভয়কে ভিন্নভাবে দেখাইলেও শক্তি শক্তের আধারেই স্থিত, তাঁহারা ঘট ও পটের ন্যায় ভিন্ন নহেন। কঠোপনিষদেও আছে "অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।"

প্রকৃতি বহুবিধ জীব সৃষ্টি করেন সত্য, কিন্তু একমাত্র মনুষ্যজীবের বন্ধ ও মোক্ষের কারণপরম্পরা এবং সাধ্যসাধনতত্ত্ব যোগশাস্ত্রের মুখ্য আলোচ্য বিষয় বলিয়া জীব শব্দে মনুষ্য অর্থ ব্যবহৃত হয়। দেহাদির দ্বারা চিৎশক্তির অবিচ্ছিন্ন হইবার যে সম্ভাব্যতা, তাহাই জীবের জীবভাব, "পাশবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তঃ সদা শিবঃ"।[১] পাশবদ্ধতা হেতু জন্ম-মৃত্যুর মধ্য দিয়া জীবকে বারম্বার দেহ ধারণ করিতে হয়। দেহাবচ্ছিন্ন জীব আপন চিৎস্বরূপ উপলব্ধি করিতে অসমর্থ। ইহা তাহার অনীশ্বরতা। দেহবন্ধ হইতে মুক্ত হইলে জীব স্বরূপে অবস্থান করিতে পারে। বস্তুতঃ জীব শিবস্বরূপ, আমি শরীর এইরূপ অভিমানই দেহধারণের মূল কারণ। এই অভিমান দূর করিতে পারিলে জীব জন্মমৃত্যুর উর্দ্ধে উঠিতে সক্ষম হয়।

জীবের জন্ম অর্থে জগতের কোন লোকে দেহধারণপূর্ব্বক আবির্ভাব, ও মৃত্যু অর্থে পূর্ব্বধৃত দেহ ত্যাগ করিয়া দেহান্তর গ্রহণ। জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে জীব অনাদিকাল হইতে দোলায়মান রহিয়াছে; স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই ত্রিবিধ দেহ ধারণ করিয়া জীব লোক হইতে লোকান্তরে আবর্ত্তিত হইতেছে। স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের বীজভূত অবিদ্যাশক্তিই জীবের কারণ শরীর। মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত কারণ দেহের নাশ নাই, উহাকে আশ্রয় করিয়াই জীব স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর পরিগ্রহ করে, এবং বাসনাক্ষয়কারী কর্ম্ম করিতে করিতে জন্মমৃত্যুর মধ্য দিয়া মুক্তিপথে অগ্রসর হয়।

জীব সম্বন্ধে একজীববাদ ও অনন্তজীববাদ এই দুইটী বিভাগ আছে।

১। কুলার্ণবতন্ত্র—১।৪৮

একজীববাদে একটীমাত্র জীব বিদ্যমান, তিনি ঈশ্বরও সৃষ্টি করিয়াছেন জগৎও সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার মুক্তি হইলে জগৎব্যাপার রুদ্ধ হইবে, সেই নিমিত্ত একজীববাদ অসম্ভব। অনন্তজীববাদে অনন্তকোটী জীব বিদ্যমান, এক চিৎসূর্য্য স্বরূপের কিরণ কণস্থানীয় চিৎপরমাণুস্বরূপ অনন্ত জীব বিদ্যমান আছে, প্রত্যেকের নিজস্বসাধনে নিজের মুক্তি হয়, তাহাতে অন্যের মুক্তি সম্ভবে না।

ঈশ্বরের সংজ্ঞা সম্বন্ধে বেদান্তে ও তন্ত্রে যথেষ্ট ভেদ আছে। বেদান্তের ঈশ্বর মায়াযুক্ত ব্রহ্ম, এই মায়া সত্ত্বগুণপ্রধান, রজঃতমোগুণ তাঁহার মধ্যে অপ্রধানরূপে বর্ত্তমান, কারণ সত্ত্বরজস্তমো অবিনাভাবী। তন্ত্রের ব্রহ্ম মধ্যে চিৎশক্তি আছে, ইহা মায়াতীত শুদ্ধ-শক্তিযুক্ত শিব। 'মায়াতীত' কারণ মায়া 'জড়' বলিয়া চৈতন্যরূপ শিবের সহিত যুক্ত হইতে পারে না, কিন্তু 'চিৎ'শক্তি যুক্ত হইতে পারে কারণ তাহাও চৈতন্যময়, এই যুক্ত অবস্থাতেই 'শিব', চিৎশক্তির অন্তর্লীন অবস্থায় শিব শবরূপ বা শববৎ। বিমর্শরহিত প্রকাশ জড়তা, বিমর্শযুক্ত প্রকাশই চৈতন্য। শিবের নিত্য অবস্থায় অর্থাৎ বিমর্শমুক্তাবস্থায় শিবের কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি থাকে না।

জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর, এই ঈশ্বর মায়ার সহিত যুক্ত হইয়া যে জগৎ সৃষ্টি করেন তাহা সৃষ্টির নিম্নক্রম, কিন্তু শিব ও শক্তির যোগে যে ঈশ্বরাদি সৃষ্টি হয় তাহা সৃষ্টির ঊর্দ্ধক্রম।

চিৎশক্তিমান শিবকে লাভ করিতে হইলে কৈবল্যাবস্থার ঊর্দ্ধে যাইতে হইবে, কৈবল্যাবস্থা সাংখ্যের নির্ব্বিকল্প সমাধিমাত্র। ইহার ঊর্দ্ধ স্তরে যাইতে পারিলে তবেই ঈশ্বরত্ব-লাভ হয়। অতএব কৈবল্য-লাভ ও ঈশ্বরের সমান হওয়া এক কথা নয়। ঈশ্বরত্ব-লাভে সৃষ্টির ক্ষমতা জন্মে, কৈবল্যলাভে সে ক্ষমতা জন্মে না।

বিম্ব মিথ্যা হয় না, প্রতিবিম্বই মিথ্যা হয়। যথা সূর্য্য মিথ্যা নহে, জলে বহু সূর্য্যের প্রতিবিম্বই মিথ্যা। সেইরূপ চিদ্রূপা শক্তি সত্য, মায়াতীত জগৎও সত্য, উহাই চৈতন্যময় জগৎ বা বৈষ্ণবের নিত্যধাম। যেমন সর্প সত্য, কিন্তু সর্পে রজ্জুভ্রম মিথ্যা। আবার ব্রহ্মকে সীমাবিশিষ্ট করা বেদসিদ্ধ নহে, কারণ তিনি অসীম। অসীম বস্তু প্রতিবিম্বিত হইতে পারে না, তাই ব্রহ্ম মায়ায় প্রতিবিম্বিত হন, ইহা মিথ্যা।[১] অর্থাৎ যাহার বিকার তাহা সত্য, কিন্তু বিকার মিথ্যা।

১। জৈবধর্ম্ম, কেদার দত্ত—১৫ অধ্যায়, পৃ ২৬২

সেইরূপ মায়াতীত জগৎ সত্য, কিন্তু মায়াময় জগৎ মিথ্যা। শিব ও শক্তি অভিন্ন কিন্তু শিব নিরাকার, শক্তি সাকার, ইহাদের সংযোগে জগতের যে সাকাররূপ দেখা যায় তাহা মিথ্যা (যেমন ছায়াচিত্রে প্রদর্শিত যানবাহনাদি মিথ্যা, কিন্তু তাহার অন্তরালে যে যানবাহন আছে তাহা সত্য, তাহার প্রতিবিম্ব রূপ ছায়াচিত্রই মিথ্যা), কারণ চৈতন্যের বিকাশে উহার লয়প্রাপ্তি ঘটে। জগতে যে সকল ঘটাদিরূপ প্রতিবিম্ব পড়ে তাহা মিথ্যা কিন্তু তাহাদের মূলে যে বিম্ব আছে তাহা সত্য, যেমন দর্পণস্থ গোলাপ মিথ্যা কিন্তু গোলাপ বস্তু সত্য।

ব্যবহারিক দৃষ্টিতে বেদান্তের ব্রহ্ম ঈশ্বর বা জড় মায়াযুক্ত, বেদান্ত-মতে এই মায়াকে সাধনদ্বারা দূর করা যায়। পারমার্থিক দৃষ্টিতে ব্রহ্ম শুদ্ধ ও নিষ্ক্রিয়, কিন্তু মায়াযুক্ত শুদ্ধ ব্রহ্মই ঈশ্বর, মায়াব দ্বারাই আবরণ ও বিক্ষেপের সৃষ্টি হয় (যেমন মনুষ্যের স্থূল চক্ষুর আবরণ স্বরূপ চক্ষুর ছানি cataract হইতেই বিক্ষেপের সৃষ্টি হয়)।

কিন্তু তন্ত্রের শিবের সহিত চিৎশক্তি যুক্ত, অতএব তন্ত্রের চিদ্‌রূপা শক্তি সর্ব্বদাই শিবযুক্ত ও শক্তিমানের সহিত অভিন্ন, বেদান্তের মায়ার ন্যায় ইহাকে সাধন দ্বারা দূর করা সম্ভব নহে।

নাথগণের ঈশ্বরতত্ত্বে অষ্টমূর্ত্তি বা শিব হইতে ভৈরব, ভৈরব হইতে শ্রীকণ্ঠ, শ্রীকণ্ঠ হইতে সদাশিব, সদাশিব হইতে ঈশ্বর, ঈশ্বর হইতে রুদ্র, রুদ্র হইতে বিষ্ণু, বিষ্ণু হইতে ব্রহ্মা (গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহ, পৃ ৩১) এই অষ্টমূর্ত্তির কল্পনা করা হইয়াছে। ঈশ্বরতত্ত্বের এই অষ্টবিভাগ এবং ব্রহ্মার অবলোকনে সৃষ্টি। শঙ্কর-পরবর্ত্তী বেদান্তে ঈশ্বর-তত্ত্বে প্রতিবিম্ববাদ, অবচ্ছেদবাদ, আভাসবাদ প্রভৃতি মত প্রচলিত আছে। মতবাদগুলি সংক্ষেপে এইরূপ—

অজ্ঞানে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যকে 'ঈশ্বর' এবং বুদ্ধিপ্রতিবিম্বিত চৈতন্যকে 'জীব' বলে, কিন্তু অজ্ঞানরহিত বিম্বরূপ চৈতন্য 'শুদ্ধ'। স্বতন্ত্রাদি গুণবিশিষ্ট হওয়ায় ঈশ্বর বিম্বস্থানাপন্ন ও পরতন্ত্রতার কারণ অবিদ্যাতে যে চিদাভাস তাহা জীব, অর্থাৎ ঈশ্বর বিম্বরূপ ও জীব প্রতিবিম্বরূপ, ইহাই প্রতিবিম্ববাদ। কিন্তু রূপযুক্ত বস্তুর রূপের মধ্যে প্রতিবিম্ব পড়ে (যেমন, চন্দ্রমার প্রতিবিম্ব জলে পড়ে); ব্রহ্ম রূপহীন, তাঁহার প্রতিবিম্ব কিরূপে সম্ভব?

বাচস্পতি মিশ্র অবচ্ছেদবাদ যুক্তিযুক্ত বলেন। এই মতে এক

চৈতন্যই অজ্ঞান ও বিষয় ভেদে দ্বিপ্রকার। অজ্ঞান আশ্রয়ভূত চৈতন্যই 'জীব', আর অবিদ্যাবচ্ছিন্ন চৈতন্য 'ঈশ্বর'। স্বজ্ঞান উপস্থিত হওয়ায় জীবজগতের উপাদান কারণ ও ঈশ্বর উপাচার মাত্র রূপে 'কারণ' বলা যায়। (সিদ্ধান্তবিন্দু, পৃ ৮০)।

অদ্বৈতমতে এক আত্মাই সত্য, তিনি জগৎকারণ বা সাক্ষী নহেন। তথাপি অজ্ঞান উপাধিযুক্ত আত্মা অজ্ঞানের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া উহাতে পতিত চিদাভাসের অবিবেকের কারণ, সাক্ষী, ঈশ্বর ইত্যাদি নামে অভিহিত হন। বুদ্ধি উপহিত তাদাত্ম্যকে লাভ করিয়া বুদ্ধিগত স্বকীয় চিদাভাসকে না জানিয়া জীব কর্ত্তা, ভোক্তা, প্রমাতা হন। ইহাই আভাস-বাদ, এই মতে জীব নানা, ঈশ্বর এক। (ভারতীয় দর্শন, পৃ ৪৪৮, ৪৪৯)।

জীব, ব্রহ্ম ও ঈশ্বরে নিম্নলিখিতরূপ ভেদ আছে—

১। সগুণ ঈশ্বর = ব্রহ্ম—মায়াযুক্ত—সত্ত্বগুণপ্রধান।

২। জীব = ব্রহ্ম—অবিদ্যা—রজস্তমোগুণপ্রধান।

৩। শুদ্ধব্রহ্ম = জীবও নহে, ঈশ্বরও নহে।

নাথগণ যে ব্রহ্মের অবলোকনে সৃষ্টি কল্পনা করেন, তাহা উপরোক্ত সগুণ ঈশ্বর।

গুরু গোরক্ষনাথের মতে যিনি ষট্‌পদার্থ সমন্বিত, তিনিই ভগবান। এই ষট্‌পদার্থ সমগ্র ঐশ্বর্য্য, ধর্ম্ম, যশ, শ্রী, জ্ঞান, বৈরাগ্য। সমগ্র ঐশ্বর্য্যই যোগ, তাহা সহজসিদ্ধিরূপ। ধর্ম্ম হইতেছে মুক্তিরূপ, যে মুক্ত-স্বরূপ তাহারই যশ; শ্রীও মুক্তস্বরূপকে মণ্ডিত করে, জ্ঞান ও বৈরাগ্যও তাহার, সেই সর্ব্বাধার-স্বরূপ 'নাথ'। শক্তি সৃষ্টিকর্ত্রী, শিব পালনকর্ত্তা, কাল সংহারকারী ও নাথ মুক্তিদাতা। নাথই মুক্ত শুদ্ধ আত্মা স্বরূপ, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব শক্তি ইত্যাদি নামভেদে সংসার প্রবর্ত্তকরূপ তাঁহারা বদ্ধ, জীব-রূপে বন্ধন, ঈশ্বররূপে বন্ধনকর্ত্তা,—জীবাত্মা ও পরমাত্মায় ইহাই ভেদ।[১]

দ্বৈতবাদীরা ব্রহ্মকে সক্রিয় বলেন, অদ্বৈতবাদীরা নিষ্ক্রিয় বলেন, কিন্তু 'সর্ব্বদা ক্রিয়ৈব ন ভবতি সর্ব্বদা হ্যক্রিয়ৈব চ ন ভবতি', ঈশ্বর মধ্যেও ক্রিয়াক্রিয়া উভয় শক্তি বর্ত্তমান। পূর্ণব্রহ্ম একদিশা নহেন, অর্থাৎ সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় নহেন। দ্বৈতবাদীদের কৈলাস-বৈকুণ্ঠ আদি স্থান, অদ্বৈত-বাদীদের 'মায়াশবলং ব্রহ্মস্থান', কিন্তু নাথস্থান নির্গুণ।[২]

১। গো. সি. স. পৃঃ ৬৯, ৭০   ২। গো. সি স. পৃ ৭১

নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে নাথের ভেদ আছে, ব্রহ্ম ব্যাপক, নির্গুণ ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপক নহে, কারণ নির্গুণ ব্রহ্ম শক্তিরহিত মাত্র। নাথস্বরূপ নির্গুণ-সগুণের অতীত (গো. সি. স., পৃ ৭২)। বামভাগে স্থিত শিব সাকার ও সংসারের কল্যাণকারী, সব্যভাগে বিষ্ণুস্থিত ইনি সংসারে প্রবৃত্তকারী, মধ্যভাগে স্বয়ংপূর্ণ নির্গুণ-সগুণাতীত সর্ব্বশিরোমণি নাথ, নাথের জ্যোতিরূপই তাঁহার সাকাররূপ। সর্ব্বদেবতা অপেক্ষা শিব উত্তম, শিব হইতেও উত্তম 'নাথ'।[১]

শিবশক্তি অভেদ 'বা' শক্তি নামে বিখ্যাত, 'ম' শিব নামে কীর্ত্তিত, আবাব যে কালী সেই তারা, যে শিব সেই রাম উহারা একই।[২]

কৈবল্য উপনিষদে ঈশ্বরেব লক্ষণ উক্ত হইয়াছে,

"চিদ্‌আনন্দস্বরূপ উমাসহায় পরমেশ্বর প্রভু ত্রিলোচন নীলকণ্ঠ ও প্রশান্ত। স ব্রহ্মা স শিবঃ সোঽক্ষবঃ পরমঃ স্বরাট্ স এব বিষ্ণুঃ স প্রাণঃ স আত্মা পরমেশ্বরঃ॥"[৩]

সিদ্ধসিদ্ধান্তসংগ্রহে পরমেশ্বরের লক্ষণ এইরূপ বর্ণিত আছে—

শক্তিতত্ত্বানন্দনিত্য শক্তিমান্ পরমেশ্বরঃ।
সবিদ্রূপোঽস্তি বিষয় ইতি সিদ্ধিমতং সতাম্॥ ৯।১৭।

পরমেশ্বর শক্তিযুক্ত, তিনি আনন্দ নিত্য ও শক্তিমান্। জ্ঞানরূপে তিনি জ্ঞেয় বিষয় ইহাই সিদ্ধমত।

অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনমতে নির্ব্বিশেষ যিনি তিনি মায়া দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়া সবিশেষ হন, তখন তিনি ঈশ্বর। প্রশ্ন হইতে পারে যিনি চেতনস্বরূপ তিনি কেন সৃষ্টিকার্য্যে রত হন? শঙ্করাচার্য্যের মতে ইহার উত্তর এই যে, যেমন জানিয়া শুনিয়া আমরা অনিষ্টকর কার্য্যে রত হই, সেইরূপ আত্মা সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হইয়াই অবিদ্যাকে আশ্রয় করেন। স্বয়ং আত্মা যখন অবিদ্যার অধীন তখন উভয়ে পরস্পরবিরোধী নহে ইহা স্বপ্রমাণ, তবে অবিদ্যা নাশ করিতে হইলে তত্ত্বজ্ঞানের আবশ্যক। তত্ত্বদৃষ্টিতে মায়া বা অবিদ্যার অস্তিত্ব নাই, ব্যবহার-দৃষ্টিতে অবিদ্যা বা মায়ার সৎ ও অসৎ রূপ আছে।

জানিয়া শুনিয়া অনিষ্টকর কার্য্যে রত হওয়ার ন্যায় ঈশ্বরের পক্ষে জগতের সৃষ্টি, অতএব ইহাকে তাঁহার লীলামাত্র বলা যায়। ন্যায় বলেন

১। গো. সি স., পৃ ৭৪
২। গো সি স, পৃ ৪৮
৩। গো. সি. স. পৃ ৮এ উল্লেখ

ঈশ্বর জগৎসৃষ্টির নিমিত্ত কারণ, বেদান্ত বলেন তিনি নিমিত্ত ও উপাদান কারণ উভয়ই। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে,—যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদবাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্ ইত্যাদি।[১] অর্থাৎ একটি মৃত্তিকাপিণ্ড দ্বারা যেমন মৃত্তিকার পরিণামভূত সমগ্র মৃন্ময় পদার্থকে জানা যায়, তেমনি এক ব্রহ্মকে জানিলে সব জানা যায়। অতএব ঈশ্বর সর্ব্ববস্তুতে আছেন, এবং তিনি জগৎসৃষ্টির উপাদান কারণও বটে। মুণ্ডক (৩।১।৩) তাই এই ব্রহ্মকে যোনি বলিয়াছেন, সাক্ষাৎকামী সাধক যখন হিরণ্যবর্ণ পরমেশ্বর পরিপূর্ণস্বরূপ 'ব্রহ্মযোনি'কে অর্থাৎ জগৎকারণ ব্রহ্মকে দর্শন করেন, তখন সেই বিদ্বান পুণ্য ও পাপ সমূলে নাশ করিয়া বিগতক্লেশ হন এবং পরমসাম্য প্রাপ্ত হন।[২] অতএব চেতন পদার্থ হইতেই অচেতনের উৎপত্তি স্বীকার্য্য।

জগৎ ভোগ্যস্বরূপ, আত্মাই ভোক্তা, তথাপি উভয়ের উপাদান কারণ এক। সমুদ্র ও তাহার তরঙ্গ এক হইয়াও যেমন ব্যবহারিক ভেদ আছে, তেমনি ঈশ্বর ও জগৎ এক হইয়াও উভয়ের ব্যবহারিক ভেদ আছে। ঈশ্বর দেশকালাতীত তথাপি উপাসক কল্পনায় তাঁহাকে মর্ম্মাদি কেন্দ্রে স্থাপনকরতঃ উপাসনা করে।

ব্রহ্ম বা ঈশ্বর যেমন সর্ব্ববস্তুতে বিদ্যমান, তেমনি শক্তিও সর্ব্ববস্তুর উপাদান স্বরূপ, কেবল তাহা অত্যন্ত সূক্ষ্ম হইবার কারণ তাহার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয় না, যেমন কাষ্ঠমধ্যে দাহিকা শক্তি বর্ত্তমান, কিন্তু আমরা তাহা দেখিতে পাই না।

শ্রীকণ্ঠের ব্রহ্মমীমাংসায় শক্তি ও শক্তিমানের অভেদত্ব এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে—

> "শক্তয়োঽস্য জগৎ কৃৎস্নং শক্তিমাংস্তু মহেশ্বরঃ।
> শক্তিস্তু শক্তিমদ্রূপাদ্ ব্যতিরেকং ন গচ্ছতি।
> তাদাত্ম্যমনয়োর্নিত্যং বহ্নিদাহিকয়োরিব॥" ১।২।১

অর্থাৎ শক্তিই জগৎ-সৃষ্টিকর্ত্রী, মহেশ্বর শক্তিমান। শক্তির শক্তিমান ব্যতীত অস্তিত্ব নাই, তাহারা বহ্নিদাহিকার মত তাদাত্ম্য-ভাবাপন্ন।

১। ছান্দোগ্য উপনিষদ, ৬।১।৪, উপনিষৎ গ্রন্থাবলী পৃ ৬৫৬

২। যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।

"মায়াখ্যায়াঃ কামধেনোর্ব্বৎসৌ জীবেশ্বরাবুভৌ ॥
(শক্তিতত্ত্ববিমর্শিনী)।[1]

অর্থাৎ মায়াই কামধেনু, জীব ও ঈশ্বর উভয়ে তাহার বৎসস্বরূপ। মায়া হইতেই জীব, জগৎ, ঈশ্বর সকলই সৃষ্ট হইয়াছে, ইহাই তাৎপর্য্য। তথাপি জীব ও ঈশ্বরে ভেদ আছে, অভেদও আছে। অভেদরূপে ঈশ্বর ও জীব উভয়েই জ্ঞানস্বরূপ, ভোক্তৃস্বরূপ, ক্ষেত্রজ্ঞ ও ইচ্ছাময়; ঈশ্বরে যে গুণের পরাকাষ্ঠা, অত্যন্ত অণুশক্তিক্রমে জীবের মধ্যে সেই সেই গুণ অণুমাত্রাতেই বর্ত্তমান। পূর্ণতা ও অণুতা-প্রযুক্তই ভেদভাব। ঈশ্বর স্বরূপশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তির পতি, তাঁহার ইচ্ছাতেই শক্তি ক্রিয়াবতী হন। জীবে ঈশ্বরের গুণসকল বিন্দু বিন্দু স্বরূপ আছে, মায়াবদ্ধ হইয়া সেই শরীরের উপর আর দুইটী ঔপাধিক শরীর—লিঙ্গশরীর ও স্থূলশরীর—আচ্ছাদন করিয়া আছে। চিৎস্বরূপ শরীরের উপর লিঙ্গশরীর উপাধি হইয়াছে; এই লিঙ্গশরীর বদ্ধ হইবার কাল হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত অপরিহার্য্য। জন্মান্তর সময়ে স্থূলদেহের পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু লিঙ্গশরীরের হয় না। জীব অণুচৈতন্যবস্তু, জীব নিজেকে জানিতে পারিলে নিজস্বরূপে মায়িক জগৎ হইতে শ্রেষ্ঠ তত্ত্বরূপকে অনুভব করিতে পারিবে।[2]

অদ্বৈত বেদান্ত মতে মোক্ষলাভে মায়ার উচ্ছেদ হয়, কিন্তু অবিদ্যার নিবৃত্তি যদি 'সৎ' হয় তবে দ্বৈতাপত্তি শঙ্কা হয়, যদি 'অসৎ' হয় তবে, শশশৃঙ্গের ন্যায় উহা হইতে জগতের উৎপন্নতা সিদ্ধ হয় না। অবিদ্যার দ্বারা নানা ব্যাঘাত হওয়াতে অবিদ্যাকে 'সদসদাত্মকও' বলা চলে না। আবার উহাকে যদি অনির্ব্বচনীয় বলা হয়, তাহা হইলে অনির্ব্বচনীয় সাদি পদার্থের অজ্ঞান উপাদানত্ব ও জ্ঞান নিবর্ত্তত্ব মানিতে হয়। অতএব উহা সৎ, অসৎ, সদসৎ এবং অনির্ব্বচনীয় এই চারিপ্রকার হইতে পৃথক পঞ্চমপ্রকার অবিদ্যানিবৃত্তি। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে মোক্ষে মায়ার উচ্ছেদ হয় না, কোন না কোন রূপে উহা থাকে, ইহাই অদ্বৈত বেদান্ত হইতে শক্তিতত্ত্বের বৈলক্ষণ্য। মোক্ষাবস্থায় মায়া অন্তর্মুখী হয় এবং তাহার পরিণাম হয় না, কারণ তত্ত্বজ্ঞানের প্রভাবে সঞ্চিত কর্ম্মের নাশ হয়, বদ্ধ অবস্থায় মায়া বহির্মুখী হয়, ইহাই মুক্ত ও বদ্ধের মধ্যে ভেদ।

১। শক্তি ও শক্তিমানকা অভেদ, সূর্য্যনারায়ণ শাস্ত্রী, এম. এ. কল্যাণ শক্তি অঙ্ক, পৃ ১৩৮
২। জৈবধর্ম্ম, পঞ্চদশ অধ্যায়—কেদার দত্ত

জীব অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্যস্বরূপ। নিত্য শুদ্ধমুক্ত স্বভাব আত্মা উৎপত্তিনাশহীন হইয়াও শরীরের অধ্যক্ষ ও কর্মফলের ভোক্তা। আত্মা সূক্ষ্ম বলিয়া তাহার নাম 'অণু' হইয়াছে (শঙ্করভাষ্য ২।৩।৪৩)। আত্মচৈতন্য জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থায় ও পঞ্চকোশে উপলব্ধ হয় কিন্তু আত্মার শুদ্ধ চৈতন্য ইহারও উর্দ্ধে। ব্যষ্টি অভিমানী জীবের স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরে বিশ্ব, তৈজস ও প্রজ্ঞা সংজ্ঞা আছে এবং এই শরীরের সমষ্টি অভিমানী ঈশ্বরকে বৈশ্বানর (বিরাট্) সূত্রাত্মা (হিরণ্যগর্ভ) ও ঈশ্বর সংজ্ঞা দেওয়া হয়। ব্যষ্টি ও সমষ্টির অভিমানী পুরুষ পরস্পর অভিন্ন। আত্মা এই তিনের উর্দ্ধে স্বতন্ত্র সত্তা। নিম্নে কোষ্টক দ্রষ্টব্য :—

শরীর	অভিমানী	কোশ	অবস্থা
স্থূল	সমষ্টি—বৈশ্বানর (বিরাট্) ব্যষ্টি—বিশ্ব	অন্নময়	জাগ্রত
সূক্ষ্ম	সমষ্টি—সূত্রাত্মা (হিরণ্যগর্ভ) ব্যষ্টি—তৈজস	মনোময় প্রাণময় বিজ্ঞানময়	স্বপ্ন
কারণ	সমষ্টি—ঈশ্বর ব্যষ্টি—প্রাজ্ঞ	আনন্দময়	সুষুপ্তি

জীব বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী উভয়ই, বহির্মুখী হইয়া বিষয়কে প্রকাশিত করে এবং অন্তর্মুখী হইয়া 'অহং'কর্তাকে অভিব্যক্ত করে। বহির্মুখী হইয়া অহঙ্কার বুদ্ধিকে অবভাসিত করে, তাহার অভাবে স্বতঃ-প্রদ্যোতিত হয়। বুদ্ধির যোগে জীব চঞ্চল হয়, অন্যথা জীব শান্ত।[১]

শঙ্করের মতে জগৎ মিথ্যা, ঈশ্বর ইন্দ্রজালের ন্যায় জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহা সত্য তাহা সতত বিদ্যমান, অতএব নিত্যপরিবর্তনশীল জগৎ 'মিথ্যা'। তথাপি স্বপ্নাবস্থায় অলীক দ্রব্যকে সত্যের ন্যায় দেখার ন্যায় জগতের স্থিতি না থাকিলেও তাহার ব্যবহারিক সত্তা মান্য। আমাদের ইন্দ্রিয়ের পক্ষে উহা সত্য, তথাপি উহার পারমার্থিক সত্তা নাই, তাই জীবন্মুক্ত জ্ঞানীর পক্ষে জগৎ মিথ্যা, স্বপ্নের ন্যায় অলীক।

তমঃপ্রধান বিক্ষেপশক্তিযুক্ত অজ্ঞানোপহিত চৈতন্য হইতে সূক্ষ্ম তন্মাত্ররূপ আকাশের উৎপত্তি হয়, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে

১। ভারতীয় দর্শন, বলদেব উপাধ্যায়, পৃ ২৮৩।

অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী, এবং ইহাদের দ্বারা সপ্তদশ অবয়ববিশিষ্ট জীবের উৎপত্তি। (পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চবায়ু, বুদ্ধি ও মন এই সপ্তদশ অবয়ব। অদ্বৈত-বেদান্তদর্শনে জীবের উৎপত্তি এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে।)

প্রত্যেক স্থূল ভূত পঞ্চভূতাত্মক, প্রত্যেক ভূতে নিজস্ব অংশ ১/২ ও অন্য চারিভূতের ১/৮ অংশ করিয়া সম্পূর্ণ '১' হয়, যথা, আকাশ = ১/২ আকাশ + ১/৮ পৃথিবী + ১/৮ জল + ১/৮ তেজ + ১/৮ বায়ু = ১ আকাশ। ইহাই 'পঞ্চীকৃত'।[১]

অতঃপর শিব কিরূপে জীব হন ও জীব কিরূপে শিবত্ব লাভ করে ইহাই বিবেচ্য। যোগবীজ ও যোগশিখোপনিষদ মতে[২] বিশুদ্ধ পরমাত্মায় অহঙ্কারবশে জীব অভিধা হয়। নিষ্কল, নির্ম্মল, শান্ত, সর্ব্বাতীত নিরাময় যিনি, তিনি জীবরূপে পাপপুণ্য-ফলভোগী হন। পরমাত্মা কিরূপে জীব হন? যাহা বিশুদ্ধ তাহাই পরমাত্মা, কিন্তু তাহাতে স্পন্দ হইলে অহন্তা উৎপত্তি হয়, "বায়ুবৎ স্ফুরিতং স্বস্মিংস্তত্রাহংকৃতিরুত্থিতা, পঞ্চাত্মকমভূৎ পিণ্ডং ধাতুবদ্ধং গুণাত্মকম্" তখন বিশ্বোত্তীর্ণ শিব 'ত্রিপাদভূতিই' পঞ্চাত্মক পিণ্ড হন অর্থাৎ ত্রিপাদভূতিসহ নিত্যভূতি (যাহা নিত্য), লীলাভূতি (জাগতিক লীলা), মোহভূতি (জাগতিক মোহ) ও জড়াভূতি (জড়বস্তু), এই ধাতুবদ্ধ গুণাত্মক হইয়া পরমাত্মাই সুখদুঃখসমাযুক্ত জীব হন। সুখ, দুঃখ, তৃষ্ণা, লজ্জা, ভয় আদি জীবের দোষ, দোষহীন হইলে জীব শিবত্ব লাভ করে। তেন জীবাভিধা প্রোক্তা বিশুদ্ধে পরমাত্মনি। এভির্দোষৈর্বিনির্মুক্তঃ স্বজীবঃ শিব উচ্যতে॥ মোহাভূতি দ্বারাই জীবে ভোক্তৃত্ববোধ ও জগৎ ভোগ্য হয়।

নারদপরিব্রাজক উপনিষদে আছেঃ "শরীরাভিমানেন জীবত্বম্। জীবত্বং ঘটাকাশমহাকাশবৎ ব্যবধান অস্তি। ব্যবধানবশাদেব হংসঃ সোহমিতি মন্ত্রণোচ্ছ্বাস নিঃশ্বাসব্যপদেশেনানুসন্ধানং করোতি। এবং বিজ্ঞায় শরীরাভিমানং ত্যজেন্ন শরীরাভিমানী ভবতি। স এব ব্রহ্মেত্যুচ্যতে।"[৩]

১। ভারতীয় দর্শন, বলদেব উপাধ্যায়, পৃ ৪৩২
২। যোগশিখোপঃ, ১।৬-১১। যোগবীজ।
৩। না, প, উপ—ষষ্ঠ উপদেশ, পৃ ২৭৫

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ বলিয়াছেন—

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥ (৫।৯)

কেশাগ্রের শতভাগের একভাগকে শতধা করিলে যে ভাগ হয়, জীব তাহারই ন্যায় 'অণু' পরিমাণবিশিষ্ট, তিনিই আবার স্বরূপতঃ অনন্ত পদবাচ্য। মুণ্ডকোপনিষৎ (৩।১।৯) বলেন—কাষ্ঠে অগ্নির ন্যায়ই ব্রহ্ম দেহেন্দ্রিয়াদিতে অনুস্যূত আছেন, সুতরাং এই দেহমধ্যেই বিশুদ্ধ চিত্তের দ্বারা সেই সূক্ষ্ম আত্মাকে জানিতে হইবে।

আর্হতদর্শনে বোধ ও বোধাত্মক জীব ও অজীব এই দুই তত্ত্বভেদ, সংসারী ও মুক্তজীব এবং সংসারী জীবমধ্যে সমনস্ক ও অমনস্ক জীব বিচার আছে। সংসারী জীবই "ভবাদ্ভবান্তরপ্রাপ্তিমন্তঃ", এবং জীব "চৈতন্যলক্ষণো জীবঃ" (ষড়্দর্শনসমুচ্চয়-কারিকা ৪৯)। চিৎ ও অচিৎ ভেদে পরমতত্ত্বও দ্বিপ্রকার।

লোকায়ত দর্শন ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না (চার্ব্বাকদর্শন, এই মতে প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ, পৃথিব্যাদি চারিভূত হইতে দেহ উৎপন্ন হয়, তাহাতে স্বতঃই মাদকের ন্যায় যাহা উৎপন্ন হয় তাহাই চৈতন্য, ভূতের বিনাশ হইলে মনুষ্যত্বেরও বিনাশ হয়। অতএব চৈতন্য-বিশিষ্ট দেহই আত্মা বা জীব, দেহ ভিন্ন আত্মা স্বীকারের কোন প্রমাণ নাই।

রামানুজের মতে সগুণব্রহ্মই সত্য, তাহা না হইলে "ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারে মুক্তি" এই শাস্ত্রবাক্য মিথ্যা হয়, ব্রহ্মের বিশেষণ না থাকিলে সাক্ষাৎকার হইবে কিসে? শঙ্করমতে ব্রহ্ম নির্গুণ অর্থাৎ বিশেষণহীন, রামানুজ বলেন, নির্গুণ অর্থে গুণাতীত। রামানুজমতে চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর ভেদে পদার্থ ত্রিতয়, ঈশ্বর ও জীব চিৎপদার্থ, পরিদৃশ্যমান জগৎ "অচিৎ", "অচিৎ চিদচিদীশ্বরভেদেন ভোক্তৃভোগ্য-নিয়ামকভেদেন ব্যবস্থিতাস্ত্রয়ঃ পদার্থাঃ", চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর ভেদে, ভোক্তা, ভোগ ও নিয়ামক ভেদ সংঘটিত হয়, তদনুসারে পদার্থ তিন প্রকার হইয়া থাকে।[১]

বিশ্বের উৎপত্তি সম্বন্ধে গোরক্ষসিদ্ধান্ত-সংগ্রহে বর্ণিত হইয়াছে "শ্রীগোরক্ষনাথেন বিশ্বস্য কর্তৃত্বং শিবস্য লিখিতং নাথস্য তু ন লিখিতম্।" শিবই বিশ্বকর্তা, নাথ নির্গুণ এবং নিরুপাধিরূপ, অতএব তাঁহার পক্ষে

১। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ, রামানুজদর্শনম্, ৭ম শ্লোক।

প্রাকৃতিক কার্য্যকারণে কোন মাহাত্ম্য নাই, বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা সগুণ সোপাধিযুক্ত শিব। (পৃ ৭৫)

আবার "অস্মাকং মতে শক্তিঃ সৃষ্টিং করোতি শিবঃ পালনং করোতি কালঃ সংহরতি নাথো মুক্তিং দদাতি" (গো.সি.স., পৃ ৭০)—ব্রহ্মা বিশ্ব সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু পালন করেন, রুদ্র সংহার করেন, এই মতামতের উল্লেখও উক্ত গ্রন্থে দেখা যায়। (পৃ ৭৭)

"কৌলজ্ঞান-নির্ণয়ের" তৃতীয় পটলে আছে সহস্রারের উপর শুদ্ধ, অবিভক্ত, সর্ব্বব্যাপী 'নিরঞ্জন' বিরাজ করেন, তিনিই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কর্ত্তা, তাই তাঁহার নাম "লিঙ্গ", ইনি "উন্মনস্মারহিতং ধ্যানধারণাবর্জ্জিতম্ প্রত্যক্ষং সর্ব্বদা নিত্যং", ইনি বর্ণহীন হইয়াও সর্ব্ববর্ণময়, ইঁহার মানসপূজা কর্ত্তব্য। এই উৎপত্তি ও লয়ের ক্ষমতাসম্পন্ন বিশুদ্ধ, নিত্য, অপরিমেয় ও আকাশের উল্কার ন্যায় উজ্জ্বল। মানসলিঙ্গের জ্ঞান হইতেই মুক্তি হয়, ইহাই "কৌলিক লিঙ্গম্"। দ্বিতীয় পটলে সংহার বৃত্তান্ত আছে। দেহ মধ্যেও সপ্তপাতাল ও সপ্তস্বর্গ এই চতুর্দ্দশভুবন তত্ত্বরূপে আছে, কালাগ্নি উর্দ্ধমুখী হইলে সংহারাবৃত হয়। সংহারকালে শক্তি শিবে মিলিত হন, শিবও ক্রিয়াশক্তিতে বিলীন হন। তখন একমাত্র পরাশিব বিরাজ করেন, বিশ্বের এইখানেই সমাপ্তি হয়।

উক্ত গ্রন্থের ষষ্ঠ পটলে 'জীব' সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—জীব পরমতত্ত্ব, ইহাই 'হংস' ও প্রাণবুদ্ধিচিত্ত; দেহমধ্যে যাহা জীব, দেহমুক্ত হইলে তাহা শিব হয়। হংসই দেহরূপী শিব, ইহা কুণ্ডলীরূপে দেহে বিরাজ করে, ইহা অতি শক্তিশালী, ইহার জরা নাই, মৃত্যু নাই। "সা জীবঃ পুদ্গলো হংসঃ স শিবো ব্যাপকঃ পরঃ।"[১]

তন্ত্রমতে বিশ্বের উৎপত্তি রহস্য উদ্ঘাটন করিতে হইলে বিন্দু ও বিসর্গ রহস্য জানা আবশ্যক, স্বতন্ত্রানন্দ নাথ বলিয়াছেন—

স্পষ্টা বহিঃ শিবচিতা প্রকৃতিবিসর্গঃ
তাং স্বাত্মনা কবলয়ন্ শিব এষ বিন্দুঃ॥[২]

প্রকাশই শিব, বিমর্শই শক্তি। প্রকৃতি যখন শিবরূপ প্রকাশের দ্বারা বাহিরে বিসৃষ্ট হয়, তখন তাহা বিসর্গ পদবাচ্য। প্রকৃতি স্বভাব বা বিমর্শ, পক্ষান্তরে প্রকাশেও বিমর্শাত্মক স্বভাব আছে, তাই প্রকাশ নিজের

১। কৌলজ্ঞান, ১৭।৩৩

২। দেবীযুদ্ধে চিন্ময়, দুর্গা চৈতন্য ভারতী গ্রন্থের ভূমিকা, ১৵০, ১।০

বিমর্শকে কদাচিৎ প্রপঞ্চানুসন্ধানের ইচ্ছা করিয়া আপন স্বরূপের ভিত্তিতেই বাহ্যবৎ বিসৃষ্ট করে। এই বিসর্গাখ্য বিমর্শ জ্ঞেয় আকার ধারণ করিয়া জ্ঞাতাকে গ্রাস করে ও নিজে প্রমাতা হয়। অপরদিকে জ্ঞাতা চিদ্রূপ হইলেও বৈভবহীন হইয়া প্রমেয় ভাব প্রাপ্ত হয় ও জীবরূপে প্রকট হয়। শিবরূপী প্রকাশ, প্রপঞ্চ সংহার ইচ্ছা করিলে বিমর্শরূপা প্রকৃতিকে আপন স্বরূপে গ্রাস করে, তখন তাহাকে 'বিন্দু' বলে। সুতরাং জ্ঞেয়াত্মক বিমর্শই 'বিসর্গ' এবং জ্ঞাতৃরূপ প্রকাশই 'বিন্দু'। এই বিচিত্র সংসার বিসর্গ হইতেই উদ্ভূত হয়। বিশ্ব ভেদাত্মক, ভেদাভেদাত্মক, ও অভেদাত্মক, তাই বিসর্গ-শক্তিও স্থূল, সূক্ষ্ম ও পর ভেদে ত্রিবিধ। সিদ্ধযোগীশ্বরী-তন্ত্রমতে চিন্মাত্ররূপ বিসর্গশক্তিই জগদ্‌যোনি কুণ্ডলিনী, ইহার গর্ভে নিখিল বিশ্ব অবস্থিত।

বৈষ্ণব-তন্ত্রমতে 'বিশ্ব' জগৎ-অধিপতি নারায়ণের বিলাসমাত্র। ভগবানের সঙ্কল্পের নাম সুদর্শন, ইহা উৎপত্তি, স্থিতি, বিনাশ, নিগ্রহ ও অনুগ্রহ শক্তিভেদে পঞ্চবিধ। অবিদ্যাদিই 'নিগ্রহ'। স্বভাবতঃ শক্তিশালী জীব অবিদ্যাদ্বারা ক্রমশঃ অণু বা অকিঞ্চিৎকর হয়, ইহাই অণুত্বাদির মূল, জীবের ইহাই বন্ধনের কারণ, জাতি, আয়ু ভোগও ইহার ফলস্বরূপ। জীবের ক্লেশদর্শনে ভগবানের কৃপার যে স্বতঃ উদ্রেক হয়, তাহাকেই 'অনুগ্রহাত্মিকা শক্তি' বলে, আগমে ইহারই নাম "শক্তিপাত", ইহাই ভগবদ্ অনুগ্রহ। এই অনুগ্রহের ফলে জীবের শুভাশুভকর্ম্ম ফলোৎপাদন-রহিত হয় এবং জীব বৈরাগ্য ও বিবেক প্রাপ্ত হইয়া মোক্ষের প্রতি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়।

বৈষ্ণব তন্ত্রমধ্যে 'পাঞ্চরাত্র'ই প্রাচীন, 'বৈখানস' প্রায় লুপ্ত হইয়াছে। পাঞ্চরাত্রকে বেদের অংশ বলা হয়, ইহার সাহিত্য প্রচুর, যথা—অহির্বুধ্ন্যসংহিতা, জয়াখ্যসংহিতা (G. O. S.)। পাঞ্চরাত্র সাধনমার্গে যোগ ও ভক্তির সমন্বয় আছে, অকিঞ্চনরূপে ভগবানে শরণাগতি দ্বারা তাঁহার অনুগ্রহশক্তি লাভ করিলে 'ব্রহ্মভাবাপত্তি' হয়।

জীবই ব্রহ্মস্বরূপ 'তত্ত্বমসি', কিন্তু রামানুজ ইহার ভিন্নরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন 'তৎ' সর্ব্বজ্ঞ অন্তর্য্যামী ঈশ্বর, 'ত্বম্' অর্থে অচিদ্‌বিশিষ্ট জীব-শরীরধারী ব্রহ্ম (সাধারণতঃ ত্বম্ অর্থে জীবের প্রতীক) এবং 'তত্ত্বমসি' এই উভয়ের সম্বন্ধ জ্ঞাপক, অর্থাৎ বিশ্বপ্রপঞ্চ নির্ম্মাতা ও অন্তর্য্যামী এই উভয় ঈশ্বরে একতাবিশিষ্ট। অতএব এই মতের 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ' নাম হইয়াছে (তুলনীয়, ছান্দোগ্য উপ. ৬।২।৩ 'তদৈক্ষতবহুস্যাম্' ইত্যাদি)।

রামানুজমতে জীব ও ব্রহ্ম মধ্যে বিশেষণ বিশেষ্য সম্বন্ধ বা অংশাঅংশী ভাব আছে, যেমন অগ্নিশিখা অগ্নির অংশ; জীব ও ব্রহ্ম অভেদ না হইলেও ভিন্ন। ব্রহ্ম প্রাজ্ঞ, জীব অজ্ঞ, শ্রুতি এইরূপে জীবে ও ব্রহ্মে ভেদ দেখান (শ্বেতা ১।৯)।

অহম্‌রূপে এই বিশ্বের উৎপত্তি, তন্মধ্যে বাচ্য প্রকাশ, বাচক বিমর্শ, ইহাদের নিত্য অবিনাভূত সম্বন্ধ বর্ত্তমান। অ = পরমেশ্বর, অকুল, পরশিব; হ = পরাশক্তি, কৌলিকীশক্তি, বিমর্শ বা পরাকুণ্ডলিনী। "অকারশ্চ হকারশ্চ দ্বাবেতৌ যুগপংস্থিতৌ। বিভক্তির্নানয়োরস্তি চন্দ্রচন্দ্রিকয়োরিব॥" ইহাই অনাদি মিথুন বা দিব্যদম্পতী, ইহাই অর্দ্ধনারীশ্বর। এই অহম্ পরামর্শই মাতৃকার পরমতত্ত্ব, কারণ যাবতীয় বর্ণের উদ্ভব ইহারই মধ্যে নিহিত। এই অবিভক্ত, অখণ্ড, পূর্ণ অহং-পরামর্শই পরাবাক্; পশ্যন্তী মধ্যমা বৈখরী ভেদে ইহা ত্রিবিধ। পরতত্ত্ব এক ও নিরংশ হইলেও তাহার মুখ্যা শক্তি তিনটী—অনুত্তরা, পরাপরা ও অপরা। অনুত্তরা শক্তি চিৎশক্তি, পরাপরা ইচ্ছাশক্তি, অপরা জ্ঞানশক্তি। বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে হ্লাদিনী শক্তিকে পরমাশক্তি (চিৎশক্তি) বলা হয়। বস্তুতঃ চিৎশক্তি ও হ্লাদিনী শক্তি অভিন্ন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে যোগমায়া চিৎশক্তি, লীলামধ্যে ইহার প্রধান অঙ্গ। যোগমায়াই বিশ্বে ভগবৎলীলার যোজনাকারিণী আদিশক্তি অর্দ্ধমাত্রা, যোগমায়ার অঙ্গ হইতে প্রণবের উৎপত্তি, ইহার উর্দ্ধাংশ যোগমায়ার সহিত সংযুক্ত থাকে ও ব্রজলীলা নামে অভিহিত হয়। এই ব্রজলীলা ও যোগমায়ার সংযোগ হইতেই অখিল সৃষ্টির বিকাশ হয়।[১]

জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বে পরমাত্মা নিরাকার ছিলেন, স্বপ্রকাশ হইবার নিমিত্ত জগতের সৃষ্টি তিনি ইচ্ছা করিলে, সাকাররূপিণী ইচ্ছাশক্তির জন্ম হইল, তৎসহ পরমাত্মাও সাকার রূপ ধারণ করিলেন, ইহাই শিবশক্তি বা প্রকৃতি পুরুষ। ইচ্ছাশক্তি যোগমায়ার সৃষ্টি করিলেন, যোগমায়া হইতে মহামায়া ও মায়া সৃষ্ট হইলেন। মহামায়া ও মায়ার সম্বন্ধ মাতা ও পুত্রীর ন্যায়, মায়া মনুষ্য জীব পশু প্রভৃতির কর্ত্রী, পঞ্চতত্ত্ব ও অপরা জগতের অধীশ্বরী, মহামায়া জীবের জন্ম মরণ বিবাহাদি ও পরাজগতের কর্ত্রী, তিনি উর্দ্ধ জগতের ব্যবস্থাপিকা। কিন্তু জগতের

১। দেবীযুদ্ধে চিন্তনীয়, ভূমিকা, পৃ ১৮/০, ১৮০

সৃষ্টি ও সঞ্চালনকর্ত্রী ইচ্ছাশক্তি, একমাত্র যোগমায়ার সহিতই ইহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, দেহস্থ আজ্ঞাচক্রের ঊর্দ্ধে যোগমায়ার নিবাস।[১]

মায়া অবিদ্যা, মহামায়া বিদ্যা। মায়া আবরণ বিক্ষেপ দ্বারা জীবকে বহির্মুখ করিতেছে মহামায়া ঐ সকল অনর্থ দূর করিয়া জীবকে অন্তর্মুখ করিতেছেন। বেদান্তে বিদ্যা ও অবিদ্যার ভেদ থাকা সত্ত্বেও উভয়কে 'মায়া' বলা হইয়াছে। মহামায়াই দুর্গা, কালী, তারা প্রভৃতি, মহামায়াই মহাবিদ্যা, মোক্ষার্থী তাঁহারই শরণাগত হন—

মোক্ষার্থিভির্মুনিভিরস্তসমস্তদোষৈ
র্বিদ্যাসি সা ভগবতী পরমা হি দেবি॥ (শ্রীচণ্ডী)[২]

পুরুষ ও প্রকৃতির বিশেষ বাদ এবং তৎসহ জীব ও জগতের সম্বন্ধ লইয়াই দ্বৈত, অদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত প্রভৃতি মত প্রচলিত। অতি সংক্ষেপে ইহাদের নির্দ্দেশ করিয়া সিদ্ধমতের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা যাইতেছে। দ্বৈতবাদে জীব ও ঈশ্বর ভিন্ন, জীব অনাদি, ঈশ্বরও অনাদি, জীবেরই বন্ধন ও মুক্তি হয়। সাংখ্য দ্বৈতবাদী, পুরুষ ও প্রকৃতি এই দর্শনে দুইটী বিভিন্ন তত্ত্ব। বেদান্ত একমাত্র পুরুষকে স্বীকার করিয়াছেন ও মায়াশক্তির দ্বারা জগৎ বিজৃম্ভিত হইয়াছে বলিয়াছেন। এই প্রপঞ্চের চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব সাংখ্যকারও বিবৃত করিয়াছেন। প্রপঞ্চলয়ে যে ব্রহ্মতত্ত্ব থাকে তাহাই সাংখ্যের পুরুষ, তিনি অপরিণামী দ্রষ্টা পুরুষ মাত্র।

অদ্বৈতবাদীদের মধ্যেও ভেদ আছে শঙ্করের মতে একমাত্র ব্রহ্ম সত্য, "জীবব্রহ্মৈব নাপরঃ"—জীব ও ব্রহ্ম দুইই এক। নির্ব্বিশেষে চৈতন্যস্বরূপতা লাভই মোক্ষ, এবং 'জগৎ' তাঁহার মায়াশক্তির দ্বারা বিবর্ত্তিত হইতেছে, ইহা 'বিবর্ত্তবাদ' নামে পরিচিত। কাশ্মীর শৈবাদ্বৈতীরা জগৎকে পরমশিবের আভাস বলেন, ইহা 'আভাসবাদ' নামে পরিচিত। পরমশিবের কল্পনায় বা আভাসে যে জগতের বিকাশ তাহা 'সত্য'। প্রসর ও সঙ্কোচবাদ কাশ্মীর অদ্বৈতবাদীর বৈশিষ্ট্য।

যাহাতে জগৎ শক্তির পরিণামরূপে প্রকটিত (যথা, দধি দুগ্ধের ও মৃন্ময়পাত্র মৃত্তিকার পরিণাম) তাহাকে 'পরিণামবাদ' বলে। শঙ্কর বলেন

১।

ইচ্ছাশক্তি + শিব
|
যোগমায়া
|
(পরাজগৎ) মহামায়া — মায়া (অপরাজগৎ)

২। শক্তি উপাসনা ও বেদান্ত, পৃ ৬, দুর্গাচৈতন্য ভারতী

জীব ও জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত্তমাত্র, পরিণাম নহে, পরিণামবাদে তত্ত্ব রূপান্তর আছে, বিবর্ত্তবাদে অতত্ত্ব রূপান্তর আছে, যথা, রজ্জুর সর্পরূপে প্রতিভাসন। শঙ্কর জগৎকে 'মিথ্যা' বলিয়াছেন, মিথ্যা অর্থে শশশৃঙ্গের ন্যায় অলীক কিছু নহে, মিথ্যা অর্থে যাহা প্রথমে সত্য বলিয়া প্রত্যক্ষ হয় ও পরে অসত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয়,—যথা, রজ্জুতে সর্পভ্রম। ভ্রমকালীন সর্প শশশৃঙ্গের ন্যায় অলীক নহে, উহা মিথ্যা।

রামানুজ বলেন, জীব ও জগৎ ঈশ্বরের অংশ এবং উভয়েই সত্য। তথাপি জীব কখনও ঈশ্বর হয় না, জীবের মুক্তিই হয়; ইহাই 'বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ', "ঈশ্বরঃ চিৎ অচিৎ চেতি পদার্থ তৃতয়ং হরিঃ।" নিম্বার্কের মতে জীবে ঈশ্বরে অংশাংশী ভাব আছে। অংশে অংশীর সকল গুণ থাকিলেও তাহা পূর্ণ নহে; অর্থাৎ জীবে ঈশ্বরত্ব ইত্যাদি গুণ অণুপরিমাণে আছে, জীব ও ঈশ্বরে সম্বন্ধ দ্বৈত ও অদ্বৈত উভয়ই অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্ম পৃথক, কিন্তু চিৎরূপতা দ্বারা উভয়েই এক, তাই ইহার নাম দ্বৈতাদ্বৈতবাদ। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে (জীব গোস্বামী) ঈশ্বর ও জীবে ভেদাভেদের সম্যক্ উপলব্ধি হয় না বলিয়া তাহাদের মত 'অচিন্ত্যভেদাভেদ' নামে পরিচিত। জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন কি অভিন্ন ইহা চিন্তার অতীত।

সিদ্ধ বা নাথমতে অনন্ত বৈচিত্র্যময় বিশ্ব, শক্তিরই আত্মপ্রকাশ। সুসূক্ষ্ম কারণজগৎ, লিঙ্গাত্মক সূক্ষ্মজগৎ ও ইন্দ্রিয়গোচর স্থূলজগৎ, শক্তিরই ত্রিবিধ বিকাশ। বিশ্বমূলে যে পরমসত্তা বিদ্যমান, তাহাই শক্তির পরমরূপ। এই বাঙ্মনের অগোচর পরমার্থ সত্তাকেই শাস্ত্রে 'পরমপদ' বলা হয়। ইহা সৎ বা অসৎ এইরূপ বিচারের বিষয়ীভূত নহে, কিন্তু প্রকাশ ও বিমর্শ অবিনাভূতরূপে ইহাতে বর্ত্তমান তাহা স্বীকার্য্য। শিবশক্তিরূপ প্রকাশ ও বিমর্শের নিত্যসম্বন্ধ চৈতন্যরূপে সাধকের অনুভূতিতে প্রকটিত হয় ও শাস্ত্রে প্রচারিত হয়। চৈতন্য হইয়াও উহাদের সাম্যাবস্থায় তাহা অব্যক্ত থাকে, এই অবস্থাই পরমপদ। এই অবস্থায় মহাশক্তিরূপা অনাদিশক্তি পরমশিবের সহিত অদ্বয় ভাবাপন্ন হইয়া থাকেন। এই অবস্থা পরমব্রহ্মভাবের অনুরূপ হইয়াও তাহা হইতে বিলক্ষণ। কারণ পরমপদ নিষ্কল বা পূর্ণকল পরমেশ্বর নহেন, কারণ নিষ্কল, সকল তথা স-কল, বিশ্বেরই তিনটী অবস্থামাত্র, কিন্তু মহাশক্তিরূপ পরমপদ বিশ্বময় হইয়াও বিশ্বোত্তীর্ণ (পরমপদ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। এই বিশ্বাতীত পরমপদের সহিত ইহার স্বাতন্ত্র্যস্বরূপ

আত্মবিলাসের নিত্যসাম্য ভগ্ন না হইয়াও যে ভগ্নবৎ অবস্থার উদ্ভব হয় সেই বৈষম্যের ফলেই গুণপ্রধান ও ছত্রিশতত্ত্ব-সমন্বিত বিশ্বের আবির্ভাব হয়। শিবশক্তি অভিন্ন হইয়াও স্বাতন্ত্র্যজনিত যে বিক্ষোভ বর্ত্তমান উহাতেই বিশ্ব-প্রপঞ্চের আবির্ভাব, অতএব ত্রিবিধ বিভাগ বিশিষ্ট বিশ্ব মূলতঃ শক্তিরই বিকাশ।

শিবশক্তির বৈষম্যেই জগৎ সৃষ্টি ও সম্ভোগ হয় অর্থাৎ ঈশ্বর ও জীবভাবের উন্মেষ হয়। সাম্যাবস্থায় জীব ও শিব অভেদ এবং সৃষ্টি ও দৃষ্টি একার্থবোধক হয়।[১]

প্রতিজীবে ঈশ্বরের স্ফুলিঙ্গ আছে বলিয়া 'জীবাত্মা' নাম হইয়াছে। সমস্ত শক্তির যে মূলস্রোত তাহাই পরমাত্মা। জীবাত্মা ও পরমাত্মায় বস্তুতঃ ভেদ নাই, কেবল যে পরিচ্ছিন্ন ও অপরিচ্ছিন্ন ভাব আছে, তাহা উত্তীর্ণ হইয়া জীবাত্মার পরমাত্মায় লীন হওয়া অসম্ভব নহে।

বৌদ্ধতন্ত্রমতে শূন্য হইতেই সকল উৎপন্ন হইয়া শূন্যে বিলীন হইয়াছেন। এই শূন্য অর্থেই শক্তি, এই বিজ্ঞান শূন্যবিজ্ঞান ও মহাসুখের সাকার রূপ। জীবাত্মার নাম বোধিসত্ত্ব অর্থাৎ যাহার সত্ত্ব বা মন বোধি বা নিঃশ্রেয়সকে আশ্রয় করিয়াছে। পরমশূন্যের ভাবনা 'নৈরাত্মা' দেবতারূপে করা হইয়াছে। বোধিসত্ত্ব ও নৈরাত্মার মিলন লবণজলের মিলনের ন্যায় সাধিত হইতে পারে, তাই উহারা দ্বৈত মনে হইলেও বস্তুতঃ উহারা অভেদ। শক্তিবাদ সাংখ্যের দ্বৈতবাদ হইতে অগ্রণী ও বেদান্তের অদ্বৈতবাদের সোপান। কোন কোন মতে তন্ত্রের শিবশক্তি সাংখ্যের পুরুষপ্রকৃতির তুল্য, এই মত ভ্রান্ত। 'জগৎই ঈশ্বর' ইহাই আগমের ভিত্তি। শক্তি শিবের জননীস্বরূপা।

তং বিলোক্য মহেশানি সৃষ্ট্যুৎপাদনকারণাৎ।
আদিনাথং মানসিকং স্বভর্তারং প্রকল্পয়েৎ॥

অর্থাৎ হে মহেশানি! ইহা আপনরূপে দেখিয়া নিজ পতিরূপে আদিনাথকে সৃষ্টির জন্য নিজ মন হইতে উৎপন্ন করিলেন।[২]

আবার শক্তিই বিশ্বসৃষ্টির কারণ, সৃষ্টির সঞ্চালন ও সংহারকারিণী। সৃষ্টির অণুতে অণুতে পরাশক্তি বিদ্যমান। তাঁহার ইচ্ছাতেই এই ভৌতিক জগতের উৎপত্তি, ইহাই অদ্বৈতবাদী শাক্ত দর্শনের মত।

১। 'শক্তিসাধনা' ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ 'কল্যাণ' শক্তিঅঙ্ক দ্রষ্টব্য, ১৯৪৪

২। 'শক্তিকাস্বরূপ' ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য 'কল্যাণ' শক্তিঅঙ্ক।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দ্বৈত ও অদ্বৈত মত হইতে সিদ্ধমতের বৈশিষ্ট্য

ভারতীয় আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে দ্বৈতমত, দ্বেতাদ্বৈতমত, অদ্বৈতমত প্রভৃতি নানারূপ মত দেখা যায়। বৈদিকযুগের পরবর্ত্তী ভারতীয় সাধনা বৈদিক ও তান্ত্রিক সাধনার মিলিত ধারা দ্বারা অনুপ্রাণিত। বৌদ্ধসাধনার প্রভাবও পরবর্ত্তী কালের হিন্দুভাবধারার উপর পতিত হইয়াছে। বৈদিক সাধনার চরমবিকাশ অদ্বৈতজ্ঞানে, দ্বৈতাদ্বৈতের মধ্য দিয়া অদ্বৈতজ্ঞানই বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয়। তান্ত্রিক সাধনাও আগম-প্রতিপাদিত দ্বৈতাদি বিভিন্ন ধারা অবলম্বন করিয়া পরিশেষে অদ্বয়জ্ঞানে পর্য্যবসিত হইয়াছে। অদ্বৈত তত্ত্বই শক্তি ও শৈব তন্ত্রের পরমতত্ত্ব। আচার-অনুষ্ঠানাদিতে ভিন্ন হইলেও বেদান্ত ও আগম নির্দ্দিষ্ট সাধনার আদর্শ বা লক্ষ্য অনেকাংশে এক ও অভিন্ন।

অদ্বৈতমার্গী বেদান্তের প্রচার শিক্ষিত সমাজে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে, কিন্তু দ্বৈত ও অদ্বৈত আগম-প্রতিপাদিত শক্তি উপাসনা ও শিবশক্তি তত্ত্বের বিচার একপ্রকার আগম গ্রন্থেই নিবদ্ধ আছে বলিলেই হয়। বহু আগম গ্রন্থ এখনও অপ্রকাশিত রহিয়াছে। আগম সাহিত্যের আলোচনা করিলে দ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত ও অদ্বৈত এই ত্রিবিধ দৃষ্টিকোণ হইতেই শক্তিতত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। শক্তি উপাসনা একমাত্র আগমের বিষয় নহে, বেদে ও পুরাণেও ইহার বিবরণ পাওয়া যায়। বেদের বাক্‌সূক্ত বা দেবীসূক্ত, শ্রীসূক্ত রাত্রিসূক্ত প্রভৃতি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। মহাভারতে দুর্গা মহিষমর্দ্দিনীরূপে চিত্রিত হইয়াছেন, তিনি মদ্যমাংসে ও পশুবলিতে সন্তুষ্ট, তিনি কুমারী, সতীত্ব তাঁহার ধর্ম্মগত, শ্রীকৃষ্ণের তিনি ভগিনী, নীলবর্ণা ও ময়ূরপুচ্ছধারিণী। ইহার সহিত শিবের সম্বন্ধ নাই। ইহার পরে মহাভারতেই তাঁহাকে শিবপত্নী উমা বলা হইয়াছে ও বেদবেদান্তের সহিত অভিন্ন বলা হইয়াছে। তিনি সতী কিন্তু কুমারী নহেন।[১]

হরিবংশের (সম্ভবতঃ চতুর্থ শতকের রচনা) দুইটী স্তোত্রে ও

১। কারকার—দুর্গা সাহিত্য, পৃ ১৪৯

মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত দেবী-মাহাত্ম্য বা চণ্ডী-মাহাত্ম্য, দেবীভাগবত, কালিকাপুরাণ প্রভৃতি পুরাণেও শক্তি উপাসনা আছে। ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে ভারতে শক্তিপূজা উত্তমরূপেই প্রতিষ্ঠিত হয়, কারণ সপ্তম শতাব্দীতে হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকালে তদীয় দরবারে বাণ কর্ত্তৃক চণ্ডীশতক রচিত হয়; তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী চণ্ডীমাহাত্ম্য হইতেই তাঁহার রচনার উপকরণ সংগ্রহ করেন।[১]

উপনিষদেও শক্তিপূজা আছে। মাত্র ষোড়শটী শ্লোকাত্মক ত্রিপুরা উপনিষদে (ইহাকে ঋগ্বেদের শাকল শাখার অংশ বলা হইয়াছে) শক্তিপূজা পদ্ধতি ও সংক্ষেপতঃ শক্তি-দর্শনের কথা আছে। 'দেবী উপনিষদ', 'ষট্চক্র উপনিষদ', 'ভাবনা উপনিষদ' প্রভৃতি কতকগুলি অপ্রধান উপনিষদ সম্ভবতঃ কোন পূর্ব্বতন শাক্ত উপনিষদ অবলম্বনে রচিত। ভাবনা উপনিষদে জীবদেহকে শ্রীচক্র বলা হইয়াছে। এই সকল উপনিষদ পরবর্ত্তী যুগের হইলেও খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ব্বে রচিত। বঙ্গদেশেও এই সময়ে চণ্ডীপূজার মাহাত্ম্য-বর্ণন পদ্যাকারে লিপিবদ্ধ হয়।[২]

বেদান্তে ও শক্তিপূজায় রুচি বা বাসনাভেদে দেব বা দেবীর পূজা থাকিলেও বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞান লাভের প্রতি সাধকের লক্ষ্য থাকে। এই পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ আত্মা কোথাও শিব, কোথাও বিষ্ণু, কোথাও বা শক্তিরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ বেদান্ত গ্রন্থ যোগবাশিষ্ট রামায়ণেও শক্তি ও ব্রহ্মের অভিন্নতা স্থাপিত হইয়াছে, শক্তি ও কারণব্রহ্ম বস্তুতঃ এক, মায়াতীত ও সচ্চিদানন্দস্বরূপ। স্পন্দময়ী শক্তিরই নিঃস্পন্দ অবস্থা শিব, উভয়েই চিন্মাত্র বলিয়া এক। নিষ্ক্রিয় অবস্থায় উভয়ে অভেদ। তথাপি উহাদের পৃথকভাবে উপাসনার সার্থকতা আছে। স্পন্দোদয়ে ইহাদের পৃথক সত্তা গৃহীত হয়।

অদ্বৈতাগমে শিব ও শক্তি অভিন্ন ও এক। এক মহাশক্তিই সত্য, শিব বস্তুতঃ সেই মহাশক্তিরই উপাধিহীন পরমাবস্থা মাত্র। সাধারণতঃ শাক্তাগমসকল অদ্বৈতদৃষ্টিসম্পন্ন।

অদ্বৈত শাক্তমতে শিব যেরূপ মহাশক্তিরই অবস্থাবিশেষের বাচক, তদ্রূপ অদ্বৈত শৈবমতে শক্তিই পরমশিবের অবস্থাবিশেষের বাচক। উভয় মতেই পরম বা মূলতত্ত্বটী অদ্বয় বা অদ্বৈত। শাক্তমতে তিনি শক্তি, শৈবমতে তিনি শিব।

১। কারকার—দুর্গা সাহিত্য, পৃ ১৫০ ২। কারকার—দুর্গা সাহিত্য, পৃ ২৬৭

তন্ত্রশাস্ত্রে মহাশক্তি তত্ত্বাতীতরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। তিনি একদিকে তত্ত্বাতীত হইয়াও সর্ব্বতত্ত্বাত্মক, তন্ত্রমতে ইহাই তাঁহার পূর্ণত্ব। অতএব এক মহাশক্তিই অদ্বৈত শাক্তমতে পরমতত্ত্ব এবং তত্ত্বাতীত হইয়াও সর্ব্বাত্মক।

সিদ্ধমতে সেই পরমতত্ত্বকে দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জ্জিত বলা হইয়াছে; দ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত ও অদ্বৈত মত হইতে সিদ্ধমতের ইহাই ভেদ বা বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ দ্বৈত ও অদ্বৈত উভয় ভাবই পরম সত্যের একাংশ। দ্বৈতাদ্বৈত-বিবর্জ্জিত তত্ত্বই পূর্ণসত্য। নাথসম্প্রদায়ের সিদ্ধসিদ্ধান্ত পদ্ধতিতে আছেঃ—

বেদান্তী বহুতর্ককর্কশমতিগ্রস্তঃ পরং মায়য়া
ভাট্টাঃ কর্ম্মফলাকুলা হতধিয়ো দ্বৈতেন বৈশেষিকাঃ।
অন্যে ভেদরতা বিবাদবিকলাস্তে তত্ত্বতো বঞ্চিতা-
স্তস্মাৎ সিদ্ধমতং স্বভাবসময়ং ধীরঃ পরং সংশ্রয়েৎ॥
সাংখ্যা বৈষ্ণববৈদিকা বিধিপরাঃ সন্ন্যাসিনস্তাপসাঃ
সৌরা বীরপরাঃ প্রপঞ্চনিরতা বৌদ্ধা জিনাঃ শ্রাবকাঃ।
এতে কষ্টরতা বৃথা পথগতাস্তে তত্ত্বতো বঞ্চিতা-
স্তস্মাৎ সিদ্ধমতামিত্যাদি।[১]

অর্থাৎ বেদান্তবিৎ উত্তরভাগশাস্ত্রবাদী অদ্বৈত অন্য বস্তুর আরোপ করিয়া দ্বৈত-কল্পনা করে, তাহারা তর্ক ও কর্কশ কঠোর মতি লইয়া যাহা মায়াহীন তাহাকে মায়াদোষে দোষী করে। ভাট্টা মীমাংসক, অনীশ্বর-বাদীরা কর্ম্মফলাকুল। বৈশেষিক প্রভৃতি ভেদরত, বিবাদকর্ত্তা, তাহার তত্ত্বঞ্চিত। সাংখ্য, বৈষ্ণব, সন্ন্যাসী, তাপস, সৌর, বৌদ্ধ, জিন, শ্রাবক প্রভৃতি কষ্টরত, তাহারাও তত্ত্ববঞ্চিত। তাহা হইতে সিদ্ধমত শ্রেষ্ঠ, তাহারা স্বভাবসময় ও ধীর অর্থাৎ তাহাদের স্বাভাবিক সহজাবস্থাময় মত বলিয়া শ্রেয়ঃ। বহুশিষ্য-পরিবেষ্টিত অগ্নিহোত্রা আচার্য্য, নগ্নব্রত তাপস, মৌনী ইত্যাদিগণও তত্ত্ববঞ্চিত।

গোরক্ষরচিত হঠপ্রদীপিকায় আগম নিগম মতাবলম্বী বৈখানস আগমবাদীর দোষদর্শন করা হইয়াছে যে তাহারা শাম্ভবীকে জানে না, ইহারা তত্ত্ববঞ্চিত ও নিজেদের শারীরিক সুখের জন্য অর্থাৎ কষ্টসাধ্য সাধন করিতে কাতর বলিয়া "অহং ব্রহ্ম" বলিয়া থাকেন। "শাম্ভবী মুদ্রা প্রাপ্তা কুলবধূরিব" কিন্তু বেদবাদী প্রভৃতি নিজজ্ঞান প্রকাশে চতুর্ম্মুখ।

১। গো. সি. স., পৃ ১১, ১২

এই সংসারে যোগ ও ভোগ নামে দুই পদার্থ আছে, সংসারের সমস্তই যোগ বা ভোগের অন্তর্গত, তন্মধ্যে সিদ্ধগণ যোগে মগ্ন এবং সংসারিগণ ভোগে মগ্ন, যোগের ফল মুক্তি, ভোগের ফল বন্ধ, যোগে আদিতে কষ্ট হইলেও অন্তে পরমানন্দলাভ হয়, ভোগে মাত্র কিছু বিষয়ানন্দ আছে।

কেহ কেহ বলেন শাস্ত্রমতে কর্ম্মাদি উপাসনাই সাধন। মীমাংসকগণ পঠনপাঠনের দোষনিবৃত্তির জন্য ইষ্টমন্ত্র স্মরণ করেন, যদি শাস্ত্রপাঠ তাহাদের দোষের হয় তবে তাহাদের সেবায় কি ফল? যে স্বামীর ভজন করা হয়, তিনি ত স্বতন্ত্র। তিনি প্রসন্ন হইয়া ইচ্ছানুসারে মন্ত্রীদিগকে অর্থাৎ মন্ত্রজপকারীদিগকে দান করিবেন, তদ্বিষয়ে অন্য কোন পুরুষের অপেক্ষা নাই, সুতরাং উপাসনার ফল কি?

দেহ কর্ম্মরচিত, কর্ম্মসকল ত্রিগুণপ্রসূত, গুণসকল মায়ার অন্তর্গত। এইভাবে প্রাণিগণের যে প্রারব্ধ তাহা মায়াভিমত। অভিমানের উদয় হইলেই ব্রহ্ম হইতে পৃথগীভূত হয়। এইভাবে পূর্ব্বে ও পবে গুণলেশ থাকিবেই এবং তাহাই বাধক। অতএব অবধূত ব্যতীত প্রারব্ধ কর্ম্ম কেহই নির্ম্মূল করিতে পারেন না।[১]

গীতায় আছে—

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥ (২।৪৫)

সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণের কার্য্য অর্থাৎ কামনামূলক সংসার, কর্ম্মকাণ্ডাত্মক বেদ তাহার প্রকাশক, কর্ম্মফলকামীদের নিকট বেদ ফলপ্রকাশ করেন এবং তাঁহারা ফলকামনাপূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান করেন বলিয়া সংসারে বদ্ধ হন। ফলকামনা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিলে বদ্ধ হইতে হয় না। তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে এবং যোগ (অপ্রাপ্তের প্রাপ্তি) ও ক্ষেমের (প্রাপ্তের রক্ষণ) আকাঙ্ক্ষারহিত ও অপ্রমত্ত হইতে উপদেশ দিয়াছেন।

বেদান্তী চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম্মের অভিমন্ত্রণ করিয়া তদনন্তর জ্ঞানই সাধন বলিয়া থাকেন, ইহাতে বেদান্তীর জ্ঞান ও কর্ম্ম পরস্পরসাপেক্ষ। মীমাংসক মন্ত্রিবৎ রাজসাপেক্ষ, আর বেদান্তী রাজবৎ মন্ত্রিসাপেক্ষ। সাপেক্ষত্ব

১। গো. সি. স., পৃ ১৫

উভয়েই বর্ত্তমান কিন্তু কাহারও অপেক্ষা না করিয়া যে আবশ্যক যোগ সকলের কর্ত্তব্য তাহা স্বতন্ত্র বস্তু। মীমাংসক দ্বৈতের অভিমনন করেন, বেদান্তী অদ্বৈতের অভিমনন করেন, যোগীরা তদুপরি বিষয়ের কথা বলেন। দ্বৈত ও অদ্বৈত উভয়ই প্রকৃতিবিকার, প্রকৃতিবিকার সদাই চঞ্চল, কিন্তু ব্রহ্ম অচঞ্চল। দ্বৈতবাদীর নিকট নিশ্চল নাই, অদ্বৈতবাদীর পক্ষেও নিশ্চল নাই। মহাসিদ্ধরা বলেন দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জ্জিত নিশ্চল পদই সত্য।[১]

অবধূতগীতায় আছে—

অদ্বৈতং কেচিদিচ্ছন্তি দ্বৈতমিচ্ছন্তি চাপরে।
সমং তত্ত্বং ন বিন্দন্তি দ্বৈতাদ্বৈতবিলক্ষণম্॥

অর্থাৎ সংসারে কেহ অদ্বৈতবাদী, কেহ দ্বৈতবাদী, কেহ দ্বৈতাদ্বৈতবাদী, তাহারা সমতত্ত্বকে জানে না।

দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জ্জিত সেই পদে অবস্থানেই মুক্তি। মায়া প্রভৃতি দ্বৈতাদ্বৈতবাদীদের কল্পনা, ভাবাভাববিনির্ম্মুক্ত শিবই অন্তরালস্বরূপ, তিনি সাকারও নহেন নিরাকারও নহেন, ভেদাভেদ তাঁহাতে নাই। ভাবগম্য হইলে যিনি নিরাকার, দৃষ্টিগোচর হইলে তিনিই সাকার। তাই শিব ভাবাভাববিনির্ম্মুক্ত।[৩]

দ্বৈতবাদীরা ব্রহ্মকে ক্রিয়মাণ বলেন, অদ্বৈতবাদীরা তাঁহাকেই নিষ্ক্রিয় বলেন। ব্রহ্ম নিরন্তর ক্রিয়মাণ বা নিরন্তর নিষ্ক্রিয় হইতে পারেন না। মনুষ্য যেরূপ কার্য্য করে এবং কার্য্যান্তরে বিশ্রাম করে, ঈশ্বরও তদ্রূপ করেন। ক্রিয়াক্রিয়া উভয় শক্তিই তাঁহাতে বিদ্যমান। ইহাই সিদ্ধমতে পূর্ণতত্ত্বের লক্ষণ। অতএব সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় প্রভৃতি একদেশী দৃষ্টিতে তাঁহার পূর্ণত্বের নির্দ্দেশ হয় না।

নির্গুণ ব্রহ্ম ও সিদ্ধদের নাথ মধ্যে প্রভেদ এই যে, 'নাথ' অদ্বৈতোপরি ও নিরাকার সাকারাতীত, সেই নাথ হইতেই নিরাকার জ্যোতির্নাথ ও সাকারনাথের জন্ম, সাকারনাথ হইতে সদাশিব ভৈরব ও তাঁহার শক্তি ভৈরবীর জন্ম। 'নাথ' সর্ব্ববিলক্ষণ অর্থাৎ 'যাদৃশ এব তাদৃশ এব', তাঁহার কোন তুলনা নাই, তিনিই মহাসিদ্ধদের ধ্যেয়।[৪]

সিদ্ধমতে ত্যাগ ও ভোগের সামরস্য আছে, ইঁহারা ত্যাগের মধ্যে যদি ভোগ সাধন করেন তবে তাহা তাঁহাদের বাধক হয় না। কারণ

১। গো. সি. স., পৃ ১৫, ১৬
২। অবধূত গীতা, হরিপ্রসাদ ভগীরথজী, শ্লোক ৩৬ প্রথম অধ্যায়
৩। গো. সি. স., পৃ ১১, ৩৪
৪। গো. সি. স., পৃ ৭২, ৭৩

ভোগী দেহ দ্বারা বিজিত, যোগী দেহকে জয় করিয়াছেন, অতএব ভোগ ও ত্যাগ যোগীর নিকট সমানার্থক। সিদ্ধমতে ওঁকার সাধনে বৈশিষ্ট্য আছে. এই ওঁকার বা প্রণবই নাথসম্প্রদায়ের নাদবিন্দুসাধন, এই প্রণবসাধনেই সিদ্ধদের শিব ও শক্তির সাধন। সিদ্ধমতে এই মনুষ্য-দেহই আত্মা, তাই কুণ্ডলিনীর জাগরণ, ষট্‌চক্রসাধন ও ষড়ঙ্গযোগসাধন সিদ্ধদের বৈশিষ্ট্য।

মহাজ্ঞানলাভ করিয়া কায়সাধন দ্বারা অজর অমর হওয়াই নাথগণের প্রেয়। শাস্ত্রপাঠ বা বহু শিষ্য করা সিদ্ধমতে নিন্দনীয়। মহাসিদ্ধরা গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করেন না, তাঁহারা অবধূত, জ্ঞানদণ্ড তাঁহারা ধারণ করেন, তন্ময়তা যোগ রূপ সূত্রই তাঁহাদের যজ্ঞোপবীত, তাঁহাদের শিখা জ্ঞানশিখা, পরমাত্মায় স্থিতিই তাঁহাদের সন্ধ্যা।[১] নাথেরা দ্বৈত বা অদ্বৈতবাদী ছিলেন না, ইঁহারা সাকার-নিরাকারাতীত বা সগুণ-নির্গুণাতীত 'নাথে'র বর্ণনা করিয়াছেন। 'নাথ' বিশ্বোত্তীর্ণ। নিজেকে এই নাথস্বরূপে অনুভব করাই জীবনের লক্ষ্য। যোগজ প্রণালী দ্বারা সাধন না করিলে এই অনুভূতি লাভ সম্ভবে না, সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতিতে "সন্মার্গশ্চ যোগমার্গঃ, তদিতরস্তু পাষণ্ডমার্গঃ" বলা হইয়াছে। যোগ-মার্গকেই শ্রেষ্ঠ মার্গ বলা হইয়াছে। এই মার্গ দ্বৈতাদ্বৈতোপরবর্ত্তী মার্গ।

জালন্ধরনাথকৃত সিদ্ধান্তবাক্যে আছে—

> বন্দে তন্নাথতেজো ভুবনতিমিরহং ভানুতেজস্করং বা
> সংকৃতব্যাপকং ত্বা পবনগতিকরং ব্যোমবন্নিভরং বা।
> মুদ্রানাদত্রিশূলৈর্বিমলরুচিধরং খর্পরং ভস্মমিশ্রং।
> দ্বৈতং বাঽদ্বৈতরূপং দ্বয়ত উত পরং যোগিনাং শঙ্করং বা।[২]

"যোগমার্গাৎ পরো মার্গো নাস্তি নাস্তি শ্রুতৌ স্মৃতৌ"। বিবেকমার্ত্তণ্ডেও "যোগশাস্ত্রং পঠেন্নিত্যং কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরঃ" ইত্যাদি আছে। কিন্তু যোগ কি? বিভিন্ন গ্রন্থে ইহার বিভিন্ন ব্যাখ্যা থাকিলেও মূলতঃ ইহা একই। হঠযোগপ্রদীপিকাতে আছে, "যথাচোক্তং গোরক্ষনাথেন সিদ্ধ-সিদ্ধান্তপদ্ধতৌ। হকারঃ কীর্ত্তিতঃ সূর্য্যষ্ঠকারশ্চন্দ্র উচ্যতে। সূর্য্যাচন্দ্র-মসোর্যোগাদ্ধঠযোগো নিগদ্যতে।" প্রাণ ও অপানের যোগরূপ প্রাণায়ামকে হঠযোগের লক্ষণ বলা হইয়াছে। (১।১ টীকা)

১। ব্রহ্ম উপনিষদ ও পরমহংস উপনিষদ, ১০৮ উপনিষদে দ্রষ্টব্য। গো. সি. স., পৃ ৪৯, ৫০

২। Some Aspects of History & Doctrine of the Nathas—by M. M. Gopinath Kaviraj, S. B. S., No. 6.

মৎস্যেন্দ্র, গোরক্ষ আদি (অর্থাৎ জালন্ধর, ভর্ত্তৃহরি, গোপীচন্দ্র প্রভৃতি) এই হঠযোগবিদ্যার সাধন লক্ষণ ও ফলাদি জানিতেন। স্বাত্মারাম যোগী গোরক্ষ-প্রসাদেই এই হঠযোগ অবগত হন (হ-যো-প্র ১।৪)। মৎস্যেন্দ্রের নামের সহিত মৎস্যেন্দ্র-আসন, জালন্ধরনাথের নামের সহিত জালন্ধরবন্ধ, গোরক্ষের নামের সহিত গোরক্ষাসন সংশ্লিষ্ট; এইগুলি হঠযোগের সহিত যুক্ত। বঙ্গীয় গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসেও যোগের বর্ণনা পাওয়া যায়। ইহা বঙ্গসাহিত্যে যোগবিষয়ক উল্লেখ।[১]

হঠযোগ দ্বিপ্রকার, গোরক্ষ ও মার্কণ্ডেয় প্রচারিত (অন্যত্র ইহার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে)। নাথেরা হঠযোগের পুনরাবর্ত্তন করেন ইহাই সম্ভব। তৎকালে পাতঞ্জল, বৌদ্ধ ও জৈনদর্শন রাজযোগের উপর স্থাপিত ও বিস্তারিত হইতে থাকে, নাথেরা সিদ্ধান্ত করিলেন যে চিত্তবৃত্তি নিরোধের দ্বারা রাজযোগ সাধন সকলের পক্ষে সহজসাধ্য নহে, তাই বায়ুজয় দ্বারা হঠযোগ সাধন করিয়া রাজযোগে উপনীত হইবার পন্থা নির্দ্ধারণ করিলেন। মন্ত্রযোগ দ্বারা রাজযোগে উপনীত হওয়া অপেক্ষা ইহা সহজসাধ্য। এদেশে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধি আছে যে বিন্দু (বীর্য্য বা শুক্র), বায়ু ও মনস্ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, অতএব একটীর জয় সাধনে অপর দুইটীর জয় অবশ্যম্ভাবী। ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা বিন্দুজয় কর্ত্তব্য, বায়ুজয়ে মনের স্থিরতা হয়, ইহা সকল সাধনার মূল লক্ষ্য। আসন, মুদ্রা, নাদানুসন্ধানাদি হঠযোগসাধনে সাহায্য করে। ইহা দ্বারা উন্মনী অবস্থালাভই চরম উদ্দেশ্য। ইহাই অমনস্ক। ইহার সহিত বৌদ্ধ-সহজিয়া সাধনের মিল আছে। তথাপি নাথমার্গের সিদ্ধিকথা অন্যমার্গে পাওয়া যায় না। "আসনং কুম্ভকং চিত্রং মুদ্রাখ্যং করণং তথা অথ নাদানুসন্ধানম্," প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধি চতুষ্টয়ের অন্তর্গত।

আসন দ্বারা স্বাস্থ্য, স্থিরতা ও লঘুতা প্রাপ্তি হয়। নাদ অভ্যাসে মনের উপর ক্রিয়া হয় ও চাঞ্চল্য দূর হয়। মন নিষ্ক্রিয় হইলে বায়ু ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রবেশ করে ও মনোন্মোনী বা সহজাবস্থা লাভ হয়। এই বিবিধ হঠপ্রণালী পরস্পরের সহিত যুক্ত। নাদশ্রবণে অভ্যস্ত হইলে বুঝিতে হইবে বায়ু সুষুম্না নাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছে। অশুদ্ধতা পরিহৃত হওয়া মাত্রই অনাহত নাদ শ্রুত হয়। এই অশুদ্ধতা পরিহারের

১। গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস ২য় খণ্ড পৃ ৪১৩

নিমিত্ত আসন ও মুদ্রাসাধন কর্তব্য। মুদ্রাসাধনের লক্ষ্য কুণ্ডলিনীর জাগরণ কিন্তু প্রণালীবদ্ধ নিয়মে আসন সাধন না করিতে পারিলে ইহার জাগরণ সম্ভব হয় না। মানবের মধ্যে যে সুপ্ত শক্তি আছে তাহাকে জাগরিত করিবার উদ্দেশ্যেই হঠযোগের সাধনা। নাথযোগীরা দৈহিক সাধনের উপরই গুরুত্ব অর্পণ করিয়াছেন। হঠযোগে দেহস্থ নাড়ী ইত্যাদির জ্ঞান আবশ্যক। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূলতম বিষয় হইতে সম্প্রজ্ঞাত বা সস্মিতা সমাধি লব্ধ জ্ঞান অবধি সকল বস্তুর জ্ঞান এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মার সহিত যে যোগ আছে হঠযোগীর সে বিষয়ে জ্ঞান থাকা কর্তব্য। মনুষ্যের মধ্যে যে সকল অন্তরায় আছে তাহা দূঢ় করাই হঠযোগীর লক্ষ্য। বায়ুকে এক স্তর হইতে অন্য স্তরে নীত করাই হঠযোগের সাধন। মস্তকস্থ সহস্রদল কমলে সর্ব্বোচ্চ স্তর বিদ্যমান, সাধনা দ্বারা সেই স্তরে উপনীত হওয়াই হঠযোগীর কাম্য।

শুদ্ধ আত্মা মন ও ভূত এই উভয় আচ্ছাদন দ্বারা আবরিত হইয়া পার্থিবরূপ ধারণ করে। বুদ্ধি, অহঙ্কারাদি মনের অন্তর্গত, ভূত অর্থে শব্দ-স্পর্শাদির তন্মাত্রের আধার। পঞ্চভূতের প্রত্যেকটির কেন্দ্র আছে, তাহা হইতে ইহাদের প্রসার ও সঙ্কোচ সাধিত হয়, কেন্দ্রগুলিই 'তন্মাত্র'। তন্মাত্র রূপে শব্দ-স্পর্শাদির ভিন্নতা উপলব্ধি হয় না। শুদ্ধ আত্মা বহিঃপ্রকাশের সময়ে তন্মাত্রের আবরণ গ্রহণ করে, তাহা দ্বারা আত্মার বিশুদ্ধতা আবরিত হয়, কিন্তু তাহা দূর করিবার ক্ষমতাও তৎসহ গ্রথিত থাকে।

বাহ্য স্থূল জগতে আত্মার প্রকাশ হইলে আত্মবিস্মৃতি ঘটে, তন্মাত্র কেন্দ্র হইতে যে সূক্ষ্ম বস্তুর বিকীরণ ঘটে তাহার 'পঞ্চীকরণ' দ্বারাই ইহা সম্ভব হয়। শুদ্ধ আত্মার সূক্ষ্ম বস্তুতে পরিণত হওয়া সরলগতিতে গমনের ন্যায়, কিন্তু সূক্ষ্মের বাহ্য স্থূলে পরিণত হওয়া বায়ুর 'তির্য্যগ্ গতির' সহিত তুলনীয়।

বিশুদ্ধ প্রত্যক্ষ জ্ঞান যখন স্থূল আবরণে আচ্ছাদিত হয়, মনস্ তখন স্থূল বস্তু গ্রহণযোগ্য ইন্দ্রিয়ে পরিণত হয়, প্রত্যেক ইন্দ্রিয় আপন আপন বিষয় গ্রহণে রত থাকে। ইন্দ্রিয়গণ এই নিমিত্তই স্থূল বিষয় ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণে অসমর্থ, বিভিন্ন ইন্দ্রিয় হইতে মনস্‌কে পৃথক করিতে সমর্থ হইলে অতীন্দ্রিয় অনুভূতির উপলব্ধি সম্ভব হয়। মনসের এই পৃথকীকরণ যত অধিক হইবে, জ্ঞানের বিশুদ্ধতাও তত অধিক হইবে। শুদ্ধতা ও মনঃসংযমই মনকে পৃথক করিবার উপায়। শিবের 'দিব্যচক্ষু' অর্থে

মনেরই সংযম দ্বারা দিব্যদর্শন। স্থূলাবরণে আবরিত মনকে স্থূলই বলা চলে, বায়ুর গতিও এই অবস্থাতে সরল থাকে না। ইহাই আমাদের স্বাভাবিক অবস্থা। বায়ুর বক্র গতির নিমিত্তই শরীরস্থ বক্রনাড়ীর প্রয়োজন। সুষুম্না তন্মধ্যে মধ্যনাড়ী, অন্যনাড়ী বাম ও দক্ষিণে স্থাপিত; সাধারণ ব্যক্তির মন ও বায়ুর গতি এই নাড়ীপথে চালিত হয়, ইহাই তাহার সংসার। নাথগণ বলেন নদী যেমন সাগরে নীত হয় তেমনি সুষুম্না পথে চালিত হইলে মানব সেই পরমসত্তাকে উপলব্ধি করিবেই। স্থূল দেহ দ্বারা আবৃত জীবের পক্ষে অন্য পন্থা বিপথে গমনের ন্যায় ত্যাজ্য। যে মুহূর্তে মনের বিভিন্ন গতির রোধ হইয়া চিত্ত স্থির হয় ও বায়ুনিরোধ হয় তন্মুহূর্তেই উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় আত্মশক্তির বিকাশ হয়। ইহাই সুপ্ত কুণ্ডলিনীর জাগরণ ও তাহার বাহ্য বিষয় হইতে কিঞ্চিৎ বিচ্ছিন্নতা। এইরূপে বাহ্যবস্তু হইতে পৃথক্ হইয়া শক্তি অন্তর্মুখী হইয়া সেই বিরাট সত্তার সহিত মিলিত হয়। ইহা অস্তিত্বলোপ নহে, ইহা মিলন ও একের অন্যতে শোষণ। ব্রহ্মন্ বা শিব শক্তিরই রূপভেদ মাত্র। শিবের সহিত স্থূল বস্তুজগতের যোগ নাই তথাপি সত্তামাত্রে যে শিবত্ব আছে ইহা স্বীকার্য্য; বাহ্য আবরণ দ্বারা সেই শিবত্ব আবরিত। শক্তির এই রূপকে অর্থাৎ শিবত্বকে জীবমধ্যে গুরুই কৃপা করিয়া উন্মেষিত করেন—"শিবস্যাভ্যন্তরে শক্তিঃ শক্তেরভ্যন্তরে শিবঃ।"[১]

শক্তি কিরূপে জড়বস্তু দ্বারা আবরিত হয় ইহা অতীব রহস্যময়। কিন্তু মানব তাহা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইলেই শক্তিকে তাহার মূলস্বরূপ অখণ্ড পরমসত্তাতে লীন করিতে পারে।

জড়পদার্থই শিব ও শক্তিতে ভেদ উৎপন্ন করে, অতএব জড়পদার্থের যথার্থ জ্ঞান হইলেই এই ভেদজ্ঞান দূর হয়। জড়পদার্থ কি? ইহা ইন্দ্রজাল বিশেষ, পরমসত্তার শিব ও শক্তিরূপে প্রকাশেই ইহার প্রকাশ। যখন শিব ও শক্তি মিলিত হন তখন বাহ্য জড়পদার্থেরও অস্তিত্ব থাকে না। যোগী শিব-শক্তির এই মিলনাকাঙ্ক্ষাই করেন। মধ্যযুগের হিন্দু ও বৌদ্ধতন্ত্রের সাধনায় ইহারই ইঙ্গিত দেখা যায়। প্রণয়ঘটিত কাল্পনিক চিত্রদ্বারা ইহা ব্যাখ্যাত হয়।

আত্মা বাহ্যবস্তুর সহিত যুক্ত থাকিলে আত্মোপলব্ধি সম্ভব হয় না,

১। সি. সি. স. ৪।৩৭

শক্তি বিষয়বস্তু হইতে মুক্ত হইলেই স্বরূপ-উপলব্ধি সম্ভব। শক্তি আবরিত হইলে তাহার মূল শিব হইতে শক্তি বিচ্ছিন্ন হয় ও বস্তুজগতে বিলীন হইয়া যায়। ইহাই যোগসাহিত্যের 'প্রকৃতিলীন' অবস্থা। জাগতিক অজ্ঞানতার মূল এইখানে। তৎপরে বিশ্বসৃষ্টির সহিত উহা জাগতিক বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়ে, অর্থাৎ দেহস্থ বায়ুসকল সরলভাবে আর প্রবাহিত হয় না ও অন্যান্য শক্তিগুলির গতিও পরিবর্ত্তিত হয়। ইহাই তৃতীয় অবস্থা। এই অসামঞ্জস্য দূরীকরণ কর্ত্তব্য। স্বাভাবিক নিয়মে ক্ষণিকের নিমিত্ত সন্ধিক্ষণ বা নিরোধক্ষণে এই অসামঞ্জস্য থাকে না, এই ক্ষণটীর স্থায়িত্ববর্দ্ধন অভ্যাস দ্বারা সম্ভব। দক্ষিণ ও বাম মার্গের বায়ুগণকে বশীভূত করা সম্ভব, সিদ্ধ ও নাথমতে ইহাদেরই চন্দ্রসূর্য্য, ইড়াপিঙ্গলা আদি নাম দেওয়া হইয়াছে। গোরক্ষকৃত অমরৌঘশাসনে—"যত্র চ মূলভগমণ্ডলান্তে কুণ্ডলিনীশক্তি র্বিনির্গতা তত্র বামভাগোদ্ভবসোমনাড়িকা" ইত্যাদি আছে।

এই বিভিন্ন শক্তির সামঞ্জস্য সাধন করিতে পারিলে সুষুম্নাগ্র ব্রহ্ম বা শূন্যনাড়ী মুক্ত হইয়া যায়, তখন বিন্দু, বায়ু ও মনস্ ক্রিয়াযোগের দ্বারা তাহার ভিতর প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় ও ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হয়।

কুণ্ডলিনীর জাগরণ, মধ্যনাড়ীর পথ উন্মুক্ত হওয়া, মন ও বায়ুর শুদ্ধতা প্রাপ্তি, প্রজ্ঞার উন্মেষ, অহঙ্কার ও অবিদ্যাগ্রন্থির বিলয়, সকলই একই ক্রিয়ার নামান্তর। বাসনা ক্ষয় করিয়া পথ উন্মুক্ত করিতে হয়। নাথমার্গে ইহাকেই ষট্‌চক্রভেদ বলা হয়। ইহা তন্ত্রেরও প্রকাশপ্রণালী, খৃষ্টানদের ইহাই বিশোধন, তন্ত্রের উপাসনা-কাণ্ডের ইহাই ভূতশুদ্ধি বা চিত্তশুদ্ধি।

ব্রহ্মনাড়ীর গুপ্তরন্ধ্র বৈদিক দ্রষ্টাদের অজ্ঞাত ছিল না, ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপনিষদে হৃদয় হইতে মস্তক পর্য্যন্ত যে মূর্দ্ধানাড়ীর কথা বলা হইয়াছে তাহাই সুষুম্না নাড়ী। বিভিন্ন মতানুযায়ী চারিটি স্থানে (মূলা, নাভি, হৃদয় ও আজ্ঞা) হইতে মনসের ঊর্দ্ধগতি কল্পনা করা হয়। বৈদিক সম্প্রদায়ে হৃদয় ও নাথসম্প্রদায়ে মূলা ও নাভিস্থান হইতে সাধন প্রচলিত ছিল। ঐ সকল স্থানই মনস্ ও বায়ুর সন্ধিস্থল। এই সকল স্থানে মনোনিবেশ করিতে পারিলে 'পথ' উন্মুক্ত হয়। এই জ্যোতির্ম্ময় পথের এক প্রান্তে ঈশ্বর বা গুরু, অন্য প্রান্তে জ্ঞানপ্রাপ্ত জীব বা শিষ্য, এই উভয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহাই ঐ পথ। অভ্যাসের দ্বারা

এই পথের দূরত্ব হ্রাস হয় এবং উভয়ের মধ্যে ভেদাভেদ দূর হয়। জীব ও ঈশ্বরে ভেদ দূর হইলে শিব ও শক্তি (বা ঈশ্বর ও জীব) ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইয়া থাকেন ; ইহাতে স্বাতন্ত্র্য দূর হইয়া এক অবিমিশ্র সত্তার উদ্ভব হয়, ইহাই জীবের আদি অবস্থা। ইহাকেই শিবশক্তির সামরস্য বলে, ইহাই আনন্দের স্বরূপ। জ্ঞান ইহার সহিত নিত্যযুক্ত, এই জ্ঞানই মোক্ষমার্গ, তাই নাথেরা শাস্ত্রসকলকে অন্তরায়স্বরূপ বলিয়াছেন। শাস্ত্রপাঠে অজ্ঞান দূর হয় না, বিভ্রম আসিয়া পড়ে। যোগ বিনা প্রকৃত জ্ঞানলাভ সম্ভবে না, "যোগায় রহিতং জ্ঞানং মোক্ষায় ন ভবেৎ" (যোগবীজ, ৬৪ শ্লোক)। শাস্ত্রীয় জ্ঞান দ্বারা মোক্ষলাভ হয় না। জনক, অসিত, তুলাধার ধর্ম্মব্যাধ, মৈত্রেয়ী, সুলভা প্রভৃতি যোগ বিনা জ্ঞান-সাধনের উদাহরণ, ইঁহারা পূর্ব্বজীবনে যোগসাধন করিয়াছিলেন। সিদ্ধরা বলেন যাহার জ্ঞান আছে ও সিদ্ধি নাই সে যথাসময়ে কোন সিদ্ধের আশ্রয়ে তাঁহার কৃপায় যোগসাধন করিবে (যোগবীজ, ১৫৯-৬০)।

মোক্ষার্থে ইহা প্রয়োজন। জ্ঞাননিষ্ঠ যোগীর পক্ষেও যোগ আবশ্যক, দেবতাও যোগ বিনা মোক্ষলাভ করেন না (যোগবীজ, ৩১)।

শঙ্করের সর্ব্বসিদ্ধান্ত-সংগ্রহে 'জ্ঞানমাত্রেণ মুক্তিঃ' থাকিলেও যোগ-সাধন বিনা দেহজয় সম্ভব নহে। যতক্ষণ মানব সীমাদ্বারা আবদ্ধ ততক্ষণ প্রজ্ঞালাভ হয় না, মনও স্থির হয় না, এই সীমা অর্থে মানবের বাসনা আদি। দেহ পঞ্চভূত, শীতোষ্ণ, জরামৃত্যু দ্বারা বাধিত, একমাত্র যোগ দ্বারাই ইহাদের অতিক্রম করা যায়। ইহাই নাথযোগীদের প্রধানতম লক্ষ্য। মানব দেহ অপক্ক, সেই নিমিত্ত মানবে দুঃখের অস্তিত্ব ও তৎসহ স্বাভাবিক শক্তিসকল আবৃত অবস্থায় থাকে। আত্মসংযম কঠিন, কারণ প্রাকৃতিক প্রভাব হইতে মনকে বিচ্ছিন্ন করা মানবের পক্ষে কঠিন সাধনা। মানব প্রকৃতির অধীন, জ্ঞান দ্বারা পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে জয় করা যায় না বলিয়াই যোগসাধন আবশ্যক। অতএব যোগ দ্বারা পক্কদেহ লাভ করাই নাথদের সাধন। শিবত্বলাভ, জীবন্মুক্ত হইয়া সিদ্ধির দ্বারা প্রভুত্ব ইত্যাদি নাথমার্গের আদর্শ। জীবন্মুক্ত হইবার উপায় হঠযোগ সাধন। যোগসূত্রে হঠযোগের স্থান নিম্নে এবং মোক্ষের জন্য ইহাতে দেহরক্ষার আবশ্যকতা স্বীকৃত হয় নাই। নাথমার্গে দেহরক্ষাই বৈশিষ্ট্য।

সহস্রারে শক্তিসহ শিবের মিলনে মোক্ষ বা অন্য প্রণালী দ্বারা মোক্ষলাভই সকল সাধনের মূল লক্ষ্য। কিন্তু নাথসম্প্রদায়ের মতে মোক্ষ,

আবশ্যক হইলেও উহা তাহাদের লক্ষ্য নহে। সিদ্ধি বা বিভূতি লাভই ইহাদের লক্ষ্য। কারণ বিভূতি দ্বারা সাধক যে কেবল স্বয়ং স্বর্গসুখ উপলব্ধি করেন তাহা নহে, পরন্তু মানবের হিতার্থে ঘটনাবলীর গতি নিয়ন্ত্রণেও সমর্থ হন। 'কৌলজ্ঞান-নির্ণয়ে' এই ব্যবহারিক দিক্ বিভিন্ন পটলে বর্ণিত হইয়াছে।

বাসনা জয় দ্বারাই সিদ্ধিলাভ হয়, সাধক ক্রমশঃ বাসনা, ক্রোধ ও দম্ভ জয় করিয়া 'সমত্ব' লাভ করিবেন। অষ্টাদশ প্রকার 'লোকশাস্ত্র' সত্যের অঙ্গীভূত নহে, সে সকল পূজাপদ্ধতি ত্যাগ করিয়া (৩।১৬-১৭) দেহমধ্যে মানসলিঙ্গের পূজা কর্ত্তব্য, তাহাতেই 'সিদ্ধি'লাভ হইবে, প্রস্তরলিঙ্গের পূজায় সিদ্ধিলাভ হয় না। অহিংসা, ইন্দ্রিয়জয়, দয়া, জ্ঞান ইত্যাদি এই দেহস্থ লিঙ্গের মানসপূজার ফলস্বরূপ ; যথা—

> অহিংসা প্রথমং পুষ্পং দ্বিতীয়ম্ ইন্দ্রিয়নিগ্রহম্।
> তৃতীয়ঞ্চ দয়াপুষ্পম্ ভাবপুষ্পং চতুর্থকম্ ॥২৫
> পঞ্চমন্তু ক্ষমাপুষ্পং ষষ্ঠং ক্রোধবিনির্জ্জিতম্।
> সপ্তমং ধ্যানপুষ্পন্তু জ্ঞানপুষ্পন্তু অষ্টমম্ ॥২৬
> এতং পুষ্পবিধিং জ্ঞাত্বা অর্চ্চয়ে লিঙ্গমানসম্।[১]

মৎস্যেন্দ্রের যোগিনী কৌলদের বিভিন্ন সিদ্ধিকথা কৌলজ্ঞানের চতুর্দ্দশ পটলে বর্ণিত আছে; যথা. দূরদর্শন, পরকায়প্রবেশ, স্বদেহে ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবতা ও গ্রহনক্ষত্রাদি বিশ্বজগৎ দর্শন। সাধক স্বয়ং শিবের ন্যায় হইতে পারেন (৭৫-৭৬ শ্লোক) এবং সৃষ্টিসংহারকর্ত্তা, জরামরণমুক্ত মহাবেগগামী হইতে পারেন। সাধক অতীত অনাগত বর্ত্তমান দর্শনে সক্ষম হন এবং তন্ময়তা লাভ করিয়া খেচরী দ্বারা অমৃতপান করেন। এই অমৃতের স্বভাব কামকলার ন্যায় অর্থাৎ নির্ম্মল, এবং খদ্যোত ও তারকার ন্যায় উজ্জ্বল। সাধক তখন উৎপত্তিলয়ের অতীত অবস্থা, কুলাকুলবর্জ্জিত অবস্থা প্রাপ্ত হন (৯৬-৯৭ শ্লোক)। এইরূপে যিনি মনের সাধনা করেন শিব তাঁহাকেই 'অষ্টসিদ্ধি' দান করেন (৫৯-৬৮ শ্লোক)।

খেচরীমুদ্রা সাধন সম্বন্ধে ডাঃ সিং বিভিন্ন উপনিষদ হইতে উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার 'গোরক্ষনাথ' পুস্তকে দেখাইয়াছেন যে চিত্ত 'খালক' মধ্যে

১। কৌলজ্ঞান নির্ণয়, তৃতীয় পটল—২৫-২৭ শ্লোক।

ভ্রমণ করে ও জিহ্বা 'খ' মুদ্রা পর্য্যন্ত প্রসারিত হয় বলিয়া 'খেচরী মুদ্রা' নাম হইয়াছে। যোগীরা ইহার সাধন করেন।

যোগরাজ উপনিষদে দশদ্বারের কথা আছে, তন্মধ্যে ঘন্টিকাস্থানের তালুকাচক্র ষষ্ঠ। উপনিষদের সহিত গোরক্ষ-সম্প্রদায়ের ঐক্য ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের অনৈক্য সম্বন্ধে ডাঃ সিং গোরক্ষসংহিতার মতামত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে সমরস দ্বারা পূত ভক্ত শূন্যমধ্যে উল্লসিত হইয়া অবস্থান করেন। কঠ উপনিষদে পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মন জয় দ্বারা উর্দ্ধতন অবস্থালাভের উল্লেখ আছে এবং পুরুষ, সুষুম্না, অধোমুখ, উর্দ্ধ আদি শব্দ আছে।

গোরক্ষ-রচিত অমরৌঘশাসনে মোক্ষ সম্বন্ধে যে আদর্শ আছে তাহা সিদ্ধমতের বৈশিষ্ট্য। তাহাতে আছে, শব্দব্রহ্মের পারদর্শিতা হইলে পরব্রহ্মের জ্ঞান হয়, অতএব 'সর্ব্বং পরিত্যজ্য শব্দব্রহ্ম সদাভ্যসেৎ'। বায়ুকে আশ্রয় করিয়া নাদ উঠে, তবে সে নাদ শব্দহীন। বালোচিত মূর্খতা বশতঃই লোকে বলে, কর্ম্মনাশে মোক্ষ হয়, পূজাপাঠাদি মদ্যমাংসভক্ষণে যে আনন্দলক্ষণ হয় তাহাই মোক্ষ, কুণ্ডলিনীর জাগরণই মোক্ষ, সুসমদৃষ্টি হইলে মোক্ষ হয় ইত্যাদি, কিন্তু সিদ্ধমতে সহজসমাধি-ক্রমে মনের দ্বারা মনকে সমালোচনা করিলে যথার্থ মোক্ষ হয়। "কাম-বিষহরস্থানং মানসোদ্ভবঃ মনোমধ্যে কারণং কারণাৎ উৎপত্তিস্থিতি-প্রলয়াঃ প্রবর্ত্তন্তে";[১] কামবিষহর নিরঞ্জনের জ্ঞানেই জীবন্মুক্তি লাভ হয়।

এককথায় গোরক্ষমতের বৈশিষ্ট্য হইল বৃত্তি, প্রাণ ও বীর্য্য জয়। 'নাদানুসন্ধান' এই সম্প্রদায়ের বিশেষ সাধন। ইহার সহিত শব্দব্রহ্ম ও স্ফোটবাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। শ্রীব্রহ্মানন্দ-কৃত অদ্বৈতমার্ত্তণ্ডে (পৃ ১২৭-৩২) নাদসম্প্রদায়ের বিবরণ আছে; তন্মধ্যে এইরূপ বিবৃতি আছে—

অত্রায়ং সম্প্রদায়ঃ হৃদয়ধোমুখকমলে প্রাণায়ামেনোর্ধমুখং কৃত্বা তত্র সূর্য্যমণ্ডলং দ্বাদশকলাত্মকজাগরিতস্থানমকারং তদুপরি চন্দ্রমণ্ডলং ষোড়শকলাত্মকং স্বপ্নস্থানমুকারং তদুপরি বহ্নিমণ্ডলং দশকলাত্মকং সুষুপ্তি-স্থানং মকারং তদুপরি নাদাখ্যং তুরীয়ং ব্রহ্ম বিভাবয়েদিতি। সংগৃহীত-শ্চায়মর্থঃ কালিদাসেনাপি।

১। অমরৌঘশাসন, পৃ ৩, ৮, ৯

আনন্দলক্ষণমনাহতনাভিদেশে নাদাত্মা পরিণততনরূপমীশে।
প্রত্যঙ্ মুখেনমনসপরিচীমানশং সন্তি নেত্রসলিলৈঃ পুলকৈশ্চ ধন্যা।[১]

নাথেরা শিব ও পরমশিবের উপাসক, বেদান্তের ব্রহ্ম হইতে ইঁহাদের দৃষ্টিতে ভেদ আছে। ইঁহাদের মার্গ যোগপ্রধান। গোরক্ষের যোগ অথর্ব্ববেদে (৮।৯) উল্লিখিত যোগের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহার আদর্শ অর্দ্ধনারীশ্বর 'পুরুষ-বাক্', ইহা দ্বৈতভাব। অথর্ব্ববেদে যোগ অর্থে 'মিলন'—বিশ্বের সহিত পুরুষাত্মার যোগ। ইহাই শিবের উপাসনা।[২]

সিদ্ধমতের বৈশিষ্ট্য 'নাথ' কল্পনা, ইহাতে দ্বৈত বা অদ্বৈতের বিকল্প নাই। অদ্বৈত উপলব্ধি করিতে হইলে দ্বৈতের উপলব্ধি প্রথমে কর্ত্তব্য, শিব ও শক্তির সামরস্য সাধনেই পরমশিবের উপলব্ধি হয়, কিন্তু 'নাথ' সর্ব্বদ্বন্দ্বাতীত অবস্থা, তাহা 'যাদৃশ এব তাদৃশ এব'—উহা বর্ণনাতীত। সিদ্ধ-সম্প্রদায় তাঁহারই উপাসক।

ত্যাগ ও ভোগের সামরস্য।

নাথদর্শনে ত্যাগ ও ভোগের রহস্য অপূর্ব্ব। গোরক্ষসিদ্ধান্ত-সংগ্রহে (পৃ ১) নাথলক্ষণে আছে—

"একহস্তে ধৃতস্ত্যাগো ভোগাশ্চৈককরে স্বয়ম্।
অলিপ্তস্ত্যাগভোগাভ্যাম্ ···।" ইত্যাদি

যাঁহার একহস্তে ত্যাগ, অপর হস্তে ভোগ ধৃত, এবং ভোগ ও ত্যাগের দ্বারা যিনি অলিপ্ত তিনিই নাথ।

অতএব নাথমার্গে ত্যাগ ও ভোগের সামরস্য সাধনই যে আদর্শ তাহা উক্ত শ্লোক হইতে উপলব্ধি করা সম্ভব। মনুষ্যের সম্মুখে জল থাকিলে তাহার তৃষ্ণাও থাকে, জোর করিয়া জলপান হইতে বিরত থাকিলে তৃষ্ণা মিটিবে না। সেইরূপ বাসনা না মিটিলে ভোগতৃষ্ণা থাকিয়া যাইবে, সুতরাং ভোগের দুঃখাবহতার চিন্তা দ্বারা তৃষ্ণা দূর কর্ত্তব্য। কারণ "ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি"। ইহাও সত্য যে ভোগের দ্বারা তৃষ্ণা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়, ভোগে তাহার নিবৃত্তি নাই। তাই তন্ত্র উপদেশ দিয়াছেন, "ভোগের মধ্যে ত্যাগের উদ্দেশ

১। গোরক্ষনাথ, ডাঃ সিং—'নাদানুসন্ধান'
২। গোরক্ষনাথ, ডাঃ সিং—পরিশিষ্টের নোট

কর্ত্তব্য” অর্থাৎ মুক্তি ভোগেও নাই, ত্যাগেও নাই, তৃষ্ণা থাকিলে মুক্তি হইবে না, আবার জন্মগ্রহণ ও তৎফলে পুনরায় ভোগ অনিবার্য্য। আবার ভোগের মধ্যে মগ্ন থাকিলেও মুক্তি নাই. ভোগতৃষ্ণা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেই থাকিবে, অতএব ভোগ করিয়া ত্যাগ করিতে শিখিবে।

শ্রীমীননাথের উক্তি—হরকোপানলে স্মর ভস্মীভূত হন। যিনি অর্দ্ধগৌরীশ্বর তাঁহাকে নমস্কার। মহাসিদ্ধরা বিষয়াদি ত্যাগ করেন। ব্রহ্মেও প্রকৃতি আছে, শিবশক্তি অভিন্ন। তাই “শিবস্যাভ্যন্তরে শক্তিঃ শক্তেরভ্যন্তরে শিবঃ, অন্তরং নৈব জানীয়াচ্চন্দ্রচন্দ্রিকয়োরিব। প্রসরং ভাসয়েৎ শক্তিঃ সঙ্কোচং ভাসয়েচ্ছিবঃ। তয়োর্যোগস্য কর্ত্তা যঃ স ভবেৎ সিদ্ধযোগিরাট্। এবং ত ঐক্যং জ্ঞাত্বা কামমপি ভজন্ত্যেব। অতএবোক্তং ক্বচিদ্ ভোগী ক্বচিদ্ ত্যাগী” ইত্যাদি।[১] “পরমহংসাস্তু কামং নিষেধয়ন্তি স নিষেধো ন ভবত্যেবম্।”[২] ত্যাগীদের পক্ষে ত্যাগ এইরূপ—কর্ম্মরাহিত্যের পর আর ত্যাগ নাই, তাহারা প্রারব্ধ অবধি ত্যাগ করে, অর্থাৎ তাহার ফলভোগ ত্যাগীদের করিতে হয় না। তাহারা যদি ভোগ করে তাহাও সংসারীদের যেরূপ ভোগ হয়, সেরূপ হয় না। ইহাদের প্রকৃতিসহ পূর্ণত্বলাভে রীতিবৈলক্ষণ্য আছে। ভোগীদের পক্ষে ত্যাগ সম্ভবে না, যাহারা ত্যাগী তাহারা প্রথমাবধি ত্যাগশীল। আবার যাহারা ত্যাগী তাহারা পুনঃ ভোগ কিরূপে করিবে? ভোগ করিলে তাহাদের সর্ব্বস্ব নষ্ট হইবে। অতএব ত্যাগ ও ভোগের রহস্য একমাত্র অবধূতই জানেন। অবধূত ত্যাগীরা “স্বেচ্ছয়া ভোগমপি কদাচিৎ কুর্বন্তি তথাপি তেষাং ভোগো বাধকো ন ভবেৎ।”[৩] ভোগীরা মাত্র ভোগ করেন, ত্যাগীরা মাত্র ত্যাগ করেন, একমাত্র অবধূতই তাহাদের সামরস্য সাধনে সমর্থ, “ত্যাগভোগয়োর্দ্ধয়োরপি পদার্থয়োঃ সামর্থ্যম্”। ত্যাগীদের পক্ষেও আহারাদি ত্যাগ সম্ভবে না, কারণ তাঁহারা দেহদ্বারা বিজিত ও দেহাধীন।

গৃহস্থের ভোগ ও মোক্ষ

গৃহস্থ স্ত্রী গ্রহণ করে, তৎফলে ইহলোক পরলোক উভয় লোকই তাহার নষ্ট হয়। তাহার ভোগও নাই, মুক্তিও নাই, চঞ্চল মনের দ্বারা সে বশীভূত। কারণ গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করিতে করিতে সে শ্রান্ত

১। গো. সি. স. পৃ ৬৬, ৬৭ ২। গো. সি. স. পৃ ৬৬ ৩। গো. সি. স. পৃ ৬৭

হইয়া অন্য আশ্রম গ্রহণ করে, কিন্তু তাহার প্রারব্ধের ফল ফলিতে থাকে। কর্ম্ম অঙ্কুরস্বরূপ থাকিয়া যায় বলিয়া তাহার মুক্তি হয় না, এবং সে বন্যজন্তুর ন্যায় বারম্বার জন্মগ্রহণ করে। চঞ্চলমনা হস্তী সুখলাভার্থে গ্রাম হইতে বনে গমন করে, এবং বনের শৃগাল ভোগার্থে গ্রামে আগমন করে। রাজা বহুস্ত্রী-পরিবৃত হইয়া মাত্র দুঃখের ভাগী হন, তাঁহার নরকভোগই হয়।[১]

প্রারব্ধ কর্ম্মফল হইতে ত্যাগী নিজেকে রক্ষা করিতে পারেন কি না বিবেচ্য। প্রারব্ধ কর্ম্ম বিনাযত্নেই সাধিত হয় এবং তাহার ভোগ হয়, ইহা বিদ্বানেরা স্বীকার করেন। কিন্তু যোগশক্তি দ্বারা যেরূপ নানারূপ সিদ্ধি প্রসিদ্ধি আছে, সেইরূপ প্রারব্ধ কর্ম্মফলকেও যোগশক্তি দ্বারা বিজিত করা যায়। (সম্)ন্যাসীদের মতে শৃঙ্গার বর্জ্জনীয়, ইহা সত্য বটে, কিন্তু তাহা হইলে অন্যের শরীরের জন্ম কিরূপে সম্ভব? অতএব যোগিগণের সিদ্ধান্তই ধ্রুব।[২] অর্থাৎ ত্যাগের মধ্যেও ভোগ সাধন কর্ত্তব্য কারণ অবধূত বন্ধ ও মোক্ষাতীত।

ভারতীয় মতানুযায়ী ভোগ বন্ধনের কারণ, সংসার-ত্যাগেই মুক্তি। পাশ্চাত্যে ভোগী সহ ত্যাগীর দল আছে, ক্যাথলিক সম্প্রদায় মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য, দারিদ্র্যবরণ ও সেবাব্রত আছে, তথাপি ত্যাগতত্ত্ব তাহাদের প্রধান লক্ষ্য নহে, ত্যাগ ও ভোগের সামরস্যই আদর্শ। ভারতীয় উপনিষদে ত্যাগ ও ভোগের সমন্বয় সাধন তৈত্তীরিয় উপনিষদে (১।১১।১) আছে। সত্য বলিবে, ধর্ম্মাচরণ করিবে, অধ্যয়নে প্রমাদ করিবে না, আচার্য্যের জন্য অভীষ্ট ধন আহরণ করিবে কিন্তু বংশবিস্তার-ক্রমকে ভঙ্গ করিবে না—"প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসী"। অতএব ইহা ত্যাগ ও ভোগের সামরস্যের আদর্শ।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতাতে (১১।৩৩, ৭।১১) আছে যে ভোগাসক্ত না হইলে ভোগ অত্যাজ্য নহে, সর্ব্বথা অহন্তার পরিত্যাগ হইলে ভোগও অমঙ্গলপ্রদ নহে। কর্ম্মযোগী বা জ্ঞানযোগী কাহারও পক্ষে ভোগ বন্ধনের কারণ নহে। জ্ঞানযোগীর পক্ষে ভোগে অহন্তা নাই, ফলাকাঙ্ক্ষাও নাই, আসক্তিও নাই। এরূপ যোগী ভগবানের সহিত সাধর্ম্ম্যপ্রাপ্ত হন, সত্যজ্ঞান দ্বারা তাঁহার কর্ম্ম বিনষ্ট হয়। মহাপুরুষ বা

১। গো. সি. স. পৃ ৬৬, ৬৭, ৬৮, ২। গো. সি., স. পৃ ৬২

যোগীর পক্ষে ভোগ বন্ধনস্বরূপ নহে (৫।৮,৯ গীতা)। কর্ম্মযোগীর ভোগ কামরাগবিবর্জ্জিত, অতএব বন্ধনকারণহীন। অনাসক্ত হইয়া যে জিতেন্দ্রিয় পুরুষ বিষয়ভোগ করে সে ভগবানের প্রকৃত ভক্ত (২।৬৪ গীতা)। কারণ সংসার হইতে ভোগ বিসর্জ্জিত হইলে বিশ্বসৃষ্টির অন্ত হইয়া যাইবে, তাই ভারতের আদর্শ ত্যাগ ও ভোগের সমন্বয়।

বৌদ্ধধর্ম্মে তৃষ্ণা দূর করিবার জন্য অষ্টাঙ্গমার্গ ও দশশীল দ্বারা ত্যাগ সাধন আছে। জৈনদের সম্যগ্‌দর্শন, সম্যগ্‌জ্ঞান ও সম্যক্ চরিত্রও ত্যাগের মার্গ, এই তিনের সমন্বয়ে 'মোক্ষ'লাভ সম্ভব হয়।[১] শঙ্করের 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা'ও ত্যাগের তত্ত্ব। কিন্তু অদ্বৈতজ্ঞানে আরূঢ় হইলে ত্যাজ্যও থাকে না, গ্রাহ্যও থাকে না। কাশ্মীর শৈবাদ্বৈত-বাদে এই ত্যাগ ও ভোগের সামরস্য আছে। ভোক্তা যখন ভোগ্যের সহিত একীভূত হন, তখন সেই একীভাবকে 'ভোগ' বলে, 'মোক্ষ'ও বলে। প্রবোধপঞ্চদশিকাতে আছে, "তস্যা ভোক্তা স্বতন্ত্রায়া ভোগ্যৈক্যীকার এষ যঃ। স এব ভোগঃ সা মুক্তিঃ স এব পরমং পদম্।" বস্তুতঃ ভোগ ও মোক্ষের অনুভূতির সামরস্যই জীবমুক্তি। মহেশ্বরানন্দের মতে (মহার্থমঞ্জরী, পৃ ১৩) ইহাই ত্রিক্‌দর্শনের বৈশিষ্ট্য। শ্রীরত্নদেবে আছে, "ভুক্তির্ব্বাপ্যথ মুক্তিশ্চ নান্যত্রৈকা পদার্থতঃ। ভক্তিমুক্তী উভে দেবি বিশেষে পরিকীর্ত্তিতে॥" এই অবস্থায় "সর্ব্বো মমায়ং বিভবঃ" অনুভূতি হয়, এই বিশ্বাত্মকতা আত্মার স্বভাব, আগন্তুক ধর্ম্ম নহে। বৌদ্ধ সহজিয়া মতেও 'মহাসুখ' প্রকাশমান হইলে, জিনরত্ন বা বরগগন নামক অধ উর্দ্ধ পদ্মকে অবধূতী স্পর্শ করে, তৎফলে ভব ও নির্ব্বাণ উভয়ই একসঙ্গে সিদ্ধ হয়। ভবভোগ অর্থে পঞ্চপ্রকার কামগুণ, নির্ব্বাণ অর্থে মহামুদ্রা সাক্ষাৎকার।[২] বাসনা না থাকিলে বিষয়ের আকর্ষণ থাকে না, সুতরাং বিষয়-সংস্পর্শে ক্ষোভ থাকে না, বন্ধনও হয় না—ইহাই নাথযোগী-দের আদর্শ ও সাধনের লক্ষ্য। ইহাই ত্যাগ ও ভোগের সামরস্য সাধন।

পরমহংস ও অবধূত

নাথগণের আদর্শ অবধূতত্ব। সন্ন্যাস ষট্‌প্রকারের, যথা—কুটীচক, বহূদক, হংস, পরমহংস, তুরীয়াতীত ও অবধূত। নারদপরিব্রাজক

১। Outlines of Jainism—J. Jaini (1916) p. 53.

২। গুরুতত্ত্ব ও সদ্‌গুরু রহস্য, ম.ম. গোপীনাথ কবিরাজ, উত্তরা, বৈশাখ ১৩৫০, পৃ ৩০৭ ফুটনোট।

উপনিষদে[১] ইহাদের প্রত্যেকের বাহ্য লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। পরমহংস শিখাযজ্ঞোপবীতরহিত, পঞ্চগৃহে একরাত্র অন্নগ্রহণকারী, করই তাঁহার পাত্র, তিনি কৌপীন ও দণ্ডধারী, ভস্মলেপনপর ও সর্ব্বত্যাগী। অবধূত সকল নিয়মের অতীত, অনিয়ম ও অজগরবৃত্তিই তাঁহার ধর্ম্ম অর্থাৎ তিনি বায়ুমাত্র আহার করিয়া থাকেন, পরমহংসের ন্যায় অন্নগ্রহণও করেন না বা তুরীয়াতীতের ন্যায় ফলগ্রহণ করিয়াও জীবিত থাকেন না। অবধূত স্বরূপ অনুসন্ধানেই রত থাকেন। বিভিন্ন সন্ন্যাসদ্বারা বিভিন্ন লোক প্রাপ্তি হয়। তুরীয়াতীত সত্যলোকে গমন করেন, হংস ও পরমহংস যথাক্রমে স্বর্গলোক ও তপঃলোকে গমন করেন, কিন্তু অবধূতের সাত্মস্বরূপ কৈবল্য লাভ হয়। শ্রুতিতেও আছে, 'যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্। তং তমেবৈতি সমাপ্নোতি নান্যথা"।[২]

ইহাও বাহ্য লক্ষণ মাত্র। গোরক্ষসিদ্ধান্ত-সংগ্রহে অবধূত ও পরমহংসের ভেদ বিচারের রূপ অন্য প্রকার। এই গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, পরমহংসেরা বলেন যে দ্বৈতবাদীদের কৈলাস বৈকুণ্ঠাদি স্থান, অদ্বৈতবাদীদের মায়ারহিত ব্রহ্মস্থল, বন্ধ ও মননের পরে যে মুক্তি হয়, তাহা যোগীদের নির্গুণ স্থান এবং বন্ধমুক্তিরহিত পরমসিদ্ধান্তবাদী যোগী (যাঁহার শরীর অবধূতের ন্যায় অর্থাৎ যিনি অবধূত) তাঁহার স্থান নির্গুণ সগুণের অতীত অদ্বৈত পরবর্ত্তী, যে স্থান "সর্ব্বপরিবর্ত্যেব" বা যেখানে সব আছে সেই স্থান তাঁহাদের।[৩] ইহা দ্বারা অবধূত স্থানের বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থে তৎপরে উক্ত হইয়াছে যে নির্গুণ ব্রহ্ম স্থান কথামাত্র, নিজ মাহাত্ম্য বর্দ্ধনের জন্য ইহা বলা হয়, কিন্তু আচরণের দ্বারা তাহা দেখা যায় না, কারণ নির্গুণ ব্রহ্মে বা অমায়িব্রহ্মে মায়ারূপ গুণ আরোপ করিয়া সৃষ্টিপ্রক্রিয়াদি ক্রিয়া তাঁহাতে আরোপ করা হয় এবং তাঁহার নানারূপ স্তবস্তুতি করা হয়। নির্গুণ ব্রহ্মে মায়ার আরোপ কিরূপে সম্ভব? তথাপি যদি নির্গুণ ব্রহ্মই ইষ্ট বলা হয়, তাহা দ্বারাও পূর্ণতা হয় না, যোগীদের যাহা ইষ্ট তাহাই যথার্থ। কারণ ব্রহ্ম ব্যাপক, নির্গুণ ব্রহ্ম ব্যাপক হইতে পারেন না। চৈতন্যস্বরূপ জীবকে যদি ব্যাপক বলা যায় তবে পঞ্চভূতের মধ্যে ব্যাপকত্ব আবদ্ধ হইয়া ব্যাপকত্বহানি হয় কারণ

১। না প.·উপ, ৫ম উপদেশ, পৃ ২৭২, নির্ণয়সাগর প্রেস (১৯৩২)।
২। গীতা ৮।৬ তুলনীয়
৩। গো. সি. স., পৃ ৭১

তাঁহার আত্মরূপই ব্যাপক। নির্গুণ শক্তিরহিত, তাঁহাতে ব্যাপকত্বধর্ম্ম কিরূপে সম্ভব? এইরূপে নির্গুণ বা সগুণ ব্রহ্ম এই উভয় ব্রহ্মই পরাৎপর ব্রহ্ম নহেন। কারণ পরাৎপরই পূর্ণনাথ লক্ষণযুক্ত, অর্থাৎ দ্বৈত বা অদ্বৈত উপরবর্ত্তী সাকার ও নিরাকারাতীত নাথস্বরূপ।[১]

সিদ্ধমতে বলা হয় পরমহংস কেবল ত্যাগী, "পরমহংসাস্তু কামং নিষেধয়ন্তি স নিষেধো ন ভবত্যেবম্"। তাহা কিরূপে সাধিত হয় তাহা 'ত্যাগ ও ভোগের' অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে। সিদ্ধমতে অবধূতের একহস্তে ত্যাগ ও একহস্তে ভোগ ধৃত থাকায় অর্থাৎ সর্ব্বদ্বন্দ্বাতীত হওয়ায় অবধূত মার্গই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। কিন্তু বেদান্তী তাহা মানিবেন না, পরমহংসের মার্গকেই শ্রেষ্ঠ বলিবেন, কারণ পরমহংস সর্ব্বত্যাগী। অতএব বিভিন্ন মার্গের বিভিন্ন লক্ষ্য, এইমাত্র বলা চলে।

বন্ধন ও মোক্ষ

নাথগণ বলেন ব্রহ্ম পক্ষপাতবিনির্মুক্ত, 'পক্ষপাত' অর্থে দেহাভিমান অর্থাৎ আমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয়, আমি শূদ্র ইত্যাদি জ্ঞান। তাঁহাকে জানিতে হইলে সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হইবে, অর্থাৎ আমি গৃহস্থ, আমি ব্রহ্মচারী, আমি সন্ন্যাসী, আমি উত্তম, আমি মধ্যম বা অধম, এই সকল জ্ঞান (সঙ্কল্প) ত্যাগ করিয়া ব্যাপক পরমনাথকে স্বরূপতঃ দর্শন করিলে মুক্তি হয়।[২]

বর্ণাশ্রম ত্যাগে মুক্তি হয়, "গুণানতীতৈব মুক্তোভবেন্নতু গুণাভি-মানীতি সমতঃ সিদ্ধান্তো ভবত্যেব"।[৩] চাতুর্ব্বর্ণ্য ব্যবহারে গুণত্যাগ অসম্ভব, কারণ বর্ণাশ্রমীর পক্ষে গুণবৃত্তি সাধারণ, অতএব উহা মুক্তিহীন। পঞ্চমাশ্রমী বা অত্যাশ্রমীর পক্ষেই মুক্তিলাভ সম্ভব, কারণ "নাস্তি গুণবৃত্তীনাং মুক্তিসাধকত্বম্," এবং অত্যাশ্রমীই মুক্তিপ্রদ গুরু।[৪]

পরমপুরুষার্থই মুক্তি, তাহাই নাথস্বরূপে অবস্থান। অবধূতের যোগসাধনফলে ইহা লাভ হয়। গোরক্ষ উপনিষদে অদ্বৈতোপরি সদানন্দ দেবাত্মরূপে নাথস্বরূপ বর্ণন করা হইয়াছে। তিনি সকল ভেদাতীত, পরম্ একম্। সর্ব্বোপনিষৎসারে আছে—"কথং বন্ধঃ কথং মোক্ষঃ" ইত্যাদি প্রশ্নে "অনাত্মনো দেহাদীনাত্মত্বেনাভিমন্যতে সোঽভিমান আত্মনো বন্ধস্তন্নিবৃত্তির্মোক্ষ ইত্যনেন স্বরূপেণাবস্থানমিতি সিদ্ধম্।"

১। গো. সি. স., পৃ ১১, ১২ ২। গো. সি. স. পৃ ২, ৩।
৩। গো. সি. স. পৃ ৩। ৪। গো. সি. স. পৃ ৪।

অতএব অনাত্মের আত্মত্বে অভিমানই 'বন্ধ' এবং "স্বয়ংজ্যোতি সত্যমেকং জগতি তব পদং সচ্চিদানন্দমূর্ত্তে", তৎপদে অবস্থানই মুক্তি।

"সবিষয়ং মনো বন্ধায় নির্ব্বিষয়ং মুক্তয়ে ভবতি।"[১] এইরূপে সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প চিত্তের ভেদ ও অমনস্কতা সাধন আছে। সবিষয় মন বন্ধনের ও নির্ব্বিষয় মন মোক্ষের কারণ। যোগচূড়ামণি উপনিষদে আছে—

ইন্দ্রিয়ৈর্বধ্যতে জীব আত্মা চৈব ন বধ্যতে।
মমত্বেন ভবেজ্জীবো নির্মমত্বেন কেবলঃ ॥[২]

নাথমার্গের 'যোগবীজ' গ্রন্থেও আছে, অহঙ্কারই জীবত্ব, তাহাতে দোষ বর্ত্তায়, অহঙ্কাররূপ দোষ হইতে মুক্তি হইলে মোক্ষলাভ হয়। যোগশিখোপনিষদও বলেন—"বারিবৎ স্ফুরিতং স্বস্মিংস্তত্রাহঙ্কৃতিরুত্থিতা। পঞ্চাত্মকম্ ভূপিণ্ডম্ ধাতুবদ্ধম্ গুণাত্মকম্",[৩] পরমাত্মাতে বারিবৎ স্পন্দন হইলে তাঁহার অহঙ্কার উত্থিত হয় এবং তাহা পঞ্চাত্মক হয় ও গুণযুক্ত হয়, ইহাই জীবত্বপ্রাপ্তি এবং এইরূপে শিবরূপী জীব বদ্ধ হয়।

মৎস্যেন্দ্রনাথের সম্প্রদায়ের 'অকুলাগমতন্ত্রে'[৪] মুক্তির লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে, যথা, ধর্ম্মাধর্ম্ম মুক্ত নিরাশ্রয় চিত্ত নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভে সমর্থ, চিত্ত অর্থে 'জীবন' অচিত্ত অর্থে 'মরণ'—চিত্ত ও অচিত্তকে যে সমতাপন্ন করিয়াছে সেই মুক্ত।

ধর্ম্মাধর্ম্মবিনির্মুক্তং যদি চিত্তং নিরাশ্রয়ং।
তদা নির্বাণরূপায় মুক্তির্ভবতি যোগিনাম্ ॥
চিত্তং জীবিতমাখ্যাতমচিত্তং মরণং ধ্রুবং।
চিত্তাচিত্তসমো ভূত্বা জীবন্মুক্তিরিহোচ্যতে ॥
ভাবাভাববিনির্মুক্তঃ স্বভাবো ব্রহ্মসংজ্ঞকঃ।
ভাবঃ প্রাণসমাখ্যাতঃ অভাবোঽপানশব্দিতঃ ॥
প্রাণাপানসমাযোগে যান্তি ব্রহ্মপদং প্রিয়ে।
শূন্যং সর্ব্বনিরাভাসং স্বরূপং যত্র চিন্ত্যতে ॥[৫]

(দ্বিতীয় উপদেশ)।

মুক্তির দুই মার্গের কথা শ্রুতিতে উল্লিখিত হইয়াছে, "সদ্যোমুক্তিপ্রদশ্চৈকঃ ক্রমমুক্তিপ্রদঃ পরঃ।" শুকদেব-উপদিষ্ট মার্গ সদ্যমুক্তিপ্রদ,

---

১। মণ্ডল ব্রাহ্মণ্য উপনিষদ ৫।১ ২। যোগচূড়ামণি উপঃ ৮৪ শ্লোক ৩। যোগশিখোপঃ ১।৮
৪। অকুলাগমতন্ত্রের পুঁথি অপ্রাচীন নেওয়ারী লিপিতে লিখিত, ভণিতার কাল আনুমানিক ১৬৭১ খৃষ্টাব্দ, ইহা মৎস্যেন্দ্রনাথ সম্প্রদায়ের পুঁথি। ৫। কৌলজ্ঞাননির্ণয়—বাগচী পৃ ৩১

ইহার নামান্তর 'বিহঙ্গমমার্গ', ইহাতে সদ্যমুক্তি লাভ হয়। বামদেব-উপদিষ্ট মার্গের নামান্তর 'পিপীলিকামার্গ'—অর্থাৎ ইহা উত্থানপতনের মধ্য দিয়া ক্রমমুক্তির মার্গ। যোগবীজে "চিরাৎ সংপ্রাপ্যতে সিদ্ধির্মর্কটক্রম এব সঃ" এবং যোগসিদ্ধির পূর্ব্বে দেহপাত হইলে পুনরায় দেহ ধারণপূর্ব্বক পুণ্যবলে গুরুলাভ ও সাধন করিয়া সিদ্ধিলাভকে 'কাকমত' বলা হয়। অভ্যাসের ক্রমিক ফল বা 'পশ্চিমমার্গ'ই মোক্ষলাভের পথ। ইহাই কাকমত।[১] এই পশ্চিমমার্গই যোগমার্গ বা কুণ্ডলিনীর জাগরণের পথ।

গীতাতেও উক্ত হইয়াছে যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পুণ্যকারিগণের প্রাপ্য ব্রহ্মলোকাদি শুভলোক লাভ করিয়া তথায় বহুবৎসর বাস করেন, অনন্তর সদাচারসম্পন্ন ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন।[২]

দত্তাত্রেয়ের অবধূতগীতায় আছে "ত্রিতয়তুরীয়ং নহি নহি যত্র বিন্দতি কেবলমাত্মনি তত্র। ধর্ম্মাধর্ম্মৌ নহি নহি যত্র বদ্ধোমুক্তঃ কথমিহ তত্র।"[৩] অর্থাৎ যেখানে ত্রিতয়—জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি- ও তুরীয় অবস্থা নাই, সেখানে কেবল আত্মাকে জানিবে এবং যেখানে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম নাই সেখানে বন্ধ ও মোক্ষ কিরূপে সম্ভব? অতএব সিদ্ধযোগী বন্ধমোক্ষহীন।

সিদ্ধযোগী ভাবাভাববিনির্মুক্ত। ভাব অর্থে প্রাণ, অভাব অর্থে অপান। তিনি প্রাণাপানের যোগ জানেন, শূন্যময় নিরাভাসকে চিন্তার দ্বারা ব্রহ্মপদ লাভ করেন। কিন্তু এই পদলাভের উপায় কি? জ্ঞান বিনা যোগে সিদ্ধি নাই, যোগ বিনা জ্ঞানে মোক্ষ নাই। জ্ঞানী বহু জন্মান্তরের সাধনে 'যোগ' লাভ করেন, যোগী একজন্মেই 'জ্ঞান' লাভ করেন; সেই নিমিত্ত সত্যকার জ্ঞানসহ যে যোগ তাহাই মোক্ষপ্রদ মার্গ। দেবীর 'মুক্তিমার্গ' জিজ্ঞাসায় শঙ্করের উত্তর এইভাবে বিবৃত হইয়াছে—

> যোগেন রহিতং জ্ঞানং ন মোক্ষায় ভবেদ্বিধে ॥৫১
> জ্ঞানেনৈব বিনা যোগো ন সিদ্ধতি কদাচন।
> জন্মান্তরৈশ্চ বহুভির্যোগো জ্ঞানেন লভ্যতে ॥ ৫২

১। যোগবীজ ১৪৪—১৫০, ১৫৩ শ্লোক।

২। "শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে", ৬।৪১ গীতা।

৩। অবধূত গীতা ১।৩৪, দত্তাত্রেয়কৃত নকুলাবধূত প্রণীত।

জ্ঞানং তু জন্মনৈকেন যোগাদেব প্রজায়তে।
তস্মাৎ যোগাৎ পরতরো নাস্তি মার্গস্তু মোক্ষদঃ ॥ ৫৩[১]

কৌলজ্ঞাননির্ণয়ে মোক্ষবৃত্তান্ত বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কুল ঊর্দ্ধগামী হইলে মোক্ষলাভ হয়, 'কুল' অর্থে শক্তি। লিঙ্গের অর্থাৎ শিবের প্রতি ভক্তি রাখিলে ইহা সম্ভব হয়, এই শিব দেহমধ্যেই অবস্থিত (৩।২৭)। জগতের মূলে যে সর্ব্বব্যাপী 'হংস' বিরাজমান, তাহার যথার্থ জ্ঞানেই মুক্তি হয়, এই জ্ঞানলাভে পাপপুণ্যাতীত অবস্থা বা 'উন্মনী' অবস্থা লাভ হয়। এই চরম জ্ঞানের বিকাশমাত্রেই মোক্ষ হয়, কেবল স্বকীয় মোক্ষ নহে, যে তাহাকে স্পর্শ করিবে তাহারও মোক্ষ হইবে (১৭।৩৭)। হংস বা শিবই বন্ধ ও মোক্ষের কারণ, তিনি ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়ক (১৩।২) তাঁহার উপলব্ধিতে মোক্ষ। হংসের স্বভাব (১৬।১৮-৩৩) বর্ণিত হইয়াছে। তিনি হর্ত্তাকর্ত্তা, দেহমধ্যে অবাধবিচরণশীল, ভাবাভাববর্জ্জিত, জরানাশহীন, পৃথিবীতে আত্মারূপে ক্রীড়ারত (১৭।৩৮)। পরমাত্মার এই স্বভাব জানিয়া তাহাকে উপলব্ধি করিলে সদ্য মুক্তি হয়। সহস্রাধারে 'হংস'র নিবাস, শক্তি ঐ স্থানে পৌঁছিলে যথার্থ সমাধি হয়, (১৩।১-৫), ইহা ব্যতীত মোক্ষলাভ সম্ভব হয় না।[২]

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারিপ্রকার পুরুষার্থ মধ্যে মানব মোক্ষ বা ত্রিবিধ দুঃখ হইতে সদাকালের নিমিত্ত মুক্তি প্রার্থনা করে। অবিদ্যা সংসারে বন্ধনের কারণ, অবিদ্যাই রাগদ্বেষাদির জননী। অনিত্য অশুচি ইত্যাদিতে নিত্য, শুচি ইত্যাদি কল্পনাই অবিদ্যা (যোগসূত্র ২।৫), জ্ঞানই তাহা হইতে মুক্তির উপায়। হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মে তাই জ্ঞানের উপদেশ আছে। সদুপদেশ দ্বারা পারে লইয়া যাইতে যিনি সক্ষম তিনিই জৈনমতে 'তীর্থঙ্কর'। জৈনর 'সম্যক্ চারিত্র্যে'র জন্য যম, নিয়ম ও ধ্যান আছে, বৌদ্ধর সমাধি আদি ত্রিবিধ সাধন আছে, ন্যায়ের আত্মসাক্ষাৎকার আছে। সাংখ্য ও যোগে যম নিয়ম প্রত্যাহারাদি মোক্ষমার্গের সাধন আছে।

বেদান্ত বলেন, অধ্যাস বা একবস্তুতে অপর বস্তুর ধর্ম্ম আরোপে দুঃখময় বন্ধন হয়, অধ্যাস দূর হইলে মোক্ষ হইবে। মুক্ত পুরুষ দেহ, মন ও আত্মার প্রকৃত ধর্ম্ম জানেন বলিয়া রাগদ্বেষক্ষুধাতৃষ্ণাদি দ্বারা পীড়িত

১। যোগশিখোপঃ ১।৫১-৫৩, যোগবীজ ৬৪-৬৬ শ্লোক।
২। কৌলজ্ঞাননির্ণয় ১০, ১৩ পটল।

নহেন, তাই তিনি মুক্ত। সাংখ্য বলেন, দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিতে মোক্ষ হয়, বেদান্তমতে মোক্ষাবস্থা কেবল দুঃখাভাব নহে, উপরন্তু পরিপূর্ণ আনন্দঘন অবস্থা। জীবাত্মা দেহধর্ম্মে বদ্ধ হইলেও আত্মা নিত্যমুক্ত; জীব তাহা উপলব্ধি করিবামাত্র তাহার স্বস্বরূপে অবস্থান ও মুক্তি হয়। বেদান্তের মোক্ষে ও শক্তিতত্ত্বের মোক্ষে ভেদ আছে। বেদান্তের মোক্ষে মায়ার উচ্ছেদ কল্পিত হয়; শক্তিতত্ত্বের মোক্ষে মায়ার উচ্ছেদ হয় না, কোন না কোন রূপে তাহা থাকে, তবে তত্ত্বজ্ঞানের প্রভাবে সেই মায়ার পরিণাম হয় না। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা সঞ্চিত কর্ম্মের নাশই ইহার কারণ। সৃষ্টি কর্ম্মভোগের জন্য, কারণাভাবে বা কর্ম্মের নাশে সংসার উৎপন্ন হয় না। অতএব বদ্ধ অবস্থায় মায়া বহির্মুখী, মোক্ষাবস্থায় মায়া অন্তর্মুখী; ইহাই বন্ধন ও মোক্ষের বৈলক্ষণ্য।

প্রাচীন দার্শনিকগণ মোক্ষকে পরমপুরুষার্থ বলিয়াছেন, মোক্ষের আদর্শ সম্বন্ধে সম্প্রদায়গত ভেদ আছে তাহার উল্লেখ পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। নাথমার্গে ও আগমে মূলাধারে প্রসুপ্ত কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণে মুক্তিমার্গ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ প্রভৃতি নাথাচার্য্যগণের মতে যে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি কুণ্ডলিনীর জাগরণে সহায়তা করে তাহাই কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ। কুণ্ডলিনীর নিদ্রাভঙ্গ ব্যতীত আত্মা বা পরমাত্মায় স্থিতিলাভ সম্ভবপর নহে। এই সিদ্ধান্ত বৈদিক নহে, পাতঞ্জল যোগমার্গেও ইহার উল্লেখ নাই, ইহা তন্ত্রের নিজস্ব। তথাপি ইহা কোন নূতন তথ্য নহে, বা মোক্ষলাভের উপায়বিশেষ মাত্র নহে। কুণ্ডলিনী আধারশক্তি, অর্থাৎ এই শক্তি যাবতীয় পদার্থকে আশ্রয় করিয়া সকল পদার্থের মূলসত্তারূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। ইঁহার চৈতন্য সম্পাদনে ইনি নিরাধার হন, তৎফলে জাগতিক সকল বস্তু নিরাধার হয়। কুণ্ডলিনী যখন চৈতন্যময়ী হন, তখন বিশ্বজগৎও চৈতন্যময় হয়, তখন শ্রুতিনির্দ্দিষ্ট সর্ব্বত্র ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার হয়। এই জাগরণ ক্রমশঃ হয়, জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি প্রভৃতি ইহার অবস্থাভেদ মাত্র। পূর্ণ জাগরণে অদ্বৈতজ্ঞান হয়, তৎপূর্ব্বে দ্বৈতজ্ঞান অবশ্যম্ভাবী। পূর্ণ জাগরণকেই তন্ত্রশাস্ত্রে 'পূর্ণা হন্তা' বলা হইয়াছে।

তন্ত্রমতে কুণ্ডলিনীর উদ্বোধন ভিন্ন জীবের উর্দ্ধগতিলাভ সম্ভবপর নহে, বিশেষ সাধন দ্বারা ইঁহাকে জাগরিত করিতে হয়, কিন্তু অগ্নি প্রকটিত হইলে ইন্ধনকে যেমন দগ্ধ করে, তেমনি কুণ্ডলিনীর চৈতন্য হইলে

সাধনা বিলুপ্ত হয়। সাধনাই ইন্ধন। বাহ্য-সাধনমাত্রই বিচার, ভক্তি, মন্ত্র বা হঠ, পুরুষকার-সাপেক্ষ, এই পুরুষকার বা কর্তৃত্ববোধ কুণ্ডলিনীর জাগরণের সহিত লুপ্ত হইয়া আসে। বৌদ্ধরা ইহাকেই 'স্রোতাপন্ন' বলিয়াছেন, অর্থাৎ শক্তির সঞ্চার হইলে তাহার স্রোতে পতিত জীবের আর নিম্নে গতি হয় না, অবশ্য শক্তির তারতম্যে স্রোতাপন্নের অবস্থা বহু প্রকার হইতে পারে। এই স্রোতই সুষুম্নাবাহী কুণ্ডলিনীর ঊর্দ্ধস্রোত।

কুণ্ডলিনীর চৈতন্যের সহিত ইড়াপিঙ্গলামার্গে বাহিত স্রোত সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হইয়া সুষুম্না পথে প্রবেশ করে, এই পথে প্রবেশ করিয়াও ক্রমশ অধিকতর সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হইতে থাকে। এইরূপে জীবশক্তি বজ্রা ও চিত্রিণী নাড়ী ভেদ করিয়া ব্রহ্ম নাড়ী বা আনন্দময় কোষে গমন করে। ইহাতেও যখন লক্ষ্য থাকে না, তখন গুণাতীত সাম্যাবস্থা প্রাপ্তি ঘটে। আনন্দময় কোষে ঐশ্বর্য্য অবস্থা প্রাপ্তি হয় কিন্তু কুণ্ডলিনীর পূর্ণ চৈতন্যসম্পাদনে পারমৈশ্বর্য্যলাভ হয়, পূর্ব্বোক্ত তমঃ রজঃ ও সত্ত্ব মণ্ডল অতিক্রান্ত হইলে কুণ্ডলিনীর পূর্ণ চৈতন্য হইল বলা যায়।

ঊর্দ্ধস্থ সত্ত্ববিন্দু ও অধঃস্থ তমোবিন্দুর মধ্যবর্ত্তী রেখাকে 'মেরু' বলে, এই মেরুর ঊর্দ্ধবিন্দুর আকর্ষণই 'কৃপা' বা সংকর্ষণ ও অধোবিন্দুর আকর্ষণ মাধ্যাকর্ষণ, ইহা ভূমধ্য হইতে প্রসৃত। বিশুদ্ধজীব এই উভয় আকর্ষণের মধ্যস্থলে তটস্থভাবে বর্ত্তমান, আগম মতে ইঁহারাই বিজ্ঞানকল জীব, ইঁহারাই সাংখ্যজ্ঞানী, কৈবল্যপ্রাপ্ত পুরুষ কিন্তু ভগবৎকৃপাশক্তিতে বঞ্চিত। তটস্থভাব হইতে বিন্দু কোন অনির্ব্বচনীয় কারণে ঊর্দ্ধমুখী হইলে আপন রেখা অবলম্বন করিয়া সহস্রারের কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হয়। ইহা ভাবের সাধন, ইহা স্বভাবতঃই হইয়া থাকে। তমোবিন্দুর পঞ্চ বিভাগের ন্যায় সত্ত্ববিন্দুরও পঞ্চ বিভাগ আছে—তাহারা ভাবপ্রধান। শান্ত হইতে মাধুর্য্য পর্য্যন্ত এই পঞ্চ স্তর। সাম্যভাব পর্য্যন্ত ঐশ্বর্য্যাবস্থার অনুভব হয়, তৎপরে মাধুর্য্যের বিকাশ সখ্য, বাৎসল্য ও কান্তরূপে, তন্মধ্যে কান্তভাবই শ্রেষ্ঠ। এই ভাব ক্রমশঃ মহাভাবে পরিণত হয়, শৈবাচার্য্যদের শিবশক্তির সামরস্যও প্রকারান্তরে এই ভাব।

মোক্ষমার্গের পথিককে একে একে সকল তত্ত্ব অতিক্রম করিয়া তত্ত্বাতীত অবস্থায় উপনীত হইতে হইবে, কারণ তত্ত্বমাত্রই বৈষম্যের অন্তর্গত। সমাধির ক্রমবিকাশ বা কুণ্ডলিনীর ক্রমোন্নতি একই বস্তু। পাতঞ্জল যোগমতে চিত্ত একাগ্রভূমিতে অবস্থিত থাকিলে তাহার আলম্বন

থাকে, ইহাই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। ইহার পরবর্ত্তী অবস্থায় আলম্বন (অবলম্বন) বিলীন অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয় কিন্তু একাগ্রভূমি অবলম্বন না করিয়া এই নিরোধভূমিতে পদার্পণ করা যায় না। এই আলম্বন 'অস্মিতা'রূপ বিন্দু বা স্থূল হইতে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর ভাব। ইহারও ত্যাগ হইলে কর্ম্মাশয়, পূর্ব্বসংস্কার, অভিমানাদি কিছুই থাকে না। এই শুদ্ধাবস্থাই নির্ম্মাণচিত্ত বা নির্ম্মাণকায়াদি গ্রহণের অবস্থা বিশেষ। সাধক এই স্তরে কৈবল্যসিদ্ধি লাভ করেন অথবা জীবোদ্ধারে ব্রতী হইয়া নির্ম্মাণকায় গ্রহণ করেন।

যথার্থ সাম্যাবস্থালাভ করিতে হইলে প্রথমে দ্বৈত হইতে অদ্বৈতভাবে উপনীত হইতে হইবে, পরে স্বভাবের নিয়মে অদ্বৈতভূমিও অতিক্রান্ত হইলে দ্বৈতাদ্বৈত উপরিবর্ত্তী সাম্যাবস্থার উপলব্ধি হইবে ইহাই 'নাথাবস্থা'। দ্বৈতভাবকে অদ্বৈতে পরিণত না করিয়া নিবৃত্তি করিলে ব্যুত্থান অবশ্যম্ভাবী, প্রকৃতিলীনদের ও সাংখ্যের কেবলী পুরুষদের এই কারণেই মগ্নোত্থানবৎ পুনরুত্থান ঘটে।

অতএব সাংখ্যমতে যাহা মুক্তি তাহা প্রকৃত মুক্তি নহে। সাধনা দ্বারা অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্যের বিকাশ হইতেই সাংখ্যের দৃষ্টিতে ঈশ্বরত্বলাভ হইল বলা চলে, সাংখ্যের সম্মত ঈশ্বর হিরণ্যগর্ভাদি কার্য্যেশ্বর, তাঁহার ঐশ্বর্য্য অনিত্য কারণ দ্বৈতবোধ হইতে উৎপন্ন এবং কৈবল্যের পরিপন্থী। সাংখ্যনির্দ্দিষ্ট সাধনে জীব পূর্ব্বোক্ত 'তটস্থ' বা মধ্যবিন্দু হইতে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতে পারে না, তাই সহস্রারে প্রবেশ-পথ পায় না। শৈবাগম মতে ইহা 'বিজ্ঞানাকল' অবস্থা তাহাও পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বৈধী ভক্তি বা উপাসনার ফলে বিন্দুর রশ্মি মহাবিন্দুর একটি রশ্মিতে সংযোগ লাভ করিলে ক্রমশঃ তাহা অবলম্বন করিয়া কেন্দ্রাভিমুখী হয়, খণ্ড সত্ত্বে বা জীবদেহে ভাবের বিকাশ হইলেই সহস্রারের নিত্যবিভূতি অনুভূত হয়, ইহাই ক্রমশঃ মহাভাবে পরিণত হয়। কুণ্ডলিনীর ক্রমিক চৈতন্যেও জীব ঊর্দ্ধবিন্দু পর্য্যন্ত উত্থিত হয়, কেন্দ্রে প্রবিষ্ট হইলেই সাম্যভাবে অবস্থিতি হয়, ইহাই 'পূর্ণাহন্তা', শান্তাবস্থা, ব্রাহ্মীস্থিতি, শাশ্বতপদে অবস্থান বা 'নির্ব্বাণ'।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি, অপর ও পরা মুক্তি

জীবিতাবস্থায় দেহপাতের পূর্ব্বে যে মুক্তি হয় তাহা জীবন্মুক্তি, এবং পার্থিব স্থূল ও সূক্ষ্মদেহনাশের পর যে মুক্তি হয় তাহা বিদেহমুক্তি, সাধারণতঃ এই উভয় প্রকার মুক্তি বর্ণিত হয়। জীবন্মুক্তের মুক্তি হইলেও প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলস্বরূপ স্থূল দেহ থাকে। তথাপি জীবন্মুক্ত দেহ ও আত্মার ভিন্নত্ব ও জগতের মিথ্যাত্ব পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেন, অতএব জাগতিক সুখদুঃখ দ্বারা অবিচলিত থাকেন, এবং প্রারব্ধ ক্ষয়ে বিদেহ-মুক্তির প্রতীক্ষায় থাকেন। ইহা অদ্বৈতবাদী বেদান্তীর জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি। পদ্মপত্রে জলের ন্যায় বেদান্তী সংসারবিরক্ত, নিরাসক্ত, নির্ব্বিকার হইয়া নিজেকে বন্ধ হইতে মুক্ত মনে করিলে 'জীবন্মুক্ত'রূপে বিবেচিত হন। এই অবস্থাই তাহার স্বরূপোপলব্ধির অবস্থা। তৎপরে প্রারব্ধহীন হইলে 'বিদেহমুক্ত' অবস্থা হয়।

নাথদর্শনে জীবন্মুক্তির অবস্থাই আদর্শ, দেহপাতে যে মুক্তি হয় তাহাকে যথার্থ মুক্তি বলা চলে না, কারণ সে মুক্তি দেহপাতরূপ প্রতিবন্ধক দ্বারা বাধিত। নাথগণ বলেন, যে দেহে পরমপদপ্রাপ্তি হইয়াছে, সেই দেহকেই অজর অমর করিয়া রক্ষা করা ও যথেচ্ছ বিচরণাদি করা কর্ত্তব্য, বিদেহমুক্তিতে সেই দেহেরই ত্যাগ হয়। সন্তকবিরাও দেহ থাকিতে মুক্তিলাভ করিতে উপদেশ দেন, কারণ মৃত্যুর পর কি ঘটিবে বা না ঘটিবে তাহার নিশ্চয়তা কি? আবার বৈষ্ণব মধ্যে নিম্বার্ক সম্প্রদায় জীবন্মুক্তি স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে দেহ অবিদ্যাধীন, এবং দেহ থাকিলে অবিদ্যাও থাকিবে, অবিদ্যা থাকিলে মুক্তি কোথায়? এইরূপে জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তির সম্বন্ধে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মত। প্রথমতঃ নাথ মতের কথা বলিব।

যোগবীজে উক্ত হইয়াছে—"অজরামরপিণ্ডো যো জীবন্মুক্তঃ স এব হি" (১৭১ শ্লোক), যাহার পিণ্ড বা দেহ অজর ও অমর সেই জীবন্মুক্ত, যোগসিদ্ধির অলৌকিক গুণ ইহাতে কদাচিৎ লক্ষিত হয়। জীবন্মুক্ত যোগীর প্রাণ বহির্গত হয় না বলিয়া পিণ্ডপাত হয় না, "ন বহিপ্র্রাণ আয়াতি পিণ্ডস্য পতনং কুতঃ।" পিণ্ডপাতে যে মুক্তি তাহা প্রকৃত মুক্তি নহে,

কারণ অশ্বকুক্কুটাদি দেহধারণ করিয়া প্রাণত্যাগ করে, দেহত্যাগে কি তাহাদের মুক্তি হয়? (১৭২ শ্লোক)। জীবন্মুক্ত যোগীর দৈহিক পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। জলে সৈন্ধব যেমন মিলিয়া যায়, তেমনি মুক্ত পুরুষের দেহ ব্রহ্মত্বলাভ করে, এইরূপ যোগীই জীবন্মুক্ত। ব্রহ্ম হইতে অভিন্নত্ব প্রাপ্তি হইলে যোগীর দেহ চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়; ইন্দ্রিয়সকলও চিন্ময় হয়। ইহাই যোগীর 'সিদ্ধদেহ' বা যোগদেহ, ইহার বিবরণ নিবন্ধের কায়সিদ্ধি অধ্যায়ে সাধনা অংশে দ্রষ্টব্য।

যোগীর সিদ্ধ দেহলাভ হইলে ইচ্ছামৃত্যুবরণ তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয়। হঠযোগপ্রদীপিকাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, যতপ্রকার সমাধি আছে তন্মধ্যে মৃত্যুঘ্ন সমাধিক্রম অর্থাৎ ইচ্ছামৃত্যুরূপ সমাধি উত্তম এবং জীবন্মুক্তিস্বরূপ সুখের উপায়। "মৃত্যুঘ্নং চ সুখোপায়ং ব্রহ্মানন্দকরং পরম্"।[১] ইহার টীকায় আছে, যিনি এই ক্রম অনুসারে সমাধি আশ্রয় করিতে পারেন তাঁহার মৃত্যু হয় না, তিনি ইচ্ছা করিলে দেহত্যাগ করিতে পারেন। এই সমাধি আশ্রয় করিতে পারিলে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়, তাহা হইতেই মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় হইয়া জীবন্মুক্তিরূপ সুখলাভ হইয়া থাকে। আর এই সমাধিক্রম ব্রহ্মানন্দপ্রদ, অর্থাৎ এই সমাধিতে প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হয়, তাহা হইলেই জীব ও ব্রহ্মের অভেদ জ্ঞান হইয়া অত্যন্ত ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্তিরূপ 'বিদেহমুক্তি' লাভ হইয়া থাকে।

সিদ্ধগণ কায়সিদ্ধির যথার্থ মূল্য বুঝিতেন, কারণ এই দেহকেই তাঁহারা আত্মা স্বরূপ মনে করিতেন এবং সেই নিমিত্ত জীবিতকালেই মুক্তি চাহিতেন। সেই মুক্তির জন্য যে সাধনা আবশ্যক তাহা দীর্ঘদিনে সাধিত হয়, তাই তাঁহারা এই দেহের স্থৈর্য্য সম্পাদনে যত্ন করিতেন। জীব অজ্ঞান বা অবিদ্যা দ্বারা আচ্ছন্ন। এই অজ্ঞানের দুইটী রূপ আছে, এক 'আবরণ' দ্বিতীয় 'বিক্ষেপ'। আবরণ দূর হইলেই জ্ঞানপ্রাপ্তি হয় এবং জীবন্মুক্তি হয়। ইহার ফলে মনোনাশ, বাসনাক্ষয় ও তত্ত্বজ্ঞান হয়। কিন্তু বিক্ষেপ দূর না হওয়া পর্য্যন্ত দেহ থাকে, ভোগের দ্বারা প্রারব্ধ ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত দেহনাশ হয় না। জ্ঞানের দ্বারা প্রারব্ধ ক্ষয় হয় না, ভোগের দ্বারাই হয়, কিন্তু যোগের দ্বারা প্রারব্ধ ক্ষয়

১। হ যো প্র ৪।২ ও টীকা পৃ ১৭৫

করিবার ক্ষমতা যোগীর আছে। যোগীর যোগাগ্নি দ্বারা সংস্কৃত পক্ক দেহ প্রারব্ধের অধীন নহে। জীবন্মুক্ত যোগীও প্রারব্ধের অধীন, বেদান্ত ভোগের দ্বারা সেই প্রারব্ধ ক্ষয়ের কথা বলেন, বেদান্তীর জ্ঞানমার্গ, কিন্তু যোগমার্গে যোগ দ্বারাই দেহজয় ও প্রারব্ধের ক্ষয় হয়। যোগবীজ গ্রন্থে আছে "আমি মুক্ত" বিচার ও মনের দ্বারা এইরূপ চিন্তা বশে কেহ মুক্ত হয় না, ইহাতে যোগের অপেক্ষা আছে "পুমান্ জন্মান্তরশতৈ র্যোগাদেব বিমুচ্যতে" (শ্লোক ৬৯)। বেদান্তী জ্ঞানলাভেই জীবন্মুক্তি স্বীকার করেন, বিদেহমুক্তি সময়সাপেক্ষ মাত্র।

জীবন্মুক্ত জ্ঞানমার্গী বেদান্তী এই নিমিত্ত প্রারব্ধক্ষয়ে সচেষ্ট হন, কারণ তাঁহার প্রারব্ধ ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত দেহপাত হয় না। পঞ্চদশী নামক বেদান্ত গ্রন্থে স্বেচ্ছা-প্রারব্ধ, পরেচ্ছা-প্রারব্ধ ও অনিচ্ছা-প্রারব্ধ ভেদ বর্ণিত হইয়াছে। অনুভূতি প্রকাশে তীব্র, মধ্য, মন্দ ও সুপ্ত এই চারি-ভেদের স্বেচ্ছা, পরেচ্ছা ও অনিচ্ছা ভেদে দ্বাদশ ভেদ বর্ণিত হইয়াছে।[১]

সাংখ্য, গীতা প্রভৃতিতে জীবন্মুক্তিকে চরমপ্রাপ্তিরূপে স্বীকার করা হইয়াছে। ইহজন্মেই সাধন দ্বারা দুঃখ হইতে ত্রাণলাভ ও আত্মসাক্ষাৎকার সম্ভব,—তাহাই জীবন্মুক্তি। ত্রিবিধ দুঃখ হইতে নিবৃত্তিই সকলের কাম্য, ষড়্দর্শনে ইহাকেই জীবনের লক্ষ্য বলা হইয়াছে। প্রাচীনতম যোগদর্শন অনুসারে যে দেহে আত্মসাক্ষাৎকার হইয়াছে প্রারব্ধের ক্ষয় পর্য্যন্ত সেই দেহে বাস করাকে 'জীবন্মুক্তি' বলে, এই অবস্থাতে প্রারব্ধের সংস্কারে যথেচ্ছাচার হইতে পারে। যে দেহে আত্মসাক্ষাৎকার হইয়াছে তাহা নাশের পরবর্ত্তী অবস্থা 'বিদেহমুক্তি'।

বেদান্তের আত্মসাক্ষাৎকারই নাথমার্গের পরমপদপ্রাপ্তি, নাথেরা সেই দেহকেই স্থায়ী করিতে সচেষ্ট। উপনিষদের আদর্শানুযায়ী হৃদয়স্থ সমস্ত কামনা নাশের দ্বারা অমরত্বপ্রাপ্তির কথা আছে (কঠোপঃ ২।৩।১৪)। ইহাই ব্রহ্মপ্রাপ্তি বা ঔপনিষদিক জীবন্মুক্তির আদর্শ।

নারদপরিব্রাজক উপনিষদের পঞ্চম উপদেশে আছে, "জাগরিতে সুষুপ্তি অবস্থাপন্ন ইব যদি অশ্রুতং যদি অদৃষ্টং তৎ সর্বম্ অবিজ্ঞাতম্ ইব যো বসেৎ তস্য স্বপ্নাবস্থায়াম্ অপি তাদৃশী অবস্থা ভবতি। স জীবন্মুক্ত ইতি বদন্তি।" চিত্তবৃত্তির অবস্থান-ভেদে জাগ্রৎস্বপ্নাদি সংজ্ঞা করা হইয়াছে।

১। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম, ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ, উত্তরা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫, পৃঃ ৩৫১।

যোগতত্ত্ব উপনিষদে (শ্লোক ১৪২) 'বিদেহমুক্তি'র কথা আছে। আত্মামাত্রে অবশিষ্ট থাকাই বিদেহমুক্তি।

নিষিদ্ধৈর্নবভির্দ্বারৈ র্নির্জনে নিরুপদ্রবে।
নিশ্চিতং তু আত্মমাত্রেণ অবশিষ্টং যোগসেবয়া ॥ ১৪২

কূর্ম্মের ন্যায় সমস্ত দ্বার নিষ্ক্রিয় করিতে পারিলে বিদেহমুক্তি হয়। এই আদর্শ সাংখ্য, যোগাদির বিদেহমুক্তির আদর্শ হইতে ভিন্ন।

নাদবিন্দু উপনিষদে আছে (৫২—৫৬ শ্লোক)—
মৃতবৎ তিষ্ঠতে যোগী স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ

*   *   *   *

দৃষ্টিঃ স্থিরা যস্য বিনা সদৃশং বায়ুঃ স্থিরো যস্য বিনা প্রযত্নম্।
চিত্তং স্থিরং যস্য বিনাবলম্বং স ব্রহ্ম তারান্তব নাদরূপ ॥

গোরক্ষসিদ্ধান্ত-সংগ্রহে এই শ্লোকের উল্লেখ আছে (পৃ ৪০)। তাহার শেষে "স এব যোগী স গুরুঃ স সেব্যঃ" এই পাঠান্তর দৃষ্ট হয়, ইহা হঠপ্রদীপিকার দশম উপদেশ মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে (গো. সি. স., পৃ. ৩৮), উপনিষদের ব্রহ্মতারান্তরই 'তূর্য্য-তূর্য্য' অবস্থা বা বিদেহমুক্তির অবস্থা।

মণ্ডলব্রাহ্মণ্য উপনিষদে (৪।৩, ৪) জীব চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ত্যাগ করিয়া পঞ্চবিংশতি তত্ত্বস্বরূপ; এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বকে ত্যাগ করিয়া জীব নিজেকে ষড়্বিংশতি বা 'অহম্ পরমাত্মা'রূপে জানিলে জীবন্মুক্ত হয়। যোগকুণ্ডল্য উপনিষদে আছে, জীবন্মুক্ত যোগীর কাল অতীত হইলে দেহনাশের সময়ে বিদেহমুক্তি অর্থাৎ অদেশমুক্তি হয়। ইহা পবনের নিস্পন্দতালাভের ন্যায় অবস্থা (৩।৩৩, ৩৪)।

তেজবিন্দু উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ে (১-৩২ শ্লোক পর্য্যন্ত) জীবন্মুক্তির লক্ষণ ও (৩৩-৮১ শ্লোক পর্য্যন্ত) বিদেহমুক্তির লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। যে নিজেকে শুদ্ধচৈতন্যরূপে জানে সেই জীবন্মুক্ত এবং যে সেই শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেই বিদেহমুক্ত। সেই পরমসত্তার তুলনা নাই।

বরাহ উপনিষদে (৪।১) মহামুনি ঋতুর দ্বাদশ বৎসরান্তে তপস্যার ফলে জীবন্মুক্তির যে জ্ঞান হয় তাহার বর্ণনা আছে : "সপ্তভূমিষু জীবন্মুক্তা-শ্চত্বারঃ" অর্থাৎ সপ্তভূমির প্রথম চারিটী—শুভেচ্ছা, বিচার, মনের সূক্ষ্মতা, সত্ত্বাপত্তি জীবন্মুক্তির, তৎপরের দুইটী ভূমিতে ব্রহ্মকে উত্তরোত্তর জানিয়া

সপ্তম ভূমিতে ব্রহ্মবিদ্‌ হওয়া যায়। এইরূপে জীবন্মুক্তেরও চারি প্রকার ভেদ বর্ণিত হইয়াছে।

বাহ্যজগতে লিপ্ত থাকিয়াও যিনি ব্যোমের ন্যায় নির্লিপ্ত, যাঁহার চিত্তে সংকল্প বা বিকল্প নাই, সুখদুঃখ নাই, যিনি নির্ব্বিকার, তিনিই জীবন্মুক্ত। যিনি রাগদ্বেষহীন, হর্ষশোকাতীত, অহঙ্কারবর্জ্জিত, যাঁহার চিত্ত অক্ষুব্ধ ও নির্ম্মল তিনিই জীবন্মুক্ত। যিনি বাহ্যবিষয়ের দ্বারা আকৃষ্ট নহেন তিনিই জীবন্মুক্ত।[১]

উপনিষদের ন্যায় হঠযোগপ্রদীপিকাতেও (৪।১১) উক্ত হইয়াছে—

উৎপন্নশক্তিবোধস্য ত্যক্তনিঃশেষকর্ম্মণঃ।
যোগিনঃ সহজাবস্থা স্বয়মেব প্রজায়তে॥

অর্থাৎ যে যোগী কুণ্ডলিনীকে প্রবোধিত করিয়া নিঃশেষরূপে কায়িক ও মানসিক কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অবস্থিত, তিনিই সহজাবস্থা লাভ করিয়াছেন। পরমবৈরাগ্য বা দীর্ঘকাল সম্প্রজ্ঞাত সমাধির দ্বারা বুদ্ধিব্যাপার নিবৃত্ত হইলে যে নির্ব্বিকার স্বরূপে অবস্থান হয়, তাহাই সহজাবস্থা বা জীবন্মুক্তি। শক্তিবোধ ও সর্ব্বকর্ম্মপরিত্যাগ হইলে কোনরূপ যত্ন না করিলেও এই অবস্থা লাভ হয়।

সিদ্ধমতে বিদেহমুক্তি নাই, যোগের দ্বারা সিদ্ধযোগী প্রারব্ধ ক্ষয় করেন, কায়ব্যূহ রচনা করিয়াও প্রারব্ধক্ষয়ের ক্ষমতা তাঁহার আছে (কায়সিদ্ধি অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। তৎপরে দেহ রাখা বা না রাখা তাঁহার ইচ্ছাধীন। এইরূপ জীবন্মুক্ত যোগীর পক্ষে বিদেহকৈবল্য অথবা সিদ্ধদেহ আশ্রয় করিয়া জগৎকল্যাণ সাধন এই দুইটী পথ খুলিয়া যায়, রুচি অনুসারে পথগ্রহণ নিষ্পন্ন হয়।[২]

জীবিতকালেই সদ্যোমুক্তির অবস্থাকে সাধারণতঃ জীবন্মুক্তি বলে, প্রারব্ধকর্ম্মবশে যে দেহ থাকে তাহার লয়প্রাপ্তি হইলে অন্তঃকরণ, ইন্দ্রিয়, প্রাণাদি অব্যক্তে লীন হইয়া যায় এবং দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই বিদেহকৈবল্য হয়। জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তির ভেদ উপাধিগত, বাস্তবিক নহে। যোগীর সিদ্ধদেহের তেজ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া

১। বরাহ উপনিষদ, চতুর্থ অধ্যায়, দ্বিতীয় মন্ত্রের ২১-৩০ শ্লোক।

বরাহ উপনিষদ এবং উপরোক্ত অন্যান্য উপনিষদের শ্লোকাদি ১০৮ উপনিষদ, নির্ণয়সাগর প্রেস ১৯৩২ হইতে গৃহীত।

২। দেবীসূক্তে টিপ্পনীর দুর্গাচৈতন্য ভারতী, ভূমিকা পৃ ।৶০, ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ লিখিত।

অবস্থান্তর প্রাপ্তি সম্ভব, ডাঃ রমন শাস্ত্রী তাঁহার প্রবন্ধে তাহাকেই শুদ্ধমার্গের দিব্যদেহ বলিয়াছেন—C. H. I. Vol. II দ্রষ্টব্য। সিদ্ধমতে দেহই আত্মা, বিক্ষেপ দূর না হইলে শুদ্ধদেহলাভ হয় না, শক্তিযুক্ত চৈতন্যকে সিদ্ধেরা স্বীকার করেন, তাহাকে জয় করিলে বিক্ষেপরূপ অজ্ঞান দূর হইয়া মুক্তিলাভ হয়। যোগী চৈতন্যশক্তিকে জয় করিয়া 'কালজয়ী' হন। যোগীর এই দেহই 'যোগদেহ'। বৈষ্ণবের 'ভাবদেহ'ও এইরূপ যোগদেহ, ইহা অপ্রাকৃত শুদ্ধদেহ। বৈষ্ণব 'ভক্তি' দ্বারা দেহ-শুদ্ধি সম্পন্ন করিয়া ভাবদেহ অর্জ্জন করেন। এই ভক্তি কি? ইহা গুরুকৃপায় জীবদেহে সঞ্চারিত চৈতন্যশক্তিবিশেষ। ইহা দ্বারা অপ্রাকৃত শুদ্ধদেহলাভ সম্ভব হয়, জ্ঞানীর পক্ষে এ দেহলাভ সম্ভব নহে। সিদ্ধমার্গে দেহ ভিন্ন আত্মার অবস্থান সম্ভব নহে মনে করিয়া দেহশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা বা পক্বদেহের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

রামানুজ আদি বৈষ্ণবেরা বলেন, সকল বন্ধন নিবৃত্তিরূপা মুক্তি জীবদ্দশায় প্রাপ্তি সম্ভব নহে, কেবল বিদেহ অবস্থাতে তাহা সম্ভব, মুক্তজীব বৈকুণ্ঠে ভগবানের কিঙ্কর, তাহাই পরমমুক্তি। এইরূপ মুক্তজীবে সর্ব্বজ্ঞতা আদি সিদ্ধ হইলেও সে সৃষ্টিস্থিতিসংহার করিতে সক্ষম হয় না, অতএব অদ্বৈত মতানুযায়ী সে ভগবানের সহিত এক হইতে পারে না। তত্ত্বজ্ঞানের সাধনে যে উন্নততম অবস্থা হয় তাহাই কাম্য। রামানুজ-মতে মুক্তাবস্থাতেও আত্মার শরীরে অবস্থান অনিবার্য্য, কিন্তু সেই শরীর শুদ্ধ ও অপ্রাকৃত। এই শুদ্ধসত্ত্বের নামান্তর পরমপদ, নিত্যবিভূতি, অমৃত, বৈকুণ্ঠ, ত্রিপাদবিভূতি ইত্যাদি। ইহা ভগবানের সেবার জন্য গৃহীত হয়, ভগবানের কৈঙ্কর্য্যই পরমমুক্তি।[১] রামানুজ, নিম্বার্ক জীবন্মুক্তি স্বীকার করেন নাই, 'বিদেহমুক্তি' স্বীকার করিয়াছেন। ইঁহাদের মতে মোক্ষের দুই অঙ্গ, তদ্ভাবাপত্তিঃ বা ব্রহ্মস্বরূপলাভ এবং আত্মস্বরূপলাভ। তদ্ভাবাপত্তি অর্থে ব্রহ্মের সহিত অভিন্নতালাভ নহে, ব্রহ্মসাযুজ্যলাভ মাত্র। আত্মস্বরূপ লাভ অর্থে জীবত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ। আত্মস্বরূপলাভই ব্রহ্মস্বরূপলাভের কারণ। অবিদ্যাযুক্ত দেহাধীন জীবের পক্ষে মুক্তিলাভ সম্ভব নহে। মুক্তজীবও ব্রহ্ম হইতে ভিন্নাভিন্ন, অভিন্ন নহে। মুক্তিকালে জীবের স্বরূপনাশ হয় না, তাহার

১। ভারতীয় দর্শন, বলদেব উপাধ্যায়, পৃ ৪৯২-৯৫।

বিকাশ হয় ও ধর্ম্মেরও পূর্ণ বিকাশ হয়, তাই জীব ব্রহ্মের সমতুল হয়, ইহাই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীদের মত।

সাংখ্যকার বলিয়াছেন বিবেক জ্ঞান হইলে এই জন্মেই মুক্ত হওয়া যায়, তাহাই জীবন্মুক্তি, কিন্তু ইহা কৈবল্য নহে। তথাপি এই প্রজ্ঞাবস্থায় পুরুষকে কেবলী বলিয়া জানা যায়। যোগসূত্রে (২।২৭), "তস্য সপ্তধা প্রান্তভূমি প্রজ্ঞা"র কথা আছে, সপ্তম ভূমিতে পুরুষকে গুণসম্বন্ধাতীত কেবলী অমল ইত্যাদি রূপে জানা যায়। এই সপ্ত প্রান্তভূমি প্রজ্ঞা ভাবনাকালে যোগী জীবন্মুক্ত হন, কারণ তখন তাঁহার সংস্কার লেশমাত্র থাকে না। যোগীর প্রারব্ধ কর্ম্মের নিষ্পাদন হইতে থাকে, তবে কর্ম্মবন্ধন হয় না। কারণ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা যোগী দুঃখ-সংস্পর্শ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকেন। সম্যক্ চিত্তনিরোধ না করা পর্য্যন্ত যোগীকে জীবন্মুক্ত বলা হয়। চিত্তনিরোধে বিদেহকৈবল্য আশ্রয় হয়। জীবন্মুক্ত যোগীর 'নির্ম্মাণচিত্ত' ধারণ করিয়া অবস্থান সম্ভব, নির্ম্মাণচিত্ত দ্বারা ইচ্ছাপূর্ব্বক দেহধারণও সম্ভব। আবার সংস্কারলেশ হইতেও শরীরধারণ হয়, তাঁহারা নূতন কর্ম্ম করেন না, সংস্কারশেষের প্রতীক্ষায় থাকেন। তাঁহাদের মুক্তি অর্থে দুঃখমুক্তি, "ততঃ ক্লেশকর্মনিবৃত্তিঃ"।[১] শরীরনাশ হইলে যে অবশ্যম্ভাবী দুঃখত্রয় হইতে মুক্তি হয় তাহাই বিদেহমুক্তি; বিজ্ঞানভিক্ষু ইহাকেই বাস্তবিক মুক্তি বলেন।

যোগসূত্রে আছে (১।১৯), "ভবপ্রত্যয়ো বিদেহপ্রকৃতিলয়ানাম্"। ভব অর্থে সংস্কারবশে জন্ম। সংস্কারবলে যাঁহাদের চিত্তবৈরাগ্য নিরুদ্ধ হইয়া প্রকৃতিতে লীন হইয়াছে, তাঁহাদের নাম প্রকৃতিলীন। সাংখ্যসূত্রে আছে প্রকৃতিলীনদের মগ্নের ন্যায় পুনরুত্থান হয়, বৈরাগ্য-সংস্কার ক্ষয় হইলেই তাঁহাদের চিত্ত পুনরুত্থিত হয়। বিদেহলীন অর্থে দেহান্তে যিনি উপাস্যে লীন হন বা যিনি দেহাহঙ্কারশূন্য হইয়া সানন্দ সমাধিতে বিরাজ করেন, দেহপাতে ইঁহারা লোকবিশেষে উৎপন্ন হইয়া ধ্যানসুখ ভোগ করেন। বিদেহলীনেরা দেহধারণে বিরাগযুক্ত, তথাপি বিদেহ প্রকৃতিলীনদের যে নিরোধ তাহা ভবমূলক, তাহার ফলে পুনরাবির্ভাব ঘটে। বিদেহলয় ও প্রকৃতিলয়ের সিদ্ধদের সম্যক্ বিবেকজ্ঞান হয় না, তথাপি বৈরাগ্যের দ্বারা কারণ লয় করেন বলিয়া

১। পাতঞ্জল যোগদর্শন, ৪।৩০

মোক্ষপদে থাকেন। সমাধিবলে শরীর সংস্কার অতীত হওয়াতে তাঁহাদের শরীর ধারণ হয় না, কিন্তু বিবেকজ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকায় উচ্চতর লোকমধ্যে অভিনিবর্ত্তিত হইয়া পরে প্রলয়ের সাহায্যে কৈবল্য লাভ করেন, কৈবল্যপদ সর্ব্বলোকাতীত ও পুনরাবর্ত্তনশূন্য।[১] বিদেহলীন ও প্রকৃতিলীনদের মোক্ষ বিদেহমুক্তির প্রকারভেদ।

ন্যায় ও বৈশেষিক দুঃখনিবৃত্তিমাত্রে মোক্ষলাভের কথা বলেন, ইহা অভাবাত্মক; মীমাংসা, বেদান্ত, জৈন ও মহাযান বৌদ্ধ মোক্ষাবস্থায় যে 'আনন্দ' উপলব্ধির কথা বলেন তাহা ভাবাত্মক। বৌদ্ধ সহজিয়া বায়ুনিরোধের দ্বারা বোধচিত্তকে দীপস্বরূপ করিয়া যে মহাসুখ উপলব্ধির বর্ণনা করেন তাহাই জীবন্মুক্তের 'আনন্দ' উপলব্ধি। বৌদ্ধমতে 'সোপাধিশেষ' অবস্থা জীবন্মুক্তের অবস্থা, ইহাই নির্ব্বাণ। 'নিরুপাধিশেষ' বা অনুপাধিশেষই বিদেহমুক্ত বা কৈবল্যমুক্তের অবস্থা।

দিগম্বরী জৈনেরা বলেন, আত্মা চতুর্দ্দশ গুণস্থানের মধ্য দিয়া অবশেষে মোক্ষাবস্থা প্রাপ্ত হয়, এই চতুর্দ্দশ গুণস্থানের শেষ দুই অবস্থা জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তির অনুরূপ। এই অবস্থাদ্বয়ের নাম 'সযোগীকেবলী গুণস্থান' এবং 'অযোগীকেবলী গুণস্থান'। সযোগীকেবলীর জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি হয়, তৎফলে তিনি বিশ্বগুরু হইতে পারেন, ইহাই তীর্থঙ্করের অবস্থা। অযোগী-কেবলী কায়াহীন সিদ্ধদের মধ্যে অবস্থান করেন ও জাগতিক ব্যাপারে অলিপ্ত থাকেন। সযোগীকেবলীর প্রারব্ধের সহিত জাতি, আয়ুভোগ থাকে, ইহার দ্বারাই শরীর রক্ষা হয়, প্রারব্ধের অন্তে শরীরের লয়প্রাপ্তি হয়। অযোগীকেবলী কায়াহীন।[২]

গীতাতে আছে জ্ঞানীব্যক্তি ব্রহ্মে স্থিতিলাভ করেন, গীতাকার ইহাকে ব্রাহ্মীস্থিতি (২।৭২) বলিয়াছেন। মৃত্যুকালেও এই অবস্থালাভ হইলে ব্রহ্মনির্ব্বাণ অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ আনন্দলাভ হয়। কামনাশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিলে মুক্তিলাভ অবশ্যম্ভাবী (৩।১৯, ৬।১)। এইরূপ নিষ্কাম কর্ম্মীই যোগী বা সন্ন্যাসী। এই সুখদুঃখহীন, সদাসন্তুষ্ট কামনাহীন যোগীই উপনিষদের বর্ণিত 'জীবন্মুক্ত'।

১। পাতঞ্জল দর্শন ও টীকা পৃঃ ২৪০—হরিহরানন্দ আরণ্য। (১৯৩৮)

২। উদয়নের ন্যায়কুসুমাঞ্জলি (১ম অধ্যায়)—ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজের প্রবন্ধ, S. B. S. Vol. II.

জীবন্মুক্তের স্বরূপ 'তন্ত্রবটধানিকা'তে এইরূপ বিবৃত হইয়াছে—

"যথা চ পশবো ভান্তি তথা কেচন তাং নিজাম্।
অপ্রকাশদশাং ঘ্নন্তি দেহপ্রাণতদাত্মতাম্॥
তে প্রবুদ্ধাশ্চ পতয়ো জীবন্মুক্তা মহর্ষয়ঃ।
তেষাং তত্তারতম্যেণ গুরুশিষ্যাদিতো স্থিতাঃ॥"[১]

জীবের স্বপ্রকাশভাব নিজের বিচিত্রস্বভাবহেতু দেহপ্রাণাদিরূপে আছে। কেহ কেহ দেহপ্রাণরূপ অপ্রকাশরূপ দশাকে হনন করেন, তাঁহারা প্রবুদ্ধ মহর্ষি জীবন্মুক্ত, তাঁহাদের মধ্যে তারতম্যতাবশে গুরুশিষ্যাদি রূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

ভট্টবামদেব রচিত 'জন্মমরণবিচারে' আছে স্বরূপ পরামর্শই জীবন্মুক্তির উপায়, "অকৃত্রিমস্বরূপপরামর্শনেন জীবন্মুক্তিমাসাদ্য কৃতকৃত্যতা-মালম্বন্তে সন্তঃ"।[২]

জীবন্মুক্ত পুরুষ জাগ্রৎকালে প্রারব্ধ কর্ম্মভোগ করতঃ দৃশ্যমান জগৎ দেখিয়াও দেখেন না; যেমন ঐন্দ্রজালিক দৃশ্যমান ইন্দ্রজালকে দেখেন, জীবন্মুক্তও সেইরূপ দৃশ্য জগৎকে দেখেন। আচার্য্যেরা বলেন, যিনি জাগ্রৎ অবস্থাতেও সুষুপ্তের ন্যায় থাকেন, ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্য সত্ত্বেও যিনি অদ্বিতীয় দর্শন, বাহ্যকর্ম্ম করিয়াও যিনি অন্তঃকরণে নিষ্কর্ম্ম, যিনি কেবল পূর্ব্বসংস্কারবশে অভ্যস্তের ন্যায় কার্য্য করেন, অভিমানপূর্ব্বক কার্য্য করেন না, তিনিই আত্মজ্ঞ বা জীবন্মুক্ত, তদ্ভিন্ন ব্যক্তি জীবন্মুক্ত নহেন।[৩]

সুখ, শান্তি, পরমাত্মার সহিত মিলন, জীবমুক্তি প্রভৃতি একই আদর্শের বিভিন্ন রূপ। মানব প্রকৃতি দ্বারা বদ্ধ, অতএব ঊর্দ্ধে গমন ব্যতীত তাহাব উপায় নাই, ইহা বিভিন্ন প্রক্রিয়া দ্বারা সাধিত হইতে পারে। মার্কণ্ডেয় ও তৎপরে মৎস্যেন্দ্র গোরক্ষাদি হঠযোগের দ্বারা ইন্দ্রিয়নিরোধের উপদেশ দিয়াছেন, বায়ুনিরোধে ইন্দ্রিয়সংযম হইলে জগৎ মিথ্যা বলিয়া প্রতিভাত হইবে, তজ্জন্য উপযুক্ত দেহধারণ কর্ত্তব্য। বহির্মুখী ইন্দ্রিয় অন্তর্মুখী হইলে সাধনের তীব্রতা অনুযায়ী শুদ্ধতা প্রাপ্তি হয়। সাধকের দেহমধ্যে জ্ঞানের উন্মেষ বা কুণ্ডলিনীর জাগরণ গুরু-

---

১। তন্ত্রবটধানিকা—অভিনব গুপ্ত বিরচিত ১।২৬, ২৭

২। জন্মমরণবিচার—ভট্টবামদেব বিরচিত, শেষ পৃষ্ঠা।

৩। বেদান্তসার—কালীবর বেদান্তবাগীশ সঙ্কলিত (সদানন্দ যোগী বিরচিত) পৃঃ ১২৩-২৬।

সহায়ে সম্পাদিত হয়, সেই জ্ঞানপ্রদীপ প্রজ্বলিত রাখা সাধকের কর্ত্তব্য। মনের শুদ্ধতা বিনষ্ট হইলেই চিত্ত অজ্ঞানের মধ্যে পুনরায় নিমজ্জিত হয়, ইহাকে ভবপ্রত্যয়, উপায়প্রত্যয়াদি বলা হয়। যাহাতে এই অবস্থা না হয় তাহার জন্য সাধককে সচেতন থাকিতে হয়। এই নিমিত্ত 'সিদ্ধদেহ' 'ভাবদেহ' প্রভৃতি দেহ ধারণ করিয়া প্রজ্ঞার স্থিতি সাধন কর্ত্তব্য। যোগসূত্রের (৩।৫১) ভাষ্যে যোগীদের চারিপ্রকার অবস্থা বর্ণন করা হইয়াছে—প্রথমকল্পিক মধুভূমিক, প্রজ্ঞাজ্যোতি ও অতিক্রান্ত ভাবনীয়। শেষোক্ত অবস্থায় চিত্তলয়ই একমাত্র অবশিষ্ট পুরুষার্থ থাকে, বিবেকখ্যাতি দ্বারা যোগী কৈবল্যপ্রাপ্ত হন, যোগমতে এই অবস্থাই যথার্থ জীবন্মুক্তের অবস্থা। বিবেকখ্যাতি হইলেই যে তৎক্ষণাৎ সদাকালের জন্য চিত্তনিবৃত্তি হয় তাহা নহে, কৈবল্যের জন্য বিবেকখ্যাতিকে অবিপ্লবা করিতে হয়। খেচরীমুদ্রা-সাধনে যে দীর্ঘকালের জন্য প্রাণরোধ সম্ভব হয় তাহাতে চিত্তবৃত্তি নিরোধ হইলেও উহা কৈবল্য নহে। স্মৃতি প্রজ্ঞাদিপূর্ব্বক সংস্কার ক্ষয় ও তত্ত্ব সাক্ষাৎ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রকৃত কৈবল্যলাভ হয় না। খেচরী আদি সিদ্ধির দ্বারা একাগ্রভূমি সাধন হইতে পারে, চিত্তকে সম্মুখে রাখিয়া দ্রষ্টৃস্বরূপ অবস্থান ও সঙ্কল্পনিরোধ সত্ত্বশুদ্ধিলাভের মুখ্য উপায়।[১] ইহাই উত্তম সমাধি। এই 'উন্মনী অবস্থাই জীবন্মুক্তের কাম্য। নাথসিদ্ধগণ উন্মনী অবস্থালাভ বা অমনস্কপ্রাপ্তির কামনা করেন, তাই জীবন্মুক্তিই নাথযোগীদের আদর্শ।

অপর ও পরামুক্তি

জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তিভেদে অপরমুক্তি ও পরামুক্তি ভেদ করা হয়। উদ্যোতকর দুইপ্রকার নিঃশ্রেয়সের কথা বলিয়াছেন, অপর ও পর নিঃশ্রেয়স; তত্ত্বজ্ঞানই এই উভয়ের কারণ। জীবন্মুক্তি অপর নিঃশ্রেয়স, বিদেহমুক্তি পর নিঃশ্রেয়স, "নিঃশ্রেয়সস্য পরাপরভেদাৎ। যত্তদপরং নিঃশ্রেয়সং তৎ তত্ত্বজ্ঞানান্তরমেব ভবতি। * * * পরং চ নিঃশ্রেয়সং তত্ত্বজ্ঞানাৎ ক্রমেণ ভবতি"।[২]

১। যোগতারাবলী ১৯ শ্লোক—পশ্যন্নুদাসীনদৃশা প্রপঞ্চং সংকল্পমুন্মূলয় সাবধানঃ" পৃঃ ৩৭৭ যোগশাস্ত্রাবলী দ্রষ্টব্য।

২। ভারতীয় দর্শন, পৃঃ ২৭১ বলদেব উপাধ্যায়।

আগমসম্মত পরামুক্তিই পূর্ণত্ব। আগম-মতে সাংখ্যের কৈবল্যে বা বেদান্তের মুক্তিতে পূর্ণত্ব নাই। তন্ত্রালোকটীকায় (৪।৩১) জয়রথ বলিয়াছেন, বেদান্তের মুক্তি সবেদ্য প্রলয়াকল অবস্থার ন্যায়। সম্ভবতঃ তাঁহার মতে এই অবস্থায় আণবমল থাকিয়া যায়, ধ্বংসোন্মুখও হয় না। এই অবস্থা বিজ্ঞানকৈবল্যবৎ বলিয়াও জয়রথ স্বীকার করেন না, কারণ বিজ্ঞানকলে আণবমল ধ্বংসোন্মুখ হয় বলিয়া উহাতে কর্ম্ম জন্মায় না। কেহ কেহ বেদান্তমোক্ষকে বিজ্ঞানকৈবল্যবৎ মনে করেন। বৈষ্ণবাদির মোক্ষ ঐ মতে প্রলয়কালের ন্যায়। এই অবস্থায় দীর্ঘকাল মোহাদি-রূপভোগ হয় ও তৎপরে নূতন সৃষ্টিতে জন্ম হয়।[১]

মৎস্যেন্দ্রের কৌলজ্ঞাননির্ণয়ে শিবকে জীব বলা হইয়াছে। জীবই সেই পরম নিষ্কল, নিত্য, নিরাময় পরমাণু বা সর্ব্বব্যাপী শিব। শিবই জীবন বা হংস, শক্তি পুদ্‌গল, মন, প্রাণ ইত্যাদি এবং সর্ব্ব প্রাণীর 'সমীরপূরকো বায়ু', দেহমধ্যে ইনি 'জীব', দেহমুক্ত হইলে 'শিব' (ষষ্ঠ পটল)। প্রকৃত মুক্তিতে পশুত্বের নিবৃত্তি ও শিবত্বের অভিব্যক্তি হয়। ভগবৎ-অনুগ্রহপ্রাপ্তির ব্যাকুলতা জন্মিলে শক্তিপাতের দ্বারা পবিত্র সাধক স্বরূপলাভে সমর্থ হন।

তন্ত্রমতে পঞ্চকৃত্যকারী পরমশিবের জীবনের প্রতি অনুগ্রহফলেই জীবের মুক্তি হয়। এই মুক্তি দ্বিবিধ—নিরধিকার ও সাধিকার। প্রলয়ান্তে ও সৃষ্টির পূর্ব্বে যে জগৎহীন স্বাপাবস্থা হয় তখন নিরধিকার মুক্তিলাভ হয়, ইহাই শিবত্ব। সংহারকালে ও স্থিতিকালে যোগ্যতানুসারে সালোক্যাদি পদপ্রাপ্তি হয় তাহাই 'অপরমুক্তি'। শিবত্বপ্রাপ্তিই 'পরামুক্তি' বা শ্রেষ্ঠমুক্তিপদ। পরামুক্তির চারিটী অবস্থা—বন্ধ, বন্ধমুক্ত, আত্মা ও সর্ব্বাত্মা। তন্ত্রবটধানিকা গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে, পরামুক্তি পুনরাবৃত্তিবর্জ্জিতা। কিন্তু অন্যদের ধী প্রাণ শূন্যে অবস্থিতির নিমিত্ত অপরমুক্তি, ইহারা জন্মমরণশীল (১।৩৩-৩৫)।

অতএব যে গতিতে পুনরাবর্ত্তন নাই তাহা পরামুক্তি, যাহাতে পুনর্ব্বার দেহধারণ অনিবার্য্য তাহাই অপরমুক্তি। দেবতা, মনুষ্য প্রভৃতি ভেদবশতঃ অপরমুক্তির বহু ভেদ আছে। পরামুক্তির দুইটী মাত্র ভেদ আছে, প্রথমটীতে মরণোত্তর 'সদ্যোমুক্তি', দ্বিতীয়টীতে

১। উত্তরা, বৈশাখ ১৩৫০ পৃ ৩০৮ ফুটনোট—গুরুতত্ত্ব ও সদ্গুরু রহস্য। ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ।

'ক্রমমুক্তি'। মৃত্যুকালীন ভাবনার উপরই জীবের পরা বা অপরগতি নির্ভর করে।[১]

জন্ম হইলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। কিন্তু কালজয়ী রসেশ্বর সিদ্ধ ও নাথসিদ্ধেরা বলেন মৃত্যুকেও জয় করা যায়। তাঁহারা বলেন মৃত্যু স্বেচ্ছাধীন, এই দেহকে জয় করিয়া অবিনাশী হইয়া জগতের কার্য্য করা সম্ভব। মাহেশ্বর সম্প্রদায়ের সিদ্ধেরা বলেন এই দেহকেই কয়েকটী বিশেষ প্রণালী দ্বারা দেহান্তরে পরিবর্ত্তিত করা যায়, যাহাতে কাল পূর্ণ হইলে সেই নূতন দেহ লইয়াই ভগবৎসকাশে উপনীত হওয়া ও সেখানে চিরস্থিতিলাভ করা সম্ভব হয়।

সাধারণতঃ আমরা বলিয়া থাকি, মৃত্যুই মুক্তিলাভের মার্গ, কিন্তু সিদ্ধসম্প্রদায় বলেন, জন্মই কালচক্রের আবর্ত্তন হইতে রক্ষা পাইবার উপায়। মৃত্যু হইলেই পুনর্জ্জন্ম হইবে, কিন্তু এই জন্মেই যদি সাধন দ্বারা এইরূপ দেহলাভ হয় যে মৃত্যু ঘটিবে না, তাহা হইলে জন্মমৃত্যুর কালচক্র হইতে অব্যাহতিলাভ হইল। সিদ্ধমাত্রেরই ইহাই প্রেয়। এ পৃথিবীতে যে জন্মগ্রহণ করিয়াছি তাহার উপর আমার কোন্ হাত নাই, কিন্তু পুনর্জ্জন্ম রোধ করিবার ক্ষমতা আমাদের আছে, অতএব 'মৃত্যুতেই মুক্তি' এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল, অতএব দেহসিদ্ধি দ্বারা মৃত্যুকে জয় করিতে হইবে। সিদ্ধদেহ যোগী 'জীবন্মুক্ত', তিনি ইহজগতে বাস করিয়াও নির্লিপ্ত, তিনি মৃত্যু ব্যতীতই 'পরামুক্ত' হইতে পারেন অর্থাৎ তাঁহার শুদ্ধদেহ লইয়াই এ জগৎ হইতে অন্তর্হিত হইতে পারেন। ইহা কায়িক মৃত্যু নহে, ইহা গুরুর উপদেশে স্থূলদেহেরই পরিবর্ত্তন এবং সেই দেহেই ইহজগৎ ত্যাগ। যে মৃত হয় সে মুক্ত নহে, ইহাই সিদ্ধমত। পরামুক্তের 'দেহপাত' হয় না, ইহাই বৈশিষ্ট্য।

স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ দেহ তিনটীই অশুদ্ধমায়ার দেহ, মানব স্থূলদেহ ত্যাগ করিবার সময়ে তাহার সূক্ষ্মদেহ জলৌকাবৎ তৎক্ষণাৎ অন্য একটী দেহকে আশ্রয় করে। স্থূলদেহ আবরণস্বরূপ, অতএব একটী আবরণ বিচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম হইলেই অন্য আবরণ গৃহীত হয়। কিন্তু মৃত্যুজয়কামী (যোগী) গুরুর উপদেশে অশুদ্ধমায়ার দেহকেই শুদ্ধমায়ার দেহে পরিণত করেন, তৎফলে যে দেহ হয় তাহা 'প্রণবতনু' (ওঁকারদেহ), ইহা অমৃতপানে চির-

১। মৃত্যুবিজ্ঞান ও পরমপদ, ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ, ভারতবর্ষ, মাঘ ১৩৪৭ পৃ ১৩৮।

সঞ্জীবিত থাকে। 'প্রণবতনু'ধারী যোগীই 'জীবন্মুক্ত', অশুদ্ধ মায়িক জগতে বাস করিলেও তাঁহার সম্পর্ক শুদ্ধস্তরের সহিত। তাঁহার জাগতিক বিষয়ের সহিত যোগ স্থায়ী নহে, কারণ তিনি ইহার পর 'পরামুক্তি'লাভ করেন। জীবন্মুক্তের শুদ্ধমায়ার সিদ্ধদেহ ক্রমশঃ পরামুক্তের মহামায়ার দিব্যদেহে পর্য্যবসিত হয়, ইহাই 'জ্ঞানতনু'। অতএব প্রণবতনু ক্রমশঃ জ্ঞানতনুতে স্থিতিলাভ করে। জীবন্মুক্তযোগী লোকের কল্যাণার্থে প্রণবতনু ধারণ করেন, এবং কার্য্যশেষ হইলে সকলের সাক্ষাতে দিবালোকেই স্বদেহেই অন্তর্হিত হন। অতএব এইরূপ দেহ শুদ্ধ হইতেই হইবে। ফলতঃ সিদ্ধসম্প্রদায়ে প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বারা দেহশুদ্ধির সাধন প্রচলিত আছে।

দেহশুদ্ধির প্রক্রিয়াতে প্রথমতঃ দেহস্থ সূক্ষ্মতর কোষগুলির পর্য্যন্ত শুদ্ধীকরণ আবশ্যক। অজপাজপ, হঠযোগের প্রণালী ও রসেশ্বর সম্প্রদায়ের পারদাদির ব্যবহার ইত্যাদির দ্বারা এই স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ দেহের পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। ফলে অজর অমর দেহ লাভ হয়। এই দেহ বাহিরের ভোগ্যবস্তু দ্বারা পুষ্ট হয় না, পার্থিব জগতের উপর এই দেহ বা প্রাণ নির্ভর করে না। এই রূপান্তরগ্রহণ বা পরিবর্ত্তনক্রিয়া সম্পুর্ণ হইলে যে দেহ লাভ হয় তাহাই সিদ্ধদেহ বা মন্ত্রতনু। ইহা তরবারির আঘাতেও কোনরূপে বিকৃত হয় না, এই দেহ দেখিতে অস্বচ্ছ হইলেও ইহার ছায়াপাত হয় না বা ইহার পদচিহ্ন পড়ে না। ইহা স্পর্শ করাও যায় না। তথাপি কোন আগন্তুক তত্ত্ববঞ্চিত ব্যক্তি ইহাতে কোন অসাধারণত্ব দেখিতে পায় না।

যখন জীবন্মুক্ত সিদ্ধদেহ যোগী পরামুক্তিলাভ করেন তখন তাঁহার উপরোক্ত প্রকার প্রণবতনু বা বৈন্দব শরীর (ইহাই বিন্দু হইতে জাত দেহ বা মহাকারণ দেহ বা শুদ্ধ দেহ) পলকমাত্রে দিব্যতনুতে পর্য্যবসিত হয়; এই দেহ মানবদৃষ্টির অগোচর, ইহাই 'জ্ঞানতনু'। এই একদেহ হইতে দেহান্তরে পরিণতি 'মৃত্যু' নহে, কারণ সিদ্ধসম্প্রদায় 'মৃত্যুঞ্জয়ী'। মানব যে মৃত্যুকে জয় করিতে অসমর্থ ইহা সিদ্ধেরা স্বীকার করেন না, ইহাকে মিথ্যা বলেন। সিদ্ধমতে দেহজয় না হইলে অর্থাৎ মৃত্যুহীন দেহ লাভ না হইলে মুক্তির কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না। অতএব সিদ্ধেরা এই জগতেই বাস করিয়া মৃত্যুজয়ের সাধনায় ব্রতী হন এবং কাল পূর্ণ হইলে তাঁহার ভবিষ্যৎ স্থিতির পরিচয় না দিয়া অন্তর্হিত হন। সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণে অনিচ্ছুক বলিয়াই জীবন্মুক্ত যোগী

সাধারণ ব্যক্তিরা যতদিন জীবিত থাকে, সেইভাবেই দেহ ধারণ করিয়া বাস করেন (পৃ ৩১১)। অন্তর্হিত হইয়াও সিদ্ধযোগীরা জাগতিক মানবের নিকট আবির্ভূত হইতে পারেন। অগস্ত্য প্রভৃতির এইরূপ বহু বৃত্তান্ত প্রচলিত আছে (C. H. I., Vol. II., Shastri's article)। (গোরক্ষের সহিত কবীরের মিলনও এই জাতীয় আবির্ভাব বলা যাইতে পারে, কারণ সিদ্ধদেহী কাল জয় করিয়া ব্রহ্মাণ্ডে বিচরণ করিয়া থাকেন।)

সিদ্ধমার্গের দর্শন সংক্ষেপে বুঝিতে হইলে বলিতে হয় যে রূপ বিনা প্রাণের অস্তিত্ব সম্ভবে না, রূপ অর্থে দেহ বা পিণ্ড ধারণ, এই দেহ বস্তুজাত, সেই বস্তু অনৈসর্গিক বা নৈসর্গিক উভয়ই হইতে পারে। একটী দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণ অপর একটী দেহকে আশ্রয় করে। এই দেহ সাধারণতঃ নশ্বর, কিন্তু প্রাণের ক্রিয়াদ্বারা ইহাকেই অবিনশ্বর করা সম্ভব। অস্থায়ী রূপকে ধারণ করিয়া রাখিতে প্রাণের নিরন্তর চেষ্টার ত্রুটী নাই, অস্থায়ী রূপ হইতেই অনন্তকাল স্থায়ী রূপের উৎপত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত প্রাণের এই তাড়নার বিরাম নাই। আত্মার স্থিতির নিমিত্ত দেহের আবশ্যকতা আছে। মুক্তিই যদি কাম্য হয় তবে এই দেহকেই চিরস্থায়ী করা কর্ত্তব্য, যে দেহ ধারণ হইয়া গিয়াছে তাহাকে পতিত হইতে দিব না ইহাই সাধনা হইবে। যদি চিরস্থায়ী করিবার জন্য উপযুক্ততর দেহধারণ আবশ্যক হয় তবেই দেহপাত হইতে দিব, অন্যথা নহে, ইহা সিদ্ধদের সিদ্ধান্ত। ইহজন্ম দ্বারাই তাহারা কালজয়ে চেষ্টিত।

নাথসিদ্ধেরা তাঁহাদের অলৌকিক সাধনের নিমিত্ত দাক্ষিণাত্যে বিশেষভাবে আদৃত হন। তাঁহারা পদার্থ-রসায়ন প্রক্রিয়া (physico-chemical process) দ্বারা মানবদেহকেই অমরত্ব দান করিতেন, ইহা দ্বারা অষ্টসিদ্ধিও লাভ হইত। ইঁহাদের প্রক্রিয়ার সহিত রসেশ্বর সিদ্ধদেরও সাদৃশ্য আছে। ইঁহারা পারদ ও অভ্রক রসায়নযোগে দেহকে প্রতিক্ষেপণ, পরিচ্ছন্ন, ও প্রক্ষেপণ (reverberating, cleansing, projecting) করিতে নিপুণ। (C.H.I., Vol. II, Shastri's article)।

বীরমহেশ্বর সম্প্রদায়ের সংস্কৃত গ্রন্থানুযায়ী নাথসিদ্ধ গোরক্ষ দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণে কোন মহেশ্বর সিদ্ধের সাক্ষাৎ লাভ করেন। এই সিদ্ধ শুদ্ধমার্গের জীবন্মুক্তের দেহ ধারণ করিয়াছিলেন।

গোরক্ষ ইঁহার নিকট জীবন্মুক্তি ও পরামুক্তির রহস্যে দীক্ষালাভ করেন। (লিঙ্গধারণচন্দ্রিকায় পৃ ৩৩৫-৩৭, ৪১ গোরক্ষ ও আলমপ্রভুর প্রশ্নোত্তর আছে।)

নবনাথের প্রত্যেকে দশ কোটি রসায়নবিদের প্রধানরূপে গণ্য, ইঁহারা জরামৃত্যুনাশ, বিষের সঞ্চারণ, ক্ষমতাহরণ প্রভৃতিতে বিখ্যাত ছিলেন। ইঁহারাই নবকোটি সিদ্ধরূপে পরিচিত। কাহারও কাহারও মতে নাথসিদ্ধদের সহিত ইঁহাদের সম্পর্ক ছিল না, ইঁহারা রসেশ্বর সম্প্রদায়ের সিদ্ধ। মতান্তরে ইঁহারা খৃষ্টপূর্ব্বকালীন দেশ হইতে আগত 'ভোগের' শিষ্য। ইনি Laotseএর সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ভোগ এই সিদ্ধমার্গ দাক্ষিণাত্যে শৈবাগমী ও শাক্তাগমীদের শিক্ষা দেন, এইরূপ প্রবাদও আছে। শুদ্ধমার্গের মাহেশ্বর সম্প্রদায়ের 'অষ্টাদশ সিদ্ধ' দাক্ষিণাত্যের সিদ্ধসংখ্যা দ্বারা পুষ্ট। মূলা বা শ্রীমূলানাথ প্রভৃতি শুদ্ধমার্গের 'জ্ঞানসিদ্ধ'দের মধ্যে অন্যতম; সনক, সনন্দন, সনাতন, সনৎকুমার, পতঞ্জলি ও ব্যাগ্র পদের সহিত ইনি স্বর্গ হইতেই দীক্ষালাভ করেন। 'ভোগ' ও 'মূলা' অন্য পঞ্চসিদ্ধের সহিত মিলিয়া সপ্ত শুদ্ধমার্গের প্রতিষ্ঠা করেন, ইহা সন্ন্যাসমার্গ। (লিঙ্গধারণচন্দ্রিকা নামক গ্রন্থে, পৃ ৩৪২ শুদ্ধমার্গের ও প্রকৃতসিদ্ধির কথা আছে।)

ভোগ অগস্ত্যের বয়ঃকনিষ্ঠ সমসাময়িক ছিলেন, এরূপ মতও প্রচলিত আছে। অগস্ত্য শুদ্ধমার্গের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন, তিনি খৃষ্টপূর্ব্ব ও খৃষ্টজন্মের পরেও স্থূলদেহেই বহু অলৌকিক সাধন দেখাইয়া গিয়াছেন। দাক্ষিণাত্যের সিদ্ধকূটপর্ব্বতে ইঁহার আবাস ছিল। তিনি উত্তরভারতের হিমালয় অঞ্চল হইতে দাক্ষিণাত্যে আসেন। ভোগেরও দেহসিদ্ধি দাক্ষিণাত্যে প্রসিদ্ধ। তাঁহার Tāoismএর স্বল্পসংখ্যক অধিকারী থাকিলেও দাক্ষিণাত্যে শুদ্ধমার্গের প্রচার তাঁহার দ্বারাই হয়। ইঁহার এক শিষ্য মৃতব্যক্তিকে পুনর্জীবন দান ইত্যাদি অলৌকিক ক্রিয়া দেখাইয়া সকলের সম্মুখে অদৃশ্য হইয়া যান। সিদ্ধমার্গের 'মুক্তি' অর্থে মৃত্যু হইতে অব্যাহতি, ইহাই সিদ্ধদের সিদ্ধান্ত। ইহাই আগমের রহস্য, শুদ্ধমার্গেরও ইহাই লক্ষ্য। অতএব সিদ্ধদের 'দেহপাত' হয় না, তাঁহারা দেহসহ অদৃশ্য হন। তামিলভাষায় রচিত কালদহন-তন্ত্র, মৃত্যুনাশক-তন্ত্র আদিতে শুদ্ধমার্গের নীতি বর্ণিত হইয়াছে। ইহা দ্বারাই মানবের দেহান্তর প্রাপ্তি ও অদৃশ্য হওয়ার ক্ষমতা লাভ হয়। সামবেদের

অন্তর্গত ব্রহ্মজাবল উপনিষদে যে মুক্তি বর্ণিত হইয়াছে তাহা মৃত্যুকে জয় করিবার ও দেহকে রূপান্তরিত করিবার উপদেশ।[১]

প্রণবই কুণ্ডলিনীর স্পন্দন, অতএব 'প্রণবতনু' লাভ অর্থে কুণ্ডলিনীর প্রবুদ্ধ হওয়া। রসেশ্বর ও নাথমার্গে এই দেহকেই স্থায়ী করিবার সঙ্কল্প দেখা যায় অর্থাৎ আয়ুবৃদ্ধি লক্ষ্য, মাহেশ্বর সম্প্রদায় (ইঁহাদের শুদ্ধ আম্নায় অর্থাৎ শুদ্ধ নিয়মাবলী) মধ্যে দেহকে শক্তিতে পরিণত করাই লক্ষ্য, ইহা দ্বারা যে সিদ্ধদেহ লাভ হইবে তাহা দিব্যদেহ হইলেও চিরস্থায়ী নহে, তাহা অদৃশ্য হয় এবং ভগবানের দিব্যতেজে মিলিত হইয়া যায়, সেখানে মৃত্যু বলিয়া কিছু নাই। কৈবল্য, হংস, ব্রহ্মবিন্দু উপনিষদাদিতে এই শুদ্ধমার্গের বর্ণনা আছে।

১। "The Doctrinal Culture & Tradition of the Siddhas, Dr. Raman Shastri, C. H. I. Vol. II, p. 303 ff.

নবম পরিচ্ছেদ

গুরুপরম্পরায় নাদ ও বিন্দুসন্তান

শ্রীগুরু আদিনাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথ, তৎপুত্র উদয়নাথ, দণ্ডনাথ, সত্যনাথ, সন্তোষনাথ, কূর্ম্মনাথ, ভবনার্জি, তস্য শ্রীগোরক্ষনাথ ঈশ্বরসন্তান আদিব্রাহ্মণ সূক্ষ্মবেদী অদ্বৈতোপরি সদানন্দদেবতা, অনাহতশৃঙ্গী খেচরীমুদ্রা মুদ্রা—ইহাই গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহে (পৃ ৪০) নবনাথের পরিচয়। কল্পদ্রুমতন্ত্রে শ্রীগোরক্ষসহস্রনাথস্তোত্র আছে, গোরক্ষনাথকেই তাহাতে বিধিবিষ্ণু শিব বলা হইয়াছে এবং নবভাবে নবনাথের নাম করা হইয়াছে, যথা—মন্ত্রনাথ, ধ্যাননাথ, নিত্যনাথ, পূর্ণনাথ, দ্যুতিনাথ, সৃষ্টিনাথ, স্থিতিনাথ, হারনাথ, রামনাথ। গোরক্ষমন্ত্র বিনা সিদ্ধিলাভ কদাচ সম্ভবে না।[১]

অন্যত্র "নবনাথাঃ—বিন্দুসন্তানমীশ্বরঃ। চত্বারো গুরবঃ। মৎস্যেন্দ্র ঈশ্বর চতুরঙ্গী, গোরক্ষ ইতি স্বরূপাঃ" বলা হইয়াছে।[২]

সাধারণতঃ পুত্রকে শিষ্যের অধিক প্রিয় বলা হয়, কিন্তু যোগ-সম্প্রদায়ে ইহার বিপরীত মত প্রচলিত। "যোগসম্প্রদায়ে শিষ্যোঽধিকো যো নাদাংশো জায়তে", কারণ নাথাংশই নাদ এবং নাদাংশ প্রাণ, শক্তি অংশ বিন্দু, বিন্দু অংশ সন্তান। যোগসম্প্রদায়ে বিন্দু হইতে জাত সন্তান বা বিন্দুসন্তান অপেক্ষা নাদ হইতে জাত সন্তান বা নাদসন্তান অর্থাৎ শিষ্য (যাহাকে নাদানুসন্ধানের দীক্ষা গুরু দান করিয়াছেন) প্রিয়তর (পৃ ৫৮)। নাথ হইতে দ্বিপ্রকার সৃষ্টি হয়, নাদরূপা ও বিন্দুরূপা, তন্মধ্যে নাদরূপা শিষ্যক্রমেণ বিন্দুরূপা চ পুত্রক্রমেণ। নাদ হইতে নবনাথের উৎপত্তি ও বিন্দু হইতে সদাশিব ভৈরবের জন্ম (পৃ ৭২, গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহ)।

তন্ত্রমতে পরমেশ্বর বা পরশিব গুরুপরম্পরায় মূল বা আদি। পরমেশ্বর স্বয়ং এক ভূমিকা গ্রহণ করিয়া গুরুপদবাচ্য হন, ভূমিকান্তর গ্রহণে শিষ্য হন। তাঁহার গুরুরূপই সদাশিবরূপ, শিষ্যরূপই ঈশ্বররূপ। ঐ উভয় রূপই শিবের স্বরূপ। তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশার্থে শিব এই

১। গো. সি স, পৃ ৪৩ ২। পরমহংসউপনিষদ উল্লেখ, গো. সি. স, পৃ ৫১

দ্বিবিধরূপ গ্রহণ করেন। ঈশ্বর বা পরমাত্মা (অপরশিব) সাড়েতিন ক্রোড় মন্ত্রের অধিপতি ও পঞ্চমন্ত্রাত্মক। তিনি পরমশিব হইতে যে মহাজ্ঞান প্রাপ্ত হন পরদ্রষ্টা হইতে অভিন্ন বলিয়া তাহা স্বরূপতঃ দৃষ্ট হয় না। ইহা ধ্বনিরূপ অর্থাৎ নাদবিমর্শময়, তথা অপ্রমেয় ও বিশ্বব্যাপক। ইহা অকারাদি কলাদ্বারা গ্রস্ত নহে। ঈশ্বর ঐ মহাজ্ঞানকে অনুগ্রহপ্রাপ্ত জীবের আশয় অনুসারে পৃথকরূপে গ্রথিত করেন। যাঁহারা সাক্ষাৎ ঈশ্বর হইতে অনুগ্রহপ্রাপ্ত হন তাঁহারা যথাক্রমে অষ্টবর্গে বিভক্ত মাতৃকামণ্ডল, সম্পূর্ণ মন্ত্রগণ ও অনন্তাদি মন্ত্রেশ্বর। ইঁহারা মায়ার উর্দ্ধে অবস্থিত। শ্রীকণ্ঠাদি অষ্ট কঞ্চুকবাসী রুদ্রগণ অনন্তের শিষ্য। তন্ত্রের উপদেষ্টা শঙ্কর শ্রীকণ্ঠের শিষ্য, উমা শঙ্কর হইতে বিশ্বোপরি অনুগ্রহ করিবার শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, উমার শিষ্যমধ্যে দিব্য, মিশ্র ও আদিব্য এই তিনপ্রকার গণ আছে, দিব্যগণে রুদ্র, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্রাদি দেবগণ আছেন, মিশ্রগণে প্রধানতঃ ঋষিগণ ও আদিব্যগণে মনুষ্য আছে।[১]

১। দীক্ষারহস্য (গুরুপরম্পরা), ম. ম গোপীনাথ কবিরাজ, কল্যাণ, পৃ ১২০৩, সাধনাঙ্ক ২য় খণ্ড।

দশম পরিচ্ছেদ

জরামৃত্যুর রহস্য এবং উহা হইতে অব্যাহতি

পাঞ্চভৌতিক দেহ জরামরণশীল, তথাপি মনুষ্য দীর্ঘজীবী হইবার আকাঙ্ক্ষা করে, অজরত্ব কামনা করে। সিদ্ধগণ কেবল অজরত্ব নহে, অমরত্বলাভেরও প্রয়াসী। কথিত আছে, স্বর্গের দেবতারা অমৃতপানে অমর হইতেন, নাথসিদ্ধরাও খেচরীমুদ্রাসাধন দ্বারা অমৃতপান করিয়া অজর অমর হইতেন। প্রাচীন অন্যান্য সম্প্রদায় মধ্যেও জরামৃত্যু জয়ের নিমিত্ত নানাপ্রকার সাধন ছিল, যথা রসেশ্বর সম্প্রদায় পারদের সহযোগে অজর হইতেন, পারদের নামান্তর রস, তাই তাঁহারা রসেশ্বর নামে পরিচিত ছিলেন। খৃষ্টধর্ম্মে বিশ্বাসীদের মধ্যেও পারদের ব্যবহার ছিল, চীনদেশেও দেহসাধনপ্রক্রিয়া প্রচলিত ছিল। ইঁহাদের সাধনপ্রণালীর সবিশেষ আলোচনা এই নিবন্ধের সাধনা অংশের 'কায়সিদ্ধি' অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

গোরক্ষসংহিতায় বায়বীমুদ্রা, অশ্বিনীমুদ্রা ইত্যাদি দ্বারা জরামৃত্যু নাশের উল্লেখ আছে—"ইয়ন্ত পরমা মুদ্রা জরামৃত্যুবিনাশিনী"; অন্যত্র "অকালমরণং হরেৎ"।[১]

মুখমণ্ডলকে বিস্তৃত করিয়া জিহ্বার মূলভাগকে প্রচালিত করিয়া ক্রমে শরীরস্থ অমৃত পান করিলে—

বলিতং পলিতং নৈব জায়তে নিত্যযৌবনং
ন কেশে জায়তে পাকো যঃ কুর্য্যান্নিত্যমাণ্ডূকীং ॥[২]

অন্যান্য মুদ্রা সাধন দ্বারাও উক্তরূপ ফললাভের বর্ণনা আছে, অতএব নাথসিদ্ধেরাও যে জরামৃত্যু হইতে অব্যাহতিলাভের জন্য সাধন করিতেন ইহা নিশ্চিত।

গোরক্ষরচিত 'হঠপ্রদীপিকা' গ্রন্থে আছে "অন্তর্লক্ষ্যবিলীনচিত্ত-পবনো যোগী যদা বর্ত্ততে দৃষ্ট্যা নিশ্চলতারয়া বহিরসৌ পশ্যন্নপশ্যত্যপি। মুদ্রেয়ং খলু শাম্ভবী ভবতি সা যুষ্মৎপ্রসাদাদ্ গুরোঃ শূন্যাশূন্য-বিবর্জ্জিতং স্ফুরতি যত্তত্ত্বং পদং শাম্ভবম্॥ অর্দ্ধোদ্ঘাটিতলোচনঃ স্থিরমনা

১। গোরক্ষসংহিতা ১।১২৮, ১৩২

২। ঐ ১।১৪৪ মাণ্ডুকী মুদ্রার ফলকথন।

নাসাগ্রদত্তেক্ষণঃ চন্দ্রার্কাবপি লীনতামুপনয়ন্নিস্পন্দভাবান্তরে। জ্যোতিরূপমশেষবাহ্যরহিতং দেদীপ্যমানং পরং তত্ত্বং তৎপদমেতি বস্তু পরমং বাচ্যং কিমত্রাধিকম্ ॥”[১] অর্থাৎ যোগী মনঃপ্রাণ বিলীন করিয়া, নিশ্চল নয়নে বাহ্যে দৃষ্টিপাত করিয়াও বিষয়গ্রহণ করে না, ইহাই শাম্ভবীমুদ্রা। এই মুদ্রা প্রাপ্ত হইলে যোগী অনির্ব্বচনীয় পদলাভ করে। নয়নদ্বয় অর্দ্ধউন্মীলিত করিয়া মনের স্থৈর্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক নাসাগ্রে দৃষ্টিস্থাপন করিয়া চন্দ্রসূর্য্য বিলীন করিবে, অর্থাৎ প্রাণ ব্যাপার স্তম্ভিত করিবে। এইরূপ করিলে জ্যোতির ন্যায় অখিলপ্রকাশক সর্ব্বকারণ দেদীপ্যমান, অর্থাৎ স্বপ্রকাশ স্বরূপের জ্ঞান হয়, যোগী স্বস্বরূপে অবস্থান করেন, অন্য বিশেষ বস্তুলাভ হয় ইহা বলা যায় না, ইতোঽধিক বক্তব্য নাই। এইরূপে পরমবস্তুর সন্ধান পাইয়া সেই আত্মসাক্ষাৎলাভমূলক দেহকে অজর অমর করিবার ইচ্ছা সাধকের মনে দেখা দেয়, তখন সাধক খেচরীমুদ্রা সাধন করেন, তাহার দ্বারা সর্ব্বপ্রকার বৃত্তিনিরোধ হয় এবং কদাচ মৃত্যু ঘটে না। ইড়াপিঙ্গলা নাড়ীর মধ্যে যে নিরালম্ব স্থল আছে অর্থাৎ শূন্য বা আকাশ স্থান আছে, সেই শূন্যস্থানে বা ব্যোমচক্রমধ্যে যে মুদ্রা আছে তাহারই নাম ‘খেচরী’-মুদ্রা। এই খেচরীমুদ্রা দ্বারা চন্দ্র হইতে অমৃত উদ্ভূত হয়। খেচরী মুদ্রা শিবের অতি প্রিয়। এই খেচরীমুদ্রা সর্ব্বনাড়ীপ্রধানা সুষুম্নাকে পশ্চিম মুখে পরিপূর্ণ করিয়া রাখে। খেচরীসাধনে চন্দ্রসূর্য্যের নিরোধ হেতু আয়ুক্ষয়কারক ‘কাল’ থাকে না।[২]

> ইড়াং চ পিঙ্গলাং বদ্ধা বাহয়েৎ পশ্চিমে পথি।
> অনেনৈব বিধানেন প্রয়াতি পবনো লয়ম্।
> ততো ন জায়তে মৃত্যুর্জ্জরারোগাদিকং তথা ॥
> বন্ধত্রয়মিদং শ্রেষ্ঠং মহাসিদ্ধৈশ্চ সেবিতম্ ॥[৩]

অর্থাৎ জালন্ধারবন্ধ, উড্ডীয়ানবন্ধ ও মূলবন্ধ এই ত্রিবিধ বন্ধ দ্বারা প্রাণবায়ুর লয় হয়। মূলস্থান বা আধারস্থান সম্যক্ আকুঞ্চিত করিয়া নাভির অধোভাগে পশ্চিম তানাখ্য বন্ধরূপ উড্ডীয়ানবন্ধ করিবে। অনন্তর ইড়াপিঙ্গলা বন্ধ করিয়া অর্থাৎ জালন্ধারবন্ধ দ্বারা সুষুম্নাতে প্রাণবায়ুকে

১। গো. সি. স. পৃ ৩৬, হ-যো-প্র ৪।৩৭, ৪১ তুলনীয়।

২। হ. যো. প্র., টীকা—৪।৪৪-৪৮

৩। হ. যো. প্র., ৩।৭৪—৭৬

প্রবাহিত করিবে। প্রাণ সুষুম্নাতে স্থির হইলে সাধকের শরীরে জরা কিম্বা কোনপ্রকার রোগ জন্মিতে পারে না, এবং তাহার মৃত্যু ঘটে না। মৎস্যেন্দ্রাদি মহাযোগিগণ ও বশিষ্ঠাদি মুনিগণ সকলেই উক্ত বন্ধত্রয়ের সেবা করিয়াছেন। হঠযোগসাধনে যতপ্রকার উপায় আছে তাহার মধ্যে উক্ত বন্ধত্রয়কে গোরক্ষাদি সিদ্ধিজনক মনে করেন। বিপরীত-করণীমুদ্রা দ্বারাও যোগীরা চন্দ্রামৃত পান করেন। নাভিদেশে যে সূর্য্য আছে তাহা চন্দ্রামৃত গ্রাস করে, তৎফলেই জরামৃত্যু হয়, এই মুদ্রা দ্বারা তাহা রোধ হয়।[১]

চন্দ্রের অমৃতকলা হইতে যে স্রাবের বর্ষণ হয় তাহা মধু অপেক্ষা মিষ্ট, তাহা পানে চিরযৌবনপ্রাপ্তি হয়। অমৃত কলাতে ষোড়শী নাম্নী শক্তি বিরাজ করেন, এই শক্তি সহস্রদল কমলের পরমাত্মার আত্মাস্বরূপ। সহস্রদল কমলে নিম্নে দুইটী কেন্দ্র আছে, একটীর নাম অমৃতকলা, অপরটীর নাম মৃত্যুকলা, একটী জীবনের পূর্ণিমাস্বরূপ, অন্যটী অমাবস্যাস্বরূপ। ষোড়শীশক্তি ষোড়শীকলা নামেও পরিচিত। পরাশক্তি বিমর্শরূপা, তাহার পঞ্চদশ কিরণ পঞ্চদশী শক্তিস্বরূপা। এই বিমর্শাখ্যা মহানিত্যা পরাশক্তি পঞ্চমহাভূত দ্বারা প্রকটিত। পঞ্চমহাভূতের পঞ্চদশ গুণ, আকাশের একগুণ শব্দ, বায়ুর দুইগুণ শব্দ ও স্পর্শ, তেজের তিনগুণ শব্দ স্পর্শ রূপ, জলের চারিগুণ শব্দ স্পর্শ রূপ রস, পৃথ্বীর পঞ্চগুণ শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ, সর্ব্বসমেত পঞ্চদশগুণ। ইহাদের পঞ্চদশ অধিষ্ঠাতৃ দেবতা আছে, ইহারাই পঞ্চদশ তিথিরূপে চন্দ্রের পঞ্চদশকলা, শুক্ল প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ইহাদের ক্রমশঃ বৃদ্ধি ও কৃষ্ণপক্ষে ক্রমশঃ ক্ষয় হয়। ষোড়শীকলা পরশিবাভিন্না মহানিত্যা সচ্চিদানন্দরূপিণী। ইহার বৃদ্ধি নাই, ক্ষয়ও নাই, ইহাই অমৃতকলা, মহাদেব ইহাকেই মস্তকে ধারণ করিয়া থাকেন। চন্দ্রের অমৃতকলা হইতে অমৃতস্রাব হইয়া ঔষধিরা প্রাপ্ত হয়, উহা ভোজনে মনুষ্যশরীর পুষ্ট হয়, ঔষধি দ্বারা দেবতারও যজ্ঞ হয়। চন্দ্রের পঞ্চদশতিথি, পঞ্চদশ নিত্যা নামে খ্যাত। ষোড়শীনিত্যার পূজা ত্রিকোণান্তর্গত মধ্যবিন্দুতে সাধিত হয়, এই নিত্যার নাম 'মহাত্রিপুরা-সুন্দরী'। এই ষোড়শীকলার উপর চন্দ্রের পঞ্চদশ কলার হ্রাসবৃদ্ধি নির্ভর করে।[২]

১। হ-যো-প্র ৩।৫২;৭৭ ২। কল্যাণ সাধনাঙ্ক ২য় খণ্ড পৃ ৮৫৭-৫৮ পঞ্চদশকলাত্মক পঞ্চদশ তিথিরূপী নিত্যা ও ষোড়শী বা অমৃতকলার বিচার"। প্রবন্ধ—শ্রীকৃষ্ণজী কাশীনাথ শাস্ত্রী।

এই ষোড়শীনিত্যার সহিত নাথসিদ্ধদের সম্বন্ধ ছিল বলিয়াই অনুমান হয়। কারণ কুণ্ডলিনীর জাগরণ নাথসিদ্ধদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। অমৃতকলার নিম্নমুখী সূত্র কুণ্ডলিনীতে আবদ্ধ থাকে, এই কুণ্ডলিনীর জাগরণে অমৃতকলার সন্ধান পাওয়া যায়। অমৃতকলার সন্ধানীর জীবনমৃত্যু তাহার স্ব-অধিকারে, কারণ অমৃতপানে সে দীর্ঘায়ু হয়, ও মৃত্যুকে দূরে রাখিতে সক্ষম হয়। মৃত্যুঞ্জয়ী যোগী জিহ্বাতল তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা ছিন্ন করিয়া কণ্ঠকূপ মধ্যে জিহ্বাকে প্রসারিত করিয়া ধ্যানস্থ হইয়া অমৃতপান করেন, ইহাই খেচরীমুদ্রা নামে খ্যাত।

ঘণ্টাকোটি কপোল কোটর কুটী জিহ্বাগ্রমধ্যাশ্রয়া
চচ্ছৃঙ্খীন্যা গত রাজদন্তবিবরং প্রান্তোর্দ্ধবক্ত্রে্ণ যৎ।

অর্থাৎ আলজিভ্‌প্রান্তে মুখবিবরে কুটিল জিহ্বাগ্র প্রবেশ করাইবে।[১] রাজদন্তান্তরে শঙ্খিনীমুখ আছে। রাজদন্তবিবর হইল Nasopharynx। মহাপুরুষলক্ষণ বিচার মধ্যে প্রভূতজিহ্বতা অর্থাৎ দীর্ঘজিহ্বা থাকা সুলক্ষণরূপে গণ্য হইয়াছে। (সাধনা অংশে গুরুতত্ত্ব ও সদ্‌গুরু মহিমা অধ্যায় দ্রষ্টব্য।)

সহস্রার-ক্ষরিত চন্দ্রামৃত ইড়াপিঙ্গলা ধারায় প্রবাহিত হইয়া মূলাধারে সূর্য্যে পতিত হইলে অমৃত গরলে পরিণত হয় তাই মানবের জরা ও বার্দ্ধক্য দেখা দেয়। কালজয়ী যোগী এই অমৃতকে গরলে পরিণত হইতে দেন না, স্বয়ং সেই অমৃত পান করিয়া জরা মৃত্যু হইতে অব্যাহতি লাভ করেন। দেহমধ্যে চন্দ্র ও সূর্য্য অমরত্ব ও বিনাশত্ব নির্ণয় করে, ইহারাই পুরুষ ও প্রকৃতির প্রতীক। দেহমধ্যস্থ ওজস্‌ই অমৃত, ইহা বিন্দু বা শুক্র, ইহার সংরক্ষণে অজর-অমরত্ব লাভ হয়, ইহার বিনাশে মানব মৃত্যুমুখী হয়। যোগী প্রাণায়ামাদি সাধন দ্বারা ইহা সংরক্ষণে যত্নবান হন। তাই সন্তকবি বলিয়াছেন—

গোরক্ষ সো জিন গোয় উঠালী করতী বার ন লাগে।
পানী পবন বন্ধি রাখে, চন্দ সুরজ মুখ দীয়ে॥[২]

অর্থাৎ তিনিই গোরখ যিনি গুপ্তধন আবিষ্কারে বিলম্ব করেন না, পবন ও বিন্দুকে যিনি বাঁধিয়া রাখেন এবং চন্দ্র ও সূর্য্যকে মিলিত করেন।

বাম নাসিকাবাহিত বায়ুকে চন্দ্রবাহিত, দক্ষিণ নাসিকাবাহিত

১। অমরৌঘ শাসনম্‌, ২য় শ্লোক। ২। বড়থ্‌বাল নির্গুণ সম্প্রদায়, পৃ ১৪০।

বায়ুকে সূর্য্যবাহিত এবং উভয় নাসিকা দ্বারা পর্য্যায়ক্রমে বাহিত বায়ুকে সুষুম্নাবাহিত বলে। পূরক, রেচক ও কুম্ভক দ্বারা প্রাণায়াম সাধনে কুণ্ডলিনী জাগরিতা হন। ব্রহ্মরন্ধ্রে কুণ্ডলিনী পৌঁছিলে উন্মনী অবস্থা হয়, অনাহত নাদ শ্রুত হয় এবং কালজয়ী অমৃতের ক্ষরণ হয়। বেদান্তীর ইহাই 'তুরীয় অবস্থা'। কবীরও বলিয়াছেন—

উলটি পবন চক্রষট্‌বেধা, মেরুডণ্ড রসপূরা।
গগন গরজি মন সুন্নি সমানা, বাজী অনহদ তূরা॥[১]

অর্থাৎ উল্টাপবন সাধন দ্বারা ষট্‌চক্রভেদ হইয়াছে, মেরুদণ্ড রসে পূর্ণ হইয়াছে, মন শূন্যে বিলীন হইয়াছে, গগনে গরজন হইতেছে, অনাহত নাদ ধ্বনিত হইতেছে।

যে মরজীবা অমৃত পীবা, কাধসিমরৈ পতাল।
গুরুকী দয়া সাধুকী সংগতি, নিকসিআউ যহিকাল॥[২]

অর্থাৎ মরণশীল জীব সংসারধর্ম্ম করিয়া পাতালে প্রবেশ করে, গুরুর দয়ায় ও সাধুসঙ্গে সে অমৃতপান করিয়া ইহজীবনেই সংসার হইতে মুক্ত হয়।

উল্টামার্গে বা মীনের মার্গে চলিয়া (কারণ মৎস্য নদীর গতির উল্টা দিকে চলে), ফুলকে আবার কলিতে পরিণত করার কথা অর্থাৎ বৃদ্ধের আবার তারুণ্যপ্রাপ্তির কথা গোরখবাণীতে (পৃঃ ৪০) দৃষ্ট হয়। উল্টামার্গে চলিলে চন্দ্র হইতে রসাস্বাদন সম্ভব হয়। গোরখনাথ আকাশমণ্ডলের রূপ গায় অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দভূতিকে দোহন করিয়া পান করে, নিঃসার বস্তুকে মন্থন করিয়া অমৃত পান করে এবং নির্ভয়ানন্দে জীবিত থাকে (ঐ পৃ ১১৩, শ্লোক ২১ আরম্ভ)।

গোরক্ষ বলেন দশমীদ্বারে (ব্রহ্মরন্ধ্রে) স্বর্গ ও মোক্ষপদ (শিবস্থান, কেদার) আছে (ঐ পৃ ১১০)। মৃত্যুকালে দেহমধ্যে বহির্মুখ নবদ্বারের একটী দ্বার দিয়া প্রাণ বহির্গত হয়, মৃত্যুর উত্তরকালীন গতিও ইহার উপর নির্ভর করে। ব্রহ্মরন্ধ্র বা দশমীদ্বার হইতে স্বাভাবিক নিষ্ক্রমণ হয় না, যোগী এই পথেই নির্গমের সাধনা করেন, কারণ তাহা হইলে পুনর্জ্জন্ম হয় না। ছিদ্রপূর্ণ কলসের ন্যায় নবদ্বার উন্মুক্ত রাখিয়া দশমীদুয়ার দিয়া বাহির হওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ হয়, তাই মুদ্রা দ্বারা বাহ্যদ্বার রুদ্ধ করিবার

১। কবীর গ্রন্থাবলী, পৃ ৯০, ৭, শ্যামসুন্দর দাস। উল্লেখ বাড়থ্বাল পৃ ১৪০ নির্গুণসম্প্রদায়।
২। কবীরের সাখী ৩০১ নং পৃ ৬৩৫, কবীরের 'বীজক', রেবা সংস্করণ

প্রণালী যোগীরা সাধনা দ্বারা লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনেও (পৃ ৩৫৯) শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা উক্ত হইয়াছে—

ইড়াপিঙ্গলা সুষুম্না সন্ধী।
মন পবন তাত কৈল বন্দী॥
দশমী দুয়ারে দিল কপাট।
এবে চড়িলো মো সে যোগবাট॥

বাহ্যদ্বার রুদ্ধ করিয়া যোগী সমাধিস্থ হইলে যে আবেশ ভাবের উদয় হয়, তাহাই দশমী দুয়ার বা দশ ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহার, তাহা দ্বারা বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয় ও সর্ব্ব দ্বারপথ রুদ্ধ হইয়া যায়। কুম্ভক দ্বারা সকল নাড়ী সুষুম্নাতে একীভূত হয় এবং বিভিন্ন নাড়ীতে সঞ্চরণশীল বায়ু সমরসীভূত হইয়া একমাত্র 'প্রাণ'রূপে পরিণত হয়, ইহাই 'নাড়ী-সামরস্য'। ইহার পর সুষুম্না নাড়ীকে ঊর্দ্ধস্রোতা ভাবনা দ্বারা গ্রন্থিসকলকে ঊর্দ্ধমুখী ও বিকশিত করিতে হয়; দেহস্থ গ্রন্থি বা পদ্ম সঙ্কোচবিকাশশীল।

বাহ্যজগতের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহার হইলে প্রাণেরও প্রত্যাহার স্বভাবতই হইয়া থাকে। ধ্যান, ধারণা, সমাধি দ্বারা মনের নিরোধ সাধিত হয়। এই নিরোধের স্থান হৃদয়ে। অন্তররাজ্যেও যাহাতে মন সঞ্চরণ করিতে না পারে তজ্জন্য মনের নিরোধ কর্ত্তব্য, নতুবা স্থৈর্য্যলাভ সম্ভব হয় না। মনোবহা নাড়ী দিয়া মন সঞ্চরণ করে, মনোবহা নাড়ীর শাখা-প্রশাখারূপ জালদ্বারা মানবদেহ গঠিত, বিভিন্ন নাড়ীর দ্বারা বিভিন্ন জ্ঞান হয়, যথা—শব্দজ্ঞান, রূপজ্ঞান ইত্যাদি। ব্যষ্টি দেহের ন্যায় ব্রহ্মাণ্ডের সূর্য্যমণ্ডলের বাহিরে একটী বায়ুমণ্ডল জালরূপে বিস্তৃত আছে। এক একটী নাড়ী এক একটী রশ্মি বিশেষ, এই রশ্মিপথে প্রাণ বা মন দেহান্তরস্থ লোকে এবং দেহের বাহিরেও সঞ্চরণ করেন। মন সূক্ষ্মপ্রাণ সাহায্যে পূর্ব্বসংস্কারানুযায়ী ভ্রমণ করে। ইন্দ্রিয়-পথে যে আত্মতেজ এতদিন বাহ্যজগতে বিস্তৃত হইয়া ছিল, ইন্দ্রিয়রোধে তাহারা উপসংহৃত হইয়া সংস্কাররাজ্যে ছড়াইয়া পড়ে, এই অবস্থায় বাহ্যস্মৃতি পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া যায়। প্রাণের বিভিন্ন ধারাকে ইড়া-পিঙ্গলার সহিত সুষুম্নার ভ্রূমধ্যে মিলনের দ্বারা একীভূত করা হয়। যোগিগণের পরিভাষায় ইহার নাম 'ঊর্দ্ধ ত্রিবেণীসঙ্গম'। (ইড়া-পিঙ্গলার নামান্তর 'বরুণা' ও 'অসি', তাই ইহাদের মিলনক্ষেত্র আজ্ঞাচক্রের নামান্তর 'বারাণসী'।) এদিকে মনও হৃদয় বা দহরাকাশে

স্থিরতালাভ করে। হৃদয়পুরী মধ্যে নির্ব্বাত প্রদেশে অচঞ্চল দীপশিখার ন্যায় মন দীপ্যমান হইয়া থাকে, ইহাই মনের নিরোধ। এই অবস্থার সহিত সুষুপ্তির ভেদ ইহাই, যে সুষুপ্তিতে প্রাণের কার্য্য রুদ্ধ থাকে না, কিন্তু ইহাতে প্রাণের কার্য্যও থাকে না, ইহা একপ্রকার শববৎ অবস্থা। মনকে শুদ্ধ করিয়া স্থায়িভাবে নিরুদ্ধ করা কর্ত্তব্য, ইহাই যোগসূত্রের অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। হৃদয় হইতে মনকে চেতন করিয়া ঊর্দ্ধ করিয়া ঊর্দ্ধমুখী সুষুম্নার ধারায় আরোপ করাই যোগীর সাধন। এই জাগ্রৎ মনই প্রবুদ্ধ কুণ্ডলিনীর মূর্ত্তিরূপে বর্ণিত হইতে পারে। হৃদয়মধ্যে অশুদ্ধমনের রোধ হয়, সুষুম্না পথে প্রাণের সহিত শুদ্ধমনের ঊর্দ্ধে মিলনের ফলে দিব্যজ্ঞানের উদয় হয়। মনের গতিনিরোধ হইলেও, তাহাতে যে স্পন্দনমাত্র থাকে, তাহা মনের স্বভাব। এই কম্পনের পর্য্যবসানে চৈতন্য সূর্য্যের সাক্ষাৎকার হয়, ইহা মনোভূমির অতীত। ইহাই আত্মা বা ব্রহ্ম, মন তাহার সহিত অভিন্নত্ব লাভ করিয়া বিমর্শরূপে বিরাজ করে, এই বিমর্শই শব্দব্রহ্ম বা ওঁকার। ইহার দ্বারাই মানবের ব্রহ্মবিদ্যালাভ হয়।[১] এই ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়া যোগী জরামৃত্যু হইতে অব্যাহতি লাভ করেন।

চিত্তের মলিন ভোগবাসনাই মানবের জন্মের কারণ। কর্ত্তৃত্বাভিমান লইয়া সকাম কর্ম্মসাধনেই বাসনার উদ্রেক হয় ও পূর্ব্ব সংস্কারসকল উদ্বুদ্ধ হইয়া তাহাদের পুষ্ট করে। তাই গীতায় নিষ্কাম কর্ম্মসাধনের উপদেশ রহিয়াছে। যে বাসনা প্রবলাকার ধারণ করে উহাই অন্তিমকালে মৃত্যুমুখী জীবের সম্মুখে জ্যোতির্ম্ময় হইয়া আবির্ভূত হয় এবং জীবকে তদনুরূপ নাড়ীমার্গ ও দ্বারপথে চালনা করিয়া দেহবিমুক্ত করে, জীবের মরণোত্তর গতিও তদ্রূপ হয়। গীতায় আছে (৮।৬)—

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥

মৃত্যুকালে যে যে দেবতাকে স্মরণ করে, সে তাহাকেই প্রাপ্ত হয়।

সুখ ও দুঃখই কর্ম্মের ভোগফল, মানব স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ দ্বারাই ইহলোকে ও পরলোকে কর্ম্মফল ভোগ করে। শুদ্ধকরণ শক্তিস্বরূপ যে লিঙ্গশরীর থাকে তাহা দ্বারা ভোগ নিষ্পন্ন হয় না। যতক্ষণ না এই করণ শক্তিস্বরূপ দেহ বিনিবৃত্ত হয়, ততক্ষণ দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। সুখ, দুঃখ

১। মৃত্যুবিজ্ঞান ও পরমপদ, ভারতবর্ষ, মাঘ ও ফাল্গুন—১৩৪১।

ও মোহ এই ত্রিপ্রকার বেদনা। কচিৎ সুখ হইলেও সংসার স্বভাবতঃ দুঃখকর, অতএব জরামরণাদিজনিত দুঃখও স্থূলাদি শরীরের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী। শরীরধারণে (যতক্ষণ না লিঙ্গশরীর বিনিবৃত্ত হয়) চেতনপুরুষ জরামরণকৃত দুঃখপ্রাপ্ত হয়, কারণ সংসার স্বভাবতঃ দুঃখকর।

তত্র জরামরণকৃতং দুঃখং প্রাপ্নোতি চেতনঃ পুরুষ।
লিঙ্গস্যাহবিনিবৃত্তেস্তস্মাদ্ দুঃখং স্বভাবেন॥

—সাংখ্যযোগ ৫৫ [1]

অতএব শরীরী মানব বারংবার জন্মমৃত্যুর দুঃখ হইতে ত্রাণলাভের নিমিত্ত সচেষ্ট। মরণোত্তর গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য মুমূর্ষুর সাত্ত্বিকভাব উদ্বুদ্ধ করিতে ঠাকুর-দেবতার নাম করিবার প্রথা আছে। তিব্বতে নানা কৃত্রিম উপায়ের দ্বারা মুমূর্ষু লামার সদ্‌গতির ব্যবস্থা করা হয়, ইহার বিশেষ বিবরণ তিব্বতী সাধনার মধ্যে পাওয়া যায়। ব্রহ্মরন্ধ্র দ্বারা নিষ্ক্রমণ ও নির্ব্বাণ-পদ প্রাপ্তিই লক্ষ্য।[2] এইরূপে জন্মমৃত্যুর হস্ত হইতে মুক্তিলাভ সম্ভব, ইহাই লামাদের বিশ্বাস।

গীতায় এই মৃত্যুবিজ্ঞানের সুন্দর পরিচয় আছে—

প্রয়াণকালে মনসাহচলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥[3]

অর্থাৎ প্রয়াণকালে ভক্তিযুক্তচিত্তে একাগ্রমনে যোগবলে ভ্রূযুগলমধ্যে সম্যক্‌রূপে প্রাণধারণপূর্ব্বক, যিনি (তাঁহাকে) স্মরণ করেন, তিনি সেই দিব্য পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হন। স্মরণের সহিত প্রাণ-মন কিরূপে নিরোধ করিতে হইবে তাহারও উপদেশ আছে—

সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্॥
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যবহারন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥[4]

অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার সংযত ও মন হৃদয়ে নিরুদ্ধ করিয়া ভ্রূযুগলের

১। সরল সাংখ্যযোগ, কাপিল মঠ প্রকাশিত, পৃ ১২০ ১ম সংস্করণ।
২। With Mystics and Magicians in Tibet, A. David Neel, pp. 29-32
৩। গীতা ৮।১০
৪। গীতা ৮।১২, ১৩ ও টীকা, উদ্বোধন কার্য্যালয়।

মধ্যে প্রাণ স্থাপন করতঃ আত্মযোগে অবস্থিত হইয়া ব্রহ্মের একাক্ষর নাম ওঁ উচ্চারণপূর্ব্বক আমাকে স্মরণ করিতে করিতে যিনি দেহত্যাগ করেন, তিনি মোক্ষ প্রাপ্ত হন।

ইহাই গীতার 'অক্ষর ব্রহ্মযোগ'। কি প্রকারে দেহত্যাগ করিলে সাক্ষাদ্‌ভাবে ভগবৎস্বরূপ লাভ করা যায় তাহা ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। অষ্টাঙ্গ যোগ, মন্ত্র, ভক্তি, জ্ঞান প্রভৃতি সাধনের সমন্বয় ইহাতে আছে। নাথযোগীদের সাধনেও সর্ব্বদ্বারেব সংযম, হৃদয়মধ্যে মনের নিরোধ ও তৎপরে ভ্রূমধ্যে মনের আজ্ঞাচক্রে প্রাণের সহিত মনের মিলন সাধন আছে। কুম্ভক সাহায্যে যোগী ঐশ্বর্য্যলাভ করেন। শ্রুতিতেও আছে রেচক-পূরক ত্যাগ করিয়া যে যোগী কুম্ভক করিয়া স্থিত থাকেন, যাঁহার প্রাণ-অপান নাভিমধ্যে সমতালাভ করে এবং যিনি 'হংস' 'হংস' জপরত, তাঁহার জরামরণ রোগাদি হয় না ও অণিমাদি সিদ্ধিলাভ হয়।

জরামরণরোগাদি ন তস্য ভুবি বিদ্যতে
এবং দিনে দিনে কুর্যাৎ অণিমাদিবিভূতয়ে ॥[১]

যাঁহার 'হংস'বিদ্যা নাই, তাঁহার নিত্যতাও নাই। এই হংস মন্ত্রই অজপা-জপ। মুদ্রাদি সাধনের সহিত যোগী 'হংস'মন্ত্র জপ করিয়া জরামরণের হস্ত হইতে অব্যাহতি পান।

হঠযোগপ্রণালী মতে চিত্ত সমত্বলাভ করিলে বিন্দুসিদ্ধি হয়, তৎফলে নিত্য ও শুদ্ধ সত্ত্ব এবং পিণ্ডৈশ্বর্য্য হয়। বিন্দু হইতেই দেহের বিকাশ, বিন্দু চঞ্চল থাকিলে জরামৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, স্থির হইলে কায়সিদ্ধি হয়। বৌদ্ধদের বজ্রকায়, সিদ্ধমার্গের সিদ্ধ বা দিব্যদেহ, পাতঞ্জলেব কায়সম্পৎ, রসেশ্বরের হরগৌরীতনু একই কথা। আধার পক্ব অর্থাৎ উপযুক্ত না হইলে বিরাট চৈতন্য ধারণ বা চৈতন্যের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন সম্ভব হয় না। জীবদেহ জরামৃত্যুর অধীন। ভর্ত্তৃহরি বাক্যপদীয়ে (১।৩) বলিয়াছেন যে, শব্দব্রহ্মের অব্যাহত নিত্যকলা কালশক্তির আশ্রয়ে ভাববিকারের প্রসব করে। কালশক্তির প্রভাব হইতেই প্রকৃতির বিকার হয়। কিন্তু পরিণামমাত্রই বিকার নহে। সাংখ্যের বিসদৃশ পরিণাম বিকার, সদৃশ পরিণাম বিকার পদবাচ্য নহে। যেখানে সদৃশ পরিণামেরও সম্ভাবনা নাই, তাহাই নির্ব্বিকার প্রকৃতি-স্থান। সাংখ্যমতে প্রবৃত্তির বিসদৃশ পরিণাম হইতেই সৃষ্টির উদ্ভব, সাংখ্যের

১। ব্রহ্মোপনিষৎ, ২৪ শ্লোক।

প্রকৃতি স্থিরবিন্দু নহেন, উহা বিন্দুত্রয় বা গুণত্রয়ের সমষ্টি। সাংখ্যের পুরুষ বিন্দুস্বরূপ, পুরুষ প্রকৃতির সহিত নিত্য মিলিত হইয়াও নিত্যমুক্ত। সাংখ্যের প্রকৃতিতে যে কম্পন, তাহা বিন্দুর স্পন্দন মাত্র, আগম মতে ইহা নাদের অন্তর্গত (নাদবিন্দুকলা অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। সৃষ্টি দ্বিপ্রকার, শুদ্ধ ও অশুদ্ধ ; সৃষ্টিতে প্রতিক্ষণে যে অবস্থান্তর হয়, তাহাই জরা। অশুদ্ধ অধ্বা অতীত হইলে বিন্দু স্থির হয়। শুদ্ধ অধ্বার স্থিতিকালে সদৃশ পরিণাম থাকে, ইহাতে যে 'মরণ' আছে, তাহা তিরোভাবমাত্র, জাগতিক মরণের সদৃশ নহে। অশুদ্ধ অধ্বায় জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত ছয় কোটি বিকার আছে। বস্তুতঃ শুদ্ধ অধ্বাতে দীর্ঘস্থিতির পর (তিরোভাব হয় সে অবস্থাই অজর-অমরত্বরূপে বর্ণিত হয়, ইহা কল্পান্ত বা যুগান্ত স্থিতিমাত্র। কালের গতির ঊর্দ্ধে অজরত্ব লাভ হয় ও কালের গতিরোধে জন্মমৃত্যু হইতে অব্যাহতি হয়।[১]

এইরূপে পাঞ্চভৌতিক দেহের জরামরণের রহস্য অবগত হইয়া অমরত্বলাভেচ্ছু যোগী সাধনা দ্বারা জরামৃত্যু হইতে অব্যাহতি লাভ রূপ লাবণ্যযুক্ত সিদ্ধদেহে শাশ্বত শান্তিতে বিরাজ করেন।

১। 'তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্ম' ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ, উত্তরা, কার্ত্তিক ১৩৩৪।

একাদশ পরিচ্ছেদ

দেহতত্ত্ব ও পিণ্ড-সংবেদন

পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের পরস্পর সম্বন্ধ

'দেহতত্ত্ব' শব্দটীর অর্থ শারীরবিদ্যা অর্থাৎ দেহ, আত্মা সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান। বিভিন্ন সাধকসম্প্রদায় বিভিন্ন দৃষ্টিভেদে দেহতত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন, পিণ্ড বা দেহকে আশ্রয় করিয়াই তাঁহারা এই সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। মধ্যযুগের সাধকদের মধ্যে এই পিণ্ডমধ্যে ব্রহ্মাণ্ডের কল্পনা করিয়া সাধন প্রচলিত ছিল। 'পিণ্ডসংবেদন' অর্থে পিণ্ডের বোধ অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের সহিত তাহার সম্বন্ধ অনুভব। প্রচলিত বাক্যেও আছে "যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে তা আছে এই দেহভাণ্ডে", অর্থাৎ এই ক্ষুদ্র দেহরূপ ভাণ্ডে যাহা কিছু আছে তাহা ব্রহ্মাণ্ডেরই প্রতীক, ততোধিক এ দেহে কিছু নাই। সিদ্ধসিদ্ধান্তসংগ্রহে উক্ত হইয়াছে—

ব্রহ্মাণ্ডবর্ত্তি যৎ কিঞ্চিৎ তৎ পিণ্ডেঽপ্যস্তি সর্ব্বথা।
ইতি নিশ্চয় এবাত্র পিণ্ডসংবিত্তিরুচ্যতে ॥[১]

সন্ত সুফী প্রভৃতির সাধন মধ্যেও পিণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডের কল্পনা আছে। সুফী সাধক আজিজ-ইবন-মহম্মদ-অল্ নসীফ তাঁহার গ্রন্থে যে পূর্ণাঙ্গ মানবের বর্ণনা দিয়াছেন, তাহার মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডের সকল অংশের তুলনা আছে, এই মানবের জন্যই সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টি।[২] সন্ত সম্প্রদায়ও মনুষ্য-দেহ ও ব্রহ্মাণ্ডী মনের দেশের তুলনা করিয়াছেন। পরে ইহা আলোচিত হইতেছে।

যোগমার্গের এই পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের সম্বন্ধ স্থাপনার জন্যই দেহতত্ত্ব ও পিণ্ডের উৎপত্তির বিষয় জানা কর্ত্তব্য। নাথসিদ্ধেরা বলেন—"নাথাংশো নাদো, নাদাংশঃ প্রাণঃ, শক্ত্যংশো বিন্দুর্বিন্দোরংশঃ শরীরম্"।[৩] বিন্দুর দুই দিক—বিশ্বসৃষ্টির যে দিক তাহাই বিন্দুর প্রসর, তাহাই 'শক্ত্যংশে' পরিণাম লাভ করে, এবং অন্য দিক 'শিবাংশ' তাহা সাক্ষী বা দ্রষ্টামাত্র হইয়া থাকে। দ্রষ্টা অপরিণামী ও এক, কিন্তু শক্তি স্তরানুসারে

১। সি. সি. স. ৩।২

২। Oriental Mysticism, Palmer, Introduction by Arbery.

৩। গো. সি. স. পৃ ৫৮

প্রসারিত হইতে থাকে। শক্তির প্রসর ও সঙ্কোচ আছে, শিবের নাই। শক্তির প্রসরে সৃষ্টি, সঙ্কোচে সংহার। প্রসর ও সঙ্কোচের আদি ও অন্তে সাম্যাবস্থা, মধ্যে কালচক্রের আবর্ত্তন, তাহাই বৈষম্য, কিন্তু তন্মধ্যেও সাম্যাবস্থা নিহিত আছে।

সৃষ্টি ও সংহার নিরন্তর চলিতেছে, বিন্দুর স্পন্দনে সৃষ্টির বিকাশ। স্পন্দনই একমাত্র ক্রিয়াশক্তি, ইচ্ছাশক্তিই সেই স্পন্দনের কারণ। জলে নিক্ষিপ্ত লোষ্ট্রের ন্যায় বিন্দু ক্রমবর্দ্ধমান মণ্ডল রচনা করে, কিন্তু সেই মণ্ডলেরও সীমা আছে। সমগ্র জগৎ একমাত্র বিন্দুকে আশ্রয় করিয়া প্রদক্ষিণ করিতেছে, কিন্তু বিন্দু অপরিবর্ত্তনশীল উদাসীন দ্রষ্টামাত্র। নাদবিন্দুকলা অধ্যায়ে ইহার সবিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে (সাধনা অংশ দ্রষ্টব্য)। এখানে সংক্ষেপতঃ কয়েকটী কথা বলা যাইতেছে। বিন্দুরূপা সাম্যশক্তি স্পন্দনের দ্বারাই ত্রিধা বিভক্ত হইয়া তিনটী স্বতন্ত্র বিন্দুরূপে পরিণত হইয়া তিনটী মণ্ডলের সৃষ্টি করে। সাম্যাবস্থায় এই ত্রিবিন্দু ও মূল বিন্দু অভিন্ন, কিন্তু বৈষম্যকালে উহারা পৃথক্‌ভাবে প্রকাশিত হয়। তথাপি সাক্ষীর সহিত অভেদভাবাপন্ন যে তুরীয় বিন্দু বা আদিবিন্দু তাহা অবিকৃত থাকে। বিন্দু স্পন্দিত হইয়া চতুর্দ্দিকে বৃত্তাকারে প্রসারিত হইয়া মণ্ডলের সৃষ্টি করে। প্রথম মণ্ডল 'সহস্রার', ইহা সহস্ররশ্মির জ্যোতির্ম্ময় সত্ত্বরাজ্য, ইহার কেন্দ্র 'ব্রহ্মবিন্দু' নামে পরিচিত। ইহার বাহিরে 'তটস্থ' মণ্ডল, ইহার কেন্দ্র 'রজঃ' নামক দ্বিতীয় বিন্দু। তটস্থের বাহিরে অন্ধকারময় তৃতীয় মণ্ডল বা 'মায়া' মণ্ডল। ইহার বিন্দু 'তমঃ' বা তৃতীয় বিন্দু।

এই তিনটী মণ্ডলের সহিত দেহস্থ চক্রের সম্বন্ধ আছে। প্রথম মণ্ডলই মস্তকোর্দ্ধের 'সহস্রারচক্র', এস্থলে চৈতন্যসত্ত্বার অনুভূতি হয়, তাই ইহাকে ব্রহ্মলোক, জ্যোতির্ম্ময়লোক প্রভৃতি বলা হয়। দ্বিতীয় মণ্ডল বা তটস্থ বিন্দু হইতে যে মণ্ডলের বিকাশ হয় তাহার নাম 'আজ্ঞাচক্র', ইহা ভ্রূদ্বয় মধ্যে এবং সহস্রারের নিম্নে অবস্থিত। তৃতীয় মণ্ডল বা 'মূলাধার' সর্ব্বনিম্ন চক্র এবং ঘোর অন্ধকারের কেন্দ্রস্থল। বৈষ্ণবেরা এই মায়ামণ্ডলকে 'বহিরঙ্গ' বলিয়াছেন, এই মূলাধার বিন্দু হইতে বহির্গত হইয়া জীব স্থূল পঞ্চীকৃত আবরণে বেষ্টিত হইয়া পড়ে। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অতীত অনাগত ভবিষ্যৎ স্থূলবস্তুর 'বীজ' এই স্তরে চিরবর্ত্তমান।

দ্রষ্টা বা সাক্ষীর দৃষ্টিক্ষেত্র আকাশ, প্রথম বা সত্ত্ববিন্দুর প্রসারক্ষেত্র চিদাকাশ, দ্বিতীয় বা রজোবিন্দুর প্রসারক্ষেত্র চিত্তাকাশ (ইহার মধ্যে খদ্যোতের ন্যায় কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড ভাসমান রহিয়াছে), তৃতীয় বা তমোবিন্দুর প্রসারক্ষেত্র ভূতাকাশ। এই ভূতাকাশ পঞ্চভাগে বিভক্ত বলিয়া ইহার বিন্দু ব্যাকৃত অবস্থায় পঞ্চবিন্দুরূপে বিভক্ত হইয়া প্রসরফলে পঞ্চমণ্ডলরূপে পরিণত হয়, এই পঞ্চমণ্ডলই বিশুদ্ধাদি পঞ্চচক্র। তটস্থ মণ্ডলের নাম আজ্ঞাচক্র, সত্ত্বমণ্ডলের নাম সহস্রারচক্র তাহা ইতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তমোমণ্ডলের মূলাধার চক্র বা সর্ব্বনিম্ন চক্রই ঘোর অন্ধকারময়।

মানবদেহ বা পিণ্ডের উৎপত্তি এই মূলাধারবিন্দু হইতে। স্থূল-জগতের জীব এই স্তরেই গঠিত হইয়া অবস্থিত থাকে। মহাপ্রলয়ের সময়ে এই পঞ্চীকৃত স্তর স্বভাবের নিয়মে অপঞ্চীকৃত হইয়া পঞ্চভাগে বিভক্ত হয় এবং বিশুদ্ধাদি পঞ্চচক্রে বিলীন হইয়া যায়। ইহাই প্রসর অন্তে সঙ্কোচশক্তির উন্মেষ অবস্থা। পঞ্চচক্র ক্রমশঃ পঞ্চবিন্দু ও পঞ্চবিন্দু ক্রমশঃ উপসংহৃত হইয়া একবিন্দুতে বা সাম্যাবস্থায় পরিণত হয়।

সাম্যাবস্থা হইতে স্তরানুসারে কিরূপে ষট্‌পিণ্ডের আবির্ভাব হইয়াছে নাথমার্গের সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতি প্রভৃতি গ্রন্থে তাহার বর্ণনা আছে। পিণ্ডতত্ত্ব ও পিণ্ডাধার অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচিত হওয়ায়, এখানে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। মাতৃকুক্ষিতে জীব যে দেহ লইয়া জন্মগ্রহণ করে তাহার নাম গর্ভপিণ্ড। অব্যক্ত অনামা হইতে প্রসরের দ্বারা ষট্‌পিণ্ডের আবির্ভাব বর্ণিত হইয়াছে।[১] নাথগণ স্থূলতম প্রকাশ হইতে নিজেকে সংবৃত করিয়া স্পন্দাত্মিকা শক্তিকুণ্ডলিনীর সহায়ে মূলাধারচক্র হইতে বিপরীত মার্গে গমন করিয়া শিবস্থান বা ব্রহ্মস্থান লাভ করেন। নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে পর পর যে ক্রমে সৃষ্টির বিকাশ হইয়াছে, সেই সমস্ত তত্ত্ব সহস্রদলের মহাশূন্য হইতে ক্রমশঃ নিম্নদিকে মেরুদণ্ডের মধ্যবর্ত্তী স্নায়বীয় কেন্দ্রসকলে যোগীর ধ্যানগোচর হয়। যোগী স্বীয় দেহে মস্তকের শূন্যস্থান হইতে মেরুর অধোভাগ পর্য্যন্ত ষট্‌চক্রের তত্ত্বের ধারণা করিয়া তত্ত্বোর্দ্ধে স্থিত সূক্ষ্মতত্ত্বের ধারণার অধিকারী হন। বিপরীতক্রমে বা লয়ক্রমে যোগী সাধনা করিয়া

১। সি. সি. প. ও সি. সি. স. প্রথমোপদেশ দ্রষ্টব্য, 'ষট্‌পিণ্ডের আবির্ভাব'।

থাকেন। সৃষ্টিরূপা কুণ্ডলিনী স্থূল ও সূক্ষ্ম দ্বিবিধরূপে অবস্থিত।[১] জীবকে সেই সূক্ষ্মশক্তি উপলব্ধি করিতে হইলে সাধনা করিতে হয়। এই সাধনায় পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের সম্বন্ধের জ্ঞান অত্যাবশ্যক বিবেচিত হয়।

স্থূলাবরণে বেষ্টিত জীব তিনটী আবরণ দ্বারা আচ্ছাদিত, বাসনা বা সংস্কার, অভিমান বা কর্ত্তৃত্ববোধ, এবং কামনা বা ফলাকাঙ্ক্ষা। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়াদি যুক্ত হইয়া জীবকে স্বধামে প্রত্যাবৃত্ত হইতে দেয় না, তাহার আবরণ তিনটীই তাহার প্রতিবন্ধকস্বরূপ হয়। ভূতশুদ্ধি প্রভৃতির দ্বারা পঞ্চভূতের শুদ্ধতা ও জ্ঞানচক্ষুর উন্মেষ বুঝায়—ইহাই জীবের শুদ্ধ অবস্থা। জীবমাত্রই জ্ঞান, আনন্দ ও অমরত্ব প্রার্থী, এককথায় জীব 'ব্রাহ্মীস্থিতি' কামনা করে। জীবের স্থূলাবরণ ক্ষণিকের জন্য দূর হইলেও সে সুষুম্নামার্গে প্রবেশের পথ পায়, তখন পঞ্চভূত শুদ্ধ হইয়া পঞ্চবিন্দু এক বিন্দুতে পরিণত হয় এবং তৎপরে চিত্তশুদ্ধি দ্বারা সেই এক বিন্দুই নির্ম্মল হইয়া তৃতীয় ক্ষেত্রের বিকাশ করে। তৎপরে ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিয়া অগ্রসর হওয়াই জীবের সাধনা, ইহাই উপাসনা। উপাসনা দ্বারা আজ্ঞাস্থ বিন্দু ও সহস্রারের মহাবিন্দুর ভেদাংশ বিগলিত হইয়া যে অভেদ প্রতিষ্ঠা হয় তাহাই ব্রহ্মজ্ঞান-লাভ, ইহার পর ত্রিগুণাতীত পরম সাম্যাবস্থা বা ব্রহ্মত্ব।[২] এই সাম্যাবস্থা তত্ত্বাতীত অবস্থা, ইহাই নাথ-মার্গের 'নাথস্বরূপ', ইহা লাভই যোগীর কাম্য। শ্রুতিতে আছে জীবদেহ পঞ্চভূতের উপাদানে গঠিত, ইহা পঞ্চভূতের স্থূল পঞ্চীকরণ বা মিশ্রণ মাত্র। ইহা বিভিন্ন ইন্দ্রিয়, পঞ্চবায়ু, মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কারকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, ইহাই স্থূল প্রকৃতি বা বিশ্ব। ইহা জাগ্রৎ অবস্থা। স্বপ্নাবস্থায় সূক্ষ্ম দেহে তৈজসের আবির্ভাব হয়, ইহাই লিঙ্গ-শরীর এবং গুণত্রয়যুক্ত কারণশরীর। সুষুপ্তি অবস্থায় 'প্রজ্ঞা'ই ইহার অধিপতি। "সর্ব্বেষামেবং ত্রীণি শরীরাণি বর্ত্তন্তে।" জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয় এই চারি অবস্থায় বিশ্ব, তৈজস, প্রজ্ঞা ও আত্মাই অধিপতি। বিশ্ব স্থূলকে ভোগ করে, তৈজস বিবিক্ত দশা ভোগ করে, প্রজ্ঞা আনন্দ ভোগ করে, তৎপরবর্ত্তী যিনি তিনি সর্ব্বসাক্ষিস্বরূপ 'আত্মা'। প্রণব বা তুরীয় সর্ব্ব জীবের অর্থাৎ বিশ্ব প্রভৃতি যত রূপ, স্থূল

১। সি. সি. প. ৪।২৩

২। কুণ্ডলিনীতত্ত্ব, ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ, বঙ্গসাহিত্য, ১ম বর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ ৫৮৯।

প্রভৃতি যত দেহ এবং জাগ্রৎ প্রভৃতি যত অবস্থা আছে, সকলের সাক্ষিরূপে নির্লিপ্ত হইয়া বর্ত্তমান থাকে।[১]

জীব প্রাণ অপানের বশীভূত, জীব সর্ব্বদা 'হংস'মন্ত্র জপ করে, এই অজপা জপই মোক্ষপ্রদ; "অনয়া সদৃশী বিদ্যা, অনয়া সদৃশো জপঃ, অনয়া সদৃশং জ্ঞানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি"।[২] কুণ্ডলিনী বিদ্যাই প্রাণ-ধারিণী মহাবিদ্যা, জীবের মুক্তি ইহার জ্ঞানে। কুণ্ডলিনীতত্ত্বের সহিত দেহতত্ত্বের কেবল দেহ নহে, জগতের যাবতীয় তত্ত্বেরই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান। কুণ্ডলিনীশক্তি যাবতীয় পদার্থকে আশ্রয় করিয়া মূলসত্তারূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তাই ইহার চৈতন্য সম্পাদনে 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'জ্ঞান হয়, এই পূর্ণ জাগরণই তন্ত্রশাস্ত্রে 'পূর্ণহন্তা'রূপে খ্যাত। কুণ্ডলিনীর জাগরণ হইলে জীবকে 'ব্রাহ্মীস্থিতি' লাভের জন্য ভিন্ন প্রয়াস করিতে হয় না, ইহা স্বতঃই সম্পাদিত হইয়া থাকে। কুণ্ডলিনী চৈতন্যের সঙ্গে সঙ্গে ইড়াপিঙ্গলা-বাহিত বায়ু সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হইয়া সুষুম্নারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া সূক্ষ্মতর অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এইরূপে জীবশক্তি স্থূলতা পরিহার করিয়া বজ্রা ও চিত্রিণী নাড়ী ভেদ করিয়া অবশেষে ব্রহ্মনাড়ীতে গমন করে,—ইহাই আনন্দময় কোষ, তদুপরি সাম্যাবস্থা।

রসেশ্বরদর্শনে পৃথ্বী অপ্ তেজ বায়ু আকাশ নির্ম্মিত দেহকে স্থূলদেহ এবং বিজ্ঞানময়, মনোময় ও প্রাণময় কোষত্রয় দ্বারা মিলিত দেহকে সূক্ষ্ম-শরীর বলা হইয়াছে। যিনি মুক্ত পুরুষ তাঁহার শরীর অব্যক্ত বা 'হরগৌরীসৃষ্টিজাং তনুং'—এইরূপ সিদ্ধেরা "খণ্ডয়িত্বা কালদণ্ডং ত্রিলোক্যাং বিচরন্তি তে"।[৩] স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ দেহ অশুদ্ধ দেহ, মহাকারণ দেহ শুদ্ধদেহ, কৈবল্য দেহ চিৎতত্ত্বাত্মক ও সন্তদের 'হংস-দেহ' সগুণ-নির্গুণের অতীত। বেদান্ত বলেন "শরীরং ত্রিবিধম্ স্থূলসূক্ষ্মকারণ-ভেদাদিত্যর্থঃ"।[৪] কাশ্মীর শৈবাগমে মহাকারণ দেহ বা 'বৈন্দব দেহের' বর্ণনা আছে, দত্তাত্রেয় সম্প্রদায়েও ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু নাথমার্গে ইহার স্পষ্ট উল্লেখ নাই। অতএব স্থূল সূক্ষ্ম কারণ দেহের মাত্র বিচার কর্ত্তব্য।

১। যোগচূড়ামণি উপ. ৭২, ৭৩ শ্লোক

২। ঐ ৩১-৩৫ ঐ।

৩। রসহৃদয় তন্ত্র, ১।৭ টীকা

৪। বেদান্তসংজ্ঞাপ্রকরণম্, শ্লোক ৭, আদিত্যপুরী বিরচিত।

নাথসিদ্ধরা স্থূল সূক্ষ্ম কারণ দেহকে শুদ্ধ করিয়া 'প্রণবতনু' বা ওঁকারদেহলাভে সচেষ্ট হইতেন। প্রণবতনু চন্দ্রামৃত পানে অজর হইত। এইরূপ যোগীই জীবন্মুক্ত বিবেচিত হইতেন। মাহেশ্বর সিদ্ধদের মধ্যে প্রণবতনুকে জ্ঞানতনুতে পর্য্যবসিত করিয়া স্বদেহে অন্তর্হিত হইবার বৃত্তান্ত আছে। নাথদের সিদ্ধদেহ, মাহেশ্বরদের দিব্যদেহ বস্তুতঃ একই দেহের বিভিন্ন স্তর মাত্র, প্রথমে বিন্দুতে স্থিতির দ্বারা সিদ্ধদেহ হয়, ইহা একটীমাত্র সত্তা বা integral part, তৎপরে উহার প্রসার বা বৃদ্ধির দ্বারা দিব্যদেহ লাভ হয়, এই বৃদ্ধি তেজেরই বৃদ্ধি, শরীরের নহে। নাথমার্গের সিদ্ধদেহ সম্ভবতঃ অন্য মার্গের দিব্যদেহের অনুরূপ, মতান্তরে ইহা বৈন্দব দেহ।

শঙ্করের মতে আত্মার তিনটী উপাধি—স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর। স্থূল শরীর পঞ্চ মহাভূতের দ্বারা গঠিত ভোগায়তন দেহ, সূক্ষ্ম শরীর সপ্তদশ অবয়ব বিশিষ্ট, ইহাই লিঙ্গশরীর। অতঃপর কারণ শরীব, তাহা সৎও নহে, অসৎও নহে, অনির্ব্বচনীয়স্বরূপ ও অনাদি। আত্মা এই উপাধিত্রয়—স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ—হইতে পৃথক।[১] স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ দেহ আশ্রয় করিয়া জীব লোক হইতে লোকান্তরে আবর্ত্তিত হইতেছে। জন্ম অর্থেই জগতের কোন লোকে দেহধারণপূর্ব্বক আবির্ভাব, মৃত্যু অর্থে পূর্ব্বধৃত দেহ ত্যাগপূর্ব্বক দেহান্তর গ্রহণ; এই জন্মমৃত্যুর মধ্যে জীব অনাদিকাল হইতে দোলায়মান রহিয়াছে। স্থূল শরীর সর্ব্ববাহ্য ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, সূক্ষ্ম শরীরকে অবলম্বন করিয়া ইহার উৎপত্তি। স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় দেহের বীজভূত অবিদ্যাশক্তিই জীবের 'কারণ'শরীর, মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ইহার বিনাশ নাই। কারণশরীরের প্রথম পরিণাম সূক্ষ্ম বা লিঙ্গশরীর; সাংখ্য লিঙ্গশরীরের কথা বলেন। ইহা বুদ্ধি, মন ও অহঙ্কারযুক্ত, দশ ইন্দ্রিয় ইহার দ্বারস্বরূপ, ইহা অনাশ্রয়ে থাকিতে পারে না বলিয়া স্থূল বা সূক্ষ্ম শরীর আশ্রয় করিয়া থাকে।

চিত্রং যথাশ্রয়মৃতে স্থাণ্বাদিভ্যো বিনা যথাচ্ছায়া।
তদ্বদ্বিনা বিশেষৈ র্ন তিষ্ঠতি নিরাশ্রয়ং লিঙ্গম্॥[২]

বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মনকে অন্তঃকরণ আখ্যা দেওয়া হয়, নাথগণ চিত্ত ও চৈতন্যকেও অন্তঃকরণ মধ্যে গণনা করেন, কারণ প্রকৃতিপিণ্ডের

১। আত্মবোধঃ, শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য প্রণীত ১১-১৩ শ্লোক।
২। সাংখ্যকারিকা, ৪১ সূত্র।

অন্তঃকরণপঞ্চক—মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত ও চৈতন্য।[১] লিঙ্গশরীর পঞ্চ অন্তঃকরণ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্রের সমবায়ে নির্ম্মিত।

বুদ্ধি জীবের গ্রহীতৃরূপ, মন ও অহঙ্কার ইন্দ্রিয়ার্পিত বিষয়বুদ্ধির সমীপে নীত করিলে জ্ঞান হয়, কারণ বুদ্ধি সত্ত্বপ্রধান। বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া অহঙ্কার উদ্ভূত; মন উভয়াত্মক—আন্তর ও বাহ্য। অন্তঃকরণের যে বিষয়জ্ঞান হয় তাহার আভ্যন্তর পরিণামই 'বৃত্তি', ইহাদের সমষ্টির নাম 'চিত্ত'। বিজানন চিন্তা, স্মরণ চিত্তের প্রধান ক্রিয়া অর্থাৎ সঙ্কল্প কল্পনাদি। চিত্তের বাহ্য ও আন্তর বিষয় আছে। চৈতন্য সম্বন্ধে নাথগণ বিমর্ষ, হর্ষ, ধৈর্য্য, চিন্তন ও নিস্পৃহত্বরূপ পঞ্চগুণের কথা বলেন। এগুলি চিত্তেরই এক প্রকার অবস্থাবৃত্তি।

সূক্ষ্ম শরীরের উপাদান পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় করণশক্তি। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের শক্তিসকলও সূক্ষ্ম শরীরের অঙ্গীভূত। পঞ্চপ্রাণ তৃতীয় প্রকার বাহ্যকরণ, কর্ম্মেন্দ্রিয় জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ন্যায় প্রাণও অস্মিতাত্মক, "আত্মন এষ প্রাণো জায়তে।"[২] পঞ্চ প্রাণশক্তি হইতেই দেহধারণ সিদ্ধ হয়। "অহং পঞ্চধাত্মানং বিভজ্যৈতদ্ বাণমবষ্টভ্য বিধারয়ামি।"[৩] অর্থাৎ আমি (প্রাণ) আপনাকে পঞ্চধা বিভক্ত করিয়া এই কার্য্যকরণ সমষ্টিকে সুদৃঢ় করিয়া শরীর ধারণ করি। প্রাণবৃত্তি ত্যাগে জীবের মৃত্যু হয়।

অন্তঃকরণের প্রখ্যা প্রবৃত্তি ও স্থিতি (সংস্কাব) রূপ মূল তিনটী বৃত্তি হইতেই দশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ প্রাণের উৎপত্তি। পঞ্চপ্রাণ মধ্যে উদানের কার্য্য মর্ম্মস্থান সকল শরীর ধাতুগত বোধাধিষ্ঠান ধারণ, মেরুদণ্ডের মধ্যগত উর্দ্ধস্রোতস্বিনী সুষুম্না নাডী আন্তরবোধের মুখ্যস্রোত, উদান জয় হইলে শরীর লঘু হয় এবং ইচ্ছামৃত্যু ক্ষমতা জন্মে।[৪] প্রাণশক্তিকে আশ্রয় করিয়া জীবের জীবত্ব, শ্বাসপ্রশ্বাস দ্বারা প্রাণের ক্রিয়া লক্ষিত হয়। প্রাণশক্তির সংযমনে শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিসংযমন কর্ত্তব্য, তাহা দ্বারা চিৎশক্তির উদ্বোধন হয়, তাহাই কুণ্ডলিনীর উদ্বোধন, ইহার জাগরণে জীব পাশমুক্ত হয়।

লিঙ্গশরীর সংস্কারাধার, স্থূলশরীর সহায়ে লিঙ্গশরীরের ভোগ সিদ্ধ হয়। বিষয়যুক্ত ইন্দ্রিয় উত্তিক্ত হইলে মনের দ্বারা তাহা জানা যায়, মন তাহা অহঙ্কারের নিকট উপস্থাপিত করে এবং বুদ্ধি তাহার ইষ্টানিষ্ট-

---

১। সি সি. স. ১।৪১
২। প্রশ্ন উপ. ৩।৩
৩। প্রশ্ন উপ ২।৩
৪। যোগসূত্র ৩।৩৯

রূপ অবধারণ করে, তাহার দ্বারাই জীবের ভোগ সিদ্ধ হয়। অন্তঃকরণ দ্বারা সিদ্ধ কর্ম্মের সংস্কার লিঙ্গশরীরে আহিত থাকে। তাই ভোগায়তন দেহ স্থূলরূপে প্রকাশিত হয় এবং ভোগের বাসনা ক্ষয় হইলে স্থূল শরীরই মোক্ষসাধনের উপায়ভূত হয়, অতএব ভোগ ও মোক্ষ উভয়ের সাধনের নিমিত্ত স্থূলশরীরের আবশ্যক; নাথসিদ্ধগণ ইহার উপলব্ধি করিয়াই বলিয়াছেন, "একহস্তে ধৃতস্ত্যাগো ভোগশ্চৈককরে স্বয়ম্" ইত্যাদি।[১] জীবের জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি অবস্থার অবসানে তুরীয় ও তৎপরে তুরীয়াতীত অবস্থা প্রাপ্তি হয়। জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি অবস্থাই তাহার সংসারাবস্থা—

এষ প্রমাতা মায়ান্ধঃ সংসারী কর্ম্মবন্ধনঃ।
বিদ্যাভি র্জ্ঞাপিতৈশ্বর্য্যশ্চিদকণা মুক্ত উচ্যতে ॥[২]

অর্থাৎ জীবরূপী প্রমাতা মায়ান্ধ ও কর্ম্মের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সংসারেব দেহ হইতে দেহান্তরে বিচরণ করে। কিন্তু বিদ্যা (যোগবিদ্যা) দ্বারা যখন আপন ঐশ্বর্য্য বিজ্ঞাপিত হয়, তখনই মুক্ত হয়, তাহাই তাহার চিদ্‌ঘনাবস্থা।

জাগ্রৎ অবস্থায় জীব 'স্থূলভুক্', তখন জীবেব চৈতন্য স্থূল জড়-দেহাশ্রয়ী। স্বপ্নাবস্থায় জীব 'প্রবিবিক্তভুক্' অর্থাৎ চিত্তে যে সংস্কাররূপ ছায়া পড়ে তাহা অবহিতরূপে ভোগ করে, এই অবস্থায় জীবচৈতন্য সূক্ষ্ম-শরীরাশ্রয়ী হইয়া থাকে। সুষুপ্তি অবস্থায় মাত্র অস্ফুট আনন্দভাব থাকে, জীব তখন 'আনন্দভুক্', জীবচৈতন্য তখন কারণশরীরাশ্রয়ী হইয়া থাকে। এই তিন অবস্থাই শরীরের সহিত যুক্ত, তদুপরি যে তুরীয় অবস্থা তাহাই আত্মার স্বরূপ অবস্থা, এই অবস্থা দেহাদিবোধ-ভাবশূন্য। তুরীয়ের পরিপক্ক অবস্থা 'তুরীয়াতীত'। অভিনব গুপ্ত তুরীয় ও তুরীয়াতীতের সংজ্ঞা ঈশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞা-বিমর্শিনীতে (৩।২।১২) নির্ণয় করিয়াছেন।

ইহাই জীবের স্থূল সূক্ষ্ম কারণ দেহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং জাগ্রৎ স্বপ্ন অবস্থার পরিচয়। কিন্তু আত্মা এই স্থূল সূক্ষ্ম কারণ উপাধিত্রয় হইতে ভিন্ন।

গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহে 'নবনাথে'র উৎপত্তি নাদ হইতে, বিন্দু হইতে সদাশিবাদি অষ্টভৈরবের উৎপত্তি কল্পিত হইয়াছে। নবনাথের পর

১। গো. সি. স. পৃ ১।
২। ঈশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞা-বিমর্শিনী, অভিনব গুপ্ত ৩ আঃ ২ আঃ ২ কাঃ।

দ্বাদশ সিদ্ধা, ৮৪ সিদ্ধা, দ্বাদশ পন্থা, অনন্ত সিদ্ধা প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছে। আবার নাদ বা শব্দসৃষ্টি দ্বিপ্রকার, স্থূল ও সূক্ষ্ম। সূক্ষ্মারূপাই 'প্রণব' মহাগায়ত্রী যোগশাস্ত্র, স্থূলরূপা ব্রহ্ম গায়ত্রী বেদত্রয় ইত্যাদি।[১] 'প্রণব'ই কুণ্ডলিনীর স্পন্দন, নাথগণ যে প্রণবতনুর কথা বলেন তাহা কুণ্ডলিনীর জাগরণে লাভ হয়, ইহাই 'ওঁকার দেহ' লাভ। এই প্রণবতনু বা ওঁকারদেহ চন্দ্রামৃতপানে অজরত্ব লাভ করে, এইরূপ দেহধারী যোগীই জীবিত থাকিয়াও মুক্ত এবং সংসারের পক্ষে মৃত। ইহাই নাথ-যোগীদের 'সিদ্ধদেহ' লাভ, ইহাই রসেশ্বর সিদ্ধের 'রসময়ী তনু' ও বৈষ্ণবের 'ভাবদেহ'। বিভিন্ন দেহ সম্বন্ধে স্থূলভাবে আলোচনা করা হইল, কিন্তু তাহার সহিত ব্রহ্মাণ্ডের কি সম্বন্ধ তাহাই নির্ণেয়। ব্রহ্মাণ্ড কি? আমরা সকলে সমভাবে যে আকাশ দেখিতেছি তাহাই আমাদের ব্রহ্মাণ্ড, মনই সেই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা, মন এক নয়, দেহভেদে মন অসংখ্য, তাই সৃষ্টিও অসংখ্য, আকাশও অসংখ্য। এই আকাশের মধ্যে একটী শক্তি আছে, বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করিয়াছেন সমগ্র বিশ্বে একটী মাত্র শক্তি আছে, যাহা দ্বারা গ্রহনক্ষত্রাদি চালিত হইতেছে, পুষ্প হইতে ফল হইতেছে ইত্যাদি। সে শক্তির ক্রিয়ামাত্র আমরা অনুভব করি, ক্রিয়ার বিভিন্নতা হইলেও মূলে শক্তি 'এক' ও অনবচ্ছিন্ন। মানবদেহমধ্যেও সেই শক্তি কুণ্ডলিনীরূপে বিরাজিত। তাই সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতিতে[২] উক্ত হইয়াছে যে সৃষ্টিরূপা কুণ্ডলিনী স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে অবস্থিত। জীবমধ্যে এই শক্তির স্থূল বিকাশ, তাঁহার সূক্ষ্মরূপ উপলব্ধির নিমিত্ত যোগসাধনার প্রয়োজন।

বিভিন্ন সৃষ্টির বিভিন্ন আকাশ আছে, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আগমে তাহাকে 'গোল' বলা হয়—যেমন ব্রহ্মগোল, বিষ্ণুগোল, রুদ্র-গোল ইত্যাদি। এইরূপ কোটি কোটি গোল আছে, আমাদের ব্রহ্মার যে গোল তাহাই আমাদের ব্রহ্মাণ্ড বা ভূর্লোক। যে মন হইতে আমাদের ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে অর্থাৎ যে মন এই ব্রহ্মাণ্ডমূর্ত্তিতে বিরাজিত সেই মনই আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, যাহা দেখিতেছি তাহা ভূর্লোক, যাহার জন্য আকাঙ্ক্ষা হইতেছে অর্থাৎ এখন যাহার বিদ্যমানতা নাই তাহাই ভুবর্লোক, তদূর্দ্ধে স্বঃ মহঃ তপঃ জন ও সত্যলোক কল্পিত হয়। ব্রহ্মাণ্ডে যে যে লোক আছে তাহা পিণ্ড

১। গো. সি. স. পৃ. ৭১। ২। সি. সি. প. ৪।২৩।

মধ্যেও বর্ত্তমান, ইহা যোগিগণসম্মত। পিণ্ডমধ্যে তাই 'চতুর্দ্দশ ভুবনে'র অবস্থান নির্ণীত হইয়াছে। উক্ত সপ্তলোক ব্যতীত তলাতল, মহাতল, রসাতল, সুতল, বিতল, অতল ও পাতাল এই সপ্ত অধোলোক কল্পিত হইয়াছে। মস্তক হইতে পদতল পর্য্যন্ত এই চতুর্দ্দশ ভুবনের অবস্থান। যোগী মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর ও অনাহত স্থানে চিত্ত সংযমন দ্বারা ভূর্লোক বিষয়ক জ্ঞানের অনুভূতি লাভ করেন। প্রাচীনতম যোগসূত্রেও নাভিচক্রে সংযম করিলে কায়ব্যূহ-জ্ঞান, হৃদয়ে সংযম করিলে চিত্ত-বিজ্ঞান, সূর্য্যে সংযম করিলে ভুবন-জ্ঞান হয় ইত্যাদি আছে।[১] এই সূর্য্য অর্থে সাধারণ সূর্য্য নহে, সূর্য্যদ্বার বা সুষুম্নাদ্বার, তদ্রূপ চন্দ্রদ্বার বা তালুমূল আছে। সূর্য্যদ্বার স্থির করিতে হইলে প্রথমতঃ সুষুম্না স্থির করিতে হয়; শ্রুতি বলেন "ততঃ শ্বেতঃ সুষুম্না বজ্রযানঃ" অর্থাৎ হৃদয় হইতে ঊর্দ্ধগত শ্বেত বা জ্যোতির্ম্ময় নাড়ীই সুষুম্না। তন্ত্রমতে মেরুদণ্ডের পথই সুষুম্না। সুষুম্নাদ্বার হইতে একটী রশ্মি ঊর্দ্ধে সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া গিয়াছে, অতএব সূর্য্যের সহিত ইহার সম্বন্ধ আছে।

পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের সামঞ্জস্য অনুসারেই সুষুম্নানাড়ী ও লোকসকলের একত্ব নির্ণীত হয়। যে ক্রমে সৃষ্টিব বিকাশ হইয়াছে, মানবদেহেও তত্ত্বগুলি সেই ক্রম অনুসারে সংস্থিত, সেইজন্য দেহকে 'ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড' বলা হয়। সৃষ্টির আদি অবস্থা শূন্য, মাতৃগর্ভস্থ জীবের প্রথম অবস্থাও শূন্য, আমাদের মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে ঊর্দ্ধদেশেও এক শূন্যস্থান আছে। সৃষ্টির শূন্য হইতে নাদের উৎপত্তি, জীবদেহের ব্রহ্মরন্ধ্রের শূন্য বেষ্টন করিয়া স্নায়বীয় পদার্থের উৎপত্তি ও তাহার ক্রমশঃ বিকাশে মেরুদণ্ডের রূপধারণ হয়। আগম মতে সমস্ত সৃষ্টি শূন্যে অবস্থিত, সেই শূন্য দেহমধ্যেই রহিয়াছে। দেহমধ্যে চন্দ্রসূর্য্যবহ্নি-তত্ত্বই ব্রহ্মাবিষ্ণুরুদ্র। বহ্নিতত্ত্ব বিন্দুর স্বরূপ, বহ্নিতত্ত্বে জগদ্রূপ বিষয় বিলীন হয়। বিন্দু অনন্ত আনন্দের ধাম সেইজন্য বিন্দুই স্বর্লোক জগতের সকল চৈতন্য বিন্দুতে গিয়া নিশ্চল চিৎ অবস্থা প্রাপ্ত হয়।[২] চিত্তের বহির্মুখতা সূর্য্য, চিত্তের অন্তর্মুখতাই চন্দ্র। তাই পিঙ্গলা ও ইড়া, সূর্য্য ও চন্দ্র নামে পরিচিত। মেরুদণ্ডের মধ্যে একটী সূক্ষ্ম রন্ধ্র আছে, তাহার চতুষ্পার্শ্বে শ্বেত ও ধূসরবর্ণ স্নায়বীয় পদার্থ আছে, তাহা হইতেই সাধনের অনুকূল ও প্রতিকূল দক্ষিণ ও বাম

১। যোগসূত্র ৩।২৯, ৩৪, ২৬ ইত্যাদি ২। মন্ত্রযোগ, অবধূত জ্ঞানানন্দ পৃ ১১৯, ১২০

নাড়ীর নামকরণ হইয়াছে। মস্তিষ্কের মহাশূন্যস্থান হইতে অধঃপ্রসারিত নাড়ীই সুষুম্না। জীবদেহস্থ ঐশী শক্তি ইহাতে বিরাজিত। সুষুম্না মধ্যে প্রাণানিল বিলীন হইলে যে লয় হয় তাহার ফলে নাদের অনুভূতি হয়। সুষুম্নাতে রতি হইলে শিবত্বলাভ হয়। সুষুম্নার নামান্তর বহ্নিতত্ত্ব ও শ্মশান, সুষুম্না মধ্যে শিবতত্ত্বের সাক্ষাৎ হয় বলিয়া শিবকে শ্মশানবাসী বলা হয়। সুষুম্নাতে প্রাণানিল লয় করার সাধনাই প্রকৃত শ্মশান সাধন। যোগসিদ্ধ যোগী পার্থিব ভাবের অতীত হইলে তাঁহার সূক্ষ্মদৃষ্টি খুলিয়া যায়, তখন তাঁহার অনুভূত উপদেশ দ্বারা লোকের উপকার হয়, দার্শনিক কর্তৃক তাহা স্থায়ী করিবার প্রচেষ্টা হইতে দর্শনের উৎপত্তি। সিদ্ধ নাথযোগী স্বীয় দেহে যে চতুর্দ্দশ ভুবনের অনুভূতি বর্ণনা করিয়াছেন তাহা এইরূপ—

কূর্ম্মঃ পাদতলেঽঙ্গুষ্ঠতলে পাতালমুচ্যতে।
তলাতলং পুরোঽঙ্গুষ্ঠাৎ পাদপৃষ্ঠে মহাতলম্॥
গুল্ফে রসাতলং প্রোক্তং জঙ্ঘায়াং সুতলং মতম্।
বিতলং জানুদেশে স্যাদতলং মূল ইষ্যতে।
উর্দ্ধঃ স্বভাবো যঃ পিণ্ডে স স্যাৎ কালাগ্নিরুদ্রকঃ।
পাতালপদবাচ্যানাং সত্ত্বানামধিদেবতা।
ভূরাদিলোকত্রিতয়ং গুহ্যে লিঙ্গাগ্রমূলয়োঃ।
তত্রাধিদেবতা শক্রঃ পিণ্ডেঽহববিনায়কঃ।
দণ্ডাগ্রে দণ্ডকুহরে মহর্লোকো জনস্তথা।
তপো দণ্ডতলে সত্যং মূলে যোমান (?) এতদীট্।[১]

অধোলোকের (তলাতল হইতে পাতাল) দেবতা কালাগ্নিরুদ্রক, উর্দ্ধলোকের (ভূরাদিলোকের) অধিদেবতা শক্র। ভূতকুক্ষিতে স্বর্লোকে অচ্যুতদেবতা (বিষ্ণু)—হৃদয়ে রুদ্রলোকে রুদ্রঅধিদেবতা, বক্ষে ঈশ্বরলোকে ঈশ্বরদেবতা, তিনি পিণ্ডে তৃপ্তিস্বরূপ অবস্থিত, কণ্ঠে নীলকণ্ঠলোকে সদাশিব শ্রীকণ্ঠ অধীশ, তিনি সনাতন, পিণ্ডান্তরে কৃতাধিবাস। লম্বিকামূলে (আলজিভে)—ভৈরব দেবতা, তালুদ্বারে শিবলোক তথায় যোগশক্তিরূপ শিব, তালুর অভ্যন্তরে সিদ্ধলোক তথায় প্রবোধাত্মা মহাসিদ্ধ, ললাটে অনাদিলোক তথায় পর অহন্তারূপে অনাদি

১। সি. সি. স. ৩।৩—৭

অধীশ্বর, শৃঙ্গাটে কুললোকে সদানন্দ স্বরূপে কুলেশ্বর, ব্রহ্মরন্ধ্রে পরব্রহ্মলোক, তথায় পরিপূর্ণস্বরূপ পরব্রহ্ম পরাপরলোকে পিণ্ডমধ্যে অস্তিত্বরূপ পরেশ্বরদেবতা, ত্রিকুটে শক্তিলোকে শক্তিদেবতা অধিষ্ঠিত, ইহারা "বৃত্তে বিপ্রো নৃপঃ শৌর্য্যে উদ্যমে বিড্‌ভয়েঙ্‌ভ্রিজঃ।[১] অর্থাৎ জ্ঞানে বিপ্র, শৌর্য্যে ক্ষত্রিয়, উদ্যমে বৈশ্য, ভয়ে শূদ্র। গোরক্ষসিদ্ধান্ত-সংগ্রহে মহাসাকার পিণ্ডের মূর্ত্তি অষ্টককে (শিব, ভৈরব, শ্রীকণ্ঠাদি) "আচারে ব্রাহ্মণা বসন্তি শৌর্য্যে ক্ষত্রিয়া ব্যবসায়ে বৈশ্যাঃ সেবাভাবে শূদ্রাঃ" বলা হইয়াছে। এইরূপে দেহমধ্যে বিভিন্ন ভুবন ও বিভিন্ন অধিদেবতার কল্পনা করা হয়। বিভিন্ন পর্ব্বত, নদী প্রভৃতির অবস্থানও দেহমধ্যে কল্পিত হয়, যথা ললাটে শ্রী পর্ব্বত, দক্ষিণ কর্ণে বিন্ধ্য, বামে মৈনাক পর্ব্বত, মেরুদণ্ডে মেরু ও দ্বাসপ্ততিসহস্র নদী, গঙ্গা, সরযূ, যমুনা, চন্দ্রভাগা, সরস্বতী প্রভৃতি বিভিন্ন শিরাতে অবস্থিত—বৌদ্ধ গান ও দোহাতেও গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতীর উল্লেখ পাওয়া যায় যথা—

গঙ্গা জউনা মাঝেঁরে বহই নাই
তহি বুড়িলী মাতঙ্গি পোইআ নীলে পার করেই ॥[২]

গঙ্গা-যমুনা অর্থে চন্দ্র-সূর্য্য বা ইড়াপিঙ্গলা নাড়ী, সরস্বতীই সুষুম্নানাড়ী বা গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্ত্তী নদী। সিদ্ধযোগী সুষুম্না পথেই ধ্যান সাধন করেন। গোরক্ষসংহিতায় আছে (৪।১৮৩, ১৮৪)

গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে বহত্যেষা সরস্বতী।
তাসান্তু সঙ্গমে স্নাত্বা ধন্যো যাতি পরাং গতিম্‌ ॥

গঙ্গা যমুনার মধ্যে সরস্বতী প্রবাহিত হইয়াছে, ইহাদের সঙ্গমস্থানে যিনি স্নান করিতে পারেন, তিনিই ধন্য এবং তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হন।

ইড়া গঙ্গা পুরা প্রোক্তা পিঙ্গলা চার্কপুত্রিকা।
মধ্যা সরস্বতী প্রোক্তা তাসাং সঙ্গোঽতিদুর্লভঃ ॥

ইড়া নাড়ীকে গঙ্গা বলিয়া জানিবে, এবং পিঙ্গলা নাড়ীকে যমুনা বলিয়া জানিবে, মধ্য নাড়ীর নাম সরস্বতী, কিন্তু ইহাদের পরস্পর সম্মিলন সাতিশয় দুর্লভ পদার্থ।

তেত্রিশকোটি দেবতা রোমকূপমধ্যে বিরাজ করেন, গন্ধর্ব্ব কিন্নর অপ্সরা যক্ষ সকলের বাসস্থান এই দেহমধ্যে নির্ণীত হয়, নেত্রদ্বয়ে চন্দ্র-সূর্য্যের অবস্থান, লতাগুল্ম তৃণাদি, কৃমিকীট সকলই দেহকে আশ্রয় করিয়া

১। সি. সি. স. ৩।২১; তুলনীয় গো. সি. স. পৃ ৩১ ২। ১৪নং দোহা।

আছে। যাহা সুখ তাহা স্বর্গ, যাহা দুঃখ তাহাই নরক। তুরীয় বা নির্ব্বিকল্প অবস্থা মোক্ষ, যাহা কর্ম্ম তাহা বন্ধন, যাহা নির্ব্বিকল্প তাহা মুক্তি, "স্বরূপদশায়াং নিদ্রাদৌ স্বাত্মজাগরঃ শান্তিঃ"—যাহা অখণ্ড পরিপূর্ণ আত্মা বিশ্বরূপ মহেশ্বর, তিনি ঘটে ঘটে (প্রতি দেহে) চিৎপ্রকাশরূপে অধিষ্ঠিত—

> অখণ্ডপরিপূর্ণাত্মা বিশ্বরূপো মহেশ্বরঃ।
> ঘটে ঘটে চিৎপ্রকাশস্তিষ্ঠতীতি প্রবুধ্যতাম্ ॥[১]

পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের যোগসাধনই যোগীর লক্ষ্য। পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগে পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ড উভয়ের উৎপত্তি। ইহারা ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে যুক্ত। ব্যষ্টি অর্থে ভিন্ন ভিন্ন ভাব বা বিশেষ ভাব, সমষ্টি অর্থে সমুদায় বা অপৃথক্ ভাব, যেমন বিশেষ বিশেষ বৃক্ষেব সমষ্টি 'এক বন' জলেব সমষ্টি ভাব 'এক জলাশয়' ইত্যাদি।[২] অতএব পিণ্ড জ্ঞান দ্বাবা ব্রহ্মাণ্ড জ্ঞান হয় ইহা সুনিশ্চিত। গুরু-উপদেশে পিণ্ডজ্ঞান লাভ কবিয়া সাধক প্রকৃতিতে পুরুষ বিলীন করিবেন।

লয়যোগ-সংহিতায় আছে—

> ব্রহ্মাণ্ডে পিণ্ডে সদৃশে ব্রহ্মপ্রকৃতিসংভবাৎ।
> সমষ্টিব্যষ্টিসংবন্ধাদেকসংবন্ধগুম্ফিতে ॥
> ঋষিদেবৌ চ পিতবৌ নিত্যং প্রকৃতিপুরুষৌ।
> তিষ্ঠতি পিণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডে গ্রহনক্ষত্ররাশয়ঃ ॥
> পিণ্ডজ্ঞানেন ব্রহ্মাণ্ডজ্ঞানং ভবতি নিশ্চিতম্।
> গুরূপদেশতঃ পিণ্ডজ্ঞানমাপ্ত্বা যথাযথম্ ?
> ততো নিপুণয়া যুক্ত্যা পুরুষপ্রকৃতের্ল্যয়ঃ।[৩]

মনুষ্য-শরীরে এরূপ রন্ধ্র আছে যাহার ভিতর দিয়া ব্রহ্মাণ্ডের সহিত সংযোগ হইয়া থাকে। এই সংযোগের প্রধান সহায় চৈতন্যধারা, কারণ চৈতন্যধারা এই ছিদ্রের সহিত ওতপ্রোতভাবে মিলিত আছে। স্পর্শেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া জ্ঞানেন্দ্রিয়-ধারা দ্বারা মস্তিষ্কে প্রেরিত হয়, অতএব পিণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডের অনুভূতি হইতে হইলে চৈতন্যধারা ব্যষ্টির উপযুক্ত ছিদ্র দ্বারা প্রবেশ করিলে এই দেহেই বিশ্বানুভূতি হইতে পারে। উল্লিখিত

১। সি. সি. স. ৩।৪০ ২। বেদান্তসার পৃ ২২

৩। লয়যোগ-সংহিতা পৃ ১, ২ উল্লেখ সিদ্ধ৭ সম্প্রদায়ে পৃ ১৩২ ফুটনোট।

নিয়মে ভিন্ন ভিন্ন ধামের সহিত মনুষ্যদেহের বিভিন্ন চক্রের যোগ সাধন-বলেই স্থাপিত হয়, এই নিমিত্ত অন্তর্নিহিত শক্তির জাগরণ কর্ত্তব্য।

কৌলজ্ঞান নির্ণয়ে[১] শিবকে লিঙ্গ বলা হইয়াছে, অর্থাৎ সৃষ্টি ও প্রলয়কর্ত্তা বলা হইয়াছে, ইহা সিদ্ধলিঙ্গ, মানসলিঙ্গ, মনোলিঙ্গ এবং প্রত্যেকের দেহে অবস্থিত আছে বলিয়া 'দেহলিঙ্গ' নামেও অভিহিত হইয়াছে। কুল বা শক্তিও এই লিঙ্গের সহিত নিত্যযুক্ত। গ্রহনক্ষত্র-তারকাদি জাগতিক পদার্থসকল এই লিঙ্গের বিন্দু হইতে জাত, প্রারম্ভে ইহারা বিন্দুমধ্যে স্থিত ছিল (৩।২০-২২), শিবশক্তির মিলনে জগতের 'সৃষ্টি' হয়, অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট বস্তুর জন্য অনির্দ্দিষ্টের নাশ হয়। "নাশঃ কারণে লয়ঃ", স্বকারণে লীন হওয়াই 'লয়'। জীবমধ্যে যে শক্তি মূলাধারে কালাগ্নিরূপে বিরাজ করেন তাহা নিম্নস্তরে থাকিলে সৃষ্টি রক্ষা পায়, ঊর্দ্ধমুখী হইলে প্রলয় হয়। জীবদেহমধ্যে সপ্তপাতাল ও সপ্তস্বর্গ এই চতুর্দ্দশ ভুবন বিরাজমান (দ্বিতীয় পটল)।

জীবদেহের কঙ্কালদণ্ডকে মেরুগিরি বলা হয়, তন্মধ্যস্থ শূন্য নাড়ীই গিরিগহ্বর নামে খ্যাত। এই গহ্বরের নামান্তর 'আকাশ', এখানে আসিলে বিন্দু স্থির হইয়া যায়।

সিদ্ধমতে পিণ্ড ও পিণ্ডাধার শক্তির জ্ঞান উপলব্ধ না হইলে তত্ত্ববোধ অসম্পূর্ণ থাকে। দেহই পিণ্ড, তাহার জ্ঞান আবশ্যক। পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডে মূলগত ঐক্য বর্ত্তমান, কারণ ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে মাত্র পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডে ভেদ, অন্যথা ব্রহ্মাণ্ডে যাহা আছে পিণ্ডেও তাহাই আছে। ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় পিণ্ডেও চতুর্দ্দশ ভুবন বিদ্যমান, ইহা কৌলজ্ঞান-নির্ণয়ের উক্তিতে দেখান হইয়াছে। নিরাকার পরমবস্তু আকার গ্রহণে উন্মুখ হইলে সৃষ্টির সূচনা হয়, তাহা হইতে পর, অনাদি ও আদি, মহাসাকার, প্রাকৃত ও গর্ভ এই ছয় পিণ্ডের আবির্ভাব হয়। এই পিণ্ড উৎপত্তির পূর্ব্বাবস্থাই 'স্বয়ংতত্ত্ব' ইহার 'নিজাশক্তি' স্বরূপাভূতাশক্তি, তাহা হইতে পঞ্চশক্তির উদ্ভব হয়, তাহাদেরও পঞ্চ পঞ্চ গুণ থাকায় সর্ব্বসমেত পঞ্চ-বিংশতি গুণের সমাবেশ 'পরপিণ্ডে' হয়।

মহাকাশাদি পঞ্চ তত্ত্ব ও তাহাদের পঞ্চবিংশতি গুণই সমষ্টিভাবে শিব, ভৈরব আদি মহাসাকার পিণ্ডের 'অষ্টমূর্ত্তি' নামে পরিচিত।

১। কৌলজ্ঞান ৩।১০

ছয় পিণ্ডের কোনটি সিদ্ধপিণ্ড নহে, কারণ পরমপদের সহিত সামরস্য না হওয়া পর্য্যন্ত পিণ্ডসিদ্ধি হয় না। পিণ্ডের আধারভূতা কুণ্ডলিনী শক্তির উদ্বোধন না হইলে পিণ্ডসিদ্ধি হয় না, যোগমার্গের ইহাই বৈশিষ্ট্য। অতএব পিণ্ডমধ্যে ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞান হইলে সাধক সাকার-নিরাকারাতীত পরমপদের সন্ধান পাইতে পারেন। সিদ্ধমতে সাকারের ন্যায় নিরাকারও সৃষ্টির অন্তর্গত, কিন্তু পরমতত্ত্ব সাকার বা নিরাকারের অতীত। নিরাকার অবস্থাই অদ্বৈত অবস্থা, সাপেক্ষতা থাকায় উহাও পরমপদ নহে। কুণ্ডলিনী শক্তিই 'পিণ্ডসংসিদ্ধিকারিণী', তিনিই পরমপদের সন্ধান দিতে পারেন।

পাশ্চাত্ত্যদেশেও পিণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডের কল্পনা প্রাচীনযুগে প্রচলিত ছিল। প্রথমতঃ একটী এমন নাক্ষত্রিক লোকের কল্পনা করিতে হইবে যাহাতে জড়জগতের সকল বস্তুর সত্তা বিদ্যমান আছে। তৎপরে পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে সমস্ত বস্তুর অভেদ কল্পনা করিয়া সাধনে অগ্রসর হইতে হইবে। সর্ব্বশেষে (মন্ত্রাদি দ্বারা) স্বীয় ইচ্ছাকে বশীভূত করিয়া মানব দেহের ও স্বীয় অদৃষ্টের প্রভু হইতে পারে। এই তিনটী ক্রম সৃষ্টির রহস্যসাধনের তিনটী স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে।[১]

ষট্‌পিণ্ড ও মনুষ্যপিণ্ডের আবির্ভাব এবং ত্রিবিধ দেহের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইল, অতঃপর আমাদের দেহ বা পিণ্ডের বিভিন্ন চক্রের সহিত ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন স্তরের কিরূপ সম্বন্ধ এবং সে সম্বন্ধ কিরূপে স্থাপিত হইল তাহাই বিবেচ্য। এই বিশ্বের উৎপত্তি নাদ ও বিন্দু হইতে, উহারা বস্তুতঃ এক হইলেও একটী আধার অন্যটী আধারস্থ সাক্ষী স্বরূপ, অর্থাৎ নাদ ব্যাপকরূপে আকাশের ন্যায় আধার স্বরূপ আর বিন্দু সেই আধারস্থ সাক্ষীচৈতন্য। নাদ শক্তি, বিন্দু শক্তিমান। শব্দব্রহ্ম অখণ্ড অব্যক্ত নাদরূপে স্ফুরিত হইলে তজ্জন্য আকাশেরও কল্পনা হইল, কারণ শূন্য কল্পনা ব্যতীত নাদের স্ফুরণ সম্ভব নহে। সেই আকাশকে শব্দগুণময় বলা হয়। নাদের সঞ্চরণক্রিয়া হইতে বায়ু-তত্ত্বের এবং বায়ুর গতিশীলতা হইতে তেজের উৎপত্তি হয়। তেজ মন্দীভূত হইলে শৈত্য রসরূপে বা জলতত্ত্বে পরিণত হয়। রস ঘনীভূত হইলে ক্লেদের উৎপত্তি, তাহা হইতে গন্ধের উৎপত্তি হয়; এই গন্ধ তন্মাত্রই

১। রহস্তবাদ, অণ্ডারহিল, পৃ ১৫৪-১৬২ দ্বাদশ সংস্করণ।

পৃথ্বীতত্ত্বে পরিণত হয়। অতএব নাদ হইতেই শব্দ, স্পর্শ (বায়ু হইতে), রূপ (তেজ হইতে), রস ও গন্ধ এই পঞ্চগুণের উৎপত্তি। এই পঞ্চগুণ মানবদেহেও রহিয়াছে। নাদ হইতে শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র এবং তাহা হইতে যথাক্রমে পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি হয়,—সমগ্র সৃষ্টির এই পঞ্চস্তর মানবদেহের মেরুমধ্যস্থ কেন্দ্রবিশেষে বর্তমান রহিয়াছে। পরিদৃশ্যমান স্থূলজগৎও পঞ্চস্তরে বিভক্ত, ইহা সূক্ষ্ম অন্তর্জগতের প্রতিবিম্বমাত্র। স্থূলকে সূক্ষ্মাকারে জানিবার জন্যই যোগীর যোগসাধন। সহস্রদল ও আজ্ঞাচক্রের উর্দ্ধভাগে অব্যক্ত সৃষ্টিভূমি। অব্যক্ত ও সূক্ষ্ম মিলিয়া সৃষ্টি সপ্তস্তরে অবস্থিত। অবধূত জ্ঞানানন্দ স্থূল ও সূক্ষ্মরূপের তুলনামূলক যে সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন তাহাই উল্লেখ করিতেছি—

"প্রথম স্তরে মহাশূন্য নির্গুণ শিবপদবীতে ইচ্ছারূপিণী শক্তির উদয়, তাঁহার নাদ ও বিন্দুরূপ ধারণ এবং বিন্দুভেদ হইয়া শব্দব্রহ্মের উৎপত্তি। যোগিদেহে ইহা মস্তিষ্ককোটরের সহস্রদল নামক মহাশূন্য। দ্বিতীয় স্তরে বিন্দুরূপী পুরুষের আজ্ঞাতে বীজাকারে পঞ্চাশৎ শূন্যমণ্ডলের উৎপত্তি, সেই সকল শূন্য হইতে ব্যক্তনাদের আবির্ভাব, এবং তাহা হইতে ত্রিবিধ অহঙ্কার বিশিষ্ট মহত্তত্ত্বের সৃষ্টি। এই আজ্ঞাই ব্রহ্ম প্রকৃতি মহামায়া এবং যোগী তাঁহাকে ভ্রূমধ্যের সমীপবর্তী মস্তিষ্কের অধস্তনভাগে সাক্ষাৎ করেন বলিয়া ঐ স্থানের নাম আজ্ঞাচক্র। তৃতীয় স্তরে শব্দগুণ-বিশিষ্ট আকাশতত্ত্ব, যোগীর ইহা কণ্ঠপ্রদেশস্থ বিশুদ্ধিচক্র, কারণ আকাশ পুরুষ না হইলে চিত্তজাল বিশুদ্ধ হয় না। চতুর্থ স্তরে স্পর্শগুণবিশিষ্ট বায়ুমণ্ডল, ইহা যোগীর হৃৎপ্রদেশস্থ অনাহতচক্র, যেখানে নাদরূপী অনাহত ধ্বনির স্ফুরণ প্রথম উপলব্ধি হয়। পঞ্চম স্তরে তেজস্তত্ত্ব বহ্নিমণ্ডল ও তদ্দ্বারা রূপবিকাশ, ইহাই যোগীর মণিপুরচক্র, কারণ মণিগণের বিভিন্ন জ্যোতিই প্রথম রূপসৃষ্টি এবং বহ্নি হইতেই সমস্ত মণিকাঞ্চন উৎপন্ন হইয়াছে। ষষ্ঠতত্ত্বে রসতত্ত্ব ও কামসৃষ্টি, এইখানেই যোগীর স্বাধিষ্ঠান চক্র। জীব কামরসে লিপ্ত হইয়া সংসারে আবদ্ধ রহিয়াছে, আকারভেদে কাম নানা বন্ধনে জীবকে বাঁধিয়াছে, সেই কামচক্র বা রাধাচক্র জীবাত্মার অধিষ্ঠানভূমি বলিয়া ইহার নাম স্বাধিষ্ঠান। কামই প্রেমে পরিণত হয়, তখন কামচক্র রাধাচক্র হইয়া দাঁড়ায়। সপ্তমস্তরে পার্থিবমণ্ডল, ইহাই জীবজগতের স্থূলভোগের স্থান

'মূলাধার', পার্থিব ভোগে নিস্পৃহ না হইলে ঊর্দ্ধতন ভূমির অভিজ্ঞান আসে না।"[১]

এই সপ্তস্তরে বিন্যস্ত সৃষ্টিমণ্ডলে যোগীর সপ্ত যোগভূমি ও সপ্ত আচার কল্পিত হয়। মূলাধারে প্রথম ভূমিতে আত্মজ্ঞানলাভের উদয় হয়, তাই উহাতে বেদাচার, স্বাধিষ্ঠানে বৈরাগ্যের উদয়ে যোগী বৈষ্ণবাচারে রত হন। মণিপুরে যোগী জিতেন্দ্রিয় ও অষ্টাঙ্গ যোগ সাধনে রত হন বলিয়া শৈবাচারী, অনাহতে রাগহীন যোগী শুদ্ধসত্ত্বস্থ বলিয়া দক্ষিণাচারী, বিশুদ্ধে যোগী আকাশবৎ স্বচ্ছ হন এবং প্রকৃতির লয়ক্রম উপস্থিত হয় বলিয়া বামাচারী। আজ্ঞাতে বিন্দুদর্শন হয় এবং সোহং ভাবের বিকাশ হয় বলিয়া তখন সিদ্ধান্তচারী। সহস্রদলমণ্ডলে সচ্চিদানন্দময় স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হন বলিয়া যোগীর শত্রুমিত্র, বিষ্ঠাচন্দনে ভেদাভেদ থাকে না বলিয়া কুলাচারী বা 'কৌল' বলিয়া অভিহিত হন। বুদ্ধিকৃত কর্ম্ম তখন লুপ্ত হইয়া যায় এবং যোগী কুলের অর্থাৎ ব্রহ্মশক্তির ক্রীড়াপুত্তলিকা হইয়া বিচরণ করেন।[২]

নাথসিদ্ধগণ নিজেদের 'কৌল' বলিতেন—মৎস্যেন্দ্রের পুথির ভণিতায় তাহা পাওয়া যায়। নাথগণ দেহমধ্যে চক্রের ধ্যানের দ্বারা পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের বা স্থূল ও সূক্ষ্মের সম্বন্ধ স্থাপনা করিতেন তাহা নিঃসন্দেহ। অমনস্ক গ্রন্থেও আছে "ব্রহ্মাণ্ডং সফলং পশ্যেৎ পাণিস্থমিব মৌক্তিকং" যোগী করস্থিত মুক্তার ন্যায় ব্রহ্মাণ্ডকে দর্শন করেন।[৩] যোগী পঞ্চতত্ত্বে সিদ্ধিলাভ করেন (১।৭০—৭৫) এবং "রাধাযন্ত্র বিধাননে জীবন্মুক্তো ভবিষ্যতি" (২।১৬) ইহাও উক্ত গ্রন্থে আছে। এই রাধাযন্ত্র পূর্ব্বোক্ত কামচক্র বা রাধাচক্র বলিয়া অনুমান হয়, কামই প্রেমে পরিণত হইয়া মানবকে ঊর্দ্ধমুখী করে।

রাধাস্বামী সম্প্রদায় মধ্যে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা এই ষট্চক্রের মধ্যে নিম্নের চারি চক্র দ্বারা মনুষ্য-শরীরের ক্রিয়া হয় এবং সকলেই তাহা বুঝিতে পারে কিন্তু উপরের দুইটী চক্রক্রিয়া যোগসাধন করিলে প্রকাশিত হয়, এইরূপ মতামত প্রচলিত আছে। আজ্ঞাচক্রে আত্মার অবস্থান, এবং পঞ্চম ও ষষ্ঠ চক্রে প্রাণ ও মনের

১। মন্ত্রযোগ, অবধূত জ্ঞানানন্দ পৃ ১৫৩
২। মন্ত্রযোগ, অবধূত জ্ঞানানন্দ পৃ ১৫৪, ১৫৫
৩। অমনস্ক ১।৭৩

স্থান বর্ণিত হয়। মনুষ্যদেহের ষট্‌চক্রের ন্যায় ব্রহ্মাণ্ডের ষট্‌চক্র আছে, পিণ্ডদেশে মনের সহিত আত্মার যেরূপ সম্বন্ধ, ব্রহ্মাণ্ডেও মনের সহিত আত্মার সেইরূপ সম্বন্ধ। এই পিণ্ডদেশের বহির্ভূত এক বিশাল ব্রহ্মাণ্ড আছে, তাহাতে ষট্‌চক্র আছে বলিয়াই তাহা হইতে উৎপন্ন পিণ্ডদেশেও ষট্‌চক্র দেখিতে পাই। সন্তদের পরিভাষায় পিণ্ডদেশের অতীত এই বিশাল দেশকে 'ব্রহ্মাণ্ড' বলে। পিণ্ডদেশের ষট্‌চক্র দেখিয়া ব্রহ্মাণ্ডের ষট্‌চক্রের ধারণা করিতে হয়, পরব্রহ্মপদও এই ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিত। পরব্রহ্মপদকে বাদ দিলে ব্রহ্মাণ্ডের ষড়্‌ভাগ অসম্পূর্ণ থাকে ও পিণ্ডদেশের ষট্‌চক্রের সহিত ব্রহ্মাণ্ডের ষড়্‌ভাগেব সামঞ্জস্য হয় না। পিণ্ডদেশের ষট্‌চক্র ব্রহ্মাণ্ডের ষট্‌চক্রের প্রতিবিম্ব মাত্র।

মনুষ্যশরীরের কেন্দ্রের সহিত ব্রহ্মাণ্ডের তদনুরূপ কেন্দ্রশক্তির সম্বন্ধ আছে। মনুষ্যশরীবের ভিন্ন ভিন্ন চক্রে মনের ভিতর দিয়াই জীবনীশক্তি অর্পিত হইয়া থাকে। অনাহত চক্র সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হইলে স্থূল শরীর বিনষ্ট হয়। আত্মা মনের সহিত মিলিত হইয়া ষট্‌চক্রের কার্য্য করে। সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ডেব চিতিশক্তির কেন্দ্র আছে, উহা ব্রহ্মাণ্ড-মনের সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য করে। বেদে এই পরমপদের 'নেতি' 'নেতি' করিয়া উল্লেখ আছে। কিন্তু আত্মা ও মনের যেরূপ ভেদ, পরব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মের ভেদও তদ্রূপ। আত্মা যেরূপ মনের সহিত মিলিত, সেইরূপ পরব্রহ্মও ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইয়াও মিলিত, যথা ঘনক্ষেত্র মধ্যে সম-চতুর্ভুজক্ষেত্র ভিন্ন হইয়াও মিলিত।

বেদের ব্রহ্মাণ্ড ও সন্তদের ব্রহ্মাণ্ড ভিন্ন, কারণ সন্তদের পরমব্রহ্ম পদও ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত। কবীরাদির মতে ব্রহ্মাণ্ডের তিনটী উচ্চধাম আছে---সুন্ন, ত্রিকুটি ও সহস্রদলকমল। সুন্নের দেবতা অবিনাশী 'অক্ষর' তিনি ব্রহ্মাণ্ডী মন বা পুরুষ বা ব্রহ্মের সহিত যুক্ত। এই পুরুষ অক্ষর হইতে চৈতন্যশক্তি সাহায্যে ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন করেন, ত্রিকুটির দেবতা 'ব্রহ্ম' এবং সহস্রারের 'নিরঞ্জন'। অতএব ব্রহ্মের তিন রূপ, অব্যাকৃত, হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট্; ইহারা যথাক্রমে অপ্রকাশিত, প্রকাশের উৎপত্তিস্থল ও প্রকাশিতরূপ (সুন্নে, ত্রিকুটিতে ও সহস্রারে)। জীবের তিনটী অবস্থা সুষুপ্তি, স্বপ্ন ও জাগ্রৎ ইহার সহিত তুলনীয়।

মনুষ্যের মস্তিষ্কের মধ্যে যে রন্ধ্র আছে তাহাতে দ্বাদশ দ্বার আছে, চক্ষুর ছিদ্র দ্বারা সূর্য্যের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন যেরূপে সম্ভব, সাধনদ্বারা

মনুষ্য এই দ্বাদশ দ্বার সাহায্যে ব্রহ্মাণ্ডের ষট্‌চক্র ও চৈতন্যদেশের ষড়্‌ধামের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে। সমষ্টির সহিত ব্যষ্টির এইরূপ সম্বন্ধ রাধাস্বামী সম্প্রদায় মধ্যে বর্ণিত হয়।[১]

মনুষ্যদেহকে 'শ্রীচক্র'রূপে ধারণা করা হয়, শ্রীচক্রের পূজাই বহির্যাগ। পিণ্ড মধ্যে শক্তির পঞ্চ রূপ—ত্বক্, অসৃক্, মাংস, মেদ ও অস্থি কল্পনা করা হয় ও শিবের চতুর্রূপ মজ্জা, শুক্র, প্রাণ ও জীব কল্পনা করা হয়। ব্রহ্মাণ্ডে শক্তির পঞ্চরূপ—৫ ভূত, ৫ তন্মাত্র, ৫ জ্ঞানেন্দ্রিয়, ৫ কর্মেন্দ্রিয়, ৫ প্রাণ এবং শিবের চতুর্রূপ—মায়া, শুদ্ধবিদ্যা, মহেশ্বর ও সদাশিব, কল্পনা করিয়া বহির্যাগ নিষ্পন্ন হয়।[২]

এইরূপে বহির্যাগ পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের সম্বন্ধ স্থাপনা করিয়া যোগী মুক্ত হইবার প্রয়াস করেন। একটী জন্মে অস্মিতার তিনটী রূপ প্রকাশিত দেখা যায়, তাহারা যথাক্রমে মানস শরীর, প্রাণময় শরীর ও ভৌতিক শরীর। এই প্রত্যেক দেহের স্বকীয় দৈহিক অনুভূতি আছে। ভৌতিক দেহের জন্মদাতা পিতা ও মাতা, প্রাণময় ও মানস শরীরের জন্ম 'অহম্' হইতে হয়, কিন্তু প্রত্যেক জন্মের স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে সঞ্চিত থাকে। অস্মিতা স্বাতন্ত্র্যের আংশিক রূপমাত্র। মানব বারম্বার এই পৃথিবীতে দেহ ধারণ করিয়া আবির্ভূত হয়, মুক্তার হারের এক একটী মুক্তা তাহার এক একটী জন্মের ন্যায়, সমগ্র হারটী তাহার স্বাতন্ত্র্যকে নির্দ্দেশ করে। উহাই অহম্ বা 'আত্মা'। ইহার অংশমাত্র নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্টরূপ দেহ ধারণ করিয়া প্রকাশিত হয়, তাহাই 'অস্মিতা' নামে খ্যাত। জ্যামিতির বিংশ ত্রিকোণ যুক্ত icosahedron নামক ঘনবস্তুর প্রত্যেকটী ত্রিকোণ 'অস্মিতাকে' ব্যক্ত করিবার উপমা স্বরূপ। বিংশ ত্রিকোণকে পরস্পর সমীপবর্ত্তী স্থাপন করিলেও ঘনবস্তুর তৃতীয় মাত্রার অনুভূতি হইবে না, তদ্রূপ প্রত্যেক জন্মকে ধার্য্য করিয়া তাহাদের এক সঙ্গে ধারণা করিলেও প্রকৃত স্বাতন্ত্র্য পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইবে না। এই বিধানে থিয়সফিষ্ট সম্প্রদায় শরীরের ভেদ নির্ণয় করেন।[৩]

সিদ্ধযোগীর সাধনায় সেই পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যের উপলব্ধিই বা আত্মোপলব্ধির সাধন দেখা যায়। সিদ্ধগণ এক জন্মেই যোগসাধনার দ্বারা ও

১। অমৃতবচন পৃ ২৬, ২৭, ৩০, ৪১ ও ভূমিকার ৵০।
২। Wave of Bliss. Arthur Avalon p. 9.
৩। First Principles of Theosophy, ch. VI, Jinarajadasa.

পিণ্ডের বিচার দ্বারা পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের সংযোগ স্থাপনা করিয়া শিবত্ব-লাভের প্রয়াস করেন। সেই নিমিত্ত মধ্যযুগের সাধনায় শ্রীচক্রপূজাদির স্থান আছে। তাহার দ্বারা বহির্যাগ সাধনের সহিত অন্তর্যাগ সাধনই মুখ্যতম লক্ষ্য। মানবের মন অতিশয় বক্র, তাহাকে সরল করিয়া নাদজয়ী শক্তিরূপে সুষুম্না পথে প্রবেশ করানই সাধন। আদ্যাশক্তি তালুমূলে উর্দ্ধে শূন্য স্থানে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিতেছেন, পৃথ্বী-মণ্ডলে আসিয়া সৃষ্টি নিবৃত্ত হয়, তাই পৃথিবীতে নিবৃত্তিকলা এবং রসতত্ত্বে প্রতিষ্ঠা, বহ্নিতে বিদ্যা, বায়ুতে শান্তি, আকাশে শান্ত্যতীতা কলা। নাদশক্তি শব্দব্রহ্ম মূলাধারে আধারপদ্মে আসিয়া জড়ভাবাপন্ন হন, তাই যোগী সেই জড়তা মুক্ত করিতে সুষুম্নার পথে শক্তিকে উর্দ্ধে নীত করেন। বিভূতিলাভ বা আত্মসাক্ষাৎকার, যাহার জন্যই হউক, মনকে সুষুম্না পথে চালিত করিতেই হয়, সুষুম্না সর্ব্বশক্তির আধার। এই পথেই মন শূন্যে নীত হয়, শূন্য কি তাহা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে নির্ণয়ের চেষ্টা করিব।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

শূন্যতত্ত্ব

'শূন্যতত্ত্ব' শব্দটী স্বভাবতঃই আমাদিগকে বৌদ্ধধর্ম্মের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, কারণ বৌদ্ধেরা শূন্য হইতে জগতের উদ্ভব কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষে প্রাচীন যুগ হইতে শূন্যতত্ত্বের ধারণা প্রচলিত আছে, ঋগ্‌বেদের যুগেও শূন্যবাদ প্রচারিত হয়, অতএব শূন্যতত্ত্ব বা শূন্যবাদ যে কেবল বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত যুক্ত এরূপ ধারণা করা অযথার্থ। 'শূন্যের' সংজ্ঞা সম্বন্ধে মতভেদ আছে, কারণ মধ্যযুগের বহু সাধকসম্প্রদায় উহার প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে না পারিয়া স্ব স্ব কল্পনা অনুযায়ী শূন্যতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুত্থান-কাল হইতে যে সকল বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইয়াছে তাহাদের সকলের মধ্যেই কোন না কোন প্রকারে শূন্যের উল্লেখ দেখা যায়। জৈনধর্ম্মে শূন্যের স্থান না থাকিলেও শূন্যের কথা পাই—

যথা— সুণ্ণ ন হোই সুণ্ণঁ দীসই সুণ্ণঁ চ তিহুবণে সুণ্ণ
অবহরই পাবপুণ্ণঁ সুণ্ণঁ সহাবেণঁ নও অপ্পা।[১]

অর্থাৎ শূন্য শূন্য নহে, শূন্য হইতেই শূন্য দেখা যায়, ত্রিভুবন শূন্য, পাপ শূন্য, সমস্তই এই শূন্যস্বভাবে বিলীন হয়।

কালক্রমে নাথধর্ম্মের উদ্ভব হইলে তাহাতেও 'শূন্যের' ধারণা প্রবেশ করে। সহজিয়া বৌদ্ধের শূন্যসমাধিই সহজাবস্থালাভ, নাথসিদ্ধের সমরস-সাধনই সহজাবস্থা লাভ, ইহাই পরমপদে স্থিতি। সহজিয়ামতের সহজাবস্থাই 'মহাসুখ', ইহা বিকল্পহীন অবস্থা, এই অবস্থায় জরামরণ থাকেনা, কর্ত্তৃত্ববোধ লুপ্ত হয়।[২] গুরুর উপদেশে শুদ্ধজ্ঞানের উদয় হয়, সেই গুরুর স্বরূপ 'যুগনদ্ধরূপ' বা প্রজ্ঞা ও উপায়ের মিলনস্বরূপ। নাথমতেও গুরু উপদেশে শিব ও শক্তির পার্থক্য পরিহার করিয়া তত্ত্বাতীত অবস্থায় উপনীত হওয়াই পরমপদ লাভ। ইহাই শিব ও শক্তির মিলন বা সামরস্য।

১। পাহুড়া দোঁহা উল্লেখ—মধ্যযুগের জৈন ও বৌদ্ধসাধনের ধারা—'পরিচয়' আষাঢ় ১৩৪৭, ডঃ প্রবোধ বাগ্‌চী।

২। চর্য্যা ২৮ দ্রষ্টব্য।

বৌদ্ধ সহজিয়া তৃতীয় ও চতুর্থ শূন্যের মিলনে অনাদি দিব্য মিথুনাবস্থার কল্পনা করেন, এই অবস্থায় যুগপৎ সর্ব্বধর্ম্মের উদয় হয়, সকল ভেদাভেদ দূর হইয়া অদ্বয়সিদ্ধি হয়। বৌদ্ধ সহজিয়ামতে চারিশূন্য কথা আছে, নাথমার্গের হঠযোগপ্রদীপিকা গ্রন্থের চতুর্থ উপদেশে শূন্যের কথা আছে।[১] ইহারা যোগের আরম্ভ, ঘট, পরিচয় ও নিষ্পত্তি অবস্থা-চতুষ্টয়ের সহিত যুক্ত শব্দের স্তরবিশেষ বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যথা—

ব্রহ্মগ্রন্থের্ভবেদ্ভেদো হ্যানন্দঃ শূন্যসম্ভবঃ।
বিচিত্রঃ ক্বণকো দেহেঽনাহতঃ শ্রূয়তে ধ্বনিঃ ॥৭০
দিব্যদেহশ্চ তেজস্বী দিব্যগন্ধস্ত্বরোগবান্।
সম্পূর্ণহৃদয়ঃ শূন্য আরম্ভো যোগবান্ ভবেৎ ॥৭১
দ্বিতীয়ায়াং ঘটীকৃত্যে বায়ুর্ভবতি মধ্যগঃ।

*　　*　　*

অতিশূন্যে বিমর্দ্দশ্চ ভেরীশব্দস্তথা ভবেৎ ॥৭৩
তৃতীয়ায়াং তু বিজ্ঞেয়ো বিহায়োমর্দ্দলধ্বনিঃ।
মহাশূন্যং তদা যাতি সর্ব্বসিদ্ধিসমাশ্রয়ম্ ॥৭৪

এই গ্রন্থের অন্যত্র উক্ত হইয়াছে—

মুদ্রেয়ং খলু শাম্ভবী ভবতি সা লব্ধ্বা প্রসাদাদ্ গুরোঃ।
শূন্যাশূন্যবিলক্ষণং স্ফুরতি তত্তত্ত্বং পরং শাম্ভবম্ ॥[২]

অর্থাৎ গুরুপ্রসাদে শাম্ভবী মুদ্রা লাভ হইলে যে পরমতত্ত্ব লাভ হয়, তাহা শূন্যাশূন্যভাববর্জ্জিত। এইরূপ যোগীই নাথমতে 'জীবন্মুক্ত'।

বস্তুতঃ সহজিয়াদের সহজাবস্থালাভ বা তুরীয়াতীত অবস্থালাভ, নাথমার্গের উন্মনী অবস্থা বা পাতঞ্জল যোগের অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি।

বৌদ্ধ সহজিয়া কৃষ্ণাচার্য্য বলিয়াছেন, মহাসুখের নিবাস চতুর্দ্দলপদ্ম মধ্যে :—

(চউ) পত্তর চউক্কম চউমৃণাল শিচঅ মহাসুখবাসে।[৩]

অর্থাৎ শূন্যমতিশূন্যং মহাশূন্যমিতি চতুঃশূন্যস্বরূপেণ পত্রচতুষ্টয়ং চতুরাদি-স্বরূপেণ চতুর্মৃণালসংস্থিতা। মহাসুখং বসত্যস্মিন্নিতি মহাসুখাবাস উষ্ণীষকমলং তত্র সর্ব্বশূন্যালয়ো—মেরুগিরিশিখরমিত্যর্থঃ ॥[৩]

১। শ্লোক ৭০ ইত্যাদি।　২। হ-যো-প্র ৪।৩৭　৩। দোহাকোষ পৃ ১২৪ নং ৫ ও টীকা

এইরূপে 'শূন্য' নির্গুণ সাধকদের মধ্যেও প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রের নামান্তরে দাঁড়াইয়াছে।

কবীরাদি এই 'শূন্য'-মণ্ডল মধ্যে পরম জ্যোতির প্রকাশ বর্ণনা করিয়াছেন।

নাথসম্প্রদায়ে প্রচলিত 'অমনস্ক' নামক গ্রন্থে আছে যোগী শূন্যপর হইবেন, চিন্তানাশ হইলে আত্মতত্ত্ব প্রাদুর্ভূত হয়। অতএব সর্ব্ব বৃত্তি নিরোধের দ্বারা যোগীর প্রযত্ন কল্পনা সংকল্প ও চিন্তাশূন্য হইলে অর্থাৎ যোগী সর্ব্বদা শূন্যময় হইয়া থাকিলে তত্ত্বের প্রকাশ হইবে। যথা :—

> ন কিঞ্চিচ্চিন্তয়েদ্ যোগী সদা শূন্যপরো ভবেৎ।
> ন কিঞ্চিচ্চিন্তনাদেব স্বয়ং তত্ত্বং প্রকাশতে ॥
> বাঙ্মনকায়সংক্ষোভং প্রযত্নেন বিবর্জ্জয়েৎ।
> দিশা চান্তমিবাত্মানং সুস্থিরং ধারয়েৎ সদা ॥
> যাবৎ প্রযত্নলেশোঽস্তি যাবৎ সংকল্পকল্পনা।
> যাবৎ চিন্তাধিকারোঽস্তি তাবত্তত্ত্বকথা কৃতঃ ॥[১]

এই তত্ত্বের প্রকাশে তত্ত্বলীন যোগী নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন, নির্ব্বাতে স্থাপিত অচঞ্চল দীপের ন্যায় জগদ্ব্যাপারে বিনির্মুক্ত যোগী নির্ম্মল ও নিশ্চলমনা হন। গীতাতেও আছে—

> যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
> যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ ॥[২]

অর্থাৎ নির্ব্বাত স্থানে অবস্থিত দীপশিখা যেমন কম্পিত হয় না, আত্মযোগ অনুষ্ঠানকারী যোগীর একাগ্র মনের সেই উপমা জানিবে অর্থাৎ যোগীর চিত্ত সেইরূপ স্থির দীপশিখার ন্যায় নিশ্চলভাবে অবস্থিত থাকে।

শব্দাদি বিষয় ত্যাগ করিয়া যোগী জলমধ্যে প্রক্ষিপ্ত লবণের ন্যায় ক্রমশঃ ব্রহ্মমধ্যে লীন হইয়া যান।

> লবণং তোয় সম্পর্কাদ্ যথা তোয়সমং ভবেৎ।
> মনোঽপি ব্রহ্মসম্পর্কাত্তথা ব্রহ্মময়ং ভবেৎ ॥
> যথা ক্ষারময়ত্বেন প্রাপ্যতে লক্ষণং স্বকং ॥
> ব্রহ্মজ্ঞানময়ত্বেন নির্ব্বাণং মনসস্তথা।

১। অমনস্ক, দ্বিতীয় অধ্যায় ৪৩—৪৫ শ্লোক। ২। গীতা ৬।১৯

ঘৃতাৎ পৃথগ্বিরহিতং ঘৃতে লীনং ঘৃতং যথা ॥
তত্ত্বে লীনস্তথা যোগী পৃথগ্‌ভাবং ন বিন্দতি ।[১]

বৌদ্ধ ও জৈন সাধনায় ইহার অনুরূপ কথা পাই। সরহপাদ বলিয়াছেন—

অলিঙ্গ ধর্ম্ম মহাসুখ পইসই
লবণ জিম পানী হি বিলিঞ্জই ॥

অর্থাৎ লবণ যেমন জলে বিলীন হয়, অলীক ধর্ম্মসমূহও তেমনি 'মহাসুখে' বিলীন হয়। বৌদ্ধযোগ মতে ইহা 'সহজানন্দ'। 'সমরস' বা 'সহজানন্দ' একই ভাবাত্মক।

পাহুড়া দোঁহায় পাই—

জিম লোণু বিলিজ্জই পাণিয়হুঁ
তিন জই চিত্ত বিলিজ্জ।

অর্থাৎ চিত্ত তখন এমনভাবে বিলীন হয় যেমন লবণ জলের মধ্যে বিলীন হয়।[২]

শ্বাসপ্রশ্বাস সমান হইলে সুষুম্নাদ্বার মুক্ত হয়, ইহাই শূন্যপদবী বা ব্রহ্মনাড়ী, চন্দ্রসূর্য্যের মিলন ভিন্ন এই শূন্যপথ উন্মুক্ত হয় না। শূন্যতাও আপেক্ষিক, অতএব হঠযোগে শূন্য, অতিশূন্য, মহাশূন্য স্তরভেদ আছে, বিশুদ্ধ শূন্যই 'নির্ব্বাণপদ', ইহা বাসনাকামনাহীন, কর্ম্মাশয়হীন, তত্ত্বাতীত অবস্থা। শিব ও শক্তির পার্থক্য বা বিন্দুদ্বয় অতিক্রম না করিলে শূন্যাবস্থার উদয় হয় না। পারমার্থিক অবস্থাই 'শূন্য' নামে পরিচিত। শূন্য, অতিশূন্য, মহাশূন্যে ক্লেশাদি মল আছে, কিন্তু চতুর্থ বা তুরীয়শূন্য নিরুপাধিক, ইহা অদ্বৈতভূমি। ইহার প্রভাবে তিন শূন্যের দোষ অপগত হয়, তাই ইহা বিশুদ্ধশূন্য, বৌদ্ধ সহজিয়া মতে ইহার নাম 'প্রভাস্বর'। প্রথম তিনশূন্যে কায়ানন্দ, চিত্তানন্দ, রাগানন্দ অনুভূত হয়, ইহারা একরস হইয়া চতুর্থ আনন্দের আবির্ভাব হয়, তখন জরামৃত্যুরাহিত্য হয় ও সিদ্ধিসকল করতলগত হয়। সপ্ত প্রকৃতিদোষ ও সমাধিমল দূর হয়, "নিবর্ত্তন্তে চ ধাতূনাং বন্ধং কুর্ব্বন্তি ধাতবঃ। চতুঃশ্বাসলয়েনাপি সপ্তধাতুগতা রসাঃ" ॥[৩] তৎপরে বিন্দু ও নাদ সাম্যপ্রাপ্ত হয়, বিকল্প থাকে না। গ্রাহকজ্ঞানরূপ

১। অমনস্ক, প্রথম অধ্যায় ২৩—২৮ শ্লোক।
২। মধ্যযুগের জৈন ও বৌদ্ধসাধনার ধারা—প্রবোধ বাগচী।
৩। অমনস্ক ১।৩৪

বিকল্পই বৌদ্ধ সহজিয়া মতে 'উপায়', গ্রাহ্যজ্ঞানরূপ বিকল্প 'প্রজ্ঞা', তন্ত্রের উহাই 'বিন্দু' ও 'নাদ'। চতুর্থআনন্দ বা অনুত্তরবোধিতে গ্রাহ্যগ্রাহক ভেদ থাকে না, উপায় ও প্রজ্ঞা বা নাদ ও বিন্দুর মিলন হয়, দ্বৈতভাব অদ্বৈতে পরিণত হইয়া নির্ব্বাণপদ প্রকাশিত হয়। অতএব নাথমতে নির্ব্বাণ লাভ করিতে হইলে চিত্তকে শূন্যময় করিবার উপদেশ আছে ইহা স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হইল।

এতদ্ব্যতীত নাথধর্ম্মে যে 'ব্যোমপঞ্চকে'র সাধনা আছে তাহাও শূন্যেরই সাধনা। আকাশ, পরাকাশ, মহাকাশ, তত্ত্বাকাশ ও সূর্য্যাকাশ ইহারা ব্যোমপঞ্চক বা পঞ্চ আকাশ নামে পরিচিত। ইহা শূন্য হইতে শূন্যে গমনের সাধনা, ইহার বিস্তারিত বিবরণ নিবন্ধের সাধনা অংশে দেওয়া হইয়াছে। (এতৎসহ পরিশিষ্ট সংযোজিত সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতির দ্বিতীয় অধ্যায়ের শ্লোক ৩০ দ্রষ্টব্য।) ইহা দ্বারাও নাথপন্থে শূন্যসাধনার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়।

গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহে আছে, "তিষ্ঠতি খেচরী মুদ্রা তস্মিন শূন্যে নিরঞ্জনে"।[১] এখানেও শূন্য কল্পনা। নাথপন্থীদের মধ্যে শিবঠাকুরের সহিত নিরঞ্জনের পূজাবিধিও আছে, এই 'নিরঞ্জন' শূন্যমূর্ত্তি, নিগু´ণী সম্প্রদায়ের সাধকেরাও নিরঞ্জনের উপাসক। নাথযোগীরা ভারতের সর্ব্বত্র পর্য্যটন করিলেও শৈবতীর্থসকলই তাঁহাদের প্রধান তীর্থ বলিয়া পরিগণিত হয়, তবে উঁহাদের আচার-পদ্ধতি বর্ণাশ্রমী হিন্দু হইতে ভিন্ন হওয়ায়, কালক্রমে অন্যান্য সাধন-পদ্ধতির নাথপন্থে সমাবেশ হওয়া বিচিত্র নহে। ডাঃ পীতাম্বর বড়থ্বাল বলিয়াছেন, নিরঞ্জন সম্প্রদায় নাথ-সম্প্রদায় হইতে উদ্ভূত। ইহা নাথ ও নিগু´ণ সম্প্রদায়ের মধ্যবর্ত্তী সম্প্রদায়-বিশেষ, কবীরাদির সহিত বিশেষ মতদ্বৈধ ইহাদের নাই।[২]

নিরঞ্জন শব্দের অর্থ, যাঁহার অঞ্জন বা কালিমা নাই (নিঃ+অঞ্জন)।

ডাঃ প্রবোধ বাগচীও বলিয়াছেন, হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মগুলির বহিরঙ্গ বা ক্রিয়াকাণ্ডের প্রভাব দূর হইয়া খৃষ্টীয় দশম একাদশ শতাব্দীতে সাধন বিষয়ে একটী ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যায়, পরবর্ত্তী কালে বৈষ্ণব ও রামানন্দী সম্প্রদায়ের সাধকেরা এই সাধনপন্থারই পুষ্টিসাধন করেন।... বৌদ্ধধর্ম্মের শেষযুগের গ্রন্থসমূহে মন্ত্রজপ, শাস্ত্রপাঠ, দেবদেবীর আবাহন,

১। গো. সি. স পৃ ৩৬
২। নিগু´ণ সম্প্রদায়ে বড়থ্বাল ভূমিকায় ৵০ ৶০

গুরুশিষ্যের জাতিবিচার প্রভৃতি বহিরঙ্গ কিছু নাই, একমাত্র 'যোগ' বা অন্তরঙ্গ সাধনই এই যুগের প্রধান অঙ্গ।[১]

অতএব মধ্যযুগের ধর্ম্মসম্প্রদায়গুলির মধ্যে সাধনগত ঐক্য থাকা বিচিত্র নহে। দশম বা একাদশ শতাব্দীতে রচিত বৌদ্ধদোঁহা ও চর্য্যাপদের সহিত তন্ত্রশাস্ত্রের যোগ দেখা যায়, নাথপন্থেও কুণ্ডলিনী জাগরণ প্রসিদ্ধ, কুণ্ডলী অর্থাৎ যাহা কুণ্ডলাকার অর্থাৎ বৃত্তাকার বা শূন্যাকার।

নাথপন্থীদের মধ্যে ওঁকার বা প্রণব সাধনার বিশিষ্ট স্থান আছে। গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহে আছে, "অয়মোঙ্কারো মহাসিদ্ধানাং ধ্যেয়ঃ।" তান্ত্রিক সাহিত্যে প্রণবের ব্যাপিনীকে 'শূন্য' নামে অভিহিত করা হয়। ব্যাপিনী ওঁকারের মাত্রাংশ, ওঁকারের স্বরূপ অধ্যায়ে ইহার বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য। নাথ সম্প্রদায়ের কোন কোন গ্রন্থে ব্যাপক নিরাকার নাথস্বরূপের বিবরণ প্রণবের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে পাওয়া যায়। আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপিনী ও নিরাকারনাথকে অভিন্ন বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু তত্ত্বতঃ উভয়ের মধ্যে কিছু বৈলক্ষণ্য আছে তাহাতে সন্দেহ নাই, কারণ তন্ত্রমতে ব্যাপিনীর পর সমনা, সুতরাং ব্যাপিনী মহামনের অন্তর্গত অবস্থা। নাথগণ নিরাকার-নাথকে মনের অন্তর্গত বলিয়া স্বীকার করেন না, অন্ততঃ সেরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রণবের স্বরূপ যথা—"উকারোঽত্ররুদ্রস্বরূপম্ অর্দ্ধমাত্রা শক্তিস্বরূপম্ বিন্দুর্নাথস্বরূপম্ অর্দ্ধমাত্রয়াজাতোঽকারো বিষ্ণু-স্বপরূম্ বিন্দোর্জাতো মকারো ব্রহ্মস্বরূপম্ ধ্বনির্নিরাকার নাথস্বরূপম্ ব্যাপকং ধ্বনির্বর্ণশ্চোভয়মুপি মিলিতং পূর্ণং যদদ্বৈতাদ্বৈতবিলক্ষণম্ সাকার নিরাকারাতীতম্ অদ্বৈতোপরবর্ত্তি মহানাথ স্বরূপমিতি।......পুনর্ধ্বনি-র্নিরাকারনাথরূপং ধ্বনির্বর্ণশ্চোভয়াত্মকঃ পূর্ণনাথস্তু .. ধ্যানভাগস্যাধিক্যাৎ ধ্বনিশ্চ নাথরূপমেব"।[২]

পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ উল্লিখিত গোরক্ষবোধেও ওঁকারধ্বনি ও শূন্যতত্ত্বের কথা আছে। যথা, চঞ্চল মন যখন স্থির হইয়া শূন্যে থাকে তখন ওঁকারধ্বনি শ্রুত হয়। মনের চঞ্চল অবস্থায় সে ধ্বনি শোনা যায় না। ওঁকার ধ্বনি হইতে জগতের উৎপত্তি। যখন সকলই স্থির থাকে, তখন সমস্তই মহাশূন্যে বিলীন থাকে। কিন্তু সেই মহাশূন্যে যখন স্পন্দন উদ্ভূত হয়, তখনই জগতের সৃষ্টি হয়। আকাশের স্পন্দন হইলেই শব্দ সম্ভূত

১। পরিচয় পত্রিকা, আষাঢ় ১৩৪৭ প্রবোধ বাগচী প্রবন্ধ মধ্যযুগের জৈন ও বৌদ্ধ সাধনার ধারা।
২। গো. সি. স. পৃ ৫৭

হয়, সেই শব্দই ওঁকারনাদ। মহাব্যোমে এই ওঁকারনাদ অনবরতই হইতেছে। ইত্যাদি।[১]

আর একখানি গোরক্ষবোধের পুঁথি (ইহাতে কবীরপন্থীদের মতামত অল্পাধিক প্রবেশ করিয়াছে) তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, "অবিনাশীর জীব শূন্য, শূন্যের জীব অনুপ, অনুপের জীব কাল, কালের জীব শিব, শিবের জীব নিরঞ্জন, নিরঞ্জনের জীব একব্রহ্ম। নিরঞ্জন অনিল হইতে উৎপন্ন, শিব নিরঞ্জন হইতে উৎপন্ন, কাল শিব হইতে উৎপন্ন, ওঁকার কাল হইতে উৎপন্ন। শূন্য ওঁকার হইতে উৎপন্ন।......তনুত্যাগ হইলে মন পবনে মিশিয়া যায়, পবন শব্দে মিশিয়া যায়, ··· শূন্য ওঁকারে মিশে।"[২]

অতএব ওঁকার সাধন করিতে হইলে শূন্যের সাধনা অত্যাবশ্যক ইহা গোরক্ষবোধ হইতে সহজেই অনুমেয়।

সদানাথ যোগী রচিত 'গোরক্ষ-বিকাশ' নামক গ্রন্থে রাজপুতনায় প্রাপ্ত গোরক্ষবোধের উল্লেখ আছে, তাহাতেও প্রশ্নোত্তর ছলে শূন্যের বাস কোথায়?—শূন্যের নিরন্তরে বাস। মনের কোন্ রূপ?—মনেব 'শূন্য' রূপ। হৃদয় যখন ছিল না তখন শূন্যে মন থাকিত। "মন সো আত্মা শূন্য সমায়," ইত্যাদি নানা কথা আছে।[৩]

উপরোক্ত গোরক্ষবোধ ও ডাঃ মোহন সিং উল্লিখিত গোরক্ষবোধে সমজাতীয় প্রশ্নোত্তর আছে, তবে শ্লোকসংখ্যায় পার্থক্য আছে, যথা—কায়ামধ্যে কয়লাখ চান্দ? পুষ্পমধ্যে কি সুগন্ধ, দুগ্ধমধ্যে কোথায় ঘৃত, দেহমধ্যে কোথায় জীব, এই প্রশ্নটী উল্লিখিত গোরক্ষ-বিকাশে উল্লিখিত গোরক্ষবোধের শ্লোকসংখ্যা ১৩, ডাঃ মোহন সিং রচিত গোরক্ষনাথ গ্রন্থে উল্লিখিত গোরক্ষবোধের শ্লোক সংখ্যা ৩৩।

স্বামীজি—কোন শূন্যসে উৎপন্না আয়, কোন শূন্য সদ্‌গুরু বুঝায়।
কোন শূন্যমে রহে সমায়, যে তত্ত্ব কহে গুরু সমঝায়॥
অবধো— সহজ শূন্যসে উৎপন্ন হৈ, সমঝ শূন্য সদ্‌গুরু বতলায়।
অতীত শূন্যমে রহে সমায় যে তত্ত্ব কহে গুরু সমঝায়॥
স্বামীজি—কোন শূন্যসে জ্যোতি পলটৈ, কোন শূন্যসে ত্রিভুবন সার।
কোন শূন্যসে বাণী ফুরকে, কোন শূন্যসে উত্তরে পার॥

১। প্রবাসী, চৈত্র ১৩২৯ 'যোগিজাতি', অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।
২। প্রবাসী, চৈত্র ১৩২৯ যোগিজাতি প্রবন্ধ।
৩। গোরক্ষ-বিকাশ, সদানাথ যোগী, পৃ ৬৬, ৬৭, ৭৯ প্রশ্নোত্তর ৫, ৭, ৮, ২০, ১১৪।

অবধো—উগ্রতেজ সে জ্যোতি পলটে, প্রভু শূন্যসে ত্রিভুবন সার।
সোহহংশূন্য সে বাচা ফুরকে, অতীত শূন্যসে উত্তরে পার ॥[১]

এই যোগ-সাধন শূন্য-সাধনার নামান্তর, এই 'শূন্য' নিরাকার। সাকার উপাসনায় বা ব্রহ্মলাভে শূন্যতত্ত্বের প্রশ্ন উঠে না। এই শূন্য সাধনাই যোগীর লয়সাধনা।

লয়সাধনা দ্বারা উন্মনী অবস্থাপ্রাপ্তিই নাথযোগীর লক্ষ্য। এই অবস্থাপ্রাপ্তি হইলে নির্ব্বিষয় যোগীর চিত্ত—

"অন্তঃ শূন্যে বহিঃশূন্যঃ শূন্যঃ কুম্ভ ইবাম্বরে
অন্তঃ পূর্ণো বহিঃপূর্ণঃ পূর্ণঃ কুম্ভ ইবার্ণবে"

হয়, অর্থাৎ লয় অবস্থায় যোগীর চিত্ত শূন্যময় হয়।[২]

উন্মনী অবস্থায় শূন্য কল্পনা অন্যত্রও পাই, যথা—শূন্যই মন্দিব, শব্দ তার দ্বার, জ্যোতিই মূর্ত্তি, অগ্নি দুর্জ্জেয়, অরূপেব রূপ ধ্যানে বা গুরুর আদেশে সাধক গুপ্ততত্ত্ব জানিতে পারে বা উন্মনী অবস্থা প্রাপ্ত হয়।[৩]

গোবক্ষনাথ-কৃত পদে আছে "জীবতে হি উলটা মবনা। সহজি হী আকাশ চরনা" ইত্যাদি।[৪] এই স্থানে সহজভাবে আকাশ গমনের কথায় শূন্য-সাধনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

শূন্য আমাদের মধ্যে আছে। নাদেব উৎপত্তি অজ্ঞেয়ে বা ওঁকারে, ইহাব শূন্যে স্থিতি, ইহাব পবনের মধ্যে লয়, নিবঞ্জন বা কায়াহীনের সহিত বা আকাশেব সহিত ইহার মিলন সম্ভব।[৫]

প্রশ্ন। কায়া ন হোতী তব কহাঁ রহতা সূরজ চান্দ।
পুহ্প ন হোতা তব কহাঁ রহত গন্ধ।
দুধ নহী হোতা তব কহাঁ রহতা ঘীব।
কায়া ন হোতা তব কহাঁ রহতা জীব?—

উত্তব। কায়া ন হোতী তব নিরন্তরি (মধ্যে) রহতা সূরজ চন্দ।
পুহ্প নহী হোতা তব অনহদ বহতা গন্ধ।
দুধ ন হোতা তব সুনি রহতা জীব।
কায়া ন হোতী তব প্রম (পরম) সুনি রহতা জীব ॥[৬]

১। গোরক্ষ-বিকাশে উল্লেখ গোরক্ষ-বোধ প্রশ্নোত্তর ৫১, ৫২ এবং ৬৩ ৬৪
২। মন্ত্রযোগ, অবধূত জ্ঞানানন্দ পৃ ১৮৪।
৩। ডাঃ সিং গোরক্ষনাথ—গোরক্ষবোধ শ্লোক ১২০।
৪। ঐ ঐ পরিশিষ্ট—গোরক্ষনাথের পদ।
৫। ঐ ঐ গোরক্ষবোধ শ্লোক ৬, ৪০।
৬। ঐ ঐ ঐ ৩৫, ৩৬।

মন কি কি অবস্থায় উন্মনী প্রাপ্ত হয়? তাহার উত্তর আমাদের মধ্যে যে আকাশ আছে তাহাতেই মনের 'উন্মনী' অবস্থার আবাস। সহজ হংস খেলাশেষে শূন্যে স্থিতি করে, আকার যখন নিরাকার প্রাপ্ত হয় তখন হংস অর্থাৎ আত্মা 'পরম জ্যোতি'তে বাস করে। জ্যোতিই পরমতত্ত্বকে ধারণ করিয়া রাখে, ইহাই মৎস্যেন্দ্রনাথের বিচার এবং 'মন সু আত্মা সুনি সমাই" অর্থাৎ মন শূন্য মধ্যেই বিলীন হইয়া থাকে।[১]

এই শূন্যতত্ত্বের প্রভাব হইতে বঙ্গীয় গীতিকাব্য রচয়িতারাও মুক্ত হইতে পারেন নাই। গোপীচন্দ্রের মাতা ময়নামতীর গানে (ভট্টশালী ও শিবচন্দ্র শীল সম্পাদিত) নাথধর্ম্মের খ্যাতনামা হাড়িপা শূন্য হইতে সমস্ত বিশ্বের উদ্ভব কল্পনা করিয়াছেন। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে রামাই পণ্ডিত বঙ্গদেশে ধর্ম্মপূজার প্রচলন করেন, এই ধর্ম্মঠাকুরের মূর্ত্তিও শূন্যমূর্ত্তি, ইঁহার নাম নিরঞ্জন অর্থাৎ নির্ম্মল। এই ধর্ম্মপদ্ধতির নাম 'শূন্যপুরাণ'। একাদশ শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম্ম হীনপ্রভ হইতে থাকে, 'বৌদ্ধ'শব্দ অর্থদুষ্ট হইয়া নাস্তিক পদবাচ্য হইয়া পড়ে, এই কারণেই সম্ভবতঃ ধর্ম্মের উপাসকগণ নিজেদের 'সদ্ধর্ম্মী' বলিতে লাগিলেন। "সদ্ধর্ম্মীরে করএ বিনাস" (শূন্যপুরাণ বসুমতী সং, পৃ ২৩৩)। অশোকের সময়ে বিশুদ্ধধর্ম্মই সদ্ধর্ম্ম নামে পরিচিত ছিল। ধর্ম্মঠাকুর সম্ভবতঃ বুদ্ধদেবের নামান্তর, তাঁহার মূর্ত্তি হিন্দুর দেবদেবীর ন্যায় নহে, কূর্ম্ম বা স্তূপের মূর্ত্তি। শূন্যপুরাণে ধর্ম্মের ধ্যান যথা—

"শূন্যরূপং নিরাকারং সহস্রবিঘ্নবিনাশনং।
সর্ব্বপরঃ পরদেবঃ তস্মাত্ত্বং বরদো ভব॥
নিরঞ্জনায় নমঃ॥[২]

এই সদ্ধর্ম্মীরা অহিংসাব্রতী হইয়াও হিন্দুর মনস্তুষ্টির জন্য ছাগবলির ব্যবস্থা করিলে ক্রমশঃ ধর্ম্মঠাকুর শূন্য নিরঞ্জন রূপে হিন্দুসমাজে স্থান পান। আবার "নিরঞ্জনের রুষ্মা" নামক শূন্যপুরাণের শেষে যে অধ্যায়টী আছে তাহাতে 'ব্রহ্মা হৈল মহম্মদ, বিষ্ণু হইল পেকাম্বর' ইত্যাদি থাকায় মুসলমানের সংস্পর্শে আসিবার চিহ্ন দেখা যায়। এই অধ্যায়টী যে প্রক্ষিপ্ত বাদ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

রামাই পণ্ডিতের শূন্যমূর্ত্তি করুণাময় ও ধবলাকার, কারণ তিনি

১। ডাঃ সিং গোরক্ষনাথ—গোরক্ষবোধ, ১৭, ১৮, ৪৪, ৭২, ১২৮
২। শূন্যপুরাণ ভূমিকা পৃ ৯। মুহম্মদ্ শহীদুল্লাহ।

জ্যোতির্ম্ময়। এই শূন্যের রূপ দ্বিবিধ,—নিরঞ্জন ও ধর্ম্ম ; তন্মধ্যে নিরঞ্জন নিরাকার, ধর্ম্ম সাকার। নিরঞ্জনের স্বেদজল হইতে আদ্যাশক্তির জন্ম, তিনি সপ্তবার জন্মগ্রহণ করার পর হিন্দুর শিবপত্নী চণ্ডীতে পরিণত হন—"মহেশ করিবে বিভা জন্মজন্মান্তরে" (শূন্যপুরাণ বসুমতী সং পৃ ৪১)। ধর্ম্মঠাকুরও ক্রমশঃ শিব ও বিষ্ণু মধ্যে আত্মনিমজ্জন করিয়া পরম নির্ব্বাণ লাভ করেন। এই ধর্ম্মপূজা বঙ্গের লৌকিক পদ্ধতিমাত্র, ইহা হিন্দু ও বৌদ্ধ পদ্ধতির মিশ্রণে উৎপন্ন। ধর্ম্মপূজায় নিরঞ্জনের কল্পনা ও সৃষ্টিতত্ত্ব ভিন্ন অপর কোন বৌদ্ধপ্রভাব দেখা যায় না। পরবর্ত্তী কালের কবীরপন্থাদির ন্যায় বঙ্গদেশীয় ধর্ম্মপূজা একটী সঙ্কর ধর্ম্মবিশেষ। শূন্যপুরাণে অর্ব্বাচীন অংশে 'অথ যজ্ঞ' মধ্যে আদিনাথ, মীননাথ, চৌরঙ্গীনাথ প্রভৃতির উল্লেখ আছে। 'গোরক্ষ-বিজয়' গ্রন্থে দেবী কর্ত্তৃক সিদ্ধগণের নিমন্ত্রণ ও পরীক্ষা বৃত্তান্ত আছে, 'শূন্যপুরাণে' সিদ্ধদের নিমন্ত্রণের উল্লেখমাত্র আছে। শূন্যপুরাণের প্রাচীন অংশে নাথসিদ্ধগণের বা মুসলমান পীর প্রভৃতির উল্লেখ নাই।

বৌদ্ধেরা আলোক হইতে অন্ধকারের উৎপত্তি কল্পনা করেন, বেদপন্থী হিন্দুমতে অন্ধকার হইতে জগতের উৎপত্তি, এই অন্ধকারই শূন্যের স্বরূপ, বৌদ্ধদের শূন্য 'স্বয়ংজ্যোতি'। রামাই পণ্ডিতের শূন্য হইতেই বিশ্বের উদ্ভব-কল্পনা দৃষ্ট হয়, কিন্তু সে শূন্য জ্যোতির্ম্ময়, ইহা বৌদ্ধমতের অনুরূপ কল্পনা। বৌদ্ধ ত্রিরত্নের সংঘও শঙ্খ নামে বিকৃত হইয়া ধর্ম্মপূজায় স্থান পাইয়াছে মনে হয় 'সংখ উপজিল সংখ সংখর বিচার' (শূন্য পুরাণ, পৃ ১৪৭)।

বঙ্গদেশে ধর্ম্মপূজার অপর নাম 'দেলপূজা'। চৈত্র-সংক্রান্তিতে দেল বা দেউল পূজা হইয়া থাকে, দেউলকে পাটও বলা হয়। পাটস্কন্ধে ভিক্ষা করা ও চড়ক-সংক্রান্তির দিন বাণফোড় ইত্যাদি কৃচ্ছ্রসাধন ইহার অঙ্গবিশেষ, পশ্চিমবঙ্গে ইহা 'গাজন-পূজা' নামে পরিচিত। দেউল মধ্যে মহাদেব অবস্থান করেন। দেলপূজার ছড়ার সৃষ্টি-কাহিনীর সহিত শূন্যপুরাণের সৃষ্টি-কাহিনীর মিল আছে। ধর্ম্ম নিরঞ্জনের উল্লেখও পাওয়া যায়। শূন্যপুরাণে 'নহি রেক নহি রূপ, নহি বন্ন চিন'এর সহিত দেলপূজার "রূপরেক না ছিল গোসাঞিঃ"র তুলনীয়। আবার দেলপূজার

মনেতে জন্মিল চন্দ্র চক্ষে দিবাকর।
মুখেতে জন্মিল ইন্দ্র অতি খরতর॥
প্রাণেতে জন্মিল পবন জগতের প্রাণ।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর জন্মিল স্থানে স্থান।

ইত্যাদির সহিত ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তের সাদৃশ্য দেখা যায়। দেলপূজার ছড়া রচয়িতা একজন কবি নহেন। দক্ষিণবঙ্গে ইহাকে অষ্টকের গান বলে, সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত নৃত্যগীতের পর চৈত্র-সংক্রান্তিতে পূজা শেষ হয়।[১]

দেলপূজার ছড়ায় 'অমুক নাথকে বর দাও, ভোলা মহেশ্বর' আছে, এই পূজা দক্ষিণবঙ্গে অধিক প্রচলিত। উত্তরবঙ্গে ধর্ম্মঠাকুরের পূজা হয়, ধর্ম্মমঙ্গল সাহিত্যে নাথদের দান স্বীকার্য্য, ধর্ম্মপূজা হিন্দু ধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের শূন্যবাদের মিশ্রণে উৎপন্ন। এই শূন্য পরম তত্ত্ব, ইহা অভাব বা নঞ্ নহে। সাধারণতঃ বৌদ্ধেরা জগতের পরিবর্ত্তনকে শূন্যের স্বরূপ মনে করেন, শঙ্করের মায়াবাদ ইহারই প্রকারভেদ। ধর্ম্মমঙ্গল সাহিত্যেও ধর্ম্মপূজার শিব ও ধর্ম্ম উভয়েই স্থান পাইয়াছেন। গাজনের ছড়াতেও ধর্ম্মের স্থান আছে, এই ধর্ম্মঠাকুরই নিরঞ্জন বা নারায়ণ। লাউসেন এই ধর্ম্মদেবতার বরে পিতৃরাজ্য উদ্ধার করেন। লাউসেন ও রঞ্জাবতীর পুরোহিত রামাই পণ্ডিত। ধর্ম্মমঙ্গলগুলিতে লাউসেন-কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে হিন্দু-মুসলমানের যুদ্ধের কথা থাকায় ইহাকে মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্বের কাহিনী বলিয়াই সিদ্ধান্ত করা যায়।

দেখা গেল 'শূন্য' 'নিরঞ্জন', 'ধর্ম্ম' প্রভৃতি শব্দ ভারতীয় বিভিন্ন ধর্ম্মে বিভিন্নরূপে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার মূল কোথায়, সে সম্বন্ধে আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। অতএব সংক্ষেপতঃ শূন্যতত্ত্বের উদ্ভব ও প্রচারের ইতিহাস আলোচিত হইতেছে। সর্ব্বপ্রথমে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে ১২৯ সূক্তে নাসদাসীয় সূক্তে যে শূন্যবাদ প্রচারিত হইয়াছে তাহা এইরূপ--

সদসৎ রজ ব্যোম ছিল না তখন।
ব্যোমের উপরে কোন ছিল না ভুবন।
কে ছিল কোথায়? কিছু ছিল আবরণ?
ছিল কি তখন অন্তঃ গভীর গহন ॥১
ছিল না তখন মৃত্যু ছিল না অমৃত।
রাত্র হ'তে দিবসের ছিল না প্রকেত।
সেই এক ছিলেন স্বধায় প্রাণবান্,
ছিল না তা হ'তে কেহ পর বিদ্যমান ॥২

১। সা. প. প, ৪৭ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা "দেল পূজার ছড়া" তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।

তম দ্বারা তম ছিল অগ্রেতে আবৃত।
এ সব সলিল ছিল, সব অপ্রকেত ॥
তুচ্ছেতে আচ্ছন্ন যাহা ছিলেন তখন।
তাহা এক হইলেন তপে উৎপাদন ॥৩ [১]

শব্দার্থ ঃ—প্রকেত=প্রভেদ, স্বধায়—আত্মধারণ শক্তি দ্বারা।

বেদের পর উপনিষদের যুগে বহুদেবতার পরিবর্ত্তে যে নিরাকার ঈশ্বর কল্পনা করা হইল তিনি 'অশব্দম্, অস্পর্শম্, অরূপম্, অব্যয়ম্'; তিনি 'ব্রহ্ম' নামেও অভিহিত হইয়াছেন। এই নিরাকার ঈশ্বরের সহিত শূন্যবাদের নিরঞ্জনের কোন পার্থক্য নাই। বেদে 'নিরঞ্জন' সংজ্ঞাটিও পাওয়া যায়। হিরণ্যগর্ভ সূক্তে (৪।৫০) শূন্যতত্ত্বের আভাস পাওয়া যায়।

ইহার পরবর্ত্তী কালে সাংখ্য ধর্ম্মে ঈশ্বর স্বীকৃত না হইলেও ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাতা হিরণ্যগর্ভকে স্বীকার করা হইয়াছে। তিনি সগুণ ব্রহ্ম, তাঁহার আসন মহাশূন্যে; ইহার সহিত ঋগ্বেদের "যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্তসো অংশ" (১০।১২৯ সূক্ত) তুলনীয়। ইহাকে আশ্রয় করিয়া চরাচর জগৎ যথানিয়মে চলিতেছে। মনুষ্যের ইহার নিকট প্রার্থনীয় কিছু নাই, দেহস্থ সদাশিব 'আত্মা'কে জানাই মনুষ্যের কর্ত্তব্য, গ্রীক মনীষীও বলিয়াছেন 'নিজেকে জান' অর্থাৎ "আত্মানং বিদ্ধি"।

বৌদ্ধযুগে বুদ্ধদেব প্রচার করিলেন, ঈশ্বরও নাই, আত্মাও নাই, সৎকর্ম্ম সাধন কর যাহাতে পরজন্মে শ্রেষ্ঠতর দেহ ধারণ সম্ভব হয় এবং জন্মজন্মান্তরে নির্ব্বাণ লাভ হয়। বৌদ্ধমতে সমস্ত জগৎ অনাত্ম বলিয়া শূন্য "সর্ব্বম্ অনিত্যং, সর্ব্বম্ অনাত্মম্, নির্ব্বাণম্ শান্তম্," এই তিনটী তত্ত্ব বৌদ্ধদর্শনের মূল। জাগতিক দৃশ্যপদার্থ অনিত্য, একমাত্র সত্য হইতেছেন সেই পরমতত্ত্ব তিনি দৃশ্যাতীত, অতএব সমস্ত দৃশ্য ধর্ম্মের নিষেধবাচক 'শূন্য' দ্বারাই বৌদ্ধেরা তাহাকে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু এই শূন্য অভাববাদ নহে, ইহা অবিকারী শূন্য। আর্যগণও অবিকারী কূটস্থ চৈতন্য-পদার্থকে অদৃষ্ট, অচিন্ত্য, অব্যবহার্য্য প্রভৃতি দৃশ্যধর্ম্মের নিষেধ দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন। যে চরমপদার্থকে বৌদ্ধেরা 'শূন্য' নামে অভিহিত করেন তাহার সম্বন্ধে অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতায়

১। 'বেদসংহিতা' মধুসূদন সরকার ১৩০৯ সাল পৃষ্ঠা ১৪১।

আছে, "শূন্যরূপেণ কৌশিক স্তিষ্ঠতি" অর্থাৎ শূন্য আছে বা উহা 'ভাব' পদার্থ। ইহাকে সম্পূর্ণ অভাব বলা যায় না।[১]

বুদ্ধদেব পুনর্জ্জন্মরহিত মোক্ষলাভকে 'নির্ব্বাণ' অবস্থা বলিলেও তাহার স্বরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই। বুদ্ধদেবের শিষ্য নাগার্জ্জুন প্রচার করিলেন, নির্ব্বাণলাভ হইলে চিত্তের যে অবস্থা হয় তাহাই 'শূন্য', রাগদ্বেষমোহের আবরণ শূন্যতাহেতু নির্ব্বাণ 'শূন্য', এই শূন্য অনির্ব্বচনীয়, ইহা অস্তি, নাস্তি, তদুভয় ও অনুভয় এই চতুর্ব্বিধ অবস্থার অতিরিক্ত অবস্থাবিশেষ, ইহাই শূন্য কিন্তু ইহা অভাববাদ নহে। বস্তু ঐকান্তিক সৎ বা অসৎ হইতে পারে না, অতএব উহার স্বরূপ সৎ ও অসৎ এর মধ্য-বিন্দুতে নির্ণীত হয়, ইহাই শূন্যরূপ। এই শূন্যই পরমতত্ত্ব, ইহা সত্য, ইহা বজ্র। এই আধ্যাত্মিক মধ্যমমার্গকে 'মাধ্যমিক দর্শন' আখ্যা দেওয়া হয়। কালক্রমে ইহা হইতেই 'বজ্রযান' সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়।

সমস্ত বৌদ্ধেরা যে ঐরূপে শূন্যের লক্ষণ নির্ণয় করেন তাহা নহে। ন্যায়ানুযায়ী উহার লক্ষণ, যথা—

"ভগবানাহ, শূন্যমিতি দেবপুত্রা অত্র লক্ষণানি স্থাপ্যন্তে। অনিমিত্তমিত্য প্রণিহিতমিতি (অর্থাৎ রাগাদি প্রণিধি বা উদ্দেশ্য রহিত) দেবপুত্রা অত্র লক্ষণানি স্থাপ্যন্তে। অনভিসংস্কার ইত্যনুৎপাদ ইত্যনিরোধ ইত্যসংক্লেশ ইত্যব্যবদানম্ ইত্যভাব ইতি নির্ব্বাণমিতি ধর্ম্মধাতুরিতি তথতেতি দেবপুত্রা অত্র লক্ষণানি স্থাপ্যন্তে"।[২]

উক্ত লক্ষণ মধ্যে 'অভাব' পদটি নিরর্থক, কারণ ভাবের নিষেধই যখন অভাব তখন অনিমিত্তাদি অভাববাচক পদসকল বলা বাহুল্য মাত্র এবং ধর্ম্মধাতু প্রভৃতি ভাবার্থপদ বলা স্বোক্তিবিরোধ। উক্ত লক্ষণে যদি 'নির্ব্বাণ' স্থলে 'পরমসুখ' বলা হয় তবে ঐ শূন্য উপনিষদের আত্মা হইতে বিশেষ ভিন্ন পদার্থ হয় না। 'শান্ত' ও 'নির্ব্বাণ' একই পদার্থ, শিব ও পরমসুখ একই বস্তু। বৌদ্ধধর্ম্মের চিত্তের নির্ব্বাণধাতুতে স্থিতি ও সাংখ্যের অব্যক্তেলীন হওয়া বস্তুতঃ এক কথা।[৩] অথর্ব্ববেদীয় মাণ্ডূক্যোপনিষৎএর সপ্তম শ্লোকে আত্মার যে লক্ষণ নির্দ্দেশিত হইয়াছে তাহা এইরূপ—"যিনি তৈজস নহেন, বিশ্ব নহেন, স্বপ্ন ও জাগরণের

১। প্রজ্ঞাপারমিতা ১ম ভাগ পৃ ৩। গোবিন্দকুমার সংস্কৃত গ্রন্থাবলী নং ১।
২। বোধিচর্য্যাবতার, ভূমিকা, 'শূন্যবাদ' পৃ ৭১ শ্রীমৎ হরিহরানন্দ আরণ্যক।
৩। বোধিচর্য্যাবতার, ভূমিকা, শূন্যবাদ পৃ ৭২।

মধ্যবর্ত্তী নহেন, প্রাজ্ঞ নহেন, যুগপৎ সর্ব্ববিষয়ে জ্ঞাতা নহেন, জড় নহেন, যিনি অদৃশ্য, অব্যবহার্য্য, অগ্রাহ্য, অনমুমেয়, অচিন্ত্য, অনির্দ্দেশ, যিনি কেবল আত্মা এই প্রতীতির গম্য, যিনি প্রপঞ্চের বিরামস্বরূপ, শান্ত, শিব ও অদ্বিতীয়, তাঁহাকেই বিবেকীরা চতুর্থ মনে করিয়া থাকেন। তিনিই আত্মা, তিনিই বিজ্ঞেয়।"[১]

বৌদ্ধ নির্ব্বাণ চিত্তের চিরশান্তিময় অবস্থাবিশেষ, ক্লেশক্ষয়ে চিত্ত চিরবিশ্রান্তি লাভ করে। এই নির্ব্বাণ শূন্যোপম, "নির্ব্বাণং শূন্যোপমং মায়োপমং তথাগতঃ শূন্যোপমঃ মায়োপমঃ" ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। সাংখ্য, বেদান্ত আদি নির্ব্বাণবাদীরা সকলেই জগৎ ও জাগতিক পদার্থকে ভ্রান্তিরূপে নির্দ্দেশিত করেন, ঐ ভ্রান্তি বা অবিদ্যা যে ত্যাজ্য তাহাও সর্ব্বসম্মত। শূন্যবাদীরা বলেন সৎএর মূল 'শূন্য', মায়াবাদীরা বলেন 'অনির্ব্বাচ্য', আরম্ভবাদীরা বলেন তাহা 'অসৎ', ইহাই মাত্র ভেদ।

মহাযান বৌদ্ধমতে শূন্যের বহুপ্রকার ভেদ বর্ণিত হয়। এই সম্প্রদায়ের বীজমন্ত্র "ওঁ শূন্যব্রহ্মণে নমঃ", ইহাকে তাঁহারা নিরাকার মন্ত্র বলেন। মহাযান বৌদ্ধেরা পরমতত্ত্ব উপলব্ধির জন্য যে সকল সাধন করেন তন্মধ্যে চারিপ্রকার ভেদ আছে—সংনাহ প্রতিপত্তি, প্রস্থান প্রতিপত্তি, সংভার প্রতিপত্তি ও নির্যাণ প্রতিপত্তি। ইহারা যথাক্রমে মনন, ধ্যান, জ্ঞান বা ধর্ম্মসঞ্চয়, এবং সর্ব্বজ্ঞতা সিদ্ধিরূপে বর্ণিত হইতে পারে। ইহাদের মধ্যে সংভার প্রতিপত্তির ত্রয়োদশবিধ ভেদ আছে, যথা—করুণা, দান, শীল, ক্ষান্তি, বীর্য্য, ধ্যান, প্রজ্ঞা, ধারণা-সম্ভার অর্থাৎ স্মৃতি, জ্ঞান-সম্ভার অর্থাৎ বিংশতিপ্রকার শূন্যতা ইত্যাদি। জ্ঞানসম্ভারের বিংশতিপ্রকার শূন্যতায় সাপেক্ষত্ব ভেদ আছে, ইহাদের আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক।[২]

শূন্যতত্ত্বের মূলকথা সাপেক্ষত্ব,—

যঃ প্রতীত্য সমুৎপাদঃ শূন্যতা সৈব তে মতা।
ভাবঃ স্বতন্ত্রো নাস্তীতি সিংহনাদ স্তবাহতুলা॥[৩]

(লোকাতীত স্তব শ্লোক ২২)

অকূটস্থ ও অবিনাশিত্ব এই উভয় লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া শূন্য সাপেক্ষ।

১। উপনিষৎ গ্রন্থাবলী প্রথম ভাগ পৃ ২৬৮, উদ্বোধন কার্য্যালয়।
২। Abhisamaya-alankara (Maitreya) পৃ ১০৪—১০৫ দ্রষ্টব্য।
৩। ঐ, ১২৬ পৃ ফুটনোট।

শূন্যতাও জ্ঞানের বিষয়, অধ্যাত্ম ও বাহ্যের শূন্যতা আছে, অতএব শূন্যতার জ্ঞানও শূন্যতা, মাধ্যমিক মতে শূন্যতাভিমুখ সিদ্ধ হইলে সেই শূন্যতাও ত্যাজ্য, কারণ শূন্যতা-ভাবনাও 'ভাব' কল্পনা।

এই মহাযান সম্প্রদায় হইতে বজ্রযান সম্প্রদায়ের উৎপত্তি, ইঁহারা শূন্যকেই পরম পরিণতি বলিয়া গ্রহণ করেন। বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনেও "নিঅ দেহ করুণা শূনমে হেরি," "চিঅ কণ্ণহার সুণতা মাঙ্গে" ইত্যাদি আছে। প্রধান অবধূতিকা নাড়ীকে গুরুপ্রসাদে মণিমূলে বা শূন্যস্থান-রূপ অন্তরাকাশে ধৃত করিয়া রাখিবার কথাও আছে। "অনাহতং ডমরুশব্দং বীরনাদেন শূন্যতা সিংহনাদেন নদিতঃ সন্ কৃষ্ণাচার্য্যো হি কাপালিকঃ"।[১]

চর্য্যাপদ মতেও জগৎ মিথ্যা, জাগতিক ব্যাপারের জ্ঞান মিথ্যা, কারণ, সকল বস্তুই নশ্বর, একমাত্র যে অবিনশ্বর সত্যস্বভাব বর্ত্তমান আছেন, তাঁহাকে অবিদ্যা বলে উপলব্ধি করিতে পারি না। কিন্তু যোগী দেহমধ্যেই সেই নিত্যানন্দধাম বা জিনপুর দেখিতে পান। নিত্য-পরিবর্ত্তনশীল বস্তুজগৎ মিথ্যা, প্রতিপদে যে পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে তাহাই 'শূন্যতা'। অবিদ্যা দূর হইলে বস্তুজগতের জ্ঞান লুপ্ত হয় এবং 'মহাশূন্যে' অবস্থিতি হয়। নির্ব্বাণে শূন্যতা ও মহাসুখ আছে, এই শূন্যতাই নৈরাত্ম্যদেবী, নির্ব্বাণপ্রাপ্তিমাত্র চিত্ত এই নৈরাত্ম্যদেবীর সঙ্গসুখে মহাসুখ লাভ করে। কালক্রমে এই মহাসুখ বাদ হইতেই সহজযানের পঞ্চ-মকার সাধনার উৎপত্তি হয়।

বৌদ্ধধর্ম্মের ত্রিরত্ন মধ্যে ধর্ম্মকে 'শূন্য' নামেও অভিহিত করা হয়। এই নিমিত্ত 'শূন্য' মহাপ্রভু, মহাশূন্য ও দয়া এবং একবার পুরুষ, একবার প্রকৃতি (স্বভাব) ও একবার ঈশ্বররূপে বর্ণিত হইয়াছেন। সাধকের লক্ষ্য মহাশূন্যে স্থিতি ও চরম সিদ্ধিলাভ। মহাশূন্যতা একেবারে নাস্তি নহে, অস্তিত্বের সম্ভাবনীয়তা মহাশূন্যের অন্তরে বিরাজ করে। প্রকৃতি বা স্বভাব যখন নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে, তাহাই 'মহাশূন্য'। মহাশূন্যের বিপরীত অবিদ্যা, সমগ্র বস্তুরূপ, যাহা অসৎ হইয়াও সৎরূপে প্রতিভাত হয়।[২]

১। চর্য্যাপদ ১৩, ৪২, ১১ এবং টীকা—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত।

২। D. Suzuki, Outlines of Mahayana Buddhism, p. 173. শূন্যপুরাণ প্রবেশক, পৃ ৯৯।

মাধ্যমিক শূন্যবাদীরা কালক্রমে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পড়েন, একদলের নাম হইল মায়োপমাদ্বৈতবাদী, তাঁহারা বলিলেন শূন্য ছাড়া সব বস্তু মায়ার মতো, দ্বিতীয় দলের নাম সর্ব্বধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানবাদী অর্থাৎ সর্ব্বধর্ম্মের মধ্যে বা পদার্থের মধ্যে পরমার্থ সত্যের অর্থাৎ শূন্যের স্বরূপ বিদ্যমান।[১]

পরবর্ত্তী কালে শঙ্করাচার্য্য মায়োপমাদ্বয়বাদের সহায়তায় 'মায়াবাদ' প্রচার করেন এবং আগম ও বেদকে প্রমাণ স্বরূপ করিয়া মাঁয়াবাদ স্থাপনার চেষ্টা করেন। সকল বস্তুতে 'শূন্যতা' আছে বলিলে উহা অত্যন্তাভাব বলা হয় না, আর্য্যদার্শনিকেরা উহাকে 'ভাব' পদার্থ বা ধ্যেয় রূপে সংজ্ঞিত করেন। বৌদ্ধভাষায় যাহা প্রত্যয় অর্থাৎ কারণহীন তাহাই অভাব, তাই শূন্যতা 'অভাব'। পরমার্থ অর্থে উত্তমার্থ, যাহার অধিগমে বস্তুতত্ত্বের বিজ্ঞান হইয়া ক্লেশের সম্যক্ প্রহাণ হয়, এই পরমার্থের অন্য নাম সর্ব্বধর্ম্মের নিঃস্বভাবতা, শূন্যতা, তথতা ধর্ম্মধাতু ইত্যাদি। এইরূপ যে শূন্যতা তাহাই পরমার্থ সত্য, ইহা বুদ্ধির অগোচর। মায়া বা অবিদ্যা বশে জগতের উপলব্ধি বুদ্ধিগোচর, ইহাই সংবৃতি সত্য, সংবৃতি অর্থে অবিদ্যা। তাই সংবৃতি সত্য ও পরমার্থ সত্য এই দ্বিবিধ সত্য মাধ্যমিকেরা স্বীকার করিয়াছেন।[২]

পরমার্থ সত্য ত্রিকালের দ্বারা অবাধিত বলিয়া 'শূন্য', ইহার অনুভূতি যোগিজনসাধ্য। যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহা সংবৃতি সত্য, যাহা কল্পিত তাহা সংবৃতি মিথ্যা, কিন্তু পরমার্থদশাতে উভয়ই মিথ্যা বলিয়া অবভাত হয় এবং 'শূন্যের' উপলব্ধি হয়। এই উপলব্ধির নিমিত্ত ষট্পারমিতা অর্থাৎ জ্ঞান, শীল, শান্তি, বীর্য্য, সমাধি ও প্রজ্ঞার উপলব্ধি এবং ইহাদের সতত অভ্যাস কর্ত্তব্য। মাধ্যমিকদের মায়াবাদী বলা যায়, কারণ তাঁহাদের মতে জগৎ শূন্যমূল এবং যাহা দৃশ্য তাহাই 'মায়া'।[৩]

গৌড়পাদের মাণ্ডুক্যকারিকাতে 'শূন্য'র পরিবর্ত্তে 'ব্রহ্ম' আছে, কিন্তু বৌদ্ধ প্রভাব রহিয়াছে। মাধ্যমিকেরা বলেন সৎ ও অসৎ একত্রে কোন বিকারী পদার্থে থাকিতে পারে না, অতএব বিকারী পদার্থ 'শূন্য', বেদান্তী

১। অদ্বয়বজ্র তত্ত্বরত্নাবলী পৃ ১৪, ভারতীয় দর্শনের পৃ ২২৭ উল্লেখ।
২। বোধিচর্য্যাবতার ৯।২ টীকা দ্রষ্টব্য।
৩। ভারতীয় দর্শন, বলদেব উপাধ্যায়, পৃ ২২৪ ইত্যাদি।

ঐ যুক্তিবলেই বলেন মায়া 'মিথ্যা, অর্থাৎ আছে বা নাই, বলা যায় না। মাধ্যমিকেরা বলেন মায়া সৎও নহে, অসৎও নহে। বেদান্তীরা মায়াকে 'সদসদ্ভ্যাম্ নির্বাচ্য' বলিয়াছেন।

প্রজ্ঞাপারমিতাদি মহাযান শাস্ত্রে 'শূন্যতা' ভাবনার সবিশেষ উপদেশ আছে ইহাই মোক্ষমার্গরূপে বর্ণিত হইয়াছে। মৈত্রেয় অসঙ্গের মহাযান তন্ত্রশাস্ত্রে 'গো'এর বিবৃতি আছে, তাহা বেদান্তের 'জীব'বাদের অনুরূপ অর্থাৎ সমস্ত প্রাণীতে 'বুদ্ধত্ব' আছে এবং ইহার সতত ধ্যানে যে পার্থিব পদার্থ প্রতিভাত হয়, তাহা কলুষহীন এবং ঐশ্বরিক গুণে বিভূষিত।[১]

নাগার্জ্জুনের প্রচারিত শূন্য শূন্যমণ্ডলের মধ্যে নিহিত তথ্য হইয়া আছে, গোরক্ষনাথের যোগতত্ত্বের মধ্য দিয়া 'শূন্য' নিগুর্ণ সাধকদের মধ্যে পৌঁছাইয়া ব্রহ্মপদবাচ্য হইয়াছে। নাগার্জ্জুন শূন্যকে সৎ বা অসৎ কিছুই নহে বলেন, নিগুর্ণীরা শূন্যকে 'সৎ' বলিয়া গণ্য করেন। সমাধিস্থ যোগীর নির্ব্বিষয় চিত্তকেও নিগুর্ণীরা 'শূন্য' বলেন। রাধাস্বামী মতে সাধনপথে সাধককে অবকাশ উত্তীর্ণ হইতে হয়, তাহাই 'শূন্য' ও 'মহাশূন্য'।[২]

নিগুর্ণ সাধকদের মধ্যে সগুণ নিগুর্ণের অতীত 'সত্যলোক' আছে, তথায় সত্যপুরুষের আবাসস্থল। সত্যলোকের নিম্নে 'শূন্য' ও 'ভ্রমরগুহা' আছে, ইহাদের অধিষ্ঠাতা যথাক্রমে ব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম।[৩]

জগৎ অর্থে যাহা গতিশীল, অলাতচক্রবৎ; ইহার গতিশীল অবস্থাই আমরা দেখি, প্রকৃতপক্ষে জাগতিক ব্যাপার খণ্ড খণ্ড জ্ঞান মাত্র, সূক্ষ্ম দৃষ্টির অভাবে ও স্বগতির যোগে সত্য বলিয়া যাহা প্রতিভাত হয় তাহা ব্যবহারিক সত্য, মূলতঃ মিথ্যা, তাই জগৎ 'শূন্য' পদবাচ্য।

ব্রহ্মজ্ঞান পাইলে সবই শূন্যবৎ মনে হয়- বঙ্গীয় গীতিকাব্যে বহু শতাব্দী পরেও ইহারই কল্পনা দেখা যায়—

শূন্য কাঁথা শূন্য ঝুলি রাজা কান্ধে দিয়া।
দেশান্তরী হইল রাজা ব্রহ্মজ্ঞান পাইয়া॥[৪]

১। অভিসময়ালঙ্কার—পৃ ৮৬। ২। নিগুর্ণ সম্প্রদায় ভূমিকা।০ ৷/০

৩। নিগুর্ণ সম্প্রদায় ভূমিকা, পৃ ২৮।

৪। গোপীচাঁদের পাঁচালী; ভবানী দাস কৃত (৩য় খণ্ড) পৃ ৩৮৪।

অনিলপুরাণেও পাই—

শূন্যের খাট, শূন্যের পাট, শূন্যের সিংহাসন।
শূন্যরথে আছেন একেলা নিরঞ্জন ॥[১]

এইরূপ বৌদ্ধ শূন্যবাদের যুগ হইতে শূন্যতত্ত্ব বিভিন্নরূপে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে গৃহীত হয়, কিন্তু শূন্যতত্ত্বের মূল বৈদিক যুগে। বৌদ্ধমতে শূন্যেতে করুণা আছে তাই জীব উদ্ধারার্থে সৃষ্টি হয়। বৌদ্ধ 'শূন্য' অর্থে প্রজ্ঞাপারমিতা অর্থাৎ সমাধিজাত প্রজ্ঞা। শূন্য হইতেই সৃষ্টি হয়। এই বৌদ্ধ 'শূন্য' ও নাথসিদ্ধদের 'নাথ' এবং 'পরমেশ্বর তত্ত্বে' ভেদ বা সাদৃশ্য কি তাহাই বিবেচ্য।

পরমেশ্বর সগুণ ও নির্গুণের অতীত, তাঁহাতে পঞ্চীকরণ অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, নিগ্রহ ও অনুগ্রহ আছে, তন্মধ্যে প্রথম চারিটী জীবের উপর অনুগ্রহার্থে, নিগ্রহও প্রকারান্তরে অনুগ্রহ, কারণ উহা জীবের সুপ্ত চৈতন্য জাগরুক করে। সৃষ্টি স্বভাবতঃ উৎপন্ন হয়, ইহা স্বীকার করিয়া লইলে 'শূন্য' বা 'পরমেশ্বর' কল্পনা নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়ে। সাংখ্য জগৎ রচনার জন্য বা কর্ম্মফল প্রদানের জন্য ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করেন না। সাংখ্য জগৎ রচনায় ঈশ্বরের স্বার্থ বা কারুণ্যও স্বীকার করেন না। ঈশ্বর কৃষ্ণ ঈশ্বরের নিষেধ মানিয়া গিয়াছেন, কিন্তু বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যকে নিরীশ্বর বলেন নাই।[২] তবে ঈশ্বর মাত্র জগতের সাক্ষী স্বরূপ, ঈশ্বরের সান্নিধ্য বশতঃ প্রকৃতি জগৎ ব্যাপারে লিপ্ত হন, এইরূপে নিষ্ক্রিয় প্রকৃতিতে ক্রিয়ার সঞ্চার হয়। যোগকে সেশ্বর সাংখ্য বলে। যোগে সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্বসহ ঈশ্বরতত্ত্ব স্বীকৃত হয়। সেই ঈশ্বর "সদৈব মুক্তঃ"।[৩] তাহাতে ঐশ্বর্য্য ও জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা আছে।

নাথপন্থের পরমেশ্বর-লক্ষণ : তিনি উমাসহায়, প্রশান্ত, নীলকণ্ঠ ও ত্রিলোচন। তিনি ব্রহ্ম, শিব, অক্ষর, স্বরাট্, পরম, বিষ্ণু, প্রাণ ও আত্মা। "ধ্যাত্বা মুনির্গচ্ছতি ভূতযোনিং সমস্ত সাক্ষিং তমসঃ পরস্তাৎ"।[৪] যিনি আনন্দ, নিত্য, শক্তিমান যিনি, তিনি পরমেশ্বর, তিনি জ্ঞানরূপে জ্ঞেয় বিষয়।[৫] অতএব পরমেশ্বর স্বগুণ সৃষ্টিকর্ত্তা, কিন্তু 'নাথ' সগুণ নির্গুণের

১। শূন্যপুরাণ ভূমিকা পৃ ৪৭।

২। সাংখ্যসূত্র টীকা ১।৯২-৯৫ ; ৩।৫৬,৫৭ ; ৫।২-১২ কালীবর বেদান্তবাগীশ

৩। যোগসূত্র ১।২৪। ৪। গো সি. স পৃ ৮। ৫। সি. সি. স পৃ ২৪।

অতীত, তাঁহার বামভাগে নির্গুণ ব্রহ্ম, দক্ষিণভাগে সগুণ ইচ্ছাশক্তি এবং মধ্যভাগে তিনি স্বয়ং বিরাজিত। এই নাথ স্বরূপে সগুণ ও নির্গুণ ঐক্য প্রাপ্ত হন, তাই তিনি সর্ব্বোপরিবর্ত্তী, দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জ্জিত, বিশ্বময় হইয়াও বিশ্বোত্তীর্ণ, ইহাই নাথপন্থের নাথস্বরূপের বৈশিষ্ট্য।

"সর্ব্বম্ শূন্যম্" সম্বন্ধে হীনযান ও মহাযান মধ্যে মতভেদ না থাকিলেও তাহার স্তর সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। হীনযান পৃথিবী সম্বন্ধেই 'শূন্য' বলিয়াছেন, মহাযান বিশেষতঃ মাধ্যমিক ও যোগাচারীরা তাহাতে বিরত হন নাই, তথাগত, নির্ব্বাণ বা আকাশও তাঁহাদের মতে শূন্য।[১]

শূন্যতত্ত্বের তুলনা

এখন শূন্যতত্ত্ব সম্বন্ধে শেষকথা এই যে, সকল সাধনার মূলতত্ত্ব এক, তাহা চিত্তকে বৃত্তিহীন বা নির্ব্বিষয় করা। তাই যোগসাধনের পথে কয়েকটী স্তর বা অবকাশ অতিক্রম করিতে হয়, তবেই পূর্ণতাপ্রাপ্তি, নাথ-মতে পরমপদ প্রাপ্তি বা বৌদ্ধমতে নির্ব্বাণলাভ সম্ভব হয়। এই অবকাশের নামান্তর 'শূন্য', তবে বিভিন্ন ধর্ম্মে শূন্যের সংখ্যা সম্বন্ধে মতভেদ আছে। সকল ধর্ম্মের মূল লক্ষ্য কিন্তু এক, অর্থাৎ চিত্তের লয়সাধন এবং "অন্তঃশূন্যঃ বহিঃশূন্যঃ শূন্যঃ কুম্ভ ইবাম্বরে" অবস্থা প্রাপ্তি, চিত্ত এই নির্ব্বিতর্ক-অবস্থা প্রাপ্ত হইলে নাদ বা মন্ত্র কোনরূপ স্পন্দনের অনুভূতি থাকে না, স্মৃতি পরিশুদ্ধ হইলে 'স্বরূপ-শূন্যের' বা বিতর্করহিত অবস্থা অর্থাৎ শব্দহীন জ্ঞানের প্রাপ্তি হয় (যোগসূত্র ১।৪৩), ইহাই নির্গুণ উন্মনী অবস্থা বা যোগমতে নির্বীজ সমাধি। ইহাই নাথগণের 'অমনস্ক' বা মনোহীন অবস্থা, বৌদ্ধদের নির্ব্বাণ অবস্থা, সহজিয়া বৌদ্ধদের চতুর্থ বা তুরীয় আনন্দের অবস্থা। পাতঞ্জল যোগদর্শনে যোগীর চারিটী অবস্থার বর্ণনা আছে— প্রথমকল্পিক, মধুভূমিক, প্রজ্ঞাজ্যোতি ও অতিক্রান্তভাবনীয় (যোগসূত্র ৩।৫১)। বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়সকলকে প্রত্যাহরণ করিলে 'মন' অবশিষ্ট থাকে, তখন মনের পশ্চাতে যে অস্মিতা আছে তাহা মনের সঙ্কল্পবিকল্প নিরোধের চেষ্টা করে; এই নিরোধ সম্ভব হইলেই প্রজ্ঞালোকের বিকাশ সম্ভব হয়, তখন মন সেই জ্ঞানস্বরূপ প্রজ্ঞায় লীন হয়, মনের এই বিলীন

১। Aspects of Mahayana Buddhism and its relation to Hinayana, N. Dutt. p. 47.

অবস্থাই শাস্ত্রমতে কুণ্ডলিনীর জাগরণ। ইহাই যোগের প্রথম অবস্থা। যোগের দ্বিতীয় অবস্থায় সাধকের জীবভাবের সহিত পরমাত্মার আধ্যাত্মিক সংযোগের ফলে সাধক মৃত্যুরও অতীত হন।

"অস্পৃশো জন্মমৃত্যুভ্যাং প্রজ্ঞায়েতি বিমুচ্যতে" (স্বাধ্যায়রত্নম্ ১।৬১)। এইরূপে ক্রমান্বয়ে চারিটী স্তর সাধককে অতিক্রম করিতে হয়, তবেই কৈবল্য লাভ সম্ভব হয়। ইহারই প্রথম স্তরের নাম প্রথমকল্পিক, ইহাতে অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের উন্মেষ মাত্র হয়, ঈশ্বরদর্শন, পরচিত্তজ্ঞান প্রভৃতি সম্ভব হয়। দ্বিতীয় স্তরে মধুমতী ভূমিতে দেবগণ কর্তৃক ভোগের জন্য আহূত হইয়াও সাধককে অবিচলিত থাকিতে হয়; তখন যোগী ঋতম্ভরপ্রজ্ঞ হন। তৃতীয় স্তর প্রজ্ঞাজ্যোতি, ইহাতে যোগী ভূতেন্দ্রিয়জয়ী হন, যোগীর অণিমা, লঘিমাদি সিদ্ধি প্রাপ্তি হয়, এই অবস্থায় যোগী বিশোকাদি অসম্প্রজ্ঞাত পর্য্যন্ত সাধনীয় বিষয়ে সাধনযুক্ত হন। চতুর্থ স্তর অতিক্রান্তভাবনীয়, তখন চিত্তবিলয়ই একমাত্র অবশিষ্ট সাধন থাকে। চিত্ত বিলীন হইলে কেবল মাত্র আত্মা বিরাজ করেন, উহাই নিরোধ-সমাধি বা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। ইহারই অপর নাম ব্যুত্থানাবস্থা বা কৈবল্য।

বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনেও চারিটি স্তর বা শূন্যের বর্ণনা আছে, যথা, শূন্য, অতিশূন্য, মহাশূন্য ও সর্ব্বশূন্য। চিত্তকে এই শূন্য হইতে শূন্যান্তরে লইয়া গেলে তবেই জ্ঞানের শেষ পর্য্যায়ে পৌঁছাইতে পারা যায়। প্রথম তিনটী শূন্যাবস্থায় নানাবিধ প্রকৃতিদোষ থাকে, ক্রমশঃ তাহারা ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে চতুর্থ বা সর্ব্বশূন্য অবস্থায় আর কোনরূপ প্রকৃতিদোষ থাকে না; ইহাই বিশুদ্ধ শূন্য অবস্থা বা নির্ব্বাণপদ। কৃষ্ণাচার্য্য বলিয়াছেন (চর্য্যা নং ১৩) 'ত্রিশরণ নাবী' অর্থাৎ কায়বাক্‌চিত্তরূপ নৌকা বাহিয়া তিনি চতুর্থ আনন্দস্বরূপ পরমকূলে পৌঁছিয়াছেন। প্রকৃতিদোষযুক্ত প্রথম শূন্য হইতে এইরূপে নৌকা বাহিয়া সর্ব্বশূন্যের দেশে পৌঁছিলে বুদ্ধত্ব লাভ হইবে। ইহাই জন্মমৃত্যুর উর্দ্ধে অবস্থান, ইহা সংসারের গতির বিপরীত গতি।

হঠযোগপ্রদীপিকার চতুর্থ উপদেশে (৪।৭০) যে তিনটী শূন্যের কথা আছে, তাহারা নাদের বিভিন্ন অনুভূতির সহিত যুক্ত স্তরবিশেষ, ইহারা যথাক্রমে আরম্ভ, ঘট ও পরিচয় অবস্থা নামে পরিচিত। এই তিনটী স্তরই ক্লেশাদি মলযুক্ত, ইহার চতুর্থ স্তর নিষ্পত্তি অবস্থা নামে

পরিচিত, ইহাই বিশুদ্ধশূন্যরূপ অদ্বৈতভূমি। গোরক্ষসিদ্ধান্ত-সংগ্রহ প্রভৃতি নাথমার্গের গ্রন্থে যোগের এই চতুর্ব্বিধ অবস্থার বিশেষ আলোচনা দেখা যায়, কারণ যোগকেই ইহারা প্রাধান্য দেন। সাধনের চতুর্ব্বিধ অবস্থা-ভেদে কাশ্মীর শৈবাগমে যোগীদের সংপ্রাপ্ত, ঘটমান, সিদ্ধ ও সুসিদ্ধ যোগী রূপে ভেদ করা হয়।

নাথসিদ্ধদের সাধনে যে পঞ্চব্যোমতত্ত্ব আছে তাহাও শূন্যের সাধনা, যথা—আকাশ, পরাকাশ, মহাকাশ, তত্ত্বাকাশ ও সূর্য্যাকাশ। এই আকাশ হইতে আকাশান্তরে গমনের সাধনার প্রথম স্তরে যোগীর নিরাকার অত্যন্ত নির্ম্মল আকাশ দর্শন ঘটে, দ্বিতীয় স্তরে অত্যন্ত অন্ধকারনিভ আকাশ দর্শন হয়, তৃতীয় স্তরে কালানল সদৃশ মহাকাশ দর্শন, চতুর্থ স্তরে নিজতত্ত্বস্বরূপ তত্ত্বাকাশ দর্শন ও পঞ্চম স্তরে সূর্য্যকোটিনিভ সূর্য্যাকাশ দর্শনের পর যোগী স্বয়ং ব্যোমসদৃশ বা শূন্যোপম হন, অর্থাৎ তাঁহার চিত্ত অব্যক্তে লীন হয় বা তাঁহার 'নির্ব্বাণ' লাভ হয়। এই পঞ্চব্যোম সাধনার সহিত নাথমার্গের ত্রিলক্ষ্য সাধনের বিশেষ যোগাযোগ আছে—অন্তর্লক্ষ্য অবলম্বনে কুণ্ডলিনী মধ্যে আকাশ সাক্ষাৎকার হয়, বহির্লক্ষ্য অবলম্বনে নাসাগ্রের বাহিরে নীলপীতাদি আকাশ দর্শন, মধ্যলক্ষ্যে নিকটবর্ত্তী অন্তরীক্ষে চন্দ্র, সূর্য্য বা বহ্নির জ্বালা দর্শন হয়, এই মধ্যলক্ষ্যের অভ্যাস বশতঃ পঞ্চ আকাশ দৃষ্টিগোচর হয়—ব্রহ্মলাভার্থে এই ত্রিলক্ষ্যের অনুসন্ধান কর্ত্তব্য (অদ্বয়তারকোপনিষৎ শ্লোক ৪। সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতির ২।৩০ শ্লোকেও এই ব্যোমপঞ্চক ও বাহ্যাভ্যন্তরে তাহাদের দর্শন করিয়া ব্যোমসম হইবার কথা আছে—পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।)

শূন্যতত্ত্বের মূলকথা সাপেক্ষত্ব, অতএব ইহার তিনটী, চারটী, পাঁচটী, এমন কি মহাযান বৌদ্ধমতে বিংশতি শূন্যের (অভিসময়ালঙ্কার পৃ ১০৪-১৩৫ দ্রষ্টব্য, Cal. Ort. Series, No. 27) যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহা দ্বারা মূলতত্ত্বের ভেদ হয় না। মহাযান বৌদ্ধদের বীজমন্ত্রও "ওঁ শূন্যব্রহ্মণে নমঃ"। চিত্তকে ইন্দ্রিয়জ বিষয় হইতে নিবৃত্তির পথে ফিরাইলে সাধকের যে শূন্য-স্বরূপতার জ্ঞান হয়, তাহাই বৌদ্ধদের 'প্রজ্ঞা', এই প্রজ্ঞার সহিত মিশ্রিত থাকে 'করুণা' অর্থাৎ জীবের ক্লেশ দূর করিবার বাসনা। শূন্যতা ও করুণার যোগে যে বোধচিত্তের উৎপত্তি হয় তাহাকেও ঊর্দ্ধযাত্রার পথে দশটী ভূমি অতিক্রম করিতে হয়, এই

মুদিতা, বিমলা প্রভৃতি দশটী ভূমি সাধকের শূন্যতা ও করুণাসক্ত চিত্তেরই বিভিন্ন অবস্থা, এই দশ অবস্থা অতিক্রম করিলে সাধকের বুদ্ধত্বপ্রাপ্তি হয়। এই চিত্তচাঞ্চল্যের একান্ত ও অত্যন্ত নিবৃত্তি, সম্যক্ চিত্তবিশ্রান্তি ও স্বস্বমধ্যে নিমগ্নতাই নিরুত্থান দশা, এই নৈরুত্থ্যের উপলব্ধিতেই নাথগণের পরমপদে অবস্থিতি হয়। (নিবন্ধের সিদ্ধান্ত অংশের পরমপদ অধ্যায়ে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।) ইহাই চিত্তের বৃত্তিহীন অবস্থা বা শূন্য হইতে শূন্যান্তরে গমনের শেষ অবস্থা, নাথগণের ইহাই উন্মনী বা অমনস্ক অবস্থা। ইহাই শূন্যতত্ত্বের সিদ্ধান্ত ও সাধনা।

তৃতীয় ভাগ

সাধনা অংশ

প্রথম পরিচ্ছেদ

গুরুতত্ত্ব ও সদ্‌গুরু-মহিমা

পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে আমরা 'শূন্যতত্ত্বের' আলোচনা করিয়াছি। চিত্ত শূন্যাবস্থা প্রাপ্ত হইলে যে নির্ব্বাণ লাভ হয়, তাহাই নাথদের 'উন্মনী' অবস্থা প্রাপ্তি। এই মনোহীন অবস্থাই পরমপদের সহিত সাম্যাবস্থা লাভের অবস্থা, ইহাই নাথমতে সামরস্য সাধন। এই পরমপদে স্থিতিই নাথগণের চরম লক্ষ্য। কিন্তু নাথমতে এই সিদ্ধিলাভ হয় একমাত্র গুরুকৃপায় – তেন সন্দর্শিতে মার্গে প্রাপ্যতে পরমং পদম্।

অজ্ঞান জীবের পক্ষে গুরুর একান্ত প্রয়োজনীয়তা আছে। তাই নাথগণ প্রতিপদে গুরুমাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। সাংসারিক জীবের সাধারণতঃ মানব-দেহধারী যে গুরু লাভ হয়, নাথগণ সেরূপ গুরুর একপক্ষে নিন্দা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে শাস্ত্রজালে জড়িত পণ্ডিত-মূর্খ রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের বহু শিষ্যও থাকে। কিন্তু এরূপ গুরু শিষ্যকে অধিকদূর পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে সক্ষম নহেন, তাঁহার দ্বারা কেবল একটী আনন্দাবস্থার বা বৌদ্ধমতে শূন্যাবস্থার লাভ হইতে পারে মাত্র। কিন্তু শূন্যের অতীত অতিশূন্যাদি বা নির্ব্বাণের অতীত পরিনির্ব্বাণাদি যে সকল অবস্থা বৌদ্ধধর্ম্মে ও সন্তকবি বা পাতঞ্জলযোগের ভাষায় অন্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে, মানবীয় গুরুর পক্ষে তথায় নীত করা অসম্ভব। তাই নাথেরা যাঁহাকে সদ্‌গুরু আখ্যা দিয়াছেন - সেই সদ্‌গুরুই প্রকৃত গুরু, নাথমতে সেই গুরু 'অবধূত'রূপী— তাঁহার বর্ণ নাই, আশ্রম নাই, পাপ নাই, পুণ্য নাই, ত্যাগ নাই, ভোগ নাই—তিনি সকলের অতীত এবং সকল গুরুর গুরু। এইরূপ গুরু সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে—

"ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকং শিবশাসনতঃ শিবশাসনতঃ"

(গোঃ সিঃ সঃ পৃঃ ৩২)

একমাত্র ইঁহার করুণাতেই মানবের অষ্টপাশ ছিন্ন হয়, এবং একমাত্র তিনিই 'নাথ' পদের পরমতত্ত্ব তাঁহার মৌনব্যাখ্যা দ্বারা শিষ্যকে অধিগম করাইতে সক্ষম। পরমপদের ঠিক নিম্নে এইরূপ গুরুর স্থান, তাই

নাথেরা বলিয়াছেন সেরূপ গুরুকে 'দেবভাবেন পরিচিন্তয়েৎ' অর্থাৎ গুরুকে দেবভাবে দর্শন কর্ত্তব্য। (সিঃ সিঃ সঃ ৫।৮)

নাথমার্গে গুরুই সকল শ্রেয়ের মূলভূত। গুরুকৃপা ভিন্ন সহজাবস্থালাভরূপ যোগের বা সাধনের চরমফললাভ সম্ভবপর হয় না। সুতরাং গুরুতত্ত্ব সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে সক্ষম না হইলে নাথমার্গের মূলতত্ত্ব অধিগত হইবে না। গুরুই আদর্শ, গুরুই উপদেষ্টা, গুরুই পথ-প্রদর্শক এবং তাঁহার কৃপাখড়্গপাত দ্বারা তিনি জীবের অষ্টপাশের ছেদক।

জ্ঞানং মুক্তিঃ স্থিতিঃ সিদ্ধিগু রুবাক্যেন লভ্যতে ॥
দুর্ল্লভো বিষয়ত্যাগো দুর্ল্লভং তত্ত্বদর্শনম্।
দুর্ল্লভা সহজাবস্থা সদ্‌গুরোঃ করুণাং বিনা ॥[১]

কোন কোন যোগমার্গে প্রসিদ্ধি আছে যে মানব নিজের কর্ম্মদ্বারাই মুক্তিলাভ করে, গুরুকৃপার কোন আবশ্যকতা নাই, কিন্তু নাথমার্গের সিদ্ধান্ত অন্যরূপ, নাথমার্গের লক্ষ্য সিদ্ধিলাভ, তাহা একমাত্র গুরুবাক্য দ্বারাই লভ্য, তাই "সিদ্ধিগু র্রুবাক্যেন লভ্যতে" ইহা স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে।

নাথগণ যোগশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক, তাঁহারা প্রতিপদে গুরুমাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন। মানবের প্রতিপদক্ষেপে গুরুর প্রয়োজনীয়তা আছে, শিশুর পক্ষে পিতামাতাই গুরু বয়োবৃদ্ধির সহিত পিতামাতা ব্যতীত শিক্ষাগুরু, দীক্ষাগুরু প্রভৃতির সাহচর্য্য অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ে, অতএব জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ সহজাবস্থালাভে যে গুরুকৃপার বা গুরুবাক্যের আবশ্যক, ইহাতে সন্দেহ কি? গুরুই আদর্শ, কারণ তিনি মুক্ত, গুরুই পথপ্রদর্শক, কারণ তিনি স্বয়ং সেই পথে সাধন করিয়াছেন।

সেই গুরুর স্বরূপ কি? তিনি শিবস্বরূপ, সকল বিঘ্ননাশকারী, "শিবায় সুখরূপায়েশ্বরাভিন্নায় বা। নমস্তে নাথ ভগবন্ শিবায় গুরুরূপিণে ॥"[২] অর্থাৎ গুরু ঈশ্বর হইতে অভিন্ন, তিনি শিবরূপী অর্থাৎ সুখস্বরূপ। যোগসূত্র মতেও তিনি (ঈশ্বর) কালাবচ্ছেদপ্রযুক্ত পূর্ব্বতনদিগেরও গুরু। নাথমার্গে গুরুকে 'নাদবিন্দুকলাত্মা' বলা হইয়াছে, অর্থাৎ তিনি নাদ, বিন্দু ও কলা স্বরূপে বর্ত্তমান আছেন

১। হ যো প্র ৪।৮, ৯, গো সি স পৃ ৩২, ৩৩
২। হ যো প্র ৪।১ টীকা; ষোড়শ নিত্যাতন্ত্র উল্লেখ, গো সি স পৃ ৪৫

(নাদবিন্দুকলাতত্ত্ব অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। যে সাধক উক্তরূপ ঈশ্বরাভিন্ন শিবরূপী গুরুতে নিরত আছেন, তিনি নিরঞ্জনপদ অর্থাৎ পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া থাকেন।

নমঃ শিবায় গুরবে নাদবিন্দুকলাত্মনে।
নিরঞ্জনপদং যাতি নিত্যং যত্র পরায়ণঃ॥[১]

নাদবিন্দুকলাযুক্ত গুরুই স্বয়ং শিবস্বরূপ, "নমস্তে নাথ ভগবন্ শিবায় গুরুরূপিণে" দ্বারাও নাথ, শিব ও গুরু এই তিন যে অভেদাত্মক তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

"ন দেবঃ শ্রীগুরোঃ পরঃ"—গুরু হইতে শ্রেষ্ঠতর দেবতা আর নাই।[২] তাই সিদ্ধসিদ্ধান্ত-পদ্ধতিতেও উক্ত হইয়াছে, "ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকম্। শিবশাসনতঃ শিবশাসনতঃ শিবশাসনতঃ শিবশাসনতঃ।"[৩]

সহজাবস্থালাভে গুরুর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নাথগণের মতের সহিত সন্তসাধকদের মতের ঐক্য আছে। সন্তমতেও গুরু বিনা সাধন সম্ভবপর নহে। সাধনের প্রতিস্তরে বিভিন্ন গুরুর অস্তিত্ব তাঁহারা স্বীকার করেন, যথা গুরুপদ বা যোগেশ্বর, সাধগুরু বা মহাত্মা, সন্তগুরু ও সর্ব্বশেষে পরমসন্তগুরু। শিশুর বয়োবৃদ্ধির সহিত যেরূপ বিভিন্ন পদগৌরববিশিষ্ট গুরুর প্রয়োজনীয়তা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, সেইরূপে সাধকের সাধনাপথেও বিভিন্ন গুরুর প্রয়োজন আছে। তন্ত্রশাস্ত্রেও সাধনের বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন গুরু গ্রহণের কথা আছে। যেরূপ মধুলুব্ধ ভৃঙ্গ পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে গমন করে, তদ্রূপ জ্ঞানলুব্ধ শিষ্য গুরু হইতে গুর্ব্বন্তরে গমন করে।

শিবদয়াল, কবীর প্রভৃতি সন্তদিগের মতে আজ্ঞাচক্রের নিম্নে গুরুলাভ হয় না, ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণ ও গুরুপদমাত্র দর্শন ঘটে, কূটস্থ ব্রহ্মের প্রকাশিত রূপই এই গুরুপদ। সন্তমতে সহস্রারে অনাহত নাদ শ্রুত হয়, তদূর্দ্ধে ত্রিকূটীতে মৃদঙ্গের ন্যায় ওঁকার নাদ ধ্বনিত হয় ও সাধগুরুর প্রাপ্তি হয়, তৎপরে তৃতীয় বা শূন্যমণ্ডল ও মহাশূন্যমণ্ডল আছে, তদূর্দ্ধে চতুর্থ মণ্ডল বা ভ্রমরগুহায় 'সোহং'নাদ হয় এবং তৎপরে সত্যলোকে সত্যনাম পুরুষ বা পরমসন্তগুরুর লাভ হয়। সত্যলোকে প্রবেশকালে 'সত্য' 'সত্য'

১। হ যো প্র ৪।১ ২। তারারহস্যে, গো সি স পৃ ৪৭ উল্লেখ।
৩। সি সি প ৫।৬৬, গো সি স পৃ ৩২।

নাদ শ্রুত হয়। শিবদয়ালের অনুভূতি সহস্রার হইতে বর্ণিত হইয়া ত্রিকূটী ও তদূর্দ্ধে পৌঁছাইয়া সত্যপুরুষ, অলখপুরুষ ও অগমপুরুষ ও তাঁহাদের তিন লোকের দর্শনে নিবৃত্ত হইয়াছে।[১] ভ্রমরগুহার অবস্থান সম্বন্ধে সন্তদের মধ্যেও মতভেদ আছে। মুণ্ডকোপনিষদে (৩।১।৭) জীবহৃদয়-গুহাতে ব্রহ্মের অবস্থান বর্ণিত হইয়াছে, কবীরও হৃদয়গুহাকে ভ্রমরগুহা বলিয়াছেন।

দেহস্থ চক্রসকলকে অতিক্রম করিয়া দেহবাহ্যে অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের চক্রসকলও অতিক্রম করিয়া সত্যলোকে উপনীত হইতে হয়, কবীর-পন্থী ও রাধাস্বামী সম্প্রদায়ে ইহার বিশেষ চর্চ্চা আছে। যে ভেদী পুরুষ নিম্নচক্র ভেদ করিয়া ত্রিকূটীতে পৌঁছিয়াছেন তিনি যোগেশ্বর, যিনি সুন্নে পৌঁছিয়াছেন তিনি সাধ, যিনি ব্রহ্মাণ্ডের পরে নির্ম্মলদেশে পৌঁছিয়াছেন তিনি সন্ত এবং সর্ব্বোচ্চ ধামে বা পরমপুরুষের ধামে যিনি পৌঁছিয়াছেন তিনি পরমসন্ত; ভেদী পুরুষ অর্থে যিনি ষট্‌চক্রভেদ করিয়াছেন।[২]

কবীরাদির মতে সত্য সগুণ ও নির্গুণের অতীত। ঈশ্বর ত্রিলোক ব্যাপ্ত হইয়া থাকিলেও তাঁহার আবাস চতুর্থলোকে, এই লোক নির্গুণ বা নিরঞ্জনের উর্দ্ধে। নিরঞ্জনের উর্দ্ধে সহজ, ওঁকার, ইচ্ছা, সোঽহং, অচিন্ত্য, অক্ষয় এই ষট্‌পুরুষের কল্পনা করিয়াছেন, ইহারও উর্দ্ধস্তরে সত্যলোক, তথায় সত্যপুরুষ বিরাজমান আছেন। ইঁহাদের স্বরূপ ও আবাস নির্ণয়ার্থে পঞ্চ ব্রহ্মের ও পঞ্চ অণ্ডের কল্পনা করা হইয়াছে, তৎপরে ষষ্ঠ ব্রহ্ম ও ষষ্ঠ মণ্ডল কল্পনা আছে। এই ষষ্ঠ অণ্ড হইতেই নিরঞ্জন ও জ্যোতির (মায়ার) উদ্ভব, তাঁহারাই ত্রিলোক সৃষ্টি করিয়াছেন।[৩] নাথপন্থেও ষট্‌পিণ্ডের কল্পনা আছে (সিদ্ধান্ত অংশের পিণ্ডতত্ত্ব অধ্যায়ে ইহার বিশেষ আলোচনা দ্রষ্টব্য)। ষষ্ঠ পিণ্ড হইতেই বিশ্বের তথা জীবের উৎপত্তি বর্ণনা করা হইয়াছে। সাধনপথে জীবকে একে একে সকল পিণ্ড অতিক্রম করিতে হয়। গুরু তাহার সহায়। তন্ত্রেও গুরুর স্থান অতি উচ্চে, গুরুকে শিবের অংশরূপে কল্পনা করিয়া চারিজন বাহ্যগুরুর কল্পনা করা হয়, যথা গুরু, পরমগুরু, পরমেষ্ঠিগুরু ও পরাৎপরগুরু। ইঁহারা সকলেই শিবের অংশবিশেষ। ষট্‌চক্রের সর্ব্বোচ্চস্থানে অধোমুখ

১। বাড়থ্‌বাল, নির্গুণসম্প্রদায় পৃ ১৫৩-১৫৯। ২। অমৃত বচন পৃ ৫২।
৩। বাড়থ্‌বাল, নির্গুণসম্প্রদায় পৃ ২৯।

সহস্রদলকমলের কর্ণিকা মধ্যে মৃণালরূপী চিত্রিণী নাড়ী দ্বারা ভূষিত গুরুমন্ত্রাত্মক দ্বাদশবর্ণরূপী দ্বাদশদলপদ্মে অকথাদি ত্রিরেখা ও কোণ দ্বারা ভূষিত কামকলা ত্রিকোণে নাদবিন্দুরূপী মণিপীঠ বা হংসপীঠের উপর শিবস্বরূপ শ্রীগুরুর স্থান আছে—পাদুকাপঞ্চক স্তোত্রে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।[১] এই পাদুকাপঞ্চক স্তোত্র পঞ্চাননের পঞ্চমুখ হইতে ভাষিত হইয়াছে, ইহাদ্বারা মন্ত্রদেবতাগণের সাধনফল লাভ হয়, ইহা অতি দুর্ল্লভ, কারণ শ্রীগুরুর কৃপা ভিন্ন ইহার উপলব্ধি হয় না (অ, উ, ম, নাদ ও বিন্দু ইহারাই শিবের পঞ্চমুখ, এই পঞ্চতত্ত্বই পাদুকাপঞ্চক)।

ষট্‌চক্র সাধনার বিভিন্ন স্তরে কুণ্ডলিনীর জাগরণে 'প্রথম গুরু'র সহায়তা আবশ্যক, তৎপরে সহস্রারে শিবশক্তির মিলন-অনুভূতি বোধার্থে 'দ্বিতীয় গুরু'র প্রয়োজন, তদূর্দ্ধে শিবশক্তির অভিন্নতা বা ব্রহ্মবোধার্থে 'ব্রহ্মগুরু'র কৃপালাভ আবশ্যক, সর্ব্বশেষে জীব ও ব্রহ্মে অভেদত্ব যিনি উপলব্ধি করাইতে সক্ষম তিনিই 'সদ্‌গুরু' পদবাচ্য। দেখা যাইতেছে সাধনপথে গুরুর আবশ্যকতা আছে, কিন্তু সে গুরুর লক্ষণ কিরূপ হইবে, তাঁহার কৃপা কাহার দ্বারা লভ্য হইবে? তদুত্তরে বলিতে হয়, গুরু সদ্‌গুরুর লক্ষণযুক্ত হইবেন ও তিনি অভেদে কৃপা করেন বলিয়া তাঁহার কৃপা সকলের দ্বারাই লভ্য হইবে। বৈষ্ণবদের মধ্যেও গুরুর অভেদে কৃপা করিবার কথা আছে। সৎ ও অসৎ গুরুতে প্রভেদ এই যে, অসৎ গুরু ভেদে কৃপা করেন। বস্তুতঃ সদ্‌গুরু কোন মানবদেহধারী গুরু নহেন, উহা আত্মা স্বয়ং, কারণ নিজের স্বরূপের উপলব্ধি নিজের দ্বারাই সম্ভব, অন্যের দ্বারা তাহা লাভ করা সম্ভব নহে, যোগসাধনের প্রথম অবস্থায় গুরুর সহায়তা আবশ্যক, কিন্তু তারক যোগে গুরুর আবশ্যকতা নাই, কারণ উহাই আত্মোপলব্ধি।

সাধনপথের মহৎ কষ্টসকলও সদ্‌গুরুলাভ হইলে স্বল্প হয়। গোরক্ষসিদ্ধান্ত-সংগ্রহে উক্ত হইয়াছে—"ভো পুরুষা গুরুহীনানাং তেষাং কষ্টং ভবেৎ যদা তাদৃশঃ পূর্ব্বোক্তপূর্ণো গুরুর্লভ্যতে তদা মহদপি কষ্টমতিস্বল্পং ভবেৎ।...তথা গুরুময্যা কুঞ্চিকয়া স্বল্পেনাপি কষ্টেন সহজসিদ্ধির্ভবতি। যদিচ মহৎ কষ্টমপি ভবেত্তদা কষ্টোত্তরে তু মহানানন্দো ভবত্যেব।" অন্যত্র "স চ যোগো গুরুকৃপয়াঽল্পশ্রমেণৈব

১। পাদুকাপঞ্চক স্তোত্র ১, ২, ৩ শ্লোক

প্রাপ্তো ভবেৎ।”[১] গুরু শিষ্যের পক্ষে মোক্ষদ্বার অর্গলমুক্ত করিবার উপায়স্বরূপ, তাই তিনি কুঞ্চিকারূপী, তাঁহার সাহায্যে কষ্ট উত্তীর্ণ হইলে মহানন্দলাভ ঘটে। “মুচ্যতে শিষ্যো জন্মসংসারবন্ধনাৎ”—জন্মমৃত্যুর দুঃখ নিবারণার্থে শিষ্য গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সফলকাম হন এবং

অনন্যভাবেন নিরুত্থিতিশ্রীলাভেন চাঞ্চল্য বিধূননেন।
অবস্থিতিঃ শ্রীকরুণাম্বুধাব্ধি গুরুপ্রসাদাদ্ ভবতীতি সত্যম্॥[২]

অর্থাৎ গুরুকৃপাফলে নিরুত্থিতিশ্রীলাভ হয়, চাঞ্চল্যমুক্ত হইয়া মুমুক্ষু শিষ্য কৈবল্যলাভে সক্ষম হয়।

নাথগুরুর অপর একটী বৈশিষ্ট্য যে তাঁহারা সর্ব্ববিদ্যাবিৎ, মহাতপা ও সকলের মন্ত্রদাতা এবং “নাথা মহাদিব্যা যোগশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকাঃ’।[৩] যিনি সর্ব্বোপরি বিরাজমান নাথমতে সেই ‘নাথ’ই একমাত্র পারমার্থিক গুরু, কিন্তু লোকসমূহের রক্ষার নিমিত্ত চারিজন ‘যুগনাথ’ আছেন, তাহাদের নাম যথাক্রমে মিত্রীশ, উড্ডীশ, ষষ্ঠিশচর্য্যা ও কুম্ভসম্ভব। ললিতাপুরের উত্তরকোণে মহাদ্যুতি বায়ুলোক আছে, তথায় বায়ুশরীর দানপরায়ণ পবনভ্যাসী সিদ্ধ দেবর্ষিগণ ও গোরক্ষপ্রমুখ যোগিগণ অবস্থান করিতেছেন—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের ললিতাখণ্ডে এইরূপ বিবৃতি আছে। নাথলোকে মহাতপা যুগনাথেরা বাস করেন, তাঁহারা লোকরক্ষার্থে পাদুকাত্মক বহু লোক সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই সকল লোকে সাযুজ্য-সিদ্ধ, সারূপ্যসিদ্ধ ও সালোক্যসিদ্ধেরা অবস্থান করেন। তন্মধ্যে ণ্ণরা দিব্যৌঘ, মিত্রাদিরা মানবৌঘ, স্বরতাপসাদি সিদ্ধৌঘ, এই ত্রিবিধ গুরুপরম্পরাকে ওঘত্রয় অর্থাৎ স্রোতত্রয় আখ্যা দেওয়া হয়। সিদ্ধদের মধ্যে দিব্যগুরু, সিদ্ধগুরু ও মানবগুরুর এই তিনটী বিভাগ কোন কোন ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রেও দেখা যায়। ললিতসহস্রনামের “দিব্যৌঘশ্চ মানবৌঘাঃ সিদ্ধৌঘাশ্চ সমাগতাঃ”র ভাস্কর রায় যে ভাষ্য করিয়াছেন সেই তালিকার সহিত তারারহস্যের তালিকার মিল নাই। তারারহস্যে দিব্য ও সিদ্ধ শ্রেণীর বর্ণনা আছে অনুমিত হয়, তন্মধ্যে মীননাথ নামও আছে। কৌলাবলীতন্ত্রে মানবৌঘ শ্রেণীর গুরুর উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে “মীনো গোরক্ষশ্চৈব ভোজদেবপ্রকীর্ত্তিতঃ……মানবৌঘঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ”

১। গো সি. স. পৃ ১৪, ১২ ২। সি. সি স. ৫।৬০ ৩। গো. সি. স. পৃ ৪৩

পাওয়া যায়, শ্যামারহস্যেও ইহার প্রায় অনুরূপ তালিকা আছে। ওঘত্রয় মধ্যে মীন গোরক্ষের উল্লেখেই বুঝা যায় যে সিদ্ধরূপে তাঁহারা লোকমান্য হইয়াছিলেন। এইরূপে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রে তাঁহারা স্থান পাইয়াছেন।[১]

যাঁহার আশ্রয়ে জীব একসঙ্গে ভোগ ও মোক্ষ উভয় সিদ্ধি লাভ করিতে পারে সিদ্ধমতে তিনিই শ্রেষ্ঠ গুরু। পূর্ণসত্যের প্রতিপাদক গুরু ও শাস্ত্রই সদ্‌গুরু ও সৎশাস্ত্র। সদ্‌গুরু প্রাতিভজ্ঞানবিশিষ্ট অর্থাৎ তাঁহার সতর্ক বা শুদ্ধবিদ্যার উদয় স্বতঃই হইয়া থাকে। মানব সদ্‌গুরুর মধ্যে অকল্পিত (স্বয়ংসিদ্ধ), অকল্পিতকল্পক (ভাবনাবলে যিনি শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়াছেন), কল্পিত (দীক্ষাযোগে যিনি শুদ্ধজ্ঞান লাভ করিয়াছেন) ও কল্পিতাকল্পিত (যিনি আকস্মিকভাবে যথার্থ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন)—এই চারিপ্রকার ভেদ আছে, তদ্ব্যতীত সিদ্ধগুরু ও দিব্যগুরুও আছেন। মূলে কিন্তু সর্ব্বত্রই পরমেশ্বরই একমাত্র অনুগ্রাহক। সদ্‌গুরু বলিতে সাক্ষাৎ পরমেশ্বর অথবা তাঁহার অনুগ্রহপ্রাপ্ত তৎসাধর্ম্ম্যাপন্ন জীবন্মুক্ত অধিকারী পুরুষকে বুঝায়। এই অধিকারী দেবতা, সিদ্ধ ও মনুষ্য—তিনই হইতে পারেন।[২]

মুক্তিপথে সাযুজ্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য ও সালোক্য এই চারিটী স্তর-ভেদ আছে অর্থাৎ শিবের দৃষ্টির মধ্যে আসিলে সালোক্য, তাঁহার রূপের মধ্যে পৌঁছিলে সারূপ্য, তাঁহার শক্তির মধ্যে আসিলে সার্ষ্টি ও তাঁহার সত্তা বা স্বরূপ উপলব্ধি করিলে সাযুজ্য সিদ্ধি হয়। নাথমতে শ্রেষ্ঠ গুরুরা এই চারিটীকে এক মনে করেন।[৩] সামীপ্য সর্ব্বসময়েই থাকে, ইহাকে পৃথকভাবে গণনা করিলে পঞ্চস্তর কল্পনা করিতে হয়। যে 'ওঘত্রয়' বর্ণিত হইয়াছে তান্ত্রিকসাধনে ষোড়শী হইতে সপ্তদশীতে উপনীত হইতে হইলে এই ওঘত্রয় ভেদ করিতে হয়। আদি নাদই চন্দ্রের অমানাম্নী ষোড়শী কলা আর যাহা নাদরূপে ব্যক্ত হইবার পূর্ব্বাবস্থা তাহাই সপ্তদশী কলা বা 'সমনী'—অর্থাৎ তখন মন অতি সূক্ষ্মভাবে বর্ত্তমান থাকে, ইহার উর্দ্ধে

১। গো সি. স পৃ ৪৪
বাগ্‌চী—কৌলজ্ঞান ভূমিকা পৃ ২০, ললিতসহস্রনামের উল্লেখ। 'কল্যাণ' সাধনাঙ্ক (১ম) 'তন্ত্রমে গুরু সাধনা' প্রবন্ধে শ্রীনগরের মন্দিরে ও রাজচিত্রভাণ্ডারে 'গুরুমণ্ডলার্চনা'র পুঁথির বর্ণনা।

২। গুরুতত্ত্ব ও সদ্‌গুরুরহস্য, গোপীনাথ কবিরাজ। উত্তরা, বৈশাখ ১৩৫০ পৃ ৩১১, ৩১২,

৩। গো. সি. স. পৃ ৪৪

'উন্মনী' অবস্থা; কোন কোন স্থলে সপ্তদশী কলাকেই উন্মনী বলা হইয়াছে। উন্মনী স্থান নির্গুণ শিবপদ। ইহা লাভ করাই যোগীর লক্ষ্য। তন্ত্রমতে গুরুপূজায় শিবশক্তি-সামরস্য স্বরূপ নাদবিন্দু কলাতীত পরমানন্দতত্ত্বেরও পূজা হয়। ইহাই তন্ত্রবর্ণিত শ্রীগুরুসাধনের বিশেষত্ব। নাথযোগীর 'নাথ'স্বরূপে অবস্থানই লক্ষ্য, ইহাও তত্ত্বাতীত অবস্থা।

নাথযোগীর আদর্শ কি? যোগীকে যাহা অধিগত হইতে হইবে, যে স্বরূপে অবস্থান করিতে হইবে, তাহাই নাথযোগীর আদর্শ। সহজাবস্থা-লাভেই মোক্ষ, তাহাই পরমপুরুষার্থ বা নাথস্বরূপে অবস্থান, ইহাই আদর্শ। "পরমঃ পুরুষার্থস্তু মুক্তিরুক্তাহ্যতস্তু সা। নিরূপ্যতে অবধূতানাং যোগসাধনজং ফলম্। পরমপুরুষার্থস্তু মুক্তিরিত্যুক্তম্। সা চ নাথস্বরূপেণা-বস্থানম্॥"[১]

এই 'নাথস্বরূপ' বলিতে কি বুঝায় তাহা শ্রীনিত্যনাথ-কৃত সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতিতে এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে—

"ন ব্রহ্মা বিষ্ণুরুদ্রৌ ন সুরপতিঃ সুরা নৈব পৃথ্বী ন চাপো নৈবাগ্নির্নাপি বায়ুর্ন চ গগনতলং ন দিশো নৈব কালঃ। ন বেদা নৈব যজ্ঞা ন চ রবিশশিনৌ ন বিধির্নৈব কল্পাঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ সত্যমেবং জয়তি তব পদং সচ্চিদানন্দমূর্ত্তে॥ তৎপদেনাবস্থানং মুক্তিরিতি।"[২] সেই সত্যস্বরূপ স্বয়ংজ্যোতি পরমপদে অবস্থানই মুক্তি। গুরুবাক্যানুসারে সাধন করিতে পারিলে তত্ত্বজ্ঞান জন্মে, তখন নির্ব্বিকারস্বরূপে অবস্থিতি হয়। ঐহিক বিষয়াদি পরিত্যাগ, পারত্রিক স্বর্গভোগাদির অভিলাষ নিবৃত্তি, তত্ত্বদর্শন বা আত্মসাক্ষাৎকার এবং সহজাবস্থালাভ বা সমাধি সকলই সদ্গুরুর কৃপাসাপেক্ষ।

শ্রীনাথকৃত সিদ্ধসিদ্ধান্ত পদ্ধতিতে বর্ণিত আছে যে আদিনাথ মহাসিদ্ধ শক্তিযুক্ত জগদ্গুরু।…"তত্তু পদং তাদৃশযোগিনামেবাপরোক্ষ-মিতি সিদ্ধান্তঃ"—সেই নাথপদবী যোগিগণের অপরোক্ষানুভূতি-সাপেক্ষ।[৩]

নাথমতে অবধূত এই পদ অনুভূতির দ্বারা লাভ করিয়াছেন, তাই তাঁহার "একহস্তে ধৃতস্ত্যাগো ভোগশ্চৈককরে স্বয়ম্।"[৪] তিনি ত্যাগ ও ভোগের দ্বারা অলিপ্ত, তিনি কেবল ত্যাগীও নহেন কেবল ভোগীও

১। গো সি স. পৃ ১০।১৭ ২। গো সি স. পৃ ১১ তে উল্লেখ, নিত্যনাথকৃত সি. সি. প.।
৩। গো সি. স পৃ ১১তে, উল্লেখ শ্রীনাথকৃত সি. সি প ৪। গো সি স. পৃ ১

নহেন; অবধূতের একদিকে দ্বৈত, অন্যদিকে অদ্বৈত, তিনি স্বয়ং সর্ব্ব-দ্বন্দ্বাতীত। এইরূপে নাথমার্গে 'অবধূত' বলিয়া যাহাকে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে তিনিই অতিবর্ণাশ্রমী সকল গুরুর গুরু অর্থাৎ সকলের মন্ত্রগুরু, তাঁহার ন্যায় শ্রেষ্ঠ গুরু আর নাই। সূতসংহিতায় শ্রেষ্ঠগুরুর বর্ণনা আছে, যথা—

'অতিবর্ণাশ্রমী সাক্ষাদ্ গুরূণাং গুরুরুচ্যতে।
ন তৎসমো নাধিকশ্চাস্মিল্লোঁকেঽস্ত্যেব ন সংশয়ঃ॥[১]

সিদ্ধমতে গুরুর কয়েকটী বিশেষ লক্ষণ নির্ণয় করা হইয়াছে, তাঁহাকে পঞ্চমাশ্রমী, অবধূত প্রভৃতি বলা হইয়াছে। সদ্‌গুরু সর্ব্বাধিকারীর গুরু, তাঁহার নিকট শিষ্যের বর্ণ বা আশ্রমের ভেদ নাই, তিনি স্বয়ং বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অতীত বলিয়া অতিবর্ণাশ্রমী বা পঞ্চমাশ্রমী নামে খ্যাত। তিনি আদর্শ যোগী পুরুষোত্তম, কেহ তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না বা তাঁহার তুল্য হইতে পারে না। এই অবধূত-গুরুর উপদেশের বৈশিষ্ট্য আছে। তিনি মৌন ব্যাখ্যান দ্বারা উপদেশ দেন, "গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানম্" এবং অবধূত-গুরু নিজ শিষ্য নির্ব্বাচন করিয়া লন বলিয়া অনাবশ্যক উপদেশ দ্বারা শিষ্যদেব বিব্রত কবেন না। পুরাণে বর্ণিত আছে শৌচাদি ক্রিয়া পর্য্যন্ত গুরু শিষ্যকে উপদেশ দিবেন, অবধূত-গুরু দ্বারা পূর্ব্বেই শিষ্যের যোগ্যতাবিচার হইয়া যায় বলিয়া এইরূপ উপদেশ অনাবশ্যক বোধ করেন। সিদ্ধমতে সাধন বিনা কেবল শাস্ত্রপাঠ নিষ্ফল, তাই সদ্‌গুরুর কৃপা ভিন্ন আত্মসাক্ষাৎকারের অন্য উপায় নাই। জঠর-সংহিতায় উক্ত হইয়াছে, যথার্থ গুরুর দ্বারা প্রদর্শিত মার্গে স্বসংবেদ্য পদের দর্শন হয়, তাহা আত্মবিশ্রান্তির কারণ, এইরূপ গুরুকেই দেবভাবে দর্শন কর্ত্তব্য। "তেন সন্দর্শিতে মার্গে স্বসংবেদ্যস্য দর্শনম্ ভবতীতি গুরুং দেবভাবেন পরিচিন্তয়েৎ।"[২] গোরক্ষকৃত অমরৌঘশাসনম্ গ্রন্থে আছে শব্দব্রহ্ম দ্বিপ্রকার--স্বসংবেদ্য ও অসংবেদ্য—"স্বসংবেদ্যম্ অসংবেদ্যম্ শব্দ ব্রহ্মদ্বিধাস্থিতম্"-- যাহা স্বপ্রকাশ তাহাই স্বসংবেদ্য, যাহা পরের দ্বারা প্রকাশিত তাহা অসংবেদ্য।[৩]

যে গুরু স্বসংবেদ্য পদের দর্শন করান তিনিই সদ্‌গুরু ইহা বলা হইয়াছে, এখন সদ্‌গুরুর অন্যান্য লক্ষণ নাথমার্গে কিরূপে নির্দ্দেশিত

১। গো সি স পৃ ২ সূতসংহিতার উল্লেখ
২। সি. সি স, ৫।৭, ৮
৩। অমরৌঘশাসনম্ ১।১৯

হইয়াছে তাহাই বিবেচ্য। নিমেষার্দ্ধ বা তদর্দ্ধকালমাত্র যাঁহার বাক্যের আলোচনা দ্বারা স্থির আত্মাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় তিনিই সদ্‌গুরু, যাঁহার উপদেশে সামরস্যাখ্য শ্রেষ্ঠ পরমপদরূপ সম্যক্‌চৈতন্যে বিশ্রান্তিলাভ হয় তিনিই সদ্‌গুরু।[১] যিনি স্বয়ং তীর্ণ হইয়াছেন তিনিই অপরকে উত্তীর্ণ করিতে পারেন, যেরূপ এক প্রস্তরে আরোহণ করিয়া অপর প্রস্তরসকল নদী পার হইতে পারে না, পার হইবার নিমিত্ত নৌকারই প্রয়োজন হয় সেইরূপ উত্তীর্ণ গুরুই সাধককে উত্তীর্ণ করিতে পারেন, অন্যে পারে না।[২]

সদ্‌গুরুই পরমপদপ্রাপ্তির সহায়স্বরূপ। জাগতিক যে সমস্ত জ্ঞানের উদয়ে পরমপদপ্রাপ্তি ঘটে, সেই জ্ঞানেব চারিটী অবস্থাভেদ আছে। প্রথমাবস্থা 'স্বাত্মসংবিত্তিরূপ সহজজ্ঞান' বা বিশ্বমধ্যে বিশ্বময়কে দর্শন, অর্থাৎ তুরীয়াতীত পরমাত্মাকে বিশ্বের অণুতেও প্রত্যক্ষ করা। দ্বিতীয় অবস্থা 'সর্ব্বনিগ্রহরূপ সংযমযুতজ্ঞান' বা স্ফুরণশীলবৃত্তির আত্মামধ্যে সংযম। তৃতীয় অবস্থা 'স্ব স্ব বিশ্রান্তিরূপ সোপায়জ্ঞান' বা প্রকাশময় আত্মাকে স্বরূপতঃ অভিব্যক্ত করিয়া সর্ব্বদা লৌল্য বা উদ্যম অবস্থায় স্থিতি। চতুর্থাবস্থা 'সাদ্বয়জ্ঞান' বা 'পরমপদরূপ অদ্বৈতজ্ঞান', ইহা অদ্বয়-জ্ঞানের অবস্থা, তখন আত্মস্বরূপে জাতি প্রভৃতি বিকল্পের আত্যন্তিক অভাব দৃষ্ট হয়। এই চতুর্ব্বিধ অবস্থা একমাত্র সদ্‌গুরু-মুখনিঃসৃত উপদেশে লাভ হয়, কেবল শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারা লভ্য নহে, সদ্‌গুরুর সম্যক্ প্রসাদই তাহা প্রাপ্তির একমাত্র উপায়।[৩]

"দৃষ্টিঃ স্থিরা যস্য বিনাপি দৃশ্যং বায়ুঃ স্থিরো যস্য বিনাপ্রযত্নম্।
চিত্তং স্থিরং যস্য বিনাবলম্বং স এব যোগী স গুরুঃ স সেব্যঃ ॥[৪]

এইরূপ গুরুই অত্যাশ্রমী, যোগী, জ্ঞানী, সিদ্ধ ও সুব্রত। তাঁহাতে ঈশ্বরতা স্বামিত্ব ও সাধুতার সম্যক্ স্ফুরণ দৃষ্ট হয়, সেজন্য তিনি ধন্য। তিনি জিতেন্দ্রিয়, সুধী, কোবিদ, বুধ এবং সমস্ত দর্শনের স্বরূপ প্রকাশে সমর্থ, এইরূপ সদ্‌গুরুই সম্ভজনীয়।[৫] কৈবল্যমুক্ত যোগী গুরু হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাতে ঈশ্বরতা থাকিবেই এইরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। তন্ত্রের সাধনে যোগীর বা গুরুর ঈশ্বরতা স্ফুরণ অনিবার্য্য, ইহার বিকাশ-ক্রিয়ার আলোচনা এস্থানে অপ্রাসঙ্গিক।

১। সি স. স ৫।৩১ ৩৭, ৩৫ ২। গো সি স. পৃ ৩২ ৩। সি সি. স. ৫।২৪, ২৫
৪। অমনস্ক ২।৩৮, গো সি. স, পৃ ৪০, নাদবিন্দু উপনিষদ ৫৬ শ্লোক। ৫। গো. সি. স পৃ ৩২

নাথমার্গে ওঁকারতত্ত্বের একটী বিশিষ্ট স্থান আছে। সদ্‌গুরু সেই ওঁকারের তত্ত্বদর্শক—"তস্মিন্ মধ্যে স্থিতং তত্ত্বং প্রদর্শয়তি সদ্‌গুরুঃ"।[১] ওঁকার সাধনই মুমুক্ষুর কর্ত্তব্য।

অনন্তোপায়যত্নেভ্যঃ প্রাপ্যতে পরমং পদম্।
গুরুদৃকৃপামাত্রাণাং হৃষ্টানাং সত্যবাদিনাম্॥
কথনাদ্ দৃষ্টিপাতাদ্বা সান্নিধ্যাদ্বাবলোকনাৎ।
প্রসাদাৎ সদ্‌গুরোঃ সম্যক্ প্রাপ্যতে পরমং পদম্॥[২]

এইরূপ দীক্ষার কথা বায়বীয় সংহিতাতেও উক্ত হইয়াছে—গুরু স্বীয় প্রসন্ন দৃষ্টি বা স্পর্শ দ্বারা একক্ষণমাত্রে শিষ্যকে স্বরূপে স্থিতি করাইয়া দেন, এই দীক্ষার নাম 'শাম্ভবী' দীক্ষা। রুদ্রযামলে উক্ত হইয়াছে ভগবান শম্ভুর চরণদ্বয় হইতে সম্ভূত দীক্ষাই শাম্ভবী দীক্ষা। সদ্‌গুরুর দীক্ষা শাক্তী, শাম্ভবী ও মান্ত্রী। শাক্তী দীক্ষাতে কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ হয়, গুরু শিষ্যের অন্তর্দেহে প্রবেশ করিয়া শক্তিকে জাগরিত করেন। মান্ত্রী বা আণবী দীক্ষার স্মার্ত্তী, মানসী, চাক্ষুষী, স্পার্শিকী, বাচিকী প্রভৃতি দশবিধ ভেদ আছে।[৩]

যোগবাশিষ্ঠে আছে—

দর্শনাৎ স্পর্শনাচ্ছব্দাৎ কৃপয়া শিষ্যদেহকে।
জনয়েদ্ যঃ সমাবেশং শাম্ভবং স হি দেশিকঃ॥

(নির্ব্বাণ প্রকরণ ১।১২৮-১৬১)

অর্থাৎ যিনি কৃপাপূর্ব্বক দর্শন, স্পর্শন বা শব্দ দ্বারা শিষ্যের দেহে শিব-ভাবের আবেশ উৎপাদন করিতে পারেন তিনিই দেশিক বা গুরু। কুণ্ডলিনী প্রবুদ্ধ হইয়া ষষ্ঠচক্রভেদপূর্ব্বক ব্রহ্মরন্ধ্রে পরশিবের সহিত মিলিত হইলে এই আবেশ ঘটে। সত্যসঙ্কল্প গুরু মাত্র একবার কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়াও এই সুমহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন। "অযোগ্যেঽপি যোগ্যতামাপাদ্য শ্রীগুরুসূর্য্যো বোধয়তি" অর্থাৎ শ্রীগুরুরূপী সূর্য্য অযোগ্যকেও যোগ্য করিয়া প্রবুদ্ধ করেন, ইহাই সদ্‌গুরুর কার্য্য।[৪]

ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ বঙ্গীয় যোগী সিদ্ধ তিলোপার শিষ্য তিব্বতের রাজপুত্র নারোপার কাহিনী উল্লেখ করা যাইতে পারে। নারোপা দ্বাদশ

১। গো. সি স. পৃ ৩৩ ২। সি সি স. ৫।২৯, ৩০

৩। কল্যাণ সাধনাঙ্ক (১ম) পৃ ২১৬, 'দীক্ষা ও অনুশাসন'।

৪। উত্তরা, বৈশাখ ১৩৫০, পৃঃ ৩১৩, গুরুতত্ত্ব ও সদ্‌গুরু-রহস্য।

বৎসর অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিবার পর, সিদ্ধগুরুর সপাদঘাত বাক্য ও দৃষ্টি দ্বারা উদ্ধার লাভ করেন। তিলোপা বঙ্গদেশের বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং নারোপা দশম শতাব্দীর লোক ছিলেন ও যাদুবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন।[১] সিদ্ধগুরু হাড়িপা বা জালন্ধাবনাথের দ্বারা বঙ্গীয় রাজা গোপীচন্দ্রের অশেষ লাঞ্ছনার পর উদ্ধারসাধনের কাহিনী গোপীচন্দ্রের গান প্রভৃতি বঙ্গীয় গীতিকার উপজীব্য।

গোপীচন্দ্র, ময়নামতী প্রভৃতি গুরুর নিকট মহাজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, এই মহাজ্ঞানের দ্বারাই তাঁহারা মৃতুঞ্জয়ী হন। ইহাই নাথগুরুর বৈশিষ্ট্য।

শারদাতিলক, অভিসময়ালঙ্কার প্রভৃতিতেও লক্ষণ বিচার করা হইয়াছে যথা—জিতেন্দ্রিয়, শিবশাস্ত্র-বিধানজ্ঞ, সত্যবাদী, বীর্য্যসম্পন্ন, দয়াদাক্ষিণ্যসংযুক্ত, ত্যাগী, দম্ভনির্মুক্ত ইত্যাদি।[২] কিন্তু তিনি মহাজ্ঞানের তত্ত্বপ্রদর্শক, এইরূপ ব্যাখ্যা নাথমার্গ ব্যতীত অন্যত্র নাই। এই মহাজ্ঞানের স্বরূপ অন্যত্র ব্যাখ্যাত হইতেছে (যোগ ও জ্ঞানের পরস্পর সম্বন্ধ বিচার অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

এক্ষণে অসদ্‌গুরুর লক্ষণ বর্ণিত হইতেছে, কারণ অসদ্‌গুরু পরিত্যাজ্য—

জ্ঞানহীনো গুরুস্ত্যাজ্যো মিথ্যাবাদী বিকল্পকঃ।
স্ববিশ্রান্তিং ন জানাতি পরেষাং কিং করোতি সঃ॥[৩]

জ্ঞানহীন, মিথ্যাবাদী, বিকল্পক গুরু ত্যাজ্য, এবং যে সকল গুরু মাত্র শাস্ত্রদৃষ্ট অনুমান, তর্ক, মুদ্রাদি লইয়া ভ্রমণ করে, বাক্যমাত্র যাহাদের সম্বল তাহারা ত্যাজ্য কারণ তাহারা অসদ্‌গুরু।[৪] "বহুদীক্ষিতা আচার্য্যা গুরবস্ত্যাজ্যাঃ মহাসিদ্ধ এব গুরুঃ কর্ত্তব্যঃ।"[৫] যে গুরুর বহুশিষ্য আছে তিনি শিষ্যদের ভুবনবিশেষের ঐশ্বর্য্যভোগের জন্য নিয়োজিত করিতে পারেন কিন্তু দিব্যজ্ঞান দিতে অক্ষম হন, অতএব তিনি ত্যাজ্য।

১। With Mystics and Magicians in Tibet. Alex David Neel p 165.

২। শারদাতিলক ২।১৪২—১৪৪, অভিসময়ালঙ্কার ১।১৩—১৫ শ্লোক মৈত্রেয়কৃত।

৩। সি সি স ৫।৩৮

৪। গো. সি স পৃ ৩২, অভিসময়ালঙ্কার, ১।১৬, ১৭ অসদ্‌গুরুর লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে, যথা—তার্কিক, ক্ষুদ্রসিদ্ধি-সাধনপর, শাস্ত্রবর্জ্জিত, সত্যশৌচ-বিবর্জ্জিত, ইত্যাদি।

৫। গো. সি স পৃ ৫৬

মহাসিদ্ধ গুরুই বরণীয়। নাথমতে "মহাসিদ্ধা বহূন্ দীক্ষিতান্ন কুর্বন্তি", কারণ বহুশিষ্যের মোক্ষলাভের যোগ্যতা থাকে না, অতএব বহু শিষ্য গ্রহণে গুরুর মনস্তাপের কারণ ঘটে। মহাসিদ্ধ গুরুর নিজাপেক্ষা চতুর্লক্ষণ ন্যূন শিষ্যগ্রহণ কর্ত্তব্য, শিষ্যপক্ষেও দ্বাত্রিংশৎ লক্ষণযুক্ত গুরুগ্রহণ কর্ত্তব্য। গুরুর বত্রিশ লক্ষণ, শিষ্যের তদপেক্ষা চারিটী লক্ষণ ন্যূন থাকিবে বা গুরুর ছত্রিশ লক্ষণ ও শিষ্যের বত্রিশ লক্ষণ থাকিবে। চারিটী লক্ষণ ন্যূন হইলে যোগ্য শিষ্য বিবেচিত হয়, তদপেক্ষা অধিক লক্ষণ ন্যূন থাকিলে মূর্খ শিষ্য বিবেচিত হয়, এইরূপ শিষ্য দ্বারা মোক্ষলাভ সম্ভবপর হয় না, অতএব সিদ্ধগুরু লক্ষণ বিচার করিয়া শিষ্য গ্রহণ করেন। 'গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহে' যে পুরুষলক্ষণ বিবৃত হইয়াছে, শিষ্যপক্ষেও ঐ সকল লক্ষণ থাকা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। অর্থাৎ গুরু ও শিষ্য উভয়ের গুণসাম্য থাকিলে উপযুক্ত গুরুশিষ্যভাব হয়, উক্ত গ্রন্থে এইরূপ সিদ্ধান্ত বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু যোগবিষয়ক অন্যান্য গ্রন্থে শিষ্যপক্ষে চারিটী লক্ষণ ন্যূন থাকা কর্ত্তব্য বিবেচিত হইয়াছে, "মহাসিদ্ধৈরপি চতুর্লক্ষণ-ন্যূন শিষ্যঃ কর্ত্তব্যো, বহবশ্চ শিষ্যা বর্জনীয়া ইতি সিদ্ধান্তঃ।[১]

সিদ্ধ সম্প্রদায়ে পুরুষের যে দ্বাত্রিংশৎ লক্ষণ থাকা কর্ত্তব্য বিবেচিত হইয়াছে তাহা এইরূপ অষ্টবিভাগ দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে,[২] যথা—

জ্ঞান পরীক্ষা	**বিবেক পরীক্ষা**	**নিরালম্ব পরীক্ষা**	**বিবেক পরীক্ষা বা পরীক্ষাবমেক**
নিরালম্ব	নির্মোহ	নিষ্প্রপঞ্চ	সর্ব্বাঙ্গী
নির্ভ্রম	নির্বন্ধ	নিস্তরঙ্গ	সাবধান
নিবাসী	নিঃশঙ্ক	নির্দ্বন্দ্ব	সন্
নিঃশব্দ	নির্বিষয়	নির্লেপ	সারগ্রাহী
সন্তোষ পরীক্ষা	**শীল পরীক্ষা**	**সহজ পরীক্ষা**	**শূন্য পরীক্ষা**
অযাচকঃ	শুচিঃ	সুহৃৎ	লয়ঃ
অবাঞ্ছকঃ	সংযমী	শীতলঃ	লক্ষ্যম্
অমানঃ	শান্তঃ	সুখদঃ	ধ্যানম্
অস্থিরঃ	শ্রোতা	স্বভাবঃ	সমাধিঃ

১। গো সি. স. পৃ ৫৬।'

২। গো সি. স. পৃ ৫৬, ৫৭। 'গোরখ-বাণী', বড়থ্‌বাল, পৃ ২৪৯ বত্তীস লছন।

বৌদ্ধগ্রন্থাদিতে—যথা, মহাপাদানা ললিতবিস্তর ইত্যাদিতে—মহাপুরুষের বত্রিশটী লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে, যথা—১। সহস্রারচক্রান্বিত পাণিপাদতলা ২। কূর্ম্মবৎ সুপ্রতিষ্ঠিতপাদতা, ৩। রাজহংসবৎ জালাবনদ্ধাঙ্গুলি-পাণিপাতো ৪। মৃদুতরুণহস্তপাদতা ৫। সমুচ্ছ্রিত হস্তদ্বয়, পাদদ্বয়, স্কন্ধদ্বয়, গ্রীবাপ্রদেশেত্বাৎ, সপ্তোৎসদগাত্রতা, ৬। দীর্ঘাঙ্গুলিতা, ৭। আপনয়াতা ৮। বৃত্তমৃদুগাত্রতা, ৯। উচ্ছংষ্টগপাদতা, ১০। উর্দ্ধগ-রোমতা, ১১। পেণেয় জঙ্গতা, ১২। পাত্বরূবাহুঙ্গতা, ১৩। কোশগতাবস্তি-গুহ্যতা, ১৪। সুবর্ণতা, ১৫। সূক্ষ্মচ্ছবিতা, ১৬। প্রদক্ষিণাবর্ত একৈকরোমতা, ১৭। উর্ণাঙ্কিতমুখতা ১৮। সিংহপূর্ব্বার্দ্ধকায়তা, ১৯। সুসংবৃত্তস্কন্ধতা, ২০। চিতান্তরাংসতা, ২১। রসরসাগ্রতা, ২২। ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলতা, ২৩। উষ্ণীষশিরস্তথা, ২৪। প্রভূতজিহ্বতা (প্রভূততনুজিহ্বতা), ২৫। ব্রহ্মস্বরতা, ২৬। সিংহহনুতা, ২৭। শুক্লদন্ততা ২৮। সমদন্ততা চতুর্মার নিবৃন্তত্বাচ্চতুর্দংষ্ট্রাবিহায় ভগবতঃ, ২৯। অবিরলদন্ততা, ৩০। চত্বারিংশদ্দন্ততা, ৩১। অভিলীননেত্রতা, ৩২। গোপননেত্রতা।[১]

উপরোক্ত ৩২ লক্ষণের সহিত পূর্ব্বোক্ত ৩২টী লক্ষণের মিল নাই। মহাপুরুষ-লক্ষণ বিচার বুদ্ধ, চক্রবর্ত্তী রাজা, বোধিসত্ত্ব, প্রভৃতির বিষয়ে করা হয়, কারণ তাঁহারা মহাপুরুষ-পদবাচ্য। পদতলে ও হস্ততলে চক্র থাকিবে, হস্ত বক্র না হইয়াও জানু স্পর্শ করিবে, ইত্যাদি লক্ষণ দ্বারা প্রায় ১২০০ গ্রন্থে লক্ষণ বিচার করা হইয়াছে।[২] শকুনশাস্ত্র প্রভৃতি জ্যোতিষের গ্রন্থেও লক্ষণ বিচার আছে। চৈতন্যচরিতামৃতে মহাপুরুষের আজানুলম্বিতভুজ, মেঘ জিনি কণ্ঠস্বর, ইত্যাদি লক্ষণ বর্ণনা আছে। মহাপুরুষদের এই দ্বাত্রিংশ মুখ্য লক্ষণ ব্যতীত ৮০টী গৌণ লক্ষণ বা অনুব্যঞ্জন বৌদ্ধগ্রন্থে নির্দ্দেশিত হইয়াছে। এই সকল চিহ্ন দ্বারা 'বজ্রগুরু'র দেহ লক্ষিত হয়। চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়, দীঘনিকায়, বিনয়-পিটক, মজ্জিম-নিকায়, সংযুক্ত-নিকায় প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার বিচার আছে।[৩]

১। 'প্রতিমালক্ষণ' C. U. Pub. Texts from Nepal, বন্দ্যোপাধ্যায় সংগৃহীত। Grunwedels. Buddhist Art in India p. 161.

২। Childer's Pali Dictionary—'Mahapuriso'.

৩। উত্তরা, কার্ত্তিক ১৩৩৪, 'তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্ম' প্রবন্ধে উল্লেখ—Getty. The Gods of Northern Buddhism, pp. 170-71.

লৌকিক ব্যবহারার্থে শাস্ত্রে মহাপুরুষের এই সকল লক্ষণ নির্ণীত হইলেও বাস্তবিকপক্ষে বাহ্যরূপ দ্বারা তাঁহাদের পরিচয় পাওয়া কঠিন, কারণ তাঁহারা কেহ জড়বৎ, কেহ পিশাচবৎ, কেহ উন্মত্তবৎ ব্যবহারও করিয়া থাকেন। তাঁহারা সকলেই সিদ্ধপুরুষ। পাশুপত-সম্প্রদায়ের 'গণকারিকা' গ্রন্থে আছে ভস্মশয়ন, ভস্মস্নান, উপহার, জপ, প্রদক্ষিণ, ক্রথন, স্পন্দন, মন্থন, শৃঙ্গারণ, অপিতৎকরণ, অপিতদ্‌ভাষণ, ইহারা চর্য্যাবিধি অর্থাৎ ধর্ম্মসাধনের অঙ্গবিশেষ। উপহার মধ্যে উচ্চহাস্য, নৃত্য, গুণকীর্ত্তন, হুহুকার (বৃষের ন্যায় চিৎকার) ও প্রণাম গণ্য হয়। অপিতৎকরণ ও ভাষণ অর্থে নটের ন্যায় করণ ও ভাষণ।[১] এই গ্রন্থে "গুরু কে?" তাহারই সবিশেষ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। পাশুমত মতে গুরু নবগণের বেত্তা, অষ্টগণ যাহার প্রত্যেকটীতে পাঁচ পাঁচটী করিয়া বিষয় আছে এবং নবমগণ যাহাতে তিনটী বৃত্তি আছে, গুরু এই নবগণের বেত্তা ও বেদিতা হইবেন।

নবচক্রেশ্বরতন্ত্র, যোগিনীহৃদয়, স্বচ্ছন্দ সংগ্রহ, গুরুগীতা প্রভৃতিতে গুরুলক্ষণের চারিটী ক্রমের বর্ণনা আছে—যিনি পিণ্ড, পদ, রূপ ও রূপাতীতের সম্যক্ বেত্তা তিনি গুরু অর্থাৎ যিনি কুণ্ডলিনী-শক্তি, হংস, বিন্দু ও নিরঞ্জনকে জানিয়াছেন তিনি গুরু।

পিণ্ডং কুণ্ডলিনী-শক্তিঃ পদং হংসঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
রূপং বিন্দুরিতি জ্ঞেয়ং রূপাতীতং নিরঞ্জনম্॥

—গুরুগীতা।

দাদূশিষ্য সুন্দর দাসের গ্রন্থেও এই চারিটী ক্রমের বর্ণনা আছে, জৈনগ্রন্থেও এই চারিধ্যানের কথা আছে, অতএব বুঝা যাইতেছে পূর্ণ ও শুদ্ধতম জ্ঞানই গুরুর লক্ষণ।[২]

আমার পুঁথিসংগ্রহের মধ্যে মৎস্যেন্দ্র-রচিত 'যোগবিষয়' নামক পুঁথিতে গুরুর সম্বন্ধে লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে যে, তিনি ভাবনাতীত এবং শিষ্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

কুলজাতিসমাযুক্তঃ সুচরিত্রো গুণান্বিতঃ ॥৩
গুরুভক্তিযুতো ধীমান্ স শিষ্য ইতি কথ্যতে।

১। গণকারিকা—রত্নটীকা ভাসর্বজ্ঞ-বিরচিত পৃ ১৮

২। উত্তরা, বৈশাখ ১৩৫০, পৃ ৩১৩ নোট, 'গুরুতত্ত্ব ও সদ্‌গুরুরহস্য'।

এবং গুরুশিষ্য সম্বন্ধের বিষয়ে বলা হইয়াছে—

ত্বং গুরুঃ ত্বং চ শিষ্যশ্চ শিষ্যস্য চ গুরোরপি।
নানয়োরপি ভেদোঽত্র সমসিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥৬

অর্থাৎ তুমি গুরু, তুমি শিষ্য এবং শিষ্য ও গুরু[১] এই উভয়ে অর্থাৎ গুরুশিষ্যে যখন ভেদ থাকে না তখনই সমসিদ্ধি হয় ॥

আমার সংগৃহীত অন্য একটী 'অমরৌঘ প্রবোধ' নামক গোরক্ষ রচিত পুঁথিতে শিষ্যমধ্যে সাধকভেদ বর্ণিত হইয়াছে। শিষ্যমধ্যে মৃদুমধ্য অধিমাত্র ও অধিমাত্রতর ভেদ আছে। ইহারা চারিপ্রকারের সাধক।[২]

ব্রহ্মবিন্দু উপনিষদে আছে আদর্শ যোগী বা গুরু আপনাকে ব্রহ্ম-স্বরূপ জানিয়া ব্রহ্মভূত হন। তিনি পক্ষপাতবিনির্ম্মুক্ত অর্থাৎ দেহাদি অভিমানশূন্য, ভাবাভাবের অতীত, নিষ্কল, নির্ব্বিকল্প, নিরঞ্জন।

"পক্ষপাতবিনির্ম্মুক্তং ব্রহ্ম ... ...
তদেব নিষ্কলং ব্রহ্ম নির্ব্বিকল্পং নিরঞ্জনম্ ॥
তদ্ব্রহ্মাহমিতি জ্ঞাত্বা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে ধ্রুবম্" ॥ [৩]

গুরু অতিবর্ণাশ্রমী বলিয়া তাঁহাকে বর্ণাশ্রমের গুণধর্ম্ম স্পর্শ করে না, ত্রিগুণকে অতিক্রম না করিলে মুক্ত হওয়া যায় না; গুরু গুণপাশের অতীত, তাই তিনি মুক্তিপ্রদ সদ্গুরু। তাঁহাতে লোভ নাই, মোহ নাই, ভয় নাই, দর্প নাই, কাম নাই, ক্রোধ নাই, তিনি মানাপমান-সুখদুঃখহীন, তিনি স্বয়ং দৃশ্যমান ব্রহ্মস্বরূপ, তিনি পর, তিনি পরাৎপর। সেই কুলাচারহীন গুরু জগতে একটীও দুর্ল্লভ, কারণ গুরুরা কুলাচাররত ও শান্ত হন। "কুলাচারবিহীনস্তু গুরুরেকো হি দুর্লভঃ।"[৪]

যিনি কুলাচারবিহীন আদর্শ যোগী তিনিই অবধূত অর্থাৎ কৈবল্যমুক্ত, শ্রেণীগত কোন দোষ তাঁহাতে স্পর্শে না। সেই অবধূতরূপী গুরু সন্মার্গদর্শনশীল, যোগমার্গই সেই সন্মার্গ। অবধূত গুরুর—

বচনে বচনে বেদাস্তীর্থানি চ পদে পদে।
দৃষ্টৌ দৃষ্টৌ চ কৈবল্যং সোঽবধূতঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ ॥
একহস্তে ধৃতস্ত্যাগো ভোগশ্চৈককরে স্বয়ম্।
অলিপ্তস্ত্যাগভোগাভ্যাং সোঽবধূতঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ ॥[৫]

১। পুঁথি, যোগবিষয়ক ৩, ৪, ৬ শ্লোক
২। পুঁথি 'অমরৌঘ প্রবোধ' ১৮ শ্লোক ইত্যাদি।
৩। গো. সি. স. পৃঃ ২। ৪। অমনস্ক ২।১৭।
৫। গো. সি স. পৃ ১।

সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতিতে আছে—

সর্ব্বান্ প্রকৃতিবিকারানবধূনোতীত্যবধূতঃ।
প্রসরং ভাসয়েচ্ছক্তিঃ সঙ্কোচং ভাসয়েচ্ছিবঃ।
তয়োর্যোগস্য কর্ত্তা যঃ স ভবেৎ সিদ্ধযোগিরাট্ ॥[১]

গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহ ও সিদ্ধসিদ্ধান্তসংগ্রহেও উক্ত মতের সমর্থন আছে। সমস্ত প্রকৃতি বিকৃতিকে যিনি অনাদর করিতে পারেন, অভিভব করিতে পারেন ও ত্যাগ করিয়া উর্দ্ধে গমন করিতে পারেন, তিনিই অবধূত। প্রসর বা বিস্তারই শক্তির প্রকাশ, শক্তির সঙ্কোচই শিবভাব, এই প্রসঙ্গ নিবন্ধের সৃষ্টিসংহার ইত্যাদি অধ্যায়ে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে; এস্থলে তাহার সহিত যোগীর কি সম্বন্ধ তাহাই বিচার্য্য। এই শিবশক্তিভাবের যিনি যোগকর্ত্তা, তিনিই সিদ্ধযোগিশ্রেষ্ঠ, তিনিই আদর্শ।

বিবেকমার্ত্তণ্ডে উক্ত হইয়াছে ক্ষেত্রজ্ঞ ও পরমাত্মার সংযোগই যোগ, অতএব যিনি ক্ষেত্রজ্ঞ ও পরমাত্মার সংযোগসাধন করিতে পারিয়াছেন তিনিই যোগী।

'যোগিনো বীতসংকল্পা নির্দ্বন্দ্বাঃ পুণ্যদর্শনাঃ।
যোগরত্নকরণ্ডাস্তে জয়ন্ত্যবিধিগোচরাঃ' ॥[২]

যিনি সকল সঙ্কল্পমুক্ত, যিনি দ্বন্দ্বাতীত, যাঁহার দর্শন পুণ্যদায়ী, করণ্ডে যেরূপ রত্নসকল সযত্নে রক্ষিত হয়, যোগরূপ রত্নসমূহও যাঁহাতে সেইরূপ আহিত, বিধিও যাঁহার তত্ত্ব সম্যক্ অবগত নহেন, তাদৃশ পুরুষই যোগিপদবাচ্য।

সিদ্ধসিদ্ধান্তসংগ্রহে সিদ্ধযোগিরূপ গুরুর বর্ণনা আছে, যথা—

বিশ্বাতীতং যদা বিশ্বমেকমেবাবভাসতে।
সংযোগেন যদা যস্য সিদ্ধযোগী ভবেত্তু সঃ ॥১০
সর্ব্বাসাং নিজবৃত্তীনাং বিস্মৃতিং ভজতে তু যঃ।
স ভবেৎ সিদ্ধসিদ্ধান্তে সিদ্ধযোগী মহাবলঃ ॥১১
উদাসীনবদাসীনঃ স্বস্থোঽন্তর্নিজভাসকঃ।
মহানন্দময়ো ধীরঃ স ভবেৎ সিদ্ধযোগিরাট্ ॥১২

১। সি সি. স ৬।৭, গো. সি. স. পৃ ১, ২, সি সি. প, ৬।১ সর্বান্ প্রকৃতিবিকারান্ ইত্যাদি।
২। গো. সি. স. পৃ ৮।

পরিপূর্ণঃ প্রসন্নাত্মা সর্ব্বাসর্ব্বপ্রদোঽপরঃ।
নিরুত্থো নির্ভরানন্দঃ স ভবেৎ সিদ্ধযোগিরাট্ ॥১৩॥
গতেন শোকেন ভয়েন বীপ্সাপ্রাপ্তেন হর্ষং ন করোতি যোগী।
আনন্দপূর্ণো নিজবোধলীনো ন বাধতে কালপথো ন নিত্যম্ ॥১৪॥[১]

যাঁহার সংযোগসাধন দ্বারা বিশ্ব ও বিশ্বোত্তীর্ণ পদার্থসকল একরূপ অবভাসিত হয়, তিনি সিদ্ধযোগী। যিনি আপনার যাবতীয় বৃত্তির মার্গ ভজনা করিতে পারেন সুতরাং অপ্রমত্ত, তিনি মহাবল সিদ্ধযোগী। যিনি উদাসীনের ন্যায় সদা আসীন, যিনি কখনও আত্মবিস্মৃত নহেন, সুতরাং সর্ব্বদা স্বস্থ, যিনি আপন অন্তরকে আপন ভাস দ্বারা উদ্ভাসিত রাখেন, যিনি মহানন্দময়, যিনি ধীর অর্থাৎ বিকারেব হেতু সত্ত্বেও সদা অবিকৃত, তিনিই সিদ্ধযোগিরাজ। যাঁহার অপ্রাপ্য বা প্রাপ্তব্য কিছু না থাকায়, সর্ব্বদা পরিপূর্ণ ও প্রসন্নাত্ম, যিনি সর্ব্বাসর্ব্বপ্রদ ও সাধারণ হইতে অপর বা ভিন্ন, যিনি নিরুত্থশ্রী লাভ করিয়া সদাকালের জন্য নির্ভরানন্দে অধিষ্ঠিত, তিনিই সিদ্ধযোগিরাজ। যোগী হর্ষবিষাদের অতীত, লাভালাভে শোকভয়ে অবিচলিত, আনন্দপূর্ণ, আপনবোধে সংলীন অতএব কালের দ্বারা অবাধিত এবং নিত্যানিত্যভাব বিবর্জ্জিত। এইরূপ যোগীই আদর্শ ও যথার্থ গুরু।

নাথমার্গে অত্যাশ্রমী যোগীই গুরু।[২] মুমুক্ষু ব্যক্তি তাঁহার কৃপায় যোগসাধনে ব্রতী হন। অত্যাশ্রমী গুরু সর্ব্বকর্ম্মত্যাগী ও শ্রেষ্ঠ; "কালত্রিতয়জং কর্ম্ম ত্যজত্যত্যাশ্রমী ক্রতম্" ও "অবধূতাঃ ক্রিয়াসিদ্ধাস্তত্ত্বরূপা নিরঞ্জনাঃ"।[৩] এইরূপ গুরুর বাক্য দ্বারা শাস্ত্রসারমাত্র শ্রবণ করিলেও যোগধর্ম্মে কৃতকৃত্যতা জন্মে, মূঢ় ব্যক্তিরা আত্মতত্ত্ব না জানিয়া শাস্ত্রে মোহগ্রস্ত হয়।[৪]

কোটি কোটি শাস্ত্র পাঠ করিলেও গুরুবাক্য ব্যতীত জ্ঞানলাভ হয় না, কিন্তু গুরু মাত্র তাঁহার করুণাখড়্গপাত দ্বারা পশু বা জীবের বন্ধন ছিন্ন করেন।[৫] চিন্তামণি এক গুরুর কৃপায় সাধকের লয়প্রাপ্তি সম্ভব।[৬] অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তির এইরূপ গুরুগ্রহণ কর্তব্য। সেই শিবরূপী গুরুর লক্ষণাদি এইরূপ—তিনি সর্ব্ববিলক্ষণ অর্থাৎ সর্ব্ব বিষয় হইতে তাঁহাতে ভেদ আছে, তিনি প্রারব্ধ কর্ম্ম নির্ম্মূল বা ক্ষয় করিতে সক্ষম, এবং সমাধি

১। সি. সি. স ৬।১০—১৪ ২। গো. সি. স পৃ ৫১ ৩। গো. সি. স পৃ ৫৩
৪। গো সি. স পৃ ২৫ ৫। গো. সি. স পৃ ৩২ ৬। গো সি. স. ৩।১, ৫

আশ্রয় করিয়া তিনি ইচ্ছামৃত্যুত্ব লাভ করিয়াছেন।[১] তাঁহার মার্গ দিব্যমার্গ, তাহা হইতে শ্রেষ্ঠতর মার্গ আর নাই, তাঁহার পক্ষে বেদের কর্ম্ম ও জ্ঞানকাণ্ডে প্রয়োজন নাই, "আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং সম্পূর্ণং পরমাত্মনি। ভিন্নাভিন্নং ন পশ্যামি তস্মাহং পঞ্চমাশ্রমী॥" তিনি বাসনাবর্জ্জিত, তাঁহার গাত্র ধূলিধূসরিত অথচ তাঁহার চিত্ত নিরাময়, অনন্তানন্দব্রহ্মজ্ঞ তাঁহার লক্ষণ, তিনি চিন্তাচেষ্টা বিবর্জ্জিত, অহঙ্কারমুক্ত, স্বচ্ছস্বভাব, গগনোপম, লোকালোক বা কুলাকুল তাঁহার মধ্যে নাই।[২]

অবধূত গুরুর বাহ্যলক্ষণ নাদ, মুদ্রা, ভস্ম, শৈলী, ঊর্ণাযজ্ঞোপবীত। এই সকল বাহ্যলক্ষণের বিষয় গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহে এইরূপ বর্ণিত আছে—"মুদমোদে তুরাদানে জীবাত্মপরমাত্মনোঃ। উভয়োরৈক্যসংভূতির্মুদ্রেতি পরিকীর্ত্তিতা।...নাদধারণমাহ,—অনাহত শৃঙ্গীতি তেষামন্যোঽন্যমন্ত্রাপি চ যো বাগ্‌ব্যবহারস্তমাহ। আত্মেতি পরমাত্মেতি জীবাত্মেতি বিচারেণ। ত্রয়াণামৈক্যসংভূতিরাদেশ ইতি কীর্ত্তিতঃ॥ আদেশ ইতি সদ্বাণীম।" আবার আদেশ অর্থে ভস্ম দ্বারা ত্রিপুণ্ড্র ধারণ। অন্যত্র "অবধূতগুরোর্মূর্দ্ধ-চিহ্নম্ নাদোমুদ্রাভস্মশৈলী" ইত্যাদি[৩]। সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতিতে আছে, অবধূত অর্থে যিনি প্রকৃতি বিকারকে 'অবধুনোতি' তিনি অবধূত। তাঁহার কেশকৃন্তন অর্থে সর্ব্বাবস্থাবিনির্মুক্ত হওয়া, বিভূতিধারণ অর্থে নিজেকে স্মরণ করা, শংখের 'শং' অর্থে সুখ, 'খ' অর্থে ব্রহ্ম, তাঁহার মেখলা 'নিবৃত্তি', কুণ্ডল 'চিৎপ্রকাশ', ইত্যাদি।[৪] এই নিবন্ধের ঐতিহাসিক অংশে বিভূতি, জল, ও নাদজনেউ দ্বারা দীক্ষার রহস্য বিবৃত হইয়াছে (দীক্ষা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াদি পৃ ১১৯ দ্রষ্টব্য)।

নাথমতে একমাত্র অবধূতই সকল মার্গের লক্ষ্য, পরমহংসাপেক্ষা অবধূত উত্তম,[৫] কারণ অবধূতই শ্রেষ্ঠতর ও নাথলক্ষণযুক্ত। তিনি একাধারে ত্যাগী ও ভোগী, পরমহংস মাত্র ত্যাগী। কথিত আছে, শঙ্কর নানামত গ্রহণান্তর অবধূতরূপ শ্রেষ্ঠমার্গ গ্রহণ করেন।[৬]

যোগমার্গে নিষ্ণাত অবধূত গুরু পরিপক্ব দেহ, তিনি জীবন্মুক্ত, সদা স্বস্থ, সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিত,[৭] দেবগণেরও দুর্ল্লভ যোগদেহ মহাবলের

১। হ-যো-প্র ৪।২ টীকা। ২। গো সি. স. পৃ ১০, ১৫, ২০, ২৮, ২, ৩৩।
৩। গো. সি. স. পৃ ৯, ৫১। ৪। সি. সি. প. ষষ্ঠ উপদেশ।
৫। গো সি. স. পৃ ৫৫, ৭২। ৬। গো. সি. স. পৃ ১৮।
৭। গো. সি. স. পৃ ৩১।

আশ্রয়স্বরূপ, উহা ছেদবন্ধবিনির্মুক্ত নানাশক্তিধর, পরমশ্রেষ্ঠ। উহা আকাশ হইতেও নির্ম্মল, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, অপিচ স্থূল হইতেও স্থূলতর। অবধূত গুরুর দেহ এইরূপ 'যোগদেহ'।

ইচ্ছারূপো হি যোগীন্দ্রঃ স্বতন্ত্রস্ত্বজরামরঃ ॥ ৫১
ক্রীড়তি ত্রিষু লোকেষু লীলয়া যত্র কুত্রচিৎ।
অচিন্ত্য শক্তিমান্ যোগী নানারূপাণি ধারয়ন্ ॥৫২
সংহরেচ্চ পুনস্তানি স্বেচ্ছয়া বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
মরণং যত্র সর্ব্বেষাং তত্রাসৌ সখি জীবতি ॥৫৩ [১]

অচিন্ত্যশক্তিমান্ যোগী নানা রূপ গ্রহণ করিয়া অবলীলাক্রমে ত্রিভুবন বিচরণ করেন, তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী। জীবন্মুক্ত বলিয়া তাঁহার কর্ত্তব্য কিছু নাই, কৃতকর্ম্মের দ্বারাও তিনি অলিপ্ত। এইরূপ সিদ্ধগুরুর কৃপায় পুণ্যশীল ব্যক্তিগণ যোগিপদে আরূঢ় হইয়া সংসার অতিক্রম করিতে পারেন। চিন্তামণিকল্প একগুরুর কৃপা ও সঙ্গগুণ বিনা শাস্ত্র, তর্ক, যুক্তি প্রভৃতি দ্বারা কেহই পরমপদলাভে সমর্থ হন না, কেহই সংসার অতিক্রম করিতে পারেন না, --এতাদৃশই সদ্গুরুর মহিমা। এই বিচিত্র বিশ্বের অভ্যন্তরে এক আত্মতত্ত্বরূপ যে পরম অদ্বৈতভাব বিরাজমান, সদ্গুরুর কৃপা ভিন্ন তাহা উপলব্ধি করা সম্ভব নহে। "শিবস্যাভ্যন্তরে শক্তিঃ শক্তেরভ্যন্তরে শিবঃ। অন্তরং নৈব জানীয়াচ্চন্দ্রচন্দ্রিকয়োরিব ॥ তজ্জ্ঞেয়ং সদ্গুরোর্বক্ত্রান্নান্যথা শাস্ত্রকোটিভিঃ।"[২] সদগুরুর নিকটই দীক্ষাগ্রহণ কর্ত্তব্য, তিনিই ভজনীয়, পরম আশ্রয়। স্বরূপ ও পরমানন্দ প্রাপ্তির সহায় তিনিই।

গুরুতত্ত্ব অর্থে সকল স্থলে মানবগুরু বুঝায় না; পারমার্থিক গুরু ও ব্যবহারিক গুরু ভিন্ন, নাথসম্প্রদায়ে ব্যবহারিক বা মানবগুরুর লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে, যথা, আচার্য্যা বহুদীক্ষিতাহুতিরতা নগ্নব্রতাস্তাপসা নানাতীর্থ-নিষেবকা জিনপরা মৌনে স্থিতা নিত্যশঃ। এতে তে খলু দুঃখভারনিরতাস্তে তত্ত্বতো বঞ্চিতাস্তস্মাৎ সিদ্ধমতমিত্যাদি।[৩]

মন্ত্রব্যাখ্যারত বহুশিষ্যপরিবৃত অজিন বা বল্কলধারী গুরু তত্ত্ববঞ্চিত জপপরা গুরু মাত্র। কেহ বা আগম কেহ বা নিগমজালে আবদ্ধ, কেহ বা তর্কপরায়ণ, ইহারা কেহই শঙ্করীকে জানেন না। ইহারা তত্ত্ববঞ্চিত, সাধনে অশক্ত, কারণ প্রারব্ধ দ্বারা লিপ্ত বলিয়া কাতর, শরীরসুখার্থে

১। যোগবীজ। গো. সি. স পৃ ৩১ পাঠান্তর দ্রষ্টব্য।
২। সি. সি. প. ৪।২৬, সি. সি. স. ৪।৩৭। ৩। গো সি. স. পৃ ১২, ১৩।

'অহং ব্রহ্ম' বলিয়া থাকেন। কুলবধূরিব শঙ্করীকে জানিবার ক্ষমতা ইঁহাদের নাই। এইরূপ তত্ত্ববঞ্চিত গুরু মূর্খ ও নরকভোগী।[১]

নাথসম্প্রদায় মতে পারমার্থিক গুরু একমাত্র 'নাথ'। রাজগুহ্যে যে নাথলক্ষণ উক্ত হইয়াছে তাহা এইরূপ—

না-কারোঽনাদিরূপং থ-কারঃ স্থাপ্যতে সদা।
ভুবনত্রয়মেবৈকঃ শ্রীগোরক্ষ নমোঽস্তু তে ॥[২]

সূর্য্যকে দীপ দ্বারা দেখাইবার চেষ্টার ন্যায় শাস্ত্রে নাথলক্ষণ বর্ণনের চেষ্টা দেখান যায়, কারণ যোগীদের যাহা অপরোক্ষ অনুভব, সে বিষয়ে বর্ণনা কিরূপে সম্ভব? পদ্মপুরাণে কপিলগীতায় আছে, শঙ্কর দত্তাত্রেয়াদিরও গুরু হইলেন 'নবনাথ', তাঁহাদের বিবরণ অন্যত্র দেওয়া হইয়াছে। নাথ হইতে গুরুশিষ্যক্রমে বা পরম্পরায় নাদসন্তান ও বিন্দুসন্তানের উৎপত্তি হইয়াছে। গুরুর জ্ঞানদেহের ধারা লইয়া যে সন্তানের উৎপত্তি তাহারা নাদসন্তান বা শিষ্য এবং মায়িকদেহের ধারা হইতে যাহাদের জন্ম তাহারা বিন্দুসন্তান। সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতিতে পঞ্চপ্রকার গুরুকুল সন্তানের কথা আছে—আঈসন্তান, বিলেশ্বরসন্তান, বিভূতিসন্তান, নাথসন্তান ও যোগীশ্বরসন্তান; তাহাদের সন্তানদেরও পৃথক্ পৃথক্ বৈশিষ্ট্য আছে।[৩]

নাথাদ্ দ্বিপ্রকারা সৃষ্টির্জাতা—নাদরূপা বিন্দুরূপা চ। নাদরূপা শিষ্যক্রমেণ বিন্দুরূপা চ পুত্রক্রমেণ। নাদ হইতে নবনাথের জন্ম, বিন্দু হইতে সদাশিব ভৈরবের জন্ম, ভৈরবের শক্তি ভৈরবী হইতে সৃষ্টির উৎপত্তি। নবনাথের পর দ্বাদশসিদ্ধ, ৮৪ সিদ্ধ, দ্বাদশপন্থা ও অনন্তসিদ্ধের উৎপত্তি।[৪]

নাথাংশো নাদো, নাদাংশঃ প্রাণঃ শক্ত্যংশো বিন্দুর্বিন্দোরংশঃ শরীরম্। এবঞ্চ যোগসম্প্রদায়ে শিষ্যোঽধিকো যো নাদাংশো জ্ঞায়তেঽন্য-মতে পুত্রোঽধিকঃ কথ্যতে। স চাধিকঃ কথং ভবেৎ। কথং বপুর্বিন্দুতো জাতম্। পুনঃ পুনঃ নাদাংশঃ প্রাণ উক্তো বিন্দ্বংশঃ শরীরমুক্তম্। তত্রাপি প্রাণাচ্ছরীরমুত্তিষ্ঠতি শরীরস্যাধারঃ প্রাণো ভবতি। তথা চ নাদস্যাত্মজঃ শিষ্য এবাধিক ইতি।[৫]

১। গো সি. স. পৃ ১৩, ৬৮, ২। গো. সি. স. পৃ ১১
৩। সি সি প. ৫।৪৬ ৪। গো সি. স. পৃ ৫৮ ৫। গো সি, স, পৃ ৫৮

সংসারীদিগের মতে বিন্দুসন্তানেরই প্রাধান্য, কিন্তু সিদ্ধমতে পিতাপুত্র সম্বন্ধ অপেক্ষা গুরুশিষ্য-সম্বন্ধ মুখ্য, কারণ গুরু পিতাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, নাদাত্মজ শিষ্য পুত্রাপেক্ষা প্রিয়।

গুরু সিদ্ধদেহী না হইলে তাঁহার নাদসন্তান সম্ভব হয় না, কারণ অপক্কদেহী যোগী জরামৃত্যুর অধীন, পক্কদেহী যোগীর জরা নাই, মৃত্যু নাই, তিনি মৃত্যুজয়ী। অজর, অমর গুরু বিনা শিষ্যের দায়িত্ব গ্রহণে কে সক্ষম? পুরৈব মৃত এবাসৌ মৃতস্য মরণং কুতঃ, মরণং যত্র সর্ব্বেষাং তত্রাসৌ সখি জীবতি ॥[১]

সাধারণ জীব শরীর দ্বারা বিজিত, কিন্তু যোগী দ্বারা শরীর বিজিত। অতএব শরীর হইতে সুখদুঃখাদি ফলভোগ তাহাদের কিরূপে হইবে? যোগী যোগাগ্নিদ্বারা সপ্তধাতুময় দেহ জয় করিয়াছেন, এইরূপ মহাবল যোগদেহ দেবতার পক্ষেও দুর্ল্লভ। জীবিতকালেই প্রাণবিলীন হওয়াতে যোগীর পিণ্ড বা দেহ পতিত হয় না, অতএব তিনি শিষ্যের নৈতিক দায়িত্ব গ্রহণে সক্ষম হন।

অপরপক্ষে এইরূপ দৃষ্টান্তও দুই একটী দেখা গিয়াছে যেখানে শিষ্যই গুরুর নৈতিক দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়াছেন। পরমসিদ্ধা মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথ কদলীরাজ্যে ভ্রমণকালে রাজ্যের অধীশ্বরী কমলা ও তাঁহার ভগিনী মঙ্গলার আকর্ষণে যোগধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া সংসারধর্ম্মে মগ্ন হইয়াছিলেন—প্রচলিত গীতিকাব্যে এইরূপ বৃত্তান্ত আছে। অতঃপর গুরুর উপযুক্ত শিষ্য শ্রীগোরক্ষনাথ নর্ত্তকীর বেশে রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া মৃদঙ্গের তালে তালে 'কায়াসাধনের' তত্ত্বগুলি গুরুরই নাম স্মরণ করিয়া 'জয়গুরু মৎস্যেন্দ্র' বলিয়া তাঁহার স্মৃতিপথে আনয়ন করিলে, মীননাথের চৈতন্যোদয় হয়, এবং রাজ্ঞীদ্বয়ের মায়াজাল হইতে তিনি শিষ্য কর্ত্তৃক মুক্ত হন। বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, গুরু পতিত হইলেও শিষ্যের নমস্য, তাই গুরুর নাম লইয়াই শিষ্য গুরুর উদ্ধার সাধনে ব্রতী হইলেন। যে গুরুশক্তির সাহায্যে শিষ্যপক্ষে গুরুর দায়িত্বগ্রহণ সম্ভব হইয়াছিল সে গুরুতত্ত্ব কোন মানবগুরুর নহে, শিষ্যের সেই গুরুভক্তি সগুণ ও নির্গুণ গুরুভক্তি, সেই ভক্তি সাহায্যেই শিষ্য বলশালী, অন্যথা সামান্য মানবের কি সাধ্য যে সে অঘটন সাধন করিবে?

১। যোগবীজ।

গুরুকৃপা ভিন্ন শিষ্যপক্ষে মুক্তিলাভ যেরূপ অসম্ভব, অন্যপক্ষে শিষ্যের পুরুষকার ভিন্ন গুরুনির্দ্দিষ্ট পথে সাধন করা অসম্ভব। গুরুশিষ্য মধ্যে দাতা ও গ্রহীতাভাব প্রশস্ত, গুরু নিজ 'শক্তিপাত' দ্বারা শিষ্যকে বলীয়ান করিবেন, শিষ্য সসম্ভ্রমে সে দান গ্রহণ করিবে। তান্ত্রিকাচার্য্যের মতে শক্তিপাত অর্থে গুরুকৃপা বা ভগবদনুগ্রহ। ইহা ব্যতীত কেবল পৌরুষ দ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তি হয় না।

গুরু বহুশিষ্য গ্রহণ করিলে তাহাদের পাপ গ্রহণ করিয়া গুরুর অশেষ দুর্গতি হয়। সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতিতে উক্ত হইয়াছে যে, যে গুরু তত্ত্ববঞ্চিত এবং বহুশিষ্যের গুরু, তিনি নরকভোগী, "যতো হেতোর্বহুশিষ্য-করণং সিদ্ধানাং মতে বর্জ্জিতম্"।[১]

দ্বাদশবর্ষব্যাপী গুরুসেবার ফল শিষ্যপক্ষে বিশেষ শুভ। শিষ্য প্রথম বৎসরান্তে নীরোগ, লোকপ্রিয় হয়, তাহার আত্মভাব প্রস্ফুট হইতে থাকে, দ্বিতীয় বৎসরে কাব্যরচনায় সামর্থ্য জন্মে, তৎপরে দিব্যযোগী, দূরশ্রাবী, বাক্যসিদ্ধ প্রভৃতি হইয়া পঞ্চমবর্ষে পরকায় প্রবেশ ক্ষমতা জন্মে। ষষ্ঠ বৎসরে শিষ্যদেহ শস্ত্র বা বজ্র দ্বারা ছেদ বা ভেদ হয় না, সপ্তম বৎসরে আকাশগামী ও দূরদর্শী হয়, অষ্টমে অষ্টমহাসিদ্ধি লাভ হয়। নবমে বজ্রকায়, খেচর ও দিক্‌চর হয়; দশমে পবনবেগে যথেচ্ছা গমন সম্ভব হয়। একাদশে সর্ব্বজ্ঞ ও সিদ্ধিভাক্, দ্বাদশে শিবতুল্য হর্ত্তাকর্ত্তা হইয়া ত্রৈলোক্যপূজ্য হয়। একমাত্র সদ্‌গুরু প্রসাদেই দ্বাদশ বর্ষে শিষ্যের এই সকল মহাবললাভ সম্ভব হয়, তাহা নিঃসংশয়।[২]

এইরূপে শিষ্য গুরুর উপর নির্ভর করিয়া সিদ্ধিলাভ করে এবং গুরুও তাহার অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করেন।

"গুশব্দস্ত্বন্ধকারঃ স্যাদ্রুশব্দস্তন্নিরোধকঃ।"[৩] অর্থাৎ 'গু' দ্বারা অন্ধকার ও 'রু' দ্বারা যিনি তাহা নিরোধ করেন তাহাই লক্ষিত হইতেছে, তিনিই 'গুরু'-পদবাচ্য। নাথগুরুর কৃপায় কেবল অজ্ঞান দূর হয় তাহা নহে, 'মহাজ্ঞান' লাভ হয় ও সিদ্ধিসকল করায়ত্ত হয়।

১। গো সি স পৃ ৬৮, ৬৯ ২। অদ্বয়তারকোপনিষৎ, ১৬ শ্লোক

৩। সি সি স ৫।৫১-৫৮, সি সি প ৫।৩৬-৪৪ তুলনীয়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যোগসাধনের উদ্দেশ্য

নাথ-সম্প্রদায়ের সাধকগণ পরমপদ প্রাপ্তির উপায়ের মধ্যে যোগকেই সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রদান করিয়াছেন, ইহা তাঁহাদের আধ্যাত্মিক জীবনের ইতিবৃত্ত এবং তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক সাহিত্যের আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। বস্তুতঃ যোগসাধনের প্রাধান্য নির্দ্দেশের জন্যই তাঁহাদিগকে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে 'যোগী' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়া থাকে। কিন্তু যোগের মহত্ব প্রাচীন ভারতে সর্ব্বত্রই অঙ্গীকৃত হইত। শঙ্করাচার্য্য "এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ" বলিয়া যোগদর্শনের অবলম্বিত সাংখ্যপ্রণালী নিরাকরণ করিলেও যোগের মহত্ব অস্বীকার করেন নাই, বরং 'শারীরক ভাষ্য' এবং বহু প্রকরণ গ্রন্থে তাহার উৎকর্ষ খ্যাপনই করিয়াছেন। ন্যায়দর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকে সূত্রকার এবং ভাষ্যকার সমবেতকণ্ঠে যোগাভ্যাসের আবশ্যকতা অঙ্গীকার করিয়াছেন।[১] বৈশেষিকদর্শনেও স্পষ্ট ভাষায় যোগাভ্যাসের প্রভাব স্বীকার করা হইয়াছে। শৈব, প্রত্যভিজ্ঞা, বীরশৈব, পাশুপত, পাঞ্চরাত্র, ভাগবত, বৌদ্ধ, জৈন, শাক্ত প্রভৃতি যাবতীয় ভারতীয় সম্প্রদায়ই যে যোগের অলৌকিক প্রভাবে সমরূপে প্রভাবিত হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, "অয়ং তু পরমো ধর্ম্মঃ যদ্ যোগেনাত্মদর্শনম্" অর্থাৎ যোগসাধনা দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করাই মনুষ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

যোগের মহত্ব অঙ্গীকার এবং আপন আপন সাধনপদ্ধতির মধ্যে যথাসম্ভব যোগপ্রক্রিয়ার সমাবেশ সর্ব্বত্রই উপলব্ধ হয়। কিন্তু অন্যান্য সম্প্রদায়ের যোগসাধনা এবং পাতঞ্জলাদি মুখ্য যোগসম্প্রদায়ের যোগসাধনা হইতেও কোন কোন অংশে নাথ-সাধকগণের যোগসাধনায় কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল। অবশ্য সাধর্ম্ম্য যে ছিল তাহা সত্য, কারণ বিভিন্ন যোগসাধনায় পরস্পর পার্থক্য সত্ত্বেও মৌলিক তত্ত্ব সম্বন্ধে একটা সাম্যভাব থাকা স্বাভাবিক। নাথ-সম্প্রদায়ের যোগের যে বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা

১। ন্যায়দর্শন ৪।২

হইল, উহা যোগের আদর্শগত ও সাধনগত উভয়ই বুঝিতে হইবে, কারণ আদর্শে বৈশিষ্ট্য না থাকিলে সাধনে বৈশিষ্ট্য থাকিতে পারে না।

নাথগণের আদর্শ কি? তাঁহারা জীবনের লক্ষ্যনির্দ্দেশ কি প্রকারে করিয়াছেন, আমরা সিদ্ধান্ত অংশে পরমপদ বা পূর্ণসত্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত-ভাবে কিছু আলোচনা করিয়াছি। মহাসৃষ্টির পূর্ব্বে ও মহাপ্রলয়ের অবসানে যখন সকল কার্য্যপদার্থ পরমকারণে একীভাব প্রাপ্ত হয়, তখন একমাত্র পূর্ণসত্যই অবশিষ্ট থাকেন। কেহ ঐ পরমসত্তাকে আত্মরূপে, কেহ শূন্যরূপে, কেহ ব্রহ্মরূপে, কেহ বা পরমপদরূপে বর্ণনা করেন। কিন্তু বস্তুতঃ উহা বর্ণনাতীত। উহাকে সগুণ বলা যায় না, নির্গুণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেও উহার সম্যক্ পরিচয় দেওয়া যায় না—উহা একাধারে সগুণ ও নির্গুণ উভয়ই, অথচ সগুণ ও নির্গুণের দ্বন্দ্বভাব উহাতে না থাকাতে উহা চির দ্বন্দ্বাতীত। উহা ভোগ ও মোক্ষের সমন্বয়, সাকার ও নিরা-কারের মিলনভূমি, সর্ব্ববিরোধের অবসানস্বরূপ। নাথগণ উহাকেই 'নাথ' বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকেন। গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহে আছে—

"নির্গুণং বামভাগে চ সব্যভাগেঽদ্‌ভূতা নিজা।
মধ্যভাগে স্বয়ং পূর্ণস্তস্মৈ নাথায় তে নমঃ॥"[১]

এই নাথতত্ত্বই সগুণ ও নির্গুণের সাম্যভূত পূর্ণতত্ত্ব। উহা দ্বৈত ও অদ্বৈত উভয় ভাবের অতীত। পরমপদ অধ্যায়ে ইহার সবিশেষ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে।

এই সর্ব্বতত্ত্বের অতীত পরমতত্ত্বকে লাভ করাই যোগসাধনের উদ্দেশ্য কিন্তু উহা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার, কারণ এই পরমসত্যের সাধনের অধিকার সাধারণ মনুষ্যের নাই। মনুষ্যদেহ অপবিত্র, তাহার চিত্ত মলিন; অপবিত্র দেহে, মলিন হৃদয়ে 'মহাজ্ঞানে'র উদয় সম্ভব নহে। সুতরাং দেহ ও চিত্ত শুদ্ধ করিতে হইবে। প্রকারান্তরে বলা যাইতে পারে যে, পাঞ্চ-ভৌতিক স্থূলদেহ এবং সপ্তদশ বা অষ্টাদশ অবয়ব সম্পন্ন সূক্ষ্ম বা লিঙ্গদেহ উভয়ই শুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। সাধারণতঃ উভয় দেহ এরূপ অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত আছে যে দুইটীকে পৃথক করা চলে না, অথচ দুইটীকে মিলিত করিয়া এক ও অভিন্নরূপে পরিণত করাও যায় না। স্থূলশরীর হইতে যখন সূক্ষ্মদেহ নির্গত হইয়া যায়, তখনই মৃত্যু ঘটে এবং সূক্ষ্মশরীর যখন

১। গো. সি. স, পৃ ১।

প্রাক্তন কর্ম্মবিপাকানুসারে পুনর্ব্বার স্থূলদেহ ধারণ করে, তখনই জন্ম হয়। সুতরাং জাগতিক জন্মমরণ বস্তুতঃ সূক্ষ্ম ও স্থূলদেহেরই যোগ ও বিয়োগের লীলা মাত্র। আর একটি বিষয় এখানে বিশেষভাবে বিবেচ্য। সূক্ষ্মদেহ পৃথক হইলেও তাহাতে স্থূলদেহের অংশ সংস্কাররূপে বর্ত্তমান থাকে, তেমনি স্থূলদেহেও সূক্ষ্ম তত্ত্বের অংশ অনুস্যূত থাকে। কোনটীই প্রকৃত প্রস্তাবে শুদ্ধ নহে। দেহশোধন ব্যাপারে এই বিষয়ের দিকেও লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। নাথযোগিগণ বলেন যে ক্রিয়াকৌশলে এই স্থূল-দেহকেই এরূপে পরিবর্ত্তিত করা যায় যে তখন ইহাতে কোন প্রকার আগন্তুক মলের লেশমাত্র বর্ত্তমান থাকে না। তখন সূক্ষ্মদেহ ইহার সহিত মিলিত হইয়া একাকার ধারণ করে। এই অবস্থায় যে সকল তত্ত্ব দ্বারা উভয় দেহ গঠিত হইয়াছিল তাহারা মূলতঃ অভিব্যক্ত হইয়া ও তীব্র সংবেগবশতঃ দ্রুত হইয়া এক অখণ্ডরূপে পরিণত হয়, সাধারণতঃ ইহাকেই 'সিদ্ধদেহ' বলে। ইহার বিশেষ বিবরণ 'কায়সিদ্ধি' প্রকরণে প্রদত্ত হইয়াছে।

বস্তুতঃ এই দেহসিদ্ধি কেবল স্থূল ও লিঙ্গের সংঘট্টে সম্পন্ন হয় না, চরমাবস্থায় কারণ-দেহের সহিত সংঘর্ষ আবশ্যক হয়। স্থূল, লিঙ্গ ও কারণ এই তিনটী মায়িক দেহ, অন্তর্গত মলের অপসারণ ও তাত্ত্বিক সম্মিলনের প্রভাবে এক অখণ্ডরূপে আবির্ভূত হয়। তাহাই প্রকৃত 'সিদ্ধদেহ'—তাহা জরা, মরণ, বিকারাদি বর্জ্জিত, শোকদুঃখ প্রভৃতি হইতে চিরমুক্ত, জ্যোতির্ম্ময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময় নিত্যবিগ্রহ। এই দেহের উপর পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের কোন ক্রিয়া প্রকাশিত হয় না, দেশ বা কাল দ্বারা ইহা পরিচ্ছিন্ন হয় না। সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ঐশ্বরিক গুণসকল ইহাতে সর্ব্বদা স্বাভাবিক ধর্ম্মরূপে বিরাজমান থাকে।

যে যোগী এই সিদ্ধদেহ লাভ করিতে পারেন, তিনি যে কর্ম্মের অতীত তাহা বলাই বাহুল্য। সাধারণতঃ জ্ঞানী ও ভক্ত প্রারব্ধের অধীন, তাই তাঁহারা প্রারব্ধজনিত ভোগ পরিহার করিতে সমর্থ হন না। প্রারব্ধের অবসানে দেহপাত বা মৃত্যু তাঁহাদের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু সিদ্ধযোগপথে সাধক মৃত্যুকে জয় করিয়া থাকেন, কালকে অধীন করিয়া রাখেন।[১]

পূর্ব্ববর্ণিত সিদ্ধদেহই বিশুদ্ধদেহ, ইহা ব্যতিরেকে ব্রহ্ম-উপাসনা এবং তাহার ফলে মহাজ্ঞানলাভ সুদূরপরাহত। সিদ্ধান্ত শৈবাচার্য্যগণ

১। গো. সি স পৃ ৫৩, 'যোগদেহং সৃজত্যেতং কালমীত্যাতু ভবতি অমর্‌'—শ্লোক ১১।

এই সিদ্ধদেহকেই 'বৈন্দব দেহ' বলিয়া বর্ণনা করেন। ইহা বিন্দু বা মহামায়া দ্বারা রচিত বলিয়া ইহাতে মায়ার বিকার বর্ত্তমান থাকে না, কর্ম্মসংস্কারও ইহাতে কার্য্য করে না। পাঞ্চরাত্র-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের পরিভাষাতে এই দেহকে 'অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ সত্ত্বময়' বলিয়া বর্ণনা করা চলে, ইহা ত্রিগুণের অতীত, তবে গুণাতীত কোন বস্তু থাকা সম্ভব নহে বলিয়া উহা 'সাত্ত্বদেহ' অর্থাৎ সত্ত্বগুণ-প্রধান দেহ।

যোগিগণ সিদ্ধদেহ ধারণ করিয়া সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত জগতের কল্যাণ সম্পাদন করেন ও এইরূপে পরোপকার কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন। ক্রমশঃ ব্যাপক আত্মভাবের সহিত পরিচয় ঘটে। তখন ধীরে ধীরে এক মহান আত্মারূপে তাঁহারা নিজেকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পান এবং 'মহাজ্ঞানে'র উদয় হয়। তখন সিদ্ধদেহ দিব্যদেহরূপে পরিণত হয়, মনও জ্যোতির্ম্ময় অব্যক্ত ভগবৎস্বরূপে লীন হইয়া যায়, স্বকীয় ভগবৎস্বরূপতা প্রতিষ্ঠিত হয়। তান্ত্রিক পরিভাষাতে ইহাই 'শাক্তদেহ' বা 'প্রণবতনু'। ভগবদ্‌রূপ চিদাত্মক বলিয়া যোগীও তখন চিৎস্বরূপেই প্রতিষ্ঠিত হন। সিদ্ধদেহ যে শক্তির বিকাশ, দিব্য বা শাক্ত দেহ তাহারই অন্তর্লীন অবস্থা মাত্র।

এখন যোগসাধনের উদ্দেশ্য কি তাহা ভালরূপে বুঝা যাইবে। যোগসাধনের মুখ্য উদ্দেশ্য পূর্ণত্বলাভ বা ভগবৎপ্রাপ্তি, এবং গৌণ উদ্দেশ্য সিদ্ধদেহলাভ, যাহা দ্বারা ভগবৎসাধন সম্ভবপর হয়। মনুষ্যের অপক্কদেহ যতদিন যোগাগ্নি দ্বারা পরিপক্ক না হয়, ততদিন ঐ দেহে ভজনসাধন চলে না, উপাসনা সম্ভবপর হয় না, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এইজন্য দেহপাক আনুষঙ্গিক হইলেও, ভগবৎতত্ত্বলাভের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। কারণ অপক্কদেহে মহাজ্ঞানের আবির্ভাবেব আশা বিড়ম্বনা মাত্র।

পূর্ণত্বলাভের নামই নিরুত্থানদশা, অর্থাৎ এই অবস্থা হইতে আর ব্যুত্থান হয় না। "যদ্ জ্ঞাত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম," শ্রীভগবান্ এই গীতাবাক্যে পরমপদের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন, যেখানে যাইতে-পারিলে জীবকে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না। এখান হইতে পুনরাবর্ত্তন হয় না, তাই ব্রহ্মসূত্রে[১] "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" বলিয়া ইঙ্গিতে ইহাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

১। ব্রহ্মসূত্র, চতুর্থ অধ্যায়, চতুর্থ পাদ, ২২ সূত্র।

অতএব সাধকের যোগসাধনের দুইটী উদ্দেশ্য স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে—প্রথম হইল, স্বয়ং দ্বৈতভাব হইতে অদ্বৈতভাবে উপনীত হওয়া; দ্বিতীয় হইল, জগতের কল্যাণসাধন করা। এইরূপ বহুসিদ্ধ যোগীর সিদ্ধদেহে জগতের কল্যাণসাধন করার বৃত্তান্ত জানা যায়, যথা, বুদ্ধদেব নিরুত্থানে যাইতে অসম্মত হন এবং প্রাণীর মঙ্গলের জন্য বহুকাল সিদ্ধদেহে এজগতে বিরাজ করেন। রুদ্রকের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া আনন্দের চতুর্থস্তরে উপনীত হইয়াও তিনি মহাজ্ঞানলাভে সমর্থ হন নাই, তখন গয়ায় বোধিবৃক্ষতলে সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন কিন্তু তৎফলে নির্ব্বাণ তাঁহার সম্মুখীন হইলেও প্রাণী-উদ্ধারের জন্য তিনি তাহা লাভ করিলেন না।

নাথমতেও সিদ্ধদেহে অমরত্বপ্রাপ্তি ও জগতের কল্যাণসাধন উদ্দেশ্য, ইহার পর দিব্যদেহে যে অবিনাশত্বপ্রাপ্তি ঘটে, তাহাই নিরুত্থানদশা। এই নিমিত্তই যোগসাধনকে নাথসিদ্ধগণ সর্ব্বোচ্চস্থান দিয়াছেন, যোগসাধনের দ্বারাই সিদ্ধদেহ ও দিব্যদেহ লভ্য।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সহজাবস্থালাভ, যোগসাধন-প্রণালী

প্রকৃতিকে 'মায়া' বলিয়া ত্যাগ করিবার উপদেশ সাধারণতঃ যোগ-পথের সাধককে দেওয়া হয়; প্রকৃতির যাহা 'ঐশ্বর্য্য' তাহা পাঞ্চভৌতিক, তন্নিমিত্ত যোগীর পক্ষে তাহার প্রাপ্তি অকিঞ্চিৎকর। নাথমতে ও অন্যান্য তন্ত্রমতেও এই অসার ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া পরম ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তির নির্দ্দেশ রহিয়াছে। পরম ঐশ্বর্য্যলাভে যোগী যাহাতে স্বতঃপ্রণোদিত হন তাহার জন্য 'সহজ পন্থা' বা সুখ সাধনের বিধানও তন্ত্রে নির্দ্দেশিত হইয়াছে। বৌদ্ধমতেও অযথা কঠোর তপস্যাদ্বারা স্বশরীরকে পীড়ন করা নিষিদ্ধ। তান্ত্রিক সাধনের উদ্দেশ্য শক্তিকে লাভ করিয়া শিবের তুল্য হওয়া, তখনই সাধকের যথার্থ 'শিবোঽহং' বলা সার্থক, ইহাই তন্ত্রমত। পাতঞ্জল যোগমতে বিবেকখ্যাতি দ্বারা পুরুষ ও প্রকৃতির ভিন্নতা উপলব্ধি ও দ্রষ্টাস্বরূপ পুরুষের সহিত অভিন্নাত্মক হইবার উপদেশ আছে, কিন্তু তন্ত্রমতে পুরুষ-প্রকৃতি বা শিবশক্তি অভিন্ন, অতএব শক্তিকে ত্যাগ করিবার উপদেশ নাই।

তন্ত্রের শক্তি কি? তন্ত্রমতে ব্রহ্ম বা বিন্দুর দুইটী অংশ আছে, এক অংশ শিব, অপর অংশ শক্তি। এই শক্তি শিবের সমান তেজস্বিনী, ইনি শিবের তুল্যা, শিবের যথার্থ অর্দ্ধাঙ্গিনী, শিবের নিকট পরাভূত মায়া নহেন। শঙ্করমতে ব্রহ্মা হইতে মায়ার উদ্ভব। যেরূপ সাগর হইতে তরঙ্গের উৎপত্তি হয় ও তাহাদের চিরন্তন সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন থাকে, ব্রহ্মা ও মায়ার সম্বন্ধ সেইরূপ। কিন্তু তন্ত্রের শক্তি এইরূপ মায়া নহেন, তিনি মহামায়া, অনন্তশক্তিধারিণী, শিবের হ্লাদিনী শক্তিবিশেষ। এক শিব ভিন্ন অপর কেহ এই মহাশক্তি ধারণের যোগ্য নহেন, অতএব সাধক শিবোঽহং বলিলে তাঁহাকে প্রথমে শিবের ন্যায় শক্তিধর হইবার ক্ষমতার্জ্জন করিতে হইবে। ইহাই তন্ত্রমতে বা নাথমতে যোগসাধন-প্রণালীর প্রথম আদর্শ।

বস্তুতঃ শিব ও শক্তিকে ভিন্ন বলিলেও উহারা স্বরূপতঃ এক, নিষ্ক্রিয় শক্তিই শিব ও ক্রিয়মাণ শিবই শক্তি। কর্ম্মাবসানে শক্তি যখন

অন্তর্মুখী হন তখনই শক্তির শিবভাব হয় অর্থাৎ শিব শক্তিরই রূপবিশেষ, ভিন্ন কোন সত্তা নহেন।

নাথগণ বলেন, শক্তিমান শিবই সর্ব্বতোমুখ সর্ব্বাকার হইয়াও বিশ্বোত্তীর্ণ। যোগী শক্তিকে অবলম্বন করিয়াই সিদ্ধিলাভ করেন। শক্তি ত্যাজ্য হইলে পূর্ণসত্য উপলব্ধির ব্যাঘাত ঘটে।[১] কিন্তু এই শিব বা পরম শিবকে উপলব্ধি করিবার উপায় কি? সকল সাধন-প্রণালীর মূলতত্ত্ব এক, "চিত্তকে শুদ্ধ কর, তাহা দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ হইলে তাহাতে পরম শিবের যে ছায়াপাত হইবে, তাহাকেই আশ্রয় কর"; জীবের আত্মাতে পরমাত্মার এই ছায়াপাতই জীবের দ্বিজত্ব প্রাপ্তি অর্থাৎ দ্বিতীয় জন্মলাভ, তাহাই সাধনপথের উপযোগী জন্মপ্রাপ্তি। একমাত্র গুরুকৃপায় (বা কোন কোন মতে ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সেই পরমগুরুর কৃপায়) এই দ্বিজত্বপ্রাপ্তি সম্ভবপর। খৃষ্টান আদি ধর্ম্ম সম্প্রদায়েও ইহার সদৃশ ব্যবস্থা আছে, তাহার নাম দীক্ষা। যাহার সতর্ক (শুদ্ধ বিদ্যা) স্বভাবতঃ উদিত হয় তাহার পক্ষে দীক্ষা নিষ্প্রয়োজন। বাহ্য দীক্ষা, বাহ্য অভিষেক আদিতে তাহার আবশ্যকতা থাকে না বটে কিন্তু সে নিজে সংবিত্তি দেবীগণের দ্বারা দীক্ষিত ও অভিষিক্ত হয়। তাহার ইন্দ্রিয়বৃত্তিসকল অন্তর্মুখী হইয়া প্রমাতার সহিত তাহার স্বাত্মার ঐক্যসাধন করে। ইহাঁরাই দ্যোতনকারিণী সংবিদ্‌দেবী, ইহারা তাহার জ্ঞানক্রিয়াখ্য প্রসুপ্ত চৈতন্যকে উত্তেজিত করে। ইহাই দীক্ষা। যে ক্রিয়ার বলে সে সর্ব্বত্র স্বাতন্ত্র্য লাভ করে, তাহা অভিষেক। বহির্মুখ চিত্তের বৃত্তিসকল অন্তর্মুখী হইলে শক্তি আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এইরূপ দীক্ষাপ্রাপ্ত সাধকই আচার্য্যদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এইরূপ সাধক স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান দ্বারাই সমস্ত শাস্ত্রার্থ রহস্যভেদে সমর্থ হয়। ইহাই প্রাতিভ মহাজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য।[২]

প্রত্যেক জীবের মধ্যেই শিবভাব আছে। প্রশ্ন হইতে পারে জীবই যদি শিব হয় তবে সাধনার প্রয়োজন কি?—উত্তরে বলা যায় সেই মহান্‌কে যে উপলব্ধি করিবে, হৃদয়মধ্যে তাহার কণাপরিমাণ সাদৃশ্য বা অনুভূতি না থাকিলে সাধনপথে কাহাকে আদর্শ করিয়া অগ্রসর হওয়া যাইবে? তাহার

১। সি, সি. প ৭।১৪ অনন্তশক্তিমান্ পরমেশ্বরঃ স বিশ্বরূপী বিশ্বমায়া ভবতীতি প্রসিদ্ধং সিদ্ধানাং চ পরাপরস্বরূপা কুণ্ডলিনী বর্ত্ততে। অতস্থে পিণ্ডসিদ্ধাঃ প্রসিদ্ধাঃ।

২। উত্তরা, বৈশাখ ১৩৫০, পৃ ৩০৯ গুরুতত্ত্ব ও সদ্‌গুরুরহস্য।

স্বরূপ উপলব্ধি না করিলে শিবত্বপ্রাপ্তি ঘটিবে না। তাই তন্ত্র উপদেশ দিলেন, শিবকে পাইতে হইলে শক্তির আরাধনা কর, বেদান্তমতে মায়া ত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম-উপলব্ধি করিলে চলিবে না, তাহাতে পরম-ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি হইবে না। অতএব তন্ত্রের আদর্শ ও সাধনপ্রণালী বেদান্তের আদর্শ ও সাধনপ্রণালী হইতে ভিন্ন। বেদান্তের জীবের ব্রহ্মপ্রাপ্তি ও তন্ত্রমতে মহাশিবপ্রাপ্তিতে যথেষ্ট প্রভেদ আছে। ব্রহ্মপ্রাপ্তিতে কেবল সেই পরম ব্রহ্মকে উপলব্ধি করাই মুখ্য উদ্দেশ্য, ইহার সহিত প্রপঞ্চের সম্বন্ধ নাই, একমাত্র তাঁহাকে উপলব্ধি করাই পন্থা, তাহাতেই আনন্দের উপলব্ধি। তন্ত্রমতে এই আনন্দ উপলব্ধির প্রক্রিয়া ভিন্ন। ইহাতে শক্তি বা মহামায়ার উপলব্ধি কর্ত্তব্য, প্রথমে পরম শিব ও মহামায়ার জ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে, পরে পূর্ণজ্ঞানের উদয়ে পরমশিব ও মহামায়ার মিলনে যখন একজ্ঞানের উদয় হইবে, দ্বৈতজ্ঞান হইতে অদ্বৈতজ্ঞানে যখন সাধক পৌঁছাইবেন, তখন সাধকের যথার্থ শিবত্ব-প্রাপ্তি ঘটিবে। এই দ্বৈত হইতে অদ্বৈত জ্ঞানই 'একীকরণ' বা এককরণ, তাহাই যথার্থ জ্ঞান, তাহাই তান্ত্রিক সাধকদেব আদর্শ। নাথ-সম্প্রদায়ের মতেও এই একীকরণ বা সমীকরণ কর্ত্তব্য। শিববিন্দু, শক্তিবিন্দু ও সামরস্যবিন্দুর সমাবেশে যে ত্রিবিন্দু-সমাবেশ বা মহাবিন্দু হয়, তাহার প্রাপ্তিই লক্ষ্য। এই মহাবিন্দুর নামান্তর 'ব্রাহ্মী স্থিতি' বা পীঠ।

এই একীকরণেব সাধনপদ্ধতি অতি বিচিত্র; ইহা চরম ভোগের পব চবম ত্যাগের পদ্ধতি, অর্থাৎ শক্তিকে পূর্ণমাত্রায় লাভ করিয়া তাহাকে ত্যাগের উপদেশ। সংসারক্ষেত্রে সকল ভোগ করিয়া সকল ত্যাগ করা বড় সহজ নহে, তবে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে ত্যাগ ও ভোগের এই বিচিত্র সমাবেশে সাধক মহত্তর আদর্শের পথে অগ্রসর হন, তাই সাধনলভ্য শক্তিকে ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হন না। অবশ্য এ ক্ষেত্রে ত্যাগ অর্থে সমন্বয় সাধন, সহজ সম্প্রদায়ের সাঙ্কেতিক ভাষায় 'হ' ও 'ঠ' বর্ণদ্বারা সমন্বয় সাধন বা চন্দ্রসূর্য্যের একীকরণের ইঙ্গিত আছে। সহজ সম্প্রদায়ের গ্রন্থে দেখা যায় যে, যে পথে আগম ও সিদ্ধ মার্গের উদ্ভব, ইহাও সেই পথের প্রদর্শক। চন্দ্রসূর্য্যের একীকরণ অর্থে ইড়া-পিঙ্গলা বা প্রাণাপানের সমীকরণ। ইড়া-পিঙ্গলা সহযোগে বা প্রাণ-অপানের সমীকরণ সাহায্যে আনন্দ উপলব্ধিই লক্ষ্য, নাথমার্গেও দ্বৈত হইতে অদ্বৈতভাবে পৌঁছাইবার উপায় হঠযোগ। নাথ ও অন্যান্য সম্প্রদায়

মতে বৈষম্য হইতেই জগতের সৃষ্টি ; যাহা হইতে জগতের সৃষ্টি হয় তাহা যদি সাম্যাবস্থায় থাকে তবে জগতের সৃষ্টি সম্ভব হয় না, তাহাই অদ্বৈত বা সাম্য অবস্থা বা প্রলয় অবস্থা। সাম্যভঙ্গে বৈষম্যের উৎপত্তি, তাহাই বিশ্বসৃষ্টি। এই ভঙ্গ অবস্থায় অদ্বৈত দ্বৈতভাব গ্রহণ করে, পুরুষ-প্রকৃতি, শিবশক্তি প্রভৃতি এই দ্বৈত ভাবের নামান্তর মাত্র, চন্দ্রসূর্য্যের মিলন অর্থেও এই পুরুষ-প্রকৃতির মিলন ব্যতীত অপর কিছু নহে। প্রাণ-অপানের সাম্যতা বা শ্বাসপ্রশ্বাসের সাধন দ্বারা মিলন করিতে পারিলে পরমানন্দের অনুভূতি হয়—এই পরমানন্দের অনুভূতিই হইল শিব উপাসনার ফল। বহিঃশক্তির প্রাধান্যে সৃষ্টি, অন্তঃশক্তির প্রাধান্যে সংহার, স্থিতি উভয় শক্তির সমানতার নিদর্শন। জীবদেহে এই উভয় শক্তি বা প্রাণ-অপান সমভাবে জাগ্রত না থাকার দরুণ পরস্পর মিলিত হইতে পারে না, তাই সাধারণতঃ উভয়ের সাম্য হয় না। স্বাভাবিক নিশ্বাস প্রশ্বাস 'পূরক' ও 'রেচক' এবং উভয়ের সমীকরণ 'কুম্ভক' নামে খ্যাত। শ্বাসপ্রশ্বাসের সহিত ইড়া-পিঙ্গলা মার্গ ক্রিয়াশীল থাকে, শ্বাসপ্রশ্বাসের সাম্য হইলে সুষুম্না দ্বার খুলিয়া যায়, ইহাই শূন্য পদবী বা 'ব্রহ্মনাড়ী'। চন্দ্রসূর্য্যের মিলনই প্রকৃতি-পুরুষের আলিঙ্গন। এই আলিঙ্গন ভিন্ন শূন্যপথ যুক্ত হয় না। শূন্যতাও আপেক্ষিক, সর্ব্বোচ্চ শূন্যপদ যাহা বিশুদ্ধ শূন্য, তাহাই নির্ব্বাণ, তাহা বাসনা-কামনাহীন, ক্লেশ-কর্ম্মাশয়হীন। সেই স্থান তত্ত্বাতীত, শিব ও শক্তিনামক বিন্দুদ্বয় পার্থক্য পরিহার করিয়া ঐক্যলাভ না করিলে সে অবস্থার উদয় হয় না। ইহাই বাম ও দক্ষিণ পথ পরিহার করিয়া মধ্যপথে চলিবার ইঙ্গিত, মধ্যাবস্থাতেই নির্ব্বাণ ; হঠযোগ মতে সহস্রারের মহাবিন্দুতে এই মহামিলন অনুভূত হয়। এই মহামিলনের রসধারায় সাধক নিজেকে প্লাবিত করেন, তাই জীব শিব হইলেও তাহার শিবোপাসনা সার্থক।

তন্ত্রমতে কুণ্ডলিনীশক্তিকে প্রবুদ্ধ করিয়া যোগসাধনই কর্ত্তব্য বিবেচিত হইয়াছে। 'মূলাধারস্থিত কুণ্ডলিনীশক্তি সুপ্তা আছেন, সহস্রারে নিত্যপুরুষ অবস্থান করেন, কুণ্ডলিনীর সুপ্তাবস্থায় সৃষ্টির প্রবাহ চলে, বিভিন্ন যোগাঙ্গ দ্বারা প্রবুদ্ধ হইয়া অগ্নিশিখার ন্যায় কুণ্ডলিনী ঊর্দ্ধমুখী হইয়া সরলপথে ধাবিত হন, উত্থানকালে সমগ্র জাগতিক পদার্থ শক্তি দ্বারাই নির্ম্মিত বলিয়া অনুভূত হয় ও ইন্দ্রজালের ন্যায় বাহ্যসৃষ্টি

পুরুষে বিলীন হইয়া যায়।[৩] তখন মহাশূন্য উপলব্ধি হয়, ফলে ভূত ও চিত্ত সংহৃত হয়, ষট্‌চক্র-ভেদ হইয়া আজ্ঞাচক্রের ঊর্দ্ধে স্থিতি হয়। পরে অতিসূক্ষ্মপথে কুণ্ডলিনীশক্তি পরমশিবের বক্ষে মিশিবার জন্য ধাবিত হন। উহাদের আলিঙ্গনে বিচিত্র আনন্দের উদয় হয়, জীব তাহা আস্বাদন করে। মহাবিন্দুতে যখন এই মিলনের সূত্রপাত হয়, তখনও তুইটী বিন্দূ থাকে, ক্রমশঃ বিন্দুদ্বয় এক মহাবিন্দুতে পরিণত হয়, উহা অখণ্ড পরমানন্দময়, যুগল ভাবাপন্ন হইয়াও অদ্বয়।

জীবদেহে পঞ্চকোষের সংস্থান আছে,—অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ ও আনন্দময় কোষ। ষট্‌চক্র সাধনে বিন্দুসাধনের দ্বারা অন্নময় কোষ, প্রাণ ও বায়ুর ক্রিয়ার দ্বারা প্রাণময় কোষ, মনের ক্রিয়াবলে মনোময় কোষ, বিচার ও বিবেক দ্বারা বিজ্ঞানময় কোষ শোধিত হইয়া থাকে। আনন্দময় কোষ নিত্য শুদ্ধ, তবে ভক্তিযোগে উহার আগন্তুক মল দূর করা বিধি। বিন্দুসাধনে প্রাণমন বিজ্ঞানের ক্রিয়ায় অধিকার জন্মে, তাহাতে সাত্ত্বিক তেজ জন্মে, তখন সুষুম্নার মধ্যে প্রাণের গতাগতি ক্রিয়া আরম্ভ হয়। ব্রহ্মনাড়ীর মধ্যে সূক্ষ্মমনের সঙ্কল্প-বিকল্প ক্রিয়া চলে, তাহা অভিভূত হইলে চিত্রানাড়ীর বিকাশের সহিত বিজ্ঞানময় কোষ খুলিয়া যায় ও তখন সত্য সঙ্কল্পের উদয় হয়, এই ভূমিতে 'যোগবিভূতি' লাভ হয়। মনোময় ভূমি নির্ব্বিকল্প হইলেও নিঃসঙ্কল্প অবস্থা নহে। সঙ্কল্প অর্থে জ্ঞান ও ইচ্ছা, তাহার নিবৃত্তিতে পরমানন্দ, সেই আনন্দ অন্নময় কোষে বজ্রনালের মধ্যে উপলব্ধ হয়। ইহার পরে যে অবস্থা হয় (বস্তুতঃ তাহা অবস্থা নয়) তাহাই 'স্বভাব' বা সহজ, সেই সহজাবস্থা অব্যক্ত, পরমার্থ দৃষ্টিতে তাহা আনন্দেরও অতীত। এই সহজাবস্থা লাভ বা পরম শিবের উপলব্ধি তান্ত্রিক সাধকের একমাত্র চরম লক্ষ্য। নাথগণ বলিয়াছেন, "তুর্ল্লভা সহজাবস্থা সদ্‌গুরোঃ করুণাং বিনা" – গুরুকৃপা ভিন্ন সিদ্ধমতে সাধকের সহজাবস্থা লাভ অসাধ্য, কারণ পথ অতি তুর্গম।

বেদান্তের পঞ্চকোষ বিবেক, তন্ত্রের চক্রভেদ, পাতঞ্জলের অষ্টাঙ্গ যোগাভ্যাস, বৌদ্ধগণের অনুপব্ব বিহার—মূলতঃ এক পথেরই প্রকার-ভেদ। বিভিন্ন সাধক-সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মার্গ, এইমাত্র প্রভেদ। যোগ

৩। লয়যোগসংহিতা তন্ত্রে আছে, পৃ ২ উল্লেখ বার্থওয়েল পৃ ১৩৭ ফুটনোট : "আধারপদ্মে প্রকৃতিঃ সুপ্তা কুণ্ডলিনী স্থিতা"—ইত্যাদি

বিদ্যালয়ের (বীরভদ্র, হৃষীকেশ) স্বামী সত্যানন্দ 'অনুভূত যোগ সাধন' নামক গ্রন্থে ধ্যান কাহাকে বলে এবং ধ্যানকালে জীবাত্মার পঞ্চকোষময় শরীরের একে একে সংযমন কি প্রকারে হয়, তাহার বিশেষ বিবরণ দিয়াছেন। বিজ্ঞানময় শরীরও পরিত্যাগ করিয়া সাধক কিরূপে স্ব-স্বরূপে অবস্থান করিতে পারেন তাহা বর্ণনা করিয়া যোগবিদ্যাকে পুনর্জীবিত করা স্বামীজির উদ্দেশ্য।[১]

যোগসাধনের যোগ্যতা বিচার, দেশকাল, আনুষঙ্গিক অবস্থার অনুকূলতা

গুরু তাঁহার শিষ্যের বা মুমুক্ষুর যোগ-সাধনের যোগ্যতা বিচার করেন তাহার বৈরাগ্য লক্ষ্য করিয়া। সংসারের প্রতি অনাসক্ত না হইলে যোগ-সাধনের যোগ্যতা জন্মে না, তদুপরি রোগহীন দেহ না হইলে সিদ্ধিলাভ হয় না। মুমুক্ষুর সাধনে তীব্রতা দেখিয়াও যোগ্যতা বিচার কর্ত্তব্য, তীব্র সংবেগ ভিন্ন আশুফল লাভ সম্ভব নহে। গুরু উচ্চকোটির হইলে শিষ্যের আকাঙ্ক্ষা দেখিয়া তাহার অনেক ত্রুটী স্বয়ং শোধন করিয়া লন। সাধনে বহুদূর অগ্রসর হইলেও গুরু ব্যতীত প্রকৃত সত্যলাভ সম্ভবপর নহে। সাধনের চরম উদ্দেশ্য সহজাবস্থা লাভ, উহাই সমরসী-করণ (সিদ্ধান্ত অংশে উহার আলোচনা করা হইয়াছে), সেই অবস্থা-লাভে গুরুর অপেক্ষা আছে, সাধকের তাহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

"ষট্‌চক্রং ষোড়শাধারং ত্রিলক্ষ্যং ব্যোমপঞ্চকং।
স্বদেহে যে ন জানান্তি কথং সিধ্যন্তি যোগিনঃ ॥[২]

সিদ্ধি ইচ্ছুক ব্যক্তিরা প্রথমতঃ আপন শরীরস্থ ষট্ (নব) চক্র, ষোড়শ আধার, ত্রিলক্ষ্য ও আকাশ-পঞ্চকের তত্ত্ব অভ্যাস করিবেন, এইগুলি অভ্যস্ত হইলেই পরে যোগানুষ্ঠানের প্রকৃত অধিকার জন্মিয়া থাকে। ইহাদের প্রত্যেকের বিবরণ সাধনা অংশের যোগ ও যোগাঙ্গে দেওয়া হইতেছে।

চলে বাতে চলং সর্ব্বং নিশ্চলে নিশ্চলং সদা।
যোনিস্থানে বশীভূত্বা ততো বায়ুং নিরোধয়েৎ ॥[৩]

১। অনুভূত যোগ সাধন, ২য় সং, পৃ ১৩৩ ইত্যাদি।
২। গোরক্ষসংহিতা ১।১১ ; সি. সি. স. ২।৪৮ নবচক্র কথা ৩।১১ ; সি. সি. প. ২।৩১
৩। গো সং ১।১৫৩। যোগমার্ত্তণ্ড পুঁথি।

বায়ু যে পর্য্যন্ত পরিবাহিত থাকে, তাবৎ দৈহিক সমস্ত পদার্থ চলিতে থাকে, বায়ু নিশ্চল হইলে শারীরিক পদার্থ নিরুদ্ধ হয়। বায়ুর সহিত চিত্ত চঞ্চল হয় বলিয়া প্রথমে বায়ু রুদ্ধ না করিলে ধ্যানধারণা করিবার যোগ্যতা জন্মে না। বায়ু শরীরমধ্যে নিরুদ্ধ হইলে যোগী নীরোগ হন এবং প্রাণায়াম সাহায্যে ভ্রূমধ্যভাগে অবলোকন করিলে যোগীর মৃত্যুভীতি দূর হয়, ইহা যোগসাধনের ফল।

এক্ষণে প্রাণায়ামের স্থান নিরূপণ করা যাইতেছে—

দূরস্থানে বিপিনে চ রাজধান্যাং জনালয়ে।
যোগাভ্যাসং ন কুর্য্যাত্তু কৃতে চ যোগহা ভবেৎ॥
সুপ্রদেশে ধর্ম্মযুক্তে সুভক্ষে নিরুপদ্রবে।
তত্রৈকং কুটীরং কৃত্বা প্রাচীরৈঃ পরিবেষ্টিতং॥
বাপীকূপতড়াগঞ্চ প্রাচীরমধ্যবর্ত্তি চ।
নাত্যুচ্চং নাতিনিম্নঞ্চ কুটীরং কীটবর্জ্জিতং॥
গোময়েন বিনির্লিপ্তং কুটীরং তত্র কল্পয়েৎ।
এবং স্থানেষু গুপ্তেষু প্রাণায়ামং সমভ্যসেৎ॥[১]

নিজের আলয় হইতে অতিদূর দেশে গমন করিয়া যোগানুষ্ঠান আরম্ভ করিলে তাহাতে চিত্তে অবিশ্বাস জন্মে, যোগের প্রতি আপনার মানসিক অবিশ্বাস হইলে কদাচ যোগাভ্যাস হইবে না; বিজন প্রদেশে যোগাভ্যাস করিবে না, কারণ তাহাতে আত্মরক্ষী লোকেব অভাব হইবে সুতরাং যোগের নানা প্রকার ব্যাঘাত জন্মিতে পারে; লোকাকীর্ণ রাজধানীতে যোগাভ্যাস করিবে না, কারণ সাধারণে সে কথা প্রকাশ হইলে অনেক লোকের দ্বারা যোগভঙ্গ হইতে পারে। এই কারণে দূরদেশ, বন, লোকাকীর্ণ স্থান সকল পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মকার্য্য সমাযুক্ত স্থানে যোগানুষ্ঠান করিবে। যাহাতে স্বল্পব্যয়ে আহারাদি নির্ব্বাহ হইতে পারে ও যেখানে কোন প্রকার উপদ্রব নাই, এতাদৃশ কোন স্থানে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া, তাহা প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত করিবে। এই প্রাচীরের মধ্যভাগে কূপ ও তড়াগাদি নির্ম্মাণ করিবে। কুটীর অতিশয় উচ্চ বা অতিশয় নিম্ন করিবে না, কুটীরে যাহাতে কীটাদি প্রবেশ করিতে না পারে সেইরূপ ব্যবস্থা করিবে। কীটাদি দ্বারা যোগের

১। গো. সং ১।১৫৫, ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯ শ্লোক

ব্যাঘাত ঘটিতে পারে, অতএব কুটীর কীটবর্জ্জিত করিয়া নির্ম্মাণ করিবে। শুদ্ধগোময় দ্বারা কুটীর লিপ্ত করিয়া তাহাতে যোগাভ্যাস করিবে। এইরূপ স্থান ব্যতীত স্বেচ্ছাকল্পিত স্থানে প্রাণায়াম আরম্ভ করিলে কদাচ সিদ্ধিলাভ হইবে না। হঠযোগপ্রদীপিকাতে যোগের অন্তরায় এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে (১।১৫, ১৬)—

অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মগ্রহঃ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্ভির্যোগো বিনশ্যতি ॥

এবং যোগের সহায়—

উৎসাহাৎ সাহসাদ্ধৈর্য্যাত্তত্ত্বজ্ঞানাচ্চ নিশ্চয়াৎ।
জনসঙ্গপরিত্যাগাৎ ষড়্ভির্যোগঃ প্রসিধ্যতি ॥
যোগারম্ভং ন কুর্ব্বীত হেমন্তে শিশিরে মুনিঃ।
তথা গ্রীষ্মে বর্ষায়াঞ্চ কৃতে যোগী রোগান্বিতঃ ॥
বসন্তে শরদি প্রোক্তং যোগাভ্যাসং সমাচরেৎ।
তথা যোগী ভবেৎ সিদ্ধো রোগামুক্তো ভবেদ্ ধ্রুবং ॥[১]

ছয় ঋতুর মধ্যে বসন্ত ও শরৎকালে যোগারম্ভ করিলে যোগসিদ্ধি হয় এবং যোগী রোগমুক্ত হইয়া প্রকৃত আত্মকল্যাণ সাধনে সক্ষম হইবেন। মননশীল ব্যক্তি হেমন্তকালে, শীতকালে, গ্রীষ্মে বা বর্ষায় যোগারম্ভ করিবেন না, কারণ তাহাতে যোগী রোগান্বিত হইবেন, সুতরাং তাঁহার উদ্যম ব্যর্থ হইবে। মধ্যরাত্রি বা সন্ধিকালই যোগসাধনের প্রশস্ত সময়।

হঠযোগপ্রদীপিকাতে হঠযোগ সাধনের স্থান নিরূপণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, যে স্থানে রাজাপ্রজা সকলেই সুশীল, সর্ব্বদা ধর্ম্মানুষ্ঠান আছে, ভক্ষ্যদ্রব্য দুর্ল্লভ নহে, চৌরব্যাঘ্রাদির উপদ্রব নাই, সুখস্বচ্ছন্দে বহুকাল বাস করা যাইতে পারে, সেই দেশের কোন নির্জ্জন প্রদেশে ক্ষুদ্র মঠমধ্যে উপবেশন করিয়া হঠযোগী যোগ সাধনা করিবেন। অভিপ্রেত স্থানের চতুর্দ্দিকে চারিহস্ত প্রমাণ স্থানের মধ্যে শিলা, অগ্নি ও জল থাকিবে না, অর্থাৎ যাহাতে শীতোষ্ণাদি ক্লেশ জন্মিতে না পারে তৎপ্রতি দৃষ্টি থাকিবে।[২]

যে স্থানে বহু জনসমাগম আছে, তথায় কলহ অবশ্যম্ভাবী, সেই কলহ হঠযোগের ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে, এই নিমিত্ত হঠযোগ সাধনে

১। গো স ১।১৬০, ১৬১ ২। হ যো প্র ১।১২

নির্জ্জন স্থান বিধেয়। অনাবৃত স্থানে শীতবাতাদির ক্লেশ হইতে পারে, এই নিমিত্ত মঠমধ্যে যোগসাধনই প্রশস্ত। যোগীর পক্ষে নির্জ্জন প্রদেশে, গুহা বা বনে নিত্যযুক্ত হইয়া সর্ব্বদা সম্যক্‌রূপে ধ্যান-সাধন নির্ণীত হইয়াছে।[১]

গোরক্ষসংহিতা মতে পরিমিতাহার না করিয়া যোগারম্ভ করিলে নানাপ্রকার ব্যাধিদ্বারা দেহ আক্রান্ত হয়, অতএব যোগশিক্ষার পূর্ব্বে মিতাহারী হওয়া একান্ত আবশ্যক। মিতাহার কাহাকে বলে?

শুদ্ধং সুমধুরং স্নিগ্ধং উদরার্দ্ধবিবর্জ্জিতং।
ভুজ্যতে সুরসং প্রীত্যা মিতাহারমিমং বিদুঃ॥[২]

যোগী এইরূপে প্রীতির সহিত অর্দ্ধ উদর শূন্য রাখিয়া অর্থাৎ অর্দ্ধভাগ অন্নের দ্বারা তৃতীয় ভাগ জলের দ্বারা পূর্ণ করিয়া চতুর্থ ভাগ বায়ুসঞ্চারের নিমিত্ত শূন্য রাখিয়া আহার করিবেন। এই প্রকার মিতাহার যোগসাধনে হিতকারী।

হঠযোগপ্রদীপিকাতে -

সুস্নিগ্ধমধুরাহারশ্চতুর্থাংশবিবর্জ্জিতঃ।
ভুজ্যতে শিবসম্প্রীত্যৈ মিতাহার স উচ্যতে॥[৩]

এইরূপে মিতাহার নিরূপণ করা হইয়াছে।

যোগীর পক্ষে কটু, অম্ল, লবণ, তিক্ত, ভর্জ্জিতদ্রব্য, দধি, তক্র, মদ্য, তাল, কাঁঠাল ও পাকা কলা নিষিদ্ধ। কলাই, মসুর, কুষ্মাণ্ড, শাকের ডাঁটাও নিষিদ্ধ। অধিক উষ্ণ, রুক্ষ দ্রব্যাদি যোগীর পক্ষে অহিতকর। অতিভোজন, অতিনিদ্রা এবং অতিভাষণও যোগী বর্জ্জন করিবেন।

এলাচি, জাতিফল, জাম, হরীতকী, খর্জ্জুর, পটল, মান, ডুমুর, রম্ভা, থোড়, বেগুন, মূলা, গোধূম, শালিধান্যের অন্ন, যব, দুগ্ধ, ঘৃত, পঞ্চশাক, (জিয়াতি বেথো, হিংচা, নটে ও পুনর্ণবা) যোগীন্দ্রগণের পথ্য।

যোগাভ্যাসকালে বহ্নিসেবা, স্ত্রীসংসর্গ, পথপর্য্যটন ত্যাগ বিধি। গোরক্ষ বলিয়াছেন—

বর্জ্জয়েদ্দুর্জ্জনপ্রান্তং বহ্নিস্ত্রীপথিসেবনম্।
প্রাতঃস্নানোপবাসাদিকায়ক্লেশবিধিং তথা॥[৪]

১। যোগরহস্যম্, শ্লোক ২১ ২। গো সং ১।১৭৩
৩। হ যো প্র ১।৫৮ ৪। হ যো প্র ১।৬১

প্রাতঃস্নানে শীতবিকার, উপবাসাদিতে পিত্তোল্বণ হইতে পারে বলিয়া উহা বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য।

প্রাতঃস্নানোপবাসাদিকায়ক্লেশবিধিং বিনা।
একাহারং নিরাহারং যামান্তে চ ন কারয়েৎ ॥[১]

গোরক্ষসংহিতায় উক্তশ্লোকটি আছে; উহা দ্বারা যোগশিক্ষেচ্ছুগণের প্রাতঃস্নান ও উপবাসাদি ক্লেশ ব্যতীত একাহার করা বা অনাহারে থাকা নিষিদ্ধ বুঝায়। এক প্রহর অন্তর ভোজন করিলে অবশ্য কালবিধি উল্লঙ্ঘিত হইবে না।

যোগাঙ্গ অনুষ্ঠানের নিমিত্ত দুগ্ধ ও ঘৃত ভক্ষণ বিধি, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন কাল ব্যতীত অন্য সময়ে আহার নিষিদ্ধ। এই দুইবেলা মাত্র আহার বিধি।

অভ্যাসকালীন নিয়ম ও আচারাদি, অনিয়মাদি, পঞ্চব্রত ও পঞ্চনিয়ম পালন

দেবর্ষি নারদ কোন সময়ে ভগবান্ সনৎকুমারের নিকট ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশার্থে গিয়াছিলেন। সনৎকুমার সত্যভাষণ, ব্রহ্মচর্য্য, গুরুসেবাদিরূপ শ্রদ্ধা-নিষ্ঠাদির উপদেশ দেন, তৎপরে ভূমাবিদ্যার উপদেশ দিয়া আত্মজ্ঞান রক্ষার নিমিত্ত আহারশুদ্ধ্যাদির বিষয় বলেন—"আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ"—এই প্রকারে নিষ্পাপ নারদকে ভগবান্ অজ্ঞানের পার অর্থাৎ পরব্রহ্মতত্ত্বের অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার করাইলেন। এইস্থানে আহারের দ্বিবিধ অর্থ আছে,—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দ্বারা শব্দাদি বিষয় গ্রহণ ও ভোজন উভয়ই শুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। সাত্ত্বিক ভোজনসহ শুদ্ধ বিষয় গ্রহণ সাধকের কর্ত্তব্য। কৈবল্য উপনিষদে আছে—

বিবিক্তদেশে চ সুখাসনস্থঃ শুচিঃ সমগ্রীবশিরঃ শরীরঃ।
অত্যাশ্রমস্থঃ সকলেন্দ্রিয়াণি নিরুধ্য ভক্ত্যা স্বগুরুং প্রণম্য ॥[৩]

অর্থাৎ সাধককে নির্জ্জনে স্থিরাসনে যোগসাধন করিতে হইবে এবং সাধক শুচি হইবেন। সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতিতে আছে—

যোগমার্গাৎ পরো মার্গো নাস্তি নাস্তি শ্রুতৌ স্মৃতৌ।[৪]

১। গো সং ১।১৮২ ২। গো সং ১।১৮৩
৩। কৈবল্য উপনিষদ ১।৫ ৪। গো সি স. পৃ ৫

এই যোগমার্গে বর্ণাশ্রম ত্যাগ করিয়া অত্যাশ্রমী হইতে হইবে, "নাস্তি গুণবৃত্তীনাং মুক্তিসাধকত্বম্"।[১] অত্যাশ্রমীই পক্ষপাতশূন্য হইতে পারেন এবং পরমনাথকে স্বরূপতঃ দেখিয়া মোক্ষলাভে সমর্থ হন। অভ্যাসকালে লোভ-মোহ, শীতোষ্ণ, ক্ষুৎপিপাসা, সুখদুঃখ, মান-অপমান, সঙ্কল্প-বিকল্প সব ত্যাগ করিতে হইবে, কারণ ব্রহ্ম এই সকল ভাবের অতীত।[২]

যোগবীজে উক্ত হইয়াছে "সর্ব্বদোষাবৃতো জীবঃ কথং জ্ঞানেন মুচ্যতে"—অর্থাৎ মাত্র শাস্ত্রজ্ঞানদ্বারা কামক্রোধাদি জয় সম্ভব নহে, কারণ জীব শরীর দ্বারা বিজিত। জ্ঞানিগণ দেহান্তে পুণ্যপাপের ফল ভোগ করেন কিন্তু জীবন্মুক্ত পক্কদেহ যোগী সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিত, "মরণং যত্র সর্ব্বেষাং তত্রাসৌ সখি জীবতি"। এই পক্কদেহ লাভ করিতে হইলে যোগিদেহ নির্ম্মল করিতে হইবে।[৩]

আচার ও বিচার এই উভয় প্রণালী দ্বারা দেহশুদ্ধি হয়, কিন্তু বাহ্য আচার (যথা স্পর্শাদিদোষ) নাথদের ত্যাজ্য, "আচারোঽস্মাকং মতে বর্ত্ততে স চ বিচাবপূর্ব্বক ইতি"।[৪] বিচার মধ্যে আবার তত্ত্ববিচার মুখ্য। বাহ্য আচার দ্বারা যতই শুদ্ধ হওয়া যাউক না কেন, মনঃস্থৈর্য্য বিনা মোক্ষলাভ হয় না। তাই শ্রীনাথ সূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণ আচার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, যোগী বিচার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন; ব্রাহ্মণ যতদিনে আচার হইতে বিচার লাভ করিবেন, যোগী ততদিনে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইবেন।[৫]

অতএব আচার ত্যাগ করিয়া বিচার গ্রহণ কর্ত্তব্য। তথাপি প্রথম অভ্যাসীর পক্ষে পঞ্চযম ও পঞ্চনিয়ম পালন কর্ত্তব্য, তাহা দ্বারা চিত্তশুদ্ধির সহায়তা হয়। যোগ ও যোগাঙ্গ অধ্যায়ে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। অচৌর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য, ত্যাগ, অলোভ ও অহিংসা এই পঞ্চব্রত এবং অক্রোধ, গুরুসেবা, শৌচ, লঘুভোজন, নিত্যবেদপাঠ পঞ্চনিয়মরূপে কীর্ত্তিত হয়। ভিক্ষুকদিগের ইহা পালনীয়।[৬]

১। গো সি. স. পৃ ৩ ২। তেজবিন্দু উপনিষদ ১।২২, ১৪

৩। গো সি. স পৃ ৩০, ৩১ যোগবীজ।

৪। গো সি স. পৃ ৬০ ৫। গো সি স. পৃ ৬২

৬। যোগরহস্যম্ (যোগশাস্ত্রাবলী) পৃ ৪০৪, শ্লোক ১৬, ১৭

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

যোগ ও জ্ঞানের পরস্পর সম্বন্ধ বিচার

গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহে[১] যোগ ও জ্ঞানের পরস্পর সম্বন্ধের কথা এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে—নানামার্গে শিবভাষিত কৈবল্যরূপ মোক্ষ দুষ্প্রাপ্য, কিন্তু সিদ্ধমার্গে তাহা সুলভ, সেই অনির্ব্বাচ্যপদ শাস্ত্রজালে পতিত বুদ্ধিবিমোহিত পণ্ডিত বা দেবগণ বলিতে অক্ষম। "পতিতাঃ শাস্ত্রজালেষু, প্রজ্ঞয়া তে বিমোহিতাঃ। অনির্ব্বাচ্যপদং বক্তুম্ ন শক্যতে সুরৈরপি॥ স্বাত্মপ্রকাশরূপং তৎ কিং শাস্ত্রেণ প্রকাশ্যতে।" সেই নিষ্কল নির্ম্মল স্বাত্মপ্রকাশ জীবরূপেই অবভাসিত হন, কিন্তু জীব কাম, ক্রোধ, ভয় ও চিন্তাদ্বারা আবৃত বলিয়া তাহা হইতে মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের শিবত্ব প্রাপ্তি হয় না। কেহ কেহ বলেন, জীব জ্ঞানের দ্বারাই মুক্ত হইতে পারেন, কিন্তু কেবলমাত্র 'জ্ঞান' সিদ্ধির পক্ষে অপর্য্যাপ্ত, তাই তাহা দ্বারা মুক্তিলাভ হয় না; অপরপক্ষে যে 'যোগ' জ্ঞানহীন, তাহাও মুক্তিপ্রদ নহে, অতএব নাথমতে "জ্ঞানযুক্ত যোগে"র প্রয়োজন। মাত্র 'জ্ঞান' বা শাস্ত্রজাল দ্বারা কামক্রোধাদি জয় সম্ভবপর নহে, 'যোগ' বিনা মোক্ষলাভ হয় না, তাই দেবপক্ষেও যোগসাধন আবশ্যক।

জ্ঞানীর পক্ষে জ্ঞেয়ের পরিসমাপ্তি হইলেও তাহার মোক্ষলাভ হয় না, কারণ দেহী জীবের 'পক্ব' ও 'অপক্ব' ভেদ আছে, যোগহীনেরা অপক্বদেহী, যোগাগ্নি দ্বারা দেহ পক্ব হইলে জীব অজড় ও শোকতাপ-বর্জ্জিত হয়। অপক্বদেহে বৈরাগ্য সাধন বা জপতপাদি ক্রিয়া বৃথাশ্রম মাত্র, কারণ "শরীরেণ জিতঃ সর্ব্বে, শরীরং যোগিভির্জিতম্", অতএব যোগদ্বারা শরীরকে জয় করিতে হইবে।

জ্ঞানী রূপে যাঁহারা মৃত হন, তাঁহারা দেহান্তে পাপপুণ্যানুযায়ী ফলপ্রাপ্ত হন, সেই সকল যথাবৎ ভোগের পর জ্ঞানীর পুনর্জন্ম হয়। যদি কোন পুণ্যবলে এরূপ জ্ঞানীর সিদ্ধগণের সঙ্গলাভ ঘটে ও তাঁহাদের কৃপায় তিনি যোগী হন তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে সংসারনাশ সম্ভব হয় (অর্থাৎ জন্মমৃত্যুর চক্র হইতে তিনি অব্যাহতি পান), অন্যথা শিবভাষিত মোক্ষ লাভ করা জ্ঞানীর পক্ষে সম্ভব হয় না।

১। গো. সি. স. পৃ ৩০, ৩১, ২৮

"বেদস্য পূর্ব্বভাগে জ্ঞানং যথা তাৎপর্য্যোঽস্তি তথা বেদান্তভাগে যোগস্তাৎপর্য্যার্থোঽস্তি"—বেদের পূর্ব্বভাগে জ্ঞানতাৎপর্য্য ও বেদান্তভাগে যোগতাৎপর্য্য আছে. তন্মধ্যে নাথমতে যোগভাগই মুখ্য, "যোগভাগস্ত্বব-ধূতানাম্", অতএব অবধূতই নাথমার্গে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। অবধূতের স্বানুভূতি আছে. তাই উক্ত হইয়াছে—"যস্য সাক্ষাদনুভবঃ শাস্ত্রজ্ঞানেন তস্য কিম্"।[১]

এখন জ্ঞানের স্বরূপ কি, যোগেরই বা স্বরূপ কি, এবং নাথমার্গে যোগকে কেন প্রধান স্থান দেওয়া হইয়াছে তাহাই বিচার্য্য। নাথগণ বলেন, "যোগ আবশ্যকঃ সর্ব্বেষাং কর্ত্তব্যো যঃ স সর্ব্বদা স্বতন্ত্রোঽস্তি"[২] অর্থাৎ যোগ নিরপেক্ষ ও সকলের কর্ত্তব্য। কিন্তু জ্ঞান নিরপেক্ষ নহে, জ্ঞান ও কর্ম্ম পরস্পরসাপেক্ষ, জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে কর্ম্ম আবশ্যক। বেদান্তীরা চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম্মের উপদেশ দেন, তৎসঙ্গে জ্ঞানের সাধনা করিতে বলেন, অতএব জ্ঞান ও কর্ম্ম পরস্পরসাপেক্ষ। কিন্তু যোগসাধন নিরপেক্ষ এবং শ্রেষ্ঠ, অতএব সাধকের যোগসাধনই কর্ত্তব্য। তথাপি স্মরণ রাখিতে হইবে যে কেবল জ্ঞানদ্বারা যেরূপ মোক্ষলাভ সম্ভব নহে, সেইরূপ যে যোগ জ্ঞানহীন, তাহাও মুক্তিপ্রদ নহে।

> যোগহীনং কথং জ্ঞানং মোক্ষদং ভবতীশ্বরি।
> যোগোঽপি জ্ঞানহীনস্তু ন ক্ষমো মোক্ষকর্ম্মণি ॥[৩]

অতএব জ্ঞানযুক্ত যোগের প্রয়োজন, তাহা দ্বারাই মোক্ষলাভ সম্ভব। অন্যত্র উক্ত হইয়াছে—

> যোগাৎ পরতরং পুণ্যং যোগাৎ পরতরং সুখম্।
> যোগাৎ পরতরং সূক্ষ্মং যোগমার্গাৎ পরং ন হি ॥[৪]

অমনস্কে 'যোগ'কে দ্বিবিধ বলা হইয়াছে—অন্তর্যোগ ও বহির্যোগ।

> বহির্মুদ্রান্বিতং পৃষ্টং বহির্যোগঞ্চ তন্মনঃ ॥
> অন্তর্মুদ্রাখ্যমপরমন্তর্যোগং তদেব হি।
> রাজযোগঃ স কথ্যতে স এব মুনিপুঙ্গব ॥[৫]

বহির্যোগ বহির্মুদ্রাযুক্ত, অন্তর্যোগ অন্তর্মুদ্রাযুক্ত, তন্মধ্যে বহির্যোগই মন বলিয়া গণ্য। অন্তর্যোগই রাজযোগ। ইহা সর্ব্বযোগের শ্রেষ্ঠ বলিয়া

১। গো সি. স. পৃ ৫২
২। গো সি স পৃ ১৬
৩। যোগবীজ ১৮, ১৯ শ্লোক
৪। যোগবীজ ৮১ শ্লোক
৫। অমনস্ক-বিবরণং—দ্বিতীয় অধ্যায় ২, ৩ শ্লোক।

'রাজ'যোগ নামে খ্যাত এবং 'রাজ'ত অর্থে স্বপ্রকাশ পরমাত্মার প্রাপক, অতএব ইহার নাম 'রাজযোগ'। মুক্তির নিমিত্ত অন্তর্যোগ ও বহির্যোগ উভয়ই বিশেষরূপে জানা কর্ত্তব্য; যিনি উভয় যোগ জানেন, তিনিই সকলের পূজ্য হন।

কৌলজ্ঞাননির্ণয়ের চতুর্বিংশ পটলে দেবী প্রশ্ন করিতেছেন, "দেহস্থ সিদ্ধদের পূজাবিধি কি?" তদুত্তরে ভৈরব বলিতেছেন, "সিদ্ধরা হৃদয় বা মস্তকস্থ চক্র মধ্যে বিরাজ করেন, তাঁহাদের পূজাবিধি দ্বিবিধ—'বহিঃস্থ' ও অধ্যাত্ম', বহিঃস্থ পূজায় সুগন্ধপুষ্প, ধূপচন্দনাদি ব্যবহার বিধি, কিন্তু অধ্যাত্ম পূজায় –

প্রসন্নবদনাশ্চৈব পিবন্ত্যো মদিরাসবম্ ॥১১॥
ইচ্ছারূপধরাঃ সর্ব্বে জরামরণবর্জ্জিতাঃ।
সৃষ্টিপ্রবর্ত্তকাঃ সর্ব্বে বরদানৈকতৎপরাঃ ॥
ই ...... দাধ্যায়েদচিরান্তং সমোভবেৎ ॥১২॥

এই স্থানে অধ্যাত্ম পূজায় যোগের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে বলিয়াই অনুমান হয়। "পিবন্ত্যো মদিরাসবম্" দ্বারা খেচরীমুদ্রা দ্বারা অমৃতপানের ইঙ্গিত ও তৎফলে ইচ্ছারূপ ধারণ, জরামরণজয়, সৃষ্টি-ক্ষমতা অর্জ্জন প্রভৃতি যোগজ সাধন ফলে সিদ্ধিলাভের উল্লেখ করা হইয়াছে। অতএব 'যোগ'কেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে।

পুষ্পাৎ প্রকাশ্যতে যদ্বৎ ফলং পুষ্পপ্রণাশনং।
আত্মনঃ তত্ত্বমজ্ঞাত্বা মূঢ়ঃ শাস্ত্রেষু মুহ্যতি ॥[১]

পুষ্প হইতে যেমন পুষ্পবিধ্বংসী ফলের উৎপত্তি হয় সেইরূপ লোকে শাস্ত্রজ্ঞান হইতে আত্মজ্ঞান লাভ করে. আত্মজ্ঞান লাভ হইতে শাস্ত্রত্যাগ কর্ত্তব্য, কিন্তু মূঢ়েরা আত্মজ্ঞান হইলেও শাস্ত্রবচনে মুগ্ধ হইয়া থাকে।

এস্থলে শাস্ত্রজ্ঞান হইতে আত্মজ্ঞানের উৎকর্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে- অর্থাৎ 'জ্ঞান' অপেক্ষা 'যোগ'কে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে।

এখন জ্ঞানের স্বরূপ কি তাহা আলোচ্য। নাথগণ 'জ্ঞান' বলিতে শাস্ত্রজ্ঞান মাত্র বলেন, ইহা মোক্ষলাভের পক্ষে নিকৃষ্ট উপায় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। কিন্তু 'জ্ঞানে'র দ্বারাও সাধনরাজ্যের স্তরে স্তরে কিরূপে অগ্রসর হইতে পারা যায় তাহার পরিচয় বৈদিকশাস্ত্রে, আগমে ও বৌদ্ধগ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়। জ্ঞানের ত্রিবিধ ভেদ আছে—শ্রৌত,

১। অমনস্কবিবরণং, দ্বিতীয় অধ্যায় ১৮ শ্লোক।

চিন্তাময় ও ভাবনাময়, "সা চ প্রজ্ঞা শ্রুতময়ী, চিন্তাময়ী, ভাবনাময়ী চ।"[১] ইহাদের মধ্যে পূর্ব্ব জ্ঞানই উত্তর জ্ঞানের হেতু। বিক্ষিপ্তচিত্তের শাস্ত্রার্থ জ্ঞানকে 'শ্রৌতজ্ঞান' বলে ; শাস্ত্রার্থ আলোচনা দ্বারা, অনুকূল যুক্তি প্রদর্শন দ্বারা ভাবনাই 'চিন্তাময়' জ্ঞান, এবং যে জ্ঞান দ্বারা মায়িক তত্ত্ব হইতে মুক্ত হইয়া সাধক পরমশিবের সহিত যুক্ত হইতে পারেন তাহাই 'ভাবনাময়' জ্ঞান। স্বভ্যস্ত চিন্তাময় জ্ঞান হইতেই এই ভাবনাময় জ্ঞান হয়, ইহাই মোক্ষের কারণ এবং ইহাই শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান। ইহা দ্বারাই যোগ ও যোগফল লাভ হয়।

মৎস্যেন্দ্রনাথ বিরচিত 'কৌলজ্ঞান নির্ণয়ে' উক্ত হইয়াছে—

ন তিথির্ন চ নক্ষত্রং নোপবাসং বিধীয়তে।
যত্র তত্র স্থিতো যোগী জ্ঞানমেবং সমাশ্রয়েৎ ॥[২]

যোগী সকল অবস্থাতে জ্ঞানকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন।

'যোগবীজ'[৩] গ্রন্থে আছে—দেবী শঙ্করকে প্রশ্ন করিলেন, "অজ্ঞান হইতে সংসার এবং জ্ঞান দ্বারাই মুক্তি হয়, তবে যোগের প্রয়োজনীয়তা কি, প্রসন্ন হইয়া আমাকে বলুন।" তদুত্তরে শঙ্কর বলিলেন, "তোমার উক্তি সত্য, তথাপি তোমাকে বলিতেছি, জ্ঞানের স্বরূপ কি, জ্ঞেয় কি, জ্ঞানের সাধন কি, অজ্ঞানই বা কীদৃশ, এই সকল বিষয় বিবেকীর দ্বারা প্রথমেই বিচার্য্য। যে ব্যক্তি নিজেকে পরম শিবরূপে জানিয়াছে, সে কি কামক্রোধাদি দোষ হইতে বিমুক্ত হইয়াছে ? সকল দোষমুক্ত জীব কেবল জ্ঞান দ্বারা কিরূপে মুক্তিলাভ করিবে ?" দেবী বলিলেন—

"সাত্মরূপং যজ্ জ্ঞাতং পূর্ণং তদ্ব্যাপকং তথা ॥
কামক্রোধাদিদোষাণাং স্বরূপান্নাস্তি ভিন্নতা।
পশ্চাত্তস্য বিধিঃ কিঞ্চ নিষেধোঽপি কথং ভবেৎ ॥"[৪]

অর্থাৎ সাত্মস্বরূপকে যখন পূর্ণ বলিয়া জানা যায় আর তাহাই যখন সর্ব্বব্যাপক, তখন কামক্রোধাদি দোষের স্বরূপ হইতে কোন ভিন্নতা থাকে না, সে অবস্থায় বিধিনিষেধের অবকাশ কোথায় ? "বিবেকী সর্ব্বদা মুক্তঃ সংসারভ্রমবর্জ্জিতঃ"। ঈশ্বর বলিলেন, "সাত্মস্বরূপ যে পরিপূর্ণ স্বরূপ তাহা সত্য, তাহার পূর্ণত্বহেতুই তাহা 'সকল' ও 'নিষ্কল' অর্থাৎ অংশযুক্ত

১। অভিধর্ম্মকোশঃ ৬।১৫ ২। কৌলজ্ঞাননির্ণয় ২১।১০
৩। যোগবীজ ২০ শ্লোক ইত্যাদি। ৪। যোগবীজ ২৩, ২৪ শ্লোক।

ও অংশহীন। সংসারভ্রম প্রাপ্ত হইয়াই সে স্ফূর্ত্তিরূপে মোহসমুদ্রে পতিত হয় (স্ফূর্ত্তি অর্থে কলাযুক্তস্বরূপ বা সকল)। যে জ্ঞানী, যে নিষ্কল, নির্ম্মল, সাক্ষাৎস্বরূপ, গগনোপম, উৎপত্তিস্থিতিসংহার-স্ফূর্ত্তিজ্ঞানবিবর্জ্জিত সে কেন বিদ্যাকে ত্যাগ করিয়া পুনঃ পুনঃ সংসারে নিমগ্ন হয়? ইহার কারণ অজ্ঞানী সংসারী জীব যেরূপ সুখ-দুঃখ-মোহে অবস্থিত, জ্ঞানীও যখন বাসনা দ্বারা অবসিত হইয়া সেইভাবে অবস্থান করে, তখন জ্ঞানী ও অজ্ঞানী উভয়ের মধ্যে কোন ভেদ থাকে না, উভয়েরই সংসারবাসনা তখন তুল্য হয়। অতএব জ্ঞানীর পক্ষেও যখন এইরূপ অবস্থাপ্রাপ্তি সম্ভব, তখন অজ্ঞানীর পক্ষে কিরূপ হয় তাহা সহজেই অনুমেয়। হে প্রিয়ে, যোগ বিনা জ্ঞাননিষ্ঠ বিরক্ত ধর্ম্মজ্ঞ বিজিতেন্দ্রিয় দেবতার পক্ষেও মোক্ষলাভ সম্ভব নহে। অতএব দেবপক্ষেও যোগসাধন কর্ত্তব্য।

জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তোঽপি ধর্ম্মজ্ঞো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
বিনা দেবোঽপি যোগেন ন মোক্ষং লভতে প্রিয়ে॥[১]

জ্ঞানী হইলেও যোগী না হওয়া পর্য্যন্ত প্রকৃতজ্ঞান লাভ হয় না, যোগীর পক্ষেও জ্ঞান আবশ্যক ; অতএব যোগ ও জ্ঞান পরস্পরের সহায়ক, তথাপি যোগই প্রধান।

প্রত্যেক মনুষ্যের জীবনে চারিটী অবস্থা দেখা যায় :—

ক. গুরু বা ভগবানের কৃপায় পৌরুষ অজ্ঞান দূর,
খ। নিজ সাধনাদ্বারা বর্ত্তমান জন্মেই বৌদ্ধজ্ঞানের উদয়,
গ। বৌদ্ধজ্ঞানের উদয়ে বৌদ্ধ অজ্ঞানের নিবৃত্তি,
ঘ। পৌরুষ জ্ঞানের উদয়।

যদি সাধন দ্বারা ইহজন্মে বৌদ্ধজ্ঞানের উদয় না হয় (উপরোক্ত 'খ' অবস্থা) তবে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পৌরুষ জ্ঞানের উদয় হইবে ('ঘ' অবস্থা), কারণ আমাদের বুদ্ধি আমাদের জ্ঞানের প্রতিবন্ধক, তাহা দূর কবিবার নিমিত্ত সাধনার প্রয়োজন। গুরু দীক্ষা দ্বারা প্রদীপ জ্বালিয়া দেন, জীবিতকালে সাধন দ্বারা তাহার আবরণ না ঘুচাইতে পারিলে মৃত্যুর পর সে আবরণ স্বতঃই ঘুচিয়া যায়, তখন গুরু দ্বারা প্রজ্বলিত দীপ আপনিই প্রকাশিত হয়, কারণ সে দীপ নির্ব্বাপিত হইবার নহে।

নাথমার্গের 'জ্ঞান' ও 'যোগ' বলিয়া যে দুইটী অবস্থা আছে বলা হয়, তাহা উপরোক্ত (ক) ও (খ) অবস্থা। প্রথমতঃ গুরু 'জ্ঞান' দান করেন,

---

১ যোগবীজ ৩১ শ্লোক।

তৎপরে যোগসাধন সম্ভব হয়, যোগ বিনা 'মহাজ্ঞানে'র উদয় হওয়া সম্ভব নহে। গুরু সাধকের দৃষ্টিশক্তি উন্মুক্ত করিয়া দিলেই সাধনা সম্ভব হয় ও 'মহাজ্ঞান' লাভ হয়।

বেদান্তে 'জ্ঞান' সম্বন্ধে দুইটী মত প্রচলিত। শঙ্কর বলিয়াছেন, শব্দ দ্বারা জ্ঞান বা অপরোক্ষ জ্ঞান হয়, অতএব যোগ আবশ্যকীয় নহে, তবে 'যোগ' উপায়স্বরূপ। মণ্ডন মিশ্র বলিয়াছেন, শব্দ দ্বারা পরোক্ষ জ্ঞান হয়, 'যোগ' দ্বারা সেই জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধিত হয়, অতএব যোগের আবশ্যকীয়তা আছে।

সাংখ্যকার বলিয়াছেন, 'জ্ঞান'ই প্রধান, 'যোগ' তাহার সহায় মাত্র। পাতঞ্জল বলেন, যোগ বিনা কেবল জ্ঞান দ্বারা যে সম্প্রজ্ঞান লাভ হয় তাহা বাঞ্ছনীয় নহে, অতএব যোগের দ্বারা যোগাতীত অবস্থালাভই কর্ত্তব্য।

সিদ্ধমতে জ্ঞানী ও যোগীর মৃত্যুর সহিতও সম্বন্ধ বিচার করা হয়, যে ব্যক্তি 'অজ্ঞানী' তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য, কারণ সে জন্মমৃত্যুর চক্রমধ্যে আবর্ত্তন করে। যে 'জ্ঞানী' তাহারও মৃত্যু বা দেহত্যাগ অনিবার্য্য, কারণ 'জ্ঞান' দ্বারা সে কালজয়ী হইতে সক্ষম হয় না, তাহার দেহের লয়প্রাপ্তির সময় হইলে তাহার দেহনাশ ঘটিবেই, তাহার উপর হস্তক্ষেপ করিবার কোন অধিকার তাহার থাকে না, তথাপি তাহার মৃত্যু আসিতেছে তাহা সে বুঝিতে সক্ষম হয়, কারণ জ্ঞানীর আমিত্ব লোপ পায় না। সেই নিমিত্ত মৃত্যু জ্ঞানীর পক্ষে জীর্ণবস্ত্র ত্যাগের ন্যায় ব্যাপারমাত্র। কিন্তু যোগীর মৃত্যু 'ইচ্ছামৃত্যু', কারণ তাহার পক্ষে কাল তাহার অধীন, তাহার 'জ্ঞান' সহ 'যোগ' যুক্ত হইয়াছে। এইরূপ যোগীর জ্ঞানই 'মহাজ্ঞান', সেই জ্ঞান দ্বারা যোগী অজর-অমরত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই জ্ঞান দ্বারা সে কালকেও জয় করে, তাই মৃত্যু তাহার স্বেচ্ছাধীন। তাই নাথমার্গের সর্ব্বত্র 'যোগ'কেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে।

আগমে যোগীর চারিপ্রকার ভেদ বর্ণিত হইয়াছে। সংপ্রাপ্ত, ঘটমান, সিদ্ধ ও সুসিদ্ধ ভেদে যোগী চারিপ্রকার। সংপ্রাপ্ত অর্থাৎ যে যোগের উপদেশ মাত্র পাইয়াছে, ঘটমান অর্থে যোগাভ্যাসে নিরত যোগী, সিদ্ধ অর্থে যোগসিদ্ধ ও স্বভ্যস্ত জ্ঞানী এবং সুসিদ্ধ অর্থে যিনি নির্ব্বিকার বা ব্যবহারভূমির অতীত। ইহাদের মধ্যে সিদ্ধ যোগীই যোগী ও জ্ঞানী

মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হন, কারণ তিনি যোগী ও জ্ঞানী উভয়ই, জ্ঞান দ্বারা তিনি অন্যকে মুক্ত করিতে সক্ষম, অন্যপ্রকারে অর্থাৎ সিদ্ধি প্রভাবে তিনি মুক্ত করেন না।[১]

আরম্ভশ্চ ঘটশ্চৈব তথা পরিচয়স্তদা।
নিষ্পত্তিঃ সর্ব্বযোগেষু যোগাবস্থা ভবন্তি তাঃ ॥[২]

আরম্ভাবস্থা, ঘটাবস্থা, পরিচয়াবস্থা ও নিষ্পত্ত্যবস্থা—সর্ব্বপ্রকার যোগেই এই চতুর্ব্বিধ অবস্থা হয় ('নাদানুসন্ধান' অধ্যায়ে ইহার আলোচনা করা হইয়াছে)। নাথমার্গে ইহার বিশেষ আলোচনা দেখা যায়, কারণ যোগকেই তাঁহারা প্রধান বলেন। তথাপি 'মহাজ্ঞান' প্রাপ্তি যোগীর আদর্শ, তাহার স্বরূপ উপস্থিত আলোচ্য।

মহাজ্ঞানের স্বরূপ

গোরক্ষনাথ স্বয়ং ময়নামতী রাণীকে শিশুকালে 'মহাজ্ঞান' দিয়াছিলেন। রাণী মৃত্যুমুখী স্বামীকে বলিলেন—

কিছু জ্ঞান কহি দিনু আড়াই অক্ষর
পৃথিবী টলিলে না যাইবে যমঘর।

কিন্তু স্বামী স্ত্রীর নিকট সে জ্ঞান লাভ করিতে অসম্মত হইলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর পুত্র গোপীচন্দ্রের অষ্টাদশ বৎসর বয়সে আয়ুষ্কাল শেষ হইবার লিখন পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য পুত্রকে নানারূপে বুঝাইয়া মাতা হাড়িসিদ্ধার নিকট মহাজ্ঞান লাভ করিতে প্রেরণ করিলেন। প্রসিদ্ধি আছে, নাথসিদ্ধরা সকলেই 'মহাজ্ঞান' লাভ করিয়াছিলেন। এই মহাজ্ঞানের স্বরূপ কি? পূর্ব্বে যে 'যোগযুক্ত জ্ঞানে'র কথা বা যোগীর জ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে তাহাই 'মহাজ্ঞান'—এই জ্ঞান স্বয়ম্ভূত, ইহার অপর নাম 'তারকজ্ঞান'। তারকজ্ঞানকে 'অনৌপদেশিক' বলা হয়, তথাপি বদ্ধজীবের পক্ষে উপদেশের অপেক্ষা আছে। 'যোগসূত্রে' আছে, "তারকং সর্ব্ববিষয়ং সর্ব্বথা বিষয়মক্রমং চেতি তদ্ বিবেকজং জ্ঞানম্" অর্থাৎ বিবেকজ জ্ঞান তারক, সর্ব্ববিষয়, সর্ব্বথাবিষয় ও অক্রম।[৩] তারকজ্ঞান পরিপূর্ণ, ইহা স্বপ্রতিভোৎপন্ন ও অনৌপদেশিক। আগমে যে জ্ঞানকে 'গুরুশাস্ত্রানপেক্ষ'

১। গুরুতত্ত্ব ও সদ্‌গুরু রহস্য, গোপীনাথ কবিরাজ, উত্তরা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০, পৃ ৩৪১

২। শিবসংহিতা ৩।৩৩

৩। পাতঞ্জল দর্শন সূত্র ৩।৫৪

বলে তাহা এই স্বয়মুদ্ভূত জ্ঞানই। এই জ্ঞান দ্বারাও মুক্তিলাভ হয়, গুরুর দীক্ষা দ্বারাও মুক্তিলাভ হয়। 'মহাজ্ঞান' লাভেরও দুইটী প্রকারভেদ আছে, 'স্বাভাবিক' ও 'আম্নায়গত'। যাহা স্বাভাবিক তাহাই বিবেকজ জ্ঞান বা সম্যগ্ জ্ঞান, ইহা অন্তঃকরণ-সম্পাদ্য নহে বলিয়া অতীন্দ্রিয়; ইহা লাভের ফলে শিবৈকঘনরূপে বিশ্বের সাক্ষাৎকার হয়। যাহা আম্নায়গত তাহা বদ্ধজীবের জন্য, কারণ বদ্ধজীবই গুরু ও শাস্ত্রের উপদেশ্য, গুরু দীক্ষাদ্বারা শিষ্যের 'পাশ' ছিন্ন করিলে 'মহাজ্ঞানে'র উদয় সম্ভব হয়, তাহা অন্তঃকরণ-সম্পাদ্য বলিয়া সেন্দ্রিয় স্বাভাবিক জ্ঞান অতীন্দ্রিয় তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

'ত্রিপুরা-রহস্যে' আছে, আরাধনা দ্বারা অন্তর্য্যামিণী দেবীকে প্রসন্ন করিলে তিনিই সাধকের চিত্তরূপ আকাশে বিচাররূপে আবির্ভূতা হন।

রাধিতা পরমা দেবী সম্যক্ তুষ্টা সতী তদা।
বিচাররূপতাং যাতি চিত্তাকাশে রবির্যথা ॥[১]

ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে হৃদয়বাসিনী দেবীকে আরাধনা করিলে তাঁহার কৃপা উপাসকের চিত্তে স্বতঃই উদিত হয়; ইহাই স্বাভাবিক জ্ঞান, বিবেকজ জ্ঞান বা 'মহাজ্ঞান'।

এই 'মহাজ্ঞান'-লাভ যোগদেহে অর্থাৎ 'পক্ব'দেহেই সম্ভব হয়। নাথমতে জ্ঞান অর্থে শাস্ত্রজ্ঞান, মহাজ্ঞান অর্থে জ্ঞান ও যোগের সমন্বয়। "তথা যোগেন রহিতং জ্ঞানং মোক্ষায় নো ভবেৎ জ্ঞানেনৈব বিনা যোগেন ন সিধ্যতি কদাচন"—এইস্থলে জ্ঞান অর্থে শাস্ত্রজ্ঞান নহে, সেই মহাজ্ঞানের কথাই বলা হইয়াছে। জ্ঞানদ্বারা মোক্ষলাভ হয়, এ কথা মিথ্যা নহে, কারণ জ্ঞানরূপ খড়্গদ্বারাই যোগযুদ্ধে জয় হয়। আবার যোগবিহীন জ্ঞানেও মুক্তি নাই, অতএব মোক্ষবিষয়ে জ্ঞান ও যোগের সমন্বয় কর্ত্তব্য বীর্য্যপূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিতে হয়, অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা যোগ-সাধন করিয়াই মোক্ষলাভ করিতে হয়।

যোগাগ্নি ভিন্ন মুক্তিলাভ হয় না, ইহা ব্যতিরেকে জ্ঞান, বৈরাগ্য ও জপাদি মিথ্যা। সপ্তধাতুময় দেহ যোগাগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইলে যোগদেহলাভ হয়। উপনিষদ আত্মা সম্বন্ধে 'অণোরণীয়ান্' 'মহতো মহীয়ান্' প্রভৃতি যে সকল বিশেষণ দিয়াছেন, যোগদেহ বা সিদ্ধদেহ বলিতে তাহাই বুঝায়।

১। ত্রিপুরারহস্য (জ্ঞানখণ্ড), দ্বিতীয় অধ্যায়, শ্লোক ৬৯-৭০।

এইরূপ দেহধারী জীবন্মুক্ত যোগী কর্ত্তব্যহীন, দোষবর্জ্জিত, নির্লেপ, সদাস্বরূপস্থ, তাঁহার জ্ঞান খড়্গস্বরূপ, যোগ তাঁহার পক্ষে যুদ্ধ ও বীর্য্যস্বরূপ এবং মোক্ষলাভই তাঁহার জয়লাভ। যোগবীজ গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে—

জ্ঞানেনৈব হি মোক্ষো হি বাক্যং তেষাম্ভ নান্যথা ॥৬২
সর্ব্বে বদন্তি খড়্গেন জয়ো ভবতি তর্হি কঃ।
বিনা যুদ্ধেন বীর্য্যেণ কথং জয়মবাপ্নুয়াৎ ॥৬৩
তথা যোগেন রহিতং জ্ঞানং মোক্ষায় নো ভবেৎ।
জ্ঞানেনৈব বিনা যোগো ন সিধ্যতি কদাচন ॥৬৪
তস্মাদত্র বরারোহে তয়োর্ভেদো ন বিদ্যতে।
জন্মান্তরৈশ্চ বহুভি র্যোগঃ জ্ঞানেন লভ্যতে ॥৬৫
জ্ঞানন্তু জন্মনৈকেন যোগাদেব প্রজায়তে।
তস্মাৎ যোগাৎ পরতরো নাস্তি মার্গস্তু মোক্ষদঃ ॥৬৬

জ্ঞানীর পক্ষে যোগপ্রাপ্তি বহুজন্মসাপেক্ষ, কিন্তু যোগীর পক্ষে জ্ঞানপ্রাপ্তি একজন্মেই সম্ভব, তাই যোগ হইতে শ্রেষ্ঠতর মুক্তিমার্গ আর নাই। যোগীর পক্ষে জ্ঞানলাভ সামান্য কথা, তাহা এক জন্মেই লভ্য, তাই বলা হইয়াছে, "যোগাৎ পরতরো নাস্তি মার্গস্তু মোক্ষদঃ"। অন্যত্রও আছে—

স্বাধ্যায়াদ্ যোগমাসীত যোগাৎ স্বাধ্যায়মানয়েৎ।
স্বাধ্যায়যোগসম্পত্ত্যা পরমাত্মা প্রকাশতে ॥[১]

যোগবীজ ও যোগশিখোপনিষদে আছে : দেবী প্রশ্ন করিলেন, "বহু জন্মের জ্ঞানদ্বারা যোগপ্রাপ্তি হয়, অথচ একজন্মের যোগদ্বারা জ্ঞানলাভ হইবার কারণ কি?" শঙ্কর তদুত্তরে বলিলেন, "বহুজন্মের জ্ঞানদ্বারা বিচারপূর্ব্বক 'আমি মুক্ত' মনে করিয়া কেহ মুক্ত হয় না, পুরুষ জন্মান্তর-শতান্তে যোগের দ্বারাই মুক্ত হয়, সেইরূপ যোগ সম্পন্ন হইলে পুনঃপুনঃ জন্ম-মৃত্যু ঘটে না।"[২]

জ্ঞানী রূপে যাঁহারা মৃত হন, দেহান্তে তাঁহারা পাপপুণ্যানুযায়ী ফলপ্রাপ্ত হন, সেই সকল যথাবৎ ভোগের পর পুনর্জন্ম হয়। পুণ্যবলে যদি সিদ্ধদের সঙ্গলাভ হয় তবে তিনি যোগী হন ও মোক্ষলাভ করেন।

১। স্বাধ্যায়রত্নম্, যোগভাষ্যস্থ গাথা ২। যোগশিখোপঃ ১।৫৪, ৫৫ ; যোগবীজ ৬৭-৭৯ শ্লোক

গীতায় আছে—

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে।[১]

এখানে যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির পুণ্যকারিগণের প্রাপ্য ব্রহ্মলোকাদি শুভলোক লাভ করিয়া বহুবৎসর বাস করিবার পর সদাচারী ধনিগৃহে জন্মগ্রহণ করার কথা আছে। তাই নাথমার্গে উক্ত হইয়াছে, "জ্ঞানং চ যোগং চ মুমুক্ষুর্দৃঢ়ম্ অভ্যাসেৎ"[২] অর্থাৎ মোক্ষলাভের জন্য 'মহাজ্ঞানে'র আশ্রয়-গ্রহণ কর্ত্তব্য।

যোগ ও যোগাঙ্গ

ইতিপূর্ব্বে যে যোগমাহাত্ম্য বর্ণনা করা হইয়াছে তাহার স্বরূপ নির্ব্বাচন এবং প্রকারভেদ নিরূপণ করা কর্ত্তব্য।

যোগ কি? প্রচলিত মতানুসারে 'যোগ' অর্থে মিশ্রণ, যোগসূত্র অনুসারে 'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ', নাথমার্গের গ্রন্থমতে, যোগ—

যোঽপানপ্রাণয়োর্যোগঃ স্বরজরেতসোস্তথা।
সূর্য্যাচন্দ্রমসোর্যোগো জীবাত্মপরমাত্মনোঃ ॥৮৩
একন্তু দ্বন্দ্বজালস্য সংযোগো যোগ উচ্যতে।[৩]

অতএব তন্ত্রমতে প্রাণঅপান, রজরেত, চন্দ্রসূর্য্য, জীবাত্মাপরমাত্মায় যোগকে যোগ বলে,— ইহাই শিবশক্তির সামরস্য। যোগিযাজ্ঞবল্ক্যে—

জ্ঞানং যোগাত্মকং বিদ্ধি, যোগশ্চাষ্টাঙ্গসংযুতম্।
সংযোগো যোগ ইত্যুক্তো জীবাত্মাপরমাত্মনোঃ ॥[৪]

যোগশিখোপনিষদ মতে যোগ এক, বহু নহে, উহা মহাযোগ নামে প্রসিদ্ধ। মন্ত্র, লয়, হঠ, রাজ তাহার ক্রমমাত্র।

মন্ত্রোলয়োহঠোরাজযোগোঽন্তর্ভূমিকাঃ ক্রমাৎ ॥১২৯
এক এব চতুর্ধায়ং মহাযোগোঽভিধীয়তে।

শিবসংহিতায়—

মন্ত্রযোগো হঠশ্চৈব লয়যোগস্তৃতীয়তঃ।
চতুর্থো রাজযোগঃ স্যাৎ স দ্বিধাভাববর্জ্জিতঃ।[৫]

১। গীতা ৬।৪১ ২। যোগশিখোপনিষৎ ১।১৪
৩। যোগবীজ, শ্লোক ৮৩, যোগশিখোপনিষৎ, শ্লোক ৬৮
৪। যোগিযাজ্ঞবল্ক্য ১।৪৩ ৫। শিবসংহিতা ৫।১৭

যোগ অর্থে এক বস্তুতে অন্যের মিশ্রণ ইত্যাদি সপ্তদশ প্রকার যোগের ভেদ আছে। আবার যোগের চতুষ্পথও আছে—

মন্ত্রযোগলয়শ্চৈব রাজযোগহঠস্তথা।
যোগশ্চতুর্ব্বিধাঃ প্রোক্তা যোগিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥[১]

প্রত্যেক যোগের সহিতই লয়ের সম্বন্ধ আছে, কারণ চিত্তের লয়সাধনই যোগের উদ্দেশ্য। সূর্য্যকিরণে তৃণোপরি অর্ককান্তমণি ধরিলে যেরূপ তৃণ ভস্ম হয়, সেইরূপ কেন্দ্রীকৃত বুদ্ধিতত্ত্বের অগ্রস্থিত সকল দ্রব্যই যোগীর নিকট প্রকাশ্য, অতএব যোগী সর্ব্বজ্ঞ। যোগসাধন দ্বারা যোগী স্বল্পাহারী, শ্বাসপ্রশ্বাসজয়ী ও দীর্ঘজীবী হন। যোগেব ক্রম বর্ণনা (মন্ত্র, হঠ, লয় ও রাজযোগ) অতঃপর বিস্তারিত হইতেছে।

যোগের 'অঙ্গ' কয়টী? পাতঞ্জল মতে যোগের অষ্ট অঙ্গ—
যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি ॥২।২৯।[২]

মার্কণ্ডেয় পাতঞ্জলের ন্যায় যোগাঙ্গ 'অষ্ট' বলিয়াছেন, গোরক্ষমতে যোগাঙ্গ 'ষট্', যথা—

আসনং প্রাণসংরোধঃ প্রত্যাহারশ্চ ধারণা।
ধ্যানং সমাধিরেতানি যোগাঙ্গানি ভবন্তি ষট্ ॥[৩]

(ধ্যানবিন্দু উপনিষদের ৪১ শ্লোক)

যম ও নিয়মকে এখানে যোগভূমিরূপে নিশ্চয় করিয়া অঙ্গমধ্যে ধার্য্য করা হয় নাই। অন্যত্রও ষড়ঙ্গ যোগের কথা আছে, যথা—

প্রত্যাহাবস্তথা ধ্যানং প্রাণায়ামোঽথ ধারণা।
তর্কশ্চৈব সমাধিশ্চ ষড়ঙ্গো যোগ উচ্যতে ॥

(অমৃতনাদ উপনিষৎ শ্লোক ৬)

ইহার মধ্যে আগম-অবিরোধী বাক্যই 'তর্ক'।

আগমস্যাবিরোধেন উহনং তর্ক উচ্যতে ॥ (ঐ ১৭)

যোগিযাজ্ঞবল্ক্যে অষ্টাঙ্গযোগ এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে—

যমশ্চ নিয়মশ্চৈব আসনঞ্চ তথৈব চ।
প্রাণায়ামস্তথা গার্গি প্রত্যাহারশ্চ ধারণা ॥৪৫

১। পাতঞ্জল-দর্শনম্, কালীবর বেদান্তবাগীশ (১৩২৬ সন) এবং অমরৌঘপ্রবোধ (পুঁথি) শ্লোক ৩ দ্রষ্টব্য।

২। পাতঞ্জল-যোগদর্শনম্, হরিহরানন্দ আরণ্য ২।২৯

৩। পাতঞ্জলদর্শনম্, কালীবর বেদান্তবাগীশ, ধ্যানবিন্দু উপ ১।৪১

ধ্যানং সমাধিরেতানি যোগাঙ্গানি বরাননে।

যমশ্চ নিয়মশ্চৈব দশধা সুপ্রকীর্ত্তিতঃ ॥৪৬ (প্রথম অধ্যায়)[১]

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, যোগের এই অষ্টাঙ্গ উত্তরোত্তর এক হইতে অন্যটী উচ্চতর ক্রমের। যোগসূত্রে অষ্টাঙ্গ যোগের চারিটী অঙ্গকে বহিঃসাধন ও চারিটী অঙ্গকে অন্তঃসাধনরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আবার বহিরিন্দ্রিয়ের উপর প্রভাব স্বরূপকে 'যম' ও অন্তরিন্দ্রিয়ের উপর প্রভাব স্বরূপকে 'নিয়ম' বলে। যম ও নিয়ম প্রত্যেকটী বিভিন্ন মতানুসারে দশবিধ বা পঞ্চবিধ।

যোগিযাজ্ঞবল্ক্যের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে (১।৪৯, ২।১) দশবিধ 'যম'—অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য, দয়া, সরলতা, ক্ষমা, ধৃতি, মিতাহার ও শৌচ ; এবং দশবিধ 'নিয়ম'—তপস্যা, সন্তোষ, আস্তিক্য, দান, ঈশ্বরার্চ্চনা, সিদ্ধান্তশ্রবণ, হ্রী, মতি বা বুদ্ধি, জপ ও ব্রতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। হঠযোগপ্রদীপিকাতে জপ ও ব্রত স্থানে তাপসহন ও হোম উল্লিখিত হইয়াছে—এইমাত্র উভয় গ্রন্থে ভেদ। পাতঞ্জলদর্শনে—

অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ

শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মঃ॥ ২।২০,৩২

বর্ণিত হইয়াছে ; অর্থাৎ যম ও নিয়ম প্রত্যেকটী পঞ্চবিধ।

যোগসাধনের 'আসন' কয় প্রকার? ৮৪ লক্ষ প্রকার আসন আছে।[২] তন্মধ্যে উত্তম আসন অষ্ট প্রকার[৩] ও উত্তমোত্তম আসন ত্রিবিধ[৪] সিদ্ধাসন, পদ্মাসন ও স্বস্তিকাসন। মৎস্যেন্দ্র ও গোরক্ষের নামেও আসন প্রচলিত আছে।

সিদ্ধাসন ও পদ্মাসন উভয়ই প্রশস্ত। ইহা দ্বারা যোগসাধন সম্ভব। সর্ব্বদা সিদ্ধাসন অভ্যাস করিলে দ্বিসপ্ততিসহস্র নাড়ীমল বিশোধিত হইয়া থাকে, দ্বাদশবৎসর পর্য্যন্ত অভ্যাসে যোগসিদ্ধি হয়। সিদ্ধাসন আসন মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কারণ সুখকর, মতভেদে ইহার নাম বজ্রাসন, মুক্তাসন বা গুপ্তাসন।

অতঃপর সিদ্ধাসনাদি বর্ণিত হইতেছে—

সিদ্ধাসন—ইহাতে বামপদ নিম্নদিকে, দক্ষিণপদ বামপদের সন্ধিস্থলে

১। যোগিযাজ্ঞবল্ক্য ১।৪৫, ৪৬ ২। গোরক্ষসংহিতা ১।৭

৩। স্বস্তিক, গোমুখ, পদ্ম, বীর, সিংহাসন, ভদ্রাসন, মুক্তাসন ও ময়ূরাসন—যোগিযাজ্ঞবল্ক্য।

৪। যোগিযাজ্ঞবল্ক্যম্ ১।৪৭।

বিন্যস্ত করিয়া হৃদয়ে চিবুক ন্যস্ত করিয়া দেহকে সরল ও নিশ্চল করিয়া বিষয়সমূহ হইতে ইন্দ্রিয়াদি সংযত করিয়া ভ্রূদ্বয়ের মধ্যভাগে দৃষ্টি স্থির করিয়া উপবেশন করা রীতি। ফলাফল—এই আসন দ্বারা চৈতন্যদ্বার মুক্ত হয়, পরমাত্মার উপলব্ধি সহজ হয়, রোগাদি দূর হয় এবং বিনম্রতা বৰ্দ্ধিত হয়।[১]

পদ্মাসন—ইহাতে বাম উরুর উপর দক্ষিণ চরণ এবং দক্ষিণ উরুর উপর বামচরণ স্থাপিত করিয়া হস্তদ্বয় দ্বারা উভয়চরণ দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া হৃদয়দেশে চিবুক স্থাপন করিয়া নাসিকাগ্রে দৃষ্টি স্থির করিয়া উপবেশন করা রীতি। ফলাফল—এই আসনসিদ্ধি দ্বারা ব্যাধি ও বিকার সম্যক্‌রূপে বিনষ্ট হয় এবং ইষ্টসিদ্ধি হয়। পদ্মাসন দ্বিবিধ, কারণ হিন্দু ও বৌদ্ধ পদ্মাসনে কিঞ্চিৎ ভেদ দৃষ্ট হয়। বুদ্ধের পদ্মাসন (বজ্রাসন) মূৰ্ত্তিতে দেখা যায়—দক্ষিণপদ বাহিরের দিকে থাকে ও পদতল বাম উরুর উপর স্থাপিত থাকে, বুদ্ধের হস্তদ্বয় প্রসারিত ও করতলদ্বয় ঊৰ্দ্ধমুখী থাকে।[২] হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত বুদ্ধ-পদ্মাসনে বামপদটী দক্ষিণ পদের উপর দিয়া আড়ভাবে রাখার নিয়ম আছে।[৩]

স্বস্তিকাসন—জানুদ্বয় ও উরুদ্বয়ের মধ্যে পদতলদ্বয় সম্যক্‌ স্থাপন-পূৰ্ব্বক সরলভাবে উপবেশন করাকে স্বস্তিকাসন বলে। দক্ষিণ গুল্‌ফ সীবনের বামপার্শ্বে ও বাম গুল্‌ফ সীবনের দক্ষিণপার্শ্বে রাখিয়া উপবেশনও স্বস্তিকাসন নামে অভিহিত। এই স্বস্তিকাসন সৰ্ব্বপাপনাশক বলিয়া কথিত।

ঘেরণ্ডসংহিতানুসারে[৪] মৎস্যেন্দ্রাসন—

উদরং পশ্চিমাভ্যাসং কৃত্বা তিষ্ঠতি যত্নতঃ।
নম্রাঙ্গবামপদং হি দক্ষজানূপরি ন্যসেৎ।
তত্র যাম্যং কূর্পরঞ্চ যাম্যকরে চ বক্ত্রকম্‌।
ভ্রুবোর্মধ্যে গতাং দৃষ্টিং পীঠং মাৎস্যেন্দ্রমুচ্যতে॥২১

ঘেরণ্ডসংহিতানুসারে[৪] গোরক্ষাসন—

জানূর্ব্বোরন্তরে পাদৌ উত্তানাব্যক্তসংস্থিতৌ।
গুল্‌ফৌ চাচ্ছাদ্য হস্তাভ্যামুত্তানাভ্যাং প্রযত্নতঃ।

১। যোগবিদ্যা, হনুমান্‌জী শর্ম্মা, ৩।১২, কল্যাণযোগাঙ্ক পৃ ৬৬৫।
২। Tibetan Yoga, Evans Wentz p. 182.
৩। যোগিযাজ্ঞবল্ক্য ৩।৩. ৪০, হ—যো—প্র ১।১৯; ঘেরণ্ড সং ২।১২।
৪। ঘেরণ্ডসংহিতা ২।২১, ২২।

কণ্ঠসঙ্কোচনং কৃত্বা নাসাগ্রমবলোকয়েৎ।
গোরক্ষাসনমিত্যাহ যোগিনাং সিদ্ধিকারণম্ ॥২২

বামপদ দক্ষিণ উরুর উপর স্থাপনা করিয়া তদুপরি দক্ষিণ কনুই রাখিয়া, দক্ষিণ হস্তের উপর মুখ রাখিয়া ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া উপবেশন করাকে 'মৎস্যেন্দ্রাসন' বলে। উভয় জানু ও উরু মধ্যে পদদ্বয় উত্তান ও গুপ্তভাবে রাখিয়া দুই হস্তদ্বারা দুইটী গুল্‌ফ আবৃত ও কণ্ঠদেশ সঙ্কুচিত করিয়া নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি স্থাপন করিলে 'গোরক্ষাসন' সিদ্ধ হয়। এই আসন যোগিগণের সিদ্ধিপ্রদ। মৎস্যেন্দ্রাসন-সিদ্ধিতে বীর্য্য বর্দ্ধিত হয়।[১]

হঠযোগপ্রদীপিকাতে যে মৎস্যেন্দ্রাসন বর্ণিত হইয়াছে, উহাতে উপরোক্ত বিবরণ হইতে প্রণালীভেদ দৃষ্ট হয়, যথা—

বামোরুমূলার্পিতদক্ষপাদং জানোর্ব্বহির্ব্বেষ্টিতবামপাদম্।
প্রগৃহ্য তিষ্ঠেৎ পরিবর্ত্তিতাঙ্গঃ শ্রীমৎস্যনাথোদিতমাসনং স্যাৎ।[২]

প্রতিদিন এই আসন অভ্যাসের ফলে জঠরাগ্নি প্রদীপ্ত হয়, দুঃসহ প্রচণ্ড রোগসমূহ শীঘ্র বিনাশ পায়, কুণ্ডলিনী অর্থাৎ আধারশক্তির প্রবোধ হয়, কখনও নিদ্রাভাব উপস্থিত হয় না এবং চন্দ্র যে তালুর উপরিভাগস্থিত হইয়া সর্ব্বদা অমৃতক্ষরণ করিতেছেন, তাহার নিবারণ হয়।

ভদ্রাসনং ভবেদেতৎ সর্ব্বব্যাধিবিনাশনম্।
গোরক্ষাসনমিত্যাহুরিদং বৈ সিদ্ধযোগিনঃ।[৩]

সিদ্ধযোগিগণ ভদ্রাসনকেই গোরক্ষাসন বলিয়া থাকেন অর্থাৎ গোরক্ষসম্প্রদায়ের যোগীরা প্রায়শঃ এই আসনে অভ্যস্ত ছিলেন বলিয়া ইহার নাম গোরক্ষাসন হইয়াছে।

আসন সিদ্ধ হইলে 'প্রাণায়াম' সিদ্ধ হয়। প্রাণায়াম কি? শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদই 'প্রাণায়াম' নামে পরিচিত। প্রাণায়াম সম্বন্ধে বৈদিকী ও তান্ত্রিকী ভেদ আছে। হঠযোগের রেচক, পূরক ও কুম্ভক, যোগসূত্রের বাহ্যবৃত্তি, আভ্যন্তরবৃত্তি ও স্তম্ভবৃত্তি নহে।

তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ ॥

পাতঞ্জলদর্শন ২।৪৯

১। যোগবিদ্যা, কল্যাণ যোগাঙ্ক পৃ ৬৬৭। ২। হ যো প্র ১।২৬।
৩। হ. যো. প্র ১।৫৪, ৫৫।

অর্থাৎ তাহা (আসন জয়) হইলে শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদ হয়, তাহাই প্রাণায়াম। প্রশ্বাস ফেলিয়া অগ্রহণ 'বাহ্যবৃত্তি,' শ্বাসগ্রহণ করিয়া ধারণ 'আভ্যন্তরবৃত্তি', রেচন বা পূরণ না করিয়া হঠাৎ বায়ুরুদ্ধ করার নাম 'স্তম্ভবৃত্তি'। হৃদয়াদি প্রদেশে ইহাদের আচরণে অস্থৈর্য্য ও জড়তারূপ রাজস ও তামস ভাব দূর হয়।[১]

প্রাণাপানসমাযোগ্যপ্রাণায়াম ইতীরিতঃ।
প্রাণায়াম ইতি প্রোক্তো রেচকপূরককুম্ভকৈঃ ॥ ৬।২
বর্ণত্রয়াত্মিকা হ্যেতে রেচকপূরককুম্ভকাঃ।
য এব প্রণবঃ প্রোক্তঃ প্রাণায়ামশ্চ তন্ময়ঃ ॥ ৬।৩[২]

অর্থাৎ প্রাণ ও অপান বায়ুর সংযোগই প্রাণায়াম বলিয়া অভিহিত। রেচক, পূরক ও কুম্ভক দ্বারা এই প্রাণায়াম সম্পাদিত হয়। এই রেচক, পূরক ও কুম্ভক (যথাক্রমে অ, উ, ম) এই ত্রিবর্ণাত্মক সুতরাং এই প্রাণায়ামই প্রণবাত্মক। যত্নবিশেষ দ্বারা প্রাণবায়ুকে গ্রহণ করার নাম পূরক, জালন্ধরাদি বন্ধ অবলম্বন দ্বারা সেই পূরিত বায়ুর নিরোধই কুম্ভক ও যত্নবিশেষ দ্বারা সেই কুম্ভিত বায়ুর অপসারণ তাহাই রেচক (হ-যো-প্র ২।৭ টীকা)।

উপরোক্ত রেচক, পূরক ও কুম্ভকই 'ত্রিবিধ' প্রাণায়াম নামে অভিহিত হয়। প্রাণায়াম দ্বারা প্রত্যাহার সুকর হয়। সেই 'প্রত্যাহার' কি? "স্ববিষয়াসম্প্রয়োগে চিত্তস্য স্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ"।[৩] অর্থাৎ স্ব স্ব বিষয়ে অসংযুক্ত হইলে ইন্দ্রিয়গণের যে চিত্তের স্বরূপানুকার তাহাই প্রত্যাহার। স্বরূপানুকার অর্থে চিত্ত-নিরোধে ইন্দ্রিয়গণও নিরুদ্ধ হয়।

প্রত্যাহার পঞ্চবিধ (যোগিযাজ্ঞবল্ক্য ১।৪৭, ৪৮) পঞ্চ-ইন্দ্রিয়যুক্ত বিষয় হইতে চিত্ত নিরুদ্ধ করিলে—অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ হইতে ইন্দ্রিয়গণকে বিযুক্ত করিলে পঞ্চবিধ প্রত্যাহার সাধিত হয়। যোগী ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রত্যাহার সাধন করিতে পারেন, প্রাণায়াম এরূপ রোধের পক্ষে সহায়। ভাবনা দ্বারাও প্রত্যাহার সম্ভব।

অতঃপর **ধারণা**। যোগিযাজ্ঞবল্ক্যে—

যমাদিগুণযুক্তস্য মনসঃ স্থিতিরাত্মনি।
ধারণেত্যুচ্যতে সদ্ভিঃ শাস্ত্রতাৎপর্য্যবেদিভিঃ ॥[৪]

১। পাতঞ্জলযোগদর্শনম্ ২।৫০ টীকা, শ্রীমদ্ হরিহরানন্দ।
২। যোগিযাজ্ঞবল্ক্যম্ ৬।২, ৩
৩। পাতঞ্জলযোগদর্শনম্ ২।৫৪
৪। যোগিযাজ্ঞবল্ক্যম্ ৮।২

অর্থাৎ যমাদিগুণসম্পন্ন ব্যক্তির আত্মাতে যে মনের স্থিতি, শাস্ত্রতাৎপর্য্যবেদী সাধুগণ তাহাকেই 'ধারণা' বলিয়া কীর্ত্তন করেন। ধারণা পঞ্চবিধ – ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম; এই তত্ত্বপঞ্চকে পঞ্চদেবের ধারণা করিতে হয়, সুতরাং ধারণা পঞ্চবিধ। পাদদেশ হইতে জানুস্থান ক্ষিতিস্থান, জানু হইতে পায়ু পর্য্যন্ত জলের স্থান, পায়ু হইতে হৃদয়দেশ পর্য্যন্ত অগ্নির স্থান, হৃদয়মধ্য হইতে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যদেশ পর্য্যন্ত বায়ুস্থান এবং ভ্রূমধ্য হইতে মস্তক পর্য্যন্ত আকাশস্থান বলিয়া কথিত। (যোগিযাজ্ঞবল্ক্য — ৮।৬-৮)

যে স্থানে ধারণা করা হইয়াছে, সেই স্থানে জ্ঞানবৃত্তির যে একতান তাহাই **ধ্যান**। তৈলধারা একতানপ্রবাহের বা ধ্যানের উপমা, বিন্দু বিন্দু জলধারা ধারণার উপমা।

ধ্যানই বন্ধমোক্ষের কারণ। মনে মনে আত্মার স্বরূপচিন্তাও ধ্যান। ধ্যান ষোড়শবিধ। প্রধানতঃ ধ্যান সগুণ ও নির্গুণ ভেদে দ্বিবিধ, নির্গুণ ধ্যান একপ্রকার, সগুণ ধ্যান মধ্যে তিনটী মুখ্যতম।[১]

সমাধি কি ? --ধ্যান পরিপক্ব হইলে যখন কেবল ধ্যেয় বিষয়মাত্র জ্ঞানগোচর থাকে, স্বরূপেরও বিস্মৃতি ঘটিয়া যে চরম চিত্তস্থৈর্য্য হয়, তাহার নাম সমাধি।

সমাধিঃ সমতাবস্থা জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।
ব্রহ্মণ্যেব স্থিতির্যা সা সমাধিঃ প্রত্যগাত্মনঃ ॥[২]

জীবাত্মা-পরমাত্মার সমভাবাবস্থাই সমাধি। ব্রহ্মপদার্থে জীবাত্মার স্থিতিও তাহাই।

প্রাণায়ামাৎ লাঘবঞ্চ ধ্যানাৎ প্রত্যক্ষমাত্মনি।
সমাধিনো নির্লিপ্তত্বং মুক্তিরেব ন সংশয়ঃ ॥ ৪।৮

—গোরক্ষসংহিতা।

প্রাণায়ামের দ্বারা লঘুতা, ধ্যান দ্বারা আত্মপ্রত্যক্ষ, সমাধি দ্বারা নির্লিপ্তত্ব সাধন করিতে হইবে, আসন-অভ্যাস দ্বারা চাঞ্চল্য দূর করিতে হইবে, মুদ্রার অভ্যাস দ্বারা স্থিরতা, ও প্রত্যাহারের দ্বারা ধীরতা সিদ্ধ হইবে, ইহার সহিত ষট্‌কর্ম্ম সাধন দ্বারা দেহ শোধন করিতে পারিলে

১। যোগিযাজ্ঞবল্ক্যম্ ৯।২-৩ ২। যোগিযাজ্ঞবল্ক্যম্ ১০।২

যোগীর সপ্তসাধন সিদ্ধ হইবে ও যোগীমুক্তির অধিকারী হইবেন।[১]

গোরক্ষসম্প্রদায়ে শোধন, স্থিরতা, ধৈর্য্য, লঘুত্ব, দৃঢ়তা, প্রত্যক্ষ ও নির্লিপ্তত্ব এই সপ্তপ্রকার দৈহিক সাধন দ্বারা দেহবিশুদ্ধিক্রিয়াকে 'সপ্তসাধন' বলা হইয়াছে।[২]

সমাধি ও সমাধিস্থ যোগীর লক্ষণ এইরূপও করা হইয়াছে—

সমাধিঃ সমতাবস্থা জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।
নিস্তরঙ্গপদপ্রাপ্তিঃ পরমানন্দরূপিণী ॥
নিশ্বাসোচ্ছ্বাসমুক্তো বা নিঃস্পন্দোঽচললোচনঃ।
শিবধ্যায়ী সুলীনশ্চ স সমাধিস্থ উচ্যতে ॥
ন শৃণোতি যদা কিঞ্চিৎ ন পশ্যতি ন জিঘ্রতি।
ন চ স্পর্শং বিজানাতি স সমাধিস্থ উচ্যতে ॥[৩]

যোগের বিভিন্ন অঙ্গের ব্যাখ্যা সংক্ষেপতঃ দেওয়া হইল, এখন যোগের প্রধান চারিটী ভেদ বা পথ বর্ণন আবশ্যক। রাজযোগই যোগমধ্যে উত্তমোত্তম, তথাপি মন্ত্র, লয়, হঠ প্রভৃতিরও স্ব স্ব গুরুত্ব আছে। অতএব চতুর্ব্বিধ যোগের ব্যাখ্যা অতি সংক্ষেপে দেওয়া যাইতেছে। নাথমার্গে হঠযোগের বিশিষ্ট স্থান আছে, ইহাকে রাজযোগে আরোহণ করিবার সোপান-স্বরূপ বিবেচনা করা হয়; অতএব হঠ ও রাজযোগের সম্বন্ধ-বিচারও করা হইতেছে। নাথমার্গের লক্ষ্যও 'উন্মনী' অবস্থাপ্রাপ্তি, উহা রাজযোগের চরম পরিণতি, তথাপি সিদ্ধরা হঠযোগের আশ্রয়েই উক্ত পদপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করিতেন।

মন্ত্রযোগ

নাথসিদ্ধ-সম্প্রদায়ের সাধনমার্গে প্রণব-জপের একটী বিশিষ্ট স্থান আছে। প্রণবাদি শব্দ দ্বারা মন্ত্রচেতনা হইলে জীবের যে ঊর্দ্ধগতি হয় ও শব্দাতীত পরমানন্দ-ধামে জীব উপনীত হয়, তাহাকেই 'মন্ত্রযোগ' বা জপযোগ বলে। বৈখরী শব্দ হইতে ক্রমশঃ মধ্যমা অবস্থা ভেদ করিয়া পশ্যন্তীতে প্রবেশ করা মন্ত্রযোগের প্রধান উদ্দেশ্য। পশ্যন্তী শব্দ স্বপ্রকাশমান, চিদানন্দময়, চিদাত্মক পুরুষের উহাই অক্ষয় ও অমর ষোড়শী কলা।

১। ষট্‌কর্ম্মণা শোধনাচ্চ আসনেন ভবেদ্ দৃঢ়ং।
মুদ্রয়া স্থিরতা চৈব প্রত্যাহারেণ ধীরতা। গোরক্ষসংহিতা ৪।৭

২। গোরক্ষসংহিতা ৪।৬ ৩। পাতঞ্জলদর্শনম্, কালীবর বেদান্তবাগীশ।

শব্দচৈতন্য, আত্মজ্ঞান বা ইষ্টদেবতার সাক্ষাৎকার একই কথা। এই অবস্থায় উপনীত জীব কৃতকৃত্যতা লাভ করে, তৎপরে যে অব্যক্তভাব স্বতঃই উদিত হয়, তাহাই শব্দের তুরীয়াবস্থা। জাগতিক কেন্দ্রে যে শব্দ বর্ত্তমান আছে, তাহার স্রোতই মূলাধার হইতে নিরন্তর উর্দ্ধমুখী হইয়া উঠিতেছে, বহির্মুখী জীব সে বিষয়ে অজ্ঞ। কোন ক্রিয়াকৌশল দ্বারা যখন ইন্দ্রিয় রুদ্ধ ও প্রাণমন স্তম্ভিত হয়, তখন জীব এই চেতনশব্দের সন্ধান পায়। ষণ্মুখী মুদ্রা দ্বারা এই নাদানুসন্ধান করা যায়। অভিঘাত-জনিত শব্দকে অনাহদ-নাদে লীন করিতে পারিলে মন্ত্র অক্ষরসমষ্টিমাত্র-রূপে থাকিয়া যায়, উহার সামর্থ্য ও প্রকাশ অনুভবগম্য থাকে না। ইড়াপিঙ্গলার গতি রুদ্ধ করিয়া প্রাণ ও মনকে সুষুম্নাতে প্রবেশ করাইতে পারিলে এই নিত্য সারস্বত স্রোত অনুভূত হয়। সাধক ইহার সাহায্যে আজ্ঞাচক্র ও তৎপরে বিন্দুস্থান ভেদ করিয়া সহস্রারে মহাবিন্দুতে উপনীত হন, তখন জীবের 'হংস' মন্ত্রই গুরুকৃপায় 'সোহং' মন্ত্রে পরিণত হয় ; ইহাই মন্ত্রযোগ সমাধি বা মহাভাব সমাধি।[১]

মন্ত্রযোগের সিদ্ধান্ত এই যে, পরমাত্মা হইতে ভাব, ভাব হইতে নামরূপ ও তাহার বিকার এবং বিলাসময় সংসার উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব ইহার বিপরীত মার্গে সাধন করিলে লয়প্রাপ্তি হইবেই। যে ভূমিতে মনুষ্য পতিত হয়, তাহার সাহায্যেই সে পুনরুত্থান করে, সেইরূপ নামরূপের আশ্রয়ে ক্রমশঃ ভাব ও ভাবগ্রাহী পরমাত্মাতে চিত্তবৃত্তির লয় হইলে মুক্তি সম্ভব হইবে।[২]

মন্ত্রযোগের সাহায্যে মূর্ত্তিপূজা ও পীঠবিজ্ঞান সিদ্ধ হয়। উহার সাধনপ্রণালী ষোড়শাঙ্গ-বিশিষ্ট ; যথা—ভক্তি, শুদ্ধি, আসন, প্রাণ-ক্রিয়া, মুদ্রা, তর্পণ, হবন, বলি, ইষ্টমন্ত্রাদি পঞ্চাঙ্গসেবন, দিব্যদেশ-সেবন, আচার, ধারণা, যাগ (অন্তর্যাগ ও বহির্যাগ), জপ, ধ্যান ও সমাধি।[৩]

মন্ত্র ও হঠযোগের সম্বন্ধ এইরূপ,-- মন্ত্রযোগে যেরূপ ভাবপূর্ণ স্থূল ধ্যানের বিধি আছে, হঠযোগে সেইরূপ জ্যোতির্ধ্যান আছে। মন্ত্রযোগে অন্তরজগতে দেবদেবীর ধ্যান বিধি আছে, হঠযোগে জ্যোতি রূপে সেই

১। যোগকা বিষয় পরিচয়, ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ, কল্যাণ যোগাঙ্ক পৃঃ ৫১

২। যোগচতুষ্টয়, কল্যাণ সাধনাঙ্ক ১ম খণ্ড পৃঃ ১৩০, ১৩১

৩। মন্ত্রযোগকে অঙ্গ, শ্রীরামেশ্বর প্রসাদজী বকীল, কল্যাণ যোগাঙ্ক, পৃঃ ৩৩৪ ইত্যাদি

ধ্যানের বিধি আছে। মন্ত্রযোগে নামরূপ দ্বারা লয়সাধন হয়, হঠযোগে বায়ুনিরোধে সমাধিলাভ বিধি। মন্ত্রযোগের সমাধিকে মহাভাব সমাধি ও হঠযোগের সমাধিকে মহাবোধ সমাধি বলা হয়।

জীব অহরহঃ শ্বাসপ্রশ্বাসের সহিত 'হংস' মন্ত্র জপ করিতেছে, সেই মন্ত্রই গুরুকৃপায় প্রাণের বিপরীত ভাবাপন্ন অবস্থাতে কিরূপে 'সোহং' মন্ত্রে পরিণত হইতেছে তাহার বিবরণ 'সদ্‌গুরুবাণী'তে নিম্নরূপে বর্ণিত হইয়াছে ঃ—

কর্ম্মের সহিত ক্রিয়াশক্তির দ্বারা যে যোগ স্থাপিত হয় তাহা কর্ম্মযোগ। চেতনশক্তিতে বা প্রাণে ক্রিয়াশক্তি আছে, জড়ে তাহা নাই। যোগসূত্রে আছে, "প্রচ্ছর্দ্দন বিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য" ; এই প্রাণ কি ? কাশীখণ্ডে—

ষট্‌ত্রিংশদঙ্গুলো হংসঃ প্রয়াণং কুরুতে বহিঃ।
সব্যাপসব্যমার্গেণ প্রয়াণাৎ প্রাণ উচ্যতে॥

হংসপ্রবাহ নাভিচক্র হইতে মায়াচক্র (আজ্ঞার নিম্নস্থ চক্র) পর্য্যন্ত বিদ্যমান, ইহাতে সত্ত্বগুণাত্মক চৈতন্য ঈশ্বরের বাস, এই হংসপ্রবাহের সহিত জীবের সম্বন্ধ হওয়া কর্ত্তব্য, কিন্তু 'অপানং কর্ষতি প্রাণং প্রাণোঽপানং চ কর্ষতি' ; অতএব জীব নাভির ঊর্দ্ধে উঠিতে সক্ষম হয় না, তাহার ঈশ্বরবোধও হয় না।

প্রথম দীক্ষাতে—প্রাণাপানের গতির সমতা সাধন করিয়া এক 'হংস'প্রবাহে পরিণত করা হয়, ইহার নাম 'কর্ম্মযোগ'। ক্রিয়ার সময়ে নাসিকাদ্বারে বায়ু বাহিরে আসে না, রোধেরও প্রয়োজন হয় না, ইহাই মুখ্যসাধনা। দীক্ষিতের সুষুপ্তি হয় না, নিত্যানিত্য বস্তুর বিচার জন্মে।

দ্বিতীয় দীক্ষাতে—নাভিভেদ হইলে জীব 'হংস'মন্ত্র উচ্চারণ করে, তখন জীবের হংস শব্দের সহিত ঊর্দ্ধাধঃ গতি হয় ; যোগসূত্রে ইহাকেই বিতর্কাবস্থা বলা হইয়াছে, ইহাতে জ্ঞানশূন্য ভক্তি হয়।

তৃতীয় দীক্ষাতে—অভ্যাসফলে মায়াচক্রভেদ হইয়া 'হংস'প্রবাহ রুদ্ধ হইয়া, 'সোহং' প্রবাহে পরিণত হয়। অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ চৈতন্যের সহিত সাধকের যোগ হয়, ইহাই 'জ্ঞানযোগ' ; গীতাতে ইহাকেই "সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং" বলা হইয়াছে।[১]

ভৃগু, কশ্যপ, প্রচেতা, দধীচি, ঔর্ব্ব, জমদগ্নি, বাল্মীকি, গর্গ প্রভৃতি

১। সদ্‌গুরুবাণী (হিন্দী), রামমূর্ত্তি শর্ম্মা রচিত ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

মন্ত্রযোগের উপদেষ্টা। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ইহার অনুষ্ঠান ও ফলাফল বর্ণিত আছে। সাধারণ শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিই কিরূপে জীবকে শিব করিতে পারে, 'মন্ত্রযোগ' তাহার উৎকৃষ্টতম নিদর্শন। মন্ত্রযোগ-সাধনে কোন বিশেষ বাহ্য নিয়মাদি নাই, কারণ ইহা মানসিক যোগ। বৈদিক যুগে মন্ত্রের দ্বারাই যুদ্ধে জয়লাভ, আকাঙ্ক্ষিত বৃষ্টি ও শস্যলাভ প্রভৃতি সাধিত হইত। সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়েই স্বরশক্তির ক্রিয়া স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়াই বিভিন্ন মন্ত্র দ্বারা পূজা বা উপাসনার বিধি নির্ণীত হইয়াছে। মন্ত্রজপ দ্বারা সিদ্ধিলাভ হয় -"জপাৎ সিদ্ধিঃ" ইহাও সাধকগণ জানেন। কিন্তু আগম উপদেশ দিয়াছেন, "শক্তিযুক্তো জপেন্মন্ত্রং ন মন্ত্রং কেবলং জপেৎ।"[১] অর্থাৎ কুণ্ডলিনীরূপ স্বরশক্তির সংযোগে মন্ত্রজপ করাই বিধি, কেবল অক্ষরমাত্রের আবৃত্তি দ্বারা মন্ত্রজপ হয় না। এখনকার প্রচলিত দীক্ষা মান্ত্রী-দীক্ষা, অর্থাৎ ইহাতে গুরু দ্বারা প্রদত্ত মন্ত্র দ্বারা দেবতার অর্চ্চনা বিধি, ইহাতে কুণ্ডলিনীকে প্রবুদ্ধ করিবার কোন বিধি নাই। মন্ত্রযোগ দ্বারাই সাধকের নাদানুভূতি হয়, তাহা নাদ ও নাদানুসন্ধান অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

হঠযোগ

হঠযোগের আদি প্রবর্ত্তক আদিনাথ বা শিব হঠযোগীদের এই মত সম্মত।

দ্বিধা হঠঃ স্যাদেকস্তু গোরক্ষাদিসুসাধকৈঃ।
অন্যো মৃকণ্ড-পুত্রাদৈঃ সাধিতো হঠসংজ্ঞকঃ॥

(পাতঞ্জলদর্শনম্—কালীবর)

মার্কণ্ডেয়, ভরদ্বাজ, মরীচি, জৈমিনি, পরাশর, ভৃগু, বিশ্বামিত্র প্রভৃতির কৃপায় এই যোগের বিস্তার সাধিত হয়। তৎপরে গোরক্ষ, মৎস্যেন্দ্র, চর্পটী, জলন্ধর, কনেড়ী, চতুরঙ্গী, বিচারনাথ প্রভৃতি নাথ-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক ইহা অনুষ্ঠিত হয়, এবং তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ গোরক্ষসংহিতা, গোরক্ষশতক, সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতি, সিদ্ধসিদ্ধান্তসংগ্রহ, গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহ, অমনস্ক, যোগবীজ, হঠযোগপ্রদীপিকা, হঠতত্ত্বকৌমুদী, ঘেরণ্ডসংহিতা, নিরঞ্জনপুরাণ ইত্যাদিতে হঠতত্ত্ব আলোচিত হয়।

১। মন্ত্রযোগ, অবধূত জ্ঞানানন্দ, ভূমিকা.

হঠযোগের অষ্টাঙ্গ, ষড়ঙ্গ ও চতুরঙ্গ ভেদ আছে। সাধারণতঃ "যম-নিয়মাসনপ্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যানসমাধিয়োঽষ্টাবঙ্গানি" প্রচলিত মত যোগতত্ত্ব উপনিষদ্ ইত্যাদিতে দেখা যায়। মহাভারতেও আছে "বেদেষু চাষ্টগুণিনং যোগমাহুর্মনীষিণঃ।" গোরক্ষ-উপদিষ্ট হঠযোগের 'ষট্ অঙ্গ' বলা হয়, যম ও নিয়মকে ভূমিস্বরূপ ধরিয়া লইয়া আসন, প্রাণায়াম ইত্যাদিকে 'ষড়ঙ্গ' বলা হইয়াছে। হঠযোগপ্রদীপিকাতে 'চতুরঙ্গ' যোগ বিষয় আছে, -তাহারা যথাক্রমে আসন, প্রাণায়াম বা কুম্ভক, মুদ্রা বা করণ ও নাদানুসন্ধান। প্রত্যাহারাদি সমাধি পর্য্যন্ত নাদানুসন্ধানেব অন্তর্ভূ্ত।[১]

"আসনেন রজো হন্তি" ইহা সিদ্ধান্ত যোগিসম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ উক্তি অর্থাৎ দীর্ঘকাল আসনের অভ্যাস দ্বারা রজোগুণ জনিত দৈহিক চাঞ্চল্য দূর হয়, যোগের বিঘ্নস্বরূপ যোগাদিও বিনষ্ট হয়। "কুর্য্যাত্তদাসনস্থৈর্য্যমারোগ্যং চাঙ্গলাঘবম্।"[২] আসন অভ্যাস দ্বারা দেহের লঘুতা সম্পন্ন হইয়া তমোগুণ দূরীভূত হয় ও দেহে সাত্ত্বিক তেজের উদয় হয়। পাতঞ্জল সূত্রেও রোগের দ্বারা চিত্ত বিক্ষেপের উল্লেখ আছে। অঙ্গের গুরুতা থাকিলে তপোবিঘ্ন ঘটে। বারম্বার আসন অভ্যাস দ্বারা প্রাণায়াম বা কুম্ভক সহজ-সাধ্য হয়। সাত্মারাম বলিয়াছেন যে, কুম্ভক দ্বারা প্রাণের গতি রুদ্ধ হইলে চিত্ত নিরালম্ব হয়। টীকাকার ব্রহ্মানন্দও বলিয়াছেন যে, সম্প্রজ্ঞাত সমাধির পর ব্রহ্মাকার-স্থিতির উদয় হয়, সেই সময়ে পরবৈরাগ্য অবলম্বনে চিত্তকে সম্যক্ রুদ্ধ করিতে হয়। কিন্তু প্রাণায়াম সহজ হইলেও নাড়ী-চক্রাদি অশুদ্ধ থাকা কালীন সুষুম্না-দ্বারে বায়ুর প্রবেশলাভ ও উন্মনী অবস্থাপ্রাপ্তি বাতুলতা মাত্র। শাণ্ডিল্য উপনিষদাদিতে[৩] নাড়ীশোধন ব্যাপারের নিমিত্ত ৪৩ দিন হইতে আরম্ভ করিয়া এক বৎসর কাল পর্য্যন্ত সাধন আবশ্যক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। প্রাণায়াম সাহায্যেই এই শোধন সম্পূর্ণ হয়। যখন দৈহিক কৃশতা, কান্তি, ইচ্ছানুসারে বায়ুধারণ-সামর্থ্য, অগ্নিবৃদ্ধি, নাদের অভিব্যক্তি ও আরোগ্য সাধকে দর্শায়, তখন নাড়ীশুদ্ধি সম্পূর্ণ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। কৃশতা স্থলে শাণ্ডিল্য উপনিষদে লঘুতা, যোগতত্ত্ব উপনিষদে কৃশতা ও লঘুতা, শিবসংহিতা মতে দেহে সাম্য, সুগন্ধি

১। হ-যো-প্র ১।৫৬, ৫৭, ৪।৮৯ ২। হ-যো-প্র ১।১৭

৩। শাণ্ডিল্য উপনিষদ ৫।৩, ত্রিচতুস্ত্রিচতুঃসপ্তত্তি চতুর্মাসপর্য্যন্তং ত্রিসংধিষু তদন্তরালেষু চ ষট্কৃত্ব আচরেন্নাড়ীশুদ্ধির্ভবতি। ততঃ শরীরে লঘূদীপ্তিবহ্নি বৃদ্ধিনাদাভিব্যক্তির্ভবতি।

ও কান্তির আভা প্রস্ফুটিত হওয়া এবং কণ্ঠস্বরে মাধুর্য্যের কথা বর্ণিত হইয়াছে।

শরীরলঘুতা দীপ্তির্জঠরাগ্নিবিবর্দ্ধনম্। কৃশত্বং চ শবীরস্য তদা জায়তে নিশ্চিতম্।[১] বপুষঃ কান্তিরুৎকৃষ্টা জঠরাগ্নিবিবর্দ্ধনম্। আরোগ্যঞ্চ পটুত্বঞ্চ করণানাঞ্চ জায়তে।[২] ইত্যাদি

যম, নিয়ম ও আসন যথাযথভাবে সিদ্ধ না হইলে যথার্থরূপে প্রাণায়াম-সাধন সম্ভব হয় না; অতএব ঐ অবস্থায় নাড়ীশুদ্ধিব চেষ্টা অকর্ত্তব্য। বায়ু, পিত্ত ও কফ দোষাদি যুক্ত সাধকের 'ষট্‌কর্ম্ম' সাধনের প্রয়োজনীয়তা আছে, ষট্‌কর্ম্ম সাধনেব জন্য স্থান, আহার, আচারবিচার পালন কর্ত্তব্য। নিরাপদ স্থান, সাত্ত্বিক আহার, বৈরাগ্যাদি পালনই বিধি।

ধৌতির্ব্বস্তিস্তথা নেতি ত্রাটকং নৌলিকং তথা।
কপালভাতিশ্চৈতানি ষট্‌কর্ম্মাণি প্রচক্ষতে ॥[৩]

ধৌতি —মুখ দিয়া উদর-মধ্যে নূতন বস্ত্রখণ্ড প্রবেশ দ্বাবা উদ্‌গিবণ; ইহা দ্বারা শ্বাসকুষ্ঠাদি দূব হয়। (পাশ্চাত্যেও নল-ব্যবহার-বীতি আছে।)

বস্তি—গুহ্যদ্বারে নল-সাহায্যে জলাকর্ষণ ও ত্যাগ; প্লীহা, বাতপিত্তাদি দূর হয়।

নেতি—নাসারন্ধ্র দ্বারা জল আকর্ষণ ও নিষ্ক্রামণ; কপাল ও নাসিকার মল রহিত হয়।

ত্রাটক—নিশ্চল নয়নে সূক্ষ্মবস্তু দর্শন। ইহা দ্বারা নেত্ররোগ বিনাশ হয়, আলস্য ও তন্দ্রা দূব হয়, বশীকরণ-শক্তি হয়। হঠযোগ গ্রন্থে ত্রাটকের ভেদ বর্ণিত হয় নাই, কেবল অশ্রুপাত না হওয়া পর্য্যন্ত একদৃষ্টে চাহিয়া থাকাকে মৎস্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতি আচার্য্যগণ ত্রাটক কর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (২।৩১ হ-যো-প্র টীকা)। মণ্ডলব্রাহ্মণ্য উপনিষদে ও তিব্বতীয় লামাদের সাধনে ত্রাটকের আন্তর, বাহ্য ও মধ্য ভেদ বর্ণিত হইয়াছে। ভ্রূমধ্যে ধ্যানই 'আন্তর ত্রাটকে'র উদাহরণ। চন্দ্র-নক্ষত্রাদি দূরস্থিত বস্তু লক্ষ্য করিয়া ত্রাটককে 'বাহ্য ত্রাটক' বলে। সূর্য্যে ত্রাটক নিষিদ্ধ, তাহাতে নেত্রদোষ হয়, জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্বে ত্রাটক করা যাইতে পারে। কাগজে বা প্রাচীর-গাত্রে বিন্দু ও দেবমূর্ত্তি

১। যোগতত্ত্বোপনিষৎ ১।৪৫, ৪৬ ২। শিবসংহিতা ৫।৯৩, ৫।৫৮ বায়ুসিদ্ধি
৩। হ-যো-প্র ২।২২, গোরক্ষসংহিতা ৪।৯, ধৌতির্ব্বস্তিস্তথা নেতি ইত্যাদি পাঠান্তর।

ইত্যাদি অঙ্কিত করিয়া ত্রাটককে 'মধ্য ত্রাটক' বলে। দীপশিখা, নাসিকাগ্র, ধাতুমূর্ত্তি প্রভৃতি লক্ষ্য করিলেও হয়। অধিকারিভেদে এই ত্রিবিধ ত্রাটকের সাধনবিধি আছে। তিব্বতীয় যোগে কোন বৃহৎ বস্তুর দিকে লক্ষ্য করিতে করিতে ক্রমশঃ তাহার একটী মাত্র অংশে মনঃসংযোগ দ্বারা ত্রাটক বিধি আছে। যথা—

উপত্যকা-নিম্নে বা পর্ব্বত-গাত্রে বা অন্ধকারে বসিয়া সাধন করিলে একটী দৃশ্য বা মূর্ত্তি চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিবে, ক্রমশঃ উহা একটী বিন্দুমাত্রে পর্য্যবসিত হইবে এবং চিত্তের স্থিরতার সহিত 'বিন্দু'ও স্থির হইবে। গুরু প্রশ্ন করিয়া এইরূপ শিষ্যের মনের একাগ্রতা সাধন কতদূর হইয়াছে তাহা পরীক্ষা করেন। এতৎসহ প্রাণায়াম কর্ত্তব্য। মোমবাতির অগ্রভাগে দৃষ্টিস্থির প্রভৃতি দ্বারাও সাধন প্রচলিত আছে। শ্বেত কাগজে বা দেওয়ালে কৃষ্ণ বিন্দুচিহ্নও কেহ কেহ দিয়া থাকেন।[১]

কপালভাতি—লোহকারের ভস্ত্রার ন্যায় শীঘ্রতার সহিত রেচক ও পূরণ; স্থূলতাহ্রাস ও কফাদি দোষ বিনষ্ট হয়।

যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিমতে একমাত্র প্রাণায়াম দ্বারা সকল মল দূর হইতে পারে, ষট্‌কর্ম্মের কোন আবশ্যকতা তাঁহাদের মতে নাই।

হঠযোগের 'সপ্তসাধন' অর্থে ষট্‌কর্ম্ম ও তৎসহ আসন, মুদ্রা, প্রত্যাহার, প্রাণায়াম, ধ্যান ও সমাধি সাধন। ষট্‌কর্ম্ম একটী সাধন, আসনমুদ্রাদি ছয়টী সাধন, একত্রে উহারা সপ্তসাধন নামে পরিচিত। গোরক্ষসংহিতায় শোধন, দৃঢ়তা ইত্যাদিকে সপ্তসাধন বলা হইয়াছে।

শোধনং দৃঢ়তা চৈব স্থৈর্য্যং ধৈর্য্যঞ্চ লাঘবং।
প্রত্যক্ষঞ্চ নির্লিপ্তত্বং দৈহিকং সপ্তসাধনং॥ (৪।৬ শ্লোক)

মুদ্রা। অতঃপর হঠযোগের 'মুদ্রা' বর্ণন কর্ত্তব্য। আসন ও মুদ্রা অভ্যাস দ্বারা দেহের দৃঢ়তা ও স্থিরতা অভ্যাস হয়, তৎপরে প্রত্যাহার, প্রাণায়াম, ধ্যান, সমাধি দ্বারা আত্মপ্রত্যক্ষ ক্ষমতা জন্মায়, তৎসহ দৈহিক লঘুতা ও ধীরতা প্রাপ্তি হয়। আসন ৩৩ প্রকার—প্রাণায়াম ৮ প্রকার, মুদ্রা ২৫ প্রকার (ঘেরণ্ডসংহিতা দ্রষ্টব্য)। হঠযোগপ্রদীপিকাতে মুদ্রার দশবিধ প্রকারভেদ বর্ণিত হইয়াছে; যথা—

মহামুদ্রা মহাবন্ধো মহাবেধশ্চ খেচরী।
উড্ডানং মূলবন্ধশ্চ বন্ধো জালন্ধরাভিধঃ॥

১। With Mystics & Magicians in Tibet, David Neel, Ch. VII, p 229 ff.

করণী বিপরীতাখ্যা বজ্রোলী শক্তিচালনম্।
ইদং হি মুদ্রাদশকং জরামরণনাশনম্॥ (৩১৬, ৭)

শিবসংহিতায় মহামুদ্রা, মহাবন্ধ, মহাবেধ, খেচরী, জালন্ধর, মূলবন্ধ, বিপরীতকৃতি, উড্ডান, বজ্রোলী, শক্তিচালন এই দশটী মুদ্রাকে উত্তমোত্তম বলা হইয়াছে।[১]

মহামুদ্রা। তিব্বতীয় লামাদের মধ্যে 'মহামুদ্রা' সাধন প্রচলিত আছে। লামা মারপা ভারতে আসিয়া অতীশার নিকট শিক্ষালাভ করেন (অতীশার ১০৫৩ খৃঃ মৃত্যু হয়)। অন্তর্দ্দৃষ্টি লাভের প্রণালীকে ইহারা 'মহামুদ্রা' আখ্যা দেন।[২] ভারতীয় যোগীর পক্ষে মহামুদ্রা একটী মুদ্রা মাত্র, কিন্তু লামাদের নিকট উহা নির্ব্বাণ-লাভের একমাত্র উপায়-স্বরূপ গণ্য।[৩]

আদিনাথ-বর্ণিত মহামুদ্রা সাধন দ্বারা কুণ্ডলী সরল হয়, ইড়া-পিঙ্গলার মরণাবস্থা হয়, অবিদ্যাদি পঞ্চক্লেশ ও শোকমোহাদি দূর হয়, জরামরণ নাশ হয়। বামপদ নিম্নে ও দক্ষিণপদ প্রসারিত করিয়া উপবেশন কবিয়া উভয় হস্তের তর্জ্জনী ব্যতীত অন্যান্য অঙ্গুলী দ্বারা প্রসারিত পদের অঙ্গুষ্ঠ ধারণ ও জালন্ধর বন্ধযোগে কণ্ঠপ্রদেশে বায়ু রুদ্ধ করিয়া সুষুম্নাতে বায়ুধারণ করার নাম 'মহামুদ্রা'। (ঘেরণ্ড-সংহিতা ৩।৬)

মহাবন্ধ ও মহাবেধ। বাম গুল্‌ফ দ্বারা পায়ুমূল নিরোধ করিয়া দক্ষিণপদ দ্বারা সযত্নে বাম গুল্‌ফ আপীড়নপূর্ব্বক জালন্ধর বন্ধ করিয়া বায়ুপূরণ করিয়া যোনিতে আকর্ষণ বা মূলবন্ধ করিয়া মধ্যনাড়ীতে মনঃসংযোগ করাকে 'মহাবন্ধ' বলে।

মহাবন্ধে অবস্থিত হইয়া একাগ্রচিত্তে উভয় নাসাপুটে বায়ুগ্রহণ করিয়া করতলদ্বয় সাহায্যে কটিদেশে মন্দ মন্দ আঘাত করিলে সুষুম্নামধ্যে বায়ু প্রবাহিত হইবে, ইহার নাম 'মহাবেধ'। মহাবেধ বিনা মহামুদ্রা-সাধন নিষ্ফল। সুতরাং যোগী যত্নসহকারে এই তিনটীর (মহামুদ্রা, মহাবন্ধ ও মহাবেধ) অনুষ্ঠান করিবেন। প্রত্যহ চারিবার এই তিনটীর অনুষ্ঠান দ্বারা ছয় মাসের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ী হওয়া যায়।

মুদ্রা-সাধনের ফল। এই মুদ্রাদি সাধনে জরামরণ হয় না, অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি হয়। তন্ত্রে পঞ্চ-মকার মধ্যে মুদ্রাকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে;

১। শিবসংহিতা ৩।২৩, ২৪। ২। Lamaism, Waddell, p. 63 ff.
৩। Milarepa, Evans Wentz, p. 146 fn.

কারণ মুদ্রা দ্বারাই শিবত্বপ্রাপ্তি হয়। তান্ত্রিক সাধনে কেবল ত্যাগের কথাই নাই, ভোগের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ভোগময়ী মনের গতিকে ত্যাগাভিমুখী করাই তান্ত্রিক সাধন। মুদ্রার মধ্যে আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান, সমাধি প্রভৃতি সকল ক্রিয়ার সংমিশ্রণ আছে। অনুভবী ও পারদর্শী গুরুর নিকট মুদ্রা-শিক্ষা কর্ত্তব্য।[১]

আপাতদৃষ্টিতে মুদ্রাসাধন অস্বাভাবিক মনে হইলেও, মনঃস্থৈর্য্যের উহা প্রকৃষ্ট উপায়। শিব স্থির, শক্তি চঞ্চল; শিব ও শক্তির সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য সাধকেব পক্ষে মুদ্রাদি সাধন দ্বারা সম্বন্ধ স্থাপন সহজ। ভোগী মানব এই পবিত্র সাধনকে বাসনা পূরণের সাধনরূপে পরিণত করিয়া লোকচক্ষে ইহাকে দূষণীয় করিয়া তুলিয়াছে। বস্তুতঃ মুদ্রার যথার্থ সাধনে সংযমের পরাকাষ্ঠা আছে।

শাম্ভবীমুদ্রা। এই মুদ্রা সাধন দ্বারা পরমাত্মা দর্শন হয়। ইহা ভ্রূমধ্যস্থলে একাগ্রচিত্তে ধ্যানযোগে পরমাত্মা দর্শনের সাধনা, ইহা কুলবধূর ন্যায় গোপনীয় সাধন। মুদ্রামধ্যে ইহা শ্রেষ্ঠ মুদ্রা (ঘেরণ্ড-সংহিতা ৩।৬৪, ৬৫)। আজ্ঞাচক্রভেদ হইলে মানসক্রিয়ার উপরম হয়, সহস্রার কর্ণিকামধ্যে আবদ্ধ মন নিশ্চল হয়, নিষ্ক্রিয় মন বিলীন হইলে 'অমনস্ক' অবস্থা হয়,—শাম্ভবীমুদ্রার ইহাই পূর্ণ পরিণতি। মন, দৃষ্টি ও বায়ু (প্রাণ) স্থির হইলে আকাশরূপী আত্মচৈতন্য প্রকাশমান থাকে।

অজ্ঞান-সমুদ্র পার হইয়া জ্যোতির্ম্ময় আত্মাকে জানিতে হইবে, "তজ্জ্ঞানপ্লবাধিরূঢ়েন জ্ঞেয়ম্"। ইহাই আন্তর ও বাহ্য লক্ষণ, ইহার মধ্যেই জগৎ লীন হইয়া আছে। ইহা নাদ, বিন্দু ও কলার অতীত অখণ্ডমণ্ডল, ইহা সগুণ ও নির্গুণ স্বরূপ, ইহার বেত্তা মুক্তিলাভ করেন। যোগী সিদ্ধাসনে প্রথমে অগ্নিমণ্ডল, তদুপবি সূর্য্যমণ্ডল, তন্মধ্যে চন্দ্রমণ্ডল, তন্মধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় অখণ্ড ব্রহ্মতেজোমণ্ডল দর্শন করেন, ইহাই শাম্ভবীমুদ্রার বৈশিষ্ট্য। অমা, প্রতিপদ্ ও পূর্ণিমা ভেদে ত্রিবিধ দৃষ্টিভেদ আছে, তাহারা যথাক্রমে নিমীলিত, অর্দ্ধনিমীলিত ও সর্ব্বোন্মীলন দৃষ্টিরূপে খ্যাত। নাসাগ্রে পূর্ণিমা দৃষ্টির অভ্যাস কর্ত্তব্য। "যদা তালুমূলে গাঢ়তমো দৃশ্যতে। তদভ্যাসাদ্ অখণ্ডমণ্ডলাকার জ্যোতির্দৃশ্যতে। তদেব সচ্চিদানন্দং ব্রহ্ম ভবতি। এবং সহজানন্দে যদা মনো লীয়তে

১। 'মুদ্রা', উপেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, যোগাঙ্ক কল্যাণ, পৃঃ ৪৯৪

তদা শাম্ভো ভবী ভবতি। তামেব খেচরীমাহুঃ।[1] তালুমূলে গাঢ় তমঃ তৎপরে জ্যোতির্ম্মণ্ডল দর্শনে সচ্চিদানন্দে এবং সহজানন্দে মনোলয় হইলে 'শাম্ভবী'র উৎপত্তি হয়, ইহাকেই 'খেচরী' বলে।

খেচরীমুদ্রা-স ন্ন যোগীদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রচলিত আছে। শিবসংহিতায় (৪।৫১, ৫২) ইহার বর্ণনা আছে, যথা—

ভ্রুবোরন্তর্গতাং দৃষ্টিং বিধায় সুদৃঢ়াং সুধীঃ।
উপবিশ্যাসনে বজ্রে নানোপদ্রববর্জ্জিতঃ॥
লম্বিকোর্দ্ধস্থিতো গর্ত্তে রসনাং বিপরীতগাম্।
সংযোজয়েৎ প্রযত্নেন সুধাকূপে বিচক্ষণঃ॥
সিদ্ধীনাং জননী হ্যেষা ।

বজ্রাসনে উপবিষ্ট হইয়া ভ্রূমধ্যে নিশ্চল দৃষ্টি স্থাপনপূর্ব্বক বিপরীত-গামিনী জিহ্বাকে লম্বিকার ঊর্দ্ধস্থ গর্ত্তে চালনা করিয়া (ভ্রূমধ্যস্থিত) অমৃতকূপে সংযোজনের ক্রিয়াই খেচরীমুদ্রা সাধন। এই মুদ্রা সকল সিদ্ধির জননীস্বরূপা। ক্ষণমাত্রের সাধনেও ইহলোকে দিব্যভোগ ও জন্মান্তরে সৎকুলে জন্মগ্রহণ হয়। চন্দ্রস্থিত অমৃত পানের জন্য সূর্য্যনাড়ীকে ঊর্দ্ধে ও চন্দ্রনাড়ীকে নিম্নে করিবার জন্য মস্তক ভূপৃষ্ঠে স্থাপিত করিয়া পদদ্বয় ঊর্দ্ধে স্থাপন করিয়া কুম্ভক করিবার প্রথাকে 'বিপরীতকরণী' মুদ্রা বলে।

যোনিমুদ্রা সাধনে ধরাতলে কোন সিদ্ধির অভাব থাকে না, ইহাকে শিবসংহিতায় (৪।৬৭, ৬৫) মূলবন্ধের সহিত যুক্ত বলা হইয়াছে। ঘেরণ্ডসংহিতায় (৩।৩৭-৪৪) যোনিমুদ্রাব বিশেষ বিবরণ ও তৎফল বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাতে ষট্‌চক্র ভাবনা করিয়া কুণ্ডলিনীকে প্রবুদ্ধ করিয়া 'হংস' মন্ত্র দ্বারা শিবশক্তির সামরস্য সাধনে আনন্দ উপলব্ধির কথা বর্ণিত হইয়াছে। ইহা পরম গোপনীয়, দেবগণেরও দুর্ল্লভ। একবার সাধনেই ইহা দ্বারা সিদ্ধিলাভ হয়। ইহা সাধনের ফলে ঘোরতর পাপসমূহও বিনষ্ট হয়, অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তির ইহা সাধন কর্ত্তব্য।

কুম্ভক। চতুরঙ্গ যোগের মধ্যে অষ্টপ্রকার কুম্ভক বা বন্ধ আছে। উন্মনীভাব-সিদ্ধির নিমিত্ত ইহাদের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। ইহার অনুষ্ঠানে প্রাণবায়ু রুদ্ধ হয় বলিয়া ইহার নামান্তর 'বন্ধ'। বন্ধমধ্যে জালন্ধর, মূল ও উড্ডীয়ান বন্ধত্রয় প্রধান। জালন্ধর বন্ধে কণ্ঠ আকুঞ্চন দ্বারা

১। মণ্ডলব্রাহ্মণ উপনিষৎ, দ্বিতীয় ব্রাহ্মণম্ ১।৩, ৪; ১।৮-৮'।

হৃদয়োপরি চিবুক স্থাপন করা বিধি। মূলবন্ধে বামপার্ষিত দ্বারা গুহ্য-প্রদেশ আকুঞ্চন করিয়া নাভিগ্রন্থি সযত্নে মেরুদণ্ডে সংলগ্ন ও পীড়িত করিয়া দক্ষিণগুল্‌ফ দ্বারা উপস্থকে দৃঢ়রূপে সংরুদ্ধ করিতে হয়। নাভির ঊর্দ্ধ ও পশ্চিম দ্বারকে জঠরে সমভাবে আকুঞ্চন করিয়া নিম্নস্থিত নাড়ীসমূহকে নাভির উর্দ্ধে উত্তোলন করার নাম উড্ডীয়ান বন্ধ। বন্ধমধ্যে ইহাই শ্রেষ্ঠ, ইহাতে অভ্যস্ত হইলে মুক্তিলাভ হয়।

ধ্যানবিন্দু উপনিষদে কথিত হইয়াছে সংযমের দ্বারা যোগী কুণ্ডলিনীকে জাগরিত করিতে সক্ষম হন। তৎপরে উক্ত বন্ধত্রয় সাধন বিধি।

জালন্ধরে কৃতে বন্ধে কণ্ঠে সঙ্কোচলক্ষণে।
ন পীযূষং পতত্যগ্নৌ ন চ বায়ুঃ প্রধাবতি।
কপালকুহরে জিহ্বা প্রবিষ্টা বিপরীতগা।
ভ্রূবোরন্তর্গতা দৃষ্টির্মুদ্রা ভবতি খেচরী॥

এই মুদ্রা জরামরণজয়ী। খেচরী মুদ্রার সাধক পতনোন্মুখ বিন্দুকে বজ্রোলী সাধন দ্বারা উর্দ্ধে নীত করিতে পারেন। বিন্দু ও রজের মিলনে পরমবপু লাভ হয়। প্রাণায়াম দ্বারা নাড়ীশুদ্ধি এবং চন্দ্রসূর্য্যের যোগে বাতপিত্তাদি রস শোষিত হইলে মহামুদ্রা সাধন পূর্ণ হয়।[১]

উপরোক্ত বন্ধত্রয়ের কথা যোগকুণ্ডল্যুপনিষদেও বর্ণিত হইয়াছে। কুণ্ডলিনীর জাগরণে 'মূলবন্ধ' সিদ্ধ হয়। "কর্ত্তব্যঃ কুম্ভকো নিত্যং বন্ধত্রয়-সমন্বিতঃ"। কুণ্ডলিনী ত্রিগ্রন্থি (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রগ্রন্থি) ভেদ করিয়া সহস্রারে গমন করে। এইরূপে কুণ্ডলিনী প্রকৃত্যষ্টকরূপং (পঞ্চভূত এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার) ত্যাগ করিয়া শিবের আলিঙ্গনে বিলীন হয়।[২]

মুদ্রা, বন্ধ প্রভৃতির রহস্য কি ? উত্তরে বলিতে হয়—

সৎসঙ্গেন ভবেন্মুক্তিরসৎসঙ্গেষু বন্ধনম্।
অসৎসঙ্গমুদ্রণং যৎ তন্মুদ্রা পরিকীর্ত্তিতম্॥ (বিজয়তন্ত্র)।[৩]

অতএব অসৎসঙ্গ পরিত্যাগই মুদ্রা নামে কীর্ত্তিত, অসৎসঙ্গে যে বন্ধন হয় তাহা পরিত্যাগ কর্ত্তব্য। ধ্যান, সমাধি আদিতেও মুদ্রার সহায়তা অত্যাবশ্যক।

১। ধ্যানবিন্দু উপঃ ৭৮-৯৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

২। যোগকুণ্ডল্যুপনিষৎ ১।৪০-৫৩, ৫৫, ৬৭-৭৩, ৭৪।

৩। অ—ক—থ চক্র, সহস্রার, যুক্তত্রিবেণী, মুদ্রাদিস্বরহস্য ; শিবনারায়ণজী শর্ম্মা সেঙ্গই, কল্যাণ যোগাঙ্ক, পৃ ৬৪৯।

সমাধি। হঠযোগের অন্তিম সাধনা হইল 'সমাধি'।

গোরক্ষনাথেন নাদোপাসনমুচ্যতে ॥
শ্রীআদিনাথেন সপাদকোটিলয়প্রকারাঃ কথিতা জয়ন্তি।
নাদানুসন্ধানকমেকমেব মন্যামহে মুখ্যতমং লয়ানাম্।
(হ-যো-প্র ৪।৬৫, ৬৬)

শ্রীঅনাদিনাথ চিত্তবৃত্তি-নিরোধের সপাদকোটিপ্রকার উপায় বলিয়াছেন, কিন্তু গোরক্ষনাথ-অভিমত নাদানুসন্ধান দ্বারা লয়সাধনই মুখ্যতম।

আসনাদি দ্বারা কায়িক বিষয়সকল ত্যক্ত হয়; প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সম্প্রজ্ঞাত সমাধি দ্বারা মানসিক ব্যাপারও নিবৃত্ত হয়। দীর্ঘকাল এইরূপ অভ্যাসের ফলে নির্ব্বিকার স্বরূপে যে অবস্থিতি হয়, তাহাই সহজাবস্থালাভ বা জীবন্মুক্তি।

সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতিতে গোরক্ষনাথ বলিয়াছেন, "হকারকীর্ত্তিতঃ সূর্য্যষ্ঠকারশ্চন্দ্র উচ্যতে। সূর্য্যাচন্দ্রমসোর্যোগাদ্ধঠযোগো নিগদ্যতে।" 'হ' ও 'ঠ' বা সূর্য্য ও চন্দ্র বা প্রাণ-অপানের যোগই প্রাণায়াম, ইহা হইতে ক্রমশঃ সমাধি উৎপন্ন হয়, এই নিমিত্ত হঠযোগকে 'রাজযোগ' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ যোগও বলা হয়।

সাধক প্রথমতঃ স্থূলশরীরের ক্রিয়া সাধন দ্বারা সূক্ষ্মশরীরের উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য স্থাপন করিয়া শক্তিকে অন্তর্মুখী করেন এবং উহা দ্বারা সূক্ষ্ম শরীরকে বশীভূত করিয়া চিত্তবৃত্তি-নিরোধ দ্বারা পরমাত্মা সাক্ষাৎকার করেন। এই সাধনপ্রণালীই হঠযোগ হইতে রাজযোগে উপনীত হইবার প্রণালী। সূক্ষ্মশরীরের তীব্র সংস্কার হইতে উৎপন্ন কর্ম্মের ভোগের জন্যই এই স্থূল শরীরের সৃষ্টি, অতএব স্থূল শরীরের কার্য্য দ্বারা সূক্ষ্ম শরীরের উপর আধিপত্য বিস্তার করা অসম্ভব নহে।

হঠযোগপ্রদীপিকায় (৪।১৪) আছে—

চিত্তে সমত্বমাপন্নে বায়ৌ ব্রজতি মধ্যমে।
তদামরোলী বজ্রোলী সহজোলী প্রজায়তে ॥

চিত্ত সমত্বলাভ করিলে এই তিন মুদ্রাসাধন আয়ত্ত হইয়া পড়ে। এই তিন মুদ্রার দ্বারা বিন্দুরক্ষা সম্ভব হয়, ফলে কালজয়ী হওয়া যায়। বজ্রোলী, সহজোলী, শব্দাদি হইতে বজ্রযান, সহজযানের স্মৃতি উদিত হওয়া স্বাভাবিক।

কথিত আছে যে, গোরক্ষ প্রথমে বৌদ্ধ ছিলেন কিন্তু তিনি সে ধর্ম্ম ত্যাগ করেন। গোরক্ষের বৌদ্ধ সিদ্ধ সম্প্রদায় হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার কারণ সম্ভবতঃ তাহাদের সহিত তান্ত্রিক সাধনা লইয়া মতভেদ। গোরক্ষনাথ বিন্দুরক্ষার উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু তিনি যে তান্ত্রিক ক্রিয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন একথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। তাঁহার সাধনে দৃষ্টিভেদ আছে ইহাই বলা চলে। কারণ হঠযোগপ্রদীপিকাতে সহজোলী, বজ্রোলী ও অমরোলী নামে যে মুদ্রা সাধন বর্ণিত হইয়াছে তাহা তন্ত্রের সাধন। "বিন্দু অগণি মুষি পারা। জো রাখৈ সো গুরু হামারা।" ইহাই গোরক্ষের বাণী, তথাপি গোরক্ষসম্প্রদায়ে যে অমরোলী প্রভৃতি সাধন ছিল তাহার উদ্দেশ্য সাধনের মধ্যে বিন্দুরক্ষা, এই সাধনা অতীব কঠিন।

সহজোলিশ্চামরোলির্বজ্রোল্যা ভেদ একতঃ।
পিত্তোল্বণত্বাৎ প্রথমাম্বধারাং বিহায় নিঃসারযান্ত্যধারাম্।
নিষেব্যতে শীতলমধ্যধারা কাপালিকে খণ্ডমতেঽমরোলী ॥[১]

(গোরক্ষপদ্ধতি পৃ ৫১)

আবার গোরক্ষশতকের (ত্রীগস পৃ ৩০২ দ্রষ্টব্য) ৯৪ শ্লোক-সংখ্যা হইতে প্রাণের ষট্‌ত্রিংশ অঙ্গুলি পর্য্যন্ত গমনেও বজ্রোলী মুদ্রার ইঙ্গিত আছে।

সিদ্ধদের অমরোলী সাধন নির্গুণীদের মধ্যেও প্রচলিত থাকায় কবীর তাহার নিন্দা করিয়াছেন, কিন্তু তিনি যথার্থ মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে না পারিয়াই নিন্দা করেন। পরবর্ত্তী কালে 'গুলাল' বজ্রোলী, অমরোলী ও সহজোলী সাধনকে পঞ্চ আকাশ সমান বলিয়াছেন, —ইহা প্রশংসাসূচক।[২]

বজ্রোলী সাধনে দেহে বিন্দুধারণ সম্ভব হয়, তাহা দ্বারা মৃত্যুভয় দূর হয়। সহজোলী ও অমরোলী মুদ্রা সাধন বজ্রোলীর প্রকার-ভেদ মাত্র।

হঠযোগপ্রদীপিকার (১।৯৪) শ্লোকের টীকায় মৎস্যেন্দ্র প্রভৃতি আচার্য্যগণ ভস্মলেপনে সহজোলী মুদ্রা ক্রিয়াকে শ্রদ্ধার সহিত দেখিতেন, এইরূপ উক্তি আছে। অমৃতসিদ্ধিতে জানা যায় যে, পুরুষের বীজ এবং

১। হ. যো. প্র. ৩।৯৬, গোরক্ষপদ্ধতি পৃ ৫১
২। Nirguna School of Hindi Poetry, Barthwal, p. 300.

স্ত্রীর রজঃ এই উভয়ের বাহ্য যোগে মনুষ্যের সৃষ্টি হয়, এবং উহাদের আন্তরিক যোগে মনুষ্য যোগী হইতে পারে। ইহা দ্বারাই পরমপদ লাভ হয়। কোন নারীও বজ্রোলী মুদ্রা সাধন করিলে, মূলাধার হইতে নাদ সমুত্থিত হইয়া হৃদয়োপরি বিন্দুর সহিত একীভূত হয় অর্থাৎ তাহার শরীরে নাদ বিন্দুতা প্রাপ্ত হয়। ইহার ফলে পুরুষ যোগী বা স্ত্রী যোগিনী উভয়েরই সিদ্ধি লাভ (যথা আকাশমার্গে গমন, ভূতভবিষ্যৎ-দর্শনাদি) হয় এবং শরীর রূপলাবণ্যসম্পন্ন ও বজ্রবৎ দৃঢ় হয়।

সিদ্ধেরা যে মৃত্যুঞ্জয়ী হইতেন এ কথা সন্তেরাও স্বীকার করেন—

দত্ত গোরখ হণবন্ত প্রহ্লাদ। সাস্ত্রো পড়িএ ন মুণিএ সাধ।
মারে মরে ন সিদ্ধ সরীর। কৃষ্ণ কাল্‌বসি একহি তীর॥

অর্থাৎ দত্তাত্রেয় গোবক্ষ হনুমান, প্রহ্লাদ শাস্ত্রজ্ঞ না হইয়াও অমরত্বলাভ করেন, কিন্তু কৃষ্ণ একবাণেই মৃত হন।[১]

সমাধি সিদ্ধিতে কিরূপে উপরোক্ত মুদ্রাত্রয় সিদ্ধি হয় ও এই মুদ্রাত্রয়ের রহস্য কি তাহা রাজযোগ অধ্যায়ে বর্ণিত হইতেছে।

কুণ্ডলিনীতত্ত্ব। উপর্য্যুক্ত মুদ্রাদি সাধনের জন্য কুণ্ডলিনীব প্রবোধন কর্ত্তব্য। এই কুণ্ডলিনী শক্তিই মানবদেহে বিরাজিতা শিবের 'শক্তি'। এই কুণ্ডলিনী শক্তি কিরূপ? ইহা প্রজ্জ্বলবৎ সর্পের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট অতিশয় বক্রা ও পদ্মতন্তুব ন্যায় অতিশয় সূক্ষ্মা, মঙ্গলদায়িনী, সমস্ত প্রাণীব জননীস্বরূপা ও কোটি সূর্য্যের ন্যায় প্রভান্বিতা। সুষুম্না নাড়ীর দ্বারাই এই শক্তি উর্দ্ধভাগে নীতা হন। যোগের আধারভূতা কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিত হইলে সমস্ত চক্রভেদ হয়, অতএব যোগেচ্ছু ব্যক্তি প্রথমতঃ তাহাকে জাগরিত কবিয়া মুদ্রাভ্যাস করেন।

যেন দ্বারেণ গন্তব্যং ব্রহ্মদ্বারং নিরাময়ং।
মুখেনাচ্ছাদ্য তদ্দ্বারং সুপ্তা সা পরমেশ্বরী॥

(গোরক্ষসংহিতা ১।৪২)

অর্থাৎ যে দ্বারের দ্বারা নিরাময় ব্রহ্মদ্বারে প্রবেশ করিতে হয়, সেই দ্বার আপন মুখের দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া পরমেশ্বরী এই কুণ্ডলিনী শক্তি সুপ্তা রহিয়াছেন। তাঁহাকে উত্থিত করিয়া ব্রহ্মদ্বারে প্রবেশ করিতে পারিলে জীবের মুক্তি হয়। এই কুণ্ডলিনীর প্রবোধন ও মুদ্রাদি সাধন

১। Nir. Sch. of Heindi Poetry, Barthwal, p 290.

কঠিন হইলেও যথাবিধি অনুষ্ঠানে শরীর ব্যাধিমুক্ত হয়, চিত্তও নির্ম্মল হয়।

মূলাধারে আত্মশক্তিঃ কুণ্ডলী পরদেবতা।
শায়িতা ভুজগাকারা সার্দ্ধত্রিবলয়ান্বিতা॥

(গোরক্ষসংহিতা ১।১০১)

যোগী সিদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয় হস্তদ্বারা রুদ্ধ করিয়া কাকীমুদ্রা দ্বারা প্রাণবায়ু আকর্ষণ করিয়া, অপান বায়ুতে উহাকে সংযোজিত করিয়া, শরীরস্থ চক্রাদি ধ্যান করিয়া 'হুঁ হংস' মন্ত্র দ্বারা ভুজঙ্গিনী দেবীকে চৈতন্যযুক্ত করিয়া শিবের সহিত যুক্ত করেন, ইহাই যোগীর সমাধিস্থ অবস্থা। (গোরক্ষসংহিতা ১।৮৯-৯৪)

যে মুদ্রা দ্বারা যোগী মোক্ষলাভ করেন ও বিন্দুসিদ্ধ হইয়া সমস্ত সিদ্ধি তাঁহার করতলগত হয় তাহার নাম 'বজ্রোলীমুদ্রা', গোরক্ষসংহিতায় হস্তদ্বয় দ্বারা পৃথিবী অবলম্বন করিয়া মস্তক শূন্যে ও পদদ্বয় উর্দ্ধে রক্ষার ক্রিয়াকে বজ্রোলী মুদ্রা সাধন বলা হইয়াছে। ভোগালু হইয়াও এই মুদ্রা সাধনে সিদ্ধিলাভ অনিবার্য্য, ভোগতৃষ্ণা পরিহার করিয়া এই মুদ্রা সাধনে মুক্তি পর্য্যন্ত লভ্য। (গোরক্ষসংহিতা ১।৯৭-১০০)

মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ প্রভৃতি হঠমার্গ প্রবর্ত্তক নাথাচার্য্যগণ ও আগমবিদ্‌গণ বলেন যে, মূলাধারে প্রসুপ্ত কুণ্ডলিনীকে উদ্‌বুদ্ধ করিতে না পারিলে কর্ম্ম, জ্ঞান কিম্বা ভক্তি কোনটিই মুক্তির উপায় স্বরূপ পরিগণিত হইতে পারে না। যে কর্ম্ম, জ্ঞান বা ভক্তি কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণে সহায়তা করে, তাহাই যথার্থ কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ। তদ্ভিন্ন কর্ম্মাদি ব্যর্থ প্রয়াসমাত্র। তাহা সিদ্ধিদায়ক হইতে পারে না। কুণ্ডলিনীর নিদ্রাভঙ্গ ব্যতীত আত্মা অথবা পরমাত্মায় স্থিতিলাভ সম্ভবপর নহে।

কুণ্ডলিনী তত্ত্ব বা কুণ্ডলিনীবাদ কোন নূতন বাদ নহে। যে শক্তি যাবতীয় পদার্থকে আশ্রয় করিয়া সকল পদার্থের মূলসত্তারূপে বিদ্যমান আছে, তাহাই কুণ্ডলিনী শক্তি। ইহার চৈতন্য সম্পাদনে ইহা নিরাধার হয়, তৎকালে জাগতিক সকল বস্তুই নিরাধার হয় ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চৈতন্যময় রূপ ধারণ করে, 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' বোধ হয়। এই জাগরণ ক্রমশঃ সিদ্ধ হয়—কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি এই জাগরণের অবস্থাভেদ মাত্র। পূর্ণ জাগরণে পরিপূর্ণ অদ্বৈতসিদ্ধি হয়, তাহার পূর্ব্বে দ্বৈতস্ফূর্ত্তি অবশ্যম্ভাবী। তন্ত্রশাস্ত্রে পূর্ণজাগরণই 'পূর্ণহন্তা' রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।[১]

১। 'কুণ্ডলিনীতত্ত্ব', বঙ্গসাহিত্য ১ম বর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজের প্রবন্ধ।

শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

মহীং মূলাধারে কাপি মণিপুরে হুতবহং।
স্থিতং স্বাধিষ্ঠানে হৃদি মরুতমাকাশমুপরি॥
মনোঽপি ভ্রূমধ্যে সকলমণি ভিত্ত্বা কুলপথং।
সহস্রারে পদ্মে সহ রহসি পত্যা বিহরসি॥ (আনন্দলহরী)

অর্থাৎ হে দেবি! তুমি কুণ্ডলিনীস্বরূপা হইয়া মূলাধারচক্রস্থিত মহীমণ্ডল, স্বাধিষ্ঠানচক্রস্থিত জলমণ্ডল, মণিপুরচক্রস্থিত অগ্নিমণ্ডল, অনাহতচক্রস্থিত বায়ুমণ্ডল, বিশুদ্ধচক্রস্থিত আকাশমণ্ডল, ভ্রূদ্বয়মধ্যস্থিত আজ্ঞাচক্রের অন্তর্গত মনশ্চক্র, এই ষট্চক্রভেদ করিয়া কুলপথ দ্বারা সহস্রারে গমন করিয়া পতির সহিত একান্তে বিগার কর। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শরীরমধ্যে মূলাধারে ভূর্লোক, স্বাধিষ্ঠানে ভুবর্লোক, মণিপুরে স্বর্লোক, অনাহতে মহর্লোক, বিশুদ্ধে জললোক, আজ্ঞায় তপোলোক, সহস্রারে সত্যলোক আছে বলিয়া স্বীকার করা যায়। ব্রহ্মাণ্ডে যে সমুদায় ঘটনা ঘটে এই দেহমধ্যেও সেই সমস্ত ঘটনা ঘটিতেছে এইরূপ অনুভূতি যোগিগণের যোগসাধন-সাপেক্ষ। মহাকুণ্ডলিনীর সাহায্য ব্যতিরেকে যোগীর পক্ষেও শিবস্থান বা ব্রহ্মপদ লাভ করা কঠিন।

হঠযোগে সিদ্ধির লক্ষণ এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে—

বপুঃ কৃশত্বং বদনে প্রসন্নতা
নাদস্ফুটত্বং নয়নে সুনির্ম্মলে।
অরোগতা বিন্দুজয়োঽগ্নিদীপনং
নাড়ীবিশুদ্ধি হঠযোগলক্ষণম্॥[১]

শ্রীআদিনাথ-উপদিষ্ট হঠযোগবিদ্যা গ্রন্থে রাজযোগ লাভের নিমিত্ত হঠযোগের আবশ্যকতা বর্ণিত হইয়াছে। হঠযোগসিদ্ধির শরীর কৃশ ও বদন প্রসন্ন হয়, তাহার বাক্য অতি সুস্পষ্ট ও নয়নযুগল নির্ম্মল হইয়া থাকে, শরীরে রোগ থাকে না, শারীরিক অগ্নির দীপ্তি হয় ও নাড়ী শুদ্ধ হয়। এইরূপ হইলেই হঠযোগ সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া জানা যায়।

লয়যোগ

চিত্তলয় দ্বারা মোক্ষ ও ঐশ্বর্য্যলাভের নাম 'লয়যোগ'; ইহাই হঠ ইত্যাদি যোগেরও চরম উদ্দেশ্য। প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে উৎপন্ন

১। হ. যো. প্র. ২।৭৮

ব্রহ্মাণ্ড ও পিণ্ড একত্ব সম্বন্ধে আবদ্ধ, সমষ্টি ও ব্যষ্টি মাত্র ভেদ। ঋষি, দেবতা, পিতর, গ্রহ, নক্ষত্র, রাশি, প্রকৃতি ও পুরুষ সকলেরই স্থান সমরূপে ব্রহ্মাণ্ডে ও পিণ্ডে বর্ত্তমান। অতএব পিণ্ডজ্ঞান হইতেই ব্রহ্মাণ্ডজ্ঞান হইতে পারে। গুরূপদেশে পিণ্ডের জ্ঞান লাভ করিয়া ক্রিয়া দ্বারা প্রকৃতিকে পুরুষে লয় করাই লয়যোগের সাধন। অঙ্গিরা, যাজ্ঞবল্ক্য, কপিল, পতঞ্জলি, বশিষ্ঠ, বেদব্যাসাদি লয়যোগের সাধক ছিলেন, কিন্তু সকলের প্রণালী এক ছিল না।

যোগশাস্ত্রে লয়যোগের নবাঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে,—যম, নিয়ম, স্থূল-ক্রিয়া, সূক্ষ্মক্রিয়া, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, লয়ক্রিয়া ও সমাধি ইহারাই নব অঙ্গ। স্থূলক্রিয়া অর্থে স্থূলদেহের ক্রিয়া, বায়ুপ্রধান ক্রিয়ার নাম সূক্ষ্মক্রিয়া, জীবমুক্ত সাধকের উপদেশে প্রাপ্ত ক্রিয়ার নাম 'লয়ক্রিয়া'। হঠযোগের প্রাণায়াম, আসন, মুদ্রাদি সাধন স্থূলক্রিয়ার মধ্যে স্বল্পাধিক আছে।

প্রত্যাহারের সিদ্ধি আরম্ভ হইলে যোগীর নাদশ্রবণ আরম্ভ হয়, লয়ক্রিয়া সাধনে শরীরস্থ ষট্‌চক্রের জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞান সাহায্যে সাধন আরম্ভ হয়। কুলকুণ্ডলিনীকে শিবশক্তির সংযোগস্থলে সহস্রারে উপনীত করিতে পারিলে মুক্তিলাভ হয়, জীবের শিবত্বপ্রাপ্তি হয়, ইহাই লয়ক্রিয়ার সাধনে মহাশক্তিকে প্রবুদ্ধ করিয়া ব্রহ্মে লীন করার সাধন। বহিরিন্দ্রিয় বশের সাধনই 'যম', অন্তরিন্দ্রিয় বশের সাধন 'নিয়ম'।

লয়যোগের ধ্যানের নাম 'বিন্দুধ্যান', কারণ যোগী সাধন করিতে করিতে প্রকৃতির সূক্ষ্মরূপকে বিন্দুরূপে দর্শন করেন। এই ধ্যান সাধনে ক্রমশঃ যে সমাধি হয় তাহার নাম 'মহালয়', ইহার বৈশিষ্ট্য স্বরোদয়ের সূক্ষ্মক্রিয়া, ষট্‌চক্রভেদ ইত্যাদি।

সুপ্তা কুণ্ডলিনীর জাগরণে শিবত্বলাভ হয়, তাঁহার সুপ্তিতে সংসার উৎপন্ন হয়।

জীবন্মুক্তোপদেশেন প্রোক্তা সা হি লয়ক্রিয়া।
লয়ক্রিয়াসাধনেন সুপ্তা সা কুলকুণ্ডলিনী।
প্রবুদ্ধয় তস্মিন্ পুরুষে লীয়তে নাত্র সংশয়ঃ।
শিবত্বমাপ্নোতি তদা সাহায্যাদস্য সাধকঃ॥
লয়ক্রিয়ায়াঃ সংসিদ্ধৌ লয়বোধঃ প্রজায়তে।
সমাধির্যেন নিরতঃ কৃতকৃত্যো হি সাধকঃ॥

লয়যোগীর কৃতকৃত্যতা নিশ্চিত। কুলকুণ্ডলিনীকে জাগরিত করিয়া লয়যোগ সাধন করিতে সমর্থ হইলে যোগীর পক্ষে সিদ্ধিসকল সুলভ হয়।

লয়যোগ-সংহিতায় আছে –

ষট্‌চক্রং ষোড়শাধারাদ্বিলক্ষ্যং ব্যোমপঞ্চকম্।
পীঠানি চোনপঞ্চাশজ্‌জ্ঞাত্বা সিদ্ধিরবাপ্যতে॥
সমাধিসিদ্ধির্ধ্যানস্য সিদ্ধিশ্চাপ্যনয়া ভবেৎ।
আত্মপ্রত্যক্ষতাং যাতি চৈতয়া যোগবিজ্জনঃ॥

ষট্‌চক্র, ষোড়শাধার, ব্যোমপঞ্চক, ঊনপঞ্চাশপীঠ জানিলে লয়যোগে সিদ্ধি হয়। লয়ক্রিয়া দ্বারা ধ্যানসিদ্ধি, সমাধিসিদ্ধি ও আত্মসাক্ষাৎকার হয়।

মন্ত্রযোগে রূপকল্পনা দ্বারা ধ্যান বিধি, হঠযোগে জ্যোতিঃকল্পনা বিধি, লয়যোগে কোন বিধি নাই—সাধন দ্বারা অন্তরজগতে যে বিন্দু দর্শন হয়, তাহাতে পরমেশ্বরের ধ্যান কর্ত্তব্য। লয়যোগী স্বপিণ্ডে ব্রহ্মাণ্ড দর্শনে সক্ষম, কারণ লয়যোগের সিদ্ধান্তানুসারে সমষ্টিরূপা ব্রহ্মাণ্ডের ব্যষ্টিরূপী পিণ্ডই পূর্ণস্বরূপ।[১] অন্যত্র আছে—

নবচক্রং কলাধারং ত্রিলক্ষ্যং ব্যোমপঞ্চকং।
স্বদেহে যো ন জানাতি স যোগী নামধারকঃ॥[২]

সিদ্ধসিদ্ধান্তসংগ্রহে বর্ণিত হইয়াছে—

নবাঙ্গং ষোড়শাধারং ত্রিলক্ষ্যং ব্যোমপঞ্চকং।
সমানং যো ন জানাতি স যোগী নামধারকঃ॥

দ্বিতীয় উপদেশ ৪৮ শ্লোক।

সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতিতে (২।৩১) কিঞ্চিৎ ভেদ দৃষ্ট হয় (নিবন্ধের পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)।

নাথমার্গে নবচক্রেব কথা আছে, ষোড়শাধাব প্রভৃতির বর্ণনাও আছে। যথা

নবচক্র—মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, তালুকা (ললনা), আজ্ঞা, ব্রহ্মরন্ধ্র ও সহস্রার।

ষোড়শাধার –অঙ্গুষ্ঠ, পাদমূল, গুহ্যদেশ, লিঙ্গমূল, জঠর, নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ, জিহ্বাগ্র, তালু, জিহ্বামূল, দন্ত, নাসিকা, নাসাপুট, ভ্রূমধ্য ও নেত্র।

১। যোগচতুষ্টয়, কল্যাণ সাধনাঙ্ক ১ম খণ্ড পৃ ১৩২ ইত্যাদি।

২। তান্ত্রিক সাধন, দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ, কল্যাণ সাধনাঙ্ক, ১ম খণ্ড পৃ ৪২৪।

ত্রিলক্ষ্য—স্বয়ম্ভূলিঙ্গ, বাণলিঙ্গ, জ্যোতির্লিঙ্গ।

পঞ্চব্যোম—আকাশ, মহাকাশ, পরাকাশ, তত্ত্বাকাশ ও সূর্য্যাকাশ।

ত্রিলক্ষ্য মধ্যে অন্তর্লক্ষ্য, বহির্লক্ষ্য ও মধ্যলক্ষ্য বর্ণিত হয়। এই ত্রিবিধ লক্ষ্য অবলম্বনে ভ্রূমধ্যে তারক জ্যোতিদর্শন হয়। অন্তর্লক্ষ্য বা কুণ্ডলিনী মধ্যে আকাশ সাক্ষাৎকার, বহির্লক্ষ্য বা নাসাগ্র হইতে চারি বা দ্বাদশ অঙ্গুলি পর্য্যন্ত নীল ও পীত বহুল আকাশ দর্শন, মধ্যলক্ষ্য বা নিকটবর্ত্তী অন্তরীক্ষে সূর্য্য, চন্দ্র বা বহ্নির জ্বালা দর্শন হয়। মধ্যলক্ষ্যের অভ্যাসবশতঃ পঞ্চ আকাশ দৃষ্টিগোচর হয়।

শ্রুতি বলেন, অদ্বয়ব্রহ্মলাভার্থে ত্রিলক্ষ্যের অনুসন্ধান কর্ত্তব্য, তৎসিদ্ধ্যৈল্লক্ষ্যত্রয়াণাং সন্ধানং কর্ত্তব্যম্।[১] জন্মমৃত্যুর হাত হইতে অব্যাহতিলাভ করিবার জন্যই 'তারক'যোগ অবলম্বন কর্ত্তব্য। তারকযোগ দ্বিবিধ—পূর্ব্ব ও উত্তর। মনোযুক্ত অন্তর্দৃষ্টি তারকযোগের প্রকাশক। অমনস্ক বা মনোবিলীন অবস্থাই উত্তর তারক। পূর্ব্বতারকের দ্বিবিধ ভেদ আছে, মূলাধার হইতে আজ্ঞা পর্য্যন্ত মূর্ত্তিতারক, আজ্ঞা হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত অমূর্ত্তিতারক।

তত্তারকং দ্বিবিধং মূর্ত্তিতারকম্ অমূর্ত্তিতারকং চেতি।

অদ্বয়তারকোপনিষৎ, ১০ শ্লোক।

প্রথমটীর অভ্যাসে তালুমূলের ঊর্দ্ধে বিরাট্ জ্যোতি দর্শন হয়, তাহা চৈতন্যস্বরূপ। ইহা দ্বারা অষ্টসিদ্ধিলাভ হয়। অমনস্ক উত্তর তারক-যোগের পরিপক্ব অবস্থাই 'শাম্ভবীমুদ্রা', হঠ ও তন্ত্রে ইহার বিশেষ প্রশংসা আছে। 'অমনস্কে' আছে—

ইন্দ্রিয়াণি দশ প্রাণা জুহোতি জ্যোতির্ম্মণ্ডলে।
তন্মূলাদিন্দুপর্য্যন্তং বিভাতি জ্যোতির্ম্মণ্ডলং ॥
একৈব শাম্ভবী মুদ্রা গুপ্তা কুলবধূরিব।
অন্তর্লক্ষ্যে বহির্দৃষ্টি র্নিমেষোন্মেষবর্জ্জিতা ॥[২]

শ্রুতিতে আছে, "দেহস্য পঞ্চ দোষা ভবন্তি কামক্রোধনিরশ্বাস-ভয়নিদ্রা।[৩] ইহাদের অতিক্রম করা কর্ত্তব্য। সংসারে সমুদ্র তীর্ণ হইবার জন্য তারকব্রহ্মকে আশ্রয় করিতে হইবে—সেই তারকজ্ঞানই 'প্রণব'। "যোগশাস্ত্রোপদিষ্টং তারকং জ্ঞানং তথা চ সর্ব্বশব্দার্থপ্রকৃতি-

---

১। অদ্বয়তারকোপনিষৎ ৪ শ্লোক। ২। অমনস্ক ২।৮, ১০
৩। মণ্ডলব্রাহ্মণ উপ ১।২

প্রণবোঽপি সৈব।"[১] ভ্রূমধ্যে তারকব্রহ্মের উপলব্ধির নিমিত্ত ত্রিলক্ষ্যের সাধন করিতে হয়।

পঞ্চ আকাশের বা ব্যোমপঞ্চকের লক্ষণ এইরূপে বর্ণিত হয়—বাহ্যাভ্যন্তরম্ অন্ধকারময়ম্ আকাশম্। বাহ্যস্যাভ্যন্তরে কালানলসদৃশং পরাকাশম্। সবাহ্যাভ্যন্তরেঽপরিমিতদ্যুতিনিভং তত্ত্বং মহাকাশম্। সবাহ্যাভ্যন্তরে সূর্য্যনিভং সূর্য্যাকাশম্। অনির্ব্বচনীয়জ্যোতিঃ সর্ব্বব্যাপকং নিরতিশয়ানন্দলক্ষণং পরমাকাশম্।[২]

নবচক্রং ষড়াধারং ত্রিলক্ষ্যং ব্যোমপঞ্চকং।
সম্যগেতন্ন জানাতি স যোগী নামতো ভবেৎ॥

মণ্ডলব্রাহ্মণ উপনিষদের চতুর্থ ব্রাহ্মণের শেষ অংশে এইরূপ উক্তি আছে।

চক্র। তন্ত্রে ষট্‌চক্র, নবচক্র আদি বর্ণনা পাওয়া যায়। সুষুম্না নাড়ীর মধ্যে ছয় চক্রের অবস্থান কল্পিত হয়। এই চক্রসকল বিভিন্ন নাড়ীর মিলনকেন্দ্র। মানবদেহে সার্দ্ধ-তিনলক্ষ নাড়ী বিদ্যমান, তাহাদের বিভিন্ন গ্রন্থিসকলই 'চক্র' নামে খ্যাত। সুপ্তা কুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করিয়া চক্রপথে ঊর্দ্ধে নীত করাই তন্ত্রের সাধন। কুণ্ডলিনীশক্তি বাগ্দেবী অর্থাৎ ব্রহ্মময়ী বীজমন্ত্রস্বরূপা। ইহাকে ঊর্দ্ধে নীত করাই ষট্‌চক্রভেদরূপ ক্রিয়া। ইহা তন্ত্রের অন্তর্যাগের প্রধানতম অঙ্গ। বহির্যাগ অর্থে ধূপধূনাদি উপকরণ দ্বারা পূজা। অন্তর্যাগে মানস উপচার কল্পনা আছে, যথা—পৃথিবীকে গন্ধ, আকাশকে পুষ্প, বায়ুকে ধূপ, তেজকে দীপ, জলকে নৈবেদ্য কল্পনা করিয়া সাধন আছে। ষট্‌চক্রভেদও ইহার অঙ্গস্বরূপ।

নাথমতে "নবচক্রাণি দেহেঽস্মিন ভবন্তীতি বিনিশ্চিতম্" বলা হয়।[৩] এই নবচক্র যথাক্রমে মূলাধার, তদূর্দ্ধে স্বাধিষ্ঠান নামক চতুর্দ্দলচক্র, নাভিতে মণিপুর, হৃদয়ে অনাহত, কণ্ঠে বিশুদ্ধ, তালুচক্র, রাজদণ্ডে ঘন্টিকা, 'শূন্য' মনোলয় কার্য্যে ধ্যেয়, সহস্রার বা ব্রহ্মচক্র। এই স্থানে 'হংস'মন্ত্র ধ্যানে তন্ময়তা প্রাপ্তি হয়। ইহাই গোরক্ষ সম্প্রদায়ে প্রচলিত 'নবচক্র'।

এই বর্ণনার মধ্যে 'আজ্ঞা'র উল্লেখ নাই।

নাথমতে ষোড়শাধার। পাদাঙ্গুষ্ঠ, পার্ষ্ণি (গোড়ালি), মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, সর্ব্বশরীরের নাভ্যাধার, নাভি (মণিপুর), হৃদয়, কণ্ঠ,

১। বেদানাং বাস্তবিকং স্বরূপম্, ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ, পৃ ৪।
২। মণ্ডলব্রাহ্মণ উপ. ৪।১-৪ ৩। সি সি. স ২য় উপদেশ

ঘন্টিকাসহ জিহ্বার স্পর্শ, তালুমূলে জিহ্বার প্রবেশ, রসাধারে জিহ্বাগ্রস্পর্শ; উর্দ্ধরদ (দন্ত), নাসিকাগ্র, নাসামূল, ভ্রূমধ্য ও নয়নাধার।[১]

পূর্ব্বোক্ত প্রচলিত ষোড়শাধার বর্ণন হইতে এই বর্ণনায় কিঞ্চিৎ ভেদ দ্রষ্টব্য।

নাথমতে নবচক্র। গোরক্ষ-অনুমোদিত চক্র বর্ণন তন্ত্র ও হঠযোগের বর্ণনা হইতে ভিন্ন। বিরাটপুরাণের পুঁথি ও একটী চক্রের চিত্র অবলম্বনে তাহার ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতেছে। প্রথমে মূলাধারে রক্তবর্ণ 'আধারচক্র' —গণেশ ও তাঁহার দুই শক্তি সিদ্ধি ও বুদ্ধি ইহার অধিষ্ঠাতা, এই চক্র তন্ত্রের মূলাধার চক্রের অনুরূপ। কিন্তু দ্বিতীয় চক্র 'মহাপদ্ম চক্র'— ইহার অধিষ্ঠাতা নীলকণ্ঠ, ইহা তন্ত্রে নাই। তৃতীয় 'স্বাধিষ্ঠান চক্র' ইহার দেবতা ব্রহ্মা ও শক্তিসাবিত্রী। স্বাধিষ্ঠান ও মণিপুর মধ্যে তিনটী কেন্দ্র আছে—ষড়্‌দল সুষুম্না চক্র, গর্ভ ও কুণ্ডলিনী (ইহার দেবতা অগ্নি, কটিদেশের নিকট ইহার অবস্থান)। নাভিস্থানে মণিপুর, ইহার দেবতা বিষ্ণু, ইহার উর্দ্ধে 'লিঙ্গচক্র', তাহার বর্ণনা নাই, তদূর্দ্ধে মনের স্থান বা 'মনস্'। অনাহতের স্থান হৃদয়ে, ইহা দ্বাদশদল পদ্ম, দেবতা মহাদেব, উমা তাঁহার শক্তি। ইহার ঋষির নাম হিরণ্যগর্ভ। ইহা কারণদেহ, সুষুপ্তি, পশ্যন্তী বাক্ ও সামবেদের অনুরূপ।

তৎপরে কণ্ঠে ষোড়শদল বিশুদ্ধচক্র, ইহা ধূম্রবর্ণ, জীব ও আদ্যাশক্তি ইহার অধিষ্ঠাতা, ইহার ঋষি বিরাট। ইহা সুষুপ্তি, পরাবাক্, অথর্ব্ববেদ, জালন্ধরবন্ধ ও সাযুজ্যমুক্তির অনুরূপ। গলস্থানে (ইহা যোগসূত্র ৩।৩০ বর্ণিত কণ্ঠকূপে) ৩২দল পদ্ম, উদ্দ্যোতবর্ণপ্রভা 'প্রাণচক্র' বিদ্যমান, ইহা প্রাণনাথ ও পরমাশক্তির অধিষ্ঠান। ইহাই মানবদেহের 'দশম দুয়ার'। বিশুদ্ধের উপরে ও আজ্ঞার নিম্নে চারিটী চক্রের মধ্যে দ্বিতীয়টী 'অবলাচক্র' ৩২দল পদ্ম অরুণোদ্যোতপ্রভা, অগ্নি ইহার দেবতা। ইহার অবস্থিতি ব্রহ্মাবিষ্ণুরুদ্রগ্রন্থির মিলনস্থানে অনুমিত হয়। ইহা কালচক্র যান ও যোগিনীচক্রের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত।

মুখে চিবুকের নিকটে 'চিবুক চক্র' আছে, উহা ৩৪দল পদ্ম, সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল, প্রাণ ও সরস্বতী ইহার অধিষ্ঠাতা। ঐ পদ্মমধ্যে সকল দেবতার আসন আছে, উহার ঋষির নাম 'ক্রোধ', মনুষ্যের ভাষার ইহাই

১। সি. সি. স. ২য় উপদেশ

উৎপত্তিস্থল বলিয়া বিবেচিত হয়। আজ্ঞার নিম্নে নাসিকাদেশে 'বলবান্ চক্র'। ইহা শ্বেত রক্ত ও গাঢ়বর্ণের ত্রিদল পদ্ম, ইহাই 'ত্রিবেণী' বা ত্রিনাড়ীর সঙ্গমস্থল। প্রণব ও তাহার শক্তি সুষুম্নার ইহা অধিষ্ঠান। 'অ-উ-ম' এই স্থানের সহিত যুক্ত। ইহার ঋষি মহাহঙ্কার। (ইহা কি ত্রিক ও ত্রিপুরাদর্শনের 'পূর্ণাহন্তা' ?)

প্রচলিত আজ্ঞাচক্র পুঁথিতে 'অণিচক্র'রূপে বর্ণিত হইয়াছে, ইহা ভ্রূদ্বয়মধ্যে অবস্থিত, মাণিক্যবর্ণপ্রভা, দ্বিদলপদ্ম, হংসদেবতা ও সুষুম্না শক্তির অধিষ্ঠান। ইহা বিজ্ঞান অবস্থা, অনুপম বাক্ ও প্রণবের অর্দ্ধ-মাত্রার অনুরূপ। কর্ণের নিম্নে কর্ণমূল চক্র ৩৬ দল মিশ্রবর্ণের পীত পদ্ম, নাদ ও তৎশক্তি শ্রুতির অধিষ্ঠান ও ৩৬ মাতৃকার আসন। 'ত্রিবেণী চক্র' উর্দ্ধে অবস্থিত, ২৬ দল পদ্ম, ইহার ঋষি 'আকাশ', ইহাই প্রকৃত ত্রিবেণী—কিন্তু নিম্নের বলবান চক্রের সহিত ইহার কিরূপ সম্বন্ধ তাহার কোন উল্লেখ নাই। কপালে ৩২ দল 'চন্দ্রচক্র' রক্ত ও শ্বেতবর্ণ, চন্দ্র ও তৎশক্তি অমৃতের অধিষ্ঠান (পুঁথিমতে শক্তি 'অমদা')। ইহার ঋষি ১৬ কলা সহ 'মনস্'। প্রবাদ আছে, সূর্য্য এই চন্দ্রলোকে অমৃত পান করিতে যান। এই চন্দ্রের সহিত অমৃতচক্রের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ইহা ঐদেশেই সামান্য উর্দ্ধে অবস্থিত। ইহার দেবতা ও শক্তি পূর্ব্বের চক্রের ন্যায়, কেবল ঋষি 'আত্মা', মনস্ নহে ; এই স্থান হইতে অমৃতক্ষরণ হয়। ইহা 'কামধেনু' নামক গায়ত্রীর আবাস, ইহার চারি স্তন—অম্বিকা, লম্বিকা, ঘণ্টিকা ও তালিকা। ইহার মুখ মনুষ্যের ন্যায়, মদনেত্র, ময়ূরপুচ্ছ, অশ্বগ্রীবা, হস্তিশুণ্ড, শার্দ্দূলহস্ত, গোশৃঙ্গ, পক্ষদ্বয় লীলাব্রহ্ম ও হংস,—ইহার এই অদ্ভুত চিত্র। ধেনুর স্তন হইতে অবিরত অমৃতধারা বর্ষিত হইতেছে। খেচরী ও বিপরীতকরণী মুদ্রা দ্বারা তাহা রক্ষা করিয়া যোগী অমর ও কালজয়ী হন। তৎপরে ললাটের উর্দ্ধে ব্রহ্মদ্বারচক্র, ইহা ১০০ দল পদ্ম, রামধেনুর বর্ণে রঞ্জিত, ইহার উর্দ্ধে অকুলকুণ্ডলিনীর আসন, তাহা নবসূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল ৬০০ দল পদ্মবিশেষ। ইহা অতিক্রম করিয়া মূর্দ্ধস্থানে ব্রহ্মরন্ধ্রে পৌঁছান যায়, তথায় বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত ১০০০ দল পদ্ম আছে, ইহাই সহস্রার, গুরু ও চৈতন্য শক্তির আবাসস্থান এবং সাধকের লক্ষ্য।

এই স্থানে চক্রের শেষ হইবে এইরূপ মনে করা স্বাভাবিক, কিন্তু সহস্রারের উর্দ্ধে ছয়টী চক্র রহিয়াছে উর্দ্ধরন্ধ্র, ভ্রমরগুহা, পুণ্যাগার,

কোহ্লাট, বজ্রদণ্ড ও নিরাধার। পুঁথিতে উর্দ্ধরন্ধ্রকে তালুচক্র বলা হইয়াছে। ইহা তালিকায় অবস্থিত ৬৪ দল পদ্ম, গোরক্ষ ও সিদ্ধান্ত শক্তি দ্বারা অধিষ্ঠিত।

ভ্রমরগুহা বা অলেখ (অলক্ষ্য চক্র) পুথিমতে 'ব্রহ্মচক্র'—১০৮ দল পদ্ম মহামৌনীরা এইস্থানে অবিরত জপ করিতেছেন। এই স্থানে 'সমাধি' আরম্ভ হয়, প্রাণমনের কার্য্য রুদ্ধ হয়। এই পদ্মের দশলক্ষ দল, ইহা অত্যন্ত উজ্জ্বল, ইহার দেবতা অলক্ষ্যনাথ, শক্তি মায়া, ঋষি মহাবিষ্ণু।

পুণ্যাগারের লক্ষ দল, দেবতা অকলনাথ, শক্তি অকলেশ্বরী, ঋষি অকল। কোহ্লাট চক্রে বৈষ্ণবের বৈকুণ্ঠ, ইহা শিখামণ্ডলে অবস্থিত, ইহা পরম শূন্যের মার্গ, দেবতা অচিন্ত্যনাথ, শক্তি অব্যক্ত।

বজ্রদণ্ডের বর্ণনা অস্পষ্ট, ইহা মহাবিশাল স্তম্ভরূপ। শেষচক্র নিরাধার, অসংখ্য দল বিশিষ্ট, বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত, মাতৃকা, দেবগণ ও সৃষ্টি সকলের অধিষ্ঠান ও গুরুদেবের শ্রেষ্ঠতম আসন।

ইহার উর্দ্ধেও বিংশসংখ্যক শূন্য আছে, তাহাদের বিবরণ নাই। পুথিতে বর্ণিত হইয়াছে যে, ২১টী ব্রহ্মাণ্ডের উর্দ্ধে পরমশূন্য স্থানে মোক্ষ-প্রাপ্তি হয়। পরমশূন্য অতিক্রম করিলে যোগী গতাগতি হইতে চিরতরে নিবৃত্ত হন ও সেই জ্যোতির মধ্যেই যুগে যুগে অবস্থান করেন।

উপরোক্ত বিবরণ প্রচলিত তন্ত্রমত হইতে ভিন্ন। স্বচ্ছন্দসংগ্রহ, অদ্বৈতমার্ত্তণ্ড প্রভৃতিতেও ৩২টী চক্রের বর্ণনা আছে। সহস্রারকে সর্ব্বোচ্চ চক্র বলা হয় না, রাধাস্বামী সম্প্রদায়ের সহিত এ সম্বন্ধে মিল আছে। উপরোক্ত বিবরণে 'মানসচক্র'র ৩২টী দল বলা হইয়াছে, অন্যত্র ইহার ছয়টী মাত্র দলের বিবরণ আছে।[১]

উপরোক্ত অকুলকুণ্ডলিনীই তন্ত্রের সহস্রারের ত্বক্ স্বরূপ ও পরব্যোমে (মস্তিষ্কের অংশবিশেষ) অবস্থিত অমৃতস্রাবের স্থানবিশেষ। গোরক্ষমতে ইহার উর্দ্ধে অমৃতচক্র হইতে অমৃতস্রাব হয়।

ভ্রমরগুহা সন্তসম্প্রদায়ে থাকিলেও ইহার স্পষ্ট বর্ণনা নাই, ব্রহ্মরন্ধ্র রূপেই ব্যবহার প্রচলিত। ইহার দ্বারমুখ অন্ধকার, চতুর্দ্দিক জ্যোতিঃপূর্ণ, সাধকের দৃষ্টি তাই রুদ্ধ হয়। সংযম ও সহিষ্ণুতা দ্বারা সাধক

১। Serpent Power, p. 146; B. N. Seal—Pos. Sc: s of the Ancient Hindus. p. 221.

গুহাদ্বার উন্মুক্ত দেখিতে সক্ষম হন। তখন সকল তত্ত্ব প্রকাশিত হয়।[১]

ষট্‌চক্রসাধন। ষট্‌চক্রসাধনে মানবের মন অতিস্থূল তত্ত্ব হইতে অতীন্দ্রিয় পরমসূক্ষ্ম তত্ত্বে উপনীত হয়, এই নিমিত্ত তন্ত্রে ষট্‌চক্র সাধনের বিশেষ আদর। শঙ্করাচার্য্যের আনন্দলহরীতে কুণ্ডলিনীতত্ত্বের বিষয় আছে, কুণ্ডলিনীশক্তি ষট্‌চক্রভেদ করিয়া কুলপথ দ্বারা সহস্রারে গমন করিয়া পতির সহিত একান্তে বিহার করেন। Arthur Avalon আনন্দলহরীর অনুবাদ করিযা নাম রাখিয়াছেন 'Wave of Bliss,' ইহাতেও উক্ত হইয়াছে কুণ্ডলিনীর অষ্ট অঙ্গ আছে, ষট্‌চক্র তাঁহার বিশ্রাম করিবার স্থানস্বরূপ, কিন্তু সহস্রারই তাঁহার 'কারণ' স্থান অর্থাৎ স্থায়ী বাসস্থান। তদ্ব্যতীত 'শিব' তাঁহার পতিস্বরূপ আছেন, ইহারাই কুণ্ডলিনীর অষ্ট অঙ্গ।[২] পূর্ণানন্দস্বামী কৈবল্যকালিকাতন্ত্র অবলম্বনে তাঁহার 'ষট্‌চক্রনিরূপণ' রচনা করেন, কমলাকান্তও তাঁহার 'সাধকরঞ্জনে' স্বানুভূতি হইতে ও শাস্ত্রানুমোদিত চক্রের বিবরণ দিয়াছেন।[৩] মহিম্ন-স্তব, আনন্দলহরী, বিবেকচূড়ামণি, পাদুকাপঞ্চকস্তোত্র, Serpent Power প্রভৃতিতে চক্রাদির যে সকল বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা হইতে গোরক্ষ-অনুমোদিত চক্রবর্ণনার ভেদ দৃষ্ট হয়। গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহে, গোরক্ষ-সিদ্ধান্তপদ্ধতিতে নবচক্রের বর্ণনা আছে, কিন্তু বিরাটপুরাণ ও একটী চিত্র অবলম্বনে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজ গোরক্ষ-সম্প্রদায়ের যে চক্রের বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে ষট্‌চক্র ব্যতীত মহাপদ্ম, প্রাণচক্র, চিবুকচক্র প্রভৃতি বিবিধ চক্রের অবস্থান বর্ণিত হইয়াছে এবং শ্রীহট্ট, কোহ্লাট, ত্রিকুট, ওড্রপীঠ, অমরগুহা ও ব্রহ্মরন্ধ্র নামক ষট্‌চক্রের অবস্থান সহস্রারের ঊর্দ্ধে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাদের সামষ্টিক নাম 'সোমচক্র'। এই নিবন্ধের পরিশিষ্টে মৎস্যেন্দ্র-রচিত 'যোগবিষয়' পুথিতে শ্রীহট্ট, কোহ্লাট প্রভৃতি চক্রের বর্ণনা আছে।[৪] যথা—

ত্রিকুটং ত্রিহটা চৈব গোহ্লাটং (কোহ্লাট ?) শিখরং তথা।
ত্রিশিখং বজ্রমোঙ্কার মূর্দ্ধ্বনাথং ভ্রাবোর্মুখম্‌॥

১। System of Chakras, according to Gorakhnath, S. B. S. Vol. II, pp. 83-92
২। Wave of Bliss, Arthur Avalon, p. 7
৩। কমলাকান্তের সাধকরঞ্জন, সা.প. মন্দির, বসন্তরঞ্জন রায় ও অটলবিহারী ঘোষ।
৪। যোগবিষয় ২০, ২১ শ্লোক (পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)।

আকুঞ্চয়েদ্ রবিং চৈব পশ্চাৎ নাড়ী প্রবর্ত্ততে।
ভেদে ত্রিহট সংঘদৃমুভয়ো··· ? দর্শনম্॥ ২০, ২১ শ্লোক।

ষট্চক্রসাধন গুরুসাপেক্ষ, কারণ সকল সাধক এক ভাবাপন্ন নহেন বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন ষট্চক্র বর্ণন আছে। সাধারণতঃ মূলাধার পৃথিবীতত্ত্ব ও গন্ধতন্মাত্রের স্থান, মণিপুর বহ্নিতত্ত্ব ও রূপতন্মাত্র, অনাহত বায়ুতত্ত্ব ও স্পর্শতন্মাত্র, বিশুদ্ধ আকাশতত্ত্ব ও শব্দতন্মাত্র এই ধারণা করা হয়। পঞ্চ চক্র পঞ্চভূতাত্মক, স্থূল তত্ত্বের লয় সূক্ষ্ম তত্ত্বে হইয়া থাকে, অর্থাৎ পৃথিবীর লয় জলে, জলের লয় অগ্নিতে, অগ্নির লয় বায়ুতে ও বায়ুর লয় আকাশে হয়। এইরূপে কুণ্ডলিনী এক তত্ত্ব হইতে তত্ত্বান্তরে নীত হন।

সাধকরঞ্জনে উক্ত হইয়াছে—

শুনি কামিনীর ভাষা যোগীন্দ্র করয়ে আশা
আমি কোন কীটের সমান
জানি এ সকল কর্ম্ম তথাপি তেজিয়ে কর্ম্ম
কুল দিতে করিছি পয়ান ॥[১]

সাধক কমলাকান্ত বলিতেছেন, 'কামিনী' অর্থাৎ কুণ্ডলিনীর প্রাপ্তির আশাতেই আমি সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছি।

কমলাকান্ত পদ্যে একে একে সকল চক্রের (সাধকরঞ্জন গ্রন্থে) আলোচনা করিয়াছেন, পূর্ণানন্দ গদ্যাকারে ষট্চক্রনিরূপণম্ রচনা করেন। পূর্ণানন্দের মতে সুষুম্নানাড়ী মূলধার হইতে শিরোদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে, তন্মধ্যে বজ্রা নাড়ী এবং তন্মধ্যেও সূক্ষ্মা চিত্রিণী নাড়ী আছে, যোগিগণ উহা জানিতে পারেন, উহা আজ্ঞাচক্রস্থ প্রণবের জ্যোতিতে সর্ব্বদা দীপ্তিশালিনী, উর্ণনাভ-সূত্রের ন্যায় সূক্ষ্ম এবং বোধস্বরূপা। এই নাড়ীমধ্যে যে বিবর আছে তাহার নাম 'ব্রহ্মনাড়ী', এই পথে কুণ্ডলিনী পতির নিকট গমনাগমন করেন। মূলাধার হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত কুণ্ডলিনী বিহার করেন, তিনি পঞ্চাশৎ অক্ষরময়ী।

গীতায় আছে, 'নবদ্বারপুরে দেহী', কিন্তু তন্ত্রে দশমদুয়ার আছে। এই দশমদুয়ার মানবদেহে রুদ্ধ অবস্থায় থাকে, নিত্য যোগাভ্যাসের ফলে তাহা মুক্ত হয়। কর্ম্মমুক্ত জীবের এই পথেই ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি হয়।

১। কমলাকান্তের সাধকরঞ্জন, পৃ, ১৩

দশদ্বার নিরূপণে কমলাকান্ত বলিয়াছেন –

কায়া মন্দির দশ দুয়ার। একটি দুয়ার জানা ভার॥
দুই চক্ষু দুই নাসা। দুই কর্ণ এক ভাষা॥
গুহ্য আর লিঙ্গ নয়। এক দ্বার গোপনে রয়॥
সেই দ্বারে মনের বাসা। তাই নিলে পূর্ণ আশা॥
কমলাকান্ত কথা মান। সেই স্থানটীর মর্ম্ম জান॥ (পৃ ৪৬)

বিশুদ্ধ চক্রের উর্দ্ধে ত্রিনাড়ীর সঙ্গমস্থল আছে, এই স্থান হইতে সুষুম্না মস্তিষ্কমধ্যে প্রবেশ করে, এবং ইড়া-পিঙ্গলা দক্ষিণ ও বাম কপালে যাইয়া সুষুম্নার সহিত ভ্রূমধ্যে মিলিত হয়। এই স্থান হইতে ইড়া বাম নাসিকায় ও পিঙ্গলা দক্ষিণ নাসিকায় গমন করে। মস্তিষ্ক হইতে সুষুম্না দ্বিধা বিভক্ত হইয়া একটী নিম্নমুখী হইয়া ভ্রূমধ্যে আসে ও আজ্ঞা ভেদ করিয়া সরল পথে ইড়া-পিঙ্গলার সহিত মিলিত হয়, তৎপরে বাহিরে আসিয়া সরল পথে উর্দ্ধমুখী হইয়া ললাটমধ্যে একটী সূক্ষ্ম ছিদ্র ভেদ করিয়া আবার নিম্নমুখী হইয়া পুনরায় বক্রাকারে সহস্রারে উঠে ও ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রবেশ করে।[১] দ্বিতীয়টী মস্তিষ্ক হইতে সরল পথে উর্দ্ধে 'শিখর' পর্য্যন্ত যায়, সামান্য বক্রাকারে ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রবেশ করে। এই দ্বারটী প্রায়শঃ রুদ্ধ থাকে, প্রথম দ্বারটী উন্মুক্ত থাকে। অতএব দুইটী মার্গের ছিদ্রপথ এক নহে। দেহত্যাগ কালে যোগী সুষুম্নার রুদ্ধ দুয়ার উন্মুক্ত করিয়া দুইটী ছিদ্রপথ এক করিয়া দেন, ইহাই 'দশমী দুয়ার' নামে পরিচিত।

অমরৌঘশাসন গ্রন্থে দশমী দুয়ারকেই শঙ্খিনীদ্বার বলা হইয়াছে— ইহা রাজদন্তবিবরে অবস্থিত।[২] কঙ্কালমালিনী তন্ত্রে শঙ্খিনীর নিম্নে ব্রহ্ম-রন্ধ্রের অবস্থান বর্ণিত হইয়াছে। কমলাকান্তও বলিয়াছেন—

শূন্যদেশে শঙ্খিনী তাহাতে আছে গাথা।
কমল সহস্রমুখ অধোমুখ জার।
পঞ্চাশৎ অক্ষরে দলের ব্যবহার।[৩]

রাধাস্বামী সম্প্রদায় মতে মস্তিষ্ক মধ্যে যে ফাট আছে তাহাতে দ্বাদশ দ্বার আছে, তাহাদের সহিত ব্রহ্মাণ্ডের ছয় চক্র ও চৈতন্যদেশের ছয় ধামের যোগ আছে। সাধন দ্বারা এই অন্তর্নিহিত দ্বারসকলের অনুসন্ধান

১। Ser. Power, p 130.

২। "ঘণ্টাকোটি কপোল কোটর কুটী জিহ্বাগ্র মধ্যাশ্রয়াচ্ছঙ্খিন্যা গতঃ রাজদন্তবিবরং প্রাপ্তোর্দ্ধ-বক্ত্রেণ যৎ।" অমরৌঘশাসন ২য় শ্লোক।

৩। কমলাকান্তের সাধকরঞ্জন, পৃ ৩০।

করা কর্ত্তব্য। এই রন্ধ্রসকল দ্বারাই অন্তরস্থ শক্তির সহিত বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের সকল ধামের সম্বন্ধ স্থাপন সম্ভব।[১]

পীঠ। যোগিমতে আজ্ঞাচক্রের উর্দ্ধে তিনটী পীঠস্থান আছে—বিন্দুপীঠ, নাদপীঠ ও শক্তিপীঠ। এই তিন পীঠ কপালদেশে অবস্থিত। শক্তিপীঠই ব্রহ্মবীজ বা ওঁকার, উহার নিম্নে ষোড়শদলযুক্ত 'সোমচক্র' বিদ্যমান। এই 'সোমচক্র' ষোড়শদলযুক্ত, এই দলকে চন্দ্রের ষোড়শ-কলা বলে। প্রথম কলার নাম কৃপা, তৎপরে মৃদুতা, ধৈর্য্য, বৈরাগ্য, ধৃতি, সম্পৎ, হাস্য, রোমাঞ্চ, বিষয়, ধ্যান, সুস্থিরতা, গাম্ভীর্য্য, উদ্যম, অক্ষোভ, ঔদার্য্য, একাগ্রতা (কল্যাণ যোগাঙ্ক, 'অ-ক-খ' চক্র, পৃ ৬৪৮)।

ইহার নিম্নে একটী গুপ্ত ষড়্দল পদ্ম আছে, উহাকে 'জ্ঞানচক্র' বলে। উহার প্রতিদলে ক্রমশঃ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ ও স্বপ্নের জ্ঞান উৎপন্ন হয়। ইহার নিম্নেই 'আজ্ঞাচক্র'। আজ্ঞার নিম্নে তালুমূলে একটী গুপ্তচক্র বা দ্বাদশদলযুক্ত রক্তবর্ণ পদ্ম আছে, তাহাতে পঞ্চ সূক্ষ্মভূতের পঞ্চীকরণ দ্বারা পঞ্চ স্থূলভূতের প্রাদুর্ভাব হয়। Arthur Avalon ইহাকেই Serpent Power নামক গ্রন্থে 'ললনাচক্র' বা 'কলাচক্র' আখ্যা দিয়াছেন। ইহা 'ষট্চক্রনিরূপণম্' গ্রন্থে নাই। ইহার নিম্নে বিশুদ্ধচক্রের স্থান। ইহার দ্বাদশ দল[২]—শ্রদ্ধা, সন্তোষ, অপরাধ, দম, মান, স্নেহ, শুদ্ধতা, অরতি, সম্ভ্রম, উর্ম্মি ইত্যাদি।

সহস্রার চক্র অধোমুখী, পঞ্চাশৎ অক্ষর যুক্ত। ইহার মধ্যে গোলাকার চন্দ্রমণ্ডল আছে, ঐ চন্দ্রমণ্ডল ছত্রাকারে এক উর্দ্ধমুখী দ্বাদশদল কমলকে আবৃত করিয়া রহিয়াছে, ঐ কমলে 'অ-ক-থ' ত্রিকোণযন্ত্র আছে, উহার চতুর্দ্দিকে সুধাসাগর বেষ্টন করিয়া আছে, তন্মধ্যে উহা মণিময় দ্বীপের ন্যায় বিরাজিত। উহার মধ্যস্থলে মণিপীঠে নাদবিন্দুর উর্দ্ধে হংসপীঠের স্থান, এই পীঠে গুরুপাদুকা বা গুরুচরণ ধ্যান কর্ত্তব্য। গুরুই পরমশিব স্বরূপ। উক্ত চন্দ্রমণ্ডলের মধ্যে অমৃতকলা বা ষোড়শীকলা ও তন্মধ্যে নির্ব্বাণকলা বিদ্যমান। নির্ব্বাণকলা-অন্তর্গত নির্ব্বাণ-শক্তিরূপা মূলপ্রকৃতি বিন্দু ও বিসর্গ শক্তির সহিত পরমশিবকে বেষ্টন করিয়া আছে, উহার ধ্যানে নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভ হয়। বেদান্তমতে সহস্রারাস্থিত পরমশিব ও শক্তিকে ব্রহ্ম ও মায়া বলে, পদ্মকে আনন্দময় কোষ বলে।

১। অমৃত বচন—পৃ ৪১, ।/০　　২। Serpent Power, p. 142.

তন্ত্রের এই পরমশিব ও শক্তিই সাংখ্যের প্রকৃতি ও পুরুষ, পুরাণের লক্ষ্মীনারায়ণ বা রাধাকৃষ্ণ।[১]

বৌদ্ধ লামাদের মধ্যে লয়যোগের অনুরূপ যে সাধন আছে তাহাকে short বা direct path বলা হয়, অর্থাৎ জ্ঞানের পথে চলিয়া কোন বিধিনিষেধ না মানিয়া যে সাধন দ্বারা একজন্মেই বুদ্ধত্বলাভ হয় তাহাই। এই বিশ্ব যে ইন্দ্রজালস্বরূপ স্বকল্পনা-উদ্ভূত এবং মনের মধ্যেই বিশ্ব লয় প্রাপ্ত হয় এই জ্ঞান লাভই উদ্দেশ্য। অন্ধকার গৃহে সাধন আরম্ভ করিলে জ্যোতির্ময় মূর্ত্তি বা পুষ্প দেখা দেয়, ক্রমশঃ তাহা স্থির হইয়া বিন্দুমাত্রে পর্য্যবসিত হয়। যখন বহির্জগতের দৃশ্য বস্তু ও অন্তর্জগতের দৃশ্য বস্তু অভিন্ন হইয়া উঠে তখনই চিত্তের একাগ্রতা-সাধন পূর্ণ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। 'ওঁ মণিপদ্ম হুঁম্'কে ছয়টি মাত্রায় বিভক্ত করিয়া তাহার ছয় বর্ণ কল্পনা এবং ক্রমশঃ তাহাদের অন্তর্দ্ধান কল্পনা দ্বারাও সাধন প্রচলিত। পূর্ণরূপে সাধনের পর ছয়টি মাত্রা 'তথতা'র সহিত মিলিত হইয়া যায়। মহাযান মতে ইহাই শূন্য সাধন।

পীঠতত্ত্ব। পরাশক্তি যখন শিবের সহিত সাম্যভাব প্রাপ্ত হন, তখন তাহা বিন্দুরূপ ধারণ করে ও জ্যোতির্লিঙ্গরূপে প্রকটিত হয়। এই বিন্দুই তান্ত্রিক পরিভাষায় কামরূপ পীঠ নামে প্রসিদ্ধ, এই পীঠে অভিব্যক্ত চৈতন্য স্বয়ম্ভুলিঙ্গ নামে পরিচিত। এই পীঠ একমাত্রা শক্তি ও একমাত্রা শিব অংশের সমভাবে সংগঠিত। এই অংশদ্বয়ের নাম শান্তাশক্তি ও অম্বিকাশক্তি। এই পীঠে মহাশক্তির আত্মপ্রকাশ 'পরাবাক্' নামে পরিচিত, ইহাই শব্দরাজ্যের সূচনা। ইহাই প্রণবের পরমরূপ বা বেদের স্বরূপ। ইহার পর শক্তির ক্রমবিকাশে শান্তাশক্তি 'ইচ্ছাতে' পরিণত হয় ও শিবাংশ অম্বিকাশক্তি 'বামা'রূপে আবির্ভূত হয়, ইহাদের সামরস্য-বিন্দুই পূর্ণগিরিপীঠ ও চিদ্বিকাশ বাণলিঙ্গ। শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে ইহাই পশ্যন্তী বাক্ অবস্থা। ইহাই সৃষ্টির বিকাশের অবস্থা, এই ভূমি হইতে কালের প্রভাব আরম্ভ হয় ও ক্রমানুসারে সৃষ্টিক্রিয়া হইতে থাকে। তৎপরে 'ইচ্ছা'শক্তির উপরম হওয়ায় 'জ্ঞান'শক্তির উদয় হয় এবং শিবাংশ জ্যেষ্ঠাশক্তির সহিত অদ্বৈতভাবে মিলিত হইয়া জালন্ধরপীঠ নামক সামরস্য-বিন্দুর সৃষ্টি করে। এই বিন্দুতে অভিব্যক্ত চৈতন্য

১। তান্ত্রিক সাধন, দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ; কল্যাণ সাধনাঙ্ক (১ম), পৃ ৪২৩

ইতরলিঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ। শক্তির এই স্তরের নাম 'মধ্যমা বাক্'—ইহার প্রভাবে সৃষ্ট জগৎ তত্তদ্ভাবে স্থিত হয়। স্বভাবের নিয়মে যখন সংহার ক্রিয়া আরম্ভ হয় তখন জ্ঞানশক্তি ক্রিয়াশক্তিরূপে পরিণত হয়, শিবাংশ রৌদ্রী শক্তির সহিত সাম্যভাব প্রাপ্ত হয়, উহাদের ফলস্বরূপ যে অদ্বৈত বিন্দুর আবির্ভাব হয় তাহাকেই উড্ডীয়ান পীঠ বলে। এই বিন্দু হইতে অভিব্যক্ত চৈতন্যই মহাতেজঃসম্পন্ন 'পরলিঙ্গ' নামে অভিহিত হয়। ইহাই শব্দের 'বৈখরী' নামক চতুর্থ ভূমি। যে সংহারশীল জগতের আমরা অনুভব করি, তাহা বৈখরী শব্দেরই বিভূতি।[১]

সিদ্ধসিদ্ধান্তসংগ্রহের ২য় উপদেশে মাত্র দুইটী পীঠের বর্ণনা আছে, যথা—মূলাধারে কামরূপ পীঠ, ইহা সর্ব্বকামপ্রদায়িনী, এবং স্বাধিষ্ঠানচক্রে উড্ড্যান পীঠ, ইহাই সিদ্ধিস্থান। (বিশুদ্ধচক্রে যে অনাহত কলা বর্ত্তমান তাহাও যোগীদের মতে মহাসিদ্ধিদাত্রী।)

যোগশিখোপনিষদে চতুষ্পীঠতত্ত্ব এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে—কুণ্ডলিনী হইতে নাদ ও বিন্দু, তাহা হইতে হংস ও মন, তাহা হইতে কামফলপ্রদ স্বাধিষ্ঠানচক্রে কামরূপ পীঠ, হৃদয়ে অনাহত পূর্ণগিরি পীঠ, কণ্ঠকূপে বিশুদ্ধচক্রে জালন্ধর পীঠ আজ্ঞাচক্রে উড্যায়ন মহাপীঠ প্রতিষ্ঠিত আছে।[২]

রাজযোগ

"রাজত্বাৎ সর্ব্বযোগানাং রাজযোগ ইতি স্মৃতঃ",—যোগের রাজা বলিয়া 'রাজযোগ' নাম হইয়াছে।

রাজযোগসমাধিশ্চ উন্মনী চ মনোন্মনী।
অমরত্বং লয়স্তত্ত্বং শূন্যাশূন্যং পরং পদম্॥
অমনস্কং তথাদ্বৈতং নিরালম্বং নিরঞ্জনম্।
জীবন্মুক্তিশ্চ সহজাতুর্য্যা চেত্যেকবাচকাঃ॥[৩]

রাজযোগের এই ষোড়শটি বিভিন্ন নাম হইতেই তাহার স্বরূপ বুঝা যায়, এই সমুদয় শব্দই একার্থবোধক, অর্থাৎ এই শব্দসমুদয় দ্বারা সমাধিকেই বুঝায়। সমাধি কি? সলিলে সৈন্ধব মিলিত হইয়া যেরূপ সমতা প্রাপ্ত হয়, আত্মা ও মনের সেইরূপ ঐক্য হইলে তাহাকে সমাধি বলা যায়।

১। শক্তিসাধনা (ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ) কল্যাণ শক্তি অঙ্ক
২। যোগশিখোপ ১।১৭১ এবং ৫।৬ ইত্যাদি চতুষ্পীঠতত্ত্ব। ৩। হ-যো-প্র ৪।৩, ৪

আত্মার সহিত মনের যোগেই আত্মভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই সমাধি নামে পরিচিত। প্রাণ অর্থাৎ চাঞ্চল্য যখন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, মনের বাসনারাশি দূর হয়, তখন প্রাণ ও মনের ভেদ রহিত হইয়া যে একীভাব জন্মে, তাহাই সমাধি। এই অবস্থাতে একমাত্র আত্মা সর্ব্বময়রূপে বিদ্যমান থাকেন।

জীবাত্মা ও পরমাত্মার যে ঐক্য অবস্থা তাহাকেই সমস্ত সঙ্কল্পরূপী মানসকার্য্যের লয়স্বরূপ সমাধি নামে অভিহিত করা হয়।

রাজযোগস্য মাহাত্ম্যং কো বা জানাতি তত্ত্বতঃ।
জ্ঞানং মুক্তিঃ স্থিতিঃ সিদ্ধির্গুরুবাক্যেন লভ্যতে॥
দুর্ল্লভো বিষয়ত্যাগো দুর্ল্লভং তত্ত্বদর্শনম্।
দুর্ল্লভা সহজাবস্থা সদ্‌গুরোঃ করুণাং বিনা॥[১]

রাজযোগের মাহাত্ম্য জানেন এইরূপ জ্ঞানী দুর্ল্লভ। গুরুবাক্যানুসারে রাজযোগ সাধন করিতে পারিলে তত্ত্বজ্ঞান জন্মে এবং বিদেহমুক্তি হয়, তাহা হইলেই নির্ব্বিকার স্বরূপে অবস্থিতি অর্থাৎ জীবন্মুক্তি এবং অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে।

বিবিধ আসন, কুম্ভক, মুদ্রাদি সাধন দ্বারা যখন 'প্রবুদ্ধায়াং মহাশক্তৌ প্রাণঃ শূন্যে প্রলীয়তে' তখন সর্ব্ববিষয় ত্যক্ত হইয়া 'যোগিনঃ সহজাবস্থা স্বয়মেব প্রজায়তে'; ইহাই হঠযোগের সাহায্যে সমাধিলাভের উপায়। এই অবস্থায় প্রারব্ধ কর্ম্মও ক্ষয় পাইয়া থাকে। সমাধি দ্বারা প্রারব্ধ ক্ষয় করিয়া যে যোগী কালকে পরাজিত করিতে সক্ষম, তিনি ধন্য। সমাধিসিদ্ধিতে—

চিত্তে সমত্বমাপন্নে বায়ৌ ব্রজতি মধ্যমে।
তদামরোলী বজ্রোলী সহজোলী প্রজায়তে॥[২]

অর্থাৎ সমাধিসিদ্ধিতে বজ্রোলী, অমরোলী ও সহজোলী এই মুদ্রাসকল সিদ্ধি হয়। যখন চিত্তের সমতা অর্থাৎ ধ্যেয়াকার বৃত্তি প্রবাহতা প্রাপ্ত হয় এবং প্রাণ মধ্যনাড়ীতে গমন করে, তখন এই মুদ্রাত্রয় সিদ্ধ হয়। যাহার প্রাণ ও চিত্তজয় হয় নাই তাহার সিদ্ধি হয় না। 'যোগবীজ' গ্রন্থে আছে, নানাপ্রকার বিচার করিলেও মনের সমতা হয় না, অতএব মন ও প্রাণের পরাজয় কর্ত্তব্য, তদ্‌ব্যতিরেকে মোক্ষ সিদ্ধি হয় না। প্রাণকে ব্রহ্মরন্ধ্রে রুদ্ধ করিয়া লয় করিতে পারিলে মনেরও লয় হইবে।

১। হ যো প্র ৪।৮, ৯ ২। হ যো প্র ৪।১৪

যোগবাশিষ্টে আছে, প্রাণের ক্ষয় হইলে মন শান্ত হয়, এইরূপে নির্ব্বাণ লাভ হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, রাজযোগ পাতঞ্জলদর্শনের অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। সমাধি দুই প্রকার, সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত। তন্মধ্যে সম্প্রজ্ঞাত সমাধিকে যোগাঙ্গ ও অসম্প্রজ্ঞাতকে মুখ্য যোগ বলিতে হইবে। আসন হইতে আরম্ভ করিয়া সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অনুষ্ঠান দ্বারাই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভ হয়, অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞানও রোধ করিলে চিত্তের যে সম্পূর্ণ বৃত্তিহীন অবস্থা হয়, তাদৃশ সমাধির নামই অসম্প্রজ্ঞাত। ইহাই রাজযোগ বা নির্ব্বীজ সমাধিবিশেষ।

পাতঞ্জল-যোগসূত্রে নির্ব্বীজ সমাধির ভবপ্রত্যয় ও উপায়প্রত্যয় এই দ্বিবিধ ভেদ বর্ণিত হইয়াছে, তন্মধ্যে যোগীদের উপায়প্রত্যয় আর বিদেহলীন ও প্রকৃতিলীনদের ভবপ্রত্যয় হয়। প্রকৃতিলয় অর্থে প্রধানা ও মূলা প্রকৃতিতে লয় বুঝিতে হইবে, কারণ তাহাতেই চিত্ত লয় প্রাপ্ত হয় বা নির্ব্বীজ সমাধি হয়। শ্রদ্ধা বীর্য্য স্মৃতি সমাধি ও প্রজ্ঞা এই উপায় দ্বারা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি সিদ্ধির নাম উপায়প্রত্যয় ও জন্মের হেতুভূত অবিদ্যামূলক সংস্কারই 'ভব', ভবপ্রত্যয় সমাধিতে চিত্ত-নিরোধ হইলেও 'অবিদ্যা' নিবৃত্ত হয় না। তজ্জন্য আত্মা মুক্তিলাভ করে না।

চিত্তবৃত্তির সম্যগ্‌ নিরোধকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে। চিত্তের সমস্ত বৃত্তির নিরোধ অবস্থার যে কারণ (প্রত্যয়) তাহাই পরবৈরাগ্য, তাহার অভ্যাসপূর্ব্বক সংস্কারমাত্র যে সমাধিতে অবশিষ্ট থাকে তাহার নাম অসম্প্রজ্ঞাত (অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত হইতে অন্য বা ভিন্ন)। সংস্কারমাত্র থাকার অর্থ চিত্ত কিয়ৎক্ষণ নিরুদ্ধ থাকিয়া সংস্কারবশে পুনরায় উদিত হয়, তজ্জন্য উহার লক্ষণ 'সংস্কারশেষ'; এইরূপ সমাধির অপর নাম নির্ব্বীজ সমাধি, কারণ উহা নির্ব্বিষয়। 'প্রত্যয়' ও 'সংস্কার' চিত্তের এই দ্বিবিধ ধর্ম্ম, তন্মধ্যে চিত্তের জ্ঞান ও চেষ্টারূপ ধর্ম্মই 'প্রত্যয়' এবং স্থিতিরূপ ধর্ম্মের নাম 'সংস্কার'—অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে প্রত্যয় থাকে না, তবে সংস্কার থাকে বলিয়া পুনরায় চিত্তমধ্যে বৃত্তি উঠে।

চিত্ত ও আত্মার স্ব-স্বামি সম্বন্ধ, ব্যুত্থান অবস্থায় দ্রষ্টা পুরুষ বৃত্তিসকলের সহিত অভিন্নরূপে প্রতীত হয় ও বৃত্তিনিরোধে দ্রষ্টা পুরুষ সাক্ষিরূপে অবস্থিত থাকেন। গভীর অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া

বিষয়জ্ঞানশূন্য ও চিৎস্বরূপে বঞ্চিত অবস্থাকে সাধকের 'প্রকৃতিলয়' বা জড় সমাধির অবস্থা বলা হয়; ইহা যোগীদের কাম্য নহে।

বৃত্তিহীন হওয়াতে ইহা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হইলেও জ্ঞানহীন অবস্থা বলিয়া উহা প্রকৃত যোগাবস্থা নহে। বাস্তবিক যোগাবস্থা হইল উপায়প্রত্যয় অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি, উপায় অর্থে প্রজ্ঞা বা শুদ্ধ জ্ঞান। জ্ঞানের সম্যক্ উদয়ে যে সমাধি হয় তাহা অতুলনীয়। ভবপ্রত্যয় অবস্থাতে পুনরায় সংস্কারবশে ব্যুত্থান অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু প্রজ্ঞা উৎপন্ন হইলে সে আশঙ্কাও থাকে না, উহা কৈবল্যের পূর্ব্বস্বাদ স্বরূপ।

বৌদ্ধযোগী প্রতিসংখ্যা-নিরোধ ও অপ্রতিসংখ্যা-নিরোধ নামে যে সমাধির বর্ণনা করিয়াছেন তাহা উপায়প্রত্যয় ও ভবপ্রত্যয় অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির অনুরূপ। তপস্যা, স্বাধ্যায়, ঈশ্বর-প্রণিধান দ্বারা সংস্কারের স্থূলরূপ দূর করতঃ প্রসংখ্যান বা জ্ঞানাগ্নি দ্বারা তাহার সুখরূপ দগ্ধ করা বিধেয়। সম্প্রজ্ঞাত সমাধির প্রতি স্তরে জ্ঞানের উন্মেষ হয়, অতঃপর সস্মিতা সমাধিতে সালম্বজ্ঞানের চরমশুদ্ধি সম্পন্ন হয়। ইহার অপর নাম গৃহীতসমাপত্তি।[১]

রাজযোগে সাধনের ষোড়শ অঙ্গ আছে—অপরোক্ষানুভূতিপূর্ণ জীবন্মুক্ত যোগী ইহার তত্ত্বনির্দ্দেশে সক্ষম, প্রথমতঃ সোপান অতিক্রমের ন্যায় একে একে সপ্ত জ্ঞানভূমির অতিক্রমণ, তৎপরে প্রকৃতি ও পুরুষের সৎচিদ্‌রূপী দুই রাজ্যদর্শন ও প্রপঞ্চের বিস্মৃতি, ইহা অষ্টম ও নবম অঙ্গ, তৎপরে প্রকৃতির স্বরূপকে বুঝিয়া ব্রহ্ম, ঈশ বা বিরাট রূপে অদ্বিতীয় ব্রহ্মসত্তার দর্শন (ইহা দশম, একাদশ ও দ্বাদশ অঙ্গ) ও সর্ব্বশেষে বিতর্কানুগত, বিচারানুগত, আনন্দানুগত ও অস্মিতানুগত এই চারি প্রকার আত্মজ্ঞানযুক্ত সমাধি-দশা অতিক্রম করিয়া স্ব-স্বরূপপ্রাপ্তি হয়। এই দশাকে জীবন্মুক্ত দশা বলে। এই অবস্থা পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র, হঠ, লয় যোগের মহাভাব, মহাবোধ ও মহালয় সমাধি হইতে ভিন্ন। ইহাই সকল সাধনার চরম লক্ষ্য। ইহাই উপাসনারাজ্যের পরিধি ও বেদান্তের চরম সিদ্ধান্ত।

উপলব্ধমহাভাবা মহাবোধান্বিতাশ্চ বা।
মহালয়ং প্রপন্নাশ্চ তত্ত্বজ্ঞানাবলম্বতঃ॥
যোগিনো রাজযোগস্য ভূমিমাসাদয়ন্তি তে।
যোগসাধনমূর্দ্ধন্যো রাজযোগোঽভিধীয়তে॥

১। যোগ কা বিষয় পরিচয়, 'অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি'—ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ, কল্যাণ যোগাঙ্ক পৃ ৫৫

অতএব মন্ত্র, হঠ ও লয় যোগ সাধনে মহাভাব, মহাবোধ ও মহালয়সাধন, শেষে বিচারশক্তির পূর্ণতা দ্বারা রাজযোগের ধ্যানকে ব্রহ্মধ্যান ও সমাধিকে 'নির্ব্বিকল্প সমাধি' বলে। রাজযোগে সিদ্ধিপ্রাপ্ত যোগীই 'জীবন্মুক্ত', রাজযোগই যোগসাধনের মূর্দ্ধন্য বা চরমসীমা, এই নিমিত্ত ইহার নাম 'রাজযোগ'।[১]

দত্তাত্রেয় প্রভৃতি রাজযোগের সাধক, মন ও বায়ু নিশ্চল করাই ইহার উদ্দেশ্য, অতএব ইহাতে প্রাণায়াম আবশ্যক ও ইহা হঠযোগের অঙ্গ। হঠ ও রাজযোগের সম্বন্ধ নির্ণয় অধ্যায়ে ইহা ব্যাখ্যাত হইতেছে।

১। 'যোগচতুষ্টয়', কল্যাণ সাধনাঙ্ক (১ম) পৃ ১৩৪, ১৩৫

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হঠ ও রাজযোগের পরস্পর সম্বন্ধ বিচার

হশ্চ ঠশ্চ হঠঃ সূর্য্যচন্দ্রোতয়োর্যোগো হঠযোগ এতেন হঠশব্দ-বাচ্যয়োঃ সূর্য্যচন্দ্রাখ্যয়োঃ প্রাণাপানয়োরৈক্যলক্ষণং প্রাণায়ামো হঠযোগ ইতি হঠযোগলক্ষণং সিদ্ধং।[১] ইহাদ্বারা হঠযোগ কি, সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করা যায়। রাজযোগ অতিশ্রেষ্ঠ তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই, কিন্তু এই হঠযোগই তাহাতে আরোহণ করিবার সোপানস্বরূপ অর্থাৎ কোন উন্নত প্রাসাদশিখবে আরোহণ করিতে হইলে সোপান দ্বারা যেরূপ অনায়াসে আরোহণ করা সম্ভব হয়, সেইরূপ হঠযোগ-সোপান আশ্রয় করিলে অনায়াসে যোগশৈলের শিখরে আরোহণ কবা যায়। তাই হঠযোগপ্রদীপিকাতে স্বাত্মারাম বলিয়াছেন—

শ্রীআদিনাথায় নমোঽস্তু তস্মৈ যেনোপদিষ্টা হঠযোগবিদ্যা
বিভ্রাজতে প্রোন্নতরাজযোগমারোঢ়ুমিচ্ছারধিরোহিণীব ॥১।১
প্রণম্য শ্রীগুরুং নাথং স্বাত্মারামেণ যোগিনা।
কেবলং রাজযোগায় হঠবিদ্যোপদিশ্যতে ॥১।২

ইহার দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে কেবল রাজযোগের নিমিত্ত হঠবিদ্যা উপদেশ করা হইয়াছে। হঠযোগ দ্বারা যে সকল বিভূতি বা সিদ্ধি লাভ হয় তাহা লাভ করাই মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, রাজযোগ দ্বারা কৈবল্যলাভই উদ্দেশ্য, কৈবল্যলাভেচ্ছুর নিকট বিভূতিলাভ অতি নগণ্য। নানামত রূপ অন্ধকারে পড়িয়া যাহারা রাজযোগলাভ করিতে অক্ষম, তাহাদের জন্যই স্বাত্মারামযোগী হঠযোগ বিবৃত করিয়াছেন। ইহা রাজযোগ প্রকাশের প্রদীপস্বরূপ; মন্ত্রযোগাদি অন্যান্য যোগে সগুণ নির্গুণ ধ্যান ও মুদ্রাদি দ্বারা সাধকের যে রাজযোগপ্রাপ্তির কথা আছে তাহা অশান্তচিত্ত ব্যক্তিদের দ্বারা অলভ্য বলিয়া ঐ সকল যোগ তাহাদের পক্ষে গাঢ় অন্ধকারস্বরূপ এবং একমাত্র হঠযোগই তাহাদের আশ্রয়স্বরূপ বা সহায়। রাজযোগ না জানিয়া যে সাধক হঠযোগানুষ্ঠান করেন, তাঁহার শ্রম ব্যর্থ হয়।

১। হ-যো-প্র পৃ ১-৪

রাজযোগমজানন্তঃ কেবলং হঠকর্ম্মিণঃ।

এতানভ্যাসিনো মন্যে প্রয়াসফলবর্জ্জিতম্ ॥৪।৭৯[১]

কুম্ভকদ্বারা বায়ুরোধ-সামর্থ্য জন্মিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ চিত্তের লয় হয়, অতএব কুম্ভক অভ্যাসই মুক্তির হেতু, এই নিমিত্ত ইহাও রাজযোগ। ইহা দ্বারা কুণ্ডলিনী-শক্তিরও প্রবোধ জন্মে। সুষুম্না নাড়ীর শুদ্ধিতে হঠযোগের সিদ্ধি হয় এবং হঠযোগ বিনা রাজযোগ সিদ্ধ হয় না, অতএব সিদ্ধি পর্য্যন্ত রাজযোগ ও হঠযোগ উভয়েরই অভ্যাস কর্ত্তব্য।

হঠং বিনা রাজযোগো রাজযোগং বিনা হঠঃ।

ন সিধ্যতি ততো যুগ্মমনিষ্পত্তেঃ সমভ্যসেৎ ॥৬[২]

রাজযোগের শারীরিক সাধনের সহিত (অর্থাৎ আসন, প্রাণায়ামাদির সহিত) হঠযোগের সাদৃশ্য আছে। হঠযোগী স্থূলদেহ সাধনে ব্যাপৃত, পাশ্চাত্যের ডেলসার্ট আদি ব্যায়ামাচার্য্যগণ ও যোগী রামচরক[৩] প্রভৃতি দেহকে ইচ্ছামত চালিত করিবার ক্ষমতা অর্জ্জনের জন্য যে সকল উপদেশ দিয়াছেন তাহা হঠযোগের অনুরূপ সাধন। পানাহার বিধি ও শ্বাসপ্রশ্বাস বিধি এবং 'Ego'(= The Divine Spirit in every soul, around which clusters matter and energy) ও 'Prana' (= Energy used by the Ego)[৪] ইত্যাদির বর্ণনাও ইহাতে আছে। দৈহিক ক্রিয়া দ্বারা নানারূপ ব্যাধি দূর করা কিরূপে সম্ভব, তাহাও বর্ণিত হইয়াছে।

হঠযোগী কেবল পেশী নহে, হৃদ্‌যন্ত্রকেও রোধ করিতে সমর্থ, কিন্তু ইহা দ্বারা আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশাধিকার জন্মে না, অতএব রাজযোগীর পক্ষে ইহা আদর্শ নহে। হঠযোগীর বিশেষ প্রক্রিয়া দ্বারা শতায়ু হওয়া বিচিত্র নহে। রাজযোগীর পক্ষে 'জ্ঞান'সাধনই লক্ষ্য। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে (৩০১।১০৮-১০) আছে, "যে মহৎ জ্ঞান মহৎ ব্যক্তিদের মধ্যে, বেদসকলে, সংখ্যসম্প্রদায়ে ও যোগসম্প্রদায়ে দেখা যায় এবং পুরাণেও যে বিবিধ জ্ঞান দেখা যায় তাহা সমস্তই সাংখ্য হইতে আসিয়াছে।" এই সাংখ্যের উপর রাজযোগ-বিদ্যাও প্রতিষ্ঠিত, কারণ পাতঞ্জলসূত্র রাজযোগের শাস্ত্র ও সর্ব্বোচ্চ প্রামাণিক গ্রন্থ,

---

১। হ-যো-প্র ৪।৭৯ ২। হ-যো-প্র ২।৭৬

৩। Hatha Yoga, Yogi Ramcharaka (Chicago) ৪। Chap. XX

পাতঞ্জলদর্শন সাংখ্যমতের উপরই প্রতিষ্ঠিত, যোগ ও সাংখ্যে ভেদ অতি সামান্য।[১]

যোগানুশীলন বহু প্রাচীন, উপনিষদের মধ্যেও যোগের অনুশীলন আছে। কঠ উপনিষদে (১।৩।১০-১১) "ইন্দ্রিয়েভ্য পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধিঃ বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরং। মহতঃ পরমব্যক্তম্ অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ॥" অর্থাৎ ইন্দ্রিয় হইতে বিষয়সমূহ শ্রেষ্ঠ (কারণ, বিষয়সমূহ নিজ নিজ উপলব্ধির জন্য ইন্দ্রিয় নির্ম্মাণ করিয়াছে, কার্য্য অপেক্ষা কারণ সূক্ষ্মতর ও ব্যাপক অতএব শ্রেষ্ঠ), অর্থসমূহ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, কিন্তু মন হইতেও বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ এবং বুদ্ধি হইতে হিরণ্যগর্ভ শ্রেষ্ঠ। হিরণ্যগর্ভ হইতে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ।

যচ্ছেদ বাঙ্ মানসী প্রাজ্ঞস্তদ যচ্ছেজ্ জ্ঞান আত্মনি।
জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেৎ তদ্যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি॥

(ঐ ১।৩।১৩)

বিবেকী পুরুষ ইন্দ্রিয়বর্গকে মনে অর্পণ করিবেন, মনকে প্রকাশাত্মক বুদ্ধিতে অর্পণ করিবেন, বুদ্ধিকে প্রথমজ মহত্তত্ত্বে অর্পণ করিবেন এবং উক্ত মহান্ আত্মাকে সর্ব্ববিক্রিয়ারহিত মুখ্য আত্মাতে লয় করিবেন।

ইহা দ্বারা উপনিষদে সুমহৎ নির্গুণ আত্মজ্ঞান উপদিষ্ট হইতেছে, তাহার উপলব্ধির ক্রমও বর্ণিত হইয়াছে। কঠ উপনিষদে (১০-১১ শ্লোক) যে একটী অপরটী হইতে শ্রেষ্ঠ এই ক্রম বর্ণনা করা হইয়াছে এবং পুরুষকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে তাহা হঠযোগের ইন্দ্রিয়-নিরোধ দ্বারা আত্মতত্ত্ব উপলব্ধিরূপ যোগে উপনীত হইবার কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। এইরূপে উপনিষদেও হঠ ও রাজযোগের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধের ইঙ্গিত সুস্পষ্টরূপে বিদ্যমান। কেবল কঠোপনিষদে নহে, কেন (১।২) ইত্যাদি শ্রুতিতেও ইন্দ্রিয়াদিতে আত্মবুদ্ধি ত্যাগ করতঃ এই সংসার হইতে নিবৃত্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করার কথা আছে: এইরূপ যোগী দেহান্তে পুনর্ব্বার দেহ ধারণ করেন না।

প্রশ্নোপনিষদের তৃতীয় প্রশ্নে প্রাণতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তৎসহ সমান ও অপান বায়ুর বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। পঞ্চম প্রশ্নে প্রণবের তিনটী মাত্রার ধ্যানের কথা আছে। মাত্রাত্রয়ের পরস্পর-সম্বন্ধরূপে

১। রাজযোগ, স্বামী বিবেকানন্দ, ভূমিকা পৃ ৶০, ।০/

উপাসিত হইলে উহারা ব্রহ্মপ্রাপ্তির কারণ হয়। এই ধ্যানের ফলে ধ্যাতা সর্ব্বস্বরূপ হন এবং তাঁহার চাঞ্চল্যের কোন কারণ থাকে না (৫।৬)। ওঁকার অবলম্বনে অপরব্রহ্মাত্মক ত্রিবিধ প্রাপ্তি ঘটে এবং যাহা শান্ত, অজর, অমৃত, অভয় ও সর্ব্বোত্তম তাহাও এই ওঁকাররূপ প্রতীক অবলম্বনেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। অর্থাৎ ওঁকার দ্বারা পরব্রহ্মেরও প্রাপ্তি হয়। এইরূপে ওঁকার-সাধন ক্রমমুক্তির কারণ হইয়া থাকে। হঠযোগেও এই ক্রমমুক্তি আছে। 'মন্ত্রচৈতন্য' বা মন্ত্রযোগই তাহার সহায়। (মন্ত্রযোগ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

মাণ্ডুক্য উপনিষদে 'সাম্য' শব্দ দ্বারা 'মিলন' বর্ণিত হইয়াছে। মুক্তাত্মা যখন ব্রহ্ম দর্শন করে তখন যোগ নহে, সমতা লাভ করিয়া অহং ব্রহ্ম উপলব্ধি করে। (প্রোফেসার রাধাকৃষ্ণের মতে পাতঞ্জল যোগদর্শনের যোগ অর্থে 'প্রয়াস', 'মিলন' নহে। সাংখ্যযোগ অর্থে সম্যক্ জ্ঞানের যোগ, সং = সম্যক্, খ্যা = জ্ঞান)।

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়েও আত্মতত্ত্ববিষয়ক জ্ঞানের বিষয় আছে।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বক্ষঃ, গ্রীবা ও শিরোদেশ উন্নতভাবে রাখিয়া শরীরকে সমভাবে ধারণ করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে মনে স্থাপন করিয়া জ্ঞানী ব্যক্তির প্রণবরূপ ভেলা সাহায্যে ভয়াবহ স্রোত উত্তীর্ণ হইবার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। (২।৮)

প্রাণান্ প্রপীড্যেহ সংযুক্তচেষ্টঃ ক্ষীণে প্রাণে নাসিকয়োচ্ছ্বসীত।
দুষ্টাশ্বযুক্তমিব বাহমেনং বিদ্বান্ মনো ধারয়েতাপ্রমত্তঃ ॥[১]

অর্থাৎ সংযুক্তচেষ্ট ব্যক্তি যোগমার্গে প্রাণকে সংযম করেন, যখন উহা শান্ত হইয়া যায়, তখন নাসিকা দ্বারা প্রশ্বাস পরিত্যাগ করেন। পরে যেমন সারথি চঞ্চল অশ্বযুক্ত রথে আরূঢ় থাকেন তদ্রূপ যোগীও মনকে অপ্রমত্তভাবে ধ্যেয় বস্তুতে একাগ্র করিবেন।

চক্ষুর প্রীতিকর, সমতল, শুচি, অগ্নি ও বালুকাশূন্য ইত্যাদি স্থানে নির্জ্জনে যোগ অভ্যাস করিতে এবং ব্রহ্মের অভিব্যক্তিসূচক 'নীহার-ধূমার্কানিলানলানাং খদ্যোতবিদ্যুৎস্ফটিক শশিনাম্' রূপ ধ্যান করিবার কথা শ্বেতাশ্বতরে বর্ণিত হইয়াছে। (২।১০, ১১)

পৃথ্ব্যপ্ তেজোঽনিলখে সমুত্থিতে পঞ্চাত্মকযোগগুণে প্রবৃত্তে।
ন তস্য রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরম্ ॥২।১২

১। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ২।৯

যখন যোগীর পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূত হইতে পঞ্চগুণরূপ যৌগিক অনুভূতিসমুদয় হইতে থাকে, তখন যোগ আরম্ভ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। যিনি এইরূপ যোগাগ্নিময় শরীর পাইয়াছেন, তাঁহার আর ব্যাধি, জরা, মৃত্যু থাকে না।

যোগারম্ভ করিলে শরীরের লঘুতা, স্বাস্থ্য, লোভশূন্যতা, সুন্দর বর্ণ, স্বরসৌন্দর্য্য, মূত্রপুরীষের অল্পতা ও শরীরের একটী পরম সুগন্ধ এই লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়।

মৃত্তিকাদিলিপ্ত সুবর্ণ ও রজত অগ্ন্যাদির দ্বারা উত্তমরূপে বিশোধিত হইলে যেমন তেজোময় হইয়া প্রকাশ পায় সেইরূপ আত্মতত্ত্ব-সাক্ষাৎকার হইলে যোগী পরমাত্মার সহিত অভিন্ন ও সর্ব্বদুঃখবিমুক্ত হন। (শ্বেতাশ্বতর)।

অতএব দেখা যাইতেছে, উপনিষদে যে যোগতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে তাহার সহিত হঠযোগের ইন্দ্রিয়নিরোধ প্রভৃতি আচরণ না করিলে রাজযোগ সহজলভ্য হয় না। প্রবন্ধের প্রথমেই তাই বলা হইয়াছে—"কেবলং রাজযোগায় হঠবিদ্যোপদিশ্যতে"—এবং রাজযোগ না জানিয়া কেবল হঠযোগানুষ্ঠানে ব্যর্থ পরিশ্রম হয় (হ-যো-প্র ৪।৭৯)। অতএব—

হঠং বিনা রাজযোগো রাজযোগং বিনা হঠঃ।
ন সিধ্যতি ততো যুগ্মমানিষ্পত্তেঃ সমভ্যসেৎ॥[১]

প্রাণায়ামাদি হঠযোগ বিনা রাজযোগ সিদ্ধ হয় না, রাজযোগ বিনা হঠযোগ সিদ্ধ হয় না, অতএব সিদ্ধিলাভ পর্য্যন্ত পরস্পরের সহকারিরূপ হঠযোগ ও রাজযোগ উভয়ই সমভাবে অভ্যাস করিতে থাকিবে।

নাড়ীচক্র ও নাড়ীশুদ্ধি

মানবদেহের সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া ৭২,০০০ নাড়ী আছে, উহার দ্বারাই শোণিতের প্রবাহাদি কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। এই নাড়ীচক্র মধ্যে প্রধান নাড়ী ৭২টী, তাহার দ্বারা প্রাণক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তন্মধ্যেও আবার দশটী প্রধানতম।

প্রধানাঃ প্রাণবাহিন্যো ভূয়স্তত্র দশ স্মৃতাঃ।
ইড়া চ পিঙ্গলা চৈব সুষুম্না চ তৃতীয়িকা॥ ১।২৪

১। হ-যো-প্র ২।৭৬

গান্ধারী হস্তিজিহ্বা চ পূষা চৈব যশস্বিনী।
অলম্বুষা কুহূশ্চৈব শঙ্খিনী দশমী স্মৃতা॥ ১।২৫
(গোরক্ষসংহিতা)

যোগশিখোপনিষদে (৫।১৬) উক্ত নাড়ীচক্রের বর্ণনা আছে।

শিবসংহিতা মতে চতুর্দ্দশ নাড়ী প্রধানতমা এবং মানবদেহ মধ্যে সার্দ্ধতিনলক্ষ নাড়ী বিদ্যমান এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।
(২।১৩, ১৪, ১৫ শিবসংহিতা)।

উক্ত নাড়ী মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এই নাড়ীত্রয় যোগসাধনের উপযুক্ত, তন্মধ্যে সুষুম্না নাড়ী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না চ ত্রিস্রোনাড্য উদাহৃতাঃ।
ইড়া তত্র স্থিতা বামে, দক্ষিণে পিঙ্গলা স্থিতা।
সুষুম্না মধ্যদেহস্থা প্রাণমার্গং সমাশ্রিতা।
প্রাণোঽপানঃ সমানশ্চোদানব্যানৌ চ বায়বঃ॥[১]

ত্রিশিখো ব্রাহ্মণ উপনিষদে ইহাদের সংস্থান বর্ণিত হইয়াছে, বরাহ উপনিষদে নাড়ীকন্দ ব্যাখ্যাত হইয়াছে।[২]

ইড়া নাড়ীর দেবতা সোম, পিঙ্গলার সূর্য্য, সুষুম্নার অধিদেবতা অগ্নি। ষট্চক্রাদিগ্রন্থেও মেরুদণ্ডের বামে ও দক্ষিণে চন্দ্র ও সূর্য্যরূপ নাড়ীর কথা বর্ণিত হইয়াছে, যথা "মেরোর্ব্বাহ্যপ্রদেশে শশিমিহিরশিরে সব্যদক্ষে নিষণ্ণে মধ্যে নাড়ী সুষুম্না ত্রিতয়গুণময়ী চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিরূপা" ইত্যাদি (গোরক্ষ সংহিতা)।

জীবদেহে নাড়ীসমূহ মধ্যে বায়ু বিচরণ করিতেছে, এই এক বায়ুর ক্রিয়াভেদে দশটী নাম হইয়াছে, যথা প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়। হৃদয়দেশে 'প্রাণ' বায়ুর বসতি, ব্যান বায়ু সর্ব্বদেহ ব্যাপিয়া আছে, অপান, সমান ও উদান যথাক্রমে গুহ্য, নাভিমণ্ডল ও কণ্ঠ মধ্যে অবস্থিত। এই প্রাণাদি পঞ্চ-বায়ুই প্রধান, ইহার সহিত নাগাদি পঞ্চবায়ুর পদার্থগত কোন ভেদ নাই।

১। গোরক্ষসংহিতা ১।২৭, ২৮। Studies in the Tantras. Bagchi, p. 36।
বৌদ্ধমতে ইহারা ললনা, রসনা, অবধূতী নামে খ্যাত। ললনা প্রজ্ঞাস্বভাব, রসনা উপায়স্বভাব, অবধূতী গ্রাহ্যগ্রাহক বর্জ্জিতা।

২। ত্রিশিখো. ব্রাহ্মণ উপ. ৩৬ শ্লোক ইত্যাদি। বরাহ উপ. ৫।২০

বায়ুর সহিত দেহের সম্বন্ধ। জীব সর্ব্বদা প্রাণ ও অপান বায়ুর দ্বারা দেহের অধোদেশে প্রধাবিত হইতেছে, প্রাণের দ্বারা বামভাগে ও অপানের দ্বারা দক্ষিণভাগে বিচরণ করিতেছে। জীবের এই সঞ্চালন-ক্রিয়া অতিদ্রুত বলিয়া বাহির হইতে লক্ষিত হয় না। প্রাণ ও অপান বায়ু উভয়ে উভয়কে ঊর্দ্ধ-অধোদেশে আকর্ষণ করিতেছে, এই আকর্ষণ ক্রিয়া যিনি অবগত হন, তিনিই যোগী। যখন জীব বহির্ভাগে প্রধাবিত হয় তখন 'হং' শব্দের উচ্চারণ হয়, এবং যখন জীব পুনরায় অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তখন 'সঃ' শব্দের উচ্চারণ হয়, এইরূপে জীব দিবা ও রাত্রিতে 'হংস' এই মহামন্ত্রটি একবিংশতি সহস্র ষট্ শত বার (২১ হাজার ছয়শত বার) জপ করিতেছে।

হকারেণ বহির্যাতি সকারেণ বিশেৎ পুনঃ।
হংস হংসেতি মন্ত্রোঽয়ং সর্ব্বৈর্জীবৈশ্চ জপ্যতে।
গুরুবাক্যাৎ সুষুম্নায়াং বিপরীতো ভবেজ্জপঃ।
সোঽহংসোঽহমিতি প্রোক্তো মন্ত্রযোগঃ স উচ্যতে।

(যোগশিখোপনিষৎ, ১৩০-১৩২ শ্লোক)

"অথ 'হংস' ঋষি······সোহং ইতি কীলকম্।" এই হংস মন্ত্রকে চতুর্ভাগে বিভক্ত করিয়া সূর্য্য, চন্দ্র, নিরঞ্জন ও নিরাভাসকে অর্পণ কর্ত্তব্য, এইরূপে হৃদয় মধ্যে অষ্টদলে হংসাত্মাকে ধারণ করিবে।

(হংস উপ, ১০-১৩)

মহামন্ত্র কথন। গোরক্ষসংহিতায় এইরূপ আছে—

হংকারণে বহির্যাতি সঃকারণে বিশেৎ পুনঃ।
হংসো হংসেত্যমুং মন্ত্রং জীবো জপতি সর্ব্বদা॥ (১।৩৬)

কবীরও বলিয়াছেন, জীব এই 'হংস' মন্ত্র দিবারাত্রিতে ২১,৬০০ বার জপ করেন অর্থাৎ ২১,৬০০ বার জীব শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করে।[১]

এই হংস মন্ত্রই 'মহামন্ত্র' বা অজপা গায়ত্রী, গুরুর উপদেশে এই মন্ত্রই 'সোহং' মন্ত্রে পরিণত হয়। এই অজপা গায়ত্রী পরম মোক্ষদায়িনী।

অজপা নাম গায়ত্রী যোগিনাং মোক্ষদায়িনী
তস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ১।৩৮

১। ধ্যানবিন্দু উপ. ৬২ শ্লোক—হংসহংসেত্যমুং মন্ত্রং জীবো জপতি সর্বদা।
শতানি ষট্ দিবারাত্রং সহস্রাণ্যেকবিংশতি। গো. সং ১।৩৭

অনয়া সদৃশী বিদ্যা, অনয়া সদৃশো জপঃ।
অনয়া সদৃশং জ্ঞানং ন ভূতম্ ন ভবিষ্যতি ॥ ১।৩৯
(গোরক্ষসংহিতা)

অজপা গায়ত্রী স্মরণ করিতে করিতে যোগী সমস্ত পাপরাশি হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন, পরে চিত্তশুদ্ধি দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানলাভ ও কৈবল্যপ্রাপ্তি সম্ভব হয়। ইহার ন্যায় বিদ্যা, ইহার ন্যায় মন্ত্র, ইহার সদৃশ জ্ঞান পূর্ব্বে ছিল না বা ভবিষ্যতে হইবে না।

মন পবন অরু সুরতি কৌ আতম পকড়ে আপ।
রজ্জব লাবৈ তত্ত্ব সো যোহো অজপা জাপ।
(সর্ব্বাঙ্গী ১৯।২২)

আত্মা স্বয়ং যখন মন, পবন ও সুরতিকে ধৃত করে, এবং তাহা একত্রিত করিয়া তত্ত্বে সন্নিবেশিত করে, তখন অজপাজাপ সাধন হয়। রজ্জবের মতে অজপাজাপ অর্থে শরীর, শব্দ ও শ্বাসের মিলন দ্বারা 'স্মরণ'।[১] নির্গুণীদের এই অজপাজাপ গোরক্ষসম্প্রদায় হইতে গৃহীত।

গোরক্ষপদ্ধতি (শতক), গোরক্ষসংহিতা প্রভৃতিতে হকারেণ বহির্যাতি সকারেণ বিশেৎ পুনঃ ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত শ্লোক এবং উহা যোগীদের মোক্ষপ্রদ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।[২]

কুণ্ডলিন্যাঃ সমুদ্ভূতা গায়ত্রী প্রাণধারিণী।
প্রাণবিদ্যা মহাবিদ্যা যস্তাং বেত্তি স বেদবিৎ ॥১।৪০
(গোরক্ষসংহিতা)

এই অজপা গায়ত্রী কুণ্ডলিনী শক্তি হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে, ইহার দ্বারাই জীবন সঞ্চারিত হয়, সুতরাং ইহাকে 'প্রাণবিদ্যা' বলে, যিনি এই মহাবিদ্যা জানেন তিনি বেদবেত্তা বলিয়া প্রখ্যাত হন।

নাড়ীশুদ্ধি। নাড়ীপুঞ্জের সংস্থান বর্ণিত হইল, বিধিবিহিতরূপে তাহাদের শুদ্ধি কিরূপে সম্ভব তাহা যোগিযাজ্ঞবল্ক্যে এইরূপে বিবৃত হইয়াছে। নিষ্কাম ও নিঃসঙ্কল্প হইয়া অনুষ্ঠান এবং যম ও নিয়ম পালন করিয়া সর্ব্বসঙ্গ পরিবর্জ্জন করিয়া, জিতাসনগত হইয়া পবিত্র স্থানে প্রাণায়াম অভ্যাস কর্ত্তব্য। মন্ত্রপাঠ সহকারে অঙ্গন্যাস ও নিয়ত ভস্ম ধারণ-

---

১। Nir. Sch. of H. Poetry—p. 296. Kabir's Ref.
২। Nir. Sch. of H. Poetry—Barthwal, p. 295
ঐ পৃ ২৯৬ গোরক্ষশতকের উল্লেখ।

পূর্ব্বক অভীষ্টদেব ও গুরুকে প্রণতিপূর্ব্বক স্মরণ করিবে। আসনবদ্ধ হইলে তদুপরি পূর্ব্বাস্য বা উত্তরাস্য হইয়া গ্রীবা, মস্তক ও দেহ সরলভাবে রাখিয়া সংবৃতমুখে নিশ্চলভাবে নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি স্থাপন করিবে। তৎকালে বামহস্তের উপর দক্ষিণহস্ত স্থাপনা করিতে হয়। অনন্তর নাসিকাগ্রে জ্যোৎস্নাজাল-বিরাজিত চন্দ্রবিম্ব ও বিন্দুযুক্ত সপ্তমবর্গের চতুর্থ অক্ষর (হঁ) হইতে অমৃত স্রাবিত হইতেছে, চক্ষুর্দ্বারা এইরূপ দেখিয়া সমাহিতভাবে ইড়া নাড়ীতে বায়ু আরোপণ ও উদর পূর্ণ করিবে। পরে শরীরমধ্যস্থ জ্বালামালাসঙ্কুল অগ্নির ধ্যান করিয়া বহ্নিমণ্ডলমধ্যস্থ সানুস্বার বহ্নিবীজ রকার (রং) চিন্তা সহকারে শনৈঃ শনৈঃ বায়ুরেচন করিতে হয়। অনন্তর ধীমান্ ব্যক্তি পুনরায় পিঙ্গলাযোগে দক্ষিণ নাসিকায় প্রাণবায়ু পূরণ করিয়া ইড়া দ্বারা শনৈঃ শনৈঃ রেচন করিবে। নির্জ্জন স্থানে উপবিষ্ট হইয়া প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যায় ছয়বার অভ্যাস করিলে তিনচারি মাস হইতে তিনচারি বৎসর পর্য্যন্ত কাল মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণবিশিষ্ট নাড়ীশুদ্ধি হইয়া থাকে। নাড়ীশুদ্ধির লক্ষণ যথা :—

নাড়ীশুদ্ধিমবাপ্নোতি পৃথক্‌চিহ্নোপলক্ষিতাম্।
শরীরলঘুতা দীপ্তির্বহ্নের্জঠরবর্ত্তিনঃ ॥ ২১
নাদাভিব্যক্তিরিত্যেতচ্চিহ্নং তৎসিদ্ধিসূচকম্।
যাবন্নৈতানি সম্পশ্যেৎ তাবদেবং সমভ্যসেৎ ॥ ২২[১]

ত্রিচতুস্ত্রিচতুঃসপ্তত্রিচতুর্ম্মাসপর্য্যন্তং ত্রিসন্ধিষু তদন্তরালেষু চ ষট্‌কৃত্ব আচরেন্নাড়ীশুদ্ধি র্ভবতি। ততঃ শরীরে লঘুদীপ্তি র্ব্বহ্নিবৃদ্ধিনাদাভিব্যক্তি র্ভবতি।[২] অর্থাৎ নাড়ীশুদ্ধি হইলে দেহের লঘুতা, উদরাগ্নির উদ্দীপ্তি এবং শরীরাভ্যন্তরে নাদের অভিব্যক্তি এই সকল সিদ্ধিসূচক চিহ্ন দৃষ্ট হয়। যতদিন এই সকল লক্ষণ লক্ষিত না হয়, তাবৎকাল অভ্যাস কর্ত্তব্য।

এই লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইলে রেচক, কুম্ভক ও পূরকাত্মক প্রাণায়াম করিতে হইবে। অপানের সহিত প্রাণের যোগের নামই প্রাণায়াম। প্রাণায়ামের দ্বারা শরীরের সমস্ত দোষ দগ্ধ হইয়া যায়। ধারণা দ্বারা মনের অপবিত্রতা দূর হয়, প্রত্যাহার দ্বারা সঙ্গদোষ নাশ হয় এবং ধ্যানের দ্বারা যাহা কিছু আত্মার ঈশ্বরভাব আবরণ করিয়া রাখে, তাহা নাশ হইয়া যায়।

১। যোগিযাজ্ঞবল্ক্য ৫ম অধ্যায়, উত্তরখণ্ড—'নাড়ীশুদ্ধি'। ২। শাণ্ডিল্য উপ. ৫।৩, ৪

নাড়ীশুদ্ধি রাজযোগের অন্তর্গত না হইলেও শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় ভাষ্যকারও ইহার বিধান দিয়াছেন, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের শঙ্কর ভাষ্যে আছে, "প্রাণায়াম দ্বারা ধৌত মনই ব্রহ্মে স্থির হয়, এইজন্যই শাস্ত্রে প্রাণায়াম বিধি আছে। প্রথমে নাড়ীশুদ্ধি করিলে তবে প্রাণায়ামের অধিকার জন্মে। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসা বন্ধ করিয়া বাম নাসিকা দ্বারা পূরণ ও তৎক্ষণাৎ বাম নাসিকা বন্ধ করিয়া দক্ষিণ দ্বারা রেচন, পুনঃ দক্ষিণে পূরণ, বামে রেচন করিবে। অহোরাত্র চারিবার—উষা, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন ও অর্দ্ধরাত্রে পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়া তিন বা পাঁচবার অভ্যাস করিলে একপক্ষ বা মাসের মধ্যে নাড়ীশুদ্ধি হয়।"[১]

গোরক্ষপদ্ধতিতে আছে—

শুদ্ধিমেতি যদা সর্ব্বং নাড়ীচক্রং মলাকুলম্।
তদৈব জায়তে যোগী প্রাণসংগ্রহণে ক্ষমঃ ॥[২]

অর্থাৎ যখন সমস্ত মলাকুল নাড়ীর শুদ্ধি হয় তখনই যোগী প্রাণ সংরক্ষণের ক্ষমতা অর্জ্জন করেন।

১। রাজযোগ—বিবেকানন্দ, পৃ ২৫। শ্বেতা. উপ শঙ্কর ভাষ্যের ২ অ. ৮ শ্লোক।
২। গোরক্ষপদ্ধতি, ১।৯৫ শ্লোক।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নাদ ও নাদানুসন্ধান ও নাদের অবস্থাচতুষ্টয়

বিন্দু বা আকাশ একটী বিশ্বব্যাপী সত্তা। উহা সাম্যভাবে বিদ্যমান কিন্তু বৈষম্য না ঘটিলে সৃষ্টি হয় না, তাই এই আকাশে চিৎশক্তির সঞ্চাব বা আঘাত হইলে কম্পন আরম্ভ হয়। সেই কম্পনের ফলেই এই সৃষ্টিব প্রারম্ভ। চিৎ হইতে শুদ্ধ অচিৎ ও ক্রমশঃ অচিৎ এইভাবে সৃষ্টির কম্পন হইতে থাকে। কম্পনের শুদ্ধ অচিৎ অবস্থায় সাম্যভাব নষ্ট হইয়া যায়, এবং উহা দ্বিধাবিভক্ত হইয়া অন্তর ও বাহির এই দুইটী রূপে প্রকাশ পায়, তৎসহ নাদের উৎপত্তি হয়, কারণ আকাশের গুণই 'শব্দ'। শুদ্ধ অচিৎ পঞ্চমুখী হইয়া অচিৎএ পৌছায় ও তাহারা একত্র হইয়া জগৎ সৃষ্টি করে। মানবমন বহির্মুখী হইলেও তাহার এক সামান্য অংশ অন্তর্মুখী। তাই মানব জড় জগৎ হইতে নিজের মনকে সঙ্কুচিত করিয়া শুদ্ধ চিৎএর দিকে অগ্রসর হইতে পারে। যখন বহির্মুখী পঞ্চধারা অন্তর্মুখী হইয়া শুদ্ধ অচিৎএ ফিরিয়া আসে তখন ঐ পঞ্চধারার সহিত শুদ্ধ অচিৎএর বা মূলাধাবের একটী ধারা বা বিন্দু মিলিয়া ছয়টী ধারা একত্রিত হইলে তাহার দ্বারা ষট্‌চক্রভেদ হয়। অতঃপর শুদ্ধ চিৎএর দিকে অগ্রসব হইবার পথ উন্মুক্ত হয়। গুরুপ্রসাদে নাদরূপে ইহার সাধন হইয়া থাকে। উক্ত ছয়টী ধারার একটী মন বা চিৎ ও অন্য পাঁচটী অচিৎ পদার্থ।

বদ্ধজীব শ্বাসপ্রশ্বাসের অধীন, তাহাদেব ইড়াপিঙ্গলামার্গ নিবন্তর ক্রিয়াশীল বলিয়া সুষুম্নামার্গ একপ্রকার রুদ্ধ। পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও চিত্তবৃত্তি বহির্মুখী হওয়ায় যে অখণ্ডনাদ জগতের অন্তস্তলে, আকাশমণ্ডলে নিরন্তর ধ্বনিত হইতেছে উহা জীবের শ্রুতিগোচর হয় না, গুরুকৃপায় বা শাম্ভবী-মুদ্রাদি কৌশলের দ্বারা প্রাণ স্থির হইলে শূন্যপথ মধ্যে অনাহত ধ্বনি শ্রুত হয়। নিরন্তর এই ধ্বনির অনুসন্ধানে রত থাকিলে মন ক্রমশঃ নির্ম্মল হয় ও শান্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। মন পূর্ণরূপে স্থির হইলে নাদধ্বনিও বিলীন হয়। সেই অবস্থায় চিদাত্মক আত্মা আপন স্বরূপে স্থিত হইয়া বাহ্য প্রকৃতির স্পর্শ হইতে মুক্ত হয়, তখন নাদও লয়প্রাপ্ত হয়।

নাদ মূলতঃ এক, কিন্তু ঔপাধিক সম্বন্ধের নিমিত্ত উহাকে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করা হইয়াছে। যোগিগণের মতে সাধারণতঃ উহার সপ্ত

বিভাগ প্রসিদ্ধ আছে, একমাত্র ওঁকার বা প্রণব উপাধিরহিত শব্দতত্ত্বরূপে বর্ণিত হইয়াছে। বৈয়াকরণেরা ও কোন কোন প্রাচীন সাধকসম্প্রদায় উহার 'স্ফোট' আখ্যা দিয়াছেন অর্থাৎ উহা হইতে ব্রহ্মভাবের স্ফূর্ত্তি হয়, তাই ওঁকার স্ফোট। প্রণব বা শব্দব্রহ্ম অখণ্ড সত্তা ব্রহ্মতত্ত্বের বাচক ও বাচ্য সত্তা পরব্রহ্ম রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। অতএব ব্রহ্মই ব্রহ্মের প্রকাশক, তদতিরিক্ত কোন পদার্থ দ্বারা তিনি প্রকাশিত হইতে পারেন না। স্ফোট বা শব্দতত্ত্ব জীবপক্ষে যতদিন অব্যক্ত থাকে, ততদিন তাহার দ্বারা কোন প্রয়োজন সিদ্ধি হয় না, তাই যোগী যথাবিধি ধ্বনি ও নাদের অবলম্বনে ইহার অভিব্যক্তি কামনা করেন। কুণ্ডলিনীর উদ্বোধনও আংশিকভাবে এই কার্য্যের সহায়ক, মূলাধার হইতে নাদের উৎপত্তি ও সহস্রারে উহার লয়প্রাপ্তি হয়, সাধক এই নাদের সহিত তাহার মনকে যুক্ত করিয়া অনায়াসে পরব্রহ্মপদ পর্য্যন্ত উপলব্ধি করিয়া মনকে চিন্ময় করতঃ স্বয়ং চৈতন্যের সহিত মিলিত হন। এই নাদানুসন্ধানের বৃত্তান্ত হঠযোগপ্রদীপিকা, যোগতারাবলী প্রভৃতিতে বর্ণিত হইয়াছে। নাদানুসন্ধানের প্রথম অবস্থায় প্রাণবায়ু ব্রহ্মরন্ধ্রে গমন সময়ে সাগরগর্জ্জন, মেঘধ্বনি, ভেরীশব্দাদি শোনা যায়, মধ্য অবস্থায় প্রাণবায়ু ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইলে মর্দ্দল, শঙ্খ, ঘণ্টাদি শব্দের ন্যায় সূক্ষ্ম শব্দ শোনা যায়, এবং অন্তে প্রাণবায়ু ব্রহ্মরন্ধ্রে স্থির হইলে ক্ষুদ্র ঘণ্টা, বংশী, বীণা ও ভ্রমরাদির নাদের ন্যায় সূক্ষ্মতর নাদ শোনা যায়। নাদানুরক্ত মন সর্ব্ববিষয় পরিত্যাগ করে, ইহা হইতে মনের সমাধি লাভ হয়।[১]

নাদের অবস্থাচতুষ্টয়, যথা আরম্ভাবস্থা, ঘটাবস্থা, পরিচয়াবস্থা ও নিষ্পত্ত্যবস্থা। সর্ব্বপ্রকার চিত্তবৃত্তিনিরোধেই উক্ত অবস্থাচতুষ্টয় হইয়া থাকে। প্রাণায়াম দ্বারা অনাহত চক্রে বর্ত্তমান ব্রহ্মগ্রন্থির ভেদ হইলে দেহমধ্যে হৃদয়াকাশে নানাবিধ ভূষণধ্বনির ন্যায় আনন্দধ্বনি শ্রুত হয়, তখন যোগীর হৃদয় প্রাণবায়ু দ্বারা পূর্ণ হয়, দেহ রূপলাবণ্যসম্পন্ন হয়, তেজ বৃদ্ধি হয়, রোগ দূর হয় ও অতিউত্তম গন্ধ অনুভূত হয়। ইহাই যোগীর 'আরম্ভাবস্থা'।

নাদের দ্বিতীয় অবস্থায় প্রাণবায়ুর সহিত অপানবায়ু এবং নাদবিন্দু মিলিত হইয়া কণ্ঠস্থিত ষোড়শদল মধ্যচক্রে আবদ্ধ হয়, প্রাণ-অপান বায়ু ও

১। হংসউপনিষদ, ১৩ শ্লোক, দশবিধ নাদবর্ণনা আছে। দশম নাদটী (মেঘনাদ) অভ্যাস কর্ত্তব্য। নাদবিন্দু উপঃ—৩১-৪১ শ্লোক, সিদ্ধাসনে বৈষ্ণবী মুদ্রাসাধনে দক্ষিণকর্ণে নাদশ্রবণ, নাদানুসন্ধানে চিত্তবিলীন ও 'উন্মনী' অবস্থা প্রাপ্তির বিবরণ আছে।

নাদবিন্দু একীভূত হইয়া ঘটাকৃতি হয় বলিয়া এই অবস্থার নাম 'ঘটাবস্থা'। কণ্ঠস্থিত বিষ্ণুগ্রন্থির ভেদবশতঃ ব্রহ্মানন্দসূচক ভেরী শব্দের ন্যায় শব্দ শ্রুত হয়, তাহা শ্রবণে পরমানন্দ লাভ হয়।

তৃতীয় বা 'পরিচয়' অবস্থাতে ভ্রূমধ্যগত আকাশে মর্দ্দল নামক বাদ্যবিশেষের ন্যায় শব্দ অনুভূত হয়, এই অবস্থায় প্রাণ অণিমাদি অষ্টসিদ্ধির আশ্রয়ভূত ভ্রূমধ্যগত আকাশ প্রাপ্ত হয় এবং যোগীর ক্ষুধা-নিদ্রাদি দূর হইয়া আত্মসুখের উপলব্ধি ঘটে। প্রাণের আজ্ঞাচক্রস্থিত রুদ্রগ্রন্থি বা ঈশ্বরের পীঠস্থান ভেদে এই অবস্থা হয়।

চতুর্থ বা 'নিষ্পত্তি' অবস্থায় প্রাণ ব্রহ্মরন্ধ্রে গমন করে, তখন বংশীধ্বনি বা বীণাবাদনের ন্যায় শব্দ শ্রুত হয়। চিত্ত একবিষয়ীভূত হয় ও বিষয়-বিষয়ীর অভেদহেতু মন নির্ব্বিষয় হয়। এইরূপ চিত্তের একাগ্রতাই 'রাজযোগ', তখন যোগী সৃষ্টি ও প্রলয় করিতে সক্ষম বলিয়া তাঁহাকে ঈশ্বর বা ঈশ্বরতুল্য বলা যায়।[১]

গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহে নাদের অবস্থাচতুষ্টয়ের কথা আছে, যথা—আরম্ভ, ঘট, পরিচয় ও নিষ্ঠাবস্থা। আরম্ভ অবস্থায় "ব্রহ্মগ্রন্থির্ভবেদ্ ভিন্ন আনন্দঃ শূন্যসম্ভবঃ। বিচিত্রক্বণিকো দেহোঽনাহতঃ শ্রূয়তে ধ্বনিঃ॥ দিব্যগন্ধো দিব্যচক্ষুস্তেজস্বী স্যাদরোগবান্। সম্পূর্ণহৃদয়ঃ শূন্য আরম্ভো যোগবান্ ভবেৎ।"

অথ ঘটাবস্থায়—"ঘটীকৃত্য বায়ুর্ভবতি মধ্যগঃ। দৃঢ়াসনোভবেদ্ যোগী জ্ঞানী দেবসমস্তথা। বিষ্ণুগ্রন্থির্যদা ভিন্নঃ পরমানন্দসূচকঃ। অতিশূন্যবিভেদশ্চ ভেরীশব্দস্তথা ভবেৎ॥"

অথ পরিচয়াবস্থা—"ততো ভিত্বা বিহায়োমর্দ্দলধ্বনিঃ। মহাশূন্যাং তথা যাতি সর্ব্বসিদ্ধিসমাশ্রয়ম্॥ চিত্তানন্দং ততো জিত্বা সহজানন্দসম্ভবঃ। দোষদুঃখক্ষুধানিদ্রাজরামৃত্যুবিবর্জ্জিতঃ॥ রুদ্রগ্রন্থিং ততো ভিত্বা সর্ব্বপীঠ-গতোঽনিলঃ।"

অথ নিষ্ঠাবস্থা—"নিষ্পন্নৌ বৈণবঃ শব্দঃ ক্বণদ্বীণাক্বণো ভবেৎ। অস্ত বা মাস্ত বা মুক্তিরত্রৈবাখণ্ডিতং মহৎ॥ লয়ামৃতমিদং সৌখ্যং রাজযোগাদবাপ্যতে। রাজযোগপদং প্রাপ্তং সুখোপায়ং সুচেতসাম্॥"[৩]

শ্রুতিতে যোগের চারি অবস্থা—"আরম্ভশ্চ ঘটশ্চৈব তথা পরিচয়ঃ স্মৃতঃ। নিষ্পত্তিশ্চেত্যবস্থা চ সর্ব্বত্র পরিকীর্ত্তিতা॥"[২]

১। হ-যো-প্র ৪।৭০, ৭৩, ৭৫, ৭৭ ২। গো সি. স., পৃ ১৭ ৩। যোগতত্ত্বোপনিষৎ ১।২০

নাদানুসন্ধানই শ্রেষ্ঠ লয়কারক, যোগতারাবলীতে আছে—

"নাদানুসন্ধায়কমেব নান্যং মন্যামহে ধন্যতমম্ লয়ানাম্।"[১]

অতএব চিত্তলয়াকাঙ্ক্ষী যোগী লয়সাধনের প্রধান সহায় নাদানুসন্ধানের সাধন করিবেন। মনোরূপ মত্তহস্তী সংসারবিষয়োদ্যানে বিচরণ করিতে থাকে, নাদানুসন্ধানরূপ অঙ্কুশ দ্বারা তাহাকে তাড়না করিয়া বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিতে হয়। যেমন পক্ষীর পক্ষদ্বয় ছেদনে সে উড়িতে অক্ষম হয়, তদ্রূপ মনও এইভাবে নিবৃত্ত হইলে বিষয় গ্রহণে বিমুখ হয়। প্রাণায়াম দ্বারা বায়ু রুদ্ধ ও প্রত্যাহার দ্বারা ইন্দ্রিয় বশীভূত করিয়া চিত্ত স্থির করিবার উপায় প্রসিদ্ধ আছে, কিন্তু রাজযোগারুরুক্ষু হঠযোগিগণ সর্ব্বপ্রকার বাহ্য চিন্তা রুদ্ধ করিয়া নাদানুসন্ধানের দ্বারাও চিত্তলয়ে প্রবৃত্ত হন। চঞ্চল মনোরূপ মৃগের বন্ধনে নাদানুসন্ধান জালতুল্য; নাদ উক্ত মৃগের ব্যাধতুল্য, কারণ ব্যাধ যেরূপে হরিণকে বিনাশ করে তদ্রূপ নাদ নাদানুসন্ধানের দ্বারা চিত্তকে নাশ বা বিলীন করে। নাদই মনঃস্বরূপ পারদের জারণহেতু গন্ধকস্বরূপ, কারণ মন নাদ দ্বারা জারিত গন্ধকের ন্যায় চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিয়া বদ্ধ হয়, এইরূপে বদ্ধ মন (ভাবনারূপ মন), সহজেই ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রবেশ করে। তখন রজঃ ও তমোগুণ মল নষ্ট হইয়া চিত্তের শুদ্ধসত্ত্ববৃত্তি মন্ত্র অবলম্বন হয়।

অনাহত ধ্বনি শ্রুত হইলে আকাশ কল্পনা হয়, শব্দ আকাশের গুণ। অনাহত ধ্বনিরূপে যাহা শ্রুত হয় তাহা শক্তি, এবং যাহাতে উহা লয় হয় তাহাই পরমেশ্বর। নাদের লয়ে সর্ব্ববৃত্তিনিরুদ্ধ হইয়া আত্মা স্বস্বরূপে অবস্থান করে। হঠযোগের আসন, কুম্ভক, নাদানুসন্ধান দ্বারা রাজযোগের সমাধি বা উন্মনী অবস্থারূঢ় হইলে কালজয়ী বা মৃত্যুঞ্জয়ী হওয়া যায়।

"নাদো যাবৎ মনস্তাবৎ নাদান্তেঽপি মনোন্মনী"।[২]

প্রাণায়ামরূপ ক্ষেত্রে, চিত্তরূপ বীজকে, বৈরাগ্যরূপ জলধারা সিঞ্চিত করিলে সর্ব্বইষ্টদাত্রী উন্মনীলতিকার উৎপত্তি হয়, তখন যোগীর জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, মূর্চ্ছা ও মরণ এই পঞ্চ অবস্থার অতীত অবস্থা প্রাপ্তি হয়, কোন নাদ শ্রুতিগোচর হয় না, কোন চিন্তা থাকে না, তুর্য্যাবস্থাবান্

১। যোগতারাবলী, ২য় শ্লোক; গো. সি. স., পৃ ৩৯; হ-যো-প্র, পৃ ২২৯
পাঠান্তর—নাদানুসন্ধানকমেকমেব মন্যামহে মুখ্যতমং লয়ানাম্।

২। নাদবিন্দু উপ., ৪৮ শ্লোক

যোগী জীবন্মুক্ত হন। যোগসূত্রে "তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপে অবস্থানম্‌" দ্বারাও বৃত্তিনিরোধে আত্মার উক্তরূপ স্বরূপে অবস্থান বর্ণিত হইয়াছে। সমাধিযুক্ত যোগীর শীতোষ্ণ জ্ঞান, ষড়্‌রসের আস্বাদন, বিবিধ গন্ধের অনুভূতি থাকে না। সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়ে সমভাব লক্ষিত হয়। এইরূপ যোগীই জীবন্মুক্ত, তাঁহারই সহজাবস্থালাভ হইয়াছে বলিতে হইবে।

নাদানুসন্ধানের শেষফলই জীবন্মুক্ততা, কারণ নাদ শ্রবণে বাহ্য জগতের আকর্ষণ দূর হয়। শ্যামের বংশীধ্বনি শ্রবণে রাধার যেরূপ ভাব হয়, ইহাও সেইরূপ, এই নিমিত্ত তন্ত্রশাস্ত্রে 'মন্ত্রচৈতন্যে'র ব্যবস্থা রহিয়াছে। শব্দবিশেষকে চেতন করিয়া সেই শব্দ সাহায্যে পরব্রহ্ম সাক্ষাৎকারই জীবন্মুক্তির স্বরূপ, নাথগণের নাদবিন্দু সাধন অধ্যায়ে ইহা বর্ণিত হইতেছে। পৃথিবীর সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় এই শব্দচৈতন্যের কথা অতি গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিয়াছেন, শব্দ চেতন হইলেই কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ হয়। অচেতন শব্দ বারবার জপ করিলে ও তাহার সহিত গুরুর উপদেশানুযায়ী কোন কোন বিশেষ ক্রিয়া করিলে অচেতন শব্দও ক্রমশঃ চেতন শব্দরূপে পরিণত হয়, ইহাই অধম অধিকারীর সাধন। মধ্যম অধিকারীকে গুরু বিশুদ্ধচেতন শব্দ দ্বারা উপদেশ দেন, সেই শব্দ শ্রবণেই বাহ্যাকর্ষণ নিবৃত্ত হয়। শ্রেষ্ঠ অধিকারীকে গুরু মাত্র মৌন উপদেশ দেন।[১]

স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ জগৎ পরস্পরসংশ্লিষ্ট, কারণ জগৎ জীব ও ঈশ্বরের মিলনভূমি, প্রয়োজনানুসারে কারণ জগৎ হইতেই অবতারাদি স্থূল জগতে অবতীর্ণ হন ও জীবোদ্ধারের নিমিত্ত উপদেশ দেন। কবীর, রৈদাস, নানক প্রভৃতি সন্তগণও জীবোদ্ধারের নিমিত্ত অনহদ নাদের উপদেশ দিয়াছেন। এই নাদের উৎপত্তিস্থল বিরাটের ষট্‌ত্রিংশ মণ্ডলে; প্রত্যেক মণ্ডলের ভিন্ন শব্দ আছে, তন্মধ্যে দশটী প্রকট, ষড়্‌বিংশতিটী অপ্রকট। এস্রাজ বাদ্যযন্ত্রের ৩৬টী তার ঐ ৩৬টী মণ্ডলের স্মারক। মৃদঙ্গ, মুরলী বীণা ইত্যাদির ধ্বনির ন্যায় দশপ্রকার অনাহত নাদ শ্রুতিগম্য, বাকি ২৬টী অনুভবগম্য। কারণ, মাত্র দশটী মণ্ডল হইতে অবতারাদি অদ্যাপি স্থূল জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন, এই দশটী মণ্ডল

১। সন্তপরিচয়, ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ, কল্যাণ সন্ত অঙ্ক, পৃ ২৩।

অপরার অধীন, বাকি ২৬টী পরার অধীন। দক্ষিণ কর্ণে কোন একটী নাদ শ্রবণ অভ্যাস করিলে বুদ্ধি বিকশিত হয় এবং সাধক স্বর্গের কোন না কোন মণ্ডলে আশ্রয় পান।[১]

চিত্তকে মন্ত্রসাহায্যে নাদরূপ ব্রহ্মশক্তিতে লীন করা যায়। কারণ নাদই এই জগৎ প্রপঞ্চের মূল কারণ। নাদে জগৎ প্রতিষ্ঠিত, নাদরূপ মহাশক্তি এই জগৎরূপে প্রকাশিত, অতএব নাদের জ্ঞান হইলে জগতের জ্ঞান হয়, নাদ আয়ত্ত হইলে জগৎও সাধকের আয়ত্তাধীন হয়। সেইজন্য নাদ ও নাদানুসন্ধানই জীবের অন্তর্জগতের শক্তিসঞ্চয়ের একমাত্র উপায়। নাথগণ বলেন, মৃত্যুর পর কি অবস্থা হইবে তাহা অজানিত, ইহজীবনেই সাধন দ্বারা 'আমিত্বকে' উপলব্ধি করিতে হইবে ও শক্তিবিকাশ সাধন করিতে হইবে সন্তগণও এসম্বন্ধে একমত। অতএব নাথগণ ও সন্তগণ 'মন্ত্র'সাধনার উপরই জোর দিয়াছেন, মন্ত্রজপের দ্বারা আপনাকে 'নাদরূপী' বলিয়া জ্ঞান হইলে জড়ত্ববুদ্ধি অপগত হয় এবং যে পরিমাণে নাদের সহিত পরিচয় হয় সাধক তদনুরূপ শক্তিসম্পন্ন হন। নাদানুসন্ধান করিতে করিতে নাদের বিশ্রামভূমি অব্যক্ত ধামে সাধক উপনীত হন, তখন মোক্ষ তাঁহার করতলগত হয়।

অজপা হংসমন্ত্র জপের দ্বারাই জীব পরমাত্মাকে লাভ করিতে পারে। "হংস ঋষিঃ। অব্যক্তাং গায়ত্রী ছন্দঃ। পরমহংসো দেবতা। অহমিতি বীজম্। স ইতি শক্তিঃ। সোঽহমিতি কীলকম্।"[২] অর্থাৎ হংস বা আত্মাই মন্ত্রের ঋষি বা দ্রষ্টা, অব্যক্ত গায়ত্রীই ছন্দস্ (বেদ), পরমহংস (পরমাত্মা) দেবতা, 'হং' বীজস্বরূপ, 'সঃ' শক্তিস্বরূপ এবং 'সোহং'ই কীলক বা হংসাত্মাকে উপলব্ধি করিবার বিনিয়োগ বা উপায় স্বরূপ।

'সোহং' মন্ত্র দ্বারাই হৃদয়ে অষ্টদল পদ্ম মধ্যে হংসাত্মাকে দর্শন করা যায়।

এই হংসমন্ত্র দ্বারাই জীব দশবিধ নাদ শ্রবণের পর নাদব্রহ্মকে উপলব্ধি করে। ইহাই নাদ ও নাদানুসন্ধানের রহস্য।

১। 'অনাহত নাদ', নয়নানন্দজী সরস্বতী, কল্যাণ সাধনাঙ্ক (১ম খণ্ড) পৃ ৩৪৭

২। হংসোপনিষৎ, ১০ শ্লোক।

শ্রীআদিনাথেন সপাদকোটি
লয়প্রকারাঃ কথিতা জয়ন্তি।
নাদানুসন্ধানকমেকমেব
মন্যামহে মুখ্যতমং লয়ানাম্ ॥[১]

শ্রীআদিনাথ মহাদেব সপাদকোটি প্রকার চিত্তবৃত্তির নিরোধের উপায় বলিয়াছেন, সেই সকল উপায় বর্ত্তমান রহিয়াছে, কিন্তু আমরা (গোরক্ষ সম্প্রদায়) কেবল নাদানুসন্ধানকেই লয়সাধনেব মুখ্যতম উপায় স্বরূপ জানিয়াছি।

১। হ. যো. প্র., ৪।৬৬, গো সি. স, পৃ ৩৯

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ওঁকারের স্বরূপ ও তাহার সাধন

সকল সম্প্রদায়ের মূল সাধন ওঁকার, নাথসম্প্রদায়েও ওঁকারসাধনের ইঙ্গিত স্পষ্ট। গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহে উক্ত হইয়াছে : ওঁকারবিন্দুসংযুক্তং নিত্যং ধ্যায়ন্তি যোগিনঃ। তস্মিন্ মধ্যে স্থিতং তত্ত্বং প্রদর্শয়তি সদ্‌গুরুঃ ॥[১] সদ্‌গুরু এই ওঁকার সাধনের পথপ্রদর্শক। নাথস্বরূপ মনোবাগতীতো এবং মনোবাঙ্‌ময়শ্চ তাহা ওঁ, নাথঃ, শক্তি কর্ত্তা ও অকর্ত্তা ভেদে পঞ্চবিধ, প্রণবের দেবতাও পঞ্চ,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর ও শিব। উক্ত শক্তিই কর্ত্রী ও অকর্ত্রী ভেদে দ্বিবিধ, কারণ নাথ লীলাবশে অকর্ত্তাকে কর্ত্তা করেন।[২] মানবমধ্যে এই চিৎশক্তির বিকাশেই তাহার শিবত্ব উন্মুক্ত হয়। পারমার্থিক দৃষ্টিতে জীবাত্মা যদিও শিবরূপী, তথাপি ব্যবহার-জগতে অনাদি মলের প্রভাববশতঃ জীবের শিবত্ব অভিব্যক্ত নহে, কারণ জীবের স্বাভাবিক শক্তি অবরুদ্ধ হইয়া থাকে। ওঁকার সাধনে চিৎশক্তির বিকাশে জীবাত্মার শিবসাম্য হয়, এই চিৎশক্তির বিকাশ সম্প্রদায় অনুসারে কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান দ্বারা সাধিত হয়। দুঃখসাগর উত্তীর্ণ হইবার জন্য মানব এই তিনটী মার্গের একটী অবলম্বন করে। সংসারাসক্ত 'কর্ম্মযোগ', সংসারে অনাসক্ত 'জ্ঞানযোগ' ও আসক্ত ও অনাসক্ত নহে এরূপ ব্যক্তির পক্ষে 'ভক্তিযোগ' সরল ও সুগম পথ, তথাপি গুরু-উপদেশ বিনা তত্ত্বজ্ঞান হয় না। কৃচ্ছ্র তপাদি সাধনে স্বল্পব্যক্তিই সক্ষম, তাই ভক্তিপূর্ব্বক নামস্মরণের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়, ভগবানের বাচকরূপ ওঁকারসাধনে মোক্ষলাভ নিশ্চিত। বেদান্তের মার্গ জ্ঞানমার্গ, ওঁকারসমন্বিত গায়ত্রী মন্ত্রের সাধন ইহাতে আছে, তান্ত্রিকের শক্তি উপাসনা ভক্তিমার্গ হইলেও ইহাতেও গায়ত্রী মন্ত্র আছে।[৩]

যোগসূত্রে আছে 'তস্য বাচকঃ প্রণব' (১।২৭)। শ্রুতিতেও আছে—

১। গো সি. স., পৃ ৩০ ২। ঐ ৩২, ৩৩

৩। আদ্যায়ৈ বিদ্মহে পরমেশ্বর্য্যৈ ধীমহি, তন্নঃ কালী প্রচোদয়েৎ।

—ওঁকার ও গায়ত্রীতত্ত্ব, পৃ ১৯১, সুরেশচন্দ্র সিংহ।

প্রণবো ধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ ॥ ১৪
আত্মানমরণিং কৃত্বা প্রণবং চোত্তরারণিম্।
ধ্যাননির্মথনাভ্যাসাদেব পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ ॥ ২২

(ধ্যানবিন্দু উপনিষৎ)

প্রণবই ধনু, জীবাত্মাই বাণ, ব্রহ্ম উক্ত বাণের লক্ষ্য বলিয়া কথিত হন, প্রমাদহীন হইয়া লক্ষ্যভেদ করিতে হইবে। অতঃপর বাণেব ন্যায় তন্ময় অর্থাৎ লক্ষ্যের সহিত অভিন্ন হইবে। আত্মাকে (অন্তঃকরণ) নিম্নের অরণি ও ওঁকারকে উর্দ্ধের অরণি করিয়া ধ্যান দ্বারা মন্থন করিয়া, নিজেকে ঘটাচ্ছাদিত দীপের ন্যায় দেখিবে। এইরূপে নাদে বিলীন না হওয়া পর্য্যন্ত ওঁকাব জপ কর্ত্তব্য। হৃদয়মধ্যে পদ্মকর্ণিকায় স্থিরদীপনিভাকৃতি অঙ্গুষ্ঠমাত্র অচল ওঁকার ঈশ্বরের ধ্যান কর্ত্তব্য।[১]

প্রণবধ্যানে অন্তঃকবণ শুদ্ধ হয়, শঙ্কাদি বিনষ্ট হয়, এবং ব্রহ্মলাভ হয়। চিত্তের চাঞ্চল্য দূব করিতে হইলে ওঁকার সাধনের ন্যায় মন্ত্র আব নাই। চিত্তের মল, আবরণ ও বিক্ষেপ নাশ করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ওঁকারসাধনে ব্যাধিস্ত্যানসংশয়াদি একাদশপ্রকার অন্তরায় ও পঞ্চপ্রকাব বিক্ষেপ বিনষ্ট হয়। ওঁকারকে ঈশ্বরের বাচক বলা হয়, বাচ্য হইলেন সেই পরমব্রহ্ম বা পরমশিবস্বরূপ সত্তা।

ওঁকার ও গায়ত্রী সাধনাব অপরিসীম প্রভাব ভারতে প্রাচীনকাল হইতে স্বীকৃত হইয়াছে। গায়ত্রী ঋগ্বেদেব প্রসিদ্ধ মন্ত্র, বিশ্বামিত্র এই মন্ত্রের দ্রষ্টা ; ওঁকার বেদেব কোন মন্ত্র নহে, ওঁকাবের দ্রষ্টা কোন ঋষি নাই, তথাপি ওঁকারের যথাবিধি উচ্চারণ ব্যতীত কোন বৈদিক মন্ত্রেব বিনিয়োগ হইতে পারে না। বেদভেদে ওঁকারের উচ্চারণের পার্থক্য হইয়া থাকে।

'ওম্' শব্দ প্রথমতঃ দুই মাত্রা 'অ', 'ম' বিশিষ্ট ছিল, তাহা দ্বারা দ্যুলোক ও পৃথিবীকে বুঝাইত, ইহারা ঋগ্বেদের প্রাচীন দেবতা। ক্রমশঃ ওঁ শব্দ চারিমাত্রাবিশিষ্ট হইয়াছে। দ্যুলোক ও পৃথিবীর আধিদৈবিক দেবতা অগ্নি ও বরুণ। দ্যাবাপৃথিবীকে মিথুন কল্পনা করা হয়, ইহা হইতেই জগতের সৃষ্টি। এই মিথুন কল্পনা ঋঙ্‌মন্ত্রে দেখা যায়। ক্রমশঃ ভূঃ ভুবঃ স্বর্লোক, ঋক্ যজু সামবেদ প্রভৃতি অ-উ-ম দ্বারা নির্দ্দেশিত হইতে লাগিল। অন্তর্জগতে উহা প্রাণ, অপান, ব্যান বায়ুকে নির্দ্দেশ

১। ধ্যানবিন্দু উপঃ, ১৪, ২২, ১৯ শ্লোক। মুণ্ডক উপ ২।২।৪

করিল। অ-উ-ম কারের সহিত যে চতুর্থমাত্রা চন্দ্রবিন্দুর যোজনা হইল, তাহা শক্তি মতানুমোদিত নাদবিন্দু-কলার স্মারক, নাদরূপিণী মহাশক্তি হইতে সৃষ্টি হইয়াছে, তথাপি নাদবিন্দু বা শিবশক্তি তন্ত্রমতে অভিন্ন। বৈদিক সাধনের সহিত তান্ত্রিক সাধনের এই যোগ দ্বারা 'ওঁ' শব্দের সৃষ্টি এক বিস্ময়কর ব্যাপার। তথাপি ইহাই প্রচলিত হইয়াছে।

ওঁকার সাধনে 'ত্রিরত্ন' উপলব্ধি করিতে হয়। এই ত্রিরত্ন নিত্য, ইহারা যথাক্রমে (১) চিৎস্বরূপ, চৈতন্য, পরমেশ্বর বা পরমশিব, (২) চিৎশক্তি বা শক্তি, ইনি পরমশিবের সহিত নিত্যযুক্ত, (৩) বিন্দু, মহামায়া বা কুণ্ডলিনী। এই বিন্দুই উপাদান শক্তি, ইহার দ্বারা জগৎসৃষ্টি হয়, শুদ্ধ ও মলিন ভেদে জগৎ দ্বিবিধ, শুদ্ধজগৎ নিত্য। শুদ্ধ জগতের শুদ্ধ স্তরের উপাদান বিন্দু, বিন্দুর মহামায়া, মায়া ও প্রকৃতি এই তিনটী রূপ আছে। ইহারা তিনটী স্তরবিশেষ। মহামায়া বিন্দু বা কুণ্ডলিনীর স্তর নির্ম্মল, মায়ার স্তরে আবরণযুক্ত মলের আরম্ভ হয় এবং প্রকৃতির স্তরে ত্রিগুণের বশে ঘনীভূত অবস্থা প্রাপ্তি হয়। মহামায়ার উর্দ্ধে কৈবল্যাবস্থা, ইহা শুদ্ধতম অবস্থা হইয়াও চরম অবস্থা নহে। অজ্ঞানাখ্য আণবমল (বিজ্ঞানকল) যুক্ত জীবের মহামায়ার জগতেও প্রবেশাধিকার থাকে না, যদিও ইহারা প্রকৃতি ও মায়ার রাজ্যের উচ্চতর স্তরে অবস্থিত। প্রকৃতি হইতে যে চৌদ্দ ভুবন, মায়া হইতে মায়িক জগৎ সে সকল উত্তীর্ণ হইয়া সিদ্ধদেহ (মতান্তরে বৈন্দব দেহ)—লাভ হইলেও মহামায়ার জগতে প্রবেশাধিকার জন্মে, কিন্তু এই দেহ লাভের নিমিত্ত সর্ব্বাগ্রে দীক্ষার প্রয়োজন আছে।

মানবমধ্যে শিবত্বের অভিব্যক্তির জন্য আত্মশক্তির বিকাশসাধন কর্ত্তব্য, কিন্তু বদ্ধজীবের ঈশ্বরানুগ্রহ বা দীক্ষা ব্যতীত নিজস্ব কোন ক্ষমতা দ্বারা এই শক্তির বিকাশসাধন সম্ভবপর নহে। জীবের অবিদ্যাদি পঞ্চক্লেশ দূর হইলেও জীব জীবই থাকে, কৈবল্যপ্রাপ্তি হইলেও তাহা দ্বারা উচ্চতর অবস্থা প্রাপ্তি হয় মাত্র, তাহাতে শিবত্বের অভিব্যক্তি হয় না। তন্ত্রমতে তাই ভগবতী শক্তির বিকাশের নির্দ্দেশ আছে। এই শক্তিবিকাশে জীবের প্রকৃতি-বিজয়ের ক্ষমতা হয়, জীব তখন ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হন। জীব ঈশ্বর দ্বারাই বদ্ধ বা মুক্ত হন, প্রকৃতি বা পুরুষ বা শক্তি জীবকে বদ্ধ বা মুক্ত করে না। অজ্ঞলোক মাত্রই বদ্ধ, নিজের সুখ-দুঃখ তাহার ইচ্ছাধীন নহে। ঈশ্বর জীবকে বদ্ধ করেন সত্য, কিন্তু

তাঁহার ক্রিয়াশক্তি জীবের অন্তরে পতিত হইলে জীবের আবরণ সরিয়া যায়, তখন জ্ঞান ও ক্রিয়া (বা চিৎ) শক্তির বিকাশ হয় ; ইহার নাম 'দীক্ষা'—ইহার দ্বারা 'মল' অপসারিত হয়। "দীয়তে বিমলং জ্ঞানং ক্ষীয়তে ক্লেশকারণম্" ইহাই দীক্ষার অর্থ। গুরু বিশেষ বিশেষ মন্ত্র দ্বারা ক্লেশ ক্ষয় করেন। কিন্তু 'মল' অজ্ঞান বা অবিদ্যা নহে, ইহা অতি সূক্ষ্ম বস্তু, দীক্ষার দ্বারা অপসারণীয়। মানবাত্মার দুইটী অবস্থা আছে, শিবাবস্থা ও পশ্বস্থা। শিবাবস্থাই স্বাভাবিক অবস্থা, পশ্বস্থা অনাদি হইলেও উহা আগন্তুক। দীক্ষা দ্বারা মল বিগত হইলে মানবের পশু অবস্থা দূর হইয়া শক্তির উন্মেষের সহিত দিব্য বা শিবাবস্থা লাভ হয়। মলের দরুণ যে বিপরীত জ্ঞান হয়, তাহাই 'অজ্ঞান' ; মল অপসারিত হইলে অজ্ঞানও দূর হয়।

দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদী শৈবসম্প্রদায় যথাক্রমে শিব ও পরমশিবেব অস্তিত্ব স্বীকাব করেন। অনাদিকাল হইতে নিগ্রহ শক্তির দরুণ মানব মধ্যে পশুভাব বর্ত্তমান, তাহা দূব করিবার জন্যই সৃষ্টি আদি ব্যাপাব হইয়া থাকে। মল পরিপক্ক হইলে সাক্ষাৎভাবে অনুগ্রহশক্তি পতিত হয়। সৃষ্টি স্থিতি সংহারই 'নিগ্রহ'। এই নিগ্রহের পর অনুগ্রহ আসে যেমন রাতের পর দিন বা শীতের পর গ্রীষ্ম আসে। শিবের নিগ্রহ অর্থে মানবের 'অণু'ভাব বা পশুত্ব, ইহাই জীবের আণবিক চরিত্র, অণুব ভার গ্রহণ করেন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, ইহাবা যথাক্রমে মানবদেহেব সৃষ্টি, রক্ষা ও সংহার কর্ত্তা। এই নিগ্রহ শক্তির অবসানে অনুগ্রহ আসিলে জীবের মায়িক বা মহামায়িক জগতে আবির্ভাব হয়। এই অনুগ্রহ লাভের জন্যই মানবের সাধন।

মানবের কর্ম্মের মূলে আছে মায়া ও পশুত্ব, কারণ পশু লইয়াই মায়ার খেলা, ইহার মূল হইতেছে 'মল' বা পরমেশ্বর কর্ত্তৃক অনাদি আবরণ। মল অপগত হইলে, অপক্কদেহ মানবের পক্কতা হয় ও মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। যোগসূত্রে আছেঃ "দৃষ্টানুশ্রবিকাবিষয় বিতৃষ্ণস্য বশীকার সংজ্ঞা বৈরাগ্যম্"[১]—অর্থাৎ দৃষ্ট ও আনুশ্রবিক বিষয়ে বিতৃষ্ণ-চিত্তের যতমান, ব্যতিরেক, একেন্দ্রিয় এই তিন অবস্থার পর বশীকার সিদ্ধ হয়, ইহা অনাভোগাত্মক। দৃষ্ট বিষয় ইহলোকের ভোগৈশ্বর্য্য আনুশ্রবিক অর্থাৎ পরলোক সম্বন্ধীয় বিষয়, যথা স্বর্গভোগাদি। ইহাতে

১। যোগসূত্র—১।১৫

বৈরাগ্য হইলে বশীকারসংজ্ঞক বৈরাগ্য হয়, অর্থাৎ যোগীকে ইচ্ছাপূর্ব্বক রাগাদিকে নিবৃত্ত করিতে হয় না, তখন যোগীর চিত্ত সহজতই ইহলৌকিক ও পারলৌকিক বিষয় হইতে নিবৃত্ত থাকে। ইহাই বিষয়ের প্রতি পরম উপেক্ষা। ইহা সাধক মাত্রের কাম্য অবস্থা।

উপরোক্ত অবস্থা লাভ করিতে হইলে মানবের অজ্ঞান দূর কর্ত্তব্য। ইহা দ্বিবিধ—পৌরুষ অজ্ঞান ও বৌদ্ধ অজ্ঞান। প্রথমটী দূর হয় দীক্ষা দ্বারা, দ্বিতীয়টি দূর হয় শাস্ত্রপাঠ ও তপস্যাদি দ্বারা। পৌরুষ অজ্ঞান অর্থে মানবের মধ্যে যে অজ্ঞান আছে, বৌদ্ধ অজ্ঞান অর্থে বুদ্ধির অজ্ঞান। গুরু দীক্ষা দ্বারা শিষ্যের পৌরুষ অজ্ঞান দূর করেন, শিষ্য স্বীয় সাধনবলে বৌদ্ধ অজ্ঞান দূর করেন। নাথসম্প্রদায়ের সাধন মধ্যে গুরুর স্থান অতি উচ্চে, এবং সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ মধ্যে ওঁকার সাধন বা অনাহত নাদ সাধনের কথাও স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে। ওঁকারকে বেদের সার ও যোগে ইহার প্রয়োজনীয়তা আছে বলা হইয়াছে। অ উ-ম কার যথাক্রমে ভূঃ ভুবঃ স্বঃ লোককে প্রতিভাসিত করে। অ-উ-ম কার ও অর্দ্ধমাত্র বা স্থূল সূক্ষ্ম কারণ ও তুরীয়ে উত্তরোত্তর প্রবিলয়ে তূর্য্যশিব স্বরূপের মনন সম্ভব হয়, ইহা চতুর্থমাত্রা বা অদ্বৈত-ভাব। এইরূপে বাঙ্‌মনসাতীতে প্রবিলয় হয়। "অতঃ প্রণব এব বেদ ইত্যভ্যুপগম্য তদ্দ্বারা তৎপ্রবর্ত্তক-নাদব্রহ্মেত্যবলম্ব নাদব্রহ্মণো যৎ স্থূলং তত্ত্বমিতি বিশ্রান্তিমতাং মতে কা বা শ্রুতিঃ সাধিকা ন ভবতীতি প্রসিদ্ধতরমেব সর্ব্বত্র।" প্রণব জপ দ্বারাই তাহার প্রবর্ত্তক নাদে এবং নাদব্রহ্মের যে মূলতত্ত্ব তাহাতে উপনীত হওয়া যায় ইহাই সিদ্ধ সম্প্রদায়ের মত।[১]

গোরক্ষসংহিতায় আছে—

> ওঁকারং পাদশো জ্ঞাত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ।
> যুঞ্জীত প্রণবে চেতঃ প্রণবো ব্রহ্ম নির্ভয়ং।
> প্রণবে নিত্যযুক্তস্য ন ভয়ং বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥[২]

অর্থাৎ ওঁকারকে প্রত্যেক পাদরূপে জানিতে পারিলে আর কিছুই জ্ঞাতব্য থাকে না। সাধকগণ সর্ব্বদা চিত্তকে প্রণবে সংযোজিত করিবে অর্থাৎ প্রণবরূপ ব্রহ্মে আপনার অদ্বৈতভাব সুদৃঢ় করিবে। এই প্রণব ব্রহ্মস্বরূপ, এই প্রতিপাদ্য ব্রহ্মকে সাক্ষাৎকার করিতে পারিলে কোন ভয় থাকে না,

---

১। গো. সি. স., পৃ ২৬।

২। গো. সং., ৩।৫, ৬; গো. সি. স., পৃ ২৭।

তাই ব্রহ্মকে নির্ভয় বলা হইয়াছে, প্রণবে সর্ব্বদা অর্পিতচিত্ত ব্যক্তির কদাপি কোন ভয় থাকিতে পারে না।

সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে বিদ্যমান ঈদৃশ ওঁকারকে ঈশ্বর বলিয়া জানা কর্ত্তব্য। একবার ওঁকাররূপ আত্মাকে সাক্ষাৎকার করিতে পারিলে সংসাব নিমিত্ত শোক করিতে হয় না, অতএব ইহা মুনিমাত্রের ধ্যেয়। প্রণব পঞ্চবর্ণযুক্ত: অকার, উকার, মকার, বিন্দু ও নাদ। এই প্রণবকে 'হংস' পক্ষী রূপে বিকৃত করা হয়। 'অ'কাব উক্ত পক্ষীর দক্ষিণ পক্ষ, 'উ'কার উহার উত্তর পক্ষ, 'ম'কার তাহার পুচ্ছ এবং অর্দ্ধমাত্রা বা নাদবিন্দু বর্ণদ্বয় তাহার মস্তকস্বরূপ।[১] এই পক্ষীর শরীরে সপ্তলোক বিভাগ আছে—

> ভূর্লোকঃ পাদয়োস্তস্য ভুবর্লোকস্তু জানুনোঃ।
> স্বর্লোকঃ কটিদেশে তু নাভিদেশে মহর্জ্জগৎ॥
> জনলোকস্তু হৃদয়ে কণ্ঠদেশে তপস্তথা।
> ভ্রুবোর্ললাটমধ্যে তু সত্যলোকো ব্যবস্থিতঃ॥[২]

যে বিচক্ষণ যোগী উক্ত হংসে আরোহণ করিতে পারেন, অর্থাৎ চিন্তা করিতে পারেন, তাঁহারাও সেই ব্রহ্মলোকে গমন করিতে সমর্থ হন। "এবমেতাং সমারূঢ়ো হংসযোগবিচক্ষণঃ। ন ভিদ্যতে কর্ম্মচারৈঃ পাপকোটি-শতৈরপি।" নাদবিন্দু উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে যে ব্যক্তি নিয়ত হংসরূপী ওঁকারের চিন্তা করেন, তিনি শতকোটি পাপেও আবদ্ধ হন না।[৩]

অতঃপর ওঁকারের দ্বাদশমাত্রা বিবৃত হইতেছে। গোরক্ষ-সংহিতায় আছে—ইহার প্রথম মাত্রা অকারের দেবতা বসু, দ্বিতীয় মাত্রা উকারের দেবতা অগ্নি, তৃতীয় মাত্রা মকারের দেবতা সূর্য্য আর চতুর্থ বা অর্দ্ধমাত্রাকে পরমামাত্রারূপে পণ্ডিতগণ কীর্ত্তন করেন। এই মাত্রাচতুষ্টয়েব প্রত্যেকের তিন তিন মাত্রা আছে। অতএব ওঁকারের দ্বাদশমাত্রা জানা যায়। চিত্ত দ্বারাই এই দ্বাদশমাত্রা জ্ঞেয়—যোষিণী (ঘোষিণী নাদবিন্দু উপঃ, ৯ শ্লোক), বিদ্যুন্মালা (বিদ্যা), পতঙ্গী, বায়ুবেগিনী, নামধেয়া, ঐন্দ্রী, বৈষ্ণবী, শঙ্করী, মহতী, ধ্রুবা, মৌনী, ব্রাহ্মী---ইহারাই প্রণবের দ্বাদশ মাত্রা। এই মাত্রাসকল জানিয়া উপাসনা করিলে উক্ত মাত্রাসকলের নামানুসারে সেই সেই লোকে গমন করিতে পারা যায়। (গোরক্ষ-সংহিতা, ৫।২১-২৫ এবং নাদবিন্দু উপনিষদ ১২-১৬ শ্লোকে বিভিন্ন মাত্রায় চিত্তযুক্ত হইয়া সাধকের মরণ হইলে যে যে ফল হয় তাহা বর্ণিত হইয়াছে,

---

১। গো. সং, ৫।৮, ১০। ২। গো. সং, ৫।১২, ১৩। ৩। নাদবিন্দু উপঃ, ১।৫, ৬

যথা, পরজন্মে সার্ব্বভৌম রাজা হওয়া, যক্ষ, বিদ্যাধর, গন্ধর্ব্ব, পশুপতি প্রভৃতি পদপ্রাপ্তি, দ্বাদশী মাত্রাতে চিত্তসমর্পণ ফলে মরণান্তে সাক্ষাৎ ব্রহ্মপদপ্রাপ্তি হয়।)

উক্ত দ্বাদশমাত্রারহিত, শুদ্ধ, সর্ব্বব্যাপক নিষ্কল ব্রহ্মের বিজ্ঞানের নিমিত্ত সাধক বিন্দুনামক অন্তনাদাক্ষরে চিত্ত স্থাপন করিবেন, ইহাই প্রণবের পঞ্চমাক্ষরে চিত্তযোজনার ফলস্বরূপ। শ্রুতিতে আছে, ব্রহ্মতেজেই সমস্ত পদার্থ প্রকাশ পায়, এই ব্রহ্ম হইতেই সূর্য্যাদি ও চক্ষুরাদি জ্যোতিষ্কগণ উদিত হইতেছে। দ্বাদশমাত্রায় চিত্তস্থাপনের ফল বর্ণিত হইলেও মনোলয়ই নাদধারণার ফলস্বরূপ। পক্ষান্তরে উক্ত হইয়াছে, যেমন অগ্নি কাষ্ঠেতে উৎপন্ন হইয়া কাষ্ঠের সহিত শান্ত হয় তেমনি চিত্ত নাদে প্রবর্ত্তিত হইয়া নাদের সহিতই লয় পায়।[১]

প্রশ্নোপনিষৎ মতে 'অ'কার মাত্রাত্মক প্রণবের সাক্ষাৎফলে শীঘ্রই পৃথিবীতে জাত হইতে হয়, 'উ'কার মাত্রাত্মক প্রণব সাক্ষাৎফলে চন্দ্র-লোকের ঐশ্বর্য্য ভোগান্তর পুনরায় মনুষ্যলোকে প্রত্যাগমন হয় এবং অ-উ-ম এই ত্রিমাত্রাত্মক ওঁ এই অক্ষররূপ প্রতীকে পরমপুরুষকে ধ্যান ফলে তৃতীয় মাত্রার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যে সম্মিলিত হওয়া যায়। এই মাত্রাত্রয়ের পৃথকভাবে উপাসনার ফল বিনাশী, কিন্তু পরস্পর-সম্বদ্ধরূপে উপাসিত হইলে উহারা ব্রহ্মপ্রাপ্তির কারণ হয়।[২] গোরক্ষ-সিদ্ধান্তসংগ্রহে প্রণবের মাত্রা এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে—ওঁকার মহাসিদ্ধদের ধ্যেয়—অকার বিষ্ণুস্বরূপ, উকার রুদ্রস্বরূপ, মকার ব্রহ্মস্বরূপ, অর্দ্ধমাত্রা শক্তিস্বরূপ, বিন্দু নাথস্বরূপ, ধ্বনি নিরাকার নাথস্বরূপ, ধ্বনি ও বর্ণ উভয়ের মিলনে দ্বৈতাদ্বৈতবিলক্ষণ, সাকার নিরাকার অতীত, অদ্বৈতো-পরিবর্ত্তী মহানাথস্বরূপ প্রতিভাত হয়, পৃ ৫৭। ওঁকারে ভূর্ভুর্বর্লোক চন্দ্রসূর্য্যঅগ্নিদেবতা, ইচ্ছা জ্ঞান ক্রিয়া এবং ব্রাহ্মীরৌদ্রীবৈষ্ণবী শক্তি, এই সকলই আছে, ইহার জপফলে সাধক পদ্মপত্রের ন্যায় নির্লিপ্ত থাকেন, জিতায়ু কামবর্জ্জিত হইয়া নিত্য তারক জপ করেন। ইহাই নাসাগ্রে দৃষ্টি স্থিরপূর্ব্বক ওঁকার জপ (পৃ ৩৯)। এই তারকই ব্রহ্ম, দণ্ডক বিষ্ণু, কুণ্ডল্যা রুদ্র, অর্দ্ধচন্দ্র ঈশ্বর, বিন্দু সদাশিব, ইহারাই প্রণবের পঞ্চ-দেবতা, নিরঞ্জন ইহাদের ঊর্দ্ধে। গুরুকৃপা ভিন্ন ঐহিক বিষয় ত্যাগ,

---

১। গো. সংহিতা, ৫।২৩ টীকা; নাদবিন্দু উপঃ, ১৩ শ্লোক।

২। প্রশ্নোপনিষৎ, ৫।৩-৬।

পারত্রিক অভিলাষনিবৃত্তি ও সহজাবস্থালাভ (সমাধিলাভ), সকলই দুর্ল্লভ।[১]

আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ড ভূর্লোকের অন্তর্গত, ভবিষ্যৎ সৃষ্টিকল্পের কত ব্রহ্মাবিষ্ণু ভুবর্লোকে আছেন, ভুবঃ লোক অর্থে পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী স্থান বা অন্তরীক্ষ, সেখানে সিদ্ধগণের বাস। ভোগবিতৃষ্ণ জীব জগতের কল্যাণার্থে ভুবর্লোক হইতে পুনরায় উপযুক্ত অবসরে ভূর্লোকে অবতীর্ণ হন। আর ভোগবিতৃষ্ণ জীব যদি নিত্যধামে বিরাজ করিতে চাহেন, তবে তাঁহার স্বর্লোকে গতি হয়, ইহা সুখদুঃখরহিত পূর্ণানন্দময় স্থান। প্রণবের প্রথম মাত্রা ভূর্লোক, দ্বিতীয় মাত্রা ভুবর্লোক ও তৃতীয় মাত্রা স্বর্লোকের জ্ঞাপক। ষট্‌চক্রসাধনে মূলাধার হইতে অনাহত পর্য্যন্ত চারিচক্রে ভূর্লোকবিষয়ক জ্ঞান হয়, বিশুদ্ধচক্রে ভুবর্লোকের অনুভূতি হয়, এবং আজ্ঞা হইতে ঊর্দ্ধে স্বর্লোকের আস্বাদন হয়। আজ্ঞাচক্রভেদ হইলে অক্ষয়ধাম সকল অধিগত হয়।

অন্যত্র ওঁকারের মাত্রাংশ এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে—অকারের মাত্রা এক, উকারের মাত্রা দুই, মকারের তিন, উহারা একত্রে ছয়মাত্রা। বিন্দু অর্দ্ধমাত্রা, তৎপরে মাত্রাংশ আরও কমিতে থাকে, এইরূপে বিন্দু হইতে সমনা পর্য্যন্ত মাত্রাংশ যোজনা করিলে একমাত্রা হয়। মায়াজালে মন্ত্রের ছয় মাত্রা হইলেও, মায়াতীতপদে উহা মাত্র একমাত্রা। এই এক মাত্রাই সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া কার্য্য করে। এই এক মাত্রার মাত্রাংশ, যথা—

বিন্দু অর্দ্ধমাত্রা	নাদান্ত ১/৩২ মাত্রা
অর্দ্ধচন্দ্র ১/৪ মাত্রা	শক্তি ১/৬৪ মাত্রা
নিরোধিকা ১/৮ মাত্রা	সমনা ১/১২৮ মাত্রা
নাদ ১/১৬ মাত্রা	ব্যাপিনী ১/১২৮ মাত্রা

সমষ্টিমাত্রা ১

আবার অ, উ, ম, বিন্দু, অর্দ্ধচন্দ্র, নিরোধিকা, নাদ, নাদান্ত, শক্তি ও ব্যাপিনী ওঁকার উচ্চারণে মন্ত্রের অবয়ব ক্রমশঃ এই একাদশ কলা বা অবস্থায় উপনীত হইতে হয়, তৎপরের অবস্থাই দ্বাদশীকলা, উহা নিষ্কল, অদ্বৈতাবস্থা।[২]

১। গো সি, স, পৃ ৫৭, ৩৯, ৩৩ ; হ-যো-প্র ৪।৯ দুর্ল্লভো বিষয়ত্যাগো ইত্যাদি।
২। মৃত্যুবিজ্ঞান ও পরমপদ, ম ম গোপীনাথ কবিরাজ, ভারতবর্ষ—ফাল্গুন ১৩৪৭, পৃ ৩০৯, ৩০৮।

এক্ষণে এই মাত্রাংশ ব্যাখ্যাত হইতেছে ঃ প্রণবের স্বরূপ ত্রিকোণের দ্বারা অভিব্যক্ত হয়, সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকার ভুজঙ্গ বিগ্রহা সুষুপ্তা কুণ্ডলিনীও ত্রিকোণ দ্বারা ব্যাখ্যাত হন, এই শক্তির জাগরণে ত্রিকোণের ত্রিবিন্দু এক মধ্যবিন্দুতে পরিণত হয়। সাধক এই বিন্দুভূমিতে 'অহং' ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেও বিন্দুর পূর্ণ তিরোধান না হওয়া পর্য্যন্ত মহাবিন্দু বা শিবভাবের অভিব্যক্তি হয় না। এই নিমিত্ত কলাক্ষয়ের সাধন কর্ত্তব্য। প্রণবের চতুর্থমাত্রা বিন্দুকে 'চন্দ্রবিন্দু' বলা হয়, তৎপরে উল্লেখযোগ্য প্রধানচক্র অর্দ্ধচন্দ্র (অর্দ্ধবিন্দু), এই অবস্থায় অষ্টকলা শক্তির বিকাশ হয়। ইহার পরে রোধিনী, অনুগ্রহ শক্তি ব্যতীত ইহার আবরণভেদ কঠিন। ইহা ভেদ হইলে নাদ নাদান্ত প্রভৃতি নাদভূমির প্রাপ্তি হয় ও চিৎশক্তির আবির্ভাব হয়। ব্রহ্মরন্ধ্রের যে স্থানে নাদের লয় হয় ইহা ঐ স্থান। ইহার পর ত্রিকোণরূপা 'ব্যাপিনী', ইহাই বিন্দুর বিলাসস্বরূপ বামাদি শক্তিত্রয় দ্বারা সংঘটিত। অতঃপর 'সমনা'র আবির্ভাব হয়। ইহা সর্ব্বকারণভূতা, এতদারূঢ় শিবই পঞ্চকৃত্যকারী, এই স্থানে মনোরাজ্যের অন্ত হয়। ইহার পর দেশকালতত্ত্ব প্রভৃতি সদাকালের জন্য তিরোহিত হয়। ইহাই উন্মনা ভূমি, তথাপি নিষ্কল অবস্থা নহে, কারণ চিদ্রূপা নির্ব্বাণকলা এই অবস্থাতেও অবশিষ্ট থাকে, এই কলার নামান্তর দ্রষ্টা বা সাক্ষী। সাংখ্যের কৈবল্য এই অবস্থার দ্যোতক, কারণ পুরুষ নির্ব্বাণকলাস্বরূপ, তিনি দ্রষ্টা বা সাক্ষী এবং ষোড়শী কলা, প্রকৃতি পঞ্চদশ কলাত্মক। 'উন্মনী' অবস্থার উর্দ্ধে উঠিলে শিবতত্ত্ব উপলব্ধি হয়, বিন্দু শূন্য হইয়া গেলে মহাশক্তির আবির্ভাব হয়, অর্থাৎ মহাবিন্দুর পূর্ণস্থিতিতে পরাশক্তি নিত্য অভিব্যক্ত থাকেন, মহাবিন্দু রিক্ত হইলে পরমশিব আবির্ভূত হন। শিবশক্তি অভিন্ন হওয়ায় এই শূন্যত্ব ও পূর্ণত্বের আবির্ভাবও নিত্য। রিক্তদিশাই অমাবস্যা, পূর্ণদিশাই পূর্ণিমা। এক মহাশক্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়াই যাহা অমাবস্যারূপে সৃষ্টি হয় তাহা কালী এবং যাহা পূর্ণিমারূপে স্ফূর্ত্ত হয় তাহা ষোড়শী, ত্রিপুরা শ্রীবিদ্যানামে সাধক সমাজে সুপরিচিত।

অতীন্দ্রিয়ং গুণাতীতং মনোলীনং যদাভবেৎ।
অনুপমং শিবং শান্তং যোগযুক্তং সদা বিশেৎ ॥[১]

যখন মন গুণাতীত হইয়া লয়প্রাপ্ত হয়, তখন শিবস্বরূপে প্রবেশ হয়। এই মনোলয়ের প্রধান উপায় ওঁকার জপ, ওঁকার জপপরায়ণ ব্যক্তি শুচি

১। নাদবিন্দু উপঃ, ১৮ শ্লোক।

বা অশুচি অবস্থায় থাকিলেও সর্ব্বদা ওঁকার মহামন্ত্র জপফলে কদাচ পাপাদি দ্বারা লিপ্ত হন না, পদ্মপত্রে জলের ন্যায় প্রণবজপকারী নির্লিপ্ত থাকেন।[১]

জীব এই 'মহামন্ত্র' দিবারাত্রি জপ করিতেছে, ইহারই নামান্তর 'হংস'মন্ত্র বা অজপা গায়ত্রী। দিবারাত্রিতে শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া দ্বারা জীব একবিংশতিসহস্র ষট্‌শত বার ঐ মন্ত্র জপ করিতেছে, এই গায়ত্রী যোগীদের মোক্ষদায়িনী। ইহার ন্যায় বিদ্যা, ইহার ন্যায় জপ বা জ্ঞান কখনও হয় নাই বা হইবে না, এই অজপা গায়ত্রী কুণ্ডলিনী শক্তি হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে, ইহার দ্বারা জীবন সঞ্চারিত হয়, সুতরাং ইহাকে প্রাণবিদ্যা বলে। অজপা গায়ত্রী উচ্চারণের সহিত প্রাণবায়ুর ক্রিয়া হয় বলিয়া উহা প্রাণের তোষয়িত্রী, কুণ্ডলিনী শক্তির দ্বারা ইহার পরিপুষ্টি হয়।[২]

বিবেকমার্ত্তণ্ডে উক্ত হইয়াছে, শ্রী আদিনাথ স্বয়ং মীননাথকে অজপা গায়ত্রীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করেন, ইহা যোগীদের মোক্ষদায়িনী, ইহার সঙ্কল্প-মাত্রেই সর্ব্বপাপ মোচন হয়, "অনয়া সদৃশী বিদ্যা, অনয়া সদৃশো জপঃ। অনয়া সদৃশং জ্ঞানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি॥ অনয়া সদৃশং স্বর্গমনয়া সদৃশং তপঃ। অনয়া সদৃশং বেদ্যং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি॥[৩] প্রণব নির্গুণ, ইহা বেদমাতা গায়ত্রীর 'আদ্য', পাদুকা পরমন্ত্র, শ্রীগুরু পরদেব, শাক্ত পরমার্গ, কূলপূজা পরপুণ্য।[৪] প্রণবের অ-উ-ম এই তিন মাত্রা এবং বিন্দু ও নাদ এই পঞ্চটী শিবের পঞ্চমুখস্বরূপ এবং এই পঞ্চতত্ত্বই 'পাদুকাপঞ্চক'।[৫] শিবোপনিষদে আছে "ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরঃ শিব এব চ"—ইহারা প্রণবের পঞ্চদেবতা।[৬]

ছান্দোগ্য, মাণ্ডুক্য, বৃহদারণ্যক প্রভৃতি উপনিষদে ও ভাগবত-পুরাণে প্রণব প্রশংসা আছে। গীতাতে আছে—

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥[৭]

অর্থাৎ ব্রহ্মের একাক্ষর নাম ওঁ উচ্চারণপূর্ব্বক আমাকে স্মরণ করিতে করিতে যিনি দেহত্যাগ করেন, তিনি মোক্ষপ্রাপ্ত হন।

এই একাক্ষর নাম স্মরণ দ্বারা ব্রহ্মলাভ বা শিবত্বলাভ সম্ভব তাহা

১। গো. সং., ৫।২৯।
২। গো. সং., ১।৩৮, ৪০।
৩। বিবেকমার্ত্তণ্ড, উল্লেখ গো. সি. স., পৃ ৪০, ৪১। গো. সং., ১।৩৯অনয়া সদৃশী বিদ্যা ইত্যাদি।
৪। গো. সি. স., পৃ ৪৩
৫। মন্ত্রযোগ অবধূত জ্ঞানানন্দ, পৃ ৯১
৬। শিবোপনিষদ, উল্লেখ গো. সি. স., পৃ ২৭
৭। গীতা ৮।১৩

পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাধকদের অজ্ঞাত ছিল না। প্রাক্তন নাথসম্প্রদায় মধ্যেও ইহার সাধন ছিল, তাহা সাম্প্রদায়িক গ্রন্থাদি হইতে উল্লেখ করিয়া দেখান হইয়াছে। ওঁকার সাধন বা প্রণব মহামন্ত্রের জপের তাঁহারা যথার্থ অধিকারী ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। আধুনিক জগতে 'শব্দ বিজ্ঞানে'র সর্ব্বপ্রকার উৎকর্ষ সাধিত হইলেও 'শব্দব্রহ্মে'র তাৎপর্য্য আমরা ভুলিতে বসিয়াছি। ওঁকার সাধনকেই প্রাচীন আগম শাস্ত্রে 'শব্দযোগ' বা বাগ্‌যোগ বলিত, ইহাই নাদবিন্দুসাধন প্রক্রিয়া, ইহার সাধনেই পরমপদপ্রাপ্তি হয়।

শৈবাগমেব অন্তর্গত ব্যাকরণ আগমেও এই শব্দযোগের পরিচয় পাওয়া যায়। ভর্তৃহরির বাক্যপদীর ও তাহাব সাম্প্রদায়িক প্রাচীন ব্যাখ্যায় ইহার পরিচয় আছে। ব্যাকৃত শব্দের বৈখরী অবস্থা হইতে মধ্যমা, তৎপরে তাহা উত্তীর্ণ হইয়া পশ্যন্তীরূপে প্রবেশ করাই এই যোগ সাধনের প্রধান উদ্দেশ্য। পশ্যন্তী হইতে পরা অবস্থায় অর্থাৎ অব্যাকৃত পদে গতি ও তথায় স্থিতি স্বাভাবিক নিয়মেই হইয়া থাকে. অতএব তাহা কোন সাধনের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে।

বৈখরী বা স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দবিশেষের মিশ্র অবস্থা বলিয়া তাহা আগন্তুক মলে পূর্ণ, গুরুর উপদেশানুযায়ী সাধন করিলে যে কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল শব্দকে তাহার স্থূলাবস্থা হইতে মুক্ত করিয়া বিশুদ্ধাবস্থায় পরিণত করিয়া ব্রহ্মলাভ করা যায়। মন্দ বা ভাল যে কোন শব্দকে ব্রহ্ম মানিয়া লইয়া শব্দব্রহ্মের উপাসক সাধন করিবেন, কারণ ব্রহ্ম এক ও সম এবং অনুকূল প্রতিকূলাদি শব্দ বা রাগদ্বেষ হর্ষপ্রশংসাত্মক শব্দাদি সাধকের নিকট একার্থবোধক। স্থূল মলপূর্ণ শব্দকে শোধন করার নামই 'শব্দসংস্কার', শুদ্ধ শব্দই শক্তিরূপিণী, একটি মাত্র শব্দকে শুদ্ধ করিতে পারিলে জীব সদাকালের জন্য কৃতকৃত্য হয়। এই এক শব্দ তখন জীবের সম্মুখে কামধেনুরূপে আবির্ভূত হইয়া সাধককে অলৌকিক শক্তি প্রদান করে; "একঃ শব্দঃ সম্যগ্‌ জ্ঞাতঃ সুপ্রযুক্তঃ স্বর্গে লোকে চ কামধুগ্‌ ভবতি", বশিষ্ঠাদি ঋষি এই সাধনাদ্বারাই বিভূতিলাভ করেন। শোধিত শব্দশক্তি প্রাণশক্তির সহায়ে সুষুম্না পথে ঊর্দ্ধমুখী হয়, এই পথ জপাদি ক্রিয়া দ্বারা মলমুক্ত হয় এবং ইড়াপিঙ্গলা অপেক্ষাকৃত স্তম্ভিত হয়। এই অবস্থায় 'অনাহত নাদ' প্রকটিত হয়, ইহাই শব্দের সূক্ষ্ম বা মধ্যমাবস্থা। স্থূল শব্দ বিরাট প্রবাহে নিমগ্ন হইয়া চেতনভাব ধারণ

করে। ইহাই মন্ত্রচেতনের উন্মেষভাব। দেশ বা কাল এই শব্দের স্ফূর্ত্তি রোধ করিতে অক্ষম, সাধক এই অবস্থায় জীবমাত্রেরই চিত্তবৃত্তিকে অপরোক্ষভাবে শব্দরূপে জানিতে সক্ষম হয়। ইহার পর বালসূর্য্যসমান শব্দব্রহ্মরূপী আদিত্য সাধকের ইষ্টদেবতা বা আত্মরূপে প্রকাশিত হইয়া অন্তরাকাশের অন্ধকার দূর করেন, আগমশাস্ত্রে ইহাই 'পশ্যন্তী বাক্'। প্রাচীন বৈদিক শাস্ত্রে ইহাকেই ঋষিত্বপ্রাপ্তি বা মন্ত্রসাক্ষাৎকার বলা হইয়াছে। আত্মদর্শন, শিবনেত্রের বিকাশ, জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন, ইষ্টদেবতাদর্শন, ষোড়শীকলার উন্মেষ অথবা সাংখ্যে বর্ণিত দ্রষ্টা পুরুষের স্বরূপাবস্থিতিরূপ কৈবল্য, এই সকলই পশ্যন্তী ভূমির বিভিন্ন অবস্থা। পশ্যন্তী অপেক্ষা পরাভূমির পথ অত্যন্ত গুপ্ত, ইহার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক ও অনধিকারচর্চ্চা।[১]

বেদান্তমতে বাচ্য ব্রহ্ম, বাচক প্রণব। তন্ত্রে বাচ্য ও বাচককে কুণ্ডলিনীর দ্বিবিধা মূর্ত্তি বলা হইয়াছে, তন্ত্রশাস্ত্রের কুণ্ডলিনীতত্ত্ব ও শব্দ-ব্রহ্মতত্ত্ব দুইটী পরমরহস্য। সারদাতিলক তন্ত্রে আছে শব্দব্রহ্ম চৈতন্যরূপে সর্ব্বভূতে অবস্থিত, সেই শব্দব্রহ্ম কুণ্ডলিনীরূপে প্রাণিগণের দেহমধ্যে থাকিয়া পুনর্ব্বার কণ্ঠতালু প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ স্থানে সঞ্চারিত হইয়া গদ্যপদ্যাদিরূপে আবির্ভূত হন।

> চৈতন্যং সর্ব্বভূতানাম্ শব্দব্রহ্মেতি মে মতম্।
> তৎ প্রাপ্য কুণ্ডলীরূপং প্রাণিনাং দেহমধ্যগং
> বর্ণাত্মনাবির্ভবতি গদ্যপদ্যাদিভেদতঃ ॥[২]
> গমাগমস্থং গমনাদিশূন্যমোঙ্কারমেকং রবিকোটিদীপ্তিম্।
> পশ্যন্তি যে সর্ব্বজনান্তরস্থং হংসাত্মকং তে বিরজা ভবন্তি ॥[৩]

অর্থাৎ যাঁহারা শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি মধ্যে ওঁকার অক্ষরে 'হংস' দর্শন করেন যে হংস গমনাগমন শূন্য, কোটিসূর্য্যদীপ্তিতুল্য এবং সর্ব্বজনের অন্তরে স্থিত, তাঁহারা রজোগুণমুক্ত হন, এবং সর্ব্বোচ্চপদ প্রাপ্ত হন। এই মন্ত্রই হংসযোগের বীজ। গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহে উক্ত হইয়াছে—

> স্বরেণ সাধয়েদ্ যোগমস্বরং ভাবয়েৎ পরম্।
> অস্বরেণ হি ভাবেন ভাবো নাভাব ইষ্যতে ॥

১। শব্দযোগ ও বাগ্‌যোগ, ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ (কল্যাণ যোগাঙ্ক), পৃ ৫২, ৫৩
২। ওঙ্কার ও গায়ত্রীতত্ত্ব—সুরেশচন্দ্র সিংহ, বিদ্যার্ণব, পৃ ১৯৩।
৩। ধ্যানবিন্দু উপঃ, ২৪ শ্লোক।

এবং "তাবদ্ রথেন গন্তব্যং যাবদ্ রথপথি স্থিতঃ। স্থিত্বা রথং যথাস্থানম্ রথমুৎসৃজ্য গচ্ছতি। মাত্রালিঙ্গপদং ত্যক্ত্বা শব্দ ব্যঞ্জনবর্জ্জিতম্। অস্বরেণ মকারেণ পদ্মং সূক্ষ্মং চ গচ্ছতি।"[১]

এস্থলে ওঁকাররূপ রথে আরোহণের কথাই বলা হইয়াছে। ব্রহ্মলোকে পৌঁছাইবার নিমিত্ত ওঁকাররূপ রথের আবশ্যক, গম্যস্থানে পৌঁছিলে রথত্যাগ কর্ত্তব্য। তখন মাত্রালিঙ্গপদ প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া, স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণও ত্যাগ করিয়া, মাত্র অস্বর 'ম্' অক্ষর সাহায্যে ব্রহ্মলোকে পৌঁছান যায়। এই অস্বর 'ম' অর্থে বাক্যের উর্দ্ধে উঠিয়া ব্রহ্মলাভ হয়। 'ও' স্বর, 'ম্' অস্বর এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে, স্বর দ্বারা অর্থাৎ মন্ত্রবাক্য দ্বারা যোগসাধন হয়, কিন্তু পরমপদ লাভ করিতে হইলে তদূর্দ্ধে অস্বরের সাহায্য লইতে হয়। "ওঁমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ধ্যেয়ং সর্ব্বমুমুক্ষুভিঃ।"[২] 'অ'কার পীতবর্ণ রজোগুণ, 'উ' শুক্লবর্ণ সাত্ত্বিক, 'ম' কৃষ্ণতামস এবং ওঁকারের অষ্টঅঙ্গ, চতুষ্পদ, ত্রিস্থান ও পঞ্চদেবতা আছে। ওঁকারের হ্রস্ব উচ্চারণে পাপনাশ হয়, দীর্ঘ উচ্চারণ সম্পৎপ্রদ, অর্ধমাত্রাসমাযুক্তঃ প্রণবো মোক্ষদায়কঃ।[৩]

ওঁকারধ্বনিনাদেন বায়োঃ সংহরণান্তিকং।
যাবদ্বলং সমাদধ্যাৎ সম্যঙ্ নাদলয়াবধি ॥[৪]

সাধকের যতদূর সম্ভব ওঁকার নাদে মনকে আসক্ত করা কর্ত্তব্য, যতক্ষণ শ্বাসের গতি নিয়মিত না হয় ও নাদ লয়প্রাপ্ত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এইরূপে অভ্যাস কর্ত্তব্য।

প্রণবের অষ্ট অঙ্গ—অ, উ, ম, বিন্দু, নাদ, কলা, কলাতীত ও তৎপর। চতুষ্পাদ—বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ ও তুরীয় (ব্যষ্টিতে) এবং বিরাজ, সূত্র, বীজ ও তূর্য্য (সমষ্টিতে)। ত্রিস্থান—জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তি অবস্থা, স্থূলসূক্ষ্মকারণ দেহ, সত্ত্বরজস্তমোগুণ, ক্রিয়া ইচ্ছাজ্ঞান শক্তি, ভূতবর্ত্তমান-ভবিষ্যৎ কাল। পঞ্চদেবতা—ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র ঈশ্বর ও সদাশিব। ইহাদের না জানিলে ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না।[৫] প্রপঞ্চসারমতে জাগ্রৎ—বীজ, স্বপ্ন—বিন্দু; সুষুপ্তি—নাদ, তুরীয়—শক্তি, লয়—শান্ত।[৬]

অন্যত্র ওঁকার রূপ অন্তঃপ্রণবকে অষ্টভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—

১। গো. সি. স., পৃ ২, ৭, তুলনীয় ব্রহ্মবিন্দু উপঃ ও অমৃতনাদোপনিষৎ, ৩, ৪ শ্লোক।
২। ধ্যানবিন্দু উপঃ, ৯ শ্লোক।
৩। ধ্যানবিন্দু উপঃ, শ্লোক ১২, ১৩, ১৭ শ্লোক।
৪। ঐ শ্লোক, ২৩
৫। Adyar Up ; p: 153 ff.
৬। Serpent Power, p. 82 f. n.

অ-উ-ম, অর্দ্ধমাত্র, নাদ, বিন্দু, কলা ও শক্তি। প্রণবকে ব্রহ্ম বা সংসার তারক আখ্যা দেওয়া হইয়াছে এবং 'সংহার প্রণব' ও 'সৃষ্টি প্রণব' এই ভেদ বর্ণিত হইয়াছে। সংহার প্রণবই ব্রহ্মপ্রণব বা অর্দ্ধমাত্রা প্রণব; সৃষ্টি প্রণব অন্তঃ বাহ্য ও উভয়াত্মক প্রণবভেদে ত্রিবিধ, উহারা যথাক্রমে ব্যবহারিক প্রণব, আর্ষ প্রণব ও বিরাট প্রণব। সংহার প্রণব নির্গুণ, বিরাট প্রণব সগুণ, উৎপত্তি প্রণব উভয়াত্মক।

বিরাট প্রণবের ষোড়শ মাত্রা আছে এবং ইহা ষট্‌ত্রিংশতত্ত্বাতীত। ষোড়শ মাত্রা, যথা—অ-উ-ম, অর্দ্ধমাত্রা, নাদ, বিন্দু, কলা, কলাতীতা, শান্তি, শান্ত্যতীতা, উন্মনী, মনোন্মনী, পুরী, মধ্যমা, পশ্যন্তী ও পরা। এই 'পরা'র ৬৪ মাত্রা আছে, পুরুষের ২৮ মাত্রা, প্রকৃতির ২৮ মাত্রা, অর্থাৎ ইহা সগুণ-নির্গুণের ঐক্যভূমি।[১]

নাদবিন্দু উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে, "সহস্রার্ণমতীবাত্র মন্ত্র এষ প্রদর্শিতঃ। এবমেতাং সমারূঢ়ো হংসযোগবিচক্ষণঃ।"[২] অর্থাৎ ওঁকার (ইহাতে 'অ'কার যুক্ত আছে), সহস্র অঙ্গবিশিষ্ট (বৈদিক শাস্ত্রানুসারে 'অ'কার সহস্রাঙ্গযুক্ত)। হংসযোগ বিচক্ষণ ব্যক্তি যিনি বিরাজ বিদ্যায় পারদর্শী তিনি কোন পাপের দ্বারা লিপ্ত হন না।

প্রণবের চারি মাত্রা—প্রথমা, অপরা, উত্তরা ও পরমা। ইহারা যথাক্রমে আগ্নেয়ী, বায়বী, ভানুমণ্ডলসঙ্কাশা ও বারুণী, অর্থাৎ প্রথম মাত্রা 'অ'কার অগ্নি (বিরাজ) সহ যুক্ত, দ্বিতীয় মাত্রা 'উ' বায়ুর সহিত যুক্ত, তৃতীয় মাত্রা 'ম'কার (বীজাত্মা) সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশ পায় (সূর্য্যই ইহার দেবতা), এবং চতুর্থ বা অর্দ্ধমাত্রাকে বরুণা (তূর্য্য) বলিয়া পণ্ডিতগণ জানেন। ইহাদের প্রত্যেকের তিনটী করিয়া কলা আছে, তাই ওঁকারের দ্বাদশ কলা। এই মাত্রা সকল চিত্ত দ্বারাই জ্ঞেয়।[৩]

প্রণবোপাসনা দ্বারা সিদ্ধিলাভের উপায় ওঁকারের চারি মাত্রা ধ্যান। ওঁকারের কলা বা মাত্রা চারিটী, অ-উ-ম এবং অব্যবহার্য্য বা অর্দ্ধমাত্রা। ব্রহ্ম ও চারি প্রকার শুদ্ধ (তূর্য্য বা শান্ত), ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট। মায়া কার্য্যোপাধিরহিত ব্রহ্মই শুদ্ধ মায়োপহিত 'ঈশ্বর'। অপঞ্চীকৃত ভূতকার্য্যরচিত সমষ্টিভূত সূক্ষ্মশরীরোপহিত 'হিরণ্যগর্ভ' এবং পঞ্চীকৃত ভূতকার্য্যরচিত স্থূল শরীরোপহিত 'বিরাট' পুরুষ। জীবও চারিপ্রকার

১। নারদপরিব্রাজক উপঃ, অষ্টম উপদেশ, প্রথম শ্লোক।
২। নাদবিন্দু উপঃ, শ্লোক ৫। ৩। গো. সং., ৫।১৫, ১৬, ১৭, নাদবিন্দু উপঃ, ১।৬, ৭।

অবস্থাযুক্ত—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়। সেই অবস্থাভেদে জীব বৈশ্বানর, তৈজস, প্রাজ্ঞ ও অব্যবহার্য্য নাম ধারণ করে। ওঁকারের চারি মাত্রার ধ্যান বা ভেদচিন্তা এইরূপে করিতে হয়—বিশ্ব, বৈশ্বানর ও অকারমাত্রার একতার ধ্যান অর্থাৎ পরমাত্মার বিশ্বরূপ, জীবাত্মার বৈশ্বানররূপ ও 'অ'কারমাত্রাকে এক জ্ঞান করিতে হইবে। সেইপ্রকার হিরণ্যগর্ভ, তৈজস ও 'উ'কার এবং ঈশ্বর, প্রাজ্ঞ ও 'ম'কারের একতা ধ্যান কর্ত্তব্য। শুদ্ধচিদ্রূপ, আত্মচিদ্রূপ ও ওঁকারের অব্যবহার্য্যের একতা ধ্যান করিতে হইবে। এই ধ্যানযোগের দ্বারাই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার বা শিবত্বলাভ হইবে।

অকারমাত্রং বিশ্বঃ স্যাদুকারস্তৈজসঃ স্মৃতঃ।
প্রাজ্ঞো মকার ইত্যেবং পরিপশ্যেৎ ক্রমেণ তু॥
অকারং পুরুষং বিশ্বমুকারে প্রবিলাপয়েৎ।
উকারং তৈজসং সূক্ষ্মং মকারে প্রবিলাপয়েৎ॥
মকারং কারণং প্রাজ্ঞং চিদাত্মনি বিলাপয়েৎ॥[১]

স্বরবর্ণ যেরূপ স্বতন্ত্র, 'অ' ও 'উ' সেইরূপ স্বতন্ত্র; ব্যঞ্জন যেরূপ পরতন্ত্র, মায়াবাচক 'ম'ও তদ্রূপ। প্রণবের চতুর্থ মাত্রা অমাত্র, উহা প্রপঞ্চোপশম, শিব ও অদ্বৈত। অতএব উহা অব্যবহার্য্য নামে খ্যাত। এই চতুর্থ মাত্রার অস্তিত্ব স্বীকার্য্য, কারণ উহা নাদরূপ, এবং স্বর ও ব্যঞ্জনের সংঘাতের অনুরণনের দ্বারা লক্ষিত হয়।

"তিস্রোমাত্রার্দ্ধমাত্রা চ ত্র্যক্ষরস্য শিবস্য তু"—অ-উ-ম, যথাক্রমে সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নিরূপে ধ্যেয়, অর্দ্ধমাত্রা দীপশিখার ন্যায় ত্রিমাত্রার ঊর্দ্ধে স্থিত।[২] শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, ওঁকার প্রকৃতি-পুরুষের সমন্বয় দ্বৈতবাদকে তিনি অদ্বৈতবাদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বলিয়াছেন, এই সমন্বয়ই 'শব্দব্রহ্ম', ইহাই ওঁ শব্দ প্রভৃতি দ্বারা ব্যাখ্যাত হয়। শব্দের তিনটী অবস্থা—পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী—অ-উ-ম রূপে প্রতিভাত হয়। বিন্দুগর্ভস্থ বিশ্বের মূলস্বরূপ মহাত্রিকোণ উক্ত ত্রিবিধ বাক্ ও পরাবাক্ সমন্বিত। ত্রিকোণের ত্রিরেখা দ্বারা ত্রিবিধ বাক্, সৃষ্টিস্থিতিসংহার, ব্রহ্মাবিষ্ণুরুদ্ররূপ শিবাংশ ও ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়ারূপ শক্ত্যংশ প্রতিভাত হয়, ত্রিকোণের মধ্য-বিন্দুই পরাবাক্ বা শিবশক্তির সাম্যভাব। ত্রিকোণের ত্রিবিন্দু ত্রিজগতের দ্যোতক। অন্তর্মুখী প্রেরণায় ত্রিবিন্দু এক হইয়া মধ্যবিন্দুতে লয়প্রাপ্ত

১। প্রণবোপাসনা—হরিনন্দজী শর্ম্মা বেদান্তাচার্য্য, কল্যাণ সাধনাঙ্ক (২য়), পৃ ১৪৮৯।
২। ব্রহ্মবিদ্যোপনিষৎ, ৩, ৮, ৯ শ্লোক।

হয়, ইহাই দিব্যমিথুন, যুগনদ্ধরূপ, নিত্যলীলা প্রভৃতি নামে পরিচিত। এই ত্রিকোণই প্রণবের স্বরূপ, ইহাই কুণ্ডলিনী শক্তি, ইহার প্রবোধনে শিবশক্তির মিলন হয় এবং জীবে শিবে অভেদত্ব প্রাপ্তি হয়। তখন বিন্দু বা ত্রিকোণের ভেদও অপগত হইয়া এক অনামা মূলতত্ত্বমাত্র অবশিষ্ট থাকে। এই মূলতত্ত্বকে সম্প্রদায় অনুসারে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হইয়াছে। কবীরাদি ইহাকেই 'নিরঞ্জন' বলিয়াছেন, শিবদয়াল ইহাকেই 'রাধাস্বামী' বলিয়াছেন। শব্দব্রহ্মের বা ওঁকারের কূটস্থ রূপই 'বিন্দু' এবং পরিণামরূপ 'নাদ'। কূটস্থরূপে তাহা বিন্দু মাত্র, তাহার স্থিতি আছে, পরিসর নাই। বিন্দুর প্রসার হইলে তাহা হইতে রেখা ও ক্রমশঃ ক্ষেত্রাদি উৎপন্ন হয়, নাদের স্পন্দনে বা ইচ্ছাশক্তির বিকাশে বিন্দুতে অভিঘাত ফলে এক হইতে বহুর সৃষ্টি হয়। খৃষ্টানদের মতেও ঈশ্বরের বাক্য হইতেই জগতের উদ্ভব হইয়াছে। মুসলমানও আল্লার 'কুন্' শব্দ হইতে জগতের উৎপত্তি কল্পনা করেন। সন্তরা 'নাদবিন্দুসংযোগে' বিশ্বসৃষ্টির কথা বলিয়াছেন। বেদান্তীর 'স্ফোটবাদ'ও ইহাই। একমাত্র অদ্বৈতবাদীরা প্রকৃতিতত্ত্ব অস্বীকার করেন। বৈষ্ণবের লীলাপুরুষ শব্দব্রহ্মের অনুরূপ, তিনি সঙ্কল্প দ্বারা এক হইতে বহু হন। দাদূ বলিয়াছেন, ব্রহ্ম হইতে ওঁকারের উৎপত্তি, তাহা হইতে পঞ্চতত্ত্বের উৎপত্তি এবং পঞ্চতত্ত্ব হইতে ঘটাদি ও ঘটাদি হইতে বর্ণাদির উৎপত্তি হইয়াছে।[১]

মাণ্ডুক্য উপনিষদ ও গৌড় পাদাচার্য্যের মাণ্ডুক্যকারিকায় ওঁকারকে 'আত্মা' বলা হইয়াছে। এই আত্মার চারিপাদ আছে। বিশ্বনামক অধ্যাত্ম ও বৈশ্বানর নামক অধিদৈবী দেহী প্রথম পাদ, ইহা জাগরিত অবস্থার পরিচায়ক। ছান্দোগ্যে বৈশ্বানরের উপাসনা-বিধি বর্ণিত হইয়াছে এবং দেহস্থ সপ্ত অঙ্গের সহিত দ্যুলোক, আদিত্যাদির অবস্থান বর্ণিত আছে। তৈজস নামক অধ্যাত্ম ও সূত্রসংজ্ঞক অধিদৈবী দেহী দ্বিতীয় পাদ, ইহা স্বপ্নাবস্থার পরিচায়ক, ইহার ভোগ্য বাহ্যইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় নহে, ইহা মনঃকল্পিত সূক্ষ্ম বিষয়কে গ্রহণ করে। ঈশ্বর ও প্রাজ্ঞ আত্মার তৃতীয় পাদ, ইহা সুষুপ্তি অবস্থা, ইহাতে বুদ্ধির লয় হয় বলিয়া দ্বৈতজ্ঞান থাকে না, ইহা আত্মা ও পরামাত্মার যোগ বা আনন্দময় অবস্থা।

এই তিনটী পাদ মায়ামাত্র, চতুর্থ পাদ অনাবৃত শুদ্ধচিদাত্মা তুরীয়

১। সন্তবাণী-সংগ্রহ—Belvedere Press. ১ম খণ্ড, পৃ ৭৭, ৭৮ দাদূবাণী

অবস্থা। ইহা বর্ণনাতীত অদ্বৈতস্বরূপ শান্ত ও শিব অবস্থা। ইহাই আত্মা, ইহাই জ্ঞেয়। আত্মার আগমোক্ত চারিটী স্বরূপ—স্থূল, সূক্ষ্ম, বীজ ও সাক্ষী; নিবৃত্তি প্রতিষ্ঠা বিদ্যা ও শান্তি ইহার কলা। আত্মার অ-উ-ম দ্বারা বিশ্ব, তৈজস, ও প্রাজ্ঞের সহিত অভেদাত্মক হওয়া যায়, কিন্তু তুরীয় অমাত্রের উপলব্ধিতে গতি থাকে না, কারণ উহা প্রপঞ্চশূন্য অদ্বিতীয় অবস্থা। "অমাত্রশ্চতুর্থোঽব্যবহার্য্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোঽদ্বৈত এবমোকার আত্মৈব সংবিশত্যাত্মনাত্মানং য এবংবেদ, য এবংবেদ"।[১] অর্থাৎ যিনি পাদ ও মাত্রার একত্ব জানেন তাঁহার দ্বারা অমাত্র ওঁকার তুরীয় ব্যবহারাতীত, জগতের নিবৃত্তিস্থল, মঙ্গলময় অদ্বিতীয় আত্মরূপে পর্য্যবসিত হয়। ইহার বেত্তা পরমাত্মায় প্রবেশ করেন, তাঁহার পুনর্জন্ম হয় না, ওঁকার সাধনে আত্মা-পরমাত্মার ঐক্য ধ্যানে ক্রমমুক্তি হয়।

১। মাণ্ডুক্যোপনিষৎ, ১২ শ্লোক।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নাদবিন্দু কলা

হঠযোগপ্রদীপিকাতে (৪।১) যে গুরু-নমস্কার আছে তাহা নাদবিন্দু ও কলাস্বরূপে বর্ত্তমান ঈশ্বরাভিন্ন শিবরূপী গুরুকেই নমস্কার, তিনিই নিরঞ্জনপদ অর্থাৎ পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া থাকেন। যথা—

নমঃ শিবায় গুরবে নাদবিন্দুকলাত্মনে।
নিরঞ্জনপদং যাতি নিত্যং যত্র পরায়ণঃ ॥৪।১ হ-যো-প্র

সকলের মূলে আছেন চিৎস্বরূপ পরমেশ্বর। চিৎশক্তি তাহার সহিত সদাই যুক্ত হইয়া আছেন। সেই শক্তির ক্রিয়াশীল অবস্থায় শিব বা পরমেশ্বর 'সকল', শক্তির নিষ্ক্রিয় অবস্থায় শিব 'নিষ্কল'। গায়কের নিদ্রিতাবস্থায় তাহার শক্তি যেরূপ সুপ্তিমগ্ন থাকে, শিবের নিষ্কল অবস্থায় শক্তিও তদ্রূপ সুপ্ত থাকেন। স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, শিব সদাই জাগ্রত, শক্তিরই জাগরণ বা সুপ্তি তাঁহাতে আরোপিত হয় মাত্র। জীব বা জড়জগতের তুলনায় শিবকে 'সকল' 'নিষ্কল' আখ্যা দেওয়া হয়। শিবই একাধারে বিরুদ্ধগুণযুক্ত সকল ও নিষ্কল। বাস্তবিকপক্ষে এই পরস্পরবিরোধী গুণের একত্র সমাবেশ সম্ভব নহে।

চিৎস্বরূপ পরমাত্মা নিরুপাধিক। ভগবতী শক্তিকে অবলম্বন করিয়াই তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবরূপে আবির্ভূত হন। পরমাত্মার শক্তি 'ওঁকার', তিনি 'ত্রিপুরা' নামে প্রসিদ্ধ।

দশমহাবিদ্যার তৃতীয়া বিদ্যা ষোড়শী শ্রীবিদ্যা বা ত্রিপুরাসুন্দরী। ত্রিপুরা উপনিষদ হইতে জানা যায় এই উপাসনা বেদ হইতে তন্ত্রে গৃহীত হইয়াছে। একমাত্র ত্রিপুরাই আদিতে ছিলেন, শিবশক্তির ঐক্য ভাবনা দ্বারা সাধক যে নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করেন, তাহা ত্রিপুরা বিদ্যাকেই আশ্রয় করিয়া করেন। শ্রীগৌড়াপাদাচার্য; এই শ্রীবিদ্যার উপাসক ছিলেন। শঙ্করাচার্য্যও শৃঙ্গেরী মঠে শ্রীবিদ্যার যন্ত্র স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। গৌড়পাদাচার্য্যের শ্রীবিদ্যারত্ন সূত্রে আছে "আত্মৈবাখণ্ডাকারঃ চৈতন্যস্বরূপা চিচ্ছক্তিঃ" (২-৩) অর্থাৎ এক অখণ্ডাকার, তাহাই তাঁহার আকার। তাঁহার যে শক্তি সেই শক্তি চৈতন্যস্বরূপা চিৎশক্তি ও শিবের

ন্যায় অখণ্ডাকার। তত্ত্বত্রয়যোগে তিনি অভিব্যক্ত হইয়া জীবের প্রতি কল্যাণ করেন। তিনিই অখ্যাতা বা অনাম্নী 'শ্রীবিদ্যা'।[১]

সেই সনাতন শিব নিত্য বস্তু, তিনি সকলে অবস্থিত, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম, বিকারশূন্য, তিনি স্বয়ং কর্ত্তা বা ভোক্তা নহেন, সাক্ষিমাত্র।

শারদাতিলকে আছে—

নির্গুণঃ সগুণশ্চেতি শিবো জ্ঞেয়ঃ সনাতনঃ।
নির্গুণঃ প্রকৃতেরন্যঃ সগুণঃ সকলঃ স্মৃতঃ ॥[২]

অর্থাৎ সনাতন শিবতত্ত্ব নির্গুণও বটে, সগুণও বটে। প্রকৃতি হইতে পৃথক বিবেচিত হইলে তিনি নির্গুণ, আর প্রকৃতিযুক্ত চিন্তাতে তিনি সৃষ্টির উপযোগী বলিয়া সকল বা সগুণ ব্রহ্মরূপে কথিত হন। 'কলা' শব্দের অর্থ এখানে প্রকৃতি, কলা এখানে অংশ অর্থে ব্যবহার হয় নাই।

চিৎশক্তির আসন চিদাকাশ, ইহাই মহামায়া বা বিন্দুর স্তর এবং এই বিন্দুই 'কারণবিন্দু', 'পরবিন্দু', 'মহাবিন্দু' প্রভৃতি নামে খ্যাত। সমস্ত সৃষ্টি চিদাকাশ হইতে বিসৃত হয়, জলবুদ্বুদের ন্যায় প্রতিক্ষণে কত শত সৃষ্টির পুনরাবির্ভাব ও লয় হইতেছে। সুতরাং চিদাকাশ সকল সৃষ্টির আধার ও অবিনাশী। এই চিদাকাশ কি? সৃষ্টির বিকাশের জন্য যে সকল পরবর্ত্তী অবস্থা উপস্থিত হইতেছে, তাহারা সেই 'তৎ' (বেদান্তের অনাদি আদি তত্ত্ব) বা মনবুদ্ধির অগোচর ও অগম্য যে অবস্তু বস্তু বা 'চিৎ' তাহা হইতেই আগত। তৎ হইতে আগত বলিয়া, তাহারা 'তত্ত্ব' নামে অভিধেয়। যে তত্ত্ব চিৎএর প্রথম বিকাশোন্মুখ অবস্থা তাহাই 'চেতন', ইহা অব্যক্ত অবস্থা, বীজের অঙ্কুরের ন্যায় অপরিস্ফুট বা 'কলান' অবস্থা। এই চেতন হইতে ক্রমশঃ সৃষ্টির অঙ্কুর উদ্গত হইয়া চৈতন্য নামে কথিত হয়, তাহাই আরও বিকশিত অবস্থায় 'চিত্তে' পরিণত হয়। জীবের মন বুদ্ধি অহঙ্কারাদিই চিত্ত। অতএব এক চিৎ হইতে চেতন, চৈতন্য ও চিত্ত এই তিনটী অবস্থাভেদ লক্ষিত হইল। কিন্তু চিৎ, চেতন ও চিত্তকে অপ্রভেদে অনেক স্থলে 'চিদাকাশ' আখ্যা দেওয়া হয়। এই চিত্তাকাশই ব্রহ্মচিত্তের চেতনত্ব হইতে চিত্তের বিকাশ, সেইজন্য চিত্তাকাশ চৈতন্যধাম, সদাস্থায়ী বলিয়া সৎ ও আনন্দধাম

১। শ্রীগৌড়পাদাচার্য্যের শক্তিবাদ, বেদান্তে শক্তিতত্ত্বের নবম অধ্যায়, দুর্গাচৈতন্য ভারতী।
২। মন্ত্রযোগ, পৃ ৭২—অবধূত জ্ঞানানন্দ।

বলিয়া আনন্দ—অতএব 'সৎ চিৎ আনন্দ' বলিয়া চিত্তাকাশরূপ ব্রহ্মকেই নির্দ্দেশ করা হয়। যাহা 'চিৎ' তাহা শুদ্ধজ্ঞানমাত্র, তাহাই নিগুণ শিবপদ, এবং চিৎএ যে চৈতন্যের উদয় বর্ণনা করা হইল, তাহাই আগমের 'শক্তিতত্ত্ব'।

এই চিদাকাশ বা মহামায়ার স্তর জ্যোতির্ম্ময়, এই স্তরে অষ্টমন্ত্রেশ্বর ও সপ্তকোটি মন্ত্র বিরাজ করেন, পরে তাঁহাদের বিষয় আলোচিত হইতেছে। চিৎশক্তির আসন 'চিদাকাশ' তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, চিৎশক্তি যখন ক্রিয়াশীল হন, তখন তাঁহার কৃপাফলে কারণবিন্দু বা পরবিন্দু বিক্ষুব্ধ হন। চিৎশক্তির ক্রিয়াতে কারণবিন্দুতে আঘাতের ফলে যে কম্পন হয় তাহাই জ্যোতি বা নাদ বা শব্দরূপে প্রকটিত হয়, ইহাই 'ওঁকার' এবং এই জ্যোতির বহিরঙ্গই মায়া। ইহা এক ছায়াময় স্তরবিশেষ বা শিবের আত্মাবরণ-বিশেষ। চিৎশক্তি যতক্ষণ ক্রিয়াশীল না হইতেছেন ততক্ষণ জ্যোতি বা ছায়ার প্রশ্ন উঠে না, তাঁহার ক্রিয়াতে বিন্দুতে আঘাত ফলে যে কম্পন হয় তাহাতেই জ্যোতি ও ছায়া উভয়ের উৎপত্তি। পরবিন্দু শূন্যবৎ, ইহা বিশ্বের মূলকারণ অবস্থা। তৎপরের জ্যোতির্ম্ময় মহামায়ার স্তরই শক্তির ক্রিয়াশীল অবস্থা, (ইহাকে বিন্দুর ক্ষুব্ধ অবস্থা বলা চলে), ইহার পরে ছায়াময় মায়ার স্তর বিশেষ।

প্রলয়কালে যে সকল জীবের মন পরিপক্ক হইয়াছিল, তাঁহারা উক্ত মহামায়ার মায়ার স্তরে ভাসিয়া উঠেন, অন্যরা নিম্নে থাকে। মাধ্যাকর্ষণ সমভাবে সকল ফলকে আকর্ষণ করিলেও যেমন পরিপক্ক ফলগুলি ভূমিতে পতিত হয়, তেমনি পক্কমলজীবেরা মাত্র উদ্ধারলাভ করে, ইহাই মহামায়ার ও মায়ার জগতের জীবোদ্ধার। জীবের বা অণুর আণব, মায়ীয় ও কার্ম্মমল ফলে বিজ্ঞানকল প্রলয়াকল ও সকল জীবভেদ আছে। আণবমলযুক্ত অবস্থায় অণু 'বিজ্ঞানকল', আণব ও মায়ীর এই দ্বিবিধ মলযুক্তজীব 'প্রলয়াকল', আর্ণব, মায়ীয় ও কার্ম এই ত্রিবিধ মলযুক্ত অবস্থার অণু 'সকল'। কার্মজনিত মলই মুখ্য সংসার কারণ এবং অণুর (দেহীর) ভোগসিদ্ধ্যর্থে এই চরাচর জগৎ প্রকটিত হইয়াছে।[১]

যাঁহারা সর্ব্বপ্রথম এই শক্তি বা অনুগ্রহ লাভ করেন তাঁহারা সংখ্যায় অষ্টজন ; ইঁহাদের প্রত্যেকের উপর শিবের জ্ঞানশক্তি পূর্ণমাত্রায়

১। তন্ত্রসার ৮ আ:

পতিত হয়। এই অষ্টজন অনন্ত হইতে শিখণ্ডী পর্য্যন্ত মন্ত্রেশ্বর নামে পরিচিত, ইঁহারা জগদ্‌গুরুরূপে বর্ণিত হইবার যোগ্য। ইঁহারা সকলেই 'সর্ব্বজ্ঞ' তথাপি ইঁহাদের শক্তির তারতম্য আছে, অর্থাৎ তাঁহাদের পক্বতা অনুযায়ী তাঁহারা জ্ঞানলাভ করিয়াছেন তথাপি ক্রিয়াশক্তির তারতম্য রহিয়াছে। এই অষ্ট মন্ত্রেশ্বরই বিভিন্ন মহামায়া জগতের অধীশ্বর বা কর্ত্তা। ইঁহারা স্বয়ং কোন কার্য্য করেন না, অধীনস্থ সপ্তকোটি মন্ত্র দ্বারা কাজ করান। পরমেশ্বরও স্বয়ং একমাত্র প্রলয়াবস্থাকালেই জীবোদ্ধার করেন, তৎপরে অষ্টগুরু দ্বারা করান। অষ্টগুরুর আদেশ মান্য করাই মন্ত্রদের কর্ম্ম। পরমেশ্বর সৃষ্টিকালে স্বাধিকরণ অর্থাৎ গুরুর মধ্য দিয়া অনুগ্রহ করেন ও প্রলয়কালে নিরধিকরণ অনুগ্রহ করেন।

উপর্য্যুক্ত গুরু ও মন্ত্র উভয়ের দেহ 'বৈন্দব' দেহ অর্থাৎ বিন্দুই এই দেহ নির্ম্মিত হইবার উপকরণ, বিন্দু হইতেই ইহাদের দেহ লাভ হয়।

চিৎশক্তি প্রসব করেন না, তাই তাঁহার আখ্যা 'কুমারী', কিন্তু বিন্দু ও মায়া প্রসব করেন বলিয়া 'মাতা'। ঈশ্বরের (অনন্তের) দৃষ্টি মায়াতে পড়ে, কিন্তু পরমেশ্বরের দৃষ্টি মায়াতে পড়ে না, কারণ পরমেশ্বরের সে ক্ষণ-শক্তি নাই, ঈশ্বরে আছে এবং তাঁহার নাদধারাও আছে। ঈশ্বরের দৃষ্টি মায়াতে পড়িলে জগৎ সৃষ্ট হয়। এই দৃষ্টিই সবিকল্পজ্ঞান, পরমেশ্বরের জ্ঞান 'নির্ব্বিকল্প জ্ঞান'।

প্রলয়কালে যে সকল পক্বমলজীব অণুরূপে ভাসিতেছিল, চিৎশক্তিই তাহাদের বিন্দুর উপকরণে নির্ম্মিত জ্যোতির্ম্ময় দেহ প্রদান করেন। অতএব বৈন্দব বা বিন্দুনির্ম্মিত দেহ জ্যোতির্ম্ময়। অতএব মন্ত্রদের দেহও জ্যোতির্ম্ময়। ইহাদের সপ্তকোটির মধ্যে সাড়ে তিন কোটি মহামায়ার রাজ্যে ও সাড়ে তিন কোটি মায়ার স্তরে বিরাজ করেন।

বিন্দুর প্রথম কম্পনে 'নাদে'র উৎপত্তি বা সৃষ্টির বিকাশ হয়। ইহাই ওঁকার ধ্বনি বা মতান্তরে 'স্ফোটবাদ', এই শব্দ বিশ্বব্যাপী ও ইহা অবিরাম ধ্বনিত হইতে থাকে। মানবদেহেও ইহা 'অনাহত' নাদরূপে বিরাজিত, ঘুমন্ত মনুষ্যেও এই নাদ অবিরাম ধ্বনিত হইতে থাকে। শাস্ত্রে নাদকে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করা হইলেও, ওঁকার নাদের কোন ঔপাধিক ভেদ বর্ণিত হয় নাই, অতএব একমাত্র ওঁকারই উপাধিরহিত শব্দতত্ত্ব

এবং উহা দ্বারা ব্রহ্মভাবের স্ফূর্তি হয় বলিয়া প্রাচীন সাধকেরা উহাকে 'স্ফোট' আখ্যা দিয়াছেন।

এই 'নাদ' হইতেই কলা বা বর্ণের উৎপত্তি হয়। বর্ণ অর্থে 'অক্ষর' নহে, ইহা বিভিন্ন রশ্মির ন্যায়, তথাপি বর্ণের স্থূলরূপ আছে, তাহা অতিক্রম করিবার নিমিত্তই তন্ত্রে ষট্‌চক্রসাধনের ব্যবস্থা আছে এবং প্রতিচক্রে বিভিন্ন বর্ণের কল্পনা আছে। বর্ণগুলির সমষ্টি অবস্থায় তাহাদের ময়ূরের অণ্ডরসের মত অবস্থা, ময়ূর-অণ্ডে যেরূপ ময়ূরপুচ্ছের সকল বর্ণই অব্যক্ত অবস্থায় আছে, তদ্রূপ। আজ্ঞাচক্রের উপরেও সকল বর্ণের সমষ্টি আছে, তাহাই বিন্দু, ইহাই মন্ত্রচৈতন্য বা সমস্ত বর্ণের সমষ্টি, কারণ মন্ত্রই বর্ণ। এই শব্দব্রহ্ম বা মন্ত্রচৈতন্য কুণ্ডলিনী রূপে মানবদেহে অবস্থিত হইয়া বর্ণোচ্চারণের মূলাযন্ত্র হইয়াছেন—'তৎ প্রাপ্য কুণ্ডলীরূপং প্রাণিনাং দেহমধ্যগম্'। (শারদাতিলক)।

তন্ত্রে কথিত আছে বর্ণগুলি যখন কুণ্ডলীমধ্যে থাকে তখন তাহারা জ্যোতির্ম্মাত্রারূপে অবস্থিত, এই অবস্থার নামই 'পরাবস্থা'। যখন সুসুম্না পথে তাহারা নাভিপদ্মে উদিত হয়, তখন সেই পদ্মস্থিত বহ্নিতত্ত্বে তাহাদের দীপ্তি বিকসিত হয়। কুণ্ডলিনী মধ্যে সমস্ত বর্ণের একই জ্যোতির্ম্মাত্রা রূপ, নাভিপদ্মে পৃথক পৃথক বর্ণের পৃথক পৃথক দ্যুতি ভাসিত হওয়ায় সেখানে তাহারা 'স্বয়ংপ্রকাশা' এবং এই অবস্থার নাম 'পশ্যন্তী'। হৃৎপদ্মে উদিত হইলে বর্ণগুলি নাদযুক্ত হয়, কিন্তু তখনও শ্রুতিগোচর হয় না, তাহাদের অন্তরে নাদ স্ফুরিত হইলেও তাহা বাহিরে আসা ত দূরের কথা, যোগী ভিন্ন অন্যের উপলব্ধি হয় না। এই অবস্থার নাম 'মধ্যমা'। হৃৎপদ্ম ত্যাগ করিয়া তখন তাহারা ফুস্‌ফুস্ মধ্যে শ্বাসযন্ত্রে স্পন্দিত হয় এবং সেই অবস্থার নাম 'সংজল্পমাত্রা'। পরে যখন জিহ্বামূলে কণ্ঠ তালু দন্ত ওষ্ঠ প্রভৃতি স্থল হইতে শ্রবণগোচর হইয়া শব্দরূপে নির্গত হয়, তখন তাহাদের নাম 'বৈখরী'। কুণ্ডলিনী মধ্যে বর্ণাবলীর যে 'পরাবস্থা', ঊর্দ্ধে অকথাদি ত্রিরেখা মধ্যেও তাহাদের সেই পরাবস্থা। সুষুম্নার নিম্নস্তরে যিনি কুণ্ডলিনীরূপে বর্ণাবলী ধারণ করিয়াছেন, তিনিই ব্রহ্মরন্ধ্রে অকথাদি ত্রিরেখা রূপে অবস্থিত, এবং ঐ ত্রিরেখাই কুণ্ডলিনীর আদিম বা কারণ অবস্থা। কোন তন্ত্রমতে সুষুম্না নাড়ীর ঊর্দ্ধ ও অধঃ উভয় প্রান্তেই সহস্রদল পদ্ম অবস্থিত। ষট্‌চক্র বর্ণনা স্থলে ইহার আলোচনা যুক্তি-

সঙ্গত।”[১] বর্ণের স্থূলরূপ অতিক্রমের জন্যই এই সাধন ব্যাখ্যাত হয়। পরমেশ্বরের চিৎশক্তি ইচ্ছারূপে বহির্মুখী হয় ও বিন্দুতে আঘাত করে, সেই সংঘাত ফলে পঞ্চস্তর বা কলার উৎপত্তি হয় তাহারা যথাক্রমে নিবৃত্তি, প্রতিষ্ঠা, বিদ্যা, শান্তি ও শান্ত্যতীত কলা নামে পরিচিত। এই কলা-পঞ্চক সমগ্র জগতের উপাদান এবং এই সকল কলা ঐশীশক্তিতে নিত্য-প্রতিষ্ঠ বলিয়া শিব 'সকল'। রশ্মির বিকীরণই 'কলা', তাহা দ্বারা যাহা প্রকাশিত হয় তাহা 'তত্ত্ব'। বিভিন্ন মিলনে বিভিন্ন তত্ত্বের উৎপত্তি হয়। যথা—ঈশ্বর শব্দের প্রত্যেকটী অক্ষর কলা, তাহার মিলনই তত্ত্ব; সেইরূপ—

১। নিবৃত্তি কলা হইতে পৃথিবীতত্ত্ব।

২। প্রতিষ্ঠা কলা হইতে ২।৩ রকম মিলনে প্রকৃতি হইতে জলতত্ত্ব পর্য্যন্ত।

৩। বিদ্যা কলা হইতে ষট্ কঞ্চুক, মায়া, কলা, রাগ, অবিদ্যা, কাল, নিয়তি।

৪। শান্তি কলা হইতে শুদ্ধবিদ্যা, ঈশ্বর, সদাশিব ও শক্তি তত্ত্ব।

৫। শান্ত্যতীত কলা হইতে শিবতত্ত্ব স্বয়ং—ইহাই প্রথমতত্ত্ব বা বিন্দু।

এই ৩৬টী তত্ত্বের উদয় হয়, এবং তত্ত্ব হইতে ভুবন (sphere) সৃষ্টি হয়।

কলার সহিত বর্ণ আছে, বাক্যের সহিত অর্থ যেরূপ নিত্যমিলিত, ইহারাও তদ্রূপ। বাক্যের দিক 'বর্ণ', অর্থের দিক 'কলা'। কলা, তত্ত্ব ও ভুবনই অর্থের দিক; মন্ত্র, পদ, বর্ণ বাক্যের দিক। তত্ত্ব মন্ত্রবাচক, ভুবন পদবাচক, কলা বর্ণবাচক, ইহারাই 'ষড়ধ্বা' নামে খ্যাত। দীক্ষার সময়ে এই ষড়ধ্বা শুদ্ধ করিতে হয়, দীক্ষা দ্বারা অষ্টপাশমুক্তি ও শিবত্বের অভিব্যক্তিই লক্ষ্য। ইচ্ছাশক্তির সংঘাতের বিন্দুর স্পন্দনে মহামায়ার গর্ভে শান্ত্যতীত প্রভৃতি পঞ্চস্তরের উৎপত্তি হয় এবং বিন্দু ক্ষুব্ধ হইয়া শব্দ ও অর্থের যে ধারা প্রকাশিত হয় তাহাই 'ষড়ধ্বা'। শক্তির সক্রিয় অবস্থাতে বিন্দু বা কুণ্ডলিনীরূপা মহামায়া ক্ষুব্ধ হইয়া একদিকে কলা (শান্ত্যতীতা প্রভৃতি), তত্ত্ব (শিবাদি ক্ষিত্যন্ত) ও ভুবন (অনাশ্রিত হইতে কালাগ্নি রুদ্রের ভুবন পর্য্যন্ত), অপরদিকে বর্ণ, মন্ত্র ও নাদরূপ ষড়ধ্বা সৃষ্টি করেন।

১। মন্ত্রযোগ, পৃ ৯৩, ৯৪ অবধূত জ্ঞানানন্দ।

নাদসম্বন্ধিত বিন্দু হইতে মন্ত্র, বর্ণ ও পদের উৎপত্তি তন্ত্রের গূঢ়ার্থাত্মক মন্ত্র ও বর্ণসকল 'কৌলজ্ঞাননির্ণয়ে'ও বিশিষ্ট স্থান পাইয়াছে। মাতৃকাবর্ণ বা যে সকল অক্ষরের দ্বারা শব্দের উচ্চারণ বুঝা যায় তাহাও বর্ণিত হইয়াছে। নাদের উৎপত্তির কারণ তৃতীয় পটলে বর্ণিত হইয়াছে, স্থান অর্থে পিণ্ড অর্থাৎ চরম নাদ বা শব্দব্রহ্মের আধার, ইহাই তন্ত্রোক্ত মূলাধার, নাদ হইতে বর্ণ, পদ ও বাক্যের উৎপত্তি হয়। স্থান, ধ্যান, বর্ণ ও লক্ষ্য (৩।৩-৫) বা পিণ্ড, পদ, রূপ ও অরূপ যে সর্ব্বত্র বিরাজ করে তাহাও বিবৃত হইয়াছে। জগৎ নাদের উপর নির্ভর করে। নাদ দ্বিপ্রকার—আহত ও অনাহত, ইহার উৎপত্তি পিণ্ডে। পিণ্ডই শব্দব্রহ্মের উৎপত্তিস্থল রূপে মানবদেহে মূলাধারের নিম্নে স্থিত। অস্ফুট নাদ হইতে ক্রমশঃ যে স্ফুটতর নাদ, বর্ণ, পদ ও বাক্যের উৎপত্তি হয়, ব্যক্তিগত মন্ত্রোচ্চারণ বা জপ দ্বারাও ঐ একই প্রকার ব্যক্তিগত রহস্যময় শক্তির উন্মেষ হয়।

ব্যক্তিগত শক্তির উন্মেষের জন্য যে মন্ত্র উচ্চারিত হয়, তাহার বিকাশরীতি ও গীতের উৎপত্তিও একইরূপে হয় বলিয়া বর্ণিত হয়। সঙ্গীতরত্নাকরে "গীতং নাদাত্মকং—

নাদেন ব্যজতে বর্ণঃ পদং বর্ণাৎ পদাদ্বচঃ।
বচসো ব্যবহারোঽয়ং নাদাধীনমতো জগৎ ॥
আহতোঽনাহতশ্চেতি দ্বিধা নাদো নিগদ্যতে।
সোঽয়ং প্রকাশতে পিণ্ডে তস্মাৎ পিণ্ডোঽভিধীয়তে ॥"

গীতের উৎপত্তি বর্ণনাক্রমে পিণ্ড, পদ, বর্ণ আদি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। নাদব্রহ্মের চারিটী অবস্থাভেদ শ্রুতিতে আছে (যোগশিখোপনিষদ্ ৩।১-৫)। ব্রহ্মের ভেদ দ্বিবিধ, এক পরমব্রহ্ম বা 'অক্ষর' স্বরূপ, দ্বিতীয় 'শব্দব্রহ্ম'। "অক্ষরং পরমো নাদঃ শব্দব্রহ্মেতি কথ্যতে" আবার শব্দব্রহ্মই অক্ষর ব্রহ্মকে প্রাপ্তির উপায় স্বরূপ। কারণ মূলাধারে চিৎএর অনুরূপ শক্তি বা পরা শক্তি বিদ্যমান, তাহাই বিন্দুরূপে খ্যাত, তাহা হইতে নাদের উৎপত্তি হয়, ইহা বীজের অঙ্কুরের ন্যায়। যাহা দ্বারা যোগী বিশ্বকে দেখেন তাহা 'পশ্যন্তী' বা অনাহত। (পরা হইতে নাদরূপ অঙ্কুরের দ্বিদল পত্র পশ্যন্তীর উৎপত্তি।) হৃদয়ে এই শব্দ বজ্রবৎ ঘোষিত হয়, ইহাই 'মধ্যম' নামে খ্যাত। ইহাই পুনরায় 'বৈখরী' নামে অভিহিত হয় এবং প্রাণবায়ুর সহিত যুক্ত হইলে 'স্বর' নামে খ্যাত হয় অর্থাৎ উচ্চারিত শব্দরূপ ধারণ

করে। "পরব্রহ্মণঃ সকাশাত্তদনুকারস্যৈব শব্দব্রহ্মাখ্যস্য বেদস্য যথা বস্তুতঃ কোঽপি ভেদো নাস্তি তথা"... ...পরব্রহ্মে ও শব্দব্রহ্মে বস্তুতঃ কোন ভেদ নাই। "শব্দব্রহ্মাবগতিরেব শ্রুতিবিদ্যাদিপদবাচ্যা। পরন্তু তপসোঽনুষ্ঠানং বিনা ন কদাচিদেষা বিদ্যাবির্ভবতি"—শব্দব্রহ্ম-জ্ঞানই শ্রুতিবিদ্যা, তথাপি ইহা তপস্যার অনুষ্ঠান বিনা অধিগত হয় না। "তপোঽনুষ্ঠানমপি দেহবিশেষাদেব ভবতীতি।" সেই তপ-অনুষ্ঠানও বিশেষ বিশেষ দেহে হয়, অর্থাৎ মাত্র যোগীদের হয়।

ভর্তৃহরি আদি 'শব্দসংস্কারের' বিষয়ে বলিয়াছেন যে পুনঃপুনঃ স্বাধ্যায়ের দ্বারা প্রাণ ও অপানের সাম্য হয়। তৎপরে স্থূল বায়ুর সূক্ষ্মতা প্রাপ্তি হয় এবং সূক্ষ্মতর ব্রহ্মরন্ধ্রে উহার সঞ্চার হয়। তৎপরে মনও ভূতাদিব আসক্তি ত্যাগ করিয়া উহার অন্তরে প্রবেশ করে। ইন্দ্রিয়াধীন বহির্মুখ মন ব্রহ্মপথে প্রবেশ করিলে, উহা ইন্দ্রিয়াদি হইতে প্রত্যাহত হয়। স্বাধ্যায়কালে যে প্রযত্ন দ্বারা শব্দ উত্থিত হয় উহা অনাহত নাদময় শব্দে তাদাত্ম্য লাভ করে, যেমন বায়ুদ্বারা তরঙ্গ উত্থিত হয় ও বায়ু-উপশমে তাহা জলস্বরূপে লীন হইয়া যায় তদ্রূপ। অতঃপর সেই প্রবেশমান শব্দ বায়ু ও মনের ক্রম সংস্কারের মহিমা দ্বারা অত্যন্ত সংস্কৃত হইতে থাকে। ইহা সংজল্পরূপ 'মধ্যমা' বাগ্‌ভূমি। ইহার পবে বাক্‌এর সংস্কার হইলে অর্থেরও সহিত ভেদাভেদ দূর হয়। ইহাই 'পশ্যন্তী' বাক্ দেবরূপা ও আত্মশক্তির উল্লাসস্বরূপা হয়। বস্তুতঃ মন্ত্রই চিত্তস্বরূপ, তাহাদের ভেদ নাই, দিব্যজ্যোতিও একাগ্রচিত্তের ফলস্বরূপ। সেই নিমিত্তই মন্ত্র ও দেবতার অভেদ কল্পিত হয়। মন্ত্রদেবতার বিগ্রহও বর্ণন করা হয়, চিত্ত ও দেবতার অভেদ বিবরণের প্রথাও একার্থেই ব্যবহৃত হয়। বাক্ ও অর্থের নানাত্ব বহির্দৃষ্টিতেই সত্যরূপে প্রতীয়মান হয়। নাদানুসন্ধানকালে উহার আভাস স্পষ্ট হয়। নাদ পরপ্রকাশে বিলীন হইলে ক্রমও বিলীন হয় অর্থাৎ বাচ্য ও অর্থের ভেদ দূর হয়। জ্ঞানাকাশে সব বিকল্প লীন হয়। সে আনন্দ অবর্ণনীয়, মূককে রসের আস্বাদন জিজ্ঞাসার ন্যায়।[১]

এক বিরাট শুদ্ধজগৎ সৃষ্টি হইল, তাহাতে বিন্দুর কম্পনে নাদের উৎপত্তি হইল এবং বিজ্ঞানাকল জীবেরা বাহির হইতে লাগিলেন। পক্কমল জীবেরা বৈন্দব দেহ লাভ করিল, ইহাই নাথদের সিদ্ধদেহ বা দীক্ষাফলে গঠিত দেহ। তখন জীবের শিবত্ব হইল, জীব কার্যেশ্বর

১। বেদানাং বাস্তবিকং স্বরূপম্, ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ, পৃঃ ৫, ৬, ৮।

হইলেন। এইরূপে অষ্টজন মন্ত্রেশ্বর হইলেন ও অন্যেরা মন্ত্র পদ লাভ করিলেন।

পরবিন্দু হইতে তিনটি প্রসর হয়, যথা –

১।	নাদ—অস্ফুট অবস্থা বা পরনাদ	অচিৎকলা
২।	বিন্দু—সূক্ষ্মরূপ, ইহাই কার্য্যবিন্দু বা অক্ষর বিন্দু	
৩।	বর্ণ—স্থূলরূপ	

নাদ, বিন্দু, বর্ণ অচিৎকলা, শক্তিই চিৎকলা।

জ্ঞান শক্তির বিকাশে মূল 'পরবিন্দু' ত্রিধা বিভক্ত হয় ও তাহা হইতে সৃষ্টিরূপিণী নাদ, বিন্দু, বর্ণ নির্গত হয়। সৃষ্টিক্রমে যে সকল তত্ত্ব প্রাদুর্ভূত হয়, তাহারা প্রধানা প্রকৃতির অংশ বলিয়া 'কলা' নামে অভিহিত হয়। শক্তিযুক্ত শিবই সৃষ্টির আদিকারণ, তিনিই 'সৎ', সর্ব্ব-চৈতন্যের আধার বলিয়া 'চিৎ' এবং ইচ্ছাশক্তি তাঁহার কলা বা অংশ বলিয়া তিনি 'সকল' পরমেশ্বর। তাহা হইতে প্রথমে শক্তির আবির্ভাব হয়, শক্তি হইতে নাদ, নাদ হইতে বিন্দুর উৎপত্তি হয়—

সচ্চিদানন্দবিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ"।
আসীচ্ছক্তিস্ততো নাদো নাদাদ্বিন্দুসমুদ্ভবঃ॥ [১]।

তথাপি মায়া ব্যতিরেকে সৃষ্টি সম্ভবে না, তাই ইচ্ছাশক্তি মূল কারণ হইলেও মায়া নাদ প্রভৃতি সহকারী কারণ। শক্তি ইচ্ছারূপিণী। সেই ইচ্ছা কি? মহাপ্রলয়ে যে সৃষ্টি ব্রহ্মপ্রকৃতিতে বিলীন হইয়াছিল, তাহার পুনর্ব্বিকাশের ইচ্ছাই শক্তির 'ইচ্ছা' নামে খ্যাত। ইচ্ছাশক্তির ফলে বিন্দু বিক্ষুব্ধ হইলে যে জ্যোতি বা নাদের উৎপত্তি হয় সেই তেজ ও ধ্বনি মূলতঃ একই বস্তু, উভয়েই একত্রে বিদ্যমান থাকে। শক্তি স্বীয় নাদাত্মক জ্যোতিতে শূন্য ব্যাপ্ত করিলেন, সেই নাদই তাঁহার জ্যোতি এবং জ্যোতিই তাঁহার নাদ। ইচ্ছার ফলে যে ক্রিয়ার অভিব্যক্তি হয় তাহা ঐ 'নাদ'। ইচ্ছাশক্তির প্রথম অবস্থা 'অব্যক্ত', দ্বিতীয় অবস্থায় 'ব্যক্ত' নাদের উৎপত্তি। চিৎশক্তির মায়াকল্পিত ব্যাপ্তিই নাদ বা জ্যোতি এবং সেই নাদ সৃষ্টির বিস্তারের জন্য যখন শক্তির আকর্ষণে কেন্দ্রাভিমুখে আকৃষ্ট হইয়া বিন্দুত্ব প্রাপ্ত হইল, তখন তাহাই ঘনীভূত বিন্দু অবস্থা। নাদ ও বিন্দু বস্তুতঃ একই পদার্থ, ব্যাপ্তি অবস্থায় যাহা 'নাদ', ঘনীভূত অবস্থায় তাহাই

১। শারদাতিলক—১।৭

'বিন্দু'। নাদে জ্যোতি না থাকিলে, বিন্দুও জ্যোতির্ম্ময় হইত না। পরমেশ্বরের প্রথম বিকাশ নাদ ও বিন্দুতে, সেই নিমিত্ত সাধকের পরমপদ সাক্ষাৎকালে শুদ্ধ জ্যোতি ও নাদধ্বনির উপলব্ধি হয়। শক্তির উদয় হইয়াছে অথচ নাদের আবির্ভাব হয় নাই, তন্ত্রমতে সেই অবস্থাই ইচ্ছাশক্তির নির্ব্বাণকলা, আর-নাদরূপে প্রথম অভিব্যক্তি 'অমাকলা'। তবে যোগমার্গে দর্শনভেদ বশতঃ মতভেদ লক্ষিত হয়।

পরবিন্দু হইতে নাদ, বিন্দু ও বর্ণ রূপ অব্যক্ত, সূক্ষ্ম ও স্থূলরূপের বর্ণনা করা হইয়াছে। শিবের বস্তুতঃ কোন ভেদ নাই, তথাপি শক্তির ভেদ তাঁহাতে আরোপিত হয় বলিয়া শিবের তিনটী অবসর আছে বলা হয় ('অবস্থা' শব্দ শিবের সম্পর্কে ব্যবহৃত হয় না, নাদের সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়,) এই তিনটী অবসর যথাক্রমে—

শিব—লয় অবসর
সদাশিব—স্থিতি বা ভোগ অবসর
ঈশ্বর—সৃষ্টি বা ভোগ্য অবসর

এই তিনটী অবসর যথাক্রমে অব্যক্ত, বিকাশোন্মুখ ও ব্যক্ত ভাব। ঈশ্বর যখন মায়ার উপর দৃষ্টিপাত করেন তখন জগতের সৃষ্টি হয়। সিদ্ধ-সিদ্ধান্তপদ্ধতিতেও ব্রহ্মা দৃষ্টি দ্বারা প্রকৃতিপিণ্ড সৃষ্টি করিলেন এইরূপ বর্ণনা আছে (নিবন্ধের পিণ্ড উৎপত্তি বিচার অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

শক্তির ত্রিরূপ—ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া ; ইহারাও যথাক্রমে অব্যক্ত, বিকাশোন্মুখ ও ব্যক্ত ভাব। চিৎস্বরূপা অখণ্ডরূপিণী ব্যাপিনী (ষট্‌চক্র বিবরণে আদিনাদকে ব্যাপিকাশক্তি বা কলা বা আজ্ঞী বলা হয়, কোথাও চন্দ্রের অমানাম্নী ষোড়শী কলা বলা হয়। আর যাহা অব্যাকৃতা ইচ্ছাশক্তি অর্থাৎ যাহা নাদরূপে ব্যক্ত হইবার পূর্ব্বাবস্থা, তাহা সপ্তদশী কলা বা 'সমনী', সমনীর ঊর্দ্ধে শূন্যগামী 'উন্মনী' বলা হয়। সপ্তদশী কলাকেও উন্মনী বলা হয় (মন্ত্রযোগ, পৃ ৭৯।।—নির্গুণ শিবতত্ত্বে সংযুক্তা সেই পরাশক্তি সৃষ্টি নির্ম্মাণের ইচ্ছাহেতু বিন্দুরূপ ধারণ করিলেন। ইচ্ছাশক্তির প্রথম উদিত অবস্থায় তিনি অব্যক্তরূপিণী, ইচ্ছাশক্তিসম্ভূত ঐ অব্যক্ত আদিনাদ যখন বিন্দুরূপ ধারণ করিলেন, তখন ইচ্ছাশক্তি ক্রিয়াশক্তিতে পরিণত হইলেন, সেইজন্য বিন্দুতে প্রধানতঃ ক্রিয়াশক্তি লক্ষিত হয়—'বিন্দুভাবঞ্চ ক্রিয়াপ্রাধান্যলক্ষণম্', কারণ বিন্দু হইতেই সৃষ্টির ক্রিয়া নির্গত হইতে লাগিল।

পরবিন্দু হইবামাত্র উহা কি বিশিষ্ট তাহা জানিবার জন্য যে ইচ্ছা বা অনুসন্ধান প্রবৃত্তি, তাহা জ্ঞানশক্তির প্রথমাঙ্কুর, ঐ ইচ্ছার সঙ্গেই বিন্দুটী ফাটিয়া গিয়া বিন্দু, নাদ ও বীজ এই তিন তত্ত্ব নির্গত হইলেন।[১]

জগতের লয় অবস্থা কৌলজ্ঞানের দ্বিতীয় পটলে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

শিবমধ্যে গতা শক্তিঃ ক্রিয়ামধ্যে স্থিতঃ শিবঃ।
জ্ঞানমধ্যে ক্রিয়া লীনা ক্রিয়া লীয়তে ইচ্ছয়া ॥৬।
ইচ্ছাশক্তির্লয়ং যাতি যত্র তেজঃ পরঃ শিবঃ। (২।৬, ৭)

অর্থাৎ শক্তি শিবের মধ্যে বিলীন হন, শিব ক্রিয়ামধ্যে বিলীন হন, ক্রিয়া জ্ঞানমধ্যে ইচ্ছার সাহায্যে বিলীন হন, ইচ্ছাশক্তিও শিবে বিলীন হন, ইহাই শিবের অন্তিম পরিণতি বা 'পরঃ শিবঃ' অবস্থা, এমতাবস্থায় জগৎ লয়প্রাপ্ত হয় ও সৃষ্টি নিরুদ্ধ হয়। এস্থলে শক্তির ত্রিরূপ অর্থাৎ ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কৌলজ্ঞানের (১৬।২৫, ২০।১৩) "ইচ্ছাত্বং জ্ঞানশক্তিশ্চ ক্রিয়াখ্যা চৈব ভাসিনি"—দেবী উবাচ—"জ্ঞানশক্তির্ময়া জ্ঞাতা ক্রিয়াশক্তির্বদ প্রভো" ইত্যাদিতেও শক্তির ত্রিরূপ বর্ণন আছে। স্বপ্রকাশ হইবার ইচ্ছাই 'ইচ্ছা' অভিধেয়, জ্ঞান এই প্রকাশের অনুভূতি এবং শক্তির যে স্বরূপ দ্বারা সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হয় তাহাই 'ক্রিয়া'। জ্ঞানই দ্বৈতাবস্থা, এই অবস্থায় জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় উভয়ই থাকে। শক্তির এই ত্রিরূপ যখন পুনর্ব্বার শিবে লীন হয়, তখন শিবশক্তির মিলন হয় এবং পরম বিশুদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাই 'মুক্তি'। এই নিমিত্ত বলা হয়, শক্তির অধোগতিতে সংসার, ঊর্দ্ধগতিতে মুক্তি, শক্তির বহিঃ-প্রকাশের উদ্যমে সৃষ্টি, অন্তর্মুখে লীন হওয়াই লয়। শিবের চিৎ ও আনন্দ স্বরূপের ন্যায় শক্তিরও ঐ দুই রূপ স্বীকৃত হয়, তাহা শক্তির সচ্চিদানন্দের সহিত অবিনাভাবী রূপ। কৌলজ্ঞানে (১৭।৮, ৯) শিব ও শক্তিতে অগ্নি ও তাহার ধূমের ন্যায়, বৃক্ষ ও তাহার ছায়ার ন্যায় অভিন্ন বলা হইয়াছে, "ন শিবেন বিনা শক্তির্ন শক্তিরহিতঃ শিবঃ।"[২]

শক্তিতত্ত্বের সহিত বিন্দু, নাদ, কামকলা শব্দাদি জড়িত হয়। কৌলজ্ঞানের বহুস্থানে ইহাদের উল্লেখ আছে। শিব বা মহালিঙ্গের শক্তিকে 'বিন্দু' বলে। ইহাই উৎপত্তি ও লয়ের কারণ—"অক্ষোভ্য সর্ব্বশক্তীনাম্ আত্মশক্ত্যানুরঞ্জিতঃ" (২০।২০, ২১) অর্থাৎ ইহা কোন

১। মন্ত্রযোগ, অবধূত জ্ঞানানন্দ, পৃ ৭৫-৭৭ ২। কৌলজ্ঞাননির্ণয়, ডাঃ বাগচী পৃ ৪১-৪৩

শক্তি দ্বারা অবিচলিত এবং একমাত্র আত্মশক্তি দ্বারাই ভেদ্য। বিন্দু ও নাদই শক্তি (৫।৩১, ৪।৮), আবার বিন্দুই অমৃত (৬।২৩) ; ইহা জরা ও বার্দ্ধক্য দূর করে, ইহার জ্যোতিতে সকল বস্তু বিশুদ্ধ হয় ও ইহা কামকলাযুক্ত বলিয়া অমরত্ব প্রদান করে (৭।৩১, ৩২)। ইহাই সহজাবস্থার চরম পরিণতি। ইহা নির্ম্মল মণির ন্যায়, মুক্তাফলের ন্যায়, খদ্যোতের ন্যায়, আকাশের তারকারাজির ন্যায় উজ্জ্বল, ইহা 'সিতরক্তঞ্চ কৃষ্ণঞ্চ ধূম্রপীতঞ্চ রূপকম্'—ইহা 'সৃষ্টিসংহারকারকম্' ও কুলাকুলের উর্দ্ধে (১৪।৯৬, ৯৭)।

পরশিব ও পরাশক্তির মিলনে যে জগৎসৃষ্টির ইচ্ছা হয় তাহাকেই বিন্দুরূপে ব্যাখ্যা করা হয়। বিন্দু হইতে আদিশব্দ বা নাদের উৎপত্তি, ইহা হইতেই সৃষ্টির আরম্ভ হইয়াছে। কামকলাবিলাসে ইহাকেই 'মহাবিন্দু' বলা হইয়াছে, পরশিবের স্বতঃক্রিয়াশীল বিমর্শদর্পণে তাহার অসংখ্য জ্যোতি প্রতিফলিত হইলে মহাবিন্দু চিত্তে প্রবেশ করে, তৎফলে পরশিবের অহঙ্কারের উদয় হয়, এবং বিন্দুই সেই অহঙ্কারের আত্মস্বরূপ গণ্য হয়।

কামকলাবিলাসে—

> পরশিবরবিকরনিকরে প্রতিফলিতবিমর্শদর্পণে।
> প্রতিরুচিরুচিরে'কুড্যে চিত্তময়ে নিবিশতে মহাবিন্দুঃ ॥৮
> বিন্দুরহঙ্কারাত্মা রবিরেতন্মিথুনসমরসাকারঃ।
> কামঃ কমনীয়তয়া কলা চ দহনেন্দুবিগ্রহৌ বিন্দুঃ ॥৯

ভাষ্য—প্রকাশরূপপরমেশ্বরস্য দর্পণবৎ স্বরূপবিমর্শসংবন্ধে জাতে তদানীং তত্র মহাবিন্দুঃ 'পূর্ণোঽহম্' ইত্যেবং রূপঃ পরমেশ্বরোঽবভাসতে ॥

কাম ইতি কাম্যতে অভিলষ্যতে স্বাত্মতেন পরমার্থমহদ্ভির্যোগিভিরিতি কামং, তন্ত্রহেতুঃ কমনীয়তয়া ইতি, কমনীয়ত্বম্ স্পৃহণীয়ত্বম্ তেন কলা বিমর্শশক্তিঃ মহাত্রিপুরাসুন্দরী বিন্দুসমষ্টিরূপা কামকলা ইতি উচ্যতে।[১]

পরশিবের বিন্দুর স্বতঃস্পন্দন শক্তিই 'কলা' এবং ইহার মোহিনী শক্তি থাকায় উহার নাম 'কামকলা' হইয়াছে। বিন্দুতে মাতা, মানস ও মেয়ম্ এই তিনের সমষ্টি আছে অর্থাৎ জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞ এই তিনের অঙ্কুর আছে। কামকলা এই তিন বিন্দুর সমষ্টি বলিয়া উহাকে 'ত্রিপুরাসুন্দরী'ও বলা হয়।

১। কৌলজ্ঞাননির্ণয়, বাগচী, পৃ ৭৪-৭৬ ; পুণ্যানন্দের কামকলাবিলাস ৮ ও ৯ শ্লোক।

সৃষ্টির আদিতে অনাদিকাল হইতে যে পূর্ণ নিরাকার ও শূন্য স্বরূপ বস্তু বিরাজমান আছে, তাহাই শৈবের 'পরমশিব', শাক্তের 'মহাশক্তি'। তিনি বর্ণনাতীত, কারণ তত্ত্বাতীত। ইহাতে স্বয়ং-প্রকাশ ভাব নাই। এই তত্ত্বাতীত অনুত্তর অবস্থাকে শাস্ত্রে বাচকরূপে আদিবর্ণ 'অ' বলা হয়, ইহার পর প্রকাশ ও বিমর্শের সাম্যরূপ অবস্থা, অর্থাৎ 'অ'কাররূপ প্রকাশের সঙ্গে 'ই'কাররূপ বিমর্শ বা অগ্নি ও সোমের সাম্যভাবই 'কাম' বা 'রবি' নামে প্রসিদ্ধ। শিবই 'অ', শক্তি 'হ' বিন্দুরূপে উহা অহং বা পূর্ণহন্তা হয়। এই স্পন্দনকার্য্য দ্বারা যাহা অভিব্যক্ত হয়, তাহাকেই 'চৈতন্য' নামে বর্ণনা করা হয়। ইহার অপর নাম 'চিৎকলা'। অগ্নিস্পর্শে ঘৃতধারা যেরূপ দ্রুত বহে, প্রকাশাত্মক শিবের সম্পর্কে বিমর্শরূপ পরাশক্তি সেইরূপ দ্রুত হয় এবং এক অমৃত-ধারার স্রাব হয়। ইহা শিবশক্তির আপেক্ষিক বৈষম্য হইতে উৎপন্ন। শুদ্ধপ্রকাশ বা শুদ্ধবিমর্শ বিন্দু পদবাচ্য নহে। নিখিল প্রপঞ্চবিলীন হইয়া যে বিমর্শশক্তি থাকে তাহারই সংসর্গে অনুত্তর অক্ষরস্বরূপ 'বিন্দু' বা প্রকাশবিন্দু রূপ ধারণ করেন। ইহার পর বিমর্শশক্তি প্রকাশ-বিন্দুতে অনুপ্রবিষ্ট হইলে উহা হইতে তেজোময় বীজস্বরূপ 'নাদ' নির্গত হয়। এই নাদ মধ্যে সমস্ত তত্ত্ব সূক্ষ্মরূপে নিহিত থাকে। নাদ নির্গত হইয়া ত্রিকোণাকার রূপ ধারণ করে, ইহাই বিন্দুনাদাত্মক 'অহং' নামক প্রকাশ-বিমর্শের শরীর। প্রকাশ-বিমর্শের পারস্পরিক সাম্যই 'পরমাত্মা' ইহাই রবি বা কাম। এই কামের কলা অগ্নি ও সোম। অতএব কামকলা বলিলে এই ত্রিবিন্দু বুঝায়। এই ত্রিবিন্দুর সমষ্টিভূতা মহাত্রিকোণই আদ্যাশক্তির নিজরূপ। ইহার মধ্যে রবিবিন্দু দেবীর মুখ, অগ্নি ও সোমবিন্দু স্তনদ্বয় ও 'হ'কারের অর্দ্ধকলা যোনিরূপে কল্পিত হয়। শিবশক্তির মিলনে অমৃতধারা প্রবাহিত হইলে উহাতে যে লীলারূপ তরঙ্গের উৎপত্তি হয়, তান্ত্রিক পরিভাষায় তাহাই 'হার্দ্ধকলা' নামে খ্যাত।

যে ত্রিকোণ সম্বন্ধে 'কামকলা' বর্ণন করা হইতেছে, তাহা পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী এই ত্রিবিধ শব্দের পরস্পর সংশ্লেষাত্মক সম্মিলিত রূপ। ইহার কেন্দ্রস্থিত বিন্দু যাহার স্বরূপ 'অহং' রূপে বর্ণিত হইয়াছে, উহা পরমাতৃকার বিলাসক্ষেত্র সদাশিব তত্ত্বের স্বরূপ। মধ্যবিন্দু তথা মূল ত্রিকোণ হইতে সমস্ত তত্ত্ব ও পদার্থ জাত হয়।

মহাবিন্দু অনন্ত কলার সমষ্টি হইলেও তত্তদ্ ব্রহ্মাণ্ডের অভিব্যক্ত উপাদানের মাত্রানুসারে নির্দ্দিষ্ট কলাদ্বারা গঠিত হইয়া অব্যক্তের গর্ভ হইতে অহং রূপে আবির্ভূত হয়। এই 'অহং'রূপই অব্যক্ত সত্তার আত্মপ্রকাশ। কলার নিরন্তর ও ক্রমিক পূর্ণতায় যেরূপ বিন্দুরূপ পূর্ণকলা বা অহং তত্ত্বের বিকাশ, তদ্রূপ উহার নিরন্তর ও ক্রমিক ক্ষয়ে শূন্যস্বরূপ অহংভাববর্জ্জিত আত্মভাবের আবির্ভাব হয়। এই উভয়েই পূর্ণকলার এককলা সাক্ষিরূপে প্রপঞ্চের লয়ের পরও জাগ্রত থাকে। জীবের 'উন্মনী' অবস্থায় ইহাই 'নির্ব্বাণকলা' রূপে অবস্থিত থাকে। ইহারও নিবৃত্তি হইতে যে নিষ্কল অবস্থার বিকাশ হয়, তাহাই শিবশক্তি তত্ত্ব বা 'মহাবিন্দু'। সংসারী জীব পঞ্চদশ কলাত্মক, মুক্ত জীব ষোড়শ বা নির্ব্বাণ কলাত্মক।[১]

ত্রিবিন্দু, ত্রিরেখা ও নাদ লইয়াই কামকলার ধ্যান। এই কামকলাতেই জগদ্রূপ অণ্ড অবস্থিত। শ্রুতিতেও আছে 'অগ্রে শক্তিরূপিণী দেবী একা ছিলেন, তিনি এই জগদ্রূপ অণ্ড সৃজন করিয়াছেন, তাঁহাকে কামকলা বলা হয়। তাঁহা হইতে ব্রহ্মাদি ও স্থাবর-জঙ্গম সমস্তই উৎপন্ন হইয়াছে' (বহ্বৃচ উপনিষদ)।

কামকলার ধ্যান (কামিনীতত্ত্বের ধ্যান) বীরযোগীদের জন্যই বিহিত হইয়াছে। সাধক নিজদেহের সহিত ঐ কামকলা রূপ কামিনীদেহ একীভূত চিন্তা করিবেন। ইহাই বীরযোগ, ইহা দ্বারা যে পুং ও স্ত্রীত্ব একরস হইয়া যায়, তাহারই নাম 'সামরস্য'। সামরস্য না হওয়া পর্য্যন্ত নাদের উপলব্ধি হয় না, অর্থাৎ কুণ্ডলিনী প্রবুদ্ধ হন না। উর্দ্ধশক্তি ও অধঃশক্তিরূপে পুরুষ ও প্রকৃতি, নাদ ও বিন্দুরূপে ভিন্ন হইয়াছিলেন, তাহা হইতেই ক্ষোভজনিত 'কাম' থাকাতে 'সামরস্য' হইতে পারে না। সাধক কামকলা ধ্যানে নিরত থাকিলে কামজনিত ক্ষোভ হইতে পারে না, এবং সামরস্য সাধন সহজ হয়। এই উদ্দেশ্যেই আগমে কামকলারূপ কামিনীচিন্তার উপদেশ আছে, কিন্তু 'সঙ্গমেব হি কর্ত্তব্যং কর্ত্তব্যং ন তু মৈথুনম্' ইহা স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে। কামিনীদেহ কামকলার প্রত্যক্ষ অধিষ্ঠান, কামিনী কুণ্ডলিনীর স্থূল শরীর, সেই শরীর নাদময়, এই ধারণা দৃঢ় করিবার নিমিত্ত সম্মুখে কামিনী রাখিবার ব্যবস্থা। তন্ত্রে কুমারীপূজার ব্যবস্থা আছে, কারণ অপ্রস্ফুটযৌবনা নারীদেহ দর্শনে কামোদ্রেক হয় না। ইহাতে ভোগের ইঙ্গিত নাই।

১। শক্তিসাধনা, ম. ম. গোপীনাথ কবিরাজ, কল্যাণ শক্তি অঙ্ক পৃ ৫৯, ৬০।

সাধক স্বদেহে যে কুণ্ডলিনী শক্তিরূপ বিন্দু আছে, সাধনা দ্বারা তাহাকে ক্ষুব্ধ করিয়া বৈন্দবদেহ লাভে সমর্থ হন, ইহাই মায়িকজগতের বা অশুদ্ধজগতের জীবোদ্ধার। বৈন্দবদেহ মায়িকদেহের সহিত অবিচ্ছিন্ন-ভাবে যুক্ত থাকে বলিয়া তাহার কোন বহিঃপ্রকাশ থাকে না। এইরূপ দেহধারী গুরুই মায়িক রাজ্যের 'ঈশ্বর' বা 'সদ্‌গুরু' পদবাচ্য, অন্য গুরুরা শাস্ত্রপাঠজ্ঞ গুরু মাত্র। সদ্‌গুরু যে মহাজ্ঞান লাভ করেন তাহা দ্বারাই বিন্দু হইতে বীজ উৎপন্ন হয়, এই বীজ পরিপক্ক হইলে সদ্‌গুরু শিষ্যকে বীজমন্ত্র দানের উপযুক্ত হন। বহু সাধকের নামজপাদি দ্বারাও এইরূপ পথ উন্মুক্ত হয়, কিন্তু জ্ঞান, কর্ম্ম প্রভৃতি বিভিন্ন 'উপায়' দ্বারা ভগবৎকৃপা লাভ হয় না। ভগবান দীনহীন অকিঞ্চনের প্রতিই অহেতুক কৃপা করেন, মাতা যেরূপ অসহায় শিশুরই সহায়তা করেন, স্বাবলম্বীর সহায়তা করেন না।

শিবের পঞ্চবক্ত্র হইতে যাহা নির্গত হয় তাহাই তন্ত্র বা আগম। সেই আগমের শাসন 'প্রথমং কামিনীং ধ্যাত্বা জপপূজাং সমাচরেৎ'। কামকলার ধ্যান (ইহাই কামিনীতত্ত্ব) না জানিলে বা না বুঝিলে তন্ত্রোক্ত পূজা ও জপ নিষ্ফল। ইষ্টদেবতা বা ইষ্টমন্ত্র অপেক্ষাও এই কামকলার ধ্যান ও জ্ঞান আগমোক্ত সাধনমার্গে একান্ত প্রয়োজনীয়। নাদবিন্দু বীজ ঘটিত রেখাত্রয় লইয়াই তন্ত্রের কামকলা ধ্যান। শিব নির্গুণ, আদিবিন্দুতে শিব ও শক্তি তত্ত্ব অভিন্নরূপে বর্ত্তমান ছিল, তাহাই দ্বিধাবিভক্ত হইয়া অপরবিন্দু ও বীজে পরিণত হইল, এবং তাহাদের সম্মিলনঘটিত বা উভয়াত্মক 'নাদের' উৎপত্তি হইল। বীজ শক্তিতত্ত্বপ্রধানা, বিন্দু শিবতত্ত্বপ্রধান, বীজই অকথাদি ত্রিরেখা ঘটিত সমগ্র 'বর্ণাবলী'র সমন্বয়। তন্ত্রোক্ত রহস্যপূজার নিমিত্ত অকথাদির জ্ঞান আবশ্যক। 'নাদ' মধ্যে অকারাদি ক্ষকারান্ত সমগ্র বর্ণাবলীর অব্যক্ত ধ্বনি বর্ত্তমান। বীজ-মন্ত্রের রহস্য জানিতে হইলে কামকলার দর্শন জানা আবশ্যক। তাহা এইরূপ :—

অ=যখন 'চিৎ'শক্তি একা বিরাজ করেন ইহাই অনুত্তর বা transcendent অবস্থা, ইহার রৌদ্রী, জ্যেষ্ঠা ও বামা শক্তিত্রয় ত্রিকোণ আকার।

আ=এক হইতে দ্বৈতরূপ ধারণ, দর্পণে স্বীয় প্রতিবিম্ব দেখার ন্যায়, ইহাই যুগলরূপ যুগনদ্ধরূপ বা আনন্দভাব, ইহাও ত্রিকোণ আকার।

ই = 'ইচ্ছা'র বিকাশ অর্থাৎ অন্তর্মুখী চিৎশক্তির বহির্মুখী অবস্থা, আনন্দের ভাব হইতে সৃষ্টির যে ইচ্ছা, চিৎশক্তির ইহাই প্রকাশরূপ। কিন্তু খৃষ্টানদের Divine Father যেমন Divine Sonএ প্রকাশিত হইবার জন্য Divine Motherএর অস্তিত্ব অনিবার্য্য ছিল, সেইরূপ 'অ' হইতে 'ই'তে পৌঁছাইতে হইলে 'আ'র প্রয়োজন, ইহাই তান্ত্রিকের 'মহাশক্তি' ও নববৌদ্ধধর্ম্মের 'প্রজ্ঞাপারমিতা'।

ঈ = ইহা মাত্রামাত্র, 'ই' দীর্ঘ হইয়া 'ঈ' হয়, ইহা ঈশিত্ব বা ঐশ্বর্য্যভাব।

উ = উন্মেষ অর্থাৎ 'জ্ঞান' শক্তির উন্মেষ, ইহা নিরাকার অবস্থা, যথা—জল।

ঊ = ঊনতা বা সাকারভাব, জ্ঞানের ঘনীভূত অবস্থা, যথা, জল হইতে বরফের উদ্ভব, কিন্তু জলের মধ্যেই তাহার অবস্থান বা মৃত্তিকা হইতে ঘটাদিরূপ ধারণ।

এ-ঔ = ইহারা চারিটী ক্রিয়াশক্তির বিভিন্ন স্তর বা বিকাশ, যথা, ঘনীভূত জলকে বিভিন্ন আধারে স্থাপন ইত্যাদি।

শিবের পঞ্চবক্ত্রই যথাক্রমে অ, আ, ই, উ, এ-ঔ; ইহারাও যথাক্রমে চিৎশক্তি, আনন্দশক্তি, ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি।[১]

নাথসম্প্রদায়ের সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতিতে এই 'ঊ' ভাবের অভিব্যক্তি ব্যাখ্যাত হইয়াছে, ইহাকে 'স্বপ্রসারচাতুর্য্য' বলা হইয়াছে।[২] অধঃশক্তির আকুঞ্চনে অর্থাৎ বাহ্য ইন্দ্রিয়ব্যাপার বন্ধ করিয়া (মূলাধার বন্ধন দ্বারা), মধ্যশক্তির প্রবোধ দ্বারা (যে শক্তি জীবকে নানা তরঙ্গের মধ্যেও স্বস্বরূপে ধরিয়া রাখে, তাহাই মধ্যশক্তি) ঊর্দ্ধশক্তি নিপাতনে পরমপদ লাভ হয় (সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতি ৪।১৬ ও অমরৌঘশাসন)।[৩] এই মধ্য-শক্তিই কুণ্ডলিনীশক্তি, ইহা স্থূল সূক্ষ্ম ভেদে দ্বিবিধ, স্থূলরূপে নিখিল বিগ্রহের আধার, সেইরূপে কুণ্ডলিনী সাকারা, তাহারই 'স্বপ্রসারচাতুর্য্য' আছে—ইহাই উপর্য্যুক্ত তন্ত্রের বর্ণনার 'ঊ'কার। কুণ্ডলিনীর সূক্ষ্মরূপ নিরাকারা, মহাসিদ্ধেরা ইহাকে প্রবুদ্ধ করেন, তাই ইহা তাঁহাদের মতে প্রসিদ্ধা।[৪]

অ—ঊ পর্য্যন্ত মহামায়ার স্তর, শিব রূপহীন, শক্তি বহুরূপে

১। সর্ব্বোল্লাসতন্ত্রম্, প্রস্তাবনা, পৃ ৷৹

২। সি, সি, প, ৪।২৫

৩। অমরৌঘশাসনম্, গোরক্ষনাথ বিরচিত ১।১

৪। সি. সি. প ৪।১৬-২২

রূপান্বিত, তথাপি শিব বা শক্তি একাকী সৃজন করিতে অক্ষম। চিৎমাত্র হইতে সৃষ্টির উৎপত্তি সম্ভবে না, চিৎএর সহিত ইচ্ছার মিলনই বৌদ্ধশূন্যের সহিত বিজ্ঞানের মিলন। এই মিলনে 'মহাসুখ' অ+ই=এ; ইহাই বৌদ্ধদিগের এবম্‌কার। ব্রাহ্মীলিপিতে এ △ ছিল, তন্ত্রেও ত্রিকোণ ও ষট্‌কোণের দ্বারা শিবশক্তির মিলন সূচিত হয়। তন্মধ্যস্থ বিন্দুই 'মহাসুখে'র নিদর্শন। দেবেন্দ্র পরিপৃচ্ছতন্ত্রে—

একারস্তু ভবেন্মাতা বকারস্তু পিতা স্মৃতঃ।
বিন্দুস্তত্র ভবেদ্ যোগঃ স যোগঃ পরমাক্ষরঃ॥
একারস্তু ভবেৎ প্রজ্ঞা বকারঃ সুরতাধিপঃ।
বিন্দুশ্চানাহতং জ্ঞানং তজ্জন্যান্যক্ষরাণি চ॥[১]

কাহ্নপাদের দোঁহায় 'এবম্‌কার দিঢ় বোখোড় মোড়িউ' ইত্যাদি দ্বারা চন্দ্রসূর্য্য বা রাত্রিদিন বা কালকে ইঙ্গিত করিতেছে। যোগধর্ম্মে চন্দ্রই 'প্রকৃতি', ও সূর্য্য 'পুরুষ'। হিন্দু তন্ত্রেও অ+ই=এ ত্রিকোণ আকারে কল্পিত হয়। ষট্‌কোণ অর্থে অ বা আ-র সহিত এ-র যোগ=ঐ, ইহাই তন্ত্রের ষড়র নামে খ্যাত। বৌদ্ধদের 'এবম্‌' ও তন্ত্রের 'ঐ' অভিন্ন।

অতএব দেখা যাইতেছে নির্গুণ ব্রহ্ম ও প্রকৃতির মধ্যে প্রতিবিম্ব উদিত হয়। নির্গুণ শিবতত্ত্বে প্রকৃতির প্রতিবিম্ব ও প্রকৃতিতে শিবের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়। এই প্রতিবিম্বকে কেহ শক্তি, কেহ শিব, কেহ নারায়ণ আখ্যা দেন। উভয়ের প্রতিবিম্ব একীভূত হইয়া পরাপ্রাসাদবিদ্যা হয়, ইহাই অর্দ্ধনারীশ্বর রূপ। (আগমে হকার, সকার, ঔকার, বিন্দু ও বিসর্গ সংযোগে পরাপ্রাসাদ মন্ত্র উদ্ধৃত হয়। কুলার্ণব সকারকে হকারের আদিতে বলিয়াছেন। হকার শূন্য আকাশের বীজ বা নির্গুণ শিবের বীজ, সকার শক্তিবীজ, চতুর্দ্দশস্বর ঊকার 'আজ্ঞা' বা আত্মাকর্ষিণী শক্তি, ইহার পৌরাণিক নাম 'সঙ্কর্ষণ'। বিন্দুমূল ক্রিয়াশক্তি, বৈষ্ণব দর্শনের ইহাই 'প্রদ্যুম্ন'। বিসর্গ বা দ্বিবিন্দু দ্বারা ইচ্ছা বুঝায়। বৈষ্ণবশাস্ত্রে ইহাকে 'অনিরুদ্ধ' বলে। স্বচ্ছ প্রধানা প্রকৃতি নিজের চেতনাকালে স্বেচ্ছায় নাদরূপে পরিণত হন, এবং আপন নির্গুণ ভাব স্মরণার্থে নাদকে আকর্ষণ করিয়া বিন্দুতে পরিণত হন, ইহাই তাঁহার আজ্ঞা, এই নাদবিন্দুর মিলনে পরাপ্রাসাদবিদ্যার অর্দ্ধ-

১। The Mystic Significance of Evam, M. M. Gopinath Kaviraj.

নারীশ্বর মূর্ত্তি।) যাহাকে প্রতিবিম্ব বলা হইয়াছে তাহাই মায়া, ইহা হইতেই সৃষ্টি।[১]

তন্ত্রমতে সৃষ্টির মূল উপাদান চন্দ্র বা সোম। চন্দ্র যেখানে বিন্দুরূপে অবস্থিত সেখানে সৃষ্টি বা কম্পন নাই। ইহাই অমৃতকলা বা ষোড়শীকলা। উহা পঞ্চদশ কলার সমষ্টি হইয়াও তাহার অতীত। এই নিত্যকলার ক্ষরণ হয় না, উহা 'অক্ষর' বা 'বিন্দু'। তবে কৌশলে শিবতত্ত্বের যোগে ইহা হইতে সুধাধারা বর্ষণ হয়। বিন্দুদ্বয়ের অদ্বয় অবস্থাই ষোড়শী, ইহার ক্ষরণ হইলেও ইহার অক্ষরত্ব ব্যাহত হয় না। এই বিন্দুক্ষরণ হইতেই নাদের আবির্ভাব হয়। সৃষ্টি নাদরূপা ও নাদমূলিকা। সৃষ্টি দ্বিপ্রকার—শুদ্ধ ও অশুদ্ধ। বিন্দুর প্রসার হইতেই উভয়ের উদয়। শুদ্ধসৃষ্টিতে আবির্ভাব, স্থিতি ও তিরোভাব অবস্থা। আবির্ভাব ও তিবোভাবের অন্তরালে ভাবের স্থৈর্য্য থাকে, ক্রমিক পরিণাম থাকে না। অশুদ্ধমার্গে প্রতিক্ষণে অবস্থান্তর স্বাভাবিক।[২] স্থিরবিন্দুতে কোন পরিবর্ত্তন নাই, সৃষ্টির উপাদান পুরুষ নহেন। অতএব পুরুষতত্ত্ব বিন্দুরও অতীত। সৃষ্টির মূল উপাদান মধ্যবিন্দু, পুরুষ তৎসহ নিত্যমিলিত হইয়াও নিত্যবিমুক্ত। সিদ্ধমতে সাকারের ন্যায় নিরাকারও সৃষ্টির অন্তর্গত, পরমবস্তু সাকার ও নিরাকারের অতীত।

"গোরক্ষ-উপনিষদ" নামক আমার সংগৃহীত আর একটী পুঁথিতে আছে, "যা সময়ে মহাশূন্য থো আকাশাদি মহাপঞ্চভূত অরু তিনহী পঞ্চভূত ন ভয় ঈশ্বর ঔর জীবাদি কোই প্রকার ন খে, জব যা সৃষ্টি কৌ করতা কৌন থা?" ইহার উত্তরে গোরক্ষ বলিতেছেন, নানাপ্রকার সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রথম কর্ত্তা মহাভূত ছিল, তাহার শুদ্ধসত্ত্বাংশ লইয়া 'ঈশ্বর' হইলেন ও মলিন সত্তা লইয়া 'জীব' হইলেন। ইঁহারা সাক্ষাৎ কর্ত্তা হইলেন না। তবে সেই অনির্ব্বচনীয় কর্ত্তা কে? তিনি আদি অনাদি মহানন্দরূপ নিরাকার সাকার বর্জ্জিত অচিন্ত্য এক পদার্থ, তিনিই মুখ্যকর্ত্তা।...... ইনি অদ্বৈতাদ্বৈতরহিত অনির্ব্বচনীয় 'নাথ' সদানন্দস্বরূপ দেবতা। তিনি ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি প্রকটিত করিলে পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয়।......এই নাথ 'শূন্য' বা ঈশ্বরসন্তান। সন্তান দ্বিপ্রকার—নাদরূপা, বিন্দুরূপা। শিষ্য বিন্দুরূপ, পুত্র নাদরূপ, নাদ শক্তিরূপ,

---

১। মন্ত্রযোগ, অবধূত জ্ঞানানন্দ, পৃ ৭০, ৭১,।

২। তান্ত্রিকবৌদ্ধধর্ম্ম, ম.ম. গোপীনাথ কবিরাজ, উত্তরা, কার্ত্তিক ১৩৪৪।

বিন্দু নাদরূপ, তন্মধ্যে শিব্ প্রথম। নবনাথ স্বরূপ শক্তি, বিন্দুরূপ পরশিব, তিনিই ঈশ্বরনামে পূজ্য।

Sir Johne Woodroffe সাহেবের Garland of Letters-এ তিনি 'নাদবিন্দু'র আলোচনা করিয়াছেন, তাহা অবলম্বনে নাদবিন্দুতত্ত্ব আলোচিত হইতেছে। প্রথমে তত্ত্বাতীত বা নিষ্কল ব্রহ্ম বিরাজ করেন, তিনি অনির্ব্বচনীয়, শক্তি তাঁহাতে বিলীন হইয়া আছে। এই নিষ্কল ব্রহ্ম নিজেকে ঈক্ষণ করায় 'অহম্' ও 'অস্মি'র উদ্রেক হয়, অহমের প্রকাশ হয়, তৎসহ অস্মির বিমর্শ হয়। (ঈক্ষণ অর্থে মানুষ স্বপ্নে যেরূপ নিজ সংস্কার দর্শন করে, বিমর্শ অর্থে জ্ঞান।) এই প্রকাশ শিবতত্ত্ব, বিমর্শ শক্তিতত্ত্ব। ইহারা ঈক্ষণ দ্বারা আবির্ভূত বলিয়া ইহারা শক্তির প্রসার, কিন্তু এই প্রসার 'নিষেধব্যাপাররূপা', কারণ এই অবস্থায় নিষ্কল ব্রহ্ম হইতে সকল ব্রহ্মের আবির্ভাব হয়। শিবশক্তির সংশ্লিষ্ট অবস্থাই সৃষ্টির মূল। 'অহম্' নিষ্ক্রিয় বলিয়া শিবরূপ, 'অস্মি' মধ্যে সমস্ত সংস্কাব থাকায় উহা ইদম্ শক্তিরূপ, এই 'ইদম্' অহমের নিষেধরূপা, তাই শক্তিকে 'নিষেধরূপা' বলা হয়।

ঈক্ষণের পর নিষ্ক্রিয় হইতে যে সক্রিয় অবস্থা হয় বা শিবশক্তির সংযোগ হয় তাহাই 'নাদ'—

যদযমনুত্তরমূর্ত্তির্নিজেচ্ছয়াখিলমিদং জগৎ স্রষ্টুম্।
পস্পন্দে স স্পন্দঃ প্রথমঃ শিবতত্ত্বমুচ্যতে তজ্জ্ঞৈঃ॥
ইচ্ছা সৈব স্বচ্ছা সন্ততসমবায়িনী সতী শক্তিঃ।
সচরাচরস্য জগতো বীজং নিখিলস্য নিজনিলীনস্য॥

(তত্ত্বসন্দোহ ১, ২ শ্লোক)

যাহার পরে কিছু নাই, বিশ্বসৃষ্টির জন্য নিজ ইচ্ছায় যিনি স্পন্দিত হন, তাঁহার সেই প্রথম স্পন্দকেই জ্ঞানী পুরুষেরা শিবতত্ত্ব বলেন। ঐ শুদ্ধ-ইচ্ছারূপী শক্তি যাহা নিত্যশিবের সঙ্গে থাকেন, তাঁহার নিজের ভিতরে লীন হইয়া সচরাচর জগতের বীজ আছে।

সাংখ্যের ভাষায় শিব ও শক্তি, পুরুষ ও প্রকৃতি, ইহাদের সংযুক্ত নাদই সদাখ্যতত্ত্ব। ঈক্ষণে অহমের প্রকাশ-সময়ে শিব নিষ্ক্রিয়, শক্তি সক্রিয়, ইহাদের মিথসমবায়ই 'নাদতত্ত্ব', তন্ত্রের ভাষায় উহাই মহাকাল ও মহাকালীর বিপরীত রতি। নিষ্কল শিবে লীন শক্তির নাম 'সরস্বতী' অর্থাৎ সংসরণকারিণী, ইহার বাহন 'হংস', 'হং' শিবতত্ত্ব, 'সঃ' শক্তিতত্ত্ব

অর্থাৎ শক্তি-সংসরণে প্রপঞ্চাভিমুখী এবং বিপরীত প্রবাহে তাহাই 'সোহং' বা পরাবাক্ অবস্থায় প্রত্যাগমন, এই অবস্থায় শিবশক্তির একত্ববোধে নাদের অনুভূতি হয়। নিষ্কল শিবের সহিত অভিন্না শক্তিই 'উন্মনা', সৃষ্টিরূপিণী শক্তি 'সমনা', উন্মনা ও সমনার সন্ধিই শিবশক্তির সংযুক্তাবস্থা, ইহাই 'নাদ'।

সকল পরমেশ্বর হইতে শক্তি, তথা নাদ, তথা বিন্দুর উৎপত্তি হয়। (গণিতে বিন্দুর স্থান আছে পরিমাণ নাই, তন্ত্রমতে স্থানও নাই।) বিন্দুই সৃষ্টির মূল ও শক্তির অবস্থাবিশেষ, বিন্দুতত্ত্বই ঈশ্বরতত্ত্ব। এই অবস্থায় শক্তি চিদ্রূপিণী হইয়া অব্যক্ত ইদম্‌কে তাদাত্ম্যভাবে আনিয়া চিদ্বিন্দুরূপ ধারণ করে বা অহম্ (ঈশ্বর) আপন চেতনায় ইদম্‌কে (অখিলবিশ্বকে) দেখেন। অহং মহাপ্রলয়ের অন্তিম অবস্থা, ইদম্ সৃষ্টিরচনার পূর্ব্বাবস্থা।

এইরূপে নাদ ও বিন্দু উভয়ই শক্তির বিভিন্ন অবস্থা। বিন্দুকে শক্তির ঘনীভূত অবস্থা বলে, সৃষ্টির ইচ্ছায় শক্তি ঘনীভূত হন বা বিন্দুত্বলাভ করেন। সৃষ্টির ত্রিগুণের সত্ত্বগুণ সকল ব্রহ্মে চিদ্‌রূপে জ্ঞানপ্রধানা, নাদতত্ত্বে ক্রিয়ারূপে রজঃপ্রধানা, বিন্দুতত্ত্বে ঘনীভূত হইবার কারণ তমঃপ্রধানা। প্রত্যেক স্তরেই ত্রিগুণযুক্তাবস্থা হইলেও একটী গুণ প্রধান হইয়া বিরাজ করে।

অতএব সৃষ্টিবিকাশের মূলতত্ত্ব শক্তি, উহা একদিকে চিৎশক্তি, অন্যদিকে বিশ্বরূপিণী মায়াশক্তি। সকলব্রহ্ম হইতে বিন্দুতত্ত্ব পর্য্যন্ত বিকাশে ঈশ্বর প্রত্যভিজ্ঞাতে মায়াশক্তির লক্ষণ স্পষ্ট উপলক্ষিত হয়, এই ভেদবুদ্ধিকে নিষেধব্যাপার রূপ শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়।

বিন্দুতত্ত্ব পরিবিন্দুরূপে ত্রিধা বিভক্ত হয়, ভাস্কররায় ললিতা সহস্র-নাম স্তোত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন, এই কারণে বিন্দু হইতে ক্রমশঃ কার্য্য-বিন্দু, তাহা হইতে নাদ, নাদ হইতে বীজ এই তিনরূপ হয়। এই তিনকে ক্রমশঃ পরবিন্দু, সূক্ষ্মবিন্দু ও স্থূলবিন্দু রূপেও অভিহিত করা হয়। "অস্মাচ্চ কারণাদ্বিন্দোঃ সাক্ষাৎক্রমেণ কার্য্যবিন্দুস্ততো নাদস্ততো বীজমিতি ত্রয়মুৎপন্নং তদিদং পরমসূক্ষ্মস্থূলপদৈরপি উচ্যতে"। ইহার মধ্যে সূক্ষ্মবিন্দু হিরণ্যগর্ভ ও স্থূলবিন্দু বিরাটের সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। এইরূপে মায়াশক্তিকে সকল ব্রহ্মে সত্ত্বপ্রধান, তথা নাদতত্ত্ব হইতে বিন্দুর ত্রিরূপ পর্য্যন্ত রজঃ-প্রধানরূপে আমরা দেখি। মায়াশক্তি তমঃপ্রধানরূপে জীবে অভিব্যক্ত হয়। তান্ত্রিক দৃষ্টিতে সৃষ্টিবিকাশের এইরূপ ব্যাখ্যা হইল।

'কলা' কি? চিদ্রূপিণী শক্তি ব্রহ্মে লীন হইলে 'নিষ্কল' ও শক্তি চৈতন্যরূপিণী হইলে ব্রহ্ম 'সকল' হন, এই দ্বিবিধস্বরূপ সত্য, শ্রুতিতে আছে—

এতাবানস্য মহিমতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি॥

এই বিশ্বচৈতন্যরূপিণী শক্তির মহিমা, সকল স্বরূপের নিদর্শন, পুরুষ ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ, ঐ পুরুষের একপাদ (সূক্ষ্মতম অংশ) অখিল প্রাণী ও ইহার অমৃতত্রিপাদ (মহত্তম অংশ) দ্যুলোকে আছে।

শক্তির দুইটী অবস্থা উন্মনী ও সমনী। উন্মনী অবস্থাই শক্তির নিষ্কল অবস্থা, সমনী অবস্থা শক্তির কলাযুক্ত অবস্থা। শক্তি প্রধানতঃ ষোল কলাতে বিভক্ত, $\frac{১}{১৬}$ অংশের নাম কলামূর্ত্তি, কিন্তু শিব নিষ্কল। শক্তি প্রকৃত পূর্ণতাকে ভেদ করিয়া 'অস্তি' দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া 'অহং'রূপে প্রকটিত হন, এই আচ্ছাদনী শক্তিই 'কঞ্চুক' (কোষ) নামে অভিহিত। ইহারা সংখ্যায় ষট্, যথা—মায়া, কলা, রাগ, বিদ্যা, কাল ও নিয়তি। শক্তির ষোড়শতম কলা 'অমাকলা' নামে খ্যাত এবং সপ্তদশতম কলা 'নির্ব্বাণকলা'। প্রশ্নোপনিষদে (৬।৪) ষোল কলার বিবরণ আছে। কলা অর্থে শিবের অংশ বা কর্ত্তৃত্বশক্তির কিঞ্চিৎ অংশবিশেষ।[১]

ষট্ কঞ্চুকের মায়া, অহং ইদম্‌কে পৃথক করে, অহং হইতে পুরুষ, ইদম্ হইতে প্রকৃতি হয়, পুরুষে কলা, বিদ্যা, রাগ ইত্যাদি আবরণ বা কঞ্চুক হয়। কলা অর্থে জীবে কিঞ্চিৎ কর্ত্তৃত্ববোধ, বিদ্যা জীবের অল্পজ্ঞতা, রাগ জীবের অনুরাগের কারণ, কাল জীবের অনিত্য ভাব, নিয়তি জীব যাহার দ্বারা নিয়মিত কার্য্য করে—এই পঞ্চ কঞ্চুক জীবকে আবরিত করে। এই মায়াবৃত জীবই পুরুষ। এই পুরুষ ও প্রকৃতির পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব লইয়াই পরশিবরূপা সংবিদ্ বিশ্বময়ী।

তন্ত্রসারে আছে, 'তং সমস্তম্ অধ্বানং দেহে বিলাপ্য, দেহং প্রাণে, তং ধিয়ি, তাং শূন্যে, তৎ সংবেদনে নির্ভরপরিপূর্ণসংবিৎ সংপদ্যতে ষড়্‌বিংশ-তত্ত্বস্বরূপজ্ঞঃ তত্ত্বত্তীর্ণাং সংবিদং পরশিবরূপং পশ্যন্ বিশ্বময়ীমপি সংবেদয়তে।[২] পরশিবরূপা সংবিদ্ বিশ্বময়ী ও বিশ্বোত্তীর্ণা। পরশিব তত্ত্বাতীত। তত্ত্বসকল মূলতঃ ষট্‌বিংশতি, যথা—

১। নাদবিন্দুকলা, শ্রীগৌরীশঙ্কর দ্বিবেদী সাহিত্যাচার্য্য, শক্তিঅঙ্ক কল্যাণ, পৃ ৪৪৩ ইঃ Based on Garland of Letters.

২। তন্ত্রসার ৭ম আঃ

পরশিব চিৎমাত্র
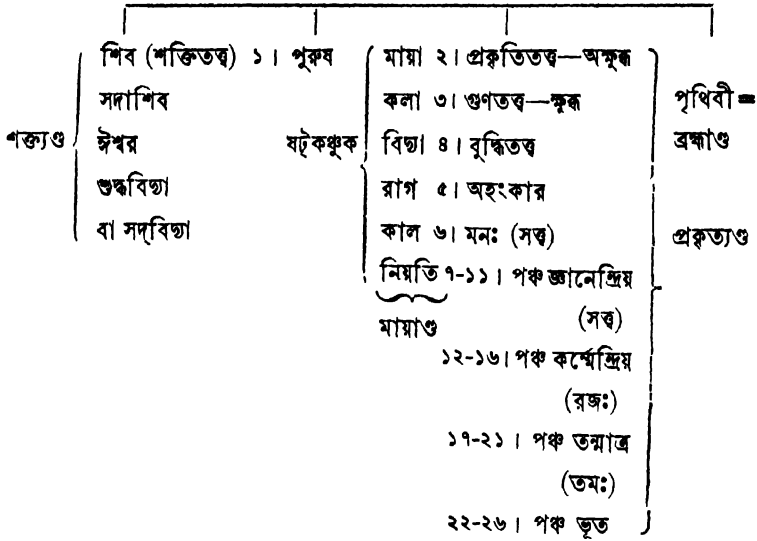
নাদাদিতত্ত্বের অন্তরশক্তিরূপ কলা নাদাদিতত্ত্বকে চারিটী অণ্ডে বিভাজিত করে—ব্রহ্মাণ্ড, মায়াণ্ড, শক্ত্যণ্ড ও মূলাণ্ড। ব্রহ্মাণ্ড পৃথ্ব্যাদি-তত্ত্বযুক্ত আকাশ দ্বারা আবৃত। মায়াণ্ড মায়া, শক্ত্যণ্ড শক্তি ও মূলাণ্ড প্রকৃতি দ্বারা আবৃত। শক্ত্যণ্ডে শক্তিকলা ব্যাপ্ত থাকে, ইহার সীমা শক্তিতত্ত্ব হইতে শুদ্ধবিদ্যা পর্য্যন্ত, ইহাতে সমনী ব্যাপিনী ইত্যাদি শক্তি ও তাহাদের কলা এবং নাদবিন্দু শক্তি ও উহাদের কলা সমাবিষ্ট থাকে। শক্ত্যণ্ডের দেবতা মন্ত্রমহেশ্বর, মন্ত্রেশ্বর, মন্ত্র ও বিদ্যেশ্বর। শুদ্ধবিদ্যা ও মায়াতত্ত্বের মধ্যে বিজ্ঞানকলা ব্যাপ্ত আছে, উহা বিন্দুবিকাশের দ্বারা বিশ্বরচনা করে। মায়াণ্ডে বিদ্যাকলা ব্যাপ্ত আছে, পৃথ্বী হইতে মায়াণ্ড পর্য্যন্ত দেবতা ব্রহ্মাবিষ্ণুরুদ্র। প্রকৃত্যণ্ডে (মূলাণ্ডে) ও ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্ম হইতে স্তম্ব পর্য্যন্ত সকল সৃষ্টি অবস্থিত আছে। এই কলাধিষ্ঠাত্রী দেবতার সাধনাদ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়া সাধক শক্তিতত্ত্বে লীন হন। সেই শক্তিতত্ত্বই শিব বা আনন্দ—সদাশিবতত্ত্ব, 'ইচ্ছা' বা অহং ইদং, ঈশ্বরতত্ত্ব 'জ্ঞান' বা ইদং, শুদ্ধবিদ্যা বা সদ্‌বিদ্যাতত্ত্ব 'ক্রিয়া' বা ইদং অহং। পরমেশ্বরের হৃদয়ে বিশ্ব-সৃষ্টির ইচ্ছা হইলে তিনি শিবরূপ ও শক্তিরূপ হন, শিব প্রকাশ-রূপ, শক্তি বিমর্শরূপা (বিমর্শ = পূর্ণ অকৃত্রিম 'অহং' এর স্ফূর্ত্তি)। সুন্দর রাজা যেমন দর্পণে নিজমূর্ত্তি দেখেন, শিবও শক্তিতে তেমনি নিজের সত্তা দেখেন, পুণ্যানন্দের কামকলাবিলাসে ঐ উপমা আছে। শিব ও শক্তি

চন্দ্রচন্দ্রিকার ন্যায় অচ্ছেদ্য। বিমর্শের নামান্তর পরাবাক্, স্ফুরতা, স্পন্দ ইত্যাদি।

শিব চিন্মাত্রস্বভাব, পূর্ণ, অধিকারী হইয়াও তাঁহার শক্তি অনন্তভাবে প্রস্ফুরিত হয়, তন্মধ্যে চিৎ, আনন্দ, ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া এই পাঁচটী মুখ্য। শিব ও শক্তি অভিন্ন; যখন মাত্র চিৎশক্তির প্রাধান্য তখন শিব তত্ত্ব, আর যখন আপন স্বাতন্ত্র্যমহিমায় বহিঃপ্রকাশের ইচ্ছায় প্রথম আত্মবিমর্শ দ্বারা শক্তিদশায় অবিশায়িত হইয়া প্রস্ফুরিত হন, তখনই তাঁহার স্বারসিক বা স্বতঃস্ফুর্ত অহংভাবের উদয় হয়, ইহাই তাঁহার 'আনন্দপ্রধান' শক্তিতত্ত্ব। ইহাই 'অহং'ভাব বা প্রকাশের দ্বিতীয় অবস্থা। অনন্তর 'অহং-ইদম্'রূপ পরামর্শদ্বয়ের দ্বারা (ইচ্ছা দ্বারা), আপনাকে প্রকাশিত করিবার ইচ্ছারূপ শক্তির প্রাধান্যে 'সদাশিব' তত্ত্বের উদ্ভব হয়। ইহা অস্ফুট ভাবরাশির ন্যায়, ইহা স্ফুটীভূত হইলে 'ইদম্' অংশে যখন 'অহম্' অংশের নিষেক হয়, তখনই 'জ্ঞান'শক্তি প্রধান 'ইদম্-অহং'রূপে ঈশ্বরতত্ত্বের প্রকাশ হয়। পরিশেষে 'ক্রিয়া' শক্তির প্রাধান্যে 'অহম্-ইদং' যখন তুল্যরূপে প্রকটিত হয়, অর্থাৎ যখন বেত্তা ও বেদ্য উভয়ই স্ফুট ধারণ করে তখন শুদ্ধবিদ্যা বা সদ্‌বিদ্যার প্রকাশ হয় (তন্ত্রসার)। শিবই বেত্তা ও বেদ্য, তিনিই প্রমেয় ও প্রমাতা। একই বস্তু বেত্তা ও বেদ্য, প্রমাতা ও প্রমেয়। দ্রষ্টাও দৃশ্য হন, কারণ তিনি অদ্বিতীয়, জগতের দ্বিতীয় কারণ নাই। তিনি আপন স্বাতন্ত্র্যমহিমায় নর্মরভসে বা খেলার ঔৎসুক্যে[১] এই জগৎকে আপনার বোধগগনে প্রতিবিম্বিতবৎ প্রকাশিত করিয়াছেন।[২]

গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহে নাদ ও বিন্দু অংশের উৎকর্ষাপকর্ষ বিচার করা হইয়াছে। নাথ হইতে নাদ, নাদ হইতে প্রাণ এবং শক্তি হইতে বিন্দু, বিন্দু হইতে শরীর উৎপন্ন হইয়াছে। যোগসম্প্রদায়ে নাদ হইতে জাত শিষ্যকে বিন্দু হইতে জাত পুত্রের অধিক বলা হয়।[৩] নাথ হইতে দ্বিপ্রকার সৃষ্টি হইয়াছে—নাদরূপা ও বিন্দুরূপা। নাদরূপা শিষ্যক্রমেণ, বিন্দুরূপা চ পুত্রক্রমেণ। নাদাত্মবনাথা জাতা বিন্দুতঃ সদাশিবো ভৈরবো জাতঃ। তৎপরে শব্দসৃষ্টি বর্ণনা আছে, এক সূক্ষ্মরূপিণী, দ্বিতীয় স্থূলরূপিণী—সূক্ষ্মরূপিণী প্রণবো মহাগায়ত্রী যোগশাস্ত্র, স্থূলরূপিণী ব্রহ্মগায়ত্রী বেদত্রয় ···· পুনঃ নাদসৃষ্টিরূপিণী সূক্ষ্মস্থূলরূপিণী প্রকারদ্বয়াত্মিকা জাতা।[৪]

১। ঈশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞাসূত্র ৫।৩ ও তন্ত্রসার

২। "সর্বমিদং ভাবজাতং বোধগগনে প্রতিবিম্বমাত্রম্"—তন্ত্রসার ৩ আঃ

৩। গো. সি স. পৃ ৫৮ ৪। গো. সি. স. পৃ ৭২, ৭৩

নাথসূত্রে একাক্ষর প্রণবকেই সূক্ষ্মবেদ বলা হইয়াছে এবং সত্যযুগে কেবল প্রণব গায়ত্রী সাধনে জীবের মুক্তিপ্রাপ্তি হইত। যে সকল শ্রুতি প্রণবানুসারিণী তাহাই 'নাথমতানুযায়ী' ইহাও গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহে উক্ত হইয়াছে। এই সকল প্রণবানুসারিণী শ্রুতির নামও উল্লিখিত হইয়াছে, যথা মণ্ডুক, মাণ্ডুক্য, ক্ষুরিকা, কৈবল্য, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, মৈত্রায়ণাদি। প্রণবই একমাত্র বেদ, যাহার দ্বারা প্রণব প্রবর্ত্তক নাদের উপলব্ধি হয় এবং নাদব্রহ্মের যাহা মূলতত্ত্ব তাহার উপলব্ধি হয়।[১]

পাতালখণ্ডে আছে—"অহং চ ললিতাদেবী রাধিকা যা চ গ্রীয়তে। অহং চ বাসুদেবাখ্যো নিত্যং 'কামকলাত্মকঃ'॥ সত্যযোষিৎ স্বরূপোঽহং যোষিচ্চাহং সনাতনী। অহং চ ললিতাদেবী পুংরূপা কৃষ্ণবিগ্রহা॥" শক্তিসঙ্গমতন্ত্রের অষ্টম পটলে 'কদাচিদ্বাত্মা ললিতা পুংরূপা কৃষ্ণবিগ্রহা। লোকসম্মোহনার্থায় স্বরূপং বিভ্রতী পরা। কদাচিদাদ্যা শ্রীকালী সৈব তারাস্তি পার্বতী। কদাচিদাদ্যা শ্রীতারা পুংরূপা রামবিগ্রহা। 'রা' শক্তিরিতি বিখ্যাতা 'ম' শিবঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। শিবশক্ত্যাত্মকং ব্রহ্ম রামরামেতি গীয়তে।" অতএব ইহা দ্বারা শিবশক্তির অভিন্নতা উপলব্ধি হয়, কালীতারা শিবরাম একই, বাসুদেবও 'কামকলাত্মকঃ'। আবার "বিন্দুঃ শিবো রজঃ শক্তি র্বিন্দুরিন্দু রজো রবিঃ। উভয়োঃ সঙ্গমাদেব প্রাপ্যতে পরমং পদম্" (পৃ ৪১ গো. সি. স.): এই বিন্দু দেহে ধারণ করিতে পারিলে মৃত্যুভয় থাকে না, পরমপদ প্রাপ্তিও হয়। নভোমুদ্রা দ্বারা এই বিন্দু ধারণ কর্ত্তব্য। মনঃস্থৈর্য্যে বায়ু স্থির হয়, তাহা হইতে বিন্দু স্থির হয়, বিন্দু স্থির হইলে পিণ্ড অবশ্যই স্থির হইবে। জিতায়ু কামবর্জিত হইয়া তারক জপ করেন, নাসাগ্রে দৃষ্টি করিয়া 'ওঁকার' অক্ষরই জপ বিধি।[২] পরবিন্দু ভেদ হইয়া যে প্রণবরূপ শব্দব্রহ্ম উৎপন্ন হইবার কথা পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে সেই প্রণবই জগতের মূলযন্ত্র। তাহাই ত্রিরেখা বা কামকলার যন্ত্ররূপে বর্ণিত হয়, বীজমন্ত্রের নাদাংশই কাম-স্বরূপ বা ইচ্ছারূপিণী নাদশক্তিই কামস্বরূপ।

এই ওঁকার বা নাদবিন্দু সাধন যোগমার্গে কিরূপে আচরিত হইত তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

১। গো সি স, পৃ ৬৩, ৬২, ৭৫, ৭৬, ২৬।   ২। গো. সি. স, পৃ ৪৭, ৪৮, ৪১, ৩১।

নবম পরিচ্ছেদ

কায়সিদ্ধি

প্রাচীন ভারতে বহু সম্প্রদায় মধ্যেই আধ্যাত্মিক সাধনার পূর্ণ উৎকর্ষ লাভের জন্য দেহসিদ্ধি বা কায়সিদ্ধির আবশ্যকতা স্বীকৃত হইত। এই দেহসিদ্ধি দ্বারা জরামৃত্যুহীন শুদ্ধদেহ লাভ করাই উদ্দেশ্য ছিল। যদিও প্রচলিত দার্শনিক প্রস্থানে আপাততঃ ইহার আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায় না, তথাপি কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিলে কোন কোন সম্প্রদায়ে ইহার আভাস অবশ্যই দৃষ্টিগোচর হইবে। এমন কি, ভারতের বাহিরে অন্যান্য ধর্ম্মের ইতিহাসেও সিদ্ধদেহের বিবরণ যে না পাওয়া যায় এমন নহে। উদাহরণস্বরূপ যীশুর পরম ভক্ত সেণ্ট জনের নাম করা যাইতে পারে।[১] চীনদেশে Laotse সম্প্রদায়েও দেহসাধনের সূক্ষ্ম আলোচনা বর্ত্তমান ছিল জানিতে পারা যায়।

ভারতবর্ষের সাধনার ইতিহাস সবিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই জানিতে পারা যায় যে, দেহসিদ্ধিলাভের বহু প্রণালী এই দেশে প্রচলিত ছিল। হঠযোগী সম্প্রদায় সাধারণতঃ বায়ুকে আশ্রয় করিয়া দেহসাধন করিতেন। রসেশ্বর দর্শনের অনুযায়িগণ পারদের অষ্টাদশ সংস্কার স্বেদন, মর্দ্দন, মূর্চ্ছন, স্থাপন, পাতন, দীপন ইত্যাদি সম্পাদনপূর্ব্বক সিদ্ধদেহ বা হরগৌরীতনু প্রকট করিবার জন্য চেষ্টা করিতেন। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে এবং কোন কোন বৌদ্ধ অথবা তান্ত্রিক সম্প্রদায়ে বিভিন্ন উপায়ও অবলম্বন করা হইত। কেহ ভাবসাধনের দ্বারা ভাবদেহ অর্জ্জন করিতেন, আবার কোন কোন সাধক বিন্দুজয়পূর্ব্বক তাহার ঊর্দ্ধগতি সম্পাদন করিয়া দেহ সিদ্ধ করিতেন। প্রাচীন বৌদ্ধগণের মধ্যেও 'স্কন্ধসিদ্ধি' নামে দেহসিদ্ধির কথাই উল্লিখিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়; এই প্রসঙ্গে আশ্রয় পরাবৃত্তি বা শুদ্ধধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণে নবকায়লাভ বিবেচ্য।[২] বজ্রযান, সহজযান, বৈষ্ণব সহজিয়া, বাউল প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সাধনার ইতিহাস আলোচনা করিলে,

---

১। The Apocalypse Unsealed (Revelation of St. John), James Pryse, New York.

২। ধর্ম্মকায় হইলেন নূতন শুদ্ধ আশ্রয়, ইহাই অনাস্রব ধর্ম্মসন্তান বা আশ্রয় পরাবৃত্তি। —অভিধর্ম্মকোশ ৭।৩৪

এই গুহ্য সাধনার অনেক রহস্যই জানিতে পারা যাইবে। নাথগণ দেহ-সিদ্ধিকে বিশেষ প্রাধান্য দিতেন, তাই ইহা তাঁহাদের নামেই প্রচলিত। সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী ও অপর ভাষায় নিবদ্ধ রচনাবলী হইতে ইহা প্রমাণিত হয়।

আমাদের পূর্ব্বে আলোচিত নাথসম্প্রদায়ের সংস্কৃত গ্রন্থগুলির মধ্যে এবং বঙ্গীয় গাথার মধ্যে কায়সিদ্ধির বহু উল্লেখ আছে। বঙ্গীয় গাথার আলোচনা পরে করিতেছি। সংস্কৃত গ্রন্থ মধ্যে গোরক্ষসিদ্ধান্ত-সংগ্রহে উক্ত হইয়াছে "চন্দ্রাৎ সারঃ স্রবিতবপুষা তেন মৃত্যুর্নরাণাং তং বধ্নীয়াৎ সুকরণমথো নান্যথা কায়সিদ্ধিঃ"।[১] যে যোগী খেচরীমুদ্রা জানেন তিনি কালের দ্বারা বাধিত হন না, যিনি চন্দ্রের এই নির্দ্দোষ অমৃতধারা পান করিয়াছেন, তিনি মৃণালের ন্যায় বপু ধারণ করিয়া জীবিত থাকেন। চন্দ্রসার যাঁহার দেহে স্রাবিত হইতেছে, তাঁহার কায়সিদ্ধি অনিবার্য্য। তিনি রোগের দ্বারা পীড়িত হন না, কর্ম্মের দ্বারাও বাধিত হন না, তিনি পঞ্চমুখ হরের ন্যায় অজর অমর হন। এই সাধন গুরুর উপদেশে লভ্য, কোটিশাস্ত্র পাঠেও এই জ্ঞানলাভ সম্ভব হয় না। হঠযোগপ্রদীপিকাতেও আছে—"নির্ব্যাধিঃ স মৃণালকোমল-বপুর্যোগী চিরং জীবতি" (৩।৪১)।

প্রশ্ন হইতে পারে, কাল শরীরকে ত্যাগ করে না, তবে যোগী কায়সিদ্ধি দ্বারা কিরূপে কালকে বঞ্চনা করেন? বস্তুতঃ কাল স্থূল শরীরকে ত্যাগ করে না, "শরীরং নো ত্যজেদেব কালঃ কস্যাপি কুত্রচিৎ। অন্তঃশরীররক্ষার্থং যত্নঃ কার্য্যস্তু যোগিনা"।[২] তাই যোগী অন্তঃশরীর রক্ষাকার্য্যে যত্নবান হন, এইরূপ যোগীর পক্ষে অহংভাববর্জ্জিত মনের অভ্যাসই লক্ষ্য। যে পূর্ণরূপে কল্পনাহীন সে কালকে জয় করিতে অক্ষম। আত্মজয়ই কাল, তাহাই শিব, তাহা সর্ব্বস্ব, ইহা ব্যতীত কিছু নাই। কালযুক্ত সংসারে যোগী স্বীয় পৌরুষের দ্বারা কালকে জয়ী করিয়া সিদ্ধযোগী হন। যোগী নবদ্বার রুদ্ধ করিয়া বায়ুরোধ করিয়া আত্মধ্যানে নিমগ্ন হইয়া থাকেন। অমরৌঘশাসনের প্রথমেই ঊর্দ্ধশক্তির নিপাতনে ও অধঃশক্তির আকুঞ্চনে মধ্যশক্তির প্রবোধ দ্বারা মহাসুখ উৎপন্ন হইবার কথা আছে। অধঃশক্তি অর্থাৎ কুণ্ডলিনী শক্তি, তাহাকে মধ্যপথে অর্থাৎ

১। গো. সি. স, পৃ ৩৮

২। গো. সি. স., পৃ. ৩৯, ৪০

সুষুম্নাপথে নীত করিয়া সহস্রারে মিলিত করিতে হয়, তৎকালে ঊর্দ্ধশক্তির নিপাতন হয় অর্থাৎ সহস্রার হইতে অমৃতক্ষরণ হয়।

কুণ্ডলিনী বিভিন্ন চক্রের মধ্য দিয়াই ঊর্দ্ধে গমন করেন। জীব খেচরী মুদ্রা সাধন দ্বারা সহস্রার-ক্ষরিত অমৃত পান করিলে তাহার পিণ্ডস্থৈর্য্য হয়।[১] ইড়া সঞ্চারী পূরকের সহিত খেচরী দ্বারা নাভিস্থ বহ্নিকে সিঞ্চিত করিলে 'নবতনু' লাভ হয়।

নাসা পশ্চিমমার্গবাহপবনাৎ প্রাণেঽতিদীর্ঘীকৃতে
চন্দ্রাম্বু প্রতিসারণাং সুকৃতিনঃ প্রাগ্ঘণ্টিকায়াঃ পথঃ।
সিঞ্চন্ কালবিশালবহ্নিবশগং ভূত্বা স নাড়ীশতং
তৎকার্য্যং কুরুতে পুনর্নবতনুং জীর্ণদ্রুমস্কন্ধবৎ॥[২]

হঠযোগপ্রদীপিকাতে উক্ত হইয়াছে—

ভ্রবোর্ম্মধ্যে শিবস্থানং মনস্তত্র বিলীয়তে।
জ্ঞাতব্যং তৎপদং তুর্য্যং তত্র কালো ন বিদ্যতে॥
অভ্যসেৎ খেচরীং তাবদ্ যাবৎ স্যাদ্‌যোগনিদ্রিতঃ।
সংপ্রাপ্তযোগনিদ্রস্য কালো নাস্তি কদাচন॥[৩]

অর্থাৎ ভ্রূযুগলের মধ্যে শিবস্থান আছে অর্থাৎ ঐ স্থানেই সুখস্বরূপ আত্মার অবস্থান। এই শিবস্থানে মন বিলীন হয় অর্থাৎ শিবাকার বৃত্তি প্রবাহ হয়। এইরূপ চিত্তলয়ই জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তির পরবর্ত্তী তুর্য্য বা চতুর্থ অবস্থা। এই অবস্থা হইলে মৃত্যু হয় না, অর্থাৎ চন্দ্রসূর্য্যের নিরোধ হেতু আয়ুক্ষয়কারক কাল থাকে না, এই নিমিত্ত সুষুম্নাকে কালের ভোক্ত্রী বলা হয়।

যাবৎ সাধক খেচরী মুদ্রা অভ্যাস করেন, তাবৎ সেই সাধক যোগনিদ্রামগ্ন থাকেন—অর্থাৎ তাহার সর্ব্বপ্রকার চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়। যে সাধক এইরূপ চিত্তবৃত্তির নিরোধ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার কদাচ মৃত্যু ঘটে না।

হঠযোগপ্রদীপিকায় যে যোগী-নমস্কার আছে তাহাতেও বলা হইয়াছে, তুমি চিরজীবী যোগী, তোমাকে নমস্কার করি। যে কাল দুর্ব্বার, তুমি সেই 'কাল' অর্থাৎ মৃত্যুকে পরাজয় করিয়াছ। যে কালের বদনে

১। অমরৌঘশাসন, তৃতীয় শ্লোক—পিণ্ডস্থৈর্য্যং যদস্মাদ্ ভবতি যত্র মহামৃত্যুরোগাত্রবস্তে ইত্যাদি।
২। অমরৌঘশাসনম্, ষষ্ঠ শ্লোক।
৩। হ যো প্র ৪।৪৮, ৪৯ ; ৪।১৭ ভোক্ত্রী সুষুম্না কালস্য।

এই পরিদৃশ্যমান স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ পতিত আছে, সেই জগদ্‌ভক্ষক কালও যখন তোমার নিকট অভিভূত হইয়াছে তখন তোমাকেই নমস্কার কর্ত্তব্য—"অমরায় নমস্তুভ্যং সোঽপি কালস্ত্বয়া জিতঃ" ॥[১]

গোরক্ষসংহিতায় যোগীন্দ্রবর গোরক্ষনাথ বলিয়াছেন—

অপানপ্রাণয়োরৈক্যাৎ ক্ষয়ো মূত্রপুরীষয়োঃ
যুবা ভবতি বৃদ্ধোঽপি সততং মূলবন্ধনাৎ ॥[২]

অর্থাৎ মূলবন্ধ মুদ্রা অভ্যাস দ্বারা প্রাণ ও অপান (এই দুইটী বায়ু পরস্পর উর্দ্ধে ও অধঃ অবস্থিত) বায়ুর একতা সম্পন্ন হয় সুতরাং মূত্র ও পুরীষের ক্ষয় হয় এবং বৃদ্ধ ও যুবার ন্যায় দৈহিক ক্ষমতা সম্পন্ন হয়। অতএব বলা যাইতে পারে মূলবন্ধ মুদ্রা অভ্যাস দ্বাবাও কায়সিদ্ধি হয়।

কোন কোন মতে কায়সাধন ক্রিয়াতে বজ্রোলী, সহজোলী প্রভৃতি যে সকল মুদ্রার সাধন আছে তাহাতে স্ত্রীসঙ্গ অনিবার্য্য। বজ্রোলী সহজোলী নাম হইতে বজ্রযান, সহজযান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের কথা স্মরণ হয়। বজ্রোলী প্রভৃতির রহস্য হঠযোগপ্রদীপিকায় এইরূপে বিবৃত হইয়াছে—

চিত্তে সমত্বমাপন্নে বায়ৌ ব্রজতি মধ্যমে।
তদামরোলী বজ্রোলী সহজোলী প্রজায়তে ॥[৩]

এই সকল মুদ্রা সাধন দ্বারা বায়ু মধ্যম নাড়ীগত হয় অর্থাৎ সুষুম্না পথে প্রবাহিত হয়, তদ্বারা কাল জয় সম্ভব হয়, কারণ সুষুম্না কালভোক্ত্রী ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

দেখা যাইতেছে নাথসম্প্রদায় মধ্যে কায়সিদ্ধি ছিল। পূর্ব্বে যে রসেশ্বর সম্প্রদায়ের কথা বলা হইয়াছে তাহার সহিতও নাথসম্প্রদায়ের যোগ ছিল। গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহে "রসায়নী মহাবিদ্যা সিদ্ধির্ভবতি নিশ্চিতম্"[৪] বলা হইয়াছে। রসায়নবিদ্যা দ্বারা যোগীর সিদ্ধিলাভ হয় অর্থাৎ তাঁহার পিণ্ডসিদ্ধি হয়। যোগী ইহার ফলে বৈষয়িক দেহ ত্যাগ করিয়া যোগদেহ লাভ করেন এবং কালকে জয় করিয়া তাহা রক্ষা করেন।

১। হ. যো প্র ৪।১৩ ২। গো সং. ১।৬২
৩। হ. যো. প্র. ৪।১৪ ৪। গো. সি. স. পৃ. ৩৫

যোগদেহং সৃজত্যেব কাঙ্গমীত্যন্ববত্যয়ম্।
হন্তি বৈষয়িকং দেহং তন্নাথঃ কহরীশ্বরঃ ॥[১]

রসেশ্বর সম্প্রদায়ের কায়সিদ্ধি বিষয়ে সবিশেষ আলোচনা পরে করা যাইতেছে, তৎপূর্ব্বে দেহসিদ্ধির দুইটী বিশেষ ধারার আলোচনা কর্ত্তব্য। দেহসিদ্ধির দুইটী ধারার বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রথম ধারায় কেবল সূক্ষ্মদেহের স্থিরতা সম্পাদন করা হয়, দ্বিতীয় ধারায় স্থূলদেহেরও শুদ্ধি সম্পাদন করা হয়।

প্রথম ধারায় দেহসিদ্ধির জন্য স্থূলদেহের সাক্ষাৎভাবে সিদ্ধতা অপরিহার্য্য নহে; এই মতে সূক্ষ্মদেহটীকে স্থূল হইতে পৃথক করিয়া লইয়া স্থির করিয়া লইতে হয়, সূক্ষ্মদেহ স্থির না হওয়া পর্য্যন্ত পারদের ন্যায় স্বভাবতঃ চঞ্চল থাকে। আশ্রয় ব্যতিরেকে উহা একপ্রকার অব্যক্ত থাকিয়া যায় এবং আশ্রয় পাইলেও উহা আশ্রয় পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হয় বলিয়া স্থিরতা লাভ করিতে পারে না। সাধনার সুকৌশলে স্থির আশ্রয়ের সহকারিতায়, জীবের সূক্ষ্ম সত্তাকে স্থিতিশীল করা যাইতে পারে। এই স্থিতি আপেক্ষিক অথবা পূর্ণ তাহার আঁলোচনা এস্থানে অপ্রাসঙ্গিক। এই প্রণালীতে যে সিদ্ধদেহের আবির্ভাব হয় তাহাতে স্থূলদেহের সারাংশ গ্রথিত থাকে, অসার অংশটী বাহ্যাবরণের ন্যায় তাহাকে আচ্ছাদন করিয়া থাকে, ইচ্ছামাত্র তাহাকে পৃথক করিয়া ফেলা যায়, লৌকিক দৃষ্টিতে এই পৃথকীকরণকে মৃত্যু বলে। বস্তুতঃ ইহা "মৃত্যু" নহে। ইহা ইচ্ছাপূর্ব্বক জীর্ণবস্ত্র ত্যাগ বা সর্পের কঞ্চুক ত্যাগের ন্যায় সাধারণ ব্যাপার মাত্র। সূক্ষ্মসত্তাতে 'অহং' বোধ উদিত হয়, ইহা অহঙ্কার নহে, সূক্ষ্মসত্তা সিদ্ধ হইয়া গেলে এই বোধের স্থায়িত্ব সিদ্ধ হইয়া যায়—অর্থাৎ 'আমিত্ব' বোধটুকু অটুট থাকে। সাধারণ জীবের মৃত্যুতে 'আমিত্ববোধের' লয় হয় এবং পুনর্জন্ম হইলে 'আমিত্ব' বোধ নূতনরূপে আবির্ভূত হয়। যোগী ও সাধারণ জীবের দেহত্যাগে ইহাই ভেদ। (জাতিস্মরদের চৈতন্যের আবরণ শিথিল থাকে বলিয়া পূর্ব্বস্মৃতি অটুট থাকে।) সাধারণতঃ জীব ক্ষণিক বা অল্পকালস্থায়ী জ্ঞান ব্যতিরেকে স্থায়ী জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে না, চিত্তের চঞ্চলতাই তাহার একমাত্র কারণ। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে কায়সিদ্ধি হইলে জ্ঞান

১। গো. সি স. পৃ. ৫৩ শ্লোক ১১

সর্ব্বদা অখণ্ড ভাবেই উদিত থাকে, তাহার তিরোধান সম্ভবপর হয় না। জ্ঞানের তিরোধান না হইলে অজ্ঞানের আবির্ভাব কি প্রকারে হইতে পারে? মৃত্যু, প্রলয় বা নিগ্রহ অজ্ঞানের নামান্তর। অতএব একবার স্থিরজ্ঞান হইয়া গেলে ইহাদের অস্তিত্ব থাকে না। ইহাকেই 'মৃত্যুঞ্জয়' বলে, আচার্য্যগণ 'কালবঞ্চন' দ্বারা ইহারই নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

কালচক্রযান সম্প্রদায়েও কালকে ধ্বংস করিবার কথা আছে, শাস্ত্রীমহাশয় বলিয়াছেন কাল অর্থে 'দানব', তাহাকে ধ্বংস করিবার চক্রবিশেষ বলিয়া কালচক্রযান নাম হইয়াছে।[১] ওয়াডেল সাহেবের মতে উত্তর ভারতের কাশ্মীর ও নেপালে তন্ত্রের উদ্ভব হয়, তাহাতে মন্ত্রযানের সাধন প্রণালীর সহিত দানবাদিব সংযোগে 'কালচক্রযানের' উদ্ভব হয়।[২] এই কালচক্রযান মধ্যে 'পরাবৃত্তি' অর্থাৎ উল্টাসাধন ছিল,—ইহা মৃত্যুর পথে অগ্রসর না হইয়া উল্টাপথে অগ্রসর হওয়ার সাধন (যথা—ঘড়ির কাঁটা উল্টাইয়া দেওয়া) অতএব ইহাও 'সিদ্ধদেহ' লাভের সাধনা। স্থূলদেহ নাশে বিষণ্ণ হইবার কাবণ নাই, চর্য্যাপদে ইহার উল্লেখ পাই "কান্ধবিয়োএঁ মা হোহি বিষণ্ণা"।[৩] দেখা যাইতেছে, যৌগিক সম্প্রদায় মাত্রেই স্থূলদেহ ত্যাগে ভীত হইতেন না, তাহাকে সাধারণ ব্যাপার রূপে গণ্য করিতেন, ইহাই দেহসিদ্ধির প্রথম ধারা।

এই যে প্রথম ধারার উল্লেখ করা হইল তাহাতে 'মৃত্যু' বলিয়া কিছু না থাকিলেও, দেহত্যাগরূপ ব্যাপার আছে। এই কঞ্চুক ত্যাগের দ্রষ্টারূপে এবং কোন কোন স্থলে অধিষ্ঠাতৃরূপে চিন্ময়ী সূক্ষ্মসত্তা বর্ত্তমান থাকে। অর্থাৎ দেহত্যাগেরও দুইটী অবস্থা আছে: প্রথমটী ইচ্ছাধীন নহে ও দ্বিতীয়টী ইচ্ছাধীন। প্রথম অবস্থায় প্রারব্ধ কর্ম্ম অভিভূত হয় না বলিয়া দেহত্যাগ ইচ্ছাধীন নহে, এই অবস্থায় জ্ঞানমাত্র থাকে, কিন্তু ইচ্ছামৃত্যু সম্ভব হয় না। তথাপি দেহত্যাগকালে অজ্ঞান থাকে না বলিয়া যিনি দেহত্যাগ করেন তিনি জ্ঞানপূর্ব্বক দেহত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। এই প্রথম অবস্থায় ইচ্ছাপূর্ব্বক দেহত্যাগের সামর্থ্য থাকে না। কিন্তু দ্বিতীয়প্রকার অবস্থায় 'প্রারব্ধ ও কালশক্তি অভিভূত থাকে বলিয়া দেহত্যাগ ইচ্ছানুরূপ সময়ে, স্থানে ও উপায়ে করিতে পারা যায়।

১। উড়িষ্যায় বৌদ্ধ ধর্ম্ম নগেন্দ্রনাথ বসু, ভূমিকা, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পৃঃ ৮
২। ওয়াডেল, 'লামাধর্ম্ম' পৃঃ ১৫
৩। চর্য্যা ৪২।২

এক্ষণে পূর্ব্বে উল্লিখিত দেহসিদ্ধির দ্বিতীয় ধারার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যাত হইতেছে। এই ধারায় স্থূল দেহের অর্থাৎ ভৌতিক উপাদানে গঠিত দেহের আত্যন্তিক শুদ্ধি নিষ্পন্ন হয়, এইজন্য দেহে বর্জ্জনীয় অংশ কিছু থাকে না। যাঁহারা এই ধারণাকে অবলম্বন করিয়া দেহকে সিদ্ধ করেন, তাঁহাদের পক্ষে দেহত্যাগ আবশ্যক হয় না, কঞ্চুক বলিয়া তাঁহাদের পক্ষে বর্জ্জনীয় কিছু থাকে না, সমস্ত দেহটী শুদ্ধ উপাদানরূপে পরিণত হইয়া যায়। এই ধারায় পরিহারযোগ্য অংশ থাকে না, যদি দেহের ঐরূপ কোন অংশ থাকে, তবে বুঝিতে হইবে দেহসিদ্ধি সম্যক্ নিষ্পন্ন হয় নাই।

পাতঞ্জলযোগশাস্ত্রে 'কায়সম্পৎ' নামে এই দেহসিদ্ধির যথার্থ বর্ণনা করা হইয়াছে, পঞ্চভূতকে জয় করিবার ফলে কান্তিমান্ বজ্রবৎ দেহ লাভ হয়, ইহার বিশেষ বিবরণ ব্যাসভাষ্যে দ্রষ্টব্য।[১] তান্ত্রিকাচার্য্যগণ 'মন্ত্র-যোগ' বা শব্দসাধনার দ্বারা সিদ্ধদেহের উৎপত্তি বর্ণনা করিয়া থাকেন। অবিরত এক মন্ত্র জপের দ্বারা বৃত্তিসমূহ রুদ্ধ হয়, শরীর-মন সহজেই বিরাম পায়। তৎফলে শরীরে নবকান্তি দেখা দেয়, শরীব লঘু হয় ও অণিমাদি সিদ্ধি হয়।

দেহসাধনের মূলে বিন্দুপ্রবাহের স্থিরতা ও শুদ্ধতা সম্পাদনপূর্ব্বক ঊর্দ্ধদিকে আকর্ষণ অত্যন্ত আবশ্যক। বিন্দুর গতি ঊর্দ্ধমুখী না হইলে অন্তঃকরণ, বাহ্যেন্দ্রিয় এবং দেহের উপাদানস্বরূপ ভৌতিক সত্তা সবগুলিকে সমষ্টিগতভাবে বিগলিত কবিয়া, একটী নিরন্তরবাহী স্রোতের ন্যায় ঊর্দ্ধ-দিকে সঞ্চালিত করিতে হয়। এই স্রোত যতই ঊর্দ্ধমুখ হইতে থাকে, ততই তাহা ক্রমশঃ অধিকতর বিশুদ্ধ হইতে হইতে চরম অবস্থায় চিন্ময়তা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহা নির্ম্মল ও আনন্দময় বিজ্ঞানপ্রবাহরূপে আত্মপ্রকাশ করে। যাহাকে যোগিগণ সাধারণতঃ 'নাদানুন্ধান' বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন, ইহা তাহারই সহিত সংশ্লিষ্ট। কুণ্ডলিনী শক্তি বিক্ষুব্ধ হইয়া অর্থাৎ চিৎশক্তির স্পর্শে কুণ্ডলিনী শক্তি স্পন্দিত ও উদ্বুদ্ধ হইয়া যখন নাদরূপে প্রবাহিত হইতে থাকে, তখনি এই ঊর্দ্ধমুখ ধারার সূত্রপাত হয়। বস্তুতঃ ইহা প্রকৃতির নিত্যসিদ্ধ ব্যাপার। মন ও তৎসহযোগে প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদি বহির্ম্মুখ থাকা পর্য্যন্ত ইহা অনুভব করা যায় না। 'নাদ' শব্দ-ব্রহ্মের স্ফুরণ অবস্থা, ইহা ধ্বন্যাত্মক শব্দ, বর্ণরূপী শব্দ নহে, ইহা বলাই

১৬। পাতঞ্জলযোগদর্শন, বিভূতিপাদে "ততোঽণিমাদিপ্রাদুর্ভাবঃ কায়সম্পৎ তদ্ধর্ম্মানভিঘাতশ্চ (৪৫ সূত্র) রূপলাবণ্যবলবজ্রসংহননত্বানি কায়সম্পৎ (৪৬ সূত্র)।"

বাহুল্য। নাদের উদ্গমে বর্ণসকল উহাতে মিলিয়া আত্মবিসর্জ্জন করে। এইভাবে বিন্দু হইতে নাদ উদ্গত হইয়া পুনর্ব্বার বিন্দুতে যাইয়াই আত্ম-সমর্পণ করে। মন প্রভৃতি অন্তঃকরণ ও বাহ্য ইন্দ্রিয়ের শক্তি, নাদের অনুগতভাবে তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া ধাবিত হয়, তাহাদের পৃথক সঞ্চারশক্তি থাকে না।

নাদের ঊর্দ্ধগতি যতই বাড়িতে থাকে ততই নাদ ক্রমশঃ ক্ষীণতর হইতে থাকে, এইরূপ উপলব্ধি হয়। বস্তুতঃ ইহা মনের ক্রমিক সূক্ষ্মতারই নিদর্শন। চরম অবস্থায় মনের স্থূলতা পরিহৃত হয় ও মন নিশ্চল হইয়া যায়, তখন নাদ আর শ্রুত হয় না, অর্থাৎ নাদ নিত্যসিদ্ধ হইলেও মনের পৃথক সত্তা থাকে না বলিয়া তাহার উপলব্ধি থাকে না। এই প্রকারে নাদ ও মনের অতীত অবস্থার উন্মেষ হয়, ইহাকেই চৈতন্য বা জ্ঞানের বিকাশ বলে। সাধক যে কোন উপায়ে সাধনা করিলেও এই সাধনফল অবশ্যম্ভাবী। দেহসিদ্ধ করিতে হইলে এই চৈতন্যময়ী শক্তিকে আশ্রয় করিয়াই দেহরূপ জড়সত্তাকে চৈতন্যময় করিয়া লইতে হয়, তখন বস্তুতঃ পঞ্চভূত ও ভৌতিকসত্তা এবং তৎসহ চিত্তসত্তা উভয়ই শুদ্ধ হইয়া চিন্ময়তা লাভ করে।

সিদ্ধদেহকে অর্থাৎ শুদ্ধদেহকে 'প্রণবতনু' অথবা 'মন্ত্রদেহ' বলা হয়। ইহাই দিব্যদেহ, জ্যোতির্ম্ময়, ইহাতে জরামৃত্যু, ক্ষুৎপিপাসা, কামক্রোধাদি জড়দেহ সংক্রান্ত ধর্ম্মের বাস্তব সত্তা নাই। বলা বাহুল্য, শুদ্ধদেহ লাভ না করিয়া সাধক চিৎসমুদ্রে প্রবেশ করিতে পারিলেও উহা আত্মবিনাশের নামান্তর, কারণ ঐ অবস্থায় চৈতন্যের সংরক্ষণ সম্ভবপর হয় না এবং বিরাট সুষুপ্তিতে সাধক নিমগ্ন হইয়া যান। যোগীর পক্ষে এই অবস্থা বাঞ্ছনীয় নহে, কারণ দেহকে আশ্রয় না করিতে পারিলে চৈতন্যশক্তি তিরোহিত হইয়া অব্যক্ত হইয়া যায়। প্রচলিত ভৌতিক দেহ চঞ্চল ও পরিবর্তনশীল হইলেও চৈতন্যের আত্মবিকাশের ক্ষেত্র, ইহার মলিনতা ইহার একমাত্র দোষ। যোগিগণ বলেন, এই মলিনতা দূর করিয়া একটী অক্ষত দেহের স্থিতির ব্যবস্থা করিতে পারিলে চৈতন্যের লোপ কখনই হইবে না, ইহাই মৃত্যুঞ্জয়। এই অক্ষত দেহই সিদ্ধদেহ। পাঞ্চরাত্রীয় বৈষ্ণব আচার্য্যগণ শুদ্ধদেহকে বিশুদ্ধ সর্ব্বময় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, এই বিশুদ্ধ সত্ত্ব অপ্রাকৃত, অতএব এই দেহ যে প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক দেহ নহে তাহা নিশ্চিত।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, প্রাকৃত দেহকেই কোন একটী ধারা অবলম্বন করিয়া শুদ্ধ করিয়া লইতে হয়, তখনই অশুদ্ধদেহের পরিবর্ত্তে শুদ্ধদেহের প্রাপ্তি ঘটে, কিন্তু এই শোধনের জন্য শুদ্ধ সত্তার বীজ আবশ্যক হয়। স্থূলদেহে যে সকল দোষ জড়িত থাকে, সাধনা দ্বারা তাহা দূর করাই নাথদের আদর্শ। ইহা দ্বারা রোগ, জরা, মৃত্যু প্রভৃতি শারীরিক বৈকল্য দূর হয়। নাথযোগিগণ বলেন, যোগিগুরু 'মহাজ্ঞান' সঞ্চার করিয়া শুদ্ধসত্তার বীজ প্রদান করিয়া থাকেন। সাধক জপাদি ক্রিয়াসাধন দ্বারা ঐ গুরুদত্ত বীজকেই ক্রমশঃ বিকশিত করিতে থাকে। ইহাই শুদ্ধসত্তায় ক্রমবিকাশরূপ ক্রিয়া। ইহার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অশুদ্ধসত্তা সম্পূর্ণভাবে বিশুদ্ধ হইয়া শুদ্ধ সত্তার অনুগমন করে, অথবা সার ও অসার দুইভাগে বিভক্ত হইয়া সারাংশ শুদ্ধ সত্তাতে প্রেরণ করে এবং অসার অংশ একটী বাহ্য আবরণের ন্যায় কিঞ্চিৎকালের নিমিত্ত শুদ্ধ সত্তাকে আচ্ছাদন করিয়া বর্ত্তমান থাকে।

এই বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, সিদ্ধদেহ এক প্রকারের 'অযোনিজ' দেহ, তাই উহা শুদ্ধ। স্থূলদেহের যাহা স্বাভাবিক মলিনতা, যাহাকে খৃষ্টানেরা 'আদিপাতক'রূপে বর্ণনা করেন তাহা ইহাতে নাই। সেই নিমিত্ত জ্ঞানদান ও জ্ঞানগ্রহণের পক্ষে ইহাই প্রকৃত বাহন। প্রায় সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের আদি প্রতিষ্ঠাতাকে এই নিমিত্ত 'ঈশ্বরসন্তান' প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া হয় বা কুমারীর গর্ভজাত বলা হয়, অর্থাৎ অযোনিজ উদ্ভব কল্পনা করা হয়। নাথমার্গেও গোরক্ষকে 'ঈশ্বর-সন্তান' ও মৎস্যেন্দ্রকে 'মৎস্যজাত' বলা হইয়াছে এবং ইহার প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং আদিনাথ বা মহাদেব।

মানবদেহে ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীদ্বয় চন্দ্র ও সূর্য্যের প্রতীক। ঊর্দ্ধগতির সময়ে অর্থাৎ কুণ্ডলিনী-প্রবাহ ঊর্দ্ধমুখ হওয়ার সময়ে এই চন্দ্র ও সূর্য্য উভয়ের মিলন হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে বলা যাইতে পারে যে, চন্দ্রসূর্য্য বা চন্দ্রসূর্য্যঅগ্নিকে এক স্রোতে প্রবাহিত করিতে না পারিলে চৈতন্যের প্রবাহ উপলব্ধ হয় না।

ইড়াপিঙ্গলা বশীভূত হইলে, মন ও বায়ুর স্থিরতা স্বতঃই সম্পাদিত হয়, ইহার দ্বারা প্রজ্ঞার উন্মেষ বা কুণ্ডলিনীর জাগরণ হয়। ষট্চক্রভেদ দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ হয় এবং ভূতজয় দ্বারা শক্তিলাভ সম্ভব হয়। নাথমার্গের সাধনে মূলা বা নাভিস্থান হইতে মনস্এর ঊর্দ্ধগতি সম্পাদিত

হয়, কিন্তু সুষুম্নাপথ উন্মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত শিবশক্তির সামরস্য সাধন হয় না। কেবল জ্ঞান দ্বারা এই পথ মুক্ত হওয়া কঠিন, তাই নাথসিদ্ধ দেহকে আশ্রয় করিয়া যোগ সাধন করিতে বলেন। যোগদ্বারা মানবের স্বাভাবিক অপক্ব দেহকে পক্ব করাই নাথযোগীর প্রধান লক্ষ্য। ইহাদ্বারা শীতোষ্ণতা ও জরামৃত্যু জয় হয় এবং মোক্ষলাভ হয়। এই যোগাগ্নি দ্বারা পক্ব দেহই সিদ্ধদেহ, এই দেহলাভ হইলে পরে দিব্যদেহ লাভ সম্ভব হয়। যোগবীজে শঙ্কর বলিয়াছেন—

জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তোঽপি ধর্ম্মজ্ঞো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
বিনা দেবোঽপি যোগেন ন মোক্ষং লভতে প্রিয়ে॥[১]

সিদ্ধদেহ লঘু, ইহা চিন্তার গতির ন্যায় ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন, যে-কোন রূপ ধাবণে সমর্থ এবং যথেচ্ছ গমনে সমর্থ। ইষ্টক-প্রাচীর, জল, অগ্নি, বায়ু প্রস্তরাদি ভেদ করিয়া ইহার গমনে সামর্থ্য আছে। ইহা শূন্য মধ্যে অদৃশ্য হইতে পারে, আবার একই সময়ে বহুমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইতে পারে। প্রসর ও সঙ্কোচ সাধনে এই দেহ পটু, দেবমধ্যেও এই দেহ দুর্ল্লভ, ইহা শুদ্ধ আকাশ হইতেও শুদ্ধতর। রসহৃদয়তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

এবং রসসংসিদ্ধো দুঃখজরামরণবর্জিতো গুণবান্।
খে গমনেন চ নিত্যং সংচরতে সকলভুবনেষু॥
দাতা ভুবনত্রিতয়ে স্রষ্টা সোঽপীহ পদ্মযোনিরিব।
ভর্ত্তা বিষ্ণুরিব স্যাৎ সংহর্ত্তা রুদ্রবদ্গতিঃ॥[২]

যোগবীজেও উক্ত হইয়াছে পবনজয়ের আবশ্যকতা আছে, পবনজয় দ্বারা পিণ্ডস্থৈর্য্য সম্পাদিত হয় ও চিত্তশুদ্ধি হয়, তৎফলে স্বাত্মজ্ঞান হয়।

যো জিত্বা পবনং মোহাদ্ যোগমিচ্ছতি যোগিনঃ।
সোঽপক্বকুম্ভমারুহ্য সাগরং তর্ত্তুমিচ্ছতি॥৭৭॥
যস্য প্রাণো বিলীন স্তৎ সাধকে জীবিতে সতি।
পিণ্ডো ন পতিত স্তস্য চিত্তং দোষৈঃ প্রমুচ্যতে॥৭৮॥
শুদ্ধে চেতসি তস্যৈব স্বাত্মজ্ঞানং প্রকাশতে।[৩]

সকল যুগের রহস্যবাদীদের মধ্যে প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বারা শুদ্ধ দেহলাভের ঈপ্সা লক্ষিত হয়। হঠযোগ, তন্ত্র, রসায়ন শাস্ত্রে শুদ্ধদেহের উল্লেখ বারম্বার দেখা যায়। যোগাগ্নি দ্বারা সপ্তধাতুময় দেহ দগ্ধ হইলে

১। যোগবীজ ৩১ শ্লোক। ২। রসহৃদয়তন্ত্রম্ ১৯।৬৩,৬৪
৩। যোগবীজ ৭৭, ৭৮, ৭৯

যোগদেহ লাভ হয় (যোগবীজ, ৪৯ শ্লোক)। চিত্তরোধের সহিত বায়ু-নাশ না হইলে সকল সাধনা ব্যর্থ, নাত্মপ্রতীতি র্ন গুরুর্ন মোক্ষঃ (যোগবীজ, ১২৯ শ্লোক)। যোগীর সাধনবলে তাঁহার দেহ ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়, যেমন সৈন্ধব জলতা প্রাপ্ত হয়, এই ব্রহ্মময়ত্বই মুক্তি, তাঁহার প্রাণের বহিরাগমন নাই, অতএব তাঁহার মৃত্যু কোথায় ?

> ন বহি প্র্াণ আয়াতি পিণ্ডস্য পতনং কুতঃ।
> পিণ্ডপাতেন যা মুক্তিঃ সা মুক্তিঃ কথ্যতে পুনঃ ॥১৭৩।
> দেহো ব্রহ্মত্বমায়াতি জলতাং সৈন্ধবং যথা।
> অনন্যতাং যদায়াতি তদা মুক্তঃ স উচ্যতে ॥১৭৪।
> চিন্ময়ানি শরীরাণি ইন্দ্রিয়াণি তথৈব চ।[১]

ইহার দ্বারা নাথযোগীর দেহ রূপান্তরিত হইবার প্রক্রিয়া সূচিত হইতেছে। চন্দ্রসূর্য্যের একতা সম্পাদনে চিত্তলয় এবং চিত্তলয়ের সহিত বায়ুজয় প্রধান কর্ত্তব্য; নিরন্তর অভ্যাসফলে দেহ ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া চিন্ময় শরীর ও চিন্ময় ইন্দ্রিয়াদি লাভ হইবে। রসেশ্বর সম্প্রদায়ের প্রক্রিয়া ভিন্ন, তাঁহারা বলেন 'দেহবেধ'রূপ ক্রিয়া দ্বারা সিদ্ধদেহ লাভ সম্ভব। যদি লোহবেধ অর্থাৎ লৌহকে স্বর্ণে পরিণত করা সম্ভব হয়, তবে দেহবেধ সম্ভব হইবে না কেন? তাই 'রস' অর্থাৎ পারদ দ্বারা দেহসিদ্ধিলাভের প্রক্রিয়া তাঁহারা বর্ণনা করিয়াছেন। পারদসহ অভ্রক ও গন্ধকের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। সিদ্ধদেহকে রসময়ী তনু বা হরগৌরীসৃষ্টিজ তনু বলা হইত, কারণ রস শিববীর্য্য, শুক্ল ও স্বচ্ছ, ইহা হরসৃষ্টি; অভ্রক গৌরীসৃষ্টি, তাই হরগৌরীসৃষ্টিজ তনুর উৎপত্তি। পারদের ক্রিয়া জীবদেহে দেখা যায়, উহা দ্বারা স্থৈর্য্য সম্পাদিত হয়। শিবই রসেশ্বর এবং শিবে-জীবে ভেদ নাই। রসেশ্বর দর্শনকার বলেন, প্রত্যভিজ্ঞা দ্বারা মোক্ষ হয় না, রসসাধনে দৈহিক স্থৈর্য্য সম্পাদন করিয়া তৎপরে যোগাভ্যাস দ্বারা মুক্তিলাভ সম্ভব। পারদের দ্বারা বর্ত্তমান দেহেই স্থৈর্য্য সম্পাদিত হইয়া মুক্তিলাভ সম্ভব হয় ইহাই জীবমুক্তি। দেব, দৈত্য, মুনি, ঋষি, অনেকেই এই পন্থা অবলম্বন করিয়া জীবন্মুক্ত হইয়াছেন।[২]

মহাদেবের যে প্রচ্যুত বীর্য্য ধরণীতলে পতিত হয় তাহাই

১। যোগবীজ, ১৭৩-১৭৫ শ্লোক। ২। সর্বদর্শনসংগ্রহ—রসেশ্বরদর্শনম্, শ্লোক ৭-৮।

পারদরূপে পরিণত হয়, ইহা সংসারের পরপার-প্রাপ্তির হেতু বলিয়া 'পারদ', তাই যাবতীয় ধাতুর মধ্যে পারদই শ্রেষ্ঠ। পারদকে রস বলা হয় কেন? ভাবমিশ্র ভবপ্রকাশে বলিয়াছেন—

রসায়নার্থিভির্লোকৈঃ পারদো রস্যতে যতঃ।
ততো রস ইতি প্রোক্তঃ স চ ধাতুরূপি স্মৃতঃ॥[১]

অর্থাৎ রসায়ন হিসাবে লোকের দ্বারা পারদ রসিত বা ভক্ষিত হয় বলিয়াই ইহা 'রস' নামে অভিহিত হয়, ইহাকে ধাতুও বলে, ইহাই রসের নিরুক্তি। পারদের অশেষপ্রকার গুণ আছে। বর্ণভেদে পারদ চতুর্ব্বিধ— শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ। পারদ ব্যবহারে খেগমন আদি সিদ্ধিলাভ হয়। যোগসূত্রেও (৪।১) ব্যাসভাষ্যে আছে, অসুরভবনে রসায়নাদির দ্বারা সিদ্ধিলাভ হইত, তদ্বিষয়ে অধুনা লোকের অভিজ্ঞতা নাই। রসায়ন দ্বারা দৈহিক পরিবর্ত্তন অবশ্যই সাধিত হইত।

এই দৃশ্য জগৎ অনিত্য, স্থূলদেহও অনিত্য, কিন্তু ষাট্‌কৌশিক এই দেহ অনিত্য হইলেও, রসাভ্রক পদবাচ্য হরগৌরী সৃষ্টিজাতের নিত্যত্ব উৎপন্ন হইয়া থাকে। রসহৃদয়তন্ত্রমতে যাঁহারা স্বশরীরে হরগৌরীর সৃষ্টিজাত্তব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই রসসিদ্ধ এবং তজ্জন্য সকল লোকের বন্দনীয়, সমুদায় মন্ত্র তাঁহাদের কিঙ্কর।[২] রসহৃদয়ে উক্ত হইয়াছে—

যে চাত্যক্তশরীরা হরগৌরীসৃষ্টিজা তনুং প্রাপ্তাঃ।
বন্দ্যা স্তে রসসিদ্ধা মন্ত্রগণাঃ কিঙ্করা যেষাম্॥১।৭

এই শ্লোকে 'অত্যক্তশরীরা' অর্থে যাঁহাদের দ্বারা শরীর ত্যক্ত হয় নাই তাঁহাদের বুঝাইতেছে। তাঁহারাই জীবন্মুক্ত। শরীর দ্বিবিধ—স্থূল ও সূক্ষ্ম; পঞ্চভূতাত্মক শরীর স্থূল, এবং 'কোশত্রয়াত্মকং সূক্ষ্মম্' অর্থাৎ বিজ্ঞানময়, মনোময় ও প্রাণময় কোশত্রয় দ্বারা মিলিত শরীর সূক্ষ্ম। রসসিদ্ধেরা অত্যক্তশরীর লইয়া ত্রিলোকে বিচরণ করেন। রসেশ্বরদর্শনকার বলিয়াছেন, ষড়্‌দর্শনে পিণ্ডপাতানন্তর মুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই মুক্তি হস্তামলকবৎ প্রত্যক্ষ হইলেও উপলব্ধি হয় না। সেইজন্য রস ও রসায়ন সাহায্যে পিণ্ডের রক্ষা কর্ত্তব্য।

ডাঃ রমন শাস্ত্রী দেখাইয়াছেন যে, খৃঃ পূঃ যুগ হইতে এ দেশে রস-সাধন বা পারদের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। সম্ভবতঃ 'ভোগ' নামে

১। দর্শনপরিচয়, গোপাল সেন, পৃ ১২৬-২৭।
২। রসহৃদয়তন্ত্রম্ ১।৭, রসেশ্বরদর্শন—সর্বদর্শনসংগ্রহে ৬ শ্লোকের টীকা।

'তাও' সাধক চীনদেশ হইতে আসিয়া ভারতে ইহার প্রচলন করেন। খৃঃ পূঃ বহু শতাব্দী হইতে সিদ্ধ-সম্প্রদায়ের সাধন চলিতেছে, তন্মধ্যে মাহেশ্বর সিদ্ধ সম্প্রদায় প্রাচীনতম, তাহাদের অলৌকিক কাহিনীসকল অদ্যাপি দক্ষিণ ভারতে প্রসিদ্ধ। (C. H. I., Vol. II)

প্রসঙ্গতঃ এস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, পারদ এবং গন্ধক সাহায্যে দৈহিক পরিবর্ত্তন ক্রিয়ার সাধন পাশ্চাত্য দেশেও প্রচলিত ছিল। মধ্যযুগে রজিক্রুসিয়ান নষ্টিক (Gnostic), কোয়াইটিষ্ট প্রভৃতি সম্প্রদায় ক্যাথলিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করেন (এ যুগের থিয়োসফিষ্টরা অনেকটা এইরূপ) ; এই সকল সম্প্রদায় মধ্যে অতীন্দ্রিয় রহস্যময় সাধন প্রচলিত ছিল। নষ্টিকেরা রহস্যবাদের সহিত মন্ত্রবিদ্যার যোগ করেন। রহস্যবাদে 'অহং' জ্ঞান উপলব্ধি পর্য্যন্তর সাধন আছে, মন্ত্রবিদ্যায় 'আমি জানিতে চাহি'র পর্য্যন্ত সাধন আছে। পরমসত্তাকে উপলব্ধির দুইটী পথ আছে, মন্ত্রাদি দ্বারা বা মনের দ্বারা (Mysticism পৃঃ ৭০)। ইহুদীদের মোসেস রচিত গ্রন্থে একটী বিচিত্র অনুষ্ঠান-পদ্ধতি আছে, তাহাকে তন্ত্রোক্ত কুণ্ডলিনীর জাগরণ বলা যায়।[১] নব্যযুগে নব্য উপায়ে আমেরিকায় এই সাধন চলিতেছে।[২] অতএব রহস্যবাদের সহিত অভ্যাসজনিত কার্য্যেরও সম্বন্ধ আছে, উহা কাল্পনিক কার্য্য মাত্র নহে (Mysticism পৃঃ ৮২)। আবার রহস্যবাদের সহিত সকল দেশেই সাঙ্কেতিক ভাষার ব্যবহার দেখা যায়, সপ্তদশ শতাব্দীতে উইলিয়াম ল ও তাঁহার গুরু যে গ্রন্থ রচনা করেন তাহা এখন দুর্ব্বোধ্য ; তাহাতে 'লীনা' অর্থে রৌপ্য, 'সল' অর্থে স্বর্ণ, 'স্পর্শমণি' তৈয়ারির পরিভাষা হইল পরমাত্মার জন্য ক্ষুধা, ইত্যাদি। Coventry Patmore তাঁহার রচিত Spousa Dei গ্রন্থ নষ্ট করিয়া যান। Mrs. Atwood "A Suggestive Enquiry into the Hermetic Mystery" রচনা করিয়াও গোপন করিতে বাধ্য হন। লবণ, গন্ধক ও পারদ ব্যবহারে ইঁহারা শরীরের পরিবর্ত্তন সাধন করিতেন, তন্মধ্যে পারদই প্রধান ছিল। কিন্তু এই পারদাদি আমাদের ব্যবহৃত সাধারণ ধাতু নহে, উহারা বৈজ্ঞানিক ক্রিয়ায় প্রস্তুত বিশেষ গুণযুক্ত ধাতু। আবার লবণ ও গন্ধক, দেহ ও আত্মার প্রতীকরূপে ব্যবহৃত

১। Hermetic Sciences. How to Wake the Solar Plexus ? See 'Mysticism', Underhill Ch. VI.

২। হঠযোগ, যোগী রামচরক, শিকাগো, বিংশতি অধ্যায়—Solar Plexus.

হইত ; অর্থাৎ গন্ধক হইতেছে প্রাকৃতিক স্বভাব, তাহাতে বুদ্ধিরূপ লবণ দ্বারা সিঞ্চন কর্ত্তব্য ; পারদ হইতেছে 'আত্মা', কেবল বিজ্ঞেরা ইহাদের সন্ধান জানেন। চন্দ্র ও সূর্য্যের রশ্মি হইতে এই পারদ সংগৃহীত হয়, ইহাই স্বর্ণ ও রৌপ্য অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোজক। মানব-মধ্যে এই তিনটীর অস্তিত্ব আছে। মন্দাগ্নিতে উহাদের দগ্ধ করিলে দৈহিক পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য। এই তিনটী মৌলিক সত্য যথাক্রমে কৃষ্ণ, শ্বেত ও রক্তবর্ণের। ইহাই রহস্যবাদীর তিনটী ক্রমঃ Purgation, Illumination এবং Union। মানবদেহ কৃষ্ণ, শ্বেতপারদের স্পর্শে ইহা নির্ম্মল হয় এবং রক্তবর্ণ দ্বারা জীবাত্মা-পরমাত্মায় (রৌপ্য ও স্বর্ণ) সংযোগ সাধিত হয়। স্পর্শমণির সন্ধানই হরিদ্বর্ণের সিংহের সন্ধান অর্থাৎ মানবের বল আছে তাই সে সিংহ, হরিত অর্থে অপক্ক, অতএব মানব যে 'রূপ' ধারণ করিয়া আছে সেই 'রূপ'কে বধ করিয়া 'নবরূপ' ধারণ করাই উদ্দেশ্য।[১] ইহাই পাশ্চাত্যের রস দ্বারা কায়সিদ্ধি।

ইহা যোগবীজের পক্ক ও অপক্ক দেহের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। পক্কদেহই যোগদেহ বা সিদ্ধদেহ, যোগী এই দেহলাভের কামনা করেন। রসেশ্বর সম্প্রদায়ের অনেক গ্রন্থ এখন লুপ্তপ্রায়, সাঙ্কেতিক পরিভাষা ব্যবহৃত হওয়ায় রসবিদ্যার গ্রন্থাদিও দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছে। তাই রসবিদ্যা বেদের ন্যায় অনাদি হইলেও অধুনা প্রায় লোপ পাইয়াছে।

গোরক্ষ, দত্তাত্রেয়, নবনাথ, নাগার্জ্জুন প্রভৃতি রসসিদ্ধ ছিলেন। নাগার্জ্জুন বৌদ্ধ রাসায়নিক ও মহাসিদ্ধ ছিলেন। তিনি সিদ্ধতান্ত্রিক যোগী রূপে খ্যাত। তাঁহার বহু উপযুক্ত শিষ্য ছিল ; সিদ্ধেরাও অনেকে তাঁহার শিক্ষা দ্বারা প্রভাবান্বিত হন। হঠযোগী হইলেও নাথদের রসায়ন শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি ছিল, তাই রসায়নী মহাবিদ্যার উল্লেখ নাথমার্গের গ্রন্থে পাওয়া যায় (গো. সি. স. পৃঃ ৪৫)। তন্ত্রের প্রচারক সরহ।[২] কিন্তু একাধিক সরহ ছিলেন। নালন্দার প্রধান পুরোহিত সরহের শিষ্য নাগার্জ্জুন, তিনি নালন্দায় রসায়ন শিক্ষা করেন।[৩]

শঙ্করের প্রপরমগুরু শ্রীমদ্‌গোবিন্দভগবৎ পদাচার্য্য রসসিদ্ধ ছিলেন এবং কায়সিদ্ধি জানিতেন। তাঁহার রচিত রসহৃদয়তন্ত্রে তিনি উপদেশ

১। রহস্যবাদ, অণ্ডারহিল, দ্বাদশ সংস্করণ, ষষ্ঠ অধ্যায় পৃঃ ১৪০ ইত্যাদি পৃঃ ৭০।৮২
২। সাধনমালা, ২য় খণ্ড, ভূমিকা, পৃঃ xliv.
৩। History of Bengal, Vol. I, Dr. De's article, p. 419

দিয়াছেন যে, ধন, শরীর এবং ভোগ সকলই অনিত্য জানিয়া মুক্তির জন্য যত্ন করিবে। এই মুক্তি জ্ঞান দ্বারা লভ্য, জ্ঞান অভ্যাস দ্বারা লভ্য, এবং দেহের স্থিরতা সম্পাদন হইলে এই অভ্যাস হইয়া থাকে (১।১০)।

দেবদৈত্য মুনি মানবাদি রসসামর্থ্য বলে দিব্যদেহ আশ্রয় করিয়া জীবন্মুক্ত হইয়াছেন, রসেশ্বরসিদ্ধান্তের দ্বারা।এইরূপ জ্ঞাত হওয়া যায়—

দেবাঃ কেচিন্মহেশাদ্যা দৈত্যাঃ কাব্যপুরঃসরাঃ।
মুনয়ো বালখিল্যাদ্যা নৃপাঃ সোমেশ্বরাদয়ঃ॥
গোবিন্দভগবৎ পাদাচার্য্যো গোবিন্দনায়কঃ।
চর্ব্বটিঃ কপিলো ব্যালিঃ কাপালিঃ কন্দলায়নঃ॥
এতেঽন্যে বহবঃ সিদ্ধা জীবন্মুক্তা শ্চরন্তি হি।
তন্নুং রসময়ীমাপ্য তদাত্মককথাচণা॥[১]

শঙ্কর-সম্প্রদায় মতে গৌড়পাদ ও গোবিন্দপাদ উভয়েই সিদ্ধযোগী ছিলেন। ইঁহারা ইচ্ছামত কাল অবধি দেহরক্ষা করিতে সমর্থ ছিলেন। দেবীভাগবত মতে গৌড়পাদ ব্যাসপুত্র শুকদেবের সন্তান। শুকদেব ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, পিতৃ-অনুরোধে গৃহে ফিরিয়া আসেন, কিন্তু ছায়ারূপে আসেন ; সেই ছায়ারূপী শুকদেবের সন্তান হইলেন গৌড়পাদ। গৌড়পাদের গুরু গোবিন্দপাদ এক সময়ে পতঞ্জলিরূপে ভূতলে অবতীর্ণ হন এবং যোগবলে শঙ্করের আবির্ভাবকাল পর্য্যন্ত দেহরক্ষা করেন এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে।[২] যোগীরা সিদ্ধদেহে দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতেন, এস্থানে এইরূপ অনুমানই সঙ্গত। শঙ্কর গোবিন্দপাদের নিকট খেগমন, পরকায়-প্রবেশ, নর্ম্মদার জলস্তম্ভন প্রভৃতি সিদ্ধিলাভ করেন। শঙ্করের পরকায়-প্রবেশ কাহিনী সুবিদিত। শঙ্কর অধিমাত্রতর সাধক ছিলেন, অর্থাৎ মাত্র তিন বৎসরের মধ্যে তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। হঠযোগের অমৃত-সিদ্ধি নামক গ্রন্থে মন্দ, মধ্যম, অধিমাত্র ও অধিমাত্রতর অধিকারীর লক্ষণ আছে।[৩] রস ঈশ্বরের স্বরূপ, প্রত্যেক জড়চেতন পদার্থে ইহা ন্যূনাধিক পরিমাণে বর্ত্তমান আছে। বাল্যাবস্থায় শরীরে এই রসের পরিমাণ অধিক থাকায় দেহ কান্তিপূর্ণ দেখায়, বয়োবৃদ্ধির সহিত মলের আধিক্যে ও রসের ন্যূনতায় মনুষ্য বৃদ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। রস যেমন স্পর্শমণির

১। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ—রসেশ্বরদর্শনম্, ৮-১০ শ্লোক।
২। আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ, রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, ১৮৪৮ শকাব্দ, ২য় সং পৃ ৬৩৮।
৩। ঐ পৃ ৮৮৯।

ন্যায় লৌহকে স্বর্ণে পরিণত করে, মানবদেহকেও সেইরূপ অজর অমর করে। মনুষ্য মধ্যে যে দৈবী শক্তি আছে তাহার বিকাশে ব্যাধি প্রতিবন্ধক স্বরূপ। রসসিদ্ধ হইলে রোগাদি দূর হয়, ঋদ্ধিসিদ্ধি করতলগত হয়, বিশ্বরচনা সম্বন্ধে অনুভবসিদ্ধ জ্ঞান হয় এবং মনুষ্য ঈশ্বরের ন্যায় হইতে পারে। সদ্‌গুরু এই জ্ঞানদানে সমর্থ। এই রস পারদ ও গন্ধকের মিশ্রণ, ইহারা সাধারণ পারদ বা গন্ধক নহে। এই পারদ একপ্রকার তীক্ষ্ণজল, সূর্য্য ইহার পিতা, চন্দ্র ইহার মাতা। পারদ ও গন্ধকের নামান্তর কন্যা ও সিংহ অথবা স্ত্রী ও পুরুষ। রসসিদ্ধির ক্রিয়াদ্বারা ইহার এক রতি মাত্র সেবন করিলে শরীরের রূপান্তর-প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। পণ্ডিত শ্রীনারায়ণ দামোদর শাস্ত্রী ইহার প্রয়োগ বিষয়ে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন।[১]

তিব্বতী লামাদের মধ্যে শবাহার দ্বারা দৈহিক পরিবর্ত্তন ক্রিয়া অনুমোদিত। অবশ্য এই শব যে ব্যক্তির, তাঁহার দেহ আধ্যাত্মিক সাধনার দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ইহাই তাঁহাদের বিশ্বাস। লামাদের মতে সাধনার দ্বারা এমন আধ্যাত্মিক পারদর্শিতা জন্মে যে জড়বস্তুর পরিবর্ত্তে সূক্ষ্মবস্তু সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া থাকে, কিন্তু বাহির হইতে স্বল্প ব্যক্তি সে পরিবর্ত্তন বুঝিতে সক্ষম। এই রূপান্তরিত দেহের মাংসখণ্ডটুকু আহার করিলে আহারকারীর অলৌকিক ক্ষমতা-প্রাপ্তি অনিবার্য্য। এই লামা সম্প্রদায় মধ্যে দেহস্থ 'চক্র'র সাধনা আছে, শক্তিকে সহস্রারে নীত করা ইহাদের সাধনা (পৃ ২৫৭)। জনৈক লামার শবাহার কাহিনী একজন ইংরাজ মহিলা বর্ণনা করিয়াছেন।[২]

রসেশ্বরদর্শন 'রস' দ্বারা যাহা সাধন করিতে উপদেশ দেন, হঠযোগ সম্প্রদায় বায়ুজয় দ্বারা তাহা সাধন করিতে বলেন। উভয়ের লক্ষ্য এক, পন্থা ভিন্ন। কর্ম্মযোগ দ্বারা দেহধারণ বা স্থৈর্য্য সম্পাদিত হয়, এই দৈহিক স্থৈর্য্য সম্পাদনের দ্বিবিধ উপায় আছে—রস ও পবন। রসেশ্বর-দর্শনকারও বলিয়াছেন—

> কর্ম্মযোগেন দেবেশি প্রাপ্যতে পিণ্ডধারণম্।
> রসশ্চ পবনশ্চেতি কর্ম্মযোগো দ্বিধা স্মৃতঃ ॥[৩]

১। রসসিদ্ধি, শ্রীনারায়ণ দামোদর শাস্ত্রী—কল্যাণ সাধনাঙ্ক. ২য় খণ্ড, পৃ ৮৫১-৮৫৬।
২। With Mystics and Magicians in Tibet, David Neel. pp. 126, 257.
৩। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ—রসেশ্বরদর্শনম্ ১১ শ্লোক।

রস বা বায়ু সাধন দ্বারা দৈহিক স্থৈর্য্যলাভ হয় বলা হইল, কিন্তু হঠযোগ ও রসেশ্বর প্রণালীদ্বয় দ্বারা দেহকে অজর, অমর বা শুদ্ধ করিতে সক্ষম হইলেও "একোঽসৌ রসরাজঃ শরীরমজরামরং কুরুতে" (রসেশ্বরদর্শনম্, ২৭ শ্লোক)। ইহা দ্বারা চিত্তবৃত্তি-নিরোধ ও চরম স্থৈর্য্যলাভ হয় না, অতএব এই সাধনপ্রণালীদ্বয় একই সীমাদ্বারা সীমাবদ্ধ। ইহাদের সাধনে মন ও বায়ুর আজ্ঞাচক্রে স্থিতি হয় এবং সাধক জীবন্মুক্ত হন। উর্দ্ধস্থ সহস্রারের দিব্যজ্যোতি দ্বারা আলোকিত হইয়া এই স্থৈর্য্য বহুকাল পর্য্যন্ত থাকিতে পারে, কিন্তু রাজযোগ সাধিত না হওয়া পর্য্যন্ত চরমস্থিতিলাভ হয় না। তাই রসেশ্বরদর্শনকার বলিয়াছেন—

"তস্মাদস্মদুক্তয়া রীত্যা দিব্যং দেহং সম্পাদ্য যোগাভ্যাসবশাৎ পরতত্ত্বে দৃষ্টে পুরুষার্থপ্রাপ্তির্ভবতি" অর্থাৎ এইজন্য আমাদের কথিত রীতির অনুসরণপূর্ব্বক দিব্যদেহ সম্পাদন করিয়া, যোগাভ্যাসবশে পরতত্ত্বের দর্শন হইলেই পুরুষার্থপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। তখন --

ভ্রূযুগমধ্যগতং যৎ শিখিবিদ্যুৎসূর্য্যবৎ জগদ্ভাসি।
কেষাঞ্চিৎ পুণ্যদৃশামুন্মীলতি চিন্ময়ং জ্যোতিঃ॥[১]

অর্থাৎ যাহা ভ্রূযুগলের মধ্যগত হইয়া, অগ্নি, বিদ্যুৎ ও সূর্য্যের ন্যায় সমুদায় জগৎ আভাসিত করে, কোন কোন পুণ্যাত্মাদিগের গোচরে সেই চিন্ময় জ্যোতি উন্মীলিত হইয়া থাকে।

রাজযোগ দ্বারা পূর্ণপ্রজ্ঞা লাভ হয়। সিদ্ধদেহ লাভ না হইলে ইহা রক্ষা করা সম্ভব হয় না। আমাদের পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহ মৃত্তিকার ন্যায়, ইহা প্রজ্ঞা ধারণের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। মৃত্তিকাতে যেমন সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হয় না, সেইরূপ এ দেহে জ্ঞান প্রতিফলিত হয় না। এমন কি তৎপূর্ব্বে যে অব্যাহত জ্ঞান সাধন কর্ত্তব্য, তাহাও এই দেহে সম্ভব হয় না, কারণ ইহা জরাব্যাধিযুক্ত অপক্ব দেহ। যদি বলা যায় সচ্চিদানন্দময় পরতত্ত্বের স্ফুরণে মুক্তি হয়, অতএব সিদ্ধদেহ সাধনের প্রয়োজন নাই, তদুত্তরে বলা যায়, এ দেহে চৈতন্যজ্যোতি স্ফুরণের কোন সম্ভাবনা নাই। রসহৃদয়তন্ত্রেও বর্ণিত হইয়াছে, যাহা সর্ব্ববিধ সম্প্রদায়ের অভীষ্ট, যাহাতে বিকল্পের লেশ নাই, সেই চিদানন্দ স্ফুরিত হইলেও অস্ফুরিত দেহবিশিষ্ট জন্তুগণের কি করিতে পারেন ?

১। রসেশ্বরদর্শন—সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ, শ্লোক ৩২। রসহৃদয়তন্ত্রম্ ১।২১

গলিতানল্পবিকল্পঃ সর্ব্বাধ্ববিবক্ষিতশ্চিদানন্দঃ।
স্ফুরিতোঽপ্যস্ফুরিততনোঃ করোতি কিং জন্তুবর্গস্য ॥[১]

দেখা যাইতেছে জ্ঞান ধারণের জন্য উপযুক্ত দেহধারণের চর্চ্চা যোগীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। বঙ্গীয় গাথাব মধ্যেও বারম্বার ইহার উল্লেখ পাই, মাতা ময়নামতী পুত্র গোপীচন্দ্রকে বলিতেছেন, "গুরু ভজিলে বাছা অমর হয় কন্ধ" (কন্ধ অর্থে স্কন্ধ বা দেহ)—আবার এই গ্রন্থের অন্যত্র পাই, "ভজিলে গুরুর চরণ অমর হয় কায়", "ভজন সাধন নাম জপ হইবে অমর"।[২] গোরক্ষবিজয় গ্রন্থে পাই, "কায়া সাধ আমি পুত্র বলি" (পৃ ১৩০), "কায়া সাধে মীননাথে বসিয়া আসনে" (পৃ ১৯৮), "আএ গুরু উলটিয়া যোগ ধর, কায়া তোহ্মাব স্থিব কর, নিজমন্ত্র করহ স্মোরন" (পৃ ১১৫)। "জোগ সাধে মীননাথে স্থির কৈল কায়া" (পৃ ১৯৮) ইত্যাদি দ্বারা নাথমার্গে কায়সিদ্ধি বা দেহলাভ সম্বন্ধে প্রধানতঃ উপদেশ দেওয়া হইত দেখা যাইতেছে।

নাথমার্গে 'মহাজ্ঞান' লাভ দ্বারা মৃত্যুঞ্জয়ী হইবার কথা আছে। ইতিপূর্ব্বেও আমরা গুরুপ্রদত্ত 'মহাজ্ঞান' দ্বাবা শুদ্ধসত্তার বিকাশের কথা বলিয়াছি। মহাজ্ঞানই শুদ্ধসত্তার বীজস্বরূপ, তাহাই প্রাকৃতিক দেহ পরিবর্ত্তনের সহায়। গুরু গোরক্ষনাথ সরলা বালা শিশুমতীর (ময়নামতীর) যাহাতে মৃত্যু না ঘটে সেই নিমিত্ত কৃপা করিয়া তাহাকে 'মহাজ্ঞান' দেন, ফলে স্বয়ং যমদূত তাহাকে ভয় করিত। ময়নামতীর বিবাহ হইলে মৃত্যুমুখী স্বামীকে 'মহাজ্ঞান' দ্বারা বাঁচাইতে ইচ্ছা করিলে স্বামী স্ত্রীর নিকট দীক্ষা লইতে অসম্মত হইয়া মৃত্যুবরণকে শ্রেয়ঃ মনে করিলেন। রাজাব মৃত্যুতে ময়না 'গোদা' যমকে তাড়না করিলেন, তাঁহার চীৎকারফলে—

কৈলাস হইতে শিব গোরক্ষনাথ মঞ্চকে নামিল।
আস্তার মধ্যে ধরিয়া মএনাক বুঝাতে লাগিল। পৃঃ ৩৯

গোরক্ষনাথ ময়নাকে বুঝাইতে লাগিলেন, "বিধাতার কলম খণ্ডন না যায়"। তৎপরেই ময়নাকে উপদেশ দিতেছেন—

আঠারো জনম ছেইলার উনিশে মরণ।
শিঘ্র নেগি ভজাইস সিদ্ধাহাড়ির চরণ ॥
ঐ সিদ্ধাক ভজাইলে তোমার ছেইলার না হবে মরণ ॥[৩]

১। রসহৃদয়তন্ত্রম ১।২০ ২। সুকুর মহম্মদ রচিত গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস।
৩। গোপীচন্দ্রের গান, পৃ ৩৯, ৪২

অর্থাৎ 'মহাজ্ঞান' লাভ হইলে বিধাতার কলমও খণ্ডান যাইবে। বহু বাদানুবাদের পর পুত্র মাতৃআজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া হাড়ির শিষ্য হইলেন, তৎপূর্ব্বে তিনি স্বয়ং তাঁহার দুই রাণী অদুনা পদুনার সহ মাতাকে বহু প্রকারে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াও সফলকাম হন নাই। রাণীমাতা 'মহাজ্ঞান' জানিতেন, গুরুনাম স্মরণে তিনি সকল পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হইতে সক্ষম হন। নাথমার্গের এই 'মহাজ্ঞান' কি? ইহা সেই জ্ঞান যাহা দ্বারা কায়সিদ্ধি সম্ভব হয়, অর্থাৎ অজর-অমরত্ব লাভ হয়। ইহা সেই জ্ঞান যাহা দ্বারা কালকেও দমন করা যায়। এই জ্ঞান লাভ হইলে শুদ্ধ স্বচ্ছস্বরূপে স্থিতি হয়, ইহাই যোগের পূর্ণ পরিণত অবস্থা।

তিব্বতীয় বৌদ্ধলামাদের সাধনায় এই মহাজ্ঞান দ্বারা মৃত্যুঞ্জয়ী হইবার কথা আছে। মায়াজয়ী ব্যক্তি জীবন্মৃত্যুঞ্জয়ী হইয়া অপরের পথপ্রদর্শক হইতে সক্ষম, তাঁহার নিকট সংসার ও নির্ব্বাণ একই কথা। এইরূপ সাধকেরা সজ্ঞানে জীর্ণবস্ত্রের ন্যায় দেহত্যাগ করেন। বোধিসত্ত্বরা সজ্ঞানেই অন্যদেহ ধারণ করিবার জন্য উপযুক্ত গর্ভে প্রবেশ করিয়া জন্মগ্রহণ করেন এবং দেহত্যাগ কালেও সজ্ঞানে দেহত্যাগ করেন। ধর্ম্মের লক্ষণ এই যে, ইচ্ছানুযায়ী সাধক সজ্ঞানে ভ্রমণ করিতে পারেন বা এক দেহ ত্যাগ করিয়া দেহান্তর গ্রহণ করিতে পারেন,—কুণ্ডলিনী যোগের পারদর্শিতার উপর ইহা নির্ভর করে।[১]

উপরোক্ত বিবরণে মায়াজয়ী ব্যক্তি মৃত্যুজয় করিতে সক্ষম বলা হইয়াছে; এই মায়াজয় অর্থাৎ মনোজয়। মহাযান মতে মায়া বা দৃশ্য জগতের কোন বাস্তব সত্তা নাই, মনের ক্রিয়া দ্বারাই তাহাদের বাস্তবতা উপলব্ধি করা যায়। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক সার জেম্‌স জিন্‌সও বলিয়াছেন, বাহিরের যাহা কিছু দৃশ্য পদার্থ তাহা মনের মধ্যে জ্ঞান আছে বলিয়াই জানিতে পারি, জ্ঞান না থাকিলে বৃক্ষও থাকিবে না, অতএব মানসিক জ্ঞানই সর্ব্ব পদার্থের মূল—অর্থাৎ 'অহং' গুটাইয়া লইলে দৃশ্যমান জগৎও অদৃশ্য হইবে। অতএব মনই প্রধান।[২]

১। Tibetan Yoga & Secret Doctrines, Evans Wentz. The Seven Books in Tibetan, Bk. V, VI. Cf. Milarepa, p. 155; Mystics & Magicians in Tibet—'Art of Phowa'.

২। The New Background of Science, Sir James Jeans, Camb. 1933 পৃ ২৮৩-২৮৪, ২৯৭-৮।

বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায় মধ্যে ও বৈষ্ণব সহজিয়া সম্প্রদায় মধ্যে সহজ স্বরূপের উপলব্ধি আছে, কায়সিদ্ধি মুখ্য লক্ষ্য না হইলেও উহা সহজ উপলব্ধির উপায় স্বরূপ। বৌদ্ধ সহজিয়ার যাহা মহাসুখ, বৈষ্ণবের তাহাই মহাভাব, সহজ উপায়ে তাহার উপলব্ধি কর্ত্তব্য। বৌদ্ধ সহজিয়া মধ্যে নাথযোগীদের অনুরূপ হঠযোগ সাধনও ছিল, ইহা দ্বারা দেহসিদ্ধি লাভ হইত। কায়সাধন, ভাবসাধন, বায়ুসাধনের একই ফল - সিদ্ধদেহ লাভ। কিন্তু বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভিন্ন নামে ইহার সাধন প্রচলিত। তাই বলা হয় –রসেশ্বরের কায়সাধন, বৈষ্ণবের ভাবসাধন, হঠযোগীর বায়ুসাধন। রসেশ্বর সম্প্রদায় মধ্যে জ্ঞানপ্রাপ্তির জন্য দৈহিক পরমাণু পরিবর্ত্তিত করিবার প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে, জীবন্মুক্ত হওয়াই তাহাদের লক্ষ্য, বিদেহমুক্তি তাহাদের লক্ষ্য নহে। পারদই তাহাদের মুক্তির উপায় স্বরূপ। কাপালিক, কালামুখ, মহাব্রতীন, সোমসিদ্ধান্ত প্রভৃতি সম্প্রদায় মধ্যে কায়সিদ্ধির বিভিন্ন উপায় ছিল। যমুনাচার্য্যের আগম-প্রামাণ্যে কাপালিক ও কালামুখ সম্প্রদায়ের বর্ণনা আছে।[১] ইহাদের মধ্যে ছয়মুদ্রাধারণ ও গুপ্তক্রিয়াদি ছিল। কর্ণিকা, রুচক, কুণ্ডল, শিখামণি, ভস্ম ও যজ্ঞোপবীত এই ছয় মুদ্রা। কপালপাত্র ভোজন, শবভস্মস্নান, সুরাকুম্ভাদি স্থাপন প্রভৃতি বিধি দ্বারা ইহাদের সিদ্ধিলাভ হইত ও পিণ্ডসিদ্ধি হইত।

চর্য্যাপদে (নং ১০) কাহ্নু বলিয়াছেন, "তুলো ডোম্বী হাউ কপালী" অর্থাৎ 'ক' অর্থে মহাসুখ, যে মহাসুখকে রক্ষা করে সে কপালী। "কং তব সুখং পালিতুং সমর্থঃ।" সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতিতে কালামুখ, কাপালিক, মহাব্রতীন প্রভৃতির বিবরণ আছে। সোম সিদ্ধান্ত সম্প্রদায় শৈব ছিলেন, ইহাদের সহিত চন্দ্রজ্ঞানবিদ্যার যোগ ছিল কি না তাহা এখন অজ্ঞাত। লক্ষ্মীধর চন্দ্রজ্ঞানবিদ্যার সহিত কাপালিকদের যোগসূত্র স্থাপনার চেষ্টা করিয়াছেন। তন্ত্রে চন্দ্র ও তাহার ষোড়শ কলার প্রাধান্য আছে, ষোড়শ নিত্যার পূজা ইহাতে আছে। অধ্যাপক তুচী সোমসম্প্রদায়ের উল্লেখ করিলেও তাহাদের দর্শন অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে।[২]

১। ভারতীয় দর্শন, বলদেব উপাধ্যায়, পৃ ৫৬২ তে উল্লেখ।

২। Soma or the Somma Sect of the Saivas. C. Chakravarti, I. H. Q. 1932 Vol. 6.

বৌদ্ধ সহজিয়ার যাহা 'মহাসুখ' দ্বারা লভ্য, রসেশ্বরের তাহা 'রস' দ্বারা লভ্য, আবার নাথযোগীর তাহাই সহস্রার ক্ষরিত 'সোমরস' দ্বারা লভ্য। বৌদ্ধ সহজিয়া মহাসুখের দ্বারা আত্মানাত্মার উপলব্ধি করিয়া সহজাবস্থা লাভ করেন, বৌদ্ধ সহজিয়া দোহাতে 'স্কন্ধসিদ্ধি'র কথা আছে, "মূর্চ্ছিতে স্কন্ধবিজ্ঞানে কুতঃ সিদ্ধিরনিন্দিতা" (রতিবজ্র-চর্য্যাচর্য্য পৃ ২)। অর্থাৎ নাড়ী সকল মূর্চ্ছিত হইলে স্কন্ধসিদ্ধি কিরূপে সম্ভব? অতএব তাঁহারা যুগনদ্ধরূপে সহজানন্দফল অন্বেষণ করেন, ইহাই বজ্র ও পদ্মের মিলন (চর্য্যাচর্য্য, পৃ ৩ টীকা)। এই ক্রিয়ায় বিন্দুরক্ষার কোন কথা নাই, কিন্তু নাথমার্গে বিন্দুরক্ষাই প্রথম সাধন। ইহা দ্বারাই নাথেরা কায়সিদ্ধি করিতেন। গোরক্ষ-মৎস্যেন্দ্রের প্রশ্নোত্তরে বিন্দুরক্ষার শুভফল এবং বিন্দুক্ষয়ের অশুভফলের ভূরিভূরি নিদর্শন আছে। মৎস্যেন্দ্রের পতনকাহিনী দ্বারা বিন্দুক্ষয়ে শরীরক্ষয় ও যোগ নষ্ট হয় ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে। কথিত আছে, গোরক্ষ প্রথমে বৌদ্ধ সহজিয়া ছিলেন, ঐ সম্প্রদায়ের ক্রিয়াকলাপ তাঁহার অনুমোদিত না হওয়ায় তিনি ঐ ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া শৈব হন। তাঁহার পূর্ব্ব নাম ছিল রমণবজ্র, মতান্তরে অনঙ্গবজ্র। বৌদ্ধ সহজিয়ারা প্রজ্ঞা ও উপায়ের মিলন নির্ম্মাণচক্রে (নাভিস্থানে) সাধিত হইলে বোধিচিত্তরূপ আনন্দ উৎপন্ন হইলে তাহাকে উষ্ণীষ কমলে নীত করিয়া 'মহাসুখ' অনুভব করেন (চর্য্যাপদ, ১০ টীকা দ্রষ্টব্য)। মহাযান মতে এই উর্দ্ধগমনের দ্বারাই অদ্বৈত উপলব্ধি হয়। বৌদ্ধ সহজিয়া মতে প্রজ্ঞা বা নৈরাত্ম্য দেবীর সঙ্গ কর্ত্তব্য। তাহা দ্বারাই প্রজ্ঞোপায়াত্মিকারূপ 'মহামুদ্রা' সিদ্ধি হয় (পৃ ২০ চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়)। বৈষ্ণবদের মধ্যেও রাধার যে মহাভাব তাহা এই প্রজ্ঞার সহিত তুলনীয়। নাথমার্গে প্রজ্ঞা, নৈরাত্ম্য দেবী, মহাভাব প্রভৃতির কোন প্রকার উল্লেখ নাই। বরং খেচরীমুদ্রা সাধন দ্বারা বীর্য্যরক্ষা করিয়া দেহকে সুন্দর করিবার কথা আছে। বৈদিক যুগেও সোমরস পান বিধি ছিল, সোমলতার ষোড়শপত্র চন্দ্রের ষোড়শ কলার সহিত তুলনীয়, চন্দ্র ওষধিপতি, তাঁহার হ্রাসবৃদ্ধিতে সোমলতার গুণের হ্রাসবৃদ্ধি কল্পিত হইত। গীতাতে আছে—

"পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ"।[১]

অর্থাৎ "আমি শ্রীকৃষ্ণ রসাত্মক চন্দ্ররূপে ওষধিসকলকে পুষ্ট করি।"

১। গীতা ১৫।১৩

রসেশ্বরদর্শনে বায়ুনিরোধের কথা আছে, নাথযোগেও বায়ুনিরোধের ও খেচরীমুদ্রা সাধনের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। নাথগণ 'অমর বারুণী' পান দ্বারা অমৃতক্ষরণ নিবৃত্তি করিতে উপদেশ দেন, ইহা দ্বারাই কায়সিদ্ধি হয়, "নান্যথা কায়সিদ্ধিঃ"। গুরু গোরক্ষনাথ বলিয়াছেন, প্রাণিগণের নাভিদেশে অগ্নিময় সূর্য্য আছে, তালুতে অমৃতাত্মা চন্দ্র আছেন, চন্দ্র অধোমুখী হইয়া অমৃতবর্ষণ করেন, সূর্য্য উর্দ্ধমুখে তাহা গ্রাস করেন, এই নিমিত্ত বিপরীতকরণী মুদ্রা দ্বারা অমৃতরক্ষা কর্ত্তব্য। গুরু-উপদেশে উর্দ্ধে সূর্য্য ও নিম্নে চন্দ্র রাখিবার অভ্যাস করিলে কালমৃত্যু জয় করা যাইবে।[১] জিহ্বাকে তালুর উর্দ্ধভাগস্থ ছিদ্রে প্রবেশ করাইয়া চন্দ্রগলিত অমৃতস্রাব (ইহাই অমর বারুণী) পান করিলে সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনাশ পায়, শরীরে জড়তা উৎপাদন হয় না, অণিমাদি অষ্টসিদ্ধিলাভ হয় ও যোগদেহ প্রাপ্তি হয়।[২]

সাধারণতঃ চন্দ্রকে সহস্রারে ও সূর্য্যকে মূলাধারে স্থাপিত করা হয় —

ব্রহ্মরন্ধ্রে হি যৎ পদ্মং সহস্রারং ব্যবস্থিতং।
তত্র কন্দে হি যা যোনিস্তস্যাং চন্দ্রো ব্যবস্থিতঃ॥
মূলাধারে হি যৎ পদ্মং চতুষ্পত্রং ব্যবস্থিতং।
তত্র মধ্যে হি যা যোনিস্তস্যাং সূর্য্যো ব্যবস্থিতঃ॥[৩]

চন্দ্র হইতে ক্ষরিত অমৃত সূর্য্য দ্বারা নষ্ট হয়। গোরক্ষসংহিতায় উক্ত হইয়াছে--

নাভিমূলে বসেৎ সূর্য্য স্তালুমূলে চ চন্দ্রমা।
অমৃতং গ্রসতে সূর্য্যস্ততো মৃত্যুবশো নরঃ॥১।৮৫

এই অমৃত নাশ হয় বলিয়াই মানব মৃত্যুর বশ হয়। গোরক্ষবিজয় গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে—

ভক্ষিআ গরল চন্দ্র কায়া কর তাজা। পৃ ১৫২
তিনচন্দ্র সম্বরিয়া— আপনা দিয়া
গরল যে চন্দ্র কর পান।
তিনচন্দ্র সম্বরিয়া — গরলচন্দ্র ভক্ষিয়া
তবেহ সকল রক্ষা পাএ॥
আএ গুরু উলটিয়া জোগ ধর কায়া তোহ্মার স্থির কর
নিজমন্ত্র করহ স্মোরন—
গোর্খবাক্যে পিণ্ড রৈক্ষা কর। (পৃঃ ১১৫)

---

১ হ-যো-প্র ৩।৫২, ৭৭, ৮২। ২। হ-যো-প্র ৩।৪৯, ৫০। ৩। গো সং ৪।১৪৭, ১৫২।

তালুস্থ চন্দ্র অধোমুখ হইয়া অমৃত বর্ষণ করেন, নাভিস্থ সূর্য্য উর্দ্ধমুখে অমৃত বর্ষণ করেন, উভয়ের অমৃত একত্রিত করণে একমাত্র গুরু-উপদেশই সহায়। উর্দ্ধে নাভি ও অধে তালু আছে, এইরূপ বিপরীত ভাবনা শতকোটি শাস্ত্রপাঠেও লভ্য নহে, একমাত্র গুরুবাক্য দ্বারাই লভ্য।

বর্ষত্যধোমুখশ্চন্দ্রো বর্ষত্যূর্দ্ধমুখো রবিঃ।
কর্ত্তব্যং কারণন্তত্র যেন পীযুষমাপ্যতে॥
তত্রাস্তি কারণং দিব্যং সূর্য্যস্য পরিবঞ্চনং।
গুরূপদেশতো জ্ঞেয়ং ন তু শাস্ত্রার্থকোটিভিঃ॥
উর্দ্ধং নাভিরধস্তালুরূর্দ্ধং ভানুরধঃ শশী।
কেবলং বিপরীতাখ্যং গুরুবাক্যেন লভ্যতে॥[1]

বিপরীতকরণী মুদ্রা দ্বারা বা উল্টাসাধন দ্বারা চন্দ্র ও সূর্য্যের অমৃতকে একত্রিত বা উল্টাপথে চালিত করা যায়। এই মুদ্রাসাধনে বিঘ্নের আশঙ্কা থাকায় গুরু অতি গুপ্ত ভাবে ইহার শিক্ষা দেন (গোরক্ষসংহিতা ১৮৭) গোরক্ষনাথও গুরুকে বলিতেছেন, "উলটিয়া ধর গুরু সুমেরুর কলা" (পৃঃ ১৪৫ গোরক্ষবিজয়, "উলটিয়া হউক পুষ্প" (ঐ পৃঃ ১৪৮), "উলটিয়া জোগ ধর, কায়া তোহ্মার স্থির কর" (পৃঃ ১১৫)। এই অমৃতপানের উপায় বর্ণন, যথা—

মুখখানি হাল গুরু জিহ্বাখানি ফাল।
অমর পাটনে জেন যেত করে হাল॥
উচ্চনীচ ভূমিখানি তাতে কৃষি হয়।
জদি হয় গৃহবাসী সে ভূমি চসয়॥ (গোরক্ষবিজয় পৃঃ ১৫৮)।

ইহা খেচরী মুদ্রা সাধনের ইঙ্গিত। খেচরী সাধনই তন্ত্রের 'মাংস' ভক্ষণ। ইহা দ্বারা অমরবারুণী বা তন্ত্রের 'মদ্য' পান সম্ভব হয় এবং এই মুদ্রার সাধক 'কাল' দ্বারা বাধিত হন না, "বাধ্যতে ন স কালেন যো মুদ্রাং বেত্তি খেচরীম্"।[2]

চন্দ্রস্থ অমৃত বক্রনাল বা শঙ্খিনী নাড়ী দ্বারা সহস্রার হইতে তালুমূলে ক্ষরিত হয়, এই অমৃতই মানবদেহস্থ বিন্দু, ইহাই 'মহারস'। দশমীদ্বার হইতে এই মহারস পতিত হয় (অর্থাৎ সহস্রার হইতে ইহা ক্ষরিত হয়), তাই "দশমীতে তালি দিয়া রহিবা সহজে" (পৃঃ ১৪২ গোরক্ষ-বিজয়) বলা হইয়াছে। শঙ্খিনী নাড়ীকে সুরসা সর্পিণী (পৃঃ ১৪৩)

১। গোঃ সং ২।৮-১০ ২। গোরক্ষশতক, ৬৬ শ্লোক

বলা হইয়াছে এবং গুরুকে গোরক্ষ বলিতেছেন, "ফিরাও খেলাও গুরু দুইমুখ সাপ"।

চাপিলে গর্জ্জিয়া উঠে বিরহ নাগিনী
সাপিনী না হয়ে গুরু সুরসা সংখিনী ॥ (পৃঃ ১৪১)

আবার "সরুয়া সংখিনী সঙ্গে একা ভেদি কাল" (পৃঃ ১৪৪) আছে। অমৃতকে রক্ষা করিবার জন্যই যে উল্টা সাধন তাহার দ্বারাই

মেরুমূলে রহিব চন্দ্র না টুটিব কলা (পৃঃ ১৪৭)

বলা হয়। এইরূপে যোগী অজর অমর হন।[১]

সন্তকবিরাও উল্টাসাধনের কথা বলেন। ভীখা বলিয়াছেন—

নয়নন সে দেখ উলটি ঠাকুর দর্ব্বারা।

চর্য্যাপদেও এই অজর-অমরত্বের কথা আছে—

সহজে থির করী বারুনী সান্ধে।
জে অজরামর হোই দিড় কান্ধে ॥
দশমি দুআরত চিহ্ন দেখাইআ।
আইল গরাহক অপণে বহিআ ॥[২]

অর্থাৎ বারুণীকে (বোধিচিত্তকে) স্থির করিয়াই অজরামর হওয়া যায়। দশমী দুয়ারে মহাসুখ প্রমোদচিহ্ন দেখিয়া, যোগী সেই পথেই প্রবেশ করিয়া মহাসুখ কমলের রসপান করিয়া থাকেন। সরহও বলিয়াছেন—

জহি মনপবণ ন সঞ্চরই, রবি শশী নাহ পবেশ
তহি বট চিত্ত বিসাম করু সরহে কহিঅ উবেশ ॥

(দোহাকোষ পৃঃ ৯৩)

সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতিতে 'নবচক্র' বর্ণনা প্রসঙ্গে "ষষ্ঠং তালুচক্রং তত্রা অমৃতধারাপ্রবাহঃ ঘন্টিকালিঙ্গমূল রন্ধ্র রাজদন্তং শঙ্খিনীবিবরং দশমদ্বারং" ইত্যাকার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।[৩]

সিদ্ধসিদ্ধান্তসংগ্রহেও "তালুচক্রং ষষ্ঠমত্র সুধাধারাপ্রবাহভৃৎ" বলা হইয়াছে, কিন্তু সপ্তম ও অষ্টম চক্র সম্বন্ধে সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতি হইতে মতভেদ দৃষ্ট হয়।[৪] তালুমূলে দশমীদ্বারে জিহ্বা প্রবেশ করাইয়া দিলে যে সুধাধারা পান করা যায়, তাহাই অমরত্ব প্রদান করে, যথা—

১। গোরক্ষবিজয় গ্রন্থ হইতে।
২। চর্য্যাপদ ৩নং
৩। সি, সি, প, ২।৬
৪। সি, সি, স, ২।১১ দ্রষ্টব্য ; তুলনীয় সি, সি, প ২।৭, ৮

সুধাকলাপরিস্রাবস্তদা স্যাদমরত্বদঃ ॥
জিহ্বাং চালনদোহাভ্যাং দীর্ঘীকৃত্য নিবেশয়েৎ।
দশমাধার তাল্বন্তঃ কাষ্ঠা ভবতি সা পরা ॥[১]

অমরৌঘশাসনেও বিবৃত হইয়াছে যে সহস্রার-ক্ষরিত অমৃতধারা খেচরী মুদ্রা দ্বারা ইড়া দ্বারা বাহিত হইয়া মূলাধারে বিষজলে মিশ্রিত হইয়া তাহার বিষত্বের উপশম সাধন করিয়া (ইহাই রবিকালরূপ সদনে রক্ষা) সকল কেন্দ্র অতিক্রম করায়। খেচরী সাধন দ্বারা ক্ষুৎপিপাসা বিনাশ পায়, দেহস্থৈর্য্য সম্পাদিত হয়, মৃত্যুজরারোগহীনতা প্রাপ্তি হয়। ইহাতে (পৃঃ ১১) "একং মুখরন্ধ্রং রাজদন্তান্তরে, এতদ্ এব শঙ্খিনীমুখং দশমদ্বারং ইত্যুচ্যতে" দ্বারা দশমীদ্বার নির্ণীত হইয়াছে। মস্তক মধ্যে রাজদন্তময় গর্ভে অমৃত সঞ্চিত থাকে, শঙ্খিনী উহাকে দমন করিয়া ব্রহ্মদণ্ডমূলে সেচন করে।[২]

বঙ্গীয় গীতিকাতেও দশমীদ্বারের কথা আছে—

দশমীর দ্বার ভেদি ঢোকে ঢোকে তোল।
উজাউক মহারস ভরৌক খাল জোর ॥ (পৃঃ ১৪৫)

অন্যত্র "ভেদিয়া দশমী দ্বার খোলো জোর ভর" (পৃ ১৩৯)।[৩] আবার গোরক্ষ গুরুকে বলিতেছেন, "দশমীদুয়ার মুক্ত রাখিয়া সর্ব্বনাশ করিলেন, চোরে সর্ব্বধন অপহরণ করিল, গৃহ শূন্য হইল" (পৃ ১০৮ গোরক্ষবিজয়)। অতএব কায়সিদ্ধি চাহিলে দশমীদুয়ার রুদ্ধ করিতে হইবে, ইহার দ্বারা তাহাই সূচিত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে আছে—

ইড়াপিঙ্গলা সুসমনা সন্ধী।
মন পবন তাত কৈল বন্দী ॥
দশমী দুয়ার দিলো কপাট।
এবে চড়িলো মো সে যোগবাট ॥

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ দশমী দুয়ার রুদ্ধ করিয়া যোগারূঢ় হইলেন।[৪]

গোরক্ষকাব্যে স্ত্রীকে 'বাঘিনী' বলা হইয়াছে, মূর্খলোকে পশুর ন্যায় সেই বাঘিনীকে পোষণ করিয়া আহার দিতেছে।[৫] নারীসঙ্গকে ব্যাঘ্রের

১। সি. সি স ২।২৩, ২৪।
২। অমরৌঘশাসন ২য় শ্লোক—ঘণ্টাকোটি কপোল কোটর কুটী জিহ্বাগ্র মধ্যাগ্রয়াচ্ছঙ্খিন্ত ইত্যাদি।
৩। গোরক্ষবিজয় হইতে।
৪। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পৃ ৩৪৯।
৫। মোহনসিং. গোরক্ষনাথ পরিশিষ্ট।

সম্মুখে গরু, বিড়ালের সম্মুখে দুগ্ধ, ইন্দুরের সম্মুখে মৎস্য, ডাকাতের সম্মুখে ধন, সাপের মুখে ব্যাঙ, ইত্যাদি উপমা দ্বারা বর্ণন করা হইয়াছে (গোরক্ষ-বিজয় পৃ ১২১।১২২)। ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যেও "ঘরে বাঘিণী পোষে" ইত্যাদি বর্ণনা পাওয়া যায়। গোরক্ষ গুরুকে বিন্দুরক্ষার্থে বলিতেছেন, "গুরুজী এসে কাম ন কীজৈ। তাথৈ অমীরস ছীজৈ"।[১]

যোগী দেহমধ্যেই স্ত্রীপুরুষের মিলনসুখ অনুভব করিয়া শিবত্বলাভ করেন, ইহাকে যোগের পরিভাষায় চন্দ্রসূর্য্যের মিলনানুভূতি বলা হইয়াছে। দেহস্থ শ্বেতবিন্দু চন্দ্রে ও লোহিতবিন্দু সূর্য্যে স্থিত, ইহাদের মিলনে যোগী পরমপদ প্রাপ্ত হন।[২] চর্য্যাপদের প্রজ্ঞা ও উপায়ের মিলনও ইহাই। তন্ত্রের কুণ্ডলিনীশক্তিকে চর্য্যাপদে 'চণ্ডালী' বলা হইয়াছে, ইহার জাগরণে মহাসুখের উদয় হয়, অর্থাৎ জীবের শিবত্ব লাভ হয়। মহাসুখ রাগাগ্নি দ্বারা ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা গ্রাহ্য বিষয়সকল বিলীন হয়। গঙ্গা ও যমুনা, ইড়া ও পিঙ্গলা, চন্দ্র ও সূর্য্যের নামান্তর চর্য্যাপদে পাই (নং ১৪)—

গঙ্গা জউনা মাঝেঁরে বহঈ নাঈ।
তহি বুড়িলী মাতঙ্গি পোইআ লীলে পার করেই॥

গোরক্ষবিজয়ে—ইঙ্গলা পিঙ্গলা দুই সুমেরুর জোরা।
মৈদ্বখানি আনিআ জে বন্দি কর চোরা॥ (পৃ ১৪০)

এই মিলন দ্বারা যোগী চিরজীবী হন। সুষুম্না নাড়ীর নাম অগ্নি; চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নির মিলন অর্থে ইড়াপিঙ্গলার মিলন সাধন করিয়া মধ্যনাড়ী সুষুম্না পথে বায়ুকে চালনা করা। ইহা দ্বারা আয়ুক্ষয় নিবারিত হয়। নাথমার্গে হাড়িসিদ্ধার অলৌকিক কাহিনী মধ্যে চন্দ্রসূর্য্যকে কর্ণের কুণ্ডল করিয়া রাখার কথা আছে, অর্থাৎ তিনি চন্দ্রসূর্য্যকে বশীভূত করিয়াছিলেন।[৩]

কৃষ্ণাচার্য্যের পদেও আছে—"রবিশশী কুণ্ডল কিউ আভরণে"—(চর্য্যা ১১)। সবহ বলিয়াছেন, যেখানে নাদবিন্দু বা চন্দ্রসূর্য্য নাই, সেইস্থানে চিত্তরাজ স্বভাবতঃই মুক্ত (চর্য্যা ৩২)। চন্দ্র ও সূর্য্য বাম ও দক্ষিণে স্থাপিত, তাহাদের পক্ষচ্ছেদন করিয়া মধ্যপথে যাইলে 'মহাসুখ'

১। নাথপন্থমে যোগ. বড়থ্বাল কল্যাণ যোগাঙ্ক পৃঃ ৭০২।
২। গোরক্ষশতক, শ্লোক ৭২, গোঃ সং ১।৮০।
৩। গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস ১ম খণ্ড, পৃ ৬১, দ্বিতীয় খণ্ড পৃঃ ৪৪১।

প্রাপ্তি হইবে (চর্য্যা ৪, ৮)। এই বাম ও দক্ষিণ বা আলি ও কালি মধ্যপথ রুদ্ধ করিয়া রাখে (চর্য্যা ৭)। এই আলিকালি দ্বারাই বীণার শব্দ হয় (চর্য্যা ১৭)। তাই লুইপাদ বলিয়াছেন, আমি ধমণচমণকে (আলিকালির নামান্তর) বশীভূত করিয়া ধ্যানে (ঝানে) দেখিয়াছি (চর্য্যা ১)। বীণাপাদও বলিয়াছেন—

সুজ লাউ সসি লাগেনি তান্তী।
অণাহ দন্ডী বাকি কি অত অবধূতী (চর্য্যা ১৭)।

অর্থাৎ তাঁহার বীণার লাউ 'সূর্য্য', তাহার তার 'চন্দ্র', এবং তাহার দণ্ড 'অনাহত নাদ'।

হেবজ্রতন্ত্রে ও হেরুকাতন্ত্রে ললনা, রসনা ও অবধূতী নাড়ীর কথা আছে; ললনা শুক্রবাহী নাড়ী, রসনা রক্তবাহী নাড়ী, অবধূতীতে প্রজ্ঞা ও উপায় বা গ্রাহ্য-গ্রাহকে ভেদ নাই। ইহারাই ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ীত্রয়। সারদাতিলকে (১।৩৯) উক্ত হইয়াছে, মানবদেহে অগ্নি ও সোম থাকায় বিন্দুরও দ্বিবিধ রূপ আছে, দক্ষিণ অংশে সূর্য্য, বাম অংশ চন্দ্র। বামে ইড়ানাড়ী ও দক্ষিণে পিঙ্গলানাড়ী আছে। 'শুক্রম্ অগ্নিরূপম্ রক্তম্ সোমরূপম্'। ইহাই বিন্দুর দ্বিবিধরূপ। কামকলাবিলাসে আছে, "সিতশোণবিন্দুযুগলং বিবিক্তশিবশক্তি সঙ্কুচৎ প্রসরম্"—অর্থাৎ বিন্দুর শ্বেত ও রক্তাংশ শিব ও শক্তির পরিচায়ক।[১]

চন্দ্র ও সূর্য্য রাত্রি ও দিবার পরিচায়ক, দিবারাত্রি কালের পরিচায়ক; অতএব চন্দ্রসূর্য্যকে বশীভূত করা অর্থে কালজয়ী হওয়া। চন্দ্র ও সূর্য্য দ্বারা প্রাণ বা অপান ও শ্বাসপ্রশ্বাসও সূচিত হয়, যোগী ইহাদের নিয়মন ও কুম্ভক করিয়া যোগারূঢ় হন, তখন কালের জ্ঞান লুপ্ত হয়।

আলিকালিকে স্বর ও ব্যঞ্জনরূপেও ব্যাখ্যা করা হয়। স্ফোটবাদীরা শব্দকেই সৃষ্টির উৎপত্তির কারণ বলেন (বিন্দু ও নাদই কালি ও আলি নামে খ্যাত, ইহারাই চিৎ ও অচিৎ)। কাশ্মীর শৈবাদ্বৈতবাদে বিন্দু ও নাদ ইচ্ছা ও ক্রিয়া শক্তিরূপে ব্যাখ্যাত (বৌদ্ধদের নির্ম্মাণকায় ইচ্ছাস্বরূপ, সম্ভোগকায় ক্রিয়াস্বরূপ)। ইহারাই পুরুষপ্রকৃতি, শিবশক্তি, রজস্তমস্, বিদ্যা-অবিদ্যা, রেতস্রজস্ ইত্যাদি। মানব ইহাদের দ্বারাই সংসারে বদ্ধ হয়, কিন্তু যোগী ইহাদের জয় করিয়া পূর্ণ সমাধি লাভ করেন। যজ্ঞের অগ্নিতে সোম আহুতি দেওয়া হয়, ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীকে

১। Studies in the Tantras, Dr. P. Bagchi, pp. 66-6৫.

সোম ও অগ্নিরূপে কল্পনা করিয়া যোগীরা তাহাদের মিলন সাধন বা সামরস্য সাধন করেন। এইরূপে দেহমধ্যেই চন্দ্র ও সূর্য্যের মিলন সাধন করিয়া, যোগী দৈহিক পরিবর্ত্তন সাধিত করেন। চন্দ্রের অমৃত বা সোমরস রক্ষা করা নাথযোগীর আদর্শ, ইহার দ্বারাই কায়সিদ্ধি হয় অথবা দিব্য বা সিদ্ধ দেহ লাভ হয়।

ষোড়শ শতাব্দীতে উড়িষ্যার বৈষ্ণবদের মধ্যেও সিদ্ধ দেহ হইয়া জীবমুক্তির আদর্শের প্রভাব পড়ে। বৈষ্ণব বৌদ্ধ শূন্যবাদী অচ্যুতানন্দ পরমাত্মাকে 'মহাশূন্য' আখ্যা দিয়াছেন[১] এবং উল্টাসাধনের কথা, দেহকে অপরিবর্ত্তনীয় করা ও চন্দ্রসূর্য্যকে বশীভূত করার কথা বলিয়াছেন।[২] বলরাম দাসের 'প্রণবগীতায়' "ওঁকার মধ্যে ষড়্‌চক্রস্থান, তথি ভিতরে চৌদ্দভুবন" বৃত্তান্ত আছে। 'অমর-পটল' নামক পুথিতে গোরক্ষ-মল্লিনাথের প্রশ্নোত্তর আছে। বৌদ্ধ বৈষ্ণবেরা তাঁহাদের পুঁথিতে মীননাথ-গোরক্ষনাথের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন। নাথমার্গের সহিত সাধনাতে ঐক্যও লক্ষিত হইতেছে, অতএব 'কায়সাধন' উড়িষ্যায় অবিদিত ছিল বলিয়া মনে হয় না।

শ্রুতিতেও যে সকল বর্ণনা আছে—আমাদের অনুমানে তাহাও 'কায়সিদ্ধি'র প্রতি ইঙ্গিত। পাতঞ্জল যোগ খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর, উপনিষদ তাহাপেক্ষা বহু প্রাচীন, অতএব 'কায়সিদ্ধি' ভারতে অপ্রাচীন নহে। যথা, ধ্যানবিন্দু উপনিষদে—

বিন্দুঃ শিবো রজঃ শক্তি র্বিন্দুবিন্দূ রজো রবিঃ।
উভয়োঃ সঙ্গমাদেব প্রাপ্যতে পরমং বপুঃ॥[৩]

এই শিবশক্তির মিলন বা চন্দ্রসূর্য্যের মিলন দ্বারা পরম সুন্দর বপু হয়, ইহাই শ্রুতি-অনুমোদিত 'কায়সিদ্ধি'।

যোগকুণ্ডল্যুপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে—

অথাহং সংপ্রবক্ষ্যামি বিদ্যাং খেচরীসংজ্ঞিকাম্।
যথা বিজ্ঞানবানস্যা লোকেঽস্মিন্নজরোঽমরঃ॥[৪]

অর্থাৎ খেচরী-সাধন জানিলে অজর-অমরত্ব লাভ হয়—ইহার দ্বারা ইহাই

১। Modern Buddhism in Orissa—N. N. Vasu, p 46. See ref. অচ্যুতানন্দদাস, শূন্যসংহিতা, ২২ অধ্যায়।

২। ঐ ঐ ব্রহ্মসংকলী—পৃ ২৬, প্রাচীন গ্রন্থমালা সিরিজ নং ৬।

৩। ধ্যানবিন্দু উপনিষদ, শ্লোক ৮৮, ৮৯।

৪। যোগকুণ্ডল্যুপনিষদ ২।১।

সূচিত হইতেছে। এই মুদ্রা সাধনসাপেক্ষ, বহু জন্ম-জন্মান্তরের সাধনে যোগী কৃতকার্য্য হন। এই বিদ্যা "যোগী লভতে গুরুবক্ত্রতঃ", তৎসহ শাস্ত্রপাঠ প্রয়োজন। কারণ শাস্ত্র বিনা গুরুও বিদ্যাদানে অক্ষম। খেচরী-বিদ্যা লাভ করিতে হইলে খেচরীযোগসহ খেচরীমুদ্রা ও খেচরীবীজ জানিতে হইবে। খেচরীমন্ত্র সপ্তবর্ণে বিভক্ত—হ্রীং, ভম্, সম্, পম্, ফম্, সম্ ও ক্ষম্—ইহাদ্বারা খেচরীমন্ত্র সিদ্ধ হয় (২।১৭-২০ এবং ৩।১)।

খেচরী অভ্যাসের পূর্ব্বে রসনাচ্ছেদন কর্ত্তব্য (২।২৮, ২৯)। করন্যাস সহ খেচরীবীজ উচ্চারণে ক্রমশঃ সিদ্ধিলাভ হয়। তিনবৎসর অভ্যাস-ফলে ব্রহ্মরন্ধ্র উন্মুক্ত হয়। দ্বাদশ বৎসরান্তে সিদ্ধিলাভ অনিবার্য্য। অতঃপর যোগী স্বীয়দেহে ব্রহ্মাণ্ড দর্শনে সক্ষম হন, "শরীরে সকলং বিশ্বং পশ্যত্যাত্মা বিভেদতঃ" (২।৪৯)। তৎপরে রাজদন্তঊর্দ্ধে কুণ্ডলী (সহস্রারে) নীত হয়, ইহাই ব্রহ্মাণ্ডের মহামার্গের অনুরূপ। অতএব খেচরী দ্বারাই 'সিদ্ধিলাভ' হয়।

দেখা যাইতেছে যে, নাথমার্গে ও অন্যান্য সিদ্ধমার্গে খেচরী সাধনের আবশ্যকতার উল্লেখ বারম্বার পাওয়া যায়। কায়সিদ্ধির নিমিত্ত ইহা অত্যাবশ্যকীয় মুদ্রা। অতএব খেচরী সাধনের মন্ত্র উপরে বর্ণিত হইল।

বৃহজ্জাবালোপনিষদে (২।১৩, ১৬) মৃত্যুজয়ের কথা আছে যিনি শিবশক্তির অমৃতস্পর্শ লাভ করিয়াছেন তাঁহার মৃত্যু কোথায়? শিবাগ্নি দ্বারা তাঁহাব তনু দগ্ধ হইয়াছে, তিনি অমৃতের অধিকারী হইয়াছেন। ইহা শিবশক্তির সামরস্য সাধন দ্বারা কায়সিদ্ধির ইঙ্গিত।

তিব্বতেও ব্রহ্মরন্ধ্র উন্মুক্ত কবিবার সাধন দৃষ্ট হয়, মৃত লামা যাহাতে এই পথে দেহ হইতে নির্গত হইতে পারেন, তজ্জন্য বিশেষ বিশেষ প্রক্রিয়া আছে। বৌদ্ধ লামাদের বিশ্বাস, শারীরিক ও আধ্যাত্মিক কার্য্যদ্বারা যে শক্তিসঞ্চয় হয় তাহা দ্বারাই বর্ত্তমান দেহত্যাগের পর 'নবদেহ' সৃষ্ট হয়। নবদেহ লাভের পূর্ব্বে 'বারড়ো' নামক স্থানে কিয়ৎকাল বাস ঘটে (এ সম্বন্ধে মতভেদও আছে)। যাহা হউক প্রণালী জানা থাকিলে নরকেও নাকি সুখে বাস করা যায়! মৃত্যুর পরবর্ত্তী অবস্থা লামাদের জানা থাকায় তাঁহারা মৃত্যুকে ভয় করেন না। আমরা যাহাকে মৃত্যু বলি তাহা তাঁহাদের মতে ভিন্ন ভিন্ন অংশে লয়প্রাপ্তি। মৃত্যুর পর কেবল 'আমিত্ব' জ্ঞানটুকু থাকে বা বাঁচিবার ইচ্ছা থাকে এবং বর্ত্তমান দেহ ত্যাগকালে

স্বীয় নবদেহের রূপ বা জন্মস্থানও স্থির করা যায়। মৃতপ্রায় লামার আত্মা যাহাতে ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে নির্গত হয়, তৎপ্রতি অন্য লামারা দৃষ্টি রাখেন, 'হিক্' ও 'ফট্' উচ্চারণে এই প্রক্রিয়ায় সহায়তা করা হয়। হয় মৃত্যুমুখী লামা স্বশক্তিবলে ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে আত্মার নির্গমন সাধিত করেন, নতুবা পার্শ্ববর্তী লামা তাঁহাকে এ কার্য্যে ঐরূপ উচ্চারণ দ্বারা সাহায্য করেন। মৃত্যুর পরও ethereal double থাকে, তিব্বতী ও মিশরীদের ইহা বিশ্বাস। জীবিতকালেও এ দেহ পৃথক্ ভাবে কার্য্য করে বা অন্যত্র দেখা দেয়, তথাপি স্থূলদেহ-সংলগ্ন হইয়াই থাকে। এইরূপ দেহ সাহায্যে যিনি ভূমণ্ডল বিচরণ করিয়া আসিয়াছেন, তিব্বতে তাঁহাকে delog অর্থাৎ 'পরপার-প্রত্যাগত' বলে। উপরোক্ত 'বারড়ো' নামক স্থানের সম্বন্ধে জীবিতকালেই শিক্ষালাভ কর্ত্তব্য, কারণ ঐ স্থানের যমরাজ প্রভৃতি যাহা কিছু দৃশ্য পদার্থ তাহাদের জীবিতকালে স্বীয় বিশ্বাসের ফলানুযায়ী দর্শন ঘটে, শিক্ষিত লামাদের মধ্যেও এইরূপ বিশ্বাস প্রচলিত আছে।[১] দেখা যাইতেছে, তিব্বতী লামাদের মধ্যেও দেহত্যাগ মৃত্যু বলিয়া বিবেচিত হয় না, এবং 'জন্ম' ও 'মৃত্যু' সম্বন্ধে বিশেষ প্রকার শিক্ষাদান প্রচলিত আছে। ইহাকেও কায়সিদ্ধির প্রকারভেদ বলা চলে।

তিব্বতীয় বিবরণে ethereal double এর কথা বলা হইয়াছে। আমাদের প্রাচীন যুগের বিবরণেও ইহার অভাব নাই। সৌরভী মুনি পঞ্চাশটী দেহ ধারণ করিয়া মান্ধাতার পঞ্চাশটী কন্যাকে বিবাহ করেন। শঙ্করও বলিয়াছেন, এক দেবতা একদেহই বহুরূপে ধারণ করিয়া বিবিধ যজ্ঞস্থানে উপস্থিত থাকেন (বেদান্তসূত্র, টীকা ১।৩।২৭)।[২] এক মনের অধীনে এই বহু দেহ পরিচালিত হয়, ইহাদের সৃষ্টি, স্থিতি ইত্যাদি যোগীর ইচ্ছাধীন। তাহাতে তাঁহার মুক্তিপথে বিঘ্ন হয় না (বিজ্ঞান-ভিক্ষু যোগবর্ত্তিকা, পৃ ২৬২-৬৩)। এই এক চিত্ত দ্বারা বহু দেহ সৃষ্টি করিয়া কর্ম্মক্ষয় করার নাম 'কায়ব্যূহ'। এই সম্বন্ধে বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন, "যোগী খলু ঋদ্ধৌ প্রাদুর্ভূতায়াং বিকরণধর্ম্মা নির্ম্মায় সেন্দ্রিয়াণি শরীরান্তরাণি তেষু তেষু যুগপজ্‌জ্ঞেয়ানুপলভতে"। শঙ্কর (বেদান্তসূত্র ৪।৪।১৫) বলিয়াছেন, "একমনোঽনুবর্ত্তিনি সমনস্ক অন্যে বাপরাণি শরীরাণি সত্য-

---

১। With Mystics and Magicians in Tibet, David Neel, 1st Ch. p. 29-43

২। বেদান্তদর্শনম্ (শারীরকসূত্রম্). মহেশ পাল সঙ্কলিত (১৩১৭) ২৪০-৪১ পৃ

সঙ্কল্পত্বাৎ স্রক্ষ্যতি। সৃষ্টেষু চ তেষূপাধিভেদাত্মনোঽপি ভেদনাধিষ্ঠাতৃত্বং যোক্ষ্যতে। এষৈব চ যোগশাস্ত্রেষু যোগিনামনেকশরীরযোগপ্রক্রিয়া।"[১]

ঋগ্বেদের সূক্তে (৩।৪৭।১৮) আছে—"ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈর্যাতে যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ শতা দশ" অর্থাৎ ইন্দ্র (সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা) নিজ যোগমায়াশক্তি দ্বারা অনেক প্রকার অনেক শরীর রচনা করিয়া নিজ ভক্তদের মনোরথ পূর্ণ করেন। এই প্রকারে অণিমাদি ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন যোগিরাজও নিজ 'কায়ব্যূহ' রচনা করিতে সক্ষম। মহাভারতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে—

আত্মনো বৈ শরীরাণি বহূনি ভরতর্ষভ।
যোগী কুর্য্যাদ্ বলং প্রাপ্য তৈশ্চ সর্ব্বৈর্ম্মহীং চরেৎ॥
প্রাপ্নুয়াদ্ বিষয়ান্ কৈশ্চিৎ কৈশ্চিদুগ্রং তপশ্চরেৎ।
সংক্ষিপেচ্চ পুনস্তানি সূর্য্যো রশ্মিগণানিব॥

অর্থাৎ হে ভরতর্ষভ যুধিষ্ঠির, অণিমাদি সিদ্ধি সম্পন্ন যোগীশ্বর নিজ এক আত্মা হইতে অনেক শরীর রচনা করিতে পারেন। এই বিভিন্ন শরীর দিয়া রাজ্যাদি বিষয় ভোগ ও তপাদি সাধন করেন। সূর্য্য যেমন নিজ রশ্মিগণকে একত্রিত করিয়া অস্তাচল পাহাড়ে অদৃশ্য হন, তেমনি যোগী বহু শরীরকে একত্রিত করিয়া গুহামধ্যে নির্ব্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন হন।[২]

যীশুর ন্যায় মৃত্যু হইতে পুনরুত্থান করিয়া মৃত্যুসময়ে অনুপস্থিত শিষ্যদের উপদেশ দেওয়ার কাহিনী জেৎসুন মিলারেপা সম্বন্ধেও প্রচলিত আছে। তিলোপা, নারোপা, মিলারেপা প্রভৃতি দশম শতাব্দীর যোগী পুরুষ। ইঁহারা 'মহামুদ্রা' সম্প্রদায় নামে খ্যাত। মিলারেপা 'কায়ব্যূহ' সৃষ্টি করিয়া একই সময়ে ২৪টী স্থানে উপস্থিত থাকিতেন। দৈবী শক্তি বলে রোগীকে রোগমুক্ত করিতে ও বস্তুজাত বিভিন্ন তরঙ্গ আবিষ্কার করিয়া সেই সেই বস্তুকে বিভিন্ন অংশে বিশ্লিষ্ট করিতে তিনি সক্ষম ছিলেন। শিষ্যকে তরঙ্গরূপে দৈব আশীর্ব্বাদ প্রেরণ, শিষ্যের বিপদে প্রাণময় শরীরকে স্থূল শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া গুরুর শিষ্যের সাহায্যার্থে গমন প্রভৃতি সিদ্ধদের পক্ষে সম্ভব। বজ্রকায়ে জ্যোতির্ম্ময় রথে আরোহণ করিয়া স্বর্গে গমন ইত্যাদি মিলারেপার সিদ্ধি মধ্যে অন্যতম। মিলারেপা

১। সরস্বতী ভবন সিরিজ নং ৬, নির্ম্মাণকায় প্রবন্ধ। বেদান্তদর্শনম্ (মহেশ পাল ১৩১৭), পৃ ১০৬৭।

২। নাথসম্প্রদায়ের মহাসিদ্ধ. স্বামীজি মৌক্তিকনাথজী, কল্যাণ সন্ত অঙ্ক, পৃ ৪৮০-৮১।

স্বীয় গুরুর নিকট ইচ্ছামৃত্যু বিদ্যা লাভ করেন (পৃ ১৬১)। তাঁহার মৃত্যুতে দুই বিরোধী শিষ্যদল দুইটী মৃতদেহ পান, অনুপস্থিত শিষ্য রিচুংকে মৃত মিলারেপা পথিমধ্যে স্বদেহে দেখা দেন, পরে শিষ্য তাঁহার মৃতদেহ দেখিয়া অবাক হয়। খৃষ্টানদের মধ্যে যীশুর মরজগৎ ত্যাগকালে ভৌতিক দেহ থাকে নাই এই বিশ্বাস প্রচলিত আছে। ইলাইজা জ্যোতির্ম্ময় রথে স্বর্গে গমন করেন ইহাও প্রসিদ্ধ আছে। খৃষ্টানদের মধ্যে গুরু দূর হইতেও শক্তিপাতের দ্বারা আশীর্ব্বাদ প্রেরণ করিতে পারেন এইরূপ আশীর্ব্বাদের কথাও আছে (পৃ ২৮১ ফুটনোট)। গুরুগোবিন্দভাগবৎপাদ রসায়নবিদ্ ছিলেন, তিনি অদ্যাপি জীবিত এই বিশ্বাস ভারতে প্রচলিত আছে। ত্রৈলঙ্গ স্বামীর কাশীতে আগমন কাহিনীর কেহই উল্লেখ করিতে পারে না, তাঁহার ১৮৮৪ খৃঃ মৃত্যু ঘটে (পৃ ১৪৭ ফুটনোট)। রিচুংএর মৃত্যুতে তাঁহার স্থূলদেহের ত্যাগ ঘটে নাই, স্বদেহেই তিনি স্বর্গলোকে প্রস্থান করেন (পৃ ৩০৭)। মিলারেপার বজ্রকায় জ্যোতিরূপ ধারণ করিয়া পূর্ব্বদিকে চলিয়া যায় (পৃ ৩০০ ১)।[১]

উপরোক্ত বিবরণে প্রথমতঃ 'কায়ব্যূহ' বা বিভিন্ন দেহ রচনার ইতিহাস পাই। দ্বিতীয়তঃ মিলারেপা ও রিচুংএর মৃত্যু বা দেহত্যাগে যে প্রকার ভেদ আছে, তাহা আমাদের এই অধ্যায়ের প্রথম দিকে বর্ণিত দেহত্যাগের দুইটী ধারার বৈশিষ্ট্যকে স্মরণ করাইয়া দেয়—প্রথমটীর সহিত মিলারেপার দেহত্যাগ তুলনীয় অর্থাৎ স্থূলদেহ পড়িয়া থাকিল, তিনি বজ্রকায়ে লোকান্তরে গমন করিলেন ; দ্বিতীয়টীর সহিত রিচুংএর দেহত্যাগ তুলনীয় অর্থাৎ কঞ্চুক বলিয়া বর্জ্জনীয় কোন অংশ দেহে না থাকায় রিচুং স্বদেহেই প্রস্থান করিলেন।

লিংদেশের রাজা গিসার 'বহুদেহ' সৃষ্টি করিয়া যুদ্ধ করেন, তৎসহ বহু অশ্ব বহু তাম্বু সৃষ্ট হয়—এইরূপ নানা কাহিনী তিব্বতে প্রচলিত আছে।[২]

শিবসংহিতায় আছে, "স যোগী কর্ম্মভোগায় কায়ব্যূহং সমাচরেৎ।"[৩] যোগী প্রণব জপ দ্বারা কর্ম্মকূট বিনাশ করিয়া পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মফলভোগের জন্য 'কায়ব্যূহ' ধারণ করেন। যোগী শীঘ্র মুক্তিলাভ কামনায় যুগপৎ বহু

১। Tibet's Great Yogi Milarepa, W. Y. Evans Wentz, London, 1928.

২। With Mystics and Magicians in Tibet, Q. David Neel, p. 270.

৩। শিবসংহিতা ৩।৭৫

শরীর ধারণপূর্ব্বক ভোগ দ্বারা পাপপুণ্যের বিলয় সাধন করেন, এই বহু শরীরের বাসনা নাই, নূতন কর্ম্মসঞ্চয়ও নাই।[১]

পাতঞ্জল যোগসূত্রে (৪।৫) যুগপৎ বহু নির্ম্মাণচিত্তের প্রযোজক এক চিত্তের কথা আছে। নির্ম্মাণকায়ের কোন কথা নাই, যোগী নির্ম্মাণচিত্তের দ্বারা কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে সক্ষম এইরূপ বৃত্তান্ত আছে। সমাধিসিদ্ধ যোগীর পুনর্জন্ম হয় না, কিন্তু নির্ম্মাণচিত্ত সৃজনে তিনি সক্ষম। মহর্ষি কপিল নির্ম্মাণচিত্ত অবলম্বনে আসুরীকে উপদেশ দেন এবং হিরণ্য-গর্ভদেব নির্ম্মাণচিত্তের সাহায্যে এই বিশ্ব রচনা করেন এইরূপ বৃত্তান্ত আছে। আমাদের অনুমানে সিদ্ধদেহ পাঞ্চভৌতিক দেহ নহে, অতএব নির্ম্মাণচিত্ত বা নির্ম্মাণকায় একই কথা। নির্ম্মাণকায়ও একপ্রকার সিদ্ধদেহ।

উচ্চশ্রেণীর যোগীরা আপন প্রয়োজনানুসারে 'নির্ম্মাণকায়' বা 'নির্ম্মাণচিত্ত' ধারণ করেন। সাধারণ জীবের দেহ ভৌতিক দেহ, পঞ্চভূত ও অন্যান্য উপাদান পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইয়া এই দেহ রচিত হয়। জীবের প্রারব্ধকর্ম্মের ফলে ইহার উৎপত্তি, কিন্তু যোগীর সঙ্কল্প দ্বারা গঠিত দেহের সহিত বা চিত্তের সহিত প্রারব্ধের কোন যোগ নাই। মন্ত্রবলে, তপস্যাফলে বা যোগপ্রভাবে নির্ম্মাণকায়ের উৎপত্তি হয়। যোগবলে সৃষ্ট নির্ম্মাণচিত্তে শুক্লকৃষ্ণাদি কর্ম্মাশয় থাকে না। এইরূপ চিত্ত বা দেহই 'গুরুদেহ', ইহা শুদ্ধ অস্মিতাতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত এবং ভ্রমপ্রমাদাদিশূন্য। জৈনদের আচার্য্যদেহও এইরূপ। বৌদ্ধরাও বলেন, বুদ্ধ সত্ত্বার্থে নির্ম্মাণকায় গ্রহণ করেন। কৈবল্যলাভের পূর্ব্বে সিদ্ধেরা লোক-কল্যাণার্থ দেহধারণে সক্ষম। মানবের মন জিজ্ঞাসু হইলে এইভাবে উচ্চতর লোক হইতে তাহাদের ইচ্ছা পূর্ণ হয়।

মাধ্যমিক মতে 'শূন্য' হইতে নির্ম্মাণকায়ের উৎপত্তি হয়, কারণ যোগদেহে উপাদান অনাবশ্যক। অভিনব গুপ্তও পঞ্চভূতের উপাদানের অনাবশ্যকতার স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন (ঈশ্বর প্রত্যভিজ্ঞাবিমর্শিনী ১।৫।৮)। জগৎসৃষ্টি যদি সম্ভব হয় তবে কায়সৃষ্টি অসম্ভব কিসে? নির্ম্মাণকায় পাঞ্চভৌতিক দেহ নহে, অতএব নির্ম্মাণচিত্ত দ্বারা নির্ম্মাণকায় সৃষ্টি সম্ভব।[২]

১। An Introduction to Yoga Philosophy, Major B. D. Basu, 1912, Allahabad. Introduction, p. XVI.

২। নির্ম্মাণকায়, সরস্বতীভবন সিরিজ নং ১

নাথমার্গে সিদ্ধযোগী পক্ষে সিদ্ধদেহে ত্রিলোক ভ্রমণের কথা আছে, যথা—

ইচ্ছারূপো হি যোগেন্দ্রঃ স্বতন্ত্রস্ত্বজরামরঃ॥
ক্রীড়তি ত্রিষু লোকেষু লীলয়া যত্র কুত্রচিৎ।
অচিন্ত্য শক্তিমান্ যোগী নানারূপাণি ধারয়ন্॥
সংহরেচ্চ পুনস্তানি স্বেচ্ছয়া বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
মরণং তস্য কিং দেবি পৃচ্ছসীন্দুসমাননে॥
নাসৌ মরণমাপ্নোতি পুনর্যোগবলেন তৎ।
পুরৈব মৃত এবাসৌ মৃতস্য মরণং কুতঃ॥
মরণং যত্র সর্ব্বেষাং তত্রাসৌ সখি জীবতি।
যত্র জীবন্তি মূঢ়াস্তু তত্রাসৌ ম্রিয়তে সদা॥
কর্ত্তব্যন্নৈব তস্যাস্তি কৃতেনাসৌ ন লিপ্যতে।
জীবন্মুক্তঃ সদা স্বচ্ছঃ সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতঃ॥[১]

ইহা দ্বারা যোগেন্দ্র লীলাপর হইয়া, নানারূপ ধাবণ করিয়া, ত্রিলোকের যথাতথা ক্রীড়া কবেন তাহাই সূচিত হইতেছে। বসেশ্বরদর্শনেও ইহার অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়, যথা—

এবং বসসংসিদ্ধো দুঃখজবামবণবর্জিতো গুণবান্।
খেগমনেন চ নিত্যং সঞ্চবতে সকল ভুবনেষু॥[২]

সিদ্ধযোগী যোগবলে পূর্ব্বেই মৃত হন, অর্থাৎ তাঁহাব কায়সিদ্ধি পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইলে ভৌতিক দেহ বিনষ্ট হয়, অতএব 'মরণং যত্র সর্ব্বেষাং তত্রাসৌ সখি জীবতি' এবং মূঢ়েরা যেখানে জীবিত সেখানে ইনি সদাই মৃত। ইহার সহিত গীতার

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥[৩]

তুলনীয় ;—ইহার নিগূঢ়ার্থ এই যে, বিবেকিগণ পরমার্থ বিষয়ে জাগ্রত ও জাগতিক বিষয়ে নিদ্রিত, আর মূঢ়গণ পরমার্থবিষয়ে নিদ্রিত এবং ঐহিক বিষয়ে সদা তৎপর থাকে।

সিদ্ধযোগীর কোন কর্ত্তব্য নাই, কর্ম্ম করিয়াও তিনি তাহার দ্বারা লিপ্ত হন না, তিনি জীবন্মুক্ত, সদা স্বস্থ, সকল দোষশূন্য। কিন্তু মাত্র বিরক্ত জ্ঞানিগণ অন্তে দেহের দ্বারা বিজিত হন, তাঁহারা মাংসপিণ্ডদ্বারা

১। যোগবীজ ৫১-৫৬ শ্লোক। ২। রসহৃদয়তন্ত্র ১৯।৬৩ ৩। গীতা—২।৬৯

পীড়িত দেহী, তাঁহারা যোগিগণের সহিত তুলিত হইবার যোগ্য নহেন। গীতাও বলিয়াছেন—

ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥[১]

যিনি কর্ম্মফলাসক্তি ত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা পরিতৃপ্ত ও নিরবলম্বন হইয়া থাকেন, তিনি জনকাদির ন্যায় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াও কিছুই করেন না, কারণ তাঁহার শুভাশুভ কর্ম্মের কর্তৃত্ব জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়াছে।

এইরূপে জীবন্মুক্ত হইয়া ইচ্ছামত যে যোগী ত্রিভুবন বিচরণে সমর্থ, তাঁহার 'কায়সিদ্ধি' পূর্ণ হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

নাথমার্গে কায়সাধনের যে বিশেষ প্রণালী আছে তাহার নাম 'উল্টা সাধন'। গোরক্ষবিজয়ে (পৃ ১১৫, ১১৬, ১৪৫) ও গোরক্ষবোধে (শ্লোক ৩৭, ৩৮) এই সাধনতত্ত্ব আছে। গোরক্ষবোধে চন্দ্রসূর্য্যের ও নাদবিন্দুর অবস্থিতি সম্বন্ধে এবং উল্টাশক্তির বিশ্রামস্থান সম্বন্ধে সাঙ্কেতিক ভাষায় প্রশ্নোত্তর আছে।[২] গোরক্ষবিজয়ে উল্টাসাধন-প্রক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে, যথা—

সট্‌চক্র ভেদ গুরু খেলাউক উজান।
মেরুমূলে রহিব চন্দ্র ন টুটিব কলা
বেঙ্কানালে সাধ গুরু ন করিয়া হেলা'। (পৃ ১৪৭)

সাধনের দ্বারা কুণ্ডলিনীকে উর্দ্ধে নীত করিয়া শিবস্থানে মিলিত করিতে পারিলে সংসারের গতি হইতে নিবৃত্তি হয়। নাভিনিম্নে শক্তিস্থান, উর্দ্ধে শিবস্থান ; মানবদেহে শক্তি কুণ্ডলিনীরূপে বিরাজ করেন, সহস্রারে শিবের নিবাস। মধ্যে ষট্‌চক্র বা নবচক্রের অবস্থান, তাহার ভেদই সাধন। এই সাধন দ্বারা যোগীর স্বরূপে স্থিতি হয়, সংসারের গতি হইতে ইহা বিপরীত মার্গ, অতএব ইহা উল্টাসাধন।[৩] সুফী, বাউল, সন্তকবিরাও ইহার বর্ণনা করিয়াছেন। সংযম বা ক্ষেম (গোরক্ষবিজয়ে 'ক্ষেমাই' পৃ ১২৪, ১৪১ ইত্যাদি) দ্বারাই যোগ সাধিত হয়, মুদ্রাদি উপায় মাত্র। গোপীচন্দ্রের গানে[৪] চিত্তজয়ের উপায় বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতেও আছে, 'মরণ কর আগা বাছা .জীবন কর পাছ' অর্থাৎ মৃত্যুঞ্জয়ী হও।

১। গীতা ৪।২০　　২। "গোরক্ষনাথ", মোহনসিং, পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

৩। কৌলজ্ঞাননির্ণয় ২০।১, ২. শক্তি উর্দ্ধগামী হইলে জীবের শিবত্ব প্রাপ্তির বৃত্তান্ত আছে। ইহাই সৃষ্টির উল্টা মার্গ।　　৪। ২য় খণ্ড, পৃ ৪৩৫

গোরক্ষবিজয়ের মধ্যেও (পৃ ৯৪, ৯৫) "কায়াসাধ কায়াসাধ মাদলে হেন বোলে······কায়াসাধ কায়াসাধ মন্দিরাএ বোলে"—ইত্যাদি দ্বারা মৃত্যুঞ্জয়ী হইবার ইঙ্গিত আছে। ইহাই 'বিপরীত' সাধন।

কবীরের 'বীজকে' এমন কয়েকটী 'শব্দ' আছে যাহা আমাদের অনুমানে উল্টাসাধন ও কায়সিদ্ধির রহস্যকেই ব্যাখ্যাত করে। যথা, কবীরের বীজকের ৬৬নং শব্দে—

যোগিয়া কী নাগরী বসৈ মতিকোই।
জোরে বসৈ সো যোগিয়া হোই ॥১॥
বহ যোগিয়াকো উল্টাজ্ঞানা।
কারাচোলা নাহি ম্যানা ॥২॥

অর্থাৎ যে যোগী, তাহার নগরী ব্রহ্মাণ্ড, সেখানে কেহ বাস করে না অর্থাৎ যোগী হঠযোগের সাধক, অন্যরা হঠযোগ সাধন করে না। বেদান্ত শরীর ও আত্মাকে ভিন্ন বলেন, কিন্তু যোগীর মতে শরীরই প্রধান, পবনকে উল্টানীত করাই যোগীর 'উল্টাজ্ঞান'।

কবীরের বীজকে 'সাখী'তে আছে (নং ৪২)—

গোরখ রসিয়া যোগকে, মুয়েন জারী দেহ।
মাঁসগলী মাটী মিলী, কোরো মাঁজী দেহ ॥

অর্থাৎ জন্ম হইলেই প্রলয়কালে মৃত্যু ঘটিবে, কিন্তু গোরখ এমন যোগ সাধন করিয়াছেন যে মরণেও তাঁহার দেহের নাশ নাই, মাংস গলিয়া মাটীর সহিত মিলিয়া যাইলেও তাঁহার 'নবদেহ' (কোরা দেহ, মাঁজী= শুদ্ধ চর্ম্ম) উৎপন্ন হইবে।[১]

কবীরের সাখীর (পৃ ৬১২তে) কবীরের শব্দাবলী গ্রন্থ হইতে উল্লেখ করিয়া অবধূতের যোগসাধন ব্যাখ্যাত হইযাছে। ইড়াপিঙ্গলাকে দমন করিয়া সুষুম্না নাড়ীকে নাশ করিয়া পবনকে গঙ্গায় চড়াইয়া মেরুদণ্ডে আসন পাতিয়া যোগী যোগ সাধন করেন, তাহাই 'উন্মনী' অবস্থা প্রাপ্তি। ইহাও কায়সিদ্ধির অন্যতম উপায়।

সিদ্ধদের দুই শ্রেণী আছেন—এক শ্রেণী পারদাদি যোগে 'কায়সিদ্ধি' লাভ করেন, অন্য শ্রেণী 'জপাদি' সহায়ে শরীর শুদ্ধ করেন। উভয় প্রক্রিয়াতেই পঞ্চইন্দ্রিয়কে অন্তর্মুখী করিতে হয়। জিহ্বার অন্তর্মুখী

১। কবীরের বীজক, টীকা সংস্করণ, বোম্বাই, সংবৎ ১৯৬১, পৃ ৩৩৭, ৫৫৫।

অবস্থায় চন্দ্রামৃত ক্ষরণ হয়, কর্ণের অন্তর্মুখী অবস্থায় নাদশ্রবণ হয়, চক্ষুর অন্তর্মুখী অবস্থায় দিব্যদৃষ্টি লাভ হয় ইত্যাদি। "বাজত অনহদ বাঁসুরী তিরবেনা কে তীর" (যারী)। বুল্লা সংক্ষেপে সমস্ত সন্তসাধনা বর্ণনা করিয়াছেন—

ত্রিকুটী দ্বারা দেখৈ আপু। সুখনন দ্বারা সুমিরৈ জাপু।
ইঙ্গলা পিঙ্গলা আখৈ জায়। দসবৈ দ্বারা রহৈ সমায়॥

অর্থাৎ ত্রিকুটী (ভ্রূদৃষ্টি) মধ্যে নিজেকে দেখ, সুষুম্না দ্বারা (অজপা) জপ কর, ইঙ্গলাপিঙ্গলা দ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ (প্রাণায়াম) কর—এইরূপে দশমী দুয়ারে প্রবিষ্ট হও।[১]

এইরূপে সন্তরা পারদাদি সহযোগে নহে, জপাদি ক্রিয়া দ্বারা সিদ্ধদেহ লাভ করিতেন। পাতঞ্জলযোগেও পারদাদি ব্যবহারের কথা নাই। কিন্তু 'অথাভিমতধ্যানাদ্বা' এবং 'জন্মৌষধিমন্ত্রতপঃসমাধিজা সিদ্ধি'র কথা আছে। আবার বৈষ্ণবসম্প্রদায় মধ্যেও কায়সিদ্ধি প্রক্রিয়া ছিল, তাহার পরিচয় জ্ঞানদেব রচিত 'জ্ঞানেশ্বরী' নামক গীতাভাষ্যে পাওয়া যায়। এই ভাষ্যের ষষ্ঠ অধ্যায়, চতুর্দ্দশ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—

প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ স যম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ॥৬। ৪

ইহার টীকায় আছে যে, অপানবায়ু মূলবন্ধ দ্বারা বদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা উল্টামুখী হইয়া তৃতীয় চক্র মণিপুরে আঘাত করিলে শরীরের দূষিতমল দূর করে, নাড়ীগ্রন্থি মোচন করে, কল্পনা রুদ্ধ হয়, প্রকৃতি শান্ত হয়। আসনের উষ্ণতা কুণ্ডলিনীকে জাগরিত করে, তাহা বজ্রাসন দ্বারা উত্থিত হইয়া নাভিস্থানে দেখা দেয়, হৃদয়কমলের নিম্নের বায়ুকে নাশ করে, সমস্ত অবয়বকে শুষ্ক করে, তাহাতে বাহ্যবৃদ্ধি রুদ্ধ হয়। নাসিকাগ্র বাহিরে দ্বাদশ অঙ্গুলি পর্য্যন্ত যে বায়ু বহির্গম করে, তাহাকেও অন্তর্মুখী করে। উর্দ্ধবায়ু ও নিম্নবায়ুর মিলন সাধন করে। ত্রিনাড়ী বশীভূত হয়, ষট্‌চক্রের কলি প্রস্ফুটিত হয়, চন্দ্রামৃত ক্ষরিত হইতে থাকে, এবং যোগীর দেহ স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ দেখায়। কুণ্ডলিনী চন্দ্রামৃত পান করিলে সুবর্ণচম্পক সদৃশ দেহ হয়, তাহা দেখিয়া কৃতান্তও ভীত হয়, বার্দ্ধক্য দূর হয়, লুপ্ত বাল্যদশা ফিরিয়া আসে। সর্ব্বশরীরে নূতন

১। বড়থ্বাল, নির্গুণ সম্প্রদায়, পৃ ২৯৮ ফুটনোট।

রোমাবলী দেখা দেয়, নবদন্তের উদগম হয়, শরীর বায়ুর ন্যায় লঘু হয়, কারণ শরীরের পৃথ্বী ও জল অংশ থাকে না। অণিমাদি সিদ্ধি লাভ হয়। পরচিত্ত জ্ঞান হয়। জগদম্বা কুণ্ডলিনী-হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া অনাহত ধ্বনি করিতে থাকেন, বুদ্ধি তাহা ধীরে ধীরে শ্রবণ করে, তখন ব্রহ্মরন্ধ্রের দ্বার উন্মুক্ত হয়। কুণ্ডলিনীও তেজ ত্যাগ করিয়া প্রাণরূপে স্থিত হন। তখন নাদ, বিন্দু, কলা, জ্যোতি থাকে না। মনবশ, পবনআশ্রয় প্রভৃতির জ্ঞানও লুপ্ত হয়। কল্পনীয় বা বর্জ্জনীয় কিছু থাকে না। ইহাই মহাভূতের স্পষ্ট নির্ভুলরূপ। পিণ্ডদ্বারা পিণ্ডের গ্রাস যে নাথসম্প্রদায়ের মর্ম্ম, সেই অভিপ্রায়ই শ্রীমহাবিষ্ণু বর্ণনা করিয়াছেন।[১]

তন্ত্রে ও নাথমার্গে দেহ মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডের কল্পনা করা হয়—নিবন্ধের অন্যত্র ইহা আলোচিত হইয়াছে। তাহাতে দেহমধ্যে চন্দ্র বা সোম এবং সূর্য্য বা অগ্নিকে প্রধানতম স্থান দেওয়া হইয়াছে। এই চন্দ্রসূর্য্যকে 'হ' ও 'ঠ' বা প্রাণঅপান ইত্যাদি দ্বারা অভিহিত করা হয়। এই প্রাণ-অপানকে মানবদেহের শিব ও শক্তি বলা হয়, কারণ চন্দ্র অমরত্ব দান করেন, সূর্য্য কালাগ্নিস্বরূপ। তাই এই দুই নাড়ীর মধ্যবর্ত্তী পথে যাইয়া দশমী দুয়ারে "তালি দিয়া রহিবা সহজে" ইত্যাদি উপদেশ আছে।

চান্দসুরজ দুই করিয়া সমএ
অভয় পুরিতে নাই, বায়ুর জে ভর।
সরুয়া সংখিনী সঙ্গে একা ভেদি কাল।
পরিচয় করি হাসা বন্দি কর কাল॥

অন্যত্র— ইঙ্গিলা পিঙ্গিলা বুঝিবা বাউ সন্ধি।
রবি শশি চলিয়াছে তারে কর বন্দি॥[২]

সর্ব্বত্র প্রাণ অপানকে বশীভূত করিয়া 'কালবঞ্চনের' কথা বলা হইতেছে। নাথমার্গে প্রাণ-অপান শিবশক্তিরূপে কল্পিত হন। গীতায় আছে—শ্রীকৃষ্ণ প্রাণ ও অপান বায়ুর সহিত সংযুক্ত হইয়া প্রাণিগণের দেহ আশ্রয় করিয়া থাকেন।[৩]

নাথগণের কায়সাধন অর্থে সামরস্যপ্রাপ্তি, ইহা শিব ও শক্তির মিলন অর্থাৎ জড় ও চৈতন্যভাবের ভেদাভেদ-কল্পনা দূর করতঃ

১। জ্ঞানেশ্বরী, ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ ২য় সংস্করণ, পৃ ১৩৫-৪১। হিন্দী টীকার ইহা সংক্ষিপ্ত অনুবাদ।

২। গোরক্ষবিজয় পৃ ১৪৪, ১৪৭,

৩। গীতা ১৫।১৪

সামরস্যভাব সাধন। ভেদজ্ঞান থাকিলে দেহসিদ্ধি বা আত্মোপলব্ধি সম্ভব নহে। শিব ও শক্তিতে বস্তুতঃ ভেদ নাই। শিব শক্তিরই আত্মলীন অবস্থা বা সিদ্ধমতে 'নিরুত্থানদশা'। ইহাই সামরস্যভূমি (পরমপদ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। জীবমধ্যে যে কুণ্ডলিনী আছেন তাঁহার চেতনে সপ্তধাতুময় দেহ যোগাগ্নি দ্বারা পক্ক হয়, "সপ্তধাতুময়ো দেহো দগ্ধো যোগাগ্নিনা শনৈঃ।"[১] তৎফলে 'যোগদেহ' প্রাপ্তি হয়। উপনিষদ আত্মা সম্বন্ধে 'অণোরণীয়ান্', 'মহতো মহীয়ান্' বিশেষণ দিয়াছেন, সিদ্ধদের যোগদেহও তাহাই। সর্ব্বদোষবর্জ্জিত সদাস্বরূপস্থ অভিনব চিদ্দেহের আবির্ভাবেই সিদ্ধদেহ লাভ হয়। যোগদেহ স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণদেহ। মৃত্যুর পরেও সূক্ষ্মদেহ থাকে, গীতাতেও ইহার বর্ণনা পাই (৫।১০, ১১)। নাথমার্গে যোগদেহ সৃজনের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে (গো, সি, স, পৃ ৫৩)। যোগের দ্বারা কায়ের দৃঢ়তা সম্পাদিত হয়, বায়ু ঊর্দ্ধে নীত করিবার ফলে চিত্তের দৃঢ়তা হয় ও শ্বাসপ্রশ্বাস বশীভূত হইলে বাক্যের দৃঢ়তা অর্থাৎ স্থিরতা হয়। এই কায়বাক্‌চিত্তের শুদ্ধিতে 'বিন্দুসিদ্ধি' হয় ও তৎফলে সিদ্ধদেহ বা যোগদেহ লাভ হয়।

সিদ্ধদেহ যোগী জরামৃত্যুহীন ; জন্মের পরের অবস্থা জরাযুক্ত অবস্থা, যোগী সাধনবলে জরানাশ করেন, তাঁহার দেহত্যাগ তিরোভাব মাত্র, উহাও দীর্ঘকাল পরে বা কল্পান্তে সংঘটিত হয় বলিয়া যোগীকে 'অমর' বলা হয়। সদাকালীন স্থিতি ইহারও ঊর্দ্ধে। কালের গতিস্তম্ভন দ্বারা এই সদাকালীন স্থিতি বা অজরত্ব লাভ হয়, তাহাতে জন্মমরণ কাটিয়া যায়, দেহ বজ্রবৎ সুদৃঢ় হয় ও রূপলাবণ্যযুক্ত হয়। কোন কোন মতে এই কল্পান্তস্থিতি ও সদাকালীন স্থিতি দ্বারা 'সিদ্ধদেহ' বা 'দিব্যদেহ' ভেদ বর্ণিত হয়। তন্ত্রশাস্ত্রেও বৈন্দব ও শাক্ত দেহের ভেদ আছে, সম্প্রদায়ভেদে ও দৃষ্টিভেদে নামভেদ দেখা যায়। ডাঃ রমন শাস্ত্রী শুদ্ধমার্গে যে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণদেহের পরিবর্ত্তন দ্বারা কায়সিদ্ধি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার সহিত নাথমার্গের কায়সিদ্ধিতে কিঞ্চিৎ ভেদ আছে। শুদ্ধমার্গে ত্রিগুণাত্মক মায়িক দেহের পরিবর্ত্তন সাধিত করিয়া শুদ্ধমায়ার সিদ্ধদেহ বা 'প্রণবতনু' বা মন্ত্রতনু লাভই 'জীবন্মুক্ত' হওয়া। তৎপরে প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বারা মহামায়ার চিন্ময় দেহ লাভ করিয়া যে স্বর্গবাস হয় তাহাই 'পরামুক্ত' হওয়া অথবা দিব্যদেহ বা 'জ্ঞানদেহ' লাভ

১। যোগবীজ, শ্লোক ৪৯।

করা।[১] বস্তুতঃ সর্ব্বোপরি যে অবস্থা হয় তাহা দিব্যদেহ—অর্থাৎ সিদ্ধদেহ অবস্থায় জ্যোতি পূর্ণ কলা প্রাপ্ত হইলেও তাহা ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে থাকে, এবং দিব্যদেহ লাভ হয়। সিদ্ধদেহ এই দিব্যদেহের অন্তর্গত হইয়া থাকে। যেমন পূর্ণ কলসীর উপর জলপাত হইতে থাকিলেও পূর্ণ কলসী তেমনি থাকে, সেইরূপ যোগীর শক্তি বর্দ্ধিত হইতে থাকিলেও সিদ্ধদেহ তদন্তর্গতই থাকে। নাথমার্গের 'পক্বদেহ'ই সিদ্ধদেহ বা যোগদেহ। দেখা যাইতেছে, 'দিব্যদেহ' 'সিদ্ধদেহে'রই প্রকারভেদ মাত্র, শুদ্ধমার্গে এই ভেদ বর্ণিত হইলেও নাথমার্গে এই ভেদাভেদের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না, অতএব নাথমার্গের 'যোগদেহ' বলিলে সিদ্ধ ও দিব্য দেহ উভয়ই বুঝিতে হইবে। রসেশ্বরদর্শনমতে সিদ্ধ বা দিব্য দেহ উভয়ই জরামরণহীন, অতএব উহাতে ভেদ নাই। রসেশ্বর সিদ্ধদের 'রসময়ীতনু' সূক্ষ্মশরীর বিশেষ, তাঁহারা এই শরীর ধারণ করিয়া ত্রিলোক বিচরণ করেন। যথা —

মন্থন ভৈরবো যোগী সিদ্ধবুদ্ধশ্চ কন্থড়ী
... .
অল্লামপ্রভু দেবশ্চ ঘোড়াচলী চ টিনিট্রনী
ইত্যাদয়ো মহাসিদ্ধা রসভোগপ্রসাদতঃ
খণ্ডয়িত্বা কালদণ্ডং ত্রিলোক্যাং বিচরন্তি তে ॥[২]

ইঁহাদের মধ্যে সিদ্ধ অল্লামপ্রভুর সহিত গোরক্ষনাথের একদা 'কায়সিদ্ধি' লইয়া তর্ক উপস্থিত হয়। গোরক্ষ অল্লামপ্রভুকে বলিলেন, "তুমি কথা ত্যাগ করিয়া আমার শরীরে তীক্ষ্ণ কৃপাণ দ্বারা আঘাত কর, তাহাতে 'মদীয় কায়ে যদি রোমমাত্রং কট্যেত চেত্তর্হি ন কায়সিদ্ধিঃ', তাহা হইলে আমি লোকমধ্যে সিদ্ধরূপে গণ্য হইতে পারি না।" অল্লামপ্রভু ভাবিলেন, ইহার শরীরে খড়্গাঘাত করিলে যদি মৃত হয়, তবে আমি উচ্চতর যমীন্দ্র গোরক্ষ সৃষ্টি করিব। এই ভাবিয়া তিনি গোরক্ষের দেহে আঘাত করিলেন ; তাহাতে ঘোর শব্দ হইল, পৃথিবী চঞ্চল হইল, অদ্রিগণ কম্পিত হইল, কিন্তু গোরক্ষের রোমমাত্র ছিন্ন হইল না। অল্লামপ্রভু বলিলেন,

---

১। The Doctrinal Culture and Tradition of the Siddhas, Dr. Raman Shastri. C. H. I. Vol II. p. 303 ff,

২। রসহৃদয়তন্ত্রম্ ১।৭ টীকা।

"যমীদের ইহা প্রকৃত সিদ্ধি নহে, এই সিদ্ধি মিথ্যা, কারণ তোমার দেহে শব্দ উত্থিত হইয়াছে, যোগী বাততাপাদি দ্বারা অপীড়িত, জরামরণবর্জ্জিত হইবেন ও ভূতজয়ী হইবেন। দৈহিক গুণ সকল দ্বারা যে অনাসক্ত থাকে তাহারই 'কায়সিদ্ধি' হইয়াছে জানিবে।" অতঃপর গোরক্ষ অল্লামপ্রভুর সিদ্ধি পরীক্ষার্থে বিচিত্র গতিতে অস্ত্র চালনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু প্রভুর দেহ 'নিঃশব্দ অপ্রতিমকান্তি বিকারশূন্য' রহিল, গোরক্ষ আশ্চর্য্য হইয়া প্রভুর সিদ্ধি স্বীকার করিলেন।[১]

উপর্য্যুক্ত বিবরণ নাথপন্থীদের না হওয়ায় গোরক্ষের সিদ্ধিকে নিম্ন করা হইয়াছে ও স্বীয় সম্প্রদায়ের মহিমা বর্ণিত হইয়াছে। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সিদ্ধদেহ আকাশের ন্যায়, তাহাতে আঘাত করিলে শব্দ হইবে না, সে দেহ ইষ্টকপ্রাচীরও ভেদ করিতে সমর্থ। জীবমধ্যে স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত থাকে, যেমন তিলমধ্যে তৈল, দুগ্ধ মধ্যে ঘৃত। যোগী সাধনদ্বারা বিচ্ছেদ সম্পন্ন করিতে পারেন, কাহারও কাহারও স্বপ্নে সূক্ষ্মশরীরের বহির্গমন হইয়া থাকে। জাগ্রত অবস্থাতেও কেহ কেহ এইরূপ অনুভূতি লাভ করেন। সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিরা অন্যের মৃত্যুর সময়ে এই দেহবিচ্ছেদ ক্রিয়া দেখিতে পান, সাধারণের নিকট ইহা অপ্রত্যক্ষ। যোগীরা মন্থনরূপ ক্রিয়া দ্বারা এই দেহবিচ্ছেদ সাধন করিয়া সূক্ষ্ম শরীরে যথেচ্ছ ভ্রমণ করিতে পারেন, দেশ বা কাল দ্বারা সে শরীর বাধিত হয় না। স্থূল শরীর তখন জড়বৎ পড়িয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ শঙ্করের স্থূলদেহ ত্যাগ ও অমরুক রাজার দেহে প্রবেশ কাহিনীর উল্লেখ করা যাইতে পারে। সুলভাও স্বীয় দৃষ্টি দ্বারা জনক রাজার দেহে প্রবেশ করেন। এই সকল ক্ষেত্রে স্থূল শরীর প্রস্তরবৎ পড়িয়া থাকে, সূক্ষ্মদেহে পরকায় প্রবেশ আদি ক্রিয়া হয়।[২] জৈন গ্রন্থাদিতে পরকায় প্রবেশের কথা আছে। এ বিষয়ে ব্লুমফিল্ড সাহেব সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন।[৩]

মার্গান্তরে যোগীর স্থূল শরীরও দৃষ্ট হয় না। তিনি স্বশরীরেই ভ্রমণ করেন, ভৌতিক স্থূল শরীর লইয়া যথেচ্ছ ভ্রমণ অসম্ভব ব্যাপার; অথচ

১। লিঙ্গধারণ চন্দ্রিকা, সাকারে প্রণীত, পৃ ৩৪, ইত্যাদি

২। এই সম্পর্কে প্রাণশক্তিযোগ ও পরকায় প্রবেশ বিদ্যার পূর্ব্বরূপ, ত্র্যম্বক ভাস্কর শাস্ত্রী সাধনাঙ্ক ১ম খণ্ড 'কল্যাণ' পৃ ৪০৪ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

৩। Magic and Miracle in Jaina Literature, K. Mitra, pp. 36, 26

প্রস্তরবৎ কোন স্থূলদেহ পড়িয়া থাকিতেও দেখা যায় না, (তাহা হইলে যোগী কেবল সূক্ষ্ম দেহে বহির্গমন করিয়াছেন এইরূপ বলিতে হইত)— অতএব যোগীর সে দেহ কিরূপ ? উহা কেবল সূক্ষ্মশরীরও নহে, আবার ভৌতিক দেহ সহ প্রস্থানও সম্ভব নহে। যোগীর এইরূপ দেহের নামই 'সিদ্ধদেহ', ইহাই পূর্ণ 'কায়সিদ্ধি'। এই দেহ স্থূলও নহে, সূক্ষ্মও নহে, অথচ উভয় দেহের ধর্ম্ম উহাতে বর্ত্তমান। যোগমার্গের ঊর্দ্ধস্তরে এই দেহ-প্রাপ্তি ঘটে। যোগীকে প্রথমতঃ স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের ভেদ উপলব্ধি করিতে হয়, দ্বিতীয়তঃ যোগসাধন দ্বারা উভয়ের মিলনে সিদ্ধদেহ লাভ ঘটে। এই সিদ্ধদেহ দ্বারা যোগী জগতের কল্যাণসাধনে ব্রতী হন, এই দেহ যথার্থ 'গুরুদেহ', ইহাই 'প্রণবতনু'। নাথমতে গোরক্ষনাথ অদ্যাপি এই দেহ ধারণ করিয়া আছেন, অতএব নাথগুরু—

স্বেচ্ছাযোগী স্বয়ং কর্ত্তা লীলয়া চাজরামরঃ।
অবধ্যো দেবদৈত্যানাং ক্রীড়তি ভৈরবো যথা ॥[১]

সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতি

জৈনদের মধ্যেও বিশ্বাস যে সিদ্ধগণ কর্ম্মফল ভোগ করেন না, তাঁহারা লোকের উপর আলোকাকাশে বাস করেন এবং অষ্টগুণযুক্ত হন। সেই অষ্টগুণ, যথা—সম্যক্তব্য অর্থাৎ জৈন-তত্ত্বে বিশ্বাস, জ্ঞান, দর্শন, বীর্য্য (ক্লান্তিহীনতা), সূক্ষ্ম, (স্থূলদেহহীন), অবগহন (বহু সিদ্ধের একত্রবাস সম্ভব), অগুরুলঘু (দেহ লঘু বা গুরু নহে), অব্যয়বাদ (নির্ব্বিকার)। অতএব জৈনমতে সিদ্ধদেহী জীবের সর্ব্বোচ্চ দেহপ্রাপ্তি হইতে সামান্য ন্যূন অবস্থা প্রাপ্তি হয়।

নষ্টাষ্টকর্ম্মদেহঃ লোকালোকস্য জ্ঞায়কঃ দ্রষ্টা।
পুরুষাকার আত্মা সিদ্ধং ধ্যায়েৎ লোকশিখরস্থঃ ॥৫১

ইহা সিদ্ধদেহের বর্ণন, এই দেহ অষ্ট কর্ম্ম হইতে জাত নহে, ইহার লোক ও অলোকের জ্ঞান আছে, ইহার পুরুষের ন্যায় আকার, তথাপি ইহা স্থূল দেহ নহে, ছায়াময় দেহবিশেষ, ইহা সর্ব্বজ্ঞ ও আলোকাকাশবাসী।[২]

১। সি. স. প ৫।৩৩, ৩৪

২। Dravya Samgraha, N. Siddhanta Sutras, 14, 51.

দশম পরিচ্ছেদ

অধিকারলাভ, অবধূত বা সিদ্ধলক্ষণ

• গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহে উক্ত হইয়াছে, "যস্য সাক্ষাদ্ অনুভবঃ শাস্ত্রজ্ঞানেন তস্য কিম্?" সাক্ষাৎ অনুভবীর পক্ষে শাস্ত্রজ্ঞান মিথ্যা। নাথমার্গ উপলব্ধির মার্গবিশেষ। বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের দ্বারা অধিকারলাভের উপায় বর্ণিত হইয়াছে। তবে সকল সম্প্রদায় মধ্যেই ব্রহ্মচর্য্যকে উচ্চস্থান দেওয়া হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্যই বল, 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ', তাই চতুরাশ্রমের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যের স্থান প্রথম। কিন্তু সিদ্ধমতে 'অবধূত'ই যথার্থ অধিকারী, তিনি ত্যাগ ও ভোগের দ্বারা অলিপ্ত ও সর্ব্বদ্বন্দ্বাতীত।

সাধারণতঃ বিন্দুর সংরক্ষণকে 'ব্রহ্মচর্য্য' বলে। যাহা দ্বারা ব্রহ্ম-পথের সঞ্চার হয় তাহাই যথার্থ ব্রহ্মচর্য্য। কামনা-বাসনাদি হইতে চিত্ত নিবৃত্ত হইলে বিন্দুর যে আপেক্ষিক সাম্যাবস্থা হয়, তাহাই ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠার প্রথম ভূমি; বিন্দুর ক্ষরণে 'সংসার', বিন্দুর ধারণে 'মোক্ষ'। গণিতশাস্ত্রে ত্রিকোণাদির কেন্দ্রই বিন্দু, দেহস্থ কেন্দ্রও সেইরূপ 'বিন্দু' নামে অভিহিত হয়। পঞ্চকোষের পঞ্চ বিন্দু কল্পিত হয়, অন্নময় কোষের বিন্দুই স্থূলবিন্দু এবং আনন্দময় কোষের বিন্দু অমৃতবিন্দু। সাধন দ্বারা বিন্দুর ভেদ অতিক্রম করিয়া ষোড়শীকলারূপ অমৃতবিন্দুতে চিত্ত স্থির করিলে সাধক মুক্ত হন। নাভিচক্ররূপ মাধ্যাকর্ষণ হইতে মুক্ত হইয়া বিন্দু সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর রূপে সহস্রকমল-দলের কর্ণিকাতে মহাবিন্দুর সহিত মিলিত হয়। মহাবিন্দুই চিত্তচন্দ্রমার 'অমৃতকলা'। বিন্দু শোধনের বৈদিক ও তান্ত্রিক সাধন আছে। বৌদ্ধদের সহজযান প্রভৃতিতে ও জৈনধর্ম্মে এই শোধন-প্রণালী প্রচলিত আছে।

বিন্দু স্থির হইলে চিত্ত স্থির হয়। হঠযোগের ক্রিয়াদ্বারা স্থির বিন্দুকে ঊর্দ্ধমুখী করাই তন্ত্রের কুণ্ডলিনীর জাগরণ। বিন্দু ঊর্দ্ধস্রোতা হইলে নাদাদি শ্রবণ, জ্যোতির্দ্দর্শন, আত্মজ্ঞানের বিকাশ ইত্যাদি হইয়া থাকে,—ইহাই যোগীর অধিকার লাভ।

যোগসূত্রে একতান ধ্যান ও সমাধি দ্বারা প্রজ্ঞার উন্মেষ ও তাহাও

নিরুদ্ধ হইলে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির উদয় বর্ণনা করা হইয়াছে। এই সমাধিলাভের জন্য ব্রহ্মচর্য্যই প্রথম কল্পিক উপায়স্বরূপ।

কুণ্ডলিনীর জাগরণ নানাপ্রকারে হয়। পূর্ব্ব সংস্কারের তারতম্যে ভক্তি বা শ্রবণ-মননাদি জ্ঞানানুষ্ঠান বা হঠযোগ, মন্ত্রযোগ ও রাজযোগের দীর্ঘকালব্যাপী অভ্যাস দ্বারা কুণ্ডলিনী জাগরণের অনুকূল সাধন হইয়া থাকে। সত্যের পথে পদার্পণ মুখ্য উদ্দেশ্য, বৃত্তিনিরোধ দ্বারা একাগ্রতা সাধন লক্ষ্য।

কুণ্ডলিনী সুপ্তা থাকিলে সত্যমার্গ আবরিত থাকে, তাঁহার জাগরণে মার্গ মুক্ত হয়। তখন জীবের শিবত্বপ্রাপ্তি হয়, জীবের অন্তর্নিহিত মহাশক্তি কুণ্ডলিনী নিত্যজাগ্রত শিবের সহিত মিলিত হন। এই মিলনে যে অদ্বয় রূপ প্রকটিত হয় তাহাই জীবের ব্রহ্মপথে অধিকার লাভের সূচনা। এই মিলনের দ্বারাই জীব তত্ত্বাতীতের সন্ধান আভাসরূপে পাইয়া থাকে, ইহা বর্ণনাতীত অবস্থা। এক ব্রহ্মকেই প্রথমে সত্যরূপে ও অবশেষে আনন্দময় সত্তারূপে সাধক উপলব্ধি করেন, কুণ্ডলিনীর জাগরণে যে নিত্যসত্তাতে প্রতিষ্ঠা হয় তাহা হইতে বিচ্যুতি ঘটে না, ইহাই সত্যে স্থিতি। মৎস্যেন্দ্র সম্প্রদায়ে এই অধিকার লাভে মনের অবস্থা বর্ণনা করা হইয়াছে, যথা, "কার্য্যকারণনির্মুক্তমচিন্ত্যমনাময়ম্, মায়াতীতং নিরালম্বং ব্যাপকং সর্ব্বতোমুখম্। সমত্বং একভূতঞ্চ।[১]

অর্থাৎ কার্য্যকারণ-বিনির্মুক্ত সকল চিন্তা হইতে মুক্ত, মায়াতীত, নিরালম্ব, ব্যাপক, সমত্বযুক্ত চিত্তই বজ্রযোগ দ্বারা লভ্য, ইহাই সহজাবস্থা, 'সহজ' দেহমধ্যস্থ চক্রবিশেষ, ইহার অপর নাম 'বজ্র'। মন সহজচক্রে প্রবেশ করিলে দেহ বজ্রের ন্যায় কঠিন ও অবিনাশী হয়। ইহা প্রাপ্ত হইলে সাধক—

স্বয়ং দেবী স্বয়ং দেবঃ স্বয়ং শিবঃ স্বয়ং গুরুঃ।
স্বয়ং ধ্যানং স্বয়ং ধ্যাতা স্বয়ং সর্ব্বত্র দেবতা ॥[২]

হইতে পারেন, তখন যোগ, মন্ত্র, উপাসনা, স্নানাদির প্রয়োজন থাকে না, (অকুলবীরতন্ত্র ১৬-২০), সাধককে পাপপুণ্য স্পর্শ করিতে পারে না, তিনি পৃথিবীতে বাস করিয়াও দগ্ধবীজের ন্যায় নিষ্ফল বা মূলহীন বৃক্ষের ন্যায় নিস্তেজ অবস্থা প্রাপ্ত হন। এইরূপ যোগীর পক্ষে—

১। অকুলবীরতন্ত্র, ৩৩-৩৪ শ্লোক, কৌলজ্ঞাননির্ণয় গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

২। ঐ ২৬ ঐ ঐ ঐ

ন তস্য মাতাপিতা বা বান্ধবং ন চ দেবতা ॥৪২
ন যজ্ঞং নোপবাসঞ্চ ন ক্রিয়া বর্ণভেদকম্।
ত্যক্ত্বা বিকল্পসংঘাতম্ অকুলবীর লয়ং গতাঃ ॥৪৩
ন জপো নার্চ্চনং স্নানং ন হোমং নৈব সাধনম্।
অগ্নিপ্রবেশনং নাস্তি হেমন্তভৃগুনোদনম্ ॥৪৪
নিয়মোঽপি ন তস্যাস্তি নোপবাসো বিধীয়তে।
পিতৃকার্য্যং ন করোতীতি তীর্থযাত্রা ব্রতানি চ ॥৪৫
ধর্ম্মাধর্ম্মফলং নাস্তি ন স্নানং নোদকক্রিয়া।
স্বয়ং ত্যজ সর্ব্বকার্য্যাণি লোকাচারাণি যানি চ ॥৪৬

মৎস্যেন্দ্র সম্প্রদায়ের আর একটী পুথিতে (অকুলাগমতন্ত্রম্) ঈশ্বর 'অকুল'রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহারাদি দ্বারা 'অকুল' প্রাপ্তি হয়। পঞ্চ মকারের আধ্যাত্ম সাধনই প্রকৃত যোগীর সাধন, যাহারা বাহ্য আচরণ করে তাহারা নরকে যায়। যথার্থ ব্রহ্মচারীই 'বাগ্দণ্ডী' (বাক্যের উপর যাঁহার প্রভুত্ব আছে), মনোদণ্ডীই প্রকৃত দীক্ষিত, কর্ম্মদণ্ডীই প্রকৃত বাণপ্রস্থী ও জ্ঞানদণ্ডীই প্রকৃত যতি। বাহ্য আচরণসকল ত্যাজ্য।

বাহ্যমদে রতো যস্তু মৈথুনে মাংসভক্ষণে।
তে সর্ব্বে নরকং যান্তি ইতি সত্যং বচো মম ॥
শিখাযজ্ঞোপবীতাদিঃ সকষায়স্ত্রিদণ্ডধৃক্।
যদ্ বাহ্যবিহিতং কর্ম্মং নৈষ্কর্মণি সমাচরেৎ ॥[১]

অতএব যথার্থ অধিকারী বাহ্যকর্ম্ম সকলে বিরত হইবেন, ইহাই নাথসম্প্রদায়ের মত। তদুপরি সকল বিষয়ে সমদৃষ্টিভাবাপন্ন হইতে হইবে এবং তত্ত্ববিচারের মূল্য বুঝিয়া আচারাদি ত্যাগ করিতে হইবে। এইরূপ ভাবাপন্ন যোগীই 'অবধূত' নামে প্রসিদ্ধ। অন্যত্র আছে—

বাগ্দণ্ডঃ কর্ম্মদণ্ডশ্চ মনোদণ্ডশ্চ তে ত্রয়ঃ।
যস্মৈ তে নিয়তা দণ্ডাঃ স ত্রিদণ্ডী মহাযতিঃ ॥[২]

অর্থাৎ বাগ্দণ্ড, মনোদণ্ড ও কর্ম্মদণ্ড এই তিনটী দণ্ড যাঁহার অধীন, তিনি মহাযতি। গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহের বহুস্থানে এই অবধূত-লক্ষণ বিস্তার করা হইয়াছে, যথা—

১। অকুলাগমতন্ত্রম কৌলজ্ঞাননির্ণয় দ্রষ্টব্য পৃ ৬২,৬৩ বাগ্চী সম্পাদিত।
২। যোগরহস্য, শ্লোক ২২।

বচনে বচনে বেদা স্তীর্থানি চ পদে পদে।
দৃষ্টৌ দৃষ্টৌ চ কৈবল্যং সোঽবধূতঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ॥
একহস্তে ধৃতস্ত্যাগো ভোগশ্চৈককরে স্বয়ম্।
অলিপ্ত স্ত্যাগভোগাভ্যাম্ সোঽবধূতঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ॥

এইরূপ অবধূতই প্রারব্ধ কর্ম্ম ক্ষয় করিতে সমর্থ। সকল মার্গ হইতে অবধূত মার্গ শ্রেষ্ঠ, তাঁহার পক্ষে বেদের কর্ম্ম ও জ্ঞানকাণ্ড নিষ্প্রয়োজন, তিনি উভয় বিলক্ষণ যোগমার্গী। এই অবধূত যে নাদমুদ্রা ভস্মশৈলী উর্ণযজ্ঞোপবীত ধারণ করেন তাহা আধ্যাত্ম রূপে ব্যবহৃত হয়, যথা জীবাত্মা-পরমাত্মার যোগই 'মুদ্রা', অনাহত নাদ ধারণাই 'নাদ' ইত্যাদি।

যাঁহার সাক্ষাৎ অনুভব হইয়াছে তাঁহার পক্ষে শাস্ত্র মিথ্যা, তিনি ক্রিয়াসিদ্ধ যোগদেহধারী। অবধূতসম্প্রদায়ে গুরুর ৩৬ লক্ষণ ও শিষ্যের ৩২ লক্ষণ থাকা আবশ্যক, অর্থাৎ উপযুক্ত গুরু এবং তাঁহার উপযুক্ত শিষ্য হওয়া কর্ত্তব্য। অবধূত গুরু অত্যাশ্রমী বা পঞ্চমাশ্রমী। নাথসূত্রে আছে, "মহাসত্যস্বরূপমেকাবধূতত্বমেব গৃহ্ণীয়াৎ"। এই অবধূতের স্থান দ্বৈতাদ্বৈত উপরিবর্ত্তী, সগুণনির্গুণাতীত, তাই পরমহংসেরা বলেন অবধূতের স্থানই শ্রেষ্ঠ। সগুণ ব্রহ্ম ব্যাপক, নির্গুণ ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপক হইতে পারেন না; নির্গুণ ব্রহ্ম শক্তিরহিত, অতএব ব্যাপকত্ব ধর্ম্ম তাঁহাতে থাকিতে পারে না। অতএব নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্ম এই উভয়ের সমন্বয়ে পূর্ণ যে 'নাথ' তিনিই শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ পরমহংস অপেক্ষা অবধূত শ্রেষ্ঠ।[১]

সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতিতে আছে—

ক্বচিদ্ ভোগী ক্বচিত্ত্যাগী ক্বচিন্নগ্নঃ পিশাচবৎ।
ক্বচিদ্ রাজা ক্ব চাচারী সোঽবধূতোঽভিধীয়তে॥

ইহার অন্যত্র আছে—"সর্ব্বান্ প্রকৃতিবিকারানবধূনোতীত্যবধূতঃ"।[২] এই অবধূত গুরু, গুরুদেরও গুরু, তিনি পক্ষপাতবিনির্ম্মুক্ত অর্থাৎ দেহাভিমানশূন্য, আমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয় ইত্যাকার জ্ঞানশূন্য, তিনি স্বর ও অস্বরের (ও এবং ম) উর্দ্ধে নির্ব্বিকল্প, নিরঞ্জন, নিষ্কল ব্রহ্মকে জ্ঞাত হইয়া পঞ্চমাশ্রমী হইয়াছেন। দত্তাত্রেয়-কৃত অবধূত-গীতায় আছে—

১। গো. সি. স পৃ ১, ১৫, ২০, ২৮, ৫১ ৫৯, ৬২, ৬৩, ৫৬, ৬৪, ৭১, ৭২।
২। সি. সি. প. ৬।২০।

আশাপাশবিনির্ম্মুক্তমাদিমধ্যান্তনির্ম্মলঃ।
আনন্দে বর্ত্ততে নিত্যম্ 'অ'কারস্তস্য লক্ষণম্॥
বাসনা বর্জ্জিতা যেন বক্তব্যং চ নিরাময়ম্।
বর্ত্তমানেষু বর্ত্ততে 'ব'কারস্তস্য লক্ষণম্॥
ধূলিধূসরগাত্রাণি ধূতচিত্তং নিরাময়ম্।
ধারণাধ্যাননির্ম্মুক্তো 'ধূ'কারস্তস্য লক্ষণম্॥
তত্ত্বচিন্তা যেন ধৃতা চিন্তাচেষ্টাবিবর্জ্জিতঃ।
তমোঽহঙ্কারনির্ম্মুক্তঃ 'ত'কারস্তস্য লক্ষণম্॥

এইরূপে অ-ব-ধূ-ত লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে।[১]

অবধূতের সাকার-নিরাকার বা ভেদাভেদ নাই, তিনি কেবল দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জ্জিত শিবকেই জানেন। অবধূত কর্ত্তাও নহেন, ভোক্তাও নহেন, তাঁহার প্রারব্ধ বা এ জন্মের কর্ম্ম নাই, তাঁহার জাগ্রতস্বপ্নসুষুপ্তি বা তুরীয় অবস্থা নাই ; তিনি কেবল আত্মাকে জানেন, তাই ধর্ম্মাধর্ম্ম বন্ধমোক্ষ তাঁহার নাই। অবধূত সমরসে মগ্ন, তাঁহার পক্ষে মন্ত্রও নাই, তন্ত্রও নাই।[২]

যোগবীজে উক্ত হইয়াছে—শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা কামক্রোধাদি জয় সম্ভবে না, যোগ বিনা মোক্ষলাভও সম্ভব নহে, "দেবোঽপি বিনা যোগেন ন মোক্ষং লভতে প্রিয়ে"। যোগদেহ পক্বদেহ, অপক্ব ও পক্বদেহ ভেদে দেহ দ্বিবিধ। অপক্ব দেহীর পক্ষে জপ জ্ঞান বৈরাগ্য আদি মিথ্যা, কারণ তিনি 'শরীরেণ জিতঃ'। যোগদেহধারী স্থূল হইতে স্থূল, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম, ইচ্ছারূপ ধারণে সমর্থ, তিনি অজর অমর এবং ত্রিলোকে তিনি ক্রীড়ারত। যেখানে সকলই মরণশীল সেখানে পক্বদেহী যোগী জীবিত থাকেন, তিনি জীবন্মুক্ত। এইরূপ চিন্তামণি এক গুরুর কৃপায় জীবের লয় হয়। 'অমনস্কে' আছে অবধূতই সন্মার্গদর্শনশীল, মুমুক্ষুর পক্ষে অবধূত গুরুই কর্ত্তব্য।

কুলাচারবিহীনস্তু গুরুরেকো হি দুর্লভ ইতি।
বর্ণাশ্রমিত্বমুক্তং নাস্তি বর্ণাশ্রমাচারে সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগ ইতি॥[৩]

সিদ্ধসিদ্ধান্তসংগ্রহের ষষ্ঠোপদেশে অধিকারী নিরূপণ হইয়াছে, যথা—

নিরূপ্য সর্ব্বং বিষয়মধিকারী নিরূপ্যতে।
অবধূতো ভবেৎ সোঽত্র তল্লক্ষণমিদং যথা॥

১। অবধূতগীতা ৮ ৬-৯, গো. সি স. পৃ ২, ৩৩-৩৫।
২। ঐ ঐ ১।৬২ ৬৩, ৭৪, ৭৫।
৩। যোগবীজ, অমনস্ক, গো. সি. স পৃ ৩০, ৫।

নাথমতে অবধূতই যথার্থ অধিকারী, তাই তাঁহার লক্ষণ নির্ণীত হইয়াছে, যথা—অবধূত সর্ব্বাবস্থাবিনির্ম্মুক্ত, ভাবময় সূত্র দ্বারা তাঁহার কন্থা নির্ম্মিত, তাঁহার চিত্ত রাগদ্বেষবর্জ্জিত, তিনিই ক্ষপণক (সন্ন্যাসী), তিনি শিব ও শক্তির সংযোগকর্ত্তা, বিশ্বাতীত ও বিশ্বময় রূপে তিনি সংযোজনে সিদ্ধ। তিনি মহাবল, উদাসীন মহানন্দময়। তিনি শোক ভয় বীপ্সা (ব্যাপ্তি, পুনঃ পুনঃ ঘটন) দ্বারা অবিচলিত। আনন্দপূর্ণ হইয়া তিনি নিজবোধে লীন হইয়া থাকেন।[১]

সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতিতেও সিদ্ধযোগীর উক্তরূপ লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে,—তিনি পরিপূর্ণপ্রসন্নাত্মা সর্ব্বাসর্ব্বপদোদিত অর্থাৎ ব্যক্ত বা 'সর্ব্ব' এবং ব্যক্তাতীত বা 'অসর্ব্ব' (immanent and transcendent) এই উভয় অবস্থার উপরিবর্ত্তী অবস্থায় মগ্ন, তিনি শান্ত উদাসীন ধীর স্বস্থ মহানন্দময় সিদ্ধ যোগিরাট্।[২]

অবধূতকে 'পঞ্চমাশ্রমী' আখ্যাও দেওয়া হয়। অর্থাৎ চতুরাশ্রমের অতীত যে পঞ্চমাশ্রম, অবধূত সেই মার্গ অবলম্বন করিয়া চলেন।

আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং সম্পূর্ণঃ পরমাত্মনি।
ভিন্নে ভিন্নং ন পশ্যামি তস্যাহং পঞ্চমাশ্রমী ॥[৩]

ইহাই অবধূতের লক্ষণ। নাথমার্গে এইরূপ লক্ষণযুক্ত যোগীকে পূর্ণ অধিকারী বলা হয়।

১। সি. সি স ৬।১-১৪। ২। সি. সি. প ৬।৬৩-৬৮। ৩। গো সি. স. পৃ ২।

একাদশ পরিচ্ছেদ

সিদ্ধি ও যোগপথে সিদ্ধির স্থান

সিদ্ধসম্প্রদায় মধ্যে সিদ্ধির বিশিষ্ট স্থান আছে, উহা সিদ্ধযোগীর অপরিহার্য্য অঙ্গবিশেষ। এই সিদ্ধি কি? আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে সিদ্ধির স্থান কোথায়? সিদ্ধির সার্থকতা কি? কোন্ সময়ে সিদ্ধি সাধনের বিঘ্নস্বরূপ হয়?—এই সকল তথ্য বিবেচ্য। প্রথমতঃ সিদ্ধি কি? উত্তরে বলা যায়—উহা একপ্রকার 'বিশেষ শক্তি'। জ্ঞানলাভের দ্বারা সিদ্ধি করতলগত হয় না, 'মহাজ্ঞান' লাভ হইলে যে শক্তি লাভ হয়, তাহাই 'সিদ্ধি' নামে খ্যাত। বহুদিন মাটীর নিম্নে আবদ্ধ থাকা, শূন্যে উত্থান প্রভৃতি প্রকৃত সিদ্ধি নহে। যে সকল যোগী সাধারণের মধ্যে এই সকল ক্রিয়া বা ভেল্কী প্রদর্শন করিয়া সিদ্ধযোগী নামে খ্যাত হন, তাঁহারা বাস্তবিক আধ্যাত্মিক সাধনার অতিনিম্ন স্তরেই অবস্থিত। অনেকের বিশ্বাস, সিদ্ধি বা বিভূতি লাভ যোগের বিঘ্ন উৎপাদন করে। বস্তুতঃ প্রত্যেক বস্তুর 'সৎ' ও 'অসৎ' ব্যবহার আছে—যেমন অগ্নি অতি প্রয়োজনীয় পদার্থ, কিন্তু শিশুর পক্ষে অগ্নিস্পর্শ হানিকর। অগ্নি আপন স্বভাবানুসারেই কার্য্য করে, কিন্তু ব্যবহারের গুণে উহার ফলাফল ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে। যে ব্যক্তি বস্তুর স্বভাব জানিয়া উহাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া আপন অভীষ্ট সিদ্ধ করে, সেই বুদ্ধিমান ব্যক্তি। এইরূপে যোগ সাধন দ্বারা লভ্য শক্তিরও সৎ ও অসৎ ব্যবহার আছে। যে যোগী সিদ্ধির অপব্যবহার করেন না, তিনিই ধন্য। তাঁহার পক্ষে সিদ্ধি সাধনের বিঘ্নস্বরূপ হইতে পারে না, উপরন্তু তিনি লোককল্যাণার্থে সিদ্ধির ব্যবহার করিলে উহার সার্থকতা স্বীকার করিতেই হইবে। পরমেশ্বরেও ঐশ্বর্য্য বা বিভূতি আছে, অতএব পরমেশ্বর-প্রার্থীর নিকট সিদ্ধি অনুকূল ও কৈবল্য-প্রার্থীর নিকট উহা প্রতিকূল বিবেচিত হয়।

যোগভাষ্যে দুইটী পথের কথা আছে—একটী অন্তরায় ও অন্যটী সহায় স্বরূপ। "স এব মুক্তঃ স এব ঈশ্বরঃ"—অর্থাৎ পরমেশ্বর সদা মুক্ত হইয়াও সদা ঈশ্বর বা ঐশ্বর্য্যযুক্ত। এই ঐশ্বর্য্যযুক্ত অবস্থাই সিদ্ধির লক্ষণ। যে যোগী 'কেবলী' হইতে চাহেন, তাঁহার পক্ষে সিদ্ধি যোগের

অন্তরায় স্বরূপ, কারণ সাংখ্যমতে আত্মা বা পুরুষ নির্গুণ, কিন্তু প্রকৃতির সত্ত্বগুণ আছে, তাহার দ্বারা যোগীর সিদ্ধিলাভ হয়। কেবলী যোগী প্রকৃতিকে বা সিদ্ধিকে ত্যাগ না করিলে নির্গুণ পুরুষকে লাভ করিতে সমর্থ হইবেন না। সাংখ্যমতে ইহাই নির্দ্ধারিত হইলেও যোগমতে উহা প্রকৃত তত্ত্ব নহে। যোগের দৃষ্টিকোণ দ্বারা বিচার করিলে "তিনি সদামুক্ত হইয়াও সদা ঈশ্বর"—এই ভাষ্য দ্বারাই সিদ্ধির স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অতএব ভগবানে যে ঐশ্বর্য্য আছে, মানবের পক্ষে তাহা লাভ করা কঠিন হইলেও উহাকে অন্যায় বলা চলে না। ঐশ্বর্য্য বা বিভূতি অর্থে আভ্যন্তরিক চৈতন্যশক্তির বিকাশ ও সর্ব্বাতীতের সহিত তাহার যোগ, অতএব যোগমার্গে সিদ্ধিলাভ অবশ্যম্ভাবী, যথা জৈন আচার্য্যগণ, বুদ্ধদেব, পরমহংসদেব, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতির সিদ্ধি। কিন্তু অনুপযুক্ত কারণে সিদ্ধি প্রদর্শন অকর্ত্তব্য, এই নিমিত্ত বুদ্ধদেব আনন্দকে ভর্ৎসনা করেন।

পাতঞ্জল যোগেও অষ্টসিদ্ধির কথা আছে—অণিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও যত্রকামাবসায়িত্ব; ইহারা অষ্ট ঐশ্বর্য্য নামেও খ্যাত। এই সিদ্ধিসকল সাধনসাপেক্ষ, অবশ্য কাহারও কাহারও জন্মগত অধিকার বা স্বপ্নাদিতে মন্ত্রাদি প্রাপ্তিও ঘটে। যোগী ইচ্ছামত অণু, লঘু, মহান্ হইতে পারেন, দূরস্থ দ্রব্যেরও ইচ্ছামাত্র স্পর্শ বা প্রাপ্তি ঘটিতে পারে। প্রাকাম্য অর্থে ইচ্ছার অনভিঘাত, ভৌতিক পদার্থের বশকারী হওয়া 'বশিত্ব', এবং সঙ্কল্প দ্বারা ভূত ও ভূতপ্রকৃতি সকলের যথাসঙ্কল্পিত অবস্থায় অবস্থান 'যত্রকামাবসায়িত্ব' নামে খ্যাত। পূর্ব্বপূর্ব্বাপেক্ষা শেষগুলি উত্তম ঐশ্বর্য্য, সর্ব্বশেষ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে পূর্ব্বের সমস্ত সিদ্ধিই বর্ত্তমান রহিয়াছে। সাংখ্যমতে হিরণ্যগর্ভ দেবের সঙ্কল্পে এই জগতের অবস্থিতি, ইহাই অষ্টম ঐশ্বর্য্যের উদাহরণ। যোগিগণ এই সিদ্ধি লাভ করিয়াও পূর্ব্বসিদ্ধের সঙ্কল্প বিপর্য্যয় সাধন করেন না বলিয়া জগতে বিপর্য্যয় ঘটে না। অযথা বিপর্য্যয়ে প্রাণিহিংসা অবশ্যম্ভাবী বলিয়া যোগীরা ইহা হইতে বিরত থাকেন। ঈশ্বর সঙ্কল্পের বিপর্য্যয় অকর্ত্তব্য কিন্তু ঈশ্বর সঙ্কল্প মুক্তপদার্থে যথোচিত শক্তিপ্রয়োগ করিতে যোগীরা সক্ষম।[১]

বৌদ্ধশাস্ত্রে ষট্ অভিজ্ঞার কথা আছে—দিব্যদর্শন, দিব্যশ্রবণ

১। যোগসূত্র ৩।৪৫ টীকা, হরিহরানন্দ আরণ্য; যোগরহস্য ২৮, ২৯ শ্লোক।

পরচিত্তজ্ঞান, জাতিস্মরতা, শক্রদমনক্ষমতা, ঋদ্ধি (লোকাতীত শক্তি), ইহারা ষট্ দৈবশক্তি।[১]

উপর্যুক্ত অষ্টসিদ্ধি ব্যতীত গৌণ সিদ্ধি দশপ্রকার বলিয়া প্রসিদ্ধ, যথা—অনূর্ম্মি (শোক, মোহ, ক্ষুধা, তৃষ্ণারূপ উর্ম্মি হইতে দেহকে মুক্ত রাখা), দূরদর্শন, দূরশ্রবণ, মনোজব-সিদ্ধি (মনোবেগে যথেচ্ছ গমন), কামরূপসিদ্ধি (যথেচ্ছ রূপ ধারণ), পরকায়-প্রবেশ, (শঙ্কর-বৃত্তান্ত সর্ব্বজনবিদিত), স্বচ্ছন্দমরণ (ভীষ্মের স্বেচ্ছামৃত্যু), দেবক্রীড়ানুদর্শন, যথাসঙ্কল্প সিদ্ধি, অপ্রতিহত গতি এবং আজ্ঞা (যোগীর অলঙ্ঘনীয় আজ্ঞা)।

ক্ষুদ্রসিদ্ধি পঞ্চপ্রকার,—ত্রিকালজ্ঞতা, অদ্বন্দ্বতা (শীতোষ্ণ ইত্যাদি জয়), পরচিত্ত-অভিজ্ঞতা, প্রতিষ্টম্ভ (অগ্নি প্রভৃতির কার্য্যকরী শক্তি রোধ), অপরাজয়।

গোরখবাণী গ্রন্থে ২৪ সিদ্ধির বর্ণনা আছে, পূর্ব্বোক্ত অষ্টসিদ্ধি ব্যতীত শীতোষ্ণাদি-রাহিত্য, পরকায়-প্রবেশ, সূর্য্য ও জল বশীকরণ, দূর শ্রবণ, দূরদর্শন, সর্ব্বদেবতার রূপধারণ, সর্ব্বদেবতার সহিত ক্রীড়া, ভূত-ভবিষ্যৎ দর্শন ইত্যাদি ষোড়শ সিদ্ধি সহ ২৪ সিদ্ধির বর্ণনা আছে।[২]

ডাঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য ৩৬ সিদ্ধির উল্লেখ মাত্র করিয়াছেন। মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা মানসিক শক্তির বিকাশ হয় ও সিদ্ধি লাভ হয়, কারণ শব্দে শক্তি নিহিত আছে, তাই তন্ত্রে বাক্‌কে 'অমরবাক্' বলা হয়, ইহার নাশ নাই। সৃষ্টির আদিতে বর্ণের উৎপত্তি হয়, তাহা হইতে চরাচর জগতের প্রভাবের উৎপত্তি হয়। অতএব মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারাই ভাল বা মন্দ প্রভাবের উৎপত্তি হয়।[৩]

কৌলজ্ঞাননির্ণয়ে ধ্যান ও মন্ত্রোচ্চারণের দ্বারা বিভিন্ন শক্তিলাভের কথা আছে, যথা—

ক। পাশস্তোভম্ (কুদৃষ্টিরোধ), নিগ্রহানুগ্রহম্ (পরের ইষ্টানিষ্ট সাধন), ক্রামণম্ (পরকায়-প্রবেশ), হরণম্ (হরণক্ষমতা), প্রতিমাজল্পনম্, (প্রতিমাকে কথা কওয়ান), ঘটপাষাণস্ফোটনম্ (ঘটপাষাণাদি ভগ্ন করিবার ক্ষমতা)।

১। সমাধিসাধন ও বিভূতিলাভ, দ্বিজদাস দত্ত, প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩২২

২। গোরখবাণী, বড়থাল পৃ ২৪৮

৩। শক্তিকা স্বরূপ, বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য, শক্তি অঙ্ক কল্যাণ পৃ ২৩২

খ। মারণ (অন্যকে মারা), স্তম্ভ (থামান), আকৃষ্টি (আকর্ষণ করা), বশম্।

গ। সর্ব্বজনপ্রিয়তা, ব্যাধিহরণ-ক্ষমতা, কবিত্ব ও বক্তৃতা শক্তি, দূরশ্রবণ।

ঘ। দীর্ঘায়ুলাভ, অজরত্বলাভ, জিহ্বা দ্বারা অমৃত পান ইত্যাদি।[১]

গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহে (পৃ ২০) উক্ত হইয়াছে, তান্ত্রিক অনুষ্ঠান "সৎফলমপি যোগ এব"। ইহা দ্বারা যোগফল যে সিদ্ধি তাহা স্পষ্ট বর্ণিত না হইলেও, কৌলজ্ঞাননির্ণয়ের ধ্যান ও যোগফল দ্বারাই যে সিদ্ধি লাভ হয় তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। সিদ্ধি যে যোগীর পক্ষে বিঘ্নস্বরূপ, তাহা বলা চলে না, মধুমতী ভূমির আকর্ষণই যোগীর পতনের কারণ হইতে পারে। যোগীকে দেবতারাও এই স্তরে প্রলোভন দেখাইয়া পরীক্ষা করেন, জরামৃত্যুনাশকারী রসায়ন, আকাশগামী যান. কমনীয়া কন্যা প্রভৃতি প্রলোভনের পদার্থ যোগীর সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। আত্ম-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত যোগী প্রলোভন উপেক্ষা করিয়া ভূত ও ইন্দ্রিয়জয়ী হন এবং বজ্রোপম সিদ্ধদেহ লাভ করেন। তখন অষ্টসিদ্ধি যোগীর করতলগত হয়, যোগীর সৃষ্টি স্থিতি সংহারের ক্ষমতা জন্মায়। 'অস্মিতা' তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত যোগী সর্ব্বজ্ঞ ও জীবন্মুক্ত হন। ইহার পর যে ত্রিগুণাতীত অবস্থা প্রাপ্তি হয় তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগভূমি।[২]

যোগজ সাধন ফল

ইতিপূর্ব্বে মধুমতী ভূমির কথা বলা হইয়াছে, ইহা প্রকৃত-পক্ষে যোগীর যোগসাধনের দ্বিতীয় স্তর। প্রথম অবস্থায় যখন যোগীর অতীন্দ্রিয় জ্ঞান কেবলমাত্র প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাকে প্রথমকল্পিক বলা হয়। তৎপরে মধুমতীর প্রলোভন জয় করিয়া যোগী তৃতীয় বা প্রজ্ঞাজ্যোতি ভূমিতে পদার্পণ করেন। প্রজ্ঞা বা জ্যোতি লাভই যোগীর পক্ষে সিদ্ধিলাভ। এই সিদ্ধি অর্থে শক্তি, ইহা যোগীকে স্বীয় সাধনার দ্বারা লাভ করিতে হয়। 'নাস্তি যোগসমং বলম্', কিন্তু যোগীর সমাধি জ্যোতিলাভের জন্য, ইহার নিমিত্ত শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি প্রভৃতির প্রয়োজন। এই 'জ্যোতি'ই যোগীর অস্ত্রস্বরূপ, ইহা লাভ হইলেই যোগীর প্রসর

১। কৌলজ্ঞাননির্ণয় ৪র্থ, ৬ষ্ঠ ও ৭ম পটল

২। পাতঞ্জলযোগদর্শন ৩।৫১ ভাষ্য

ও সঙ্কোচের ক্ষমতা জন্মে, তাঁহার পক্ষে পৃথিবীতে অলভ্য কিছু থাকে না।· অণিমা-লঘিমাদি তাঁহার নিকট ক্রীড়ার সমান হইয়া পড়ে। যোগী ভূততত্ত্বকে জয় করিয়া জল, অগ্নি, ইষ্টক-প্রাচীরাদি ভেদ করিয়া গমনে সমর্থ হন। তান্ত্রিক সাধকের পক্ষে যোগজ সাধন ফলরূপে এই সকল সিদ্ধিলাভ অনিবার্য্য, কারণ তন্ত্রমতে শিবের সহিত চিৎশক্তি অভিন্ন হইয়া বিরাজ করেন, অতএব শিবত্বলাভে শক্তিলাভ অবশ্যম্ভাবী। এই স্থলেই সাংখ্যের সহিত তন্ত্রের ভেদ, সাংখ্যের প্রকৃতিতে যে শক্তি আছে, তাহা জড়শক্তি, তাহাকে ত্যাগ না করিলে সাংখ্যের পুরুষকে লাভ করা সম্ভব নহে, কিন্তু তন্ত্রে শক্তিত্যাগের কোন প্রশ্নই উঠে না, —শিব ও শক্তি চন্দ্র ও চন্দ্রিকার ন্যায় অভিন্ন।

চলে বাতে চলৎ সর্ব্বং নিশ্চলে নিশ্চলং তদা।[১]

অর্থাৎ বায়ু যে পর্য্যন্ত পরিবাহিত থাকে তাবৎ দৈহিক সমস্ত ক্রিয়া চলিতে থাকে, বায়ু নিশ্চল হইলে শারীরিক ক্রিয়া নিরুদ্ধ হয়। যোগী ইহা স্থির নিশ্চয় জানিয়া কষ্টসাধ্য প্রাণায়াম সাধন করিয়া বায়ুকে স্থির করেন। এইরূপে শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়মিত করিয়া যোগী যে সমাধিতে মগ্ন হন, তাহা সর্পাদির শীতনিদ্রার তুল্য। ইন্দ্রিয়াদি সংযমের ফলে যোগীর দেহ কান্তিমান্ হয়। "সমানজয়াজ্জ্বলনম্"—জিতসমান যোগী তেজের উত্তেজন করিয়া প্রজ্জ্বলিত হন।[২] অর্থাৎ সমান নামক প্রাণের দ্বারা সর্ব্বশরীরে অন্নরসের সমনয়ন বা যথাযোগ্য পোষণ হয়, তাহা দ্বারা শরীরের তেজ বর্দ্ধিত হয়, ফলে যোগী প্রজ্বলিতের ন্যায় দৃষ্ট হন। (অধুনা এই তেজ বা auraর চিত্র গ্রহণ করিয়া স্বাস্থ্যনির্ণয় চেষ্টা চলিতেছে।[৩] মানবদেহে একটী স্বাভাবিক তেজ আছে।) যোগীর দেহে যোগসাধন-ফলে সাত্ত্বিকতা বৃদ্ধি পাইয়া সেই স্বাভাবিক তেজ 'স্বতঃ'প্রকাশিত ও দৃষ্টিগোচর হয়, ইহাই যোগী ও সাধারণ মানব মধ্যে ভেদ।

ত্রাটক যোগ অর্থাৎ নিজের স্থির শরীরে জ্যোতিঃপূর্ণ ধাতুময় শিব-মূর্ত্ত্যাদি দর্শন করিয়া যখন যোগীর শক্তিবৃদ্ধি হয়, তখন দৃষ্টিবিজ্ঞান দ্বারা দৃক্‌শক্তি বর্দ্ধন ও সূক্ষ্ম বস্তু দর্শনাদি করিতে যোগী সমর্থ হন। নিদ্রাতন্দ্রাদিও তাঁহার বশীভূত হয়। মনঃস্থৈর্য্যের নিমিত্ত স্বীয় নাসাপ্রদর্শন, দেবচক্ষু

১। গো সং ১।১৫৩।   ২। যোগসূত্র ৩।৪০ এবং ভাষ্য।

৩। Whitaker's Almanac 1912, p 746. Ref. in পাতঞ্জল-যোগদর্শন পৃ ২৪৮।

করিয়া স্বীয় ললাটে বিন্দুদর্শন প্রভৃতিও যোগী-সম্প্রদায়ে প্রচলিত আছে। গর্ভবাসকালে চিত্তের দৃঢ়তাই শরীরকে অবিকৃত রাখে, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে।[১] যোগীর পক্ষে দৈহিক সন্তাপ স্বল্প হওয়ায় তিন-চারি মাস পর্য্যন্ত অনাহারে থাকা বিচিত্র নহে। সামান্য অম্লজানবায়ুই যোগীর পক্ষে যথেষ্ট, ইহাও সর্পাদি জাতির তুল্য। এইরূপে অনাহারে থাকিয়া, কৌশলে প্রাণক্রিয়া রোধ করিয়া ভারতের বিভিন্ন স্থানে যোগীদের অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শনের কাহিনী Statesman, Illustrated Weekly প্রভৃতিতে বিবৃত হয়, ইহা কিন্তু প্রকৃত যোগজ সাধনের ফল নহে। রণজিৎ সিংএর রাজত্বকালে হরিদাস যোগীর কীর্ত্তিকলাপ ভারতের চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। কথিত আছে, তৎকালীন বৃটিশ রাজপ্রতিনিধিরাও এ বিষয়ে অনুসন্ধানের নিমিত্ত পত্রাদি লেখেন। হরিদাস মৃত্তিকানিম্নে সিন্ধুকের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতেন, জলের উপর দিয়া যাতায়াত করিতেন, চক্ষু বন্ধ করিয়া পুস্তক পাঠ করিতেন, ইত্যাদি। তাঁহার বারম্বার পরীক্ষার সাফল্যে লাহোরের গৃহে গৃহে মঙ্গলবাদ্য প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। দেহত্যাগকালে সমাধিমগ্ন হইয়া হরিদাস মহানিদ্রা প্রাপ্ত হন। শান্তিপুরের বিশে পাগলাও জাহ্নবীতীরে দর্শকবৃন্দের সম্মুখে যোগনিদ্রায় মগ্ন হন।[২]

কণ্টকশয্যায় শয়ন, শূন্যে উত্থান প্রভৃতির বিবরণও দুষ্প্রাপ্য নহে। স্বর্গীয় অক্ষয় দত্ত মহাশয় এইরূপ বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন (ভা উ স, ১ম ও ২য় খণ্ড দ্রষ্টব্য)। শরীরে আকাশ কল্পনা দ্বারা আকাশগতি হয়, লঘুদ্রব্যের ভাবনা দ্বারা লঘুত্ব সম্পাদিত হয়। খৃষ্টানদের মধ্যে ৪০ জন শূন্যে উত্থানের নিমিত্ত সেণ্ট পদবাচ্য হইয়াছেন। বৌদ্ধেরা ইহাকে উদ্বেগাপ্রীতি বলেন। প্রসিদ্ধ মিডিয়ম হোম সাহেবও শূন্যে উঠিতেন। যোগসূত্রে (৩।৪২) ও তাহার ভাষ্যে কায় ও আকাশ সম্বন্ধে সংযম হইতে লঘুতা আকাশগমনাদি ফলের বর্ণনা আছে। কুম্ভক বা বায়ুস্তম্ভন ও মন্ত্রজপ ক্রিয়াদ্বারা আকাশগতি হয়। 'আকাশ' শব্দ গুণ-বাচক, অতএব শরীরব্যাপী অনাহদ নাদ ভাবনা দ্বারা কায়াকাশ ভাবনা-সিদ্ধ হইয়া আকাশগতি হয়। যোগ ব্যতীত অন্য অবস্থাতেও শরীর লঘু হইতে পারে।[৩] শরীর-মধ্যে বায়ুনিরোধ দ্বারা যোগী স্বদেহ শূন্যে

১। পাতঞ্জলযোগদর্শনম্, বেদান্তবাগীশ, 'অবতরণিকা' দ্রষ্টব্য। ১৩২৬ সং

২। হিন্দুজাতির যোগবল ও হরিদাস যোগী, প্রবন্ধপাঠ পৃ ৩৬-৫৯ ভা উ স, ১ম খণ্ড পৃ ১২০।

৩। পাতঞ্জলযোগদর্শন, পৃ ২৫১ দ্রষ্টব্য।

উত্থিত করিতে পারেন। খেচরীমুদ্রাসাধনে বহুদিন পর্য্যন্ত বায়ুর বেগধারণ সম্ভব হয়। চতুর্ব্বিংশতি বৎসর এই সাধন করিলে রক্ত শুভ্রবর্ণ হয় ও ক্ষুধাতৃষ্ণাজয় হয় এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে, মহাভারতের মঙ্কনক ঋষির আখ্যায়িকা উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে।

সাধনদ্বারা দিব্যচক্ষু বা শিবনেত্র উন্মীলন হওয়া বিচিত্র নহে। ললাটকেন্দ্র পঞ্চতত্ত্বের মিলনস্থান, অতএব শিবনেত্রের উন্মেষে ললাট হইতে অগ্নি বা বারি নিষ্ক্রমণ অসম্ভব নহে। বিরাটমধ্যে যে আত্মমণ্ডলের ত্রিপুটী আছে, এই ত্রিনেত্র তাহারই প্রতিবিম্ব। শিবনেত্রের সম্বন্ধে ব্রহ্মমণ্ডলের সহিত, দক্ষিণনেত্রের সম্বন্ধ সূর্য্যমণ্ডলের সহিত এবং বামনেত্রের সম্বন্ধ চন্দ্রমণ্ডলের সহিত। শিবনেত্র হইতে জ্ঞান, দক্ষিণনেত্র হইতে ইচ্ছা ও বামনেত্র হইতে ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়। দিব্যচক্ষুর উন্মেষে জ্ঞান ও শক্তিদ্বারা ক্রিয়া করা সম্ভব হয়, যথা—ভবিষ্যদ্দর্শন, দেবদর্শন, আয়ুবৃদ্ধি ইত্যাদি।

শিবনেত্র উন্মীলনের পূর্ব্বে যোগীর ঘণ্টানিনাদ শ্রবণ, দৈববাণী শ্রবণ, সম্মুখে উপাস্যের আবির্ভাবাদি ঘটে। ললাট মধ্যে জ্যোতি দর্শন ও ভূতভবিষ্যৎ দর্শন সম্ভব হয়। দশম শতাব্দীতে তিব্বতে গুরু পদ্ম সম্ভবের আকাশগমন, সূর্য্যরশ্মিতে আরোহণ, পর্ব্বত ভেদ করিয়া গমন প্রভৃতি ১৫টী সিদ্ধিকথা প্রচলিত ছিল, তিনি ২৫ জন শিষ্যকে স্বীয় সিদ্ধি সকল অর্পণ করেন। তিনি অদ্যাবধি অক্ষয় তারুণ্যময় দেহে লামাধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, তিব্বতীদের মধ্যে এইরূপ বিশ্বাস প্রচলিত আছে।[১]

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে 'সুলভা' নামক সন্ন্যাসিনীর কথা আছে, তিনি উপযুক্ত পতি অভাবে পাণিগ্রহণ করেন নাই, উপরন্তু জনক রাজার দেহে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে পরীক্ষা করেন। রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে 'শবরী' নামক শ্রমণার উপাখ্যান আছে, তিনিও উদ্বাহব্রতে আবদ্ধ হন নাই, রামদর্শনে চরিতার্থ হইয়া অগ্নিকুণ্ডে দেহত্যাগ করেন। শকুন্তলা বৈখানস অর্থাৎ বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া পাণিগ্রহণে বিরত থাকিবেন কি না, এই প্রশ্ন দুষ্যন্ত শকুন্তলার সখীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করেন। অতএব তৎকালে স্ত্রীলোকেও যোগধর্ম্ম অবলম্বন করিতেন ইহা স্পষ্ট। সুলভার পরকায়-প্রবেশ সিদ্ধি ছিল।

মহাভারতের বিদুরের যোগবলে দেহত্যাগ ও সৌভরি নামক মুনির যোগবলে 'কায়ব্যূহ' সৃষ্টিদ্বারা মান্ধাতার কন্যাগণকে বিবাহের

১। Lamaism, Waddell—pp. 151, 152, 24, 26, 30, 31.

কথা সুবিদিত। এগুলি যোগজ সাধনফলের উদাহরণ। শঙ্করের অমরুক রাজার দেহে প্রবেশের কথাও সুবিদিত।[১] পরকায়-প্রবেশ বিদ্যা ভারত হইতে লামা মারপা কর্ত্তৃক তিব্বতে প্রচলিত হয়।[২] মাধবীর শঙ্করবিজয়ে উল্লেখ আছে, শঙ্কর অমরুক রাজার দেহে প্রবেশের সঙ্কল্প জানাইলে, তৎশিষ্য পদ্মপাদ তাঁহাকে মৎস্যেন্দ্রের কাহিনীর উল্লেখ করিয়া বিরত হইতে বলেন, কিন্তু শঙ্কর অটল থাকেন। এই গ্রন্থ পরবর্ত্তী কালে রচিত, অতএব নির্ভরযোগ্য নহে, অর্থাৎ ইহা দ্বারা মৎস্যেন্দ্রকে শঙ্কর-পূর্ব্ববর্ত্তী বলা চলে না।

হোসেন খাঁ নামক জনৈক ব্যক্তি দ্বারা দৃশ্য পদার্থকে অদৃশ্য করিতে ও অপূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুকে আনয়ন করিতে অনেকেই দেখিয়াছেন। ভাস্করানন্দ স্বামী, রামকৃষ্ণদেব প্রভৃতিও বহু সিদ্ধি দেখাইতে পারিতেন। জনৈক সাহেব যোগীর ব্যাঘ্র নিহত করার ও কাল্পনিক ব্যাঘ্র দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হইবার বৃত্তান্ত Statesman পত্রিকায় বাহির হয়।[৩]

জনৈক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ইংরাজ মহিলা স্বীয় সাধনবলে একটী লামামূর্ত্তি সৃজন করেন, তিনি স্বয়ং এবং অন্যেরাও সেই মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেন ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। মহিলাটীর মতে thought formও সত্যকার আকার ধারণ করিতে পারে। দেহাগ্নি দ্বারা শরীরকে উষ্ণ রাখাও তিব্বতীদের বিশেষ সাধনফল। এই সাধন দ্বারা রক্তকণিকা ক্রমশঃ শ্বেতপদার্থে পরিণত হয়। ইহার নিমিত্ত প্রাণায়াম, সংযম, গুরুর শক্তিপাতের আবশ্যক।[৪] ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত গোরক্ষনাথ ও অল্লাম প্রভুর কায়সিদ্ধির পরীক্ষার ন্যায় সম্প্রতি একটী দৈনিক পত্রে একটী সংবাদ বাহির হইয়াছে।

"Man Who Cannot Be Killed"

London, Oct. 27—"He has been stabbed 500 times with sword, rapier and dagger, immersed in boiling water, shot through the brain and given deadly poison." That is the brief resume of the career of Mirin Dajo, a young Dutchman who is described as "the man who cannot be killed."

১। আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ. রাঃ ঘোষ—পৃ ১৪২ (১৪৪৮)

২। With Mystics & Magicians in Tibet, p 275

৩। দ্বাত্রিংশৎ উপনিষৎ, রাঃ ঘোষ (১৮৩১) ভূমিকা ๗৶০।

৪। With Mystics & Magicians in Tibet, pp 80, 81, 275, 284, 198-200,

To show his powers, Dajo gave a "demonstration" at Zurich before a medical and Press audience, during which he allowed himself to be run through the chest with a four-foot sword's blade entering his heart. Then he walked into an adjoining room for an X-ray examination. When the sword was pulled out, the observers testified that he had not lost a drop of blood, although his body was scarred. The puzzled audience, unable to explain the mystery, reached one unanimous conclusion—that there was no trickery.

Dajo had one hitch at his first public performance at a Zurich theatre--he collapsed when the sword-point struck a bone. After the police had banned the performance, Dajo offered himself for a scientific examination. "Stab me from any angle" was his invitation.—(Globe).[১]

হঠযোগের উড্ডান, জালন্ধর ও মূল বন্ধত্রয় ও খেচরীমুদ্রা দ্বারা প্রাণরোধ ব্যাপার সম্ভব, ষট্‌কর্ম্ম সাধনান্তর কুণ্ডলিনী শক্তিকে দশমদ্বারে রুদ্ধ করিলে শরীর কাষ্ঠবৎ হয়, চিত্তবৃত্তিও নিরুদ্ধ হয়। কিন্তু ইহা প্রকৃত মোক্ষ বা যোগজ সাধনফল নহে, কারণ সংস্কারক্ষয় বা তত্ত্বসাক্ষাৎকার ইহা দ্বারা হয় না। এইরূপ সমাধিসিদ্ধিতে জ্ঞানশক্তির উৎকর্ষও হয় না। অতএব এই সকল সাধনের পরে একাগ্রভূমি সাধনের উপদেশ আছে (যোগশাস্ত্রাবলী গ্রন্থে যোগতারাবলী শ্লোক ৬, ৭, ১৯ দ্রষ্টব্য)।

যথার্থ সমাধিসিদ্ধ যোগী বিরল। তথাপি স্থূল ইন্দ্রিয় ব্যতিরেকে স্বপ্নাদিতে ভবিষ্যৎ দর্শনের বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। অতএব যোগদ্বারা এই সকল আয়ত্ত হওয়া বিচিত্র নহে। পরচিত্তজ্ঞান প্রভৃতি যোগীর পক্ষে সহজ হইলেও নির্ম্মলচিত্তের আবশ্যকতা আছে। বস্তুতঃ, অতীত ও ভবিষ্যৎ বিদ্যমান আছে,[২] স্থূল দৃষ্টিতে তাহা অদৃষ্টরূপে থাকে মাত্র। যোগী অনাবৃত চক্ষুদ্বারা ত্রিকালদর্শী হন। আমাদের চক্ষু ক্ষুদ্র গবাক্ষের তুল্য, গবাক্ষের সম্মুখের দ্রব্য মাত্র আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু প্রজ্ঞা বা জ্যোতিঃসম্পন্ন যোগীর কথা স্বতন্ত্র। হঠযোগী বা সামান্য মানবের সহিত প্রকৃত যোগীর শক্তির ইহাই তারতম্য।

১। Morning News, 29 October, 1947.

২। যোগসূত্র ৪।১২, ৩।১৬, সাংখ্যতত্ত্বালোক ৮-১০ (পাঃ যোগদর্শন দ্রষ্টব্য)

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

পরমপদে পিণ্ডলয়—সমরসীকরণ

উপসংহার

নাথপন্থে সিদ্ধদেহ লাভ করিয়া পরমপদে পিণ্ডলয় বা পরমাত্মা ও জীবাত্মার সামরস্যসাধনই বৈশিষ্ট্য। সিদ্ধসম্প্রদায় মাত্র দেহসিদ্ধি বা কায়সিদ্ধিকে প্রথম স্থান দেন, যথা রসেশ্বর সম্প্রদায়, মাহেশ্বর সম্প্রদায় ইত্যাদি নাথসিদ্ধেরাও নিজেদের সিদ্ধ সম্প্রদায় রূপে গণ্য করিতেন। নাথপন্থের তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তানুসারে পরমাত্মা কেবল, অর্থাৎ তিনি ভাব ও অভাব উভয়ের পরবর্ত্তী অবস্থা, অর্থাৎ পরমতত্ত্ব অগম, কোন কৌশল দ্বারা বা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সেখানে পৌছান যায় না, কারণ পরমতত্ত্বকে 'ভাব' বলাও যায় না, 'শূন্য' বলাও চলে না। উহা সৎ ও অসৎ বা ভাব ও অভাবের পরবর্ত্তী এবং দ্বৈত বা অদ্বৈত মতের উপরিবর্ত্তী। ব্রহ্মরন্ধ্ররূপ আকাশমণ্ডলে ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হয়, পরমতত্ত্ব এই আকাশমণ্ডলে কথারত বালকের ন্যায় অবস্থান করেন। তিনি বালকের ন্যায়, কারণ তিনি পাপপুণ্যহীন, জরামৃত্যুহীন ও কালের দ্বারা অস্পৃষ্ট। এই নিমিত্ত 'গোরক্ষগোপাল', 'বুঢ়া বাল' ইত্যাদি নামে নাথপন্থে তাঁহাকে সম্বোধন করা হয়। যিনি নাম ও রূপহীন তাঁহার আর কি বর্ণনা হইবে? তাই গোরক্ষবাণীতে উক্ত হইয়াছে—

> বসতি ন সুন্যং সুন্যং ন বসতী অগম অগোচর এসা।
> গগন সিষর মহিং বালক কৌলে তাকা নাঁব ধরহুগে কৈসা॥[১]

'শব্দ' বা 'নাদে'র দ্বারাই ব্রহ্মরন্ধ্রে তাঁহার সাক্ষাৎকার হয়, তাই তিনি কথারত বালকের ন্যায়। এই অগম লোকে পৌঁছাইবার পথ

> অদেখি দেখিবা, দেখি বিচারিবা, অদিসিটি রাখিবা চীয়া।
> পাতাল কী গঙ্গা ব্রহ্মাণ্ড চঢ়াইবা, তথা বিমল জল পিবা॥

অর্থাৎ অগোচর যে পরমাত্মা তাঁহাকে দেখিবে, দেখিয়া বিচার করিবে, যাহা আঁখি দ্বারা দেখা যায় না, তাঁহাকে চিত্তে রাখিবে। পাতালের গঙ্গাকে অর্থাৎ কুণ্ডলিনী শক্তিকে, ব্রহ্মদণ্ডে ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রেরণ

১। গোরক্ষবাণী, বড় থাল, শ্লোক ১।

করিবে, সেখানে নির্ম্মল রস পান ঘটে। এই পরমাত্মা সহস্রারে গুপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। যোগী কাম-ক্রোধাদি বর্জ্জন করিয়া সমাধি দ্বারা ব্রহ্মরন্ধ্রে যে শব্দ উত্থিত হয়, তাহাতে পরব্রহ্মের উপলব্ধি করেন। বেদপুরাণাদি শাস্ত্র তাঁহার বর্ণনা করিতে অক্ষম, কিন্তু যোগী তাহার তত্ত্ব অবগত আছেন। শ্রীগোরক্ষনাথ তাই বলিয়াছেন, হে কাজি! তুমি 'মহম্মদ' 'মহম্মদ' করিও না, কারণ তুমি তাঁহাকে জানো না। মহম্মদের বিচার অতি কঠিন, তাঁহার হস্তে যে ছুরিকা ছিল তাহা জীবহত্যার জন্য ইস্পাত বা লৌহের তৈয়ারী নহে, তাহা শব্দময় ছুরিকা, উহা দ্বারা সংসারের বিষয়-বাসনা ত্যাগ হয়।[১]

বিষয়-বাসনা ত্যাগ হইলে পরমপদে অবস্থিতি বা পূর্ণসত্যের স্বরূপ উপলব্ধি হয়। এই পরমপদ সর্ব্বতত্ত্ব-উর্দ্ধস্থ ও সর্ব্বকারণের কারণ, ইহা যুগপৎ বিশ্বময় হইয়াও বিশ্বোত্তীর্ণ, ইহাই চরম সাম্যাবস্থা বা নির্গুণ-সগুণের ঐক্যভূমি। ইহা দ্বৈত বা অদ্বৈতভাব বিবর্জ্জিত বলিয়া দ্বৈতাদ্বৈত-বিবর্জ্জিত নাথস্বরূপ নামে অভিহিত হয়। ইহাতে ক্রিয়া ও অক্রিয়া উভয়ই স্থিত, শক্তি বা শিবের সামরস্য ইহাতেই দৃষ্ট হয়। নিরুত্থান দশামাত্র পরমপদ লাভ নহে, চাঞ্চল্যের বিশ্রান্তিই নিরুত্থানদশা, ইহা পরমপদে স্থিতির উপায় মাত্র। নৈরুত্থ্যদশালাভের পর 'উন্মনা' শক্তির আশ্রয়ে কেবলী পুরুষ পরমাবস্থা বা পূর্ণব্রহ্মরূপে যে স্থিতিলাভ করেন, তাহাই পরমপদে স্থিতি। সেই পূর্ণব্রহ্ম যুগপৎ সাকার ও নিরাকার এবং সাকার দৃষ্টিতেও যুগপৎ অভিন্ন একাকার ও ভিন্ন অনন্তকারময়। এই পদলাভের নিমিত্ত গুরু-উপদেশ ও পুরুষকারের প্রয়োজন এবং যোগ ও জ্ঞানের সমন্বয়ে তাঁহাকে লাভ করা কর্ত্তব্য।

যোগসাধনের দ্বারা মানবের অপক্ক দেহ পক্কতালাভ করিলে সেই দেহে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার সম্ভব হয়। তাই নাথসিদ্ধেরা যোগসাধন প্রণালীর উপর বিশেষ প্রাধান্য দিয়াছেন। নাথমতে সত্যবিচারে উৎপত্তি বলিয়া কিছু নাই, ব্যবহার দৃষ্টিতেই উৎপত্তি আলোচ্য এবং ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তির পরেও পরব্রহ্ম পূর্ণস্বরূপে অবস্থান করেন। সেই পরব্রহ্ম অনামা ও কার্য্যকারণহীন, তাঁহার পঞ্চশক্তি ও তাহাদের পঞ্চবিংশতি গুণ হইতে ষট্‌পিণ্ডের আবির্ভাব হয়, ষট্‌পিণ্ড হইতেই জীবের আবির্ভাব। জীবের

১। গোরক্ষবাণী, শ্লোক ২ ইত্যাদি।

মুক্তির প্রয়োজন এবং তাহার নিমিত্ত সাধন কর্ত্তব্য। জীবের মধ্যে কুণ্ডলিনী শক্তি সুপ্তা হইয়া অবস্থান করিতেছেন, জীব সাধনার দ্বারা তাঁহাকে প্রবুদ্ধ করিয়া নিজের মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ। এই সাধনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া নিবন্ধের 'সাধনা-অংশে' আলোচিত হইয়াছে।

নাথসিদ্ধেরা জগৎপ্রপঞ্চের পরমকারণরূপ শিবের সহিত কারণতারূপ শক্তিকে অভিন্ন মনে করেন। শিবকে পাইতে হইলে শক্তির সাধনা করিতে হইবে, তাই নাথ-সাধনমার্গে কুণ্ডলিনীর সাধন প্রচলিত। শিবের শক্তি মানবদেহে কুণ্ডলিনীরূপে অবস্থান করেন, সহস্রারে শিবের অবস্থান, মানব সাধনার দ্বারা মস্তকস্থ সহস্রদল কমল মধ্যে উহাদের মিলন সাধিত করিয়া ধন্য হয়। শক্তি ও শক্তিমান্ 'অহং-মমেত্তিবৎ'। এই শক্তি বেদান্তের মায়া হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বেদান্তমতে মায়াকে ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মকে লাভ করিতে হয়, কিন্তু তন্ত্রমতে শিবকে লাভ করিতে হইলে শক্তিকেও লাভ করিতে হইবে, শিব ও শক্তি চন্দ্র ও চন্দ্রিকার ন্যায় অভিন্ন। দ্বৈতের মধ্য দিয়া অদ্বৈতে ও সগুণের মধ্য দিয়া নির্গুণে উপনীত হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই, তাই পরমপদে অবস্থান করিতে হইলে শক্তির সাধনা আবশ্যক। জীব চৈতন্যস্বরূপ, ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভেদেই জীব ও ঈশ্বরে ভেদ, তাই জীবও শিবত্ব লাভ করিতে পারেন, তাহার জন্য জীবের শক্তি সঞ্চয় আবশ্যক। ভারতে প্রাচীন কাল হইতে শক্তিপূজা চলিয়া আসিতেছে, অদ্বৈতাগম-মতে শিব ও শক্তি অভিন্ন, মহাশক্তি তত্ত্বাতীত হইয়াও সর্ব্বতত্ত্বাত্মক। সিদ্ধমতে পরমতত্ত্ব দ্বৈত ও অদ্বৈত বিবর্জ্জিত, কারণ দ্বৈত বা অদ্বৈত উভয়ই পরমসত্যের একাংশমাত্র, ইহাই নাথমতের বৈশিষ্ট্য। দ্বৈতাদ্বৈতবিলক্ষণ পদে অবস্থানই মুক্তি, 'ওঁকার' সাধনদ্বারা এই মুক্তি লভ্য। ওঁকার সাধনেই কুণ্ডলিনীর জাগরণ হয়। কুণ্ডলিনীর জাগরণ বা মধ্যনাড়ীর পথ মুক্ত হওয়া একই কথা; এই নিমিত্ত নাথদের মধ্যে হঠযোগের ক্রিয়াসাধন প্রচলিত। কিন্তু মুক্তি একমাত্র লক্ষ্য নহে, মুক্তিসহ সিদ্ধিলাভের জন্য নাথপন্থে বিভিন্ন সাধন আছে। কৈবল্য অবস্থা প্রাপ্তিতে বা কেবল ব্রহ্মলাভে জীবের মোক্ষ হয় ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। নাথসিদ্ধেরা জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগ সাধন করিবার নিমিত্ত কায়ার প্রতি অধিক দৃষ্টি দেন। সিদ্ধসম্প্রদায় মধ্যে কায়া বা দেহ মুক্তিলাভের পক্ষে সহায়, আত্মার অভিব্যক্তির জন্যই শরীর-ধারণ হয়, অতএব শরীর মানবের শত্রু নহে, উহাকে কষ্ট দিয়া

ধর্ম্ম সাধন কর্ত্তব্য নহে, অত্যধিক সুখ বা অত্যধিক ক্লেশ উভয়ই শরীরের পক্ষে অনুপযোগী। তাই গোরক্ষ বলিয়াছেন—

কন্দর্প রূপ কায়াকা মণ্ডণ অবির্থাকাই উলীচৌ।
গোরখ কহৈ সুণৌ রে ভৌদূ, অরণ্ড অমী কত সীচৌ॥[১]

অর্থাৎ জীবদেহ কন্দর্পের ন্যায় স্বতঃ সুন্দর, তাহাকে বৃথা মণ্ডন করিয়া উল্টা করিয়া কি লাভ? গোরক্ষ বলেন—হে মূর্খ! অরণ্ড বৃক্ষকে অমৃত দিয়া কেন সিঞ্চন করিতেছ?

কায়া জরামৃত্যুর অধীন, নাথযোগীরা কায়াকে অজর অমর করিয়া বালস্বরূপ রাখিবার প্রয়াসে রসায়নবিদ্যার সহায়তা গ্রহণ করিতেন। গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহে "রসায়নী মহাবিদ্যা সিদ্ধির্ভবতি নিশ্চিতম্"।[২] পাওয়া যায়। রসায়নের প্রয়োগে শরীরকে কিয়ৎকাল অবধি রোগ ও জরা হইতে মুক্ত রাখা যায়, কিন্তু উহা স্থায়ী নহে বলিয়া নাথযোগীরা উহাকে সিদ্ধিপ্রাপ্তির পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া স্বীকার করেন না, উহার সহিত যম ও নিয়মের আচরণ কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন। ষট্‌কর্ম্ম ও আসন-মুদ্রাদির দ্বারা কালবিজয়ী হওয়া ইঁহাদের লক্ষ্য। অমৃতপানই মুখ্যতম সাধন কিন্তু "অমাবস কৈধরি কিলিমিলি চন্দা, পুনিম কৈধরি সুর"—অর্থাৎ সহস্রারে অমৃতস্রাবক চন্দ্রমা অবস্থিত কিন্তু তাহার স্রাব মূলাধারস্থিত সূর্য্য গ্রহণ করে বলিয়া চন্দ্রমা ঝিলমিল হইয়া প্রকাশিত হইলেও অমাবস্যা বিরাজ করিতেছে, তাই গোরক্ষ বলিতেছেন, মীনের মার্গপথে যাও, চন্দ্রের বিরোধী ভানুকে চন্দ্রের সম্মুখীন কর এবং এইরূপে অমৃত রসাস্বাদন কর, তাহাদ্বারা কালজয়ী হইবে। মীন বা মৎস্য নদীর ধারার বিপরীত গতিতে গমন করে, কিন্তু নদীর জলের মধ্যে সে সংবাদ কেহ রাখে না, যোগমার্গও এইরূপ গুপ্ত।[৩]

শিবসংহিতাতেও আছে, "মেরুমূলে স্থিতঃ সূর্য্যঃ কলাদ্বাদশসংযুতঃ। পীযূষরশ্মিনির্য্যাসং ধাতূংশ্চ গ্রসতি ধ্রুবম্"।[৪] তাই সুষুম্নার মধ্যবর্ত্তী চিত্রানাড়ীর সহায়ে কুণ্ডলিনীকে সহস্রারে নীত করা ও অমৃতপান যোগিজনের সাধন। এই সাধনপথে বিন্দুরক্ষার প্রতি লক্ষ্য রাখিবার

১। নাথপন্থমে যোগ, পীতাম্বর দত্ত বড়থ্বাল, কল্যাণ যোগাঙ্ক পৃ ৭০১।

২। গো. স. স, পৃ ৪৫ রুদ্রযামাল রসসাধন প্রণালী।

৩। গোরক্ষবাণী—শ্লোক ১৪, ১১৫ বড়থাল।

৪। যোগাম্বুধি, পৃ ৯৪ ; শিবসংহিতা ২।১০,১১ প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী কর্ত্তৃক অনুদিত ও সঙ্কলিত (১৩২১)

উপদেশ নাথমার্গে বারম্বার পাওয়া যায়। গোরক্ষ বলিয়াছেন, বজ্রোলী মুদ্রাসাধন করিতে যে অমরোলী রক্ষা করে, অমরোলী সাধনে যে বায়ুকে রক্ষা করে, ভোগ করিয়াও যে বিন্দুকে রক্ষা করে, সে-ই গোরক্ষের ভাই অর্থাৎ সমকক্ষ।[১] অগ্নির সম্মুখে পারদ রাখার ন্যায় এই পরীক্ষা অতীব কঠিন। অন্যত্রও মৎস্যেন্দ্রের পতনে গোরক্ষনাথ গুরুকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন—

গুরুজী এসা কাম ন কীজৈ। জাতে অমী মহারস ছীজৈ।
নদীঢিগ বিরখা, নারী সঙ্গ পুরখা
অলপু জীবণুকী আশা।
মনকী চাল মের খিসত হৈ তাতে কন্ধ বিনাসা।

অর্থাৎ হে গুরু! এমন কাজ করিও না, যাহা দ্বারা মহারসের নাশ হয়। নদীতীরের বৃক্ষ, নারীর সঙ্গে পুরুষ, তাহাদের বহুদিন জীবনের আশা নাই। মনের অস্থিরতা ও বন্ধনহীনতা হইতে মেরুদণ্ডের ক্ষয় ও জীবননাশ হয়।[২]

নাথযোগীর ঊর্দ্ধরেতা হইবার সাধন, অমৃত আস্বাদনের নিমিত্ত বিবিধ বন্ধ, মুদ্রা ও কুম্ভক সাধনদ্বারা প্রাণবায়ুকে সুষুম্না অন্তর্গত করা বিধি। শরীরস্থ অসংখ্য লোমকূপ বন্ধ রাখিয়া ও নবদ্বার রুদ্ধ করিয়া পবন-রোধের নাম 'বায়ুভক্ষণ'। নাথপন্থে ইহার সাধন অতীব প্রয়োজনীয় অঙ্গ। ইহা দ্বারা বিন্দু স্থির হয় ও অমৃতের আস্বাদন সম্ভব হয়, আত্মজ্যোতির দর্শন ঘটে। চিত্তবৃত্তিকে অন্তর্মুখী করাই যোগের অন্যতম সাধন, কায়াশোধনের দ্বারা বৃত্তি অন্তর্মুখী হইলেও মনবশ আবশ্যক, মনই কায়ার কেন্দ্রস্বরূপ। মনকে স্থির রাখিবার উপায় 'অজপা-জপ' সাধন বা নাদসাধন। ইহাতে প্রত্যেক শ্বাসের সহিত অদ্বৈত ভাবনা কর্ত্তব্য। এই সাধন মধ্যে যোগীর চতুর্ব্বিধ অবস্থা হয়—আরম্ভ, ঘট, পরিচয় ও নিষ্পত্তি অবস্থা।

আরম্ভযোগী নিশ্চল একরসে মগ্ন থাকিয়া ক্ষণে ক্ষণে শরীরের বিচার ও বিন্দুরক্ষা করেন, ঘটাবস্থায় সুখদুঃখকালাতীত হইয়া যোগী অমর বারুণী পান করেন। পরিচয় অবস্থায় যোগী উন্মন সমাধিতে ক্রীড়ারত থাকেন, ইচ্ছানুসারে পরমতত্ত্বে লীন হন, আবার অষ্টসিদ্ধি দ্বারা

১। গোরক্ষবাণী, শ্লোক ১৪১।

২। গোরক্ষনাথ' ডাঃ সিং পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য। কল্যাণ যোগাঙ্ক, নাথপন্থে যোগ প্রবন্ধে উল্লেখ।

নানা রূপ ধারণ করেন। নিষ্পত্তি-অবস্থাপ্রাপ্ত যোগী সমদৃষ্টি হন, তাঁহার ভেদাভেদ জ্ঞান থাকে না এবং অগ্নি ও জলে যেরূপ লৌহ শুদ্ধ হয় তদ্রূপ নানা কঠোর সাধনা দ্বারা তাঁহার দেহ শুদ্ধ হইয়া যায় (গোরখবাণী, শ্লোক ১৩৬-১৩৯)। কথিত আছে গোরক্ষনাথ সিদ্ধাসনসহ খেচরীমুদ্রা সাধন দ্বারা যোগসিদ্ধ হন। নাথসিদ্ধেরা হঠযোগী হইলেও মধ্যমমার্গী, শরীরকে অযথা কষ্ট দিবার তাঁহারা বিরোধী। শরীররক্ষাও কর্ত্তব্য অথচ সে শরীর যেন জীবকে সংসারে আবদ্ধ না করে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখাও কর্ত্তব্য, তাই নাথপন্থ ত্যাগ ও ভোগের সমন্বয় সাধনের উপদেশ দেন।

মৎস্যেন্দ্র গোরক্ষকে উপদেশ দিয়াছেন—

অবধূ রহিবা হাটে বাটে রূখ বিরখকী ছায়া
তজিবা কাম ক্রোধ তিস্না ঔর সংসারকী মায়া ॥
খায়েভী মরিয়ে, অণখায়ে ভী মরিয়ে।
গোরখ কহৈ পূতা সংজমী হী তরিত্র।
ধায়ে ন খাইবা, ভূখে ন মরিবা
অহনিসি লেবা ব্রহ্ম অগিনি কা ভেবং।
হঠ না করিবা পড়ে না রহিবা
যূঁ বোল্যা গোরখ দেবং ॥[১]

জালন্ধরের উক্তিতেও আহারাদি বিষয়ে মধ্যপথ অবলম্বনের কথা আছে।[২] আহার-বিহারে সংযম সাধন করিলে মনের চঞ্চলতা নিবারিত হয়। গীতাতেও "যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু। যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগী ভবতি দুঃখহা ॥" ইত্যাদি উপদেশের দ্বারা সংসারদুঃখ-নাশের পন্থা নির্দ্দেশিত হইয়াছে। গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালনানন্তর সন্ন্যাস অবলম্বনে কোন মাহাত্ম্য নাই, কালযোগীই কৈবল্যলাভে সমর্থ, ইহা নাথপন্থের মত। নবদ্বার রুদ্ধ করিয়া দশমদ্বারে সমাধিস্থ হইয়া অমৃতপানরত কালজয়ী যোগী পরমপদে পিণ্ডলয় করিতে সমর্থ হন। ইহার জন্য যে শক্তি লাভের প্রয়োজন তাহা বার্দ্ধক্যে লাভ করা সম্ভব নহে, কারণ তখন শরীরস্থ নাড়ী সকল শিথিল হইয়া যায়। অতএব অপক্ক দেহকেই সাধনদ্বারা পক্ক করিতে হইবে। গোরক্ষনাথ বলিয়াছেন, "বায়ু, জীবন, শরীর ও বিন্দু

১। নাথপন্থমে যোগ, কল্যাণ যোগাঙ্ক
২। ঐ ঐ

সবই কাঁচা আছে, তাহারা কিরূপে পাকিবে? কিরূপে সিদ্ধ হইবে? কাঁচা অগ্নিতে নীর থাকিতে পারে না। হে দেবি, বায়ু, জীবন, শরীর ও বিন্দু পক্ক হয় যখন ব্রহ্মাগ্নি অখণ্ডরূপে প্রজ্বলিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মাগ্নি বা যোগাগ্নি সিদ্ধ হইলে জলময়ী প্রকৃতি জ্বলিয়া উঠেন।[১]

নাথপন্থে নিরক্ষর বিপ্র ও গৃহস্থ যোগীর সঙ্গত্যাগ কর্ত্তব্য, এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে এরূপ বাণী উচ্চারণ কর্ত্তব্য বিবেচিত হয় (গোরখবাণী, শ্লোক ২৬১, ২৬৩)। গোরক্ষ বলিয়াছেন—

শব্দ হমারা খরতর খাড়া রহণি হমারী সাচী।
দেখৈ লিখী না কাগদ মাড়ী সো পত্রী হম বাচী॥
মন বাধুগা পবন স্যু পবন বাধুগা মন স্যু।
তব বোলৈগা কোবত স্যু॥[২]

অর্থাৎ নাথদের উচ্চারিত শব্দ খাঁড়ার ন্যায় এবং রহণিও তাহার অনুরূপ। তাঁহারা পরমাত্মা প্রেরিত সেই পত্র পড়িয়াছেন যাহা লেখাও হয় নাই, কাগজেও নাই। যখন মন ও পবন একত্রে বাঁধা পড়িবে, তখনই অনাহদ নাদের (কোবত = শক্তি) উচ্চারণ হইবে।

এই সংসারপাশে আবদ্ধ জীবের পক্ষে কুণ্ডলিনী উদ্ধারকর্ত্রী, যোগসাধন দ্বারা তাঁহাকে মণিপুরচক্র হইতে বা মূলাধার হইতে উত্থিত করিয়া পশ্চিমমার্গে অর্থাৎ সুষুম্নামার্গে নীত করিতে হইবে। "নাথ কহে মেরা দুন্থো পন্থ পূরা" অর্থাৎ নাথমতে 'যত' ও 'সত' বা শারীরিক সংযম ও হৃদয়ের দৃঢ়ভাব উভয় পন্থাই পূর্ণ হইয়াছে,—একটী তাহার ক্রিয়া, অন্যটী রহণি ; যে রহণি স্থায়ী তাহাই নাথের গুরু, দর্শন (কুণ্ডল), তাহার পিতামাতা, ইহার ভেদ যে জানে সে স্বয়ং কর্ত্তা, স্বয়ং দেব। যে নাসাগ্রে বা ভ্রূমধ্যে দিনরাত দৃষ্টি স্থির করিতে পারে তাহার গমনাগমন মিটিয়া যায়, গোরক্ষ এইরূপ বলেন। এইরূপ যোগীর 'সমরসীকরণ' হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই পরমপদে স্থিতির উপায় গোরক্ষের বচনে—

আসন বাঁধৌ বাসন বাঁধৌ অন্ন বাঁধৌ নবদ্বার।
তাহি বাঁধৌ তেরে গুরু কো বাঁধৌ নিকসো কৌনে দ্বারা।

*　　*　　*　　*

১। গোরক্ষবাণী, শ্লোক ১৫৬, ১৫৭

২। গোরখবাণী, শ্লোক ২৬৪ ইত্যাদি।

শব্দ কহাঁ সে আয়া কহো শব্দ কা বিচার।
মহী তো মালা তিলক ধরো উতার ॥[১]

অর্থাৎ নবদ্বার রুদ্ধ করিয়া আসন সিদ্ধ হইলে, পরমপদে স্থিতিলাভ সম্ভব হয়। শব্দের বিচার কর্ত্তব্য, নহিলে তিলক-মালা ধারণ মিথ্যা।

গোরক্ষের এই বাক্য গোরখ-গোষ্ঠী (অর্থাৎ কবীরের সহিত গোরক্ষের জ্ঞানালোচনা নামক গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে কবীর দ্বৈতবাদী গোরক্ষকে অদ্বৈতবাদী করেন এইরূপ ভ্রান্তিপূর্ণ মতবাদ আছে। প্রথমতঃ কবীরের যুগে গোরক্ষের পাঞ্চভৌতিক দেহে অবস্থান সম্ভব নহে, দ্বিতীয়তঃ গোরক্ষের পন্থা ছিল দ্বৈতাদ্বৈত-বিবর্জ্জিত, ইহা দ্বৈত ও অদ্বৈত উভয়ের পরবর্ত্তী স্থানে নাথস্বরূপে অবস্থানের সাধন। অতএব বুঝা যায়, গোরক্ষের প্রাধান্যের যুগের পরবর্ত্তী কালে তাঁহার সম্বন্ধে কত প্রমাদপূর্ণ মতামত সাধারণ্যে প্রচলিত হয়। কবীর অদ্বৈতবাদী ছিলেন ইহা সত্য, এবং 'গোরক্ষ-গোষ্ঠী' কবীর সম্প্রদায়ের গ্রন্থ বলিয়া কবীরকে প্রাধান্য দিবার জন্য গোরক্ষকে দ্বৈতবাদী করা হইয়াছে। ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই।

গোরক্ষের মতানুযায়ী 'নাথস্বরূপ' বা 'পরমপদে'র বিচার এই নিবন্ধের 'সিদ্ধান্ত-অংশে' প্রথমেই করা হইয়াছে। সংক্ষেপতঃ বলা যায়, গুরুর কৃপাকটাক্ষে যে নিরুত্থানদশালাভ হয় তাহাই স্বদেহে আত্মসংবেদ্য অবস্থা।[২] ইহা প্রাপ্ত হইলে পরমপদের সহিত সামরস্য লাভ হয় এবং ভেদাভেদ তিরোহিত হয়। নিজ পিণ্ডের জ্ঞানের সিদ্ধিতে স্বভাবতঃই পরমপদের সহিত ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন জগতের সকল জ্ঞান উদিত ও সিদ্ধিসকল করতলগত হয়। এই জ্ঞানের চারিটী অবস্থা-ভেদ আছে, প্রথমতঃ সহজ জ্ঞান বা বিশ্বমধ্যে বিশ্বময়কে দর্শন (সহজাবস্থা লাভের জন্যই যোগসাধন কর্ত্তব্য)—অর্থাৎ তুরীয়াতীত পরমাত্মাকে বিশ্বের অণুতেও প্রত্যক্ষকরণ। দ্বিতীয় অবস্থায় 'সংযম জ্ঞান' বা স্ফুরণশীল বৃত্তির আত্ম-মধ্যে সংযমন (তুলনীয় যোগসূত্র—'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ')। তৃতীয় অবস্থায় 'উপায়জ্ঞান' বা প্রকাশময় আত্মাকে স্বরূপতঃ অভিব্যক্ত করিয়া সর্ব্বদা লৌল্য বা উত্তম অবস্থায় স্থিতিলাভ। চতুর্থ অবস্থায় 'অদ্বয় জ্ঞানে'র অবস্থা বা আত্মস্বরূপে অবস্থান এবং তখন জাতি প্রভৃতি

১। গোরখ-গোষ্ঠীতে গোরক্ষবচন ১৯, ১৫ পৃ ৪৭, ৪৬ দ্রষ্টব্য।—বাবা লক্ষ্মণদাসজী, বেণারস।

২। সি. সি স ৫।৭, ৮।

বিকল্পের আত্যন্তিক অভাব দৃষ্ট হয়। এই চতুর্ব্বিধ ভাব হইতে পরাবস্থার উদয় হয়। পরাবস্থা-প্রাপ্ত যোগী তৃপ্ত ও নির্ব্বিকল্পভাবে নিরুত্থানপদে বিরাজমান থাকেন। তাই উক্ত হইয়াছে—

সহজং সাত্মসংবিত্তিঃ সংযমঃ সর্ব্বনিগ্রহঃ।
স্বোপায়ং স্বাস্থ বিশ্রান্তিরদ্বৈতং পরমং পদম্‌॥[১]

এই নাথ অবস্থায় স্থিতি হইলে পুনরুত্থান হয় না এবং যোগলাভ সম্ভব হয়।

মোক্ষ দ্বিপ্রকার—'জীবন্মুক্তি' ও 'বিদেহমুক্তি'। নাথমতে ও সন্তমতে জীবন্মুক্তি আদর্শ, সিদ্ধদেহ লাভ করিয়া 'মুক্তি'কে রক্ষা করিতে হয়, মৃত্যুতে মুক্তি হয় সিদ্ধমতে এ কথা ভ্রান্তি। (অন্যান্য মার্গ হইতে নাথমার্গে মুক্তি সম্বন্ধে ভেদ এই নিবন্ধের জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি, অপরা ও পরামুক্তি অধ্যায়ে 'সিদ্ধান্ত-অংশে' দ্রষ্টব্য।) গুরুর সাহায্য ব্যতিরেকে মুক্তি লভ্য নহে, গুরুর কৃপাকটাক্ষ বিনা সহজাবস্থালাভ হয় না, নাথগুরু যোগ্যতা বিচার পূর্ব্বক শিষ্য গ্রহণ করেন, অবধূতই নাথমতে আদর্শ যোগী ও আদর্শ গুরু এবং শিষ্য পুত্র অপেক্ষা প্রিয়। গুরুর আদেশে শিষ্য নিয়ম ও আচারাদি মান্য করিয়া চলিলে মোক্ষলাভ হইবেই। এই সাধনের নিমিত্ত নাড়ীচক্রের ও নাড়ীশুদ্ধির জ্ঞান আবশ্যক, কারণ যোগানুষ্ঠানের ক্ষেত্র এই দেহ, মন, ইন্দ্রিয়কে সুসংস্কৃত করিয়া যোগসাধনের উপযোগী করা কর্ত্তব্য। অতএব নাথমার্গে হঠযোগের উপদেশ আছে, কিন্তু হঠযোগ রাজযোগে আরোহণ করিবার সোপান স্বরূপ গণ্য হয় মাত্র। হঠযোগীকে যথার্থ যোগী বলা যায় না, ঘটশোধনান্তে রাজযোগে বা উন্মনী সমাধিতে মগ্ন যোগীই যথার্থ 'যোগী'-পদবাচ্য। নাদানুসন্ধান এবং ওঁকার সাধন যোগসাধনের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অঙ্গবিশেষ। মুক্তিলাভের দুইটী পন্থা—সদ্যোমুক্তি ও ক্রমমুক্তি বা 'বিহঙ্গমমার্গ' ও 'পিপীলিকামার্গ'; শুকদেব ও বামদেব কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হয়, ইহা উপনিষদাদিতে দৃষ্ট হয়,[২] পিপীলিকা-মার্গে অষ্টাঙ্গ হঠযোগসাধনে অণিমাদি সিদ্ধিলাভ করতঃ যোগী উত্থান-পতনের বিবর্ত্তনে বারম্বার জন্মলাভ করিয়াছেন, ক্রমবিকাশ দ্বারা একজন্মেই স্ব-স্বরূপে অবস্থান সম্ভব নয়, ইহাই 'পরমপদে পিণ্ডলয়' বা 'সমরসীকরণ'। এই ক্রম দুইটীকে মর্কটক্রম ও কাকমত বলিয়াও উল্লেখ করা হইয়াছে।[৩]

১। সি সি. স ৫।১৪। ২। বরাহ উপনিষদ, চতুর্থ অধ্যায় ৩৬-৪২ শ্লোক।
৩। যোগশিখোপনিষদ ১৪০-১৫৩ শ্লোক, যোগবীজ দ্রষ্টব্য।

নাথমতে জরামৃত্যুশীল দেহের বৃত্তান্ত জানিয়া 'কায়সিদ্ধ' করিয়া তৎসহ সাধন দ্বারা মুক্তিলাভ করিলে পুনর্জ্জন্ম হইতে অব্যাহতি লাভ সম্ভবপর হয়। রসেশ্বর সম্প্রদায়ের 'হরগৌরীতনু', বৌদ্ধসম্প্রদায়ের 'বজ্রদেহ', সিদ্ধমার্গের 'দিব্যদেহ' বা 'সিদ্ধদেহ' (মতান্তরে বৈন্দবদেহ) একই কথা। কালের গতির উর্দ্ধে স্থিতিলাভই লক্ষ্য। 'দেহতত্ত্ব' বিচার বা 'পিণ্ডমধ্যে ব্রহ্মাণ্ডে'র জ্ঞান সিদ্ধ-সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য, পাশ্চাত্য দেশেও পিণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডের কল্পনা এবং পিণ্ড রক্ষার্থে রসায়নের ব্যবহার প্রচলিত ছিল (সিদ্ধান্ত ও সাধনা অংশে দেহতত্ত্ব ও কায়সিদ্ধি অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। অতএব প্রাচীনকালের সাধক সম্প্রদায় বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন জাতিদ্বারা বিভক্ত হইলেও তাহাদের মধ্যে সাধনগত ঐক্য দেখা যায়। ভারতবর্ষে প্রাচীনযুগ হইতে শূন্যতত্ত্বের ধারণাও প্রচলিত ছিল, বৌদ্ধ, জৈন, নাথ, সন্ত সম্প্রদায় মধ্যেও শূন্যতত্ত্বের আলোচনা বা উল্লেখ দেখা যায় (সিদ্ধান্ত অংশের শূন্যতত্ত্ব অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। অতএব সকল সম্প্রদায়ের অন্তরঙ্গ সাধন মধ্যে ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যায়। বৌদ্ধযুগের অবসানে 'যোগে'র প্রাধান্য লক্ষিত হয়, নাথপন্থেও 'জ্ঞানযুক্ত যোগে'র বা মহাজ্ঞানের প্রাধান্যের উল্লেখ বারম্বার পাওয়া যায়। বস্তুতঃ নাথপন্থী সাধকেরা একদা 'ওঁকার' সাধনের যথার্থ অধিকারী ছিলেন এবং যোগের দ্বারা তাঁহারা পরমপদের সন্ধান পাইয়া ভারতব্যাপী খ্যাতি অর্জ্জন করেন, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। বহুশতাব্দী গত হইলেও তাঁহাদের অপূর্ব্ব কীর্ত্তিকথা ও জয়গাথা অদ্যাপি ভারতের উত্তর পশ্চিম পূর্ব্ব ও দক্ষিণ প্রান্ত হইতে ধ্বনিত হইতেছে।

শব্দ-সূচী

(পৃষ্ঠার সংখ্যা দেওয়া হইল)

চ

চন্দ্র ও সূর্য্য

চৌরঙ্গীনাথ

ছ

জ

জীবদেহ

ম

য

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫	৭	নামধর্ম্ম	নাথধর্ম্ম
১৩	৪	লব	সব
১৪	২২ পংক্তির পরে		যোজনা হবে-- "মৈনামতিরে গোর্খনাথে ব্রহ্মজ্ঞান কএ" (২য় খণ্ড পৃ ৩৪৪)
১৮	ফুটনোট ১	G. R. E.	E. R. E.
২৩	১৮	অলোলিক	অলৌকিক
২৬	৬	ফাউচাব	ফ্রুশে
৩০	৩	মচ্ছেন্দ্রর শিষ্য গোবক্ষ ও জালন্ধরিপা	মচ্ছেন্দ্রের শিষ্য গোরক্ষ। জালিন্ধরিপাদ পা-পন্থের প্রবর্ত্তক
৪০	১৫	তোযচিতে	তোষচিতে
৪১	১৯	শঙ্করের সময়ে (৭৮৮—৮৫০ খৃঃ)	শঙ্করের সময়ে (৭৮৮—৮২০ খৃঃ)
৪৭	ফুটনোট ১	indischin Litterature	indischen Litteratur
৫০	ফুটনোট ১ ৫ লাইন	Con Pro: p. 495 ডবার ছাপা হয়েছে	Pandurang Sarma
৫৪	১৬	১৯৩৫ বা ১০৩৮ খৃষ্টাব্দে	১০৩৫ বা ১০৩৮ খৃষ্টাব্দে
৬৪	১৭	সমাবেশ হইল। "ধর্ম্মঠাকুরে"	সমাবেশ হইল ধর্ম্মঠাকুরে।
৭৯	ফুটনোট ২		ইহা পৃষ্ঠা ৮০র প্রথম প্যারার ফুটনোট
১১৯	১	সভগ্ন-দ্রজ	সভস্ম-দ্রজ
১২৩	১৩	গোরক্ষকল্প (ক) এর পাদটীকা (৩) (খ) এর পাদটীকা (২)	গোরক্ষকনা (ক) এর পাদটিকা (২) (খ) এর পাদটীকা (৩. 'বিবেক-মার্ত্তণ্ড' নাম যুক্ত হবে

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১২৬	৩	রাজগৃহ	রাজগৃহ্য
১২৯	১১	চৈত্র ১৩৯	চৈত্র ১৩২৯
১৪৭	৬	নাথজাপে	নাথমার্গে
১৪৮	৮	বড়সির ছিপ	বড়সির ছিপ
১৪৯	২৫	সপ্ত আশার	সপ্ত হাজার
১৫২	২৫	সিংহল দেশে অজন্তা	সিংহল দেশে ও অজন্তা
.	২৯	যন্ত্রযানের	মন্ত্রযানের
১৬০	৪	প্রমাণ—ম শতাব্দীব	প্রমাণ সপ্তম শতাব্দীর
১৯৪ ইত্যাদি	২৬ ইত্যাদি	ত্রিক্	ত্রিক
১৯৫	১৭, ১৮	শিবসূত্রমর্শিনী	শিবসূত্রবিমর্শিনী
১৯৫ } ১৯৭ }	শিরোনামে	বৌদ্ধ সম্প্রদায়েব	শৈব সম্প্রদায়ের
৩৭৫	২	তত্ত্বদর্শক	তত্ত্বপ্রদর্শক
৪৩৩	ফুটনোট ১	Heirdi	Hindi
৪৮৯	নীচের দিকে	বিজ্ঞানফল, প্রলয়াফল	বিজ্ঞানকল, প্রলয়াকল
		আর্ণব	আণব
৫০৫	৩	Johne	John
৫৩০	ফুটনোট ২	Somma	Sauma
৫৪২	ফুটনোট ২	Q.	A.
৫৫৫	ফুটনোট ১	কৌলতান নির্ণয়	কৌলজ্ঞান-নির্ণয়
৫৪৭	১২	অথাভিমত···	যথাভিমত
৫৫৩	শিরোনাম	অবধুত	অবধূত

পরিশিষ্ট

श्रीगोरक्षनाथकृत-

सिद्धसिद्धान्तपद्धतिः

प्रथमोपदेशः

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

आदिनाथं नमस्कृत्य शक्तियुक्तं जगद्गुरुम् ।
वक्ष्ये गोरक्षनाथोऽहं सिद्धसिद्धान्तपद्धतिम् ॥१॥

* * * *

यदा नास्ति स्वयं कर्त्ता कारणं न कुलाकुलम् ।
अव्यक्तं च परं ब्रह्म अनामा विद्यते तदा ॥४॥

अनामेति स्वयमनादिसिद्धमेकमेवानादिनिधनं सिद्धसिद्धान्तप्रसिद्धं तस्येच्छामात्रधर्माधर्मिणीनिजा शक्तिः प्रसिद्धा ॥५॥

तस्योन्मुखत्व मात्रेण परा शक्तिरुत्थिता ॥६॥
तस्याः स्पन्दनमात्रेण अपरा शक्तिरुत्थिता ॥७॥
ततोऽहन्तार्धमात्रेण सूक्ष्मशक्तिरुत्पन्ना ॥८॥
ततो वेदनशीला कुण्डलिनी शक्तिरुद्गता ॥९॥

* * * *

अस्तिता अप्रमेयता अभिन्नता अनन्तरता अव्यक्तता इति पञ्चगुणा परा शक्तिः ॥११॥

* * * * *

निरंशता निरन्तरता निश्चलता निश्चयता निर्विकल्पता इति पञ्चगुणा सूक्ष्मा शक्तिः ॥१३॥

पूर्णता प्रतिबिम्बता प्रबलता प्रोच्चलता प्रत्यङ्मुखता इति पञ्चगुणा कुण्डलिनी शक्तिः ॥१४॥

* * * * *

अपरम्परास्स्फुरत्तामात्रमुत्पन्नं परमपदाद्भावनामात्रमुत्पन्नम्
शून्यात् स्वसत्तामात्रमुत्पन्नं निरञ्जनात्स्वसाक्षात्कारमुत्पन्नं
परमात्मनः परमात्मोत्पन्नः ॥१८॥

उक्तञ्च :—अपरम्परं परमपदं शून्यं निरञ्जनं परमात्मा
पञ्चभिरेतैः सगुणैरनाद्यपिण्डः समुत्पन्नः ॥२४॥

* * * *

उक्तञ्च—परमानन्दः प्रबोधः चिदुदयः चित्प्रकाशः ।
सोऽहं भाव इत्यन्तः आद्यपिण्डो महातत्त्वगुणयुक्तः समुत्थितः ॥३०॥
आद्यान्महाकाशः महाकाशान्महावायुः महावायोर्महातेजः ।
महातेजसो महासलिलं महासलिलान्महापृथ्वी ॥३१॥
अवकाशः अच्छिद्रं अस्पृश्यत्वं नीलवर्णत्वं शब्दत्वमिति
पञ्चगुणो महाकाशः ॥३२॥
सञ्चारः सञ्चालनं स्पर्शनं शोषणं धूम्रवर्णत्वमितिपञ्चगुणोमहावायुः ॥३३॥
दाहकत्वं पाचकत्वं उष्णत्वं प्रकाशत्वं रक्तवर्णत्वमिति
पञ्चगुणं महातेजः ॥३४॥
प्रवाहः आप्यायनं द्रवः रसः श्वेतवर्णत्वमिति पञ्चगुणं महासलिलं ॥३५॥
स्थूलता नानाकारता काठिन्यं गंधः पीतवर्णत्वमिति पञ्चगुणा महापृथ्वी ।
इति महासाकारपिण्डस्य पञ्चतत्त्वं पञ्चविंशतिगुणाः ॥३६॥

* * * * *

तद्ब्रह्मणः सकाशादवलोकनेन नरनारीरूपः प्रकृतिपिण्डः
समुत्पन्नस्तच्च पञ्चपञ्चात्मकं शरीरमिति ॥३८॥
अस्थिमांसत्वङ्नाडीरोमाणि इति पञ्चगुणा भूमिः ॥३९॥
लाला मूत्रं शुक्रं शोणितं स्वेद इति पञ्चगुणा आपः ॥४०॥
क्षुधा तृषा निद्रा कान्तिरालस्यमिति पञ्चगुणं तेजः ॥४१॥
धावनं भ्रमणं प्रसारणं आकुञ्चनं निरोधनमिति पञ्चगुणो वायुः ॥४२॥
रागो द्वेषो भयं लज्जा मोह इति पञ्चगुण आकाशः ॥
इति पञ्चविंशतिगुणानां भूतानां प्रकृतिपिण्डः ॥४३॥
मनो बुद्धिरहङ्कारश्चित्तं चैतन्यमित्यन्तःकरणपञ्चकम् ॥४४॥
संकल्पः विकल्पः मूर्च्छा जड़ता मननमिति पञ्चगुणं मनः ॥४५॥
विवेको वैराग्यं शान्तिः सन्तोषः क्षमा इति पञ्चगुणा बुद्धिः ॥४६॥
अभिमानं मदीयं मम सुखं मम दुखं ममेदमिति पञ्चगुणोऽहंकारः ॥४७॥
मति धृतिः स्मृतिस्त्यागः स्वीकारः इति पञ्चगुणं चित्तम् ॥४८॥
विमर्शः तच्छीलनं धैर्यं चिन्तनं निस्पृहत्वमिति पञ्चगुणं चैतन्यम्
एवं अन्तःकरण गुणाः ॥४९॥
सत्वं रजस्तमः कालो जीव इति कुलपञ्चकम् ॥५०॥

* * * * *

जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिस्तुर्यं तूर्यातीतमिति पञ्चावस्थागुणो जीवः ॥५५॥

इच्छा क्रिया माया प्रकृति वागिति व्यक्तिशक्तिपञ्चकम् ॥५६॥
उन्मादो वासना वाञ्छा चिन्ता चेष्टेति पञ्चगुणा इच्छा ॥५७॥
स्मरणमुद्योगः कार्यं निश्चयः स्वकुलाचार इति पञ्चगुणा क्रिया ॥५८॥
मदो मात्सर्यं दम्भः कृत्रिमत्वं असत्यमिति पञ्चगुणा माया ॥५९॥
आशा तृष्णा स्पृहाकांक्षा मिथ्या इति पञ्चगुणा प्रकृतिः ॥६०॥
परा पश्यन्ती मध्यमा वैखरी मातृका इति पञ्चगुणा वाक्।
इति व्यक्तिशक्तिपञ्चविंशतिगुणाः ॥६१॥

* * * * *

॥ इति गोरक्षनाथकृतौ सिद्धसिद्धान्तपद्धतौ पिंडोत्पत्तिर्नाम-
प्रथमोपदेशः ॥१॥

द्वितीयोपदेशः

* * * * *

अथ व्योमपञ्चकं लक्षयेत् ॥ आकाशं पराकाशं महाकाशं तत्त्वाकाशं सूर्याकाशमिति व्योमपञ्चकम्। बाह्याभ्यन्तरेऽत्यन्तं निर्मलं निराकारमाकाशं लक्षयेत्। अथवा बाह्याभ्यन्तरेऽत्यन्तान्धकारनिभं पराकाशमवलोकयेत्। अथवा बाह्याभ्यन्तरे कालानलसंकाशं महाकाशमवलोकयेत्। अथवा बाह्याभ्यन्तरे निजतत्त्वस्वरूपं तत्त्वाकाशमवलोकयेत्। अथवा बाह्याभ्यन्तरे सूर्यकोटिसदृशं सूर्याकाशमवलोकयेत्। एवं व्योमपञ्चकावलोकनेन व्योमसदृशो भवति ॥३०॥

उक्तञ्च:—नवचक्रं कलाधारं त्रिलक्ष्यं व्योमपञ्चकम्।
सम्यगेतन्न जानाति स योगी नामधारकः ॥३१॥

अथ अष्टाङ्गयोगः ॥ यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोऽष्टावङ्गानि। यम इति उपशमः सर्वेन्द्रियजयः आहारनिद्राशीतवातातपजयश्चैवं शनैः शनैः साधयेत् ॥३२॥

॥ इति गोरक्षनाथकृतौ सिद्धसिद्धान्तपद्धतौ पिण्डविचारो नाम
द्वितीयोपदेशः ॥२॥

चतुर्थोपदेशः

अथ पिण्डाधारः कथ्यते ॥

अस्ति काचिदपरम्परा संवित्स्वरूपा सर्वपिण्डाधारत्वेन नित्यप्रबुद्धा निजा शक्तिः प्रसिद्धा कार्यकारणकर्तृत्वामुत्थानदशांकुरोन्मीलनेन कर्त्तारं करोति अतएवाधारशक्तिरिति कथ्यते। अत्यन्तनिजप्रकाशस्वसंवेद्यानुभवैकगम्यमानशास्त्रलौकिकसाक्षात्कारसाक्षिणी सापरा चिद्रूपिणी शक्तिर्गीयते। सैव शक्तिर्यदा सहजेन स्वस्मिन्नुन्मीलिन्यां निरुत्थानदशायां वर्त्तते तदा शिवः सैव भवति ॥१॥

अतएव कुलाकुलस्वरूपा सामरस्यनिजभूमिका निगद्यते ॥२॥

कुलमिति पराभासत्वादहन्ता सत्तां स्फुरत्ताकलास्वरूपेण सैव पञ्चधा विश्वस्याधारत्वेन तिष्ठति ॥३॥

अतएव परापरा निराभासावभासकात्मप्रकाशस्वरूपा या सा परा ॥४॥

अनादि-संसिद्धं परमाद्वैतं परमेकमेवास्तीति या अङ्गीकारं करोति सा सत्ता ॥५॥

अनादिनिधनोऽप्रमेयस्वभावकिरणानन्दोऽहमस्मीत्यहं-सूचन-शीला या सा पराऽहन्ता ॥६॥

स्वानुभवचित्चमत्कारनिरुत्थानदशां प्रस्फुटीकरोति या सा स्फुरता ॥७॥

नित्यशुद्धबुद्धस्वरूपस्य स्वयं प्रकाशत्वमाकलयतीति या सा पराकलेति उच्यते ॥८॥

अकुलमिति। जातिवर्णगोत्राद्यखिलनिमित्तत्वे नैकमेवास्तीति प्रसिद्धं। तथा चोक्तमुमामहेश्वरसंवादे—निरुत्तरं। अनन्यत्वादखण्डत्वादद्वयत्वादनन्याश्रयत्वात् निर्धामत्वादनामत्वादकुलं स्यान्निरुत्तरमिति ॥९॥

* * * * *

अलुप्तशक्तिमान्नित्यं सर्व्वाकारतया स्फुरन् पुनः स्वेनैव रूपेण एक एवावशिष्यते ॥१२॥

अतएव परमकारणं परमेश्वरः परात्परः शिवः स्वस्वरूपतया सर्वतोमुखः सर्वाकारतया स्फुरितुं शक्नोतीत्यतः शक्तिमान्। शिवोऽपि शक्तिरहितः शक्तः कर्त्तुं न किञ्चन। स्वशक्त्या सहितः सोऽपि सर्वस्याभासको भवेत् ॥१३॥

अतएवानन्तशक्तिमान् परमेश्वरः स विश्वरूपो विश्वमयो भवतीति प्रसिद्धं सिद्धानां च परापरस्वरूपा कुण्डलिनी वर्त्तते। अतस्ते पिण्डसिद्धाः प्रसिद्धाः सा कुण्डलिनी प्रबुद्धाऽप्रबुद्धा चेति द्विधा। अप्रबुद्धेति तत्र पिण्डचेतनरूपा स्वभावेन नानाचिन्ताव्यापारोद्यमप्रपञ्चरूपा कुटिलस्वभावा कुण्डलिनी ख्याता सैव योगिनां तत्तद्विलसितविकाराणां निवारणोद्यमस्वरूपां कुण्डलिन्युर्ध्वगामिनी प्रसिद्धा भवति ॥१४॥

ऊर्ध्वमिति। सर्वतत्त्वान्यपि स्वस्वरूपमेवेत्यूर्ध्वे वर्त्तते। अतएव सा विमर्शरूपिणी योगिनः स्वस्वरूपमवगच्छन्तीति सुप्रसिद्धा ॥१५॥

* * * *

एकैव सा मध्योर्ध्वाधः प्रभेदेन त्रिधा भिन्ना शक्तिरभिधीयते ॥१७॥
वाह्येन्द्रियव्यापार नानाचिन्तामया सैवाधः शक्तिरित्युच्यते ॥१८॥

* * * *

सर्वशक्तिप्रसरसंकोचाभ्यां जगत्सृष्टिसंहृतिश्च भवत्येव न सन्देहस्तस्मात्सामूर्लमित्युच्यते। अतः प्रायेण सर्वे सिद्धा मूलाधाररता भवन्ति ॥२०॥

* * * *

स्थूलेति निखिलग्राह्याधार विग्राह्य स्वरूपापि पदार्थान्तरे भ्राम्यमाणा (इव) चिद्रूपा या वर्त्तते सा कुण्डलिनी साकारा। स्थूला पुनास्त्वियमेव स्वप्रसारचातुर्य्यतया वर्त्तमाना योगिनां परमानन्दतया कुण्डलिनी या निश्चयभूता वर्त्तते सा सूक्ष्मा निराकारा प्रबुद्धा महासिद्धानां मते प्रसिद्धा ॥२२॥

सृष्टिः कुण्डलिनी ख्याता द्विधा भागवती तु सा।
एकधा स्थूलरूपा च लोकानां प्रत्यगात्मिका ॥
अपरा सर्व्वगा सूक्ष्मा व्याप्तिव्यापकवर्ज्जिता।
तस्याः भेदं न जानाति मोहितः प्रत्ययेन तु ॥२३॥

तस्मात् सूक्ष्मा परासंवित्स्वरूपा मध्या शक्तिः कुण्डलिनी योगिभिर्देहसिद्ध्यर्थं सद्गुरुमुखाज्ज्ञात्वा स्वस्वरूपदशायां प्रबोधनीया ॥२४॥

सर्वेषां तत्त्वानामुपरिवर्त्तमानत्वान्निर्नाम परमं पदमेव ऊर्ध्वं

प्रसिद्धं तस्याः स्वसंवेदन नानासाक्षात्कार सूचनशीलायासौर्ध्व शक्ति-रभिधीयते·········॥२५॥

*   *   *   *

·········परापरविमर्शरूपिणी संविज्ञानाशक्तिरूपेण निखिलपिण्ड-धारत्वेन वर्त्तते इति सिद्धान्तः ॥२८॥

॥ इति महेश्वरावतार श्रीगोरक्षनाथकृतौ सिद्धसिद्धान्तपद्धतौ पिण्डाधारनामा चतुर्थोपदेशः ॥४॥

पञ्चमोपदेशः

अथ पिण्डपदसमरसकरणो कथ्यते ।

*   *   *   *

यत्र बुद्धिर्मनो नास्ति तत्त्वविज्ञापराकला ।
ऊहोपोहौ न कर्त्तव्यौ वाचा तत्र करोति किम् ।
वाग्मिना गुरुणा सम्यक् कथं तत्पदमीर्यते ।
तस्मादुक्तं शिवेनैव स्वसंवेद्यं परं पदम् ॥३॥

अतएव नानाविधविचारचातुर्थ्यचर्चा विस्मयां गत्वाद्गुरुचरणकृपा-तत्त्वमात्रेण निरूपाधिकत्वेन निर्णेतुं शक्यत्वात् स्वसंवेद्यमेव परमपदं प्रसिद्धमिति सिद्धान्तः ॥४॥

*   *   *   *   *

निजपिण्डपरीक्षा च स्वस्वरूपकिरणानन्दोन्मेषमात्रं यस्योन्मेषस्य प्रत्याहरणमेव समरसकरणं भवति ॥११॥

*   *   *   *   *

एवं पिण्डे संसिद्धे ज्ञानप्राप्त्यर्थं तच्च परमं पदम् महासिद्धानां मतं परिज्ञाय च तस्मिन्नहं भावे जीवात्मा च सहजसंयमसोपायाद्वैतक्रमेणोप-लक्ष्यते ॥२५॥

तत्र सहजमिति विश्वातीतं परमेश्वरं विश्वरूपेणावभासमानमिति ज्ञात्वैकमेवास्तीति स्वस्वभावेन यज्ज्ञानं तत् सहजं प्रसिद्धम् ॥२६॥

संयम इति सावधानानां प्रस्फुरद्व्यापाराणां निजवर्त्तिनां संयमं कृत आत्मनि धीयत इति संयमः ॥२७॥

सोपायमिति स्वयमेव प्रकाशमयं स्वेनैव स्वात्मन्येकीकृत्य सदा तत्त्वेन स्थातव्यम् ॥२८॥

अद्वैतमित्यकर्त्तृतयैव योगी नित्यतृप्तो निर्विकल्पः सदा निरुत्थानत्वेन तिष्ठति ॥२९॥

*　　*　　*　　*　　*

अनुबुभूषति यो निजविश्रमं सद्गुरुपादसरोरुहमाश्रयेत् ।
तदनुसंसरणात् परमं पदम् समरसीकरणं न च दूरतः ॥४५॥

*　　*　　*　　*　　*

एतेषामपि सर्वेषां विज्ञाता यः स योगी स सिद्धपुरुषः स योगीश्वरेश्वर इति परमरहस्यं प्रकाशितम् ॥५५॥

अतएव सम्यङ् निजविश्रान्तिकारकं महासिद्धयोगिनं सद्गुरुं सेवयित्वा सम्यक सावधानेन परमं पदं संपाद्य तस्मिन्निजपिण्डे च समरसभावं कृत्वात्यन्तनिरुत्थानेन सर्वानन्दतत्वे निश्चलं स्थातव्यं ततः स्वयमेव महासिद्धो भवतीति सत्यम् ॥५६॥

*　　*　　*　　*　　*

योगीश्वरेश्वरस्यैवं नित्यतृप्तस्य योगिनः ।
चित् स्वात्मसुखविश्रान्ति भावलब्धस्य पुण्यतः ॥५८॥

*　　*　　*　　*　　*

कथनाच्छक्तिपाताद्वा यद्वा पादावलोकनात् ।
प्रसादात् स्वगुरोः सम्यक् प्राप्यते परमं पदम् ॥६५॥

*　　*　　*　　*　　*

किमत्र बहुनोक्तेन शास्त्रकोटिशतेन च ।
दुर्लभाश्चित्तविश्रान्ति र्विना गुरुकृपां पराम् ॥८१॥
चित्तविश्रान्तिलब्धानां योगिनां दृढ़चेतसाम् ।
स्वस्वमध्ये निमग्नानां निरुत्थानं विशेषतः ॥८२॥
निमिषात् प्रस्फुटं भाति दुर्लभं परमं पदम् ।
यस्मिन् पिण्डो भवेल्लीनः सहसामात्र संशयः ॥८३॥

संवित् क्रियाविकरणोदयचिद्विलासो विश्रान्तिमेव भजतां स्वयमेव भाति। ग्रस्ते स्ववेगनिचये पदपिण्डमैक्यं सत्यं भवेत् समरसं गुरुवत्सलानाम् ॥८४॥

॥ इति श्रीगोरक्षनाथकृतौ सिद्धसिद्धान्तपद्धतौ पिण्डपदसमरसकरणं नाम पञ्चमोपदेशः ॥५॥

षष्ठोपदेशः

अथ अवधूतयोगिलक्षणो कथ्यते।

य: सर्वान् प्रकृति विकारानवधुनोतीत्यवधूत योगी।

*　　*　　*　　*　　*

प्रसरं भासते शक्तिः संकोचं भासते शिवः।
तयोर्योगस्य कर्त्ता यः स भवेत्सिद्धयोगिराट् ॥६३॥
विश्वातीतं यथाविश्वमेकमेव विराजते।
संयोगेन सदा यस्तु सिद्धयोगी भवेत्तु सः ॥६४॥
सर्वासां निजवृत्तीनां प्रकृतिर्भजते लयम्।
स भवेत् सिद्धसिद्धान्ते सिद्धयोगी महाबलः ॥६५॥
उदासीनः सदाशान्तः स्वस्थोन्तर्निजभासकः।
महानन्दमयो धीरः स भवेत् सिद्धयोगिराट् ॥६६॥
परिपूर्णप्रसन्नात्मा सर्वासर्वपदोदितः।
विशुद्धो निर्भरानन्दः स भवेत् सिद्धयोगिराट् ॥६७॥
गते न शोकं विभवे न वाञ्छा प्राप्ते न हर्षं न करोति योगी।
आनन्दपूर्णो निजबोधलीनो न बाध्यते कालपथेन नित्यम् ॥६८॥

*　　*　　*　　*　　*

॥ इति श्रीमहेश्वरावतारश्रीगोरक्षनाथकृतौ सिद्धसिद्धान्तपद्धतावधूतयोगिलक्षणो नाम षष्ठोपदेशः समाप्तः ॥६॥

॥ श्रीरस्तु ॥

অভিমত

From Mahamohopadhyay Gopinath Kaviraj, M. A., D. Litt.

I have read the work with care and attention. The subject chosen is undoubtedly a good one as it furnishes ample scope for original investigation. Though a lot of historical research has been done on Nath culture, nothing of much importance seems to have even been attempted in regard to its philosophical and mystical aspects.

The first part is generally of the nature of a compilation of results of researches carried on by earlier writers. The second and third parts contain much more useful and original matter. The chapter which deals with the system of Yoga in vogue among the Naths as evident from Bengali Literature is interesting.

The greatest and substantial contribution of the writer is the presentation of the contents of "Siddha-Siddhanta-Paddhati". This is a very valuable work though cryptic in character. The presentation and interpretation are commendable and represent an original contribution in the field of Nath Philosophy. The data of doctrinal and cultural traditions found in the works like "Amanaska" and "Yogavija" have been used by way of confirming and illustrating the teachings of "Siddha-Siddhanta-Paddhati". This adds to the originality and importance of the contribution made by the writer. The attempt of the writer as that of the pioneer worker in an unexplored field is admirable.

Sd. Gopinath Kaviraj

From Dr. P. C. Bagchi, M. A., Dr. es Lettres (Paris), Santiniketan.

I have carefully read the work of Dr. Kalyani Mallik on the History and Philosophy of the Nath Sect. This is the first attempt to present the subject in a comprehensive manner. She has spared no pains in collecting materials from various sources such as the MSS Libraries, the Nath teachers and Sannyasis. The book as such is well documented, critical and authoritative. The author must be warmly congratulated for her successful performance.

Sd. P. C. Bagchi

From Krishna Chandra Bhattacharyya, M. A.

The work is an informative and well documented dissertation in Bengali on the history, philosophy and esoteric discipline of Nath Yogis, an influential religious sect of mediaeval India.

The first portion gives a general account of the origin and affiliations of the sect and critically investigates, in the light of previous researches, questions on the probable time of the traditional Gurus of the sect and brings out interesting affiliations of the sect with Saiva and Bhuddistic schools of thought and with the Tantrik and other mystic cults of the mediaeval period.

More valuable part of the work appears in the second portion dealing with the philosophy of the Nath sect and giving a systematic exposition and philosophy in 12 chapters supported by detailed references to works -accepted by the sect as authoritative and supplemented by comparisons with Vedantic and other schools of thought.

The work shows considerable industry and sympathetic understanding of the Cult, of free inner realization in different forms adopted by the Nath Yogis of Bengal and allied Indian sects.

Sd. **Krishna Chandra Bhattacharyya**

From Dr. H. D. Bhattacharyya, M. A., B. L., P. R. S., Darsana-sagara, retired head of the department of philosophy and Provost, Jagannath Hall, Dacca University

ডাঃ কল্যাণী মল্লিক তাঁহার নাথসম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধনপ্রণালীতে যে বিপুল দ্রব্যসম্ভার একত্রিত করিয়াছেন তাহাতে প্রতিপৃষ্ঠায় তাঁহার অধ্যবসায়, গভীর জ্ঞান ও সমালোচনা শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা একটী প্রামাণ্যগ্রন্থ হিসাবে গৃহীত হইবে এ আশা করা অন্যায় হইবে না। হয়তো স্থানে স্থানে কিছু পুনরুক্তি আছে ও সংস্কৃতাংশে কিছু কিছু বর্ণাশুদ্ধি আছে। আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণে এ সব ত্রুটি বিচ্যুতি অপসারিত হইবে। নাথসম্প্রদায়ের শাস্ত্রে অনেক পরিভাষা ব্যবহৃত হয়—এ পুস্তকেও তাহাদের সংখ্যা কম নয়। হয়তো পরিশিষ্টাংশে তাহাদের ব্যাখ্যাও সংলগ্ন করা প্রয়োজন হইবে। তিনি যে পরিশ্রমের সহিত এই দুষ্কর কার্য্যটী সম্পন্ন করিয়া যশঃ অর্জ্জন করিয়াছেন তাহার যথোচিত সমাদর হইবে ইহা আমার বিশ্বাস। আশা করি তিনি সময় ও সুবিধামত ইহার একটী ইংরাজী সংস্করণও প্রকাশিত করিবেন।

স্বাঃ **শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য**